উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি.

উপাধির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা-সন্দর্ভ

হরিশংকর জলদাসের আখ্যানবিশ্ব : নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে

গবেষক

সৌরভ বসাক

রেজিস্ট্রেশন নং. **Ph.D/Beng. (1296)/728/R-2020**

তত্ত্বাবধায়ক

উর্বী মুখোপাধ্যায়

সহকারী অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সেপ্টেম্বর, ২০২২

DECLARATION

I, Sourav Basak bearing Registration Number Ph.D/Beng.(1296)/728/R-2020 hereby declare that the subject matter of the thesis entitled 'হরিশংকর জলদাসের আখ্যানবিশ্ব : নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে' is the record of work done by me and that the contents of this thesis did not from the basis for award of any degree to me or to anybody else to the best of my knowledge. The thesis has not been submitted in any other University/Institute.

This thesis is being submitted to University of North Bengal for the degree of Doctor of Philosophy in Bengali.

Sourav Basak

....

Signature of the Candidate

Department of Bengali

North Bengal University

Place : Shivmandir

Date : 23/09/2022

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ঊর্বী মুখোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

অধিকর্তা, সরোজিনী-পূর্ণেশ্বরী ছাত্রী আবাস, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রেফারেন্স নং :

তারিখ :

CERTIFICATE

This is to certify that Sourav Basak, PhD registration no: Ph.D/Beng.(1296)/728/R-2020, has completed his research on the topic titled "হরিশংকর জলদাসের আখ্যানবিশ্ব : নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে" under my supervision at the Department of Bengali, University of North Bengal. So far as the methodology of research, collection of data, analysis, chapterization and presentation in a written form are concerned he has fulfilled all the criteria of modern research in Humanities and Social Science. I hope the thesis will be considered an original contribution in his field of research. It is also certified that neither in part nor in full the thesis has been published anywhere either for any scholarly degree or financial benefit. He is now permitted to submit the thesis for PhD degree (Arts) in Bengali to the University of North Bengal. I wish him all success.

Date: 23/09/2022

Urbi Mukherjee

Urbi Mukherjee
Assistant Professor
Department of Bengali
North Bengal University

Asst. Professor
Dept. of Bengali
University of North Bengal

ঠিকানা : বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজা রামমোহনপুর, জেলা-দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৪০১৩
ই-মেল : urbimukherjee.2014@gmail.com মোবাইল নং : 9775495159/9432849502

Ouriginal

Document Information

Analyzed document	Sourav Basak_Bengali.pdf (D144110593)
Submitted	2022-09-15 08:34:00
Submitted by	University of North Bengal
Submitter email	nbuplg@nbu.ac.in
Similarity	0%
Analysis address	nbuplg.nbu@analysis.urkund.com

Sources included in the report

Entire Document

1 উত্তরব¿ বি ±বিদ-এলয়র বাংলা বিভাগের অধীন পিএইচ ডি উপাধির জন- উপ পিত গেবষণা-স ভ ² হিরশংকর জলদাসর আখ-নির ±: নি তবগ ী য় ±চতনার আলোক গেবষক ±সৗরভ বসাক ±রিজে শন নং: Ph.D/Beng. (1296)/728/R-2020 তত্ত্বাবধায়ক উৎ ী মুখোপাধ-ায় সহকারী অধ-াপক বাংলা বিভাগ উত্তরব¿ বি ±বিদ-ালয় ±সে - পর, ২০২২

2 ভূমিকা

3 এক ি চিরকালই মানুেষর সভ-তায় একদল অধ-ত ±লাক থােক, তােদরই সংখ-া ±বিশ, তারাই বাহন; তােদর মানুষ হবার সময় ±নই, ±দেশর স েদর চিনি তারা পিতল। সব ±চেয় কম ±খেয় কম প ের কম িশেখ বািক সকেলর পিরচয ো কের; সকেলর ±চেয় ±বিশ তােদর পির েম, সকেলর ±চেয় ±বিশ তােদর অস ান। কথায় কথায় তারা উেপাস মের, উপরওয়ালােদর লািথ-ঝাঁটা ±খেয় মের — জীবন-যা ার জন- যত িকছু সুেযাগ সুিবেধ সব িকছুর ±থেকই তারা বিঞ্চত। তারা সভ-তার িপলসুজ, মাথায় প্রদীপ িনেয় খাড়া দাঁিড়েয় থােক—উপেরর সবাই আেলা পায়, তােদর গা িদেয় ±তল গিড়েয় পেড়।" (ঠাকুর ১৩৬৮, পৃ.৬৭৫) সভ-তার িপলসুজ -ই আজেকর পিরভাষায় সাবঅলটার্ন ² অথ াৎ িন তবগ ²। িক রবী নাথ এই অধ-ত ±লাক - ±দর ±য ৎ েশর কথা বেলেছন তা িন তবেগ র বিষয়¿। আেল কােক বলব িন তবগ ² ? িন তবগ ² বিতহাসচচ া, তত্ত্ব ও ±চতনার সূ পাত ±কাথায়, কেব, কীভােব? এসব প্রে র উত্তর ±খাঁজার আেগ আমরা বেল িনেত চাই সমােজর উঁচুিনচু ধারণার কথা। যেব ±থেক মানুষ ±গা ীব ভােব থাকেত িশেখেছ তেব ±থেক ±সই সমােজ উঁচু-নিচু, শাসক-শািসত—এ ৈবপরীত- লক্ষ করা িগেয়েছ। ধু সামািজক িদক ±থেক নয়, অথ ৈনিতক, রাজৈনিতক মেতা-বিষয় ²ত এক ±েশি বরাবর সমােজর তলেদেশ অব ান কেরেছ। এই বৃহৎ বিষয় ²ত মানুষগিলেক ১৯৮২ সােল সমােলাচক রণিজৎ গহ িন তবগ ² বেল অিভিহত কেরন। এরেও তােদর আমরা চাত-, দিলত, অ -জ, অি ক, অপর, অবতলজন বা- ই িদন না ±কন, তােদর একেশ্রেণর তলায় এক পিরভাষায় সংি িপ্ত করা হেয়েছ সাবঅলটার্ন ² বা িন তবগ ² বেল। এখােন অ িস¿কতেব বলা আবাজন, দিলত- ±দর আমরা আেলাচনার বাইের ±রেখিছ। আসেল যত ²মােন দিলত শ কিট একিট রাজৈনিতক পদ ±পেয়েছ যার ±যাগসূ রেয়েছ সামািজক ইিতহােসর অধ্যায় সে¿। ১৯৩০ পরবত ী সমেয় িবআর আে পদকেরর ±নতৃত্ব িন তে ণি, িন িবত্ত তথা িন তবেগ র ±য আে ালন গেড় উেঠিছল, ±সখােন এই দিলত শ কিট িবপুলভােব উেঠ আেস। সাধারণ অেথ ² দিলত বলেত ±বাঝায় যারা সব ²হারা। তা িক সব ±ক্ষে নয়। সব ²হারা বলেত যােদর িকছু ±নই, আর দিলত বলেত যারা িকছু নয়। যােদর িকছু ±নই, তা একটা সময় পূরণ হেয় ±যেত পাের িক যারা িকছু নয় তােদর পশা র যেব কী কের? এরই ফেল ১৯৫৬ সােল সািহেত-র মধ- িদেয় দিলত সািহত- আে ালেনর আেয়াজন করা হয়, িক ওই বছর িবআর আে পদকেরর অকাল প্রয়াণ তা হেয় ওেঠ না। তেব ১৯৫৮ সােল এই আে ালেনর আনু ািনক সূচনা হেয়িছল ±যখােন বলা হেয়েছ দিলত সািহত- অন-ান- সািহেত-র তুলনায় একেবােরই পৃথক। দিলত সািহত- র চনা ও আে ালেনর মধ- িদেয় সময়

Ubhi Mukherjee 23/9/2022
Asst. Professor Dept. of Bengali University of North Bengal

Sourav Basak 23/09/2022

সূচি

পৃষ্ঠা

- ➢ সারবস্তু i-vi
- ➢ প্রাগভাষ vii-viii
- ➢ ভূমিকা ১-৭
- ➢ পূর্ববর্তী গবেষণামূলক প্রবন্ধের মূল্যায়ন ৮-১২
- ➢ প্রথম অধ্যায়
  নিম্নবর্গ : ইতিহাস ও তত্ত্বের সন্ধানে ১৩-৫১
- ➢ দ্বিতীয় অধ্যায়
  স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনার রূপরেখা ৫২-৯৬
- ➢ তৃতীয় অধ্যায়
  হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে নিম্নবর্গ : আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ৯৭-২৪৭
- ➢ চতুর্থ অধ্যায়
  হরিশংকর জলদাসের আখ্যানবিশ্ব : নিম্নবর্গের শোষণ ও বঞ্চনার বিবিধ রূপ ২৪৮-৩১২
- ➢ পঞ্চম অধ্যায়
  হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্ব : নিম্নবর্গীয় চেতনায় প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বয়ান ৩১৩-৩৭৫
- ➢ ষষ্ঠ অধ্যায়
  হরিশংকর জলদাসের আখ্যানবিশ্ব ও নিম্নবর্গীয় চেতনা : সম্পর্কের সন্ধানে ৩৭৬-৪০৭
- ➢ উপসংহার ৪০৮-৪১৪
- ➢ গ্রন্থপঞ্জি ৪১৫-৪২২
- ➢ পরিশিষ্ট ৪২৩-৪৩৫
  - হরিশংকর জলদাসের জীবন ও রচনাপঞ্জি
  - সাক্ষাৎকারে হরিশংকর জলদাস
- ➢ নির্ঘণ্ট ৪৩৬-৪৩৭

গবেষণা-সন্দর্ভের সারবস্তু

ভূমিকা :

যবে থেকে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে থাকতে শিখেছে তবে থেকে সেই সমাজে উঁচু-নিচু, শাসক-শাসিত—এ বৈপরীত্য লক্ষ করা গিয়েছে। শুধু সামাজিক দিক থেকে নয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষমতা-বহির্ভূত এক শ্রেণি বরাবর সমাজের তলদেশে অবস্থান করেছে। এই বৃত্ত বহির্ভূত মানুষগুলিকে ১৯৮২ সালে সমালোচক রণজিৎ গুহ 'নিম্নবর্গ' বলে অভিহিত করেন। এক্ষেত্রে তাদের আমরা ব্রাত্য, দলিত, অন্ত্যজ, প্রান্তিক, অপর, অবতলজন যা-ই বলি না কেন, তাদের একছাদের তলায়, এক পরিভাষায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে 'সাবঅলটার্ন' বা 'নিম্নবর্গ' বলে। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' সমালোচনাতত্ত্ব মূলত পোস্ট-কলোনিয়াল স্টাডিজের অন্তর্ভুক্ত। বিশ শতকে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' অন্যতম। প্রাথমিকভাবে বলতে গেলে 'সাবঅলটার্ন' হল উপনিবেশের শোষিত মানুষ যারা মূলত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ভৌগোলিক দিক থেকে ক্ষমতার বাইরে অবস্থান করছে। আসলে উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদে বিশেষ করে যে দিকটি লক্ষ করা হয় সেটি হল স্বাধীনতার পর প্রাচ্যের দেশগুলিতে বিকাশের গতি প্রকৃতি। এখানে সমগ্র বিশ্বের আলোচনা স্থান পেলেও বিশেষ করে ভারতবর্ষ, চীন, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের ক্ষেত্রে বিশেষ আলোকপাত করা হয়। ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর প্রতিক্রিয়াগুলোর ওপর ভিত্তি করে ঔপনিবেশিকতাবাদ তত্ত্বটি গুরুত্ব লাভ করেছে। এই তত্ত্ববাদীরা অধিকাংশ সময় দেখিয়ে এসেছেন নিম্নবর্গের কোনো রাজনৈতিক সচেতনতা নেই। তাঁরা নিম্নবর্গকে দেখেছেন সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদী ইতিহাস কাঠামোর ভেতরেই। কিন্তু নিম্নবর্গের ইতিহাস-চর্চাকারীরা প্রমাণ করেছেন নিম্নবর্গের অস্তিত্ব, চেতনা, প্রভাব ও সীমাবদ্ধতাকে। সেক্ষেত্রে সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নবর্গের সচেতনতা ও বিদ্রোহী রূপ ইতিহাসের পাতায় আমরা লক্ষ করেছি বারবার। এখানেই ঔপনিবেশিকতাবাদের সঙ্গে নিম্নবর্গের ইতিহাস-চর্চাকারীদের মত পার্থক্য, যেখান থেকে ১৯৮২ সালে নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহের প্রতিনিধিত্বে নতুন তত্ত্ব সম্বলিত 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ পায় যা পরবর্তীকালে নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একটি বাঁক তৈরি করে। নিম্নবর্গের ইতিহাস কোনো 'সাবজেক্ট' নয়, তা আসলে একটি পদ্ধতি। উচ্চবর্গের বিপরীতে তাদেরও রয়েছে নিজস্ব স্বকীয়তা, দাবি ও স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর যা নিম্নবর্গের

ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের জন্ম দেয়। নানা বিতর্ক ও সমালোচনার ভিত্তিতে সৃষ্টি করে এক নতুন তত্ত্বের।

যদিও 'নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা'-য় ক্ষমতার সম্পর্কসূত্রে নিম্নবর্গের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে আধিপত্য-অধীনতার ভিত্তিতে। যেমন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক মনে করেন, ঔপনিবেশিক শাসনে যে কোনো ধরনের অধীনতা ও ক্ষমতার সূত্রে নিপীড়িত অধীনস্ত যারা, তারাই নিম্নবর্গ। রণজিৎ গুহ মনে করেন, গরীব চাষি, প্রায় গরীব ও মাঝারি চাষি, নিরবিত্ত ভূস্বামী, হীনবল গ্রামভদ্র, সম্পন্ন মাঝারি কৃষক ও ধনী কৃষক, গরীব শ্রমিক, ক্ষেত মজুর, নিম্ন মধ্যবিত্ত গ্রাম ও শহরের গরীব জনতা, আদিবাসী ও নারীও নিম্নবর্গ। জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের মতে, অচ্ছুত, গৃহ ভৃত্য, নিরক্ষর অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, নারী, শিশু ও অসংখ্য প্রান্তিক অপর শ্রেণি হল নিম্নবর্গ। তাহলে ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে নিম্নবর্গের আনুষ্ঠানিক চর্চার সূত্রপাত ও তার সংজ্ঞায়নের পরেই কি ইতিহাস ও সাহিত্যের পাতায় নিম্নবর্গের উত্থান? তা নয়, বলাবাহুল্য। ঠিক যেমন ভাষার আগে ব্যাকরণ নয়, ঠিক তেমনই আমরা যাদের ব্রাত্য, অন্ত্যজ, প্রান্তিক, অপর, অবতলজন বলে জেনে এসেছি, তার যোগসূত্র কোনোভাবেই গ্রামশি ব্যবহৃত 'সাবঅলটার্ন'-এর সঙ্গে নেই। কারণ রবীন্দ্রনাথ কথিত 'সভ্যতার পিলসুজ'রা চিরকাল সমাজের একদল অখ্যাত লোক হয়ে ছিলই। তারা বরাবর এই সচল সমাজের এক অনিবার্য উপাদান। তারা সবসময়ই ইতিহাসেও ছিল, সাহিত্যেও ছিল। পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' এর প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর নিম্নবর্গকে নতুন দৃষ্টিতে, নতুন চেতনা ও তত্ত্বের আলোকে দেখার অবকাশ পাওয়া গেল। এই অবকাশেই আমরা হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যকে আমাদের গবেষণার জন্য নির্বাচন করেছি। কারণ, তিনি অধুনা স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের জেলেপল্লির একজন জেলেসন্তান। জেলে জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা তাঁর রচনায় বারবার উঠে এসেছে। এখানে আমরা দেখতে চেয়েছি নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে সমাজের একজন তথাকথিত নিম্নবর্গের সাহিত্যিকের রচনা কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভে বর্তমানকাল অর্থাৎ ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হরিশংকর জলদাসের নিম্নবর্গকেন্দ্রিক উপন্যাস-ছোটোগল্পের ('জলপুত্র', 'দহনকাল', 'কসবি', 'রামগোলাম', 'মোহনা', 'অর্ক', 'একলব্য', 'সুখলতার ঘর নেই', 'প্রস্থানের আগে', 'কুন্তীর বস্ত্রহরণ' এবং 'গল্পসমগ্র ১', 'গল্পসমগ্র ২') মধ্য দিয়ে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-চর্চিত নিম্নবর্গীয় চেতনাকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি।

বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভের উদ্দেশ্য ও বিশ্লেষণকে সঠিক পথে চালিত করার জন্য সমগ্র কাজটি হরিশংকর জলদাসের নিম্নবর্গ-প্রধান কথাসাহিত্যের নিরিখকে অনুসরণ করে অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের গবেষণার বিশ্লেষণকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি। গবেষণা করাকালীন বিষয় অনুসারে আলোচ্য অধ্যায়ের শিরোনামকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবর্তন করা হয়েছে। সমগ্র গবেষণা-সন্দর্ভটিকে ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে আলোচনা করেছি।

প্রথম অধ্যায় :

নিম্নবর্গ : ইতিহাস ও তত্ত্বের সন্ধানে

প্রথম অধ্যায়ে আমরা নিম্নবর্গ ও নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার উৎপত্তি, ভারতবর্ষে এর সূচনা, ক্রমবিকাশ ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে এই অধ্যায়ে। এখানে আমরা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি, নিম্নবর্গ বলতে কী বোঝায় এবং কারা এর আওতাভুক্ত। পাশাপাশি তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, চেতনা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায় :

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনার রূপরেখা

আমরা এই অধ্যায়ে স্বাধীনতা উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থান ও উত্থানের সংক্ষিপ্ত রূপরেখাটি সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি। যেহেতু অতীতকে না জানলে বর্তমানকে জানা সম্ভব নয়, সেহেতু প্রাচীনসাহিত্য থকে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থানের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। স্বাধীনতা-উত্তর কালখণ্ডকে বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে বলা যায় বাংলা কথাসাহিত্যের কালখণ্ড দীর্ঘ। এই দীর্ঘ কালখণ্ডের বিচারে নিম্নবর্গকে দেখতে হলে আমরা আলোচনার মূল লক্ষ্য থেকে সরে যেতে পারি, সুতরাং আমাদের এমন একটি কালখণ্ড নির্দিষ্ট করতে হয়েছে যা গবেষণার মূলসুরকে অনুসরণ করে। তাছাড়া এই দীর্ঘ কালখণ্ডের নিরিখে নিম্নবর্গের অবস্থানগত আলোচনাটি একটি স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয় হয়ে উঠতে পারে বলে আমাদের মনে হয়েছে। তাই স্বাধীনতা উত্তর কথাসাহিত্যকে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

তৃতীয় অধ্যায় :

হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে নিম্নবর্গ : আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে আর্থিক-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পাশাপাশি দেখিয়েছেন অন্ত্যজ শ্রেণির সংগ্রাম ও উত্থানকেও। আমরা জানি একদল নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চাকারী দেখিয়ে এসেছেন নিম্নবর্গের কোনো রাজনৈতিক সচেতনতা নেই। হরিশংকর জলদাস-এর কথাসাহিত্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমরা এই সিদ্ধান্তের সত্যতা বিচার করার চেষ্টা করেছি। সমাজসৃষ্ট জাতপাত ও ধর্মীয় গোঁড়ামি লেখকের কলমে উঠে আসছে কি না এবং নিম্নবর্গ বলতে লেখক কি কেবল খেটে খাওয়া মজুরদের কথাই বোঝাচ্ছেন, না বিস্তৃত অর্থেই নিম্নবর্গকে তিনি লেখায় স্থান দিয়েছেন—সে বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়েছি।

চতুর্থ অধ্যায় :

হরিশংকর জলদাসের আখ্যানবিশ্ব : নিম্নবর্গের শোষণ ও বঞ্চনার বিবিধ রূপ

'উচ্চবর্গ'-এর অপর হিসাবে 'নিম্নবর্গ'-রা বরাবর পরিচিত হয়ে এসেছে। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে বর্ণের দিক থেকে মানুষ ছিল নিম্নবর্ণ, ঔপনিবেশিক যুগে শিক্ষার দিক থেকে মানুষ নিম্নবর্গ, আর উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে অর্থের দিক থেকে মানুষ নিম্নবর্গ। উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় শাসক-শোষিতের সম্পর্ক। আলোচ্য লেখক তাঁর সাহিত্য জগৎ তৈরি করেছেন প্রধানত নিম্নবর্গীয় মানুষদের নিয়ে। ফলে সেই সমাজেও নিম্নবর্গের মধ্যে তৈরি হয়েছে শাসক-শোষিতের পারস্পরিক অবস্থান। বিশেষ করে 'জলপুত্র' উপন্যাসে বর্ণিত জেলেগোষ্ঠীর মধ্যেই রয়েছে উচ্চ-নীচ বিভাজন। ফলে সেখানেও দেখা যায় শোষণের নানাবিধ চিত্র। সমাজে শোষণের মূলত যে দ্বিবিধ রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়—সেই বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আলোচ্য অধ্যায়ে। পুরুষের ওপরে যদি মহাজনদের শোষণ চলে তাহলে মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে অবহেলিত ও অবদমিত করার প্রয়াস।

পঞ্চম অধ্যায় :

হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্ব : নিম্নবর্গীয় চেতনায় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বয়ান

ক্ষমতার সম্পর্কের একদিকে আধিপত্য থাকলে তার অপর প্রান্তে অবশ্যই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। কিন্তু পঞ্চম অধ্যায়ে দেখা গেল পরিস্থিতি ও ক্ষমতার প্রাবল্যের কাছে প্রতিরোধ কেন, কোনো

প্রতিবাদ স্বরূপ প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত লক্ষ করা যায়নি। নিম্নবর্গের এই একান্ত অনুগত জীব হয়ে দৈনন্দিন অধীন জীবনযাপন নিম্নবর্গের নিম্নবর্গত্বকে যেমন স্পষ্ট করে তেমনই এই নিষ্ক্রিয়, ভীরুতা ও প্রতিবাদহীনতাই একটা সময় পরোক্ষভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতেও সাহায্য করেছে। পাশাপাশি নিম্নবর্গের প্রতিবাদ ও সেই প্রতিবাদের ব্যর্থতার কথাও যেভাবে উঠে এসেছে তাতে কথাবিশ্বে ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা গিয়েছে। জলপুত্র, দহনকাল, কসবি, রামগোলাম, অর্ক, মোহনা, একলব্য প্রভৃতি উপন্যাসে ইতিহাস কথিত নিম্নবর্গের নেতিবাচক চেতনা হিসেবে প্রতিবাদী চেতনাকে ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে অনুধাবনের চেষ্টা আছে আলোচ্য অধ্যায়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায় :

হরিশংকর জলদাসের আখ্যানবিশ্ব ও নিম্নবর্গীয় চেতনা : সম্পর্কের সন্ধানে

ইতিহাস যিনি লেখেন তিনি যেমন একজন ব্যক্তি; একজন সাহিত্য স্রষ্টাও তেমনই একজন ব্যক্তি। তবে একজন ঐতিহাসিক যখন ইতিহাস লিখতে বসেন তখন তাঁর নিজস্ব কিছু দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করলেও, তিনি আশ্রয় নেন বহু প্রামাণ্য তথ্য, সত্য ও তত্ত্বের। কিন্তু একজন সাহিত্য স্রষ্টার কিন্তু সে দায় থাকে না। ইতিহাসের মধ্যে যে বাস্তব সত্য উঠে আসে, তা অনেক ক্ষেত্রেই সাহিত্যে উঠে আসে না। কারণ সাহিত্য শিল্পকলা, আর ইতিহাস চরম বাস্তব। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গিগত তফাৎ থেকেই একজন ঐতিহাসিক যেভাবে নিম্নবর্গকে আবিষ্কার করবেন একজন সাহিত্যিক হিসাবে নিম্নবর্গের আবিষ্কার কিন্তু সেরূপ হবে না। এই ভাবনা আমাদের বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভ তৈরির ওপর অনেক বেশি ক্রিয়াশীল। আমরা এ অধ্যায়ে অন্বেষণ করে দেখেছি নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাকারীরা নিম্নবর্গকে যেভাবে দেখেছেন, একজন সাহিত্যিক হিসাবে হরিশংকর জলদাস তাঁর আখ্যানে নিম্নবর্গকে সেভাবে দেখছেন কি না, বা নিম্নবর্গ নিয়ে তাঁর আখ্যানে নতুন কোনো দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা গিয়েছে কি না। মূলত নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে হরিশংকর জলদাস-এর কথাসাহিত্যকে ব্যাখ্যা করেছি আলোচ্য অধ্যায়ে।

পরিশিষ্ট :

আলোচ্য অংশে আমরা হরিশংকর জলদাস-এর ব্যক্তিগত জীবনপঞ্জি ও সৃজনবিশ্ব নিয়ে আলোচনার অবকাশ রেখেছি। পাশাপাশি হরিশংকর জলদাস অর্জিত বিবিধ সম্মাননার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং সাক্ষাৎকার এই অংশে তুলে ধরা হয়েছে।

উপসংহার :

উপসংহারে পৌঁছে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির আলোচনার প্রেক্ষিতে সামগ্রিক সিদ্ধান্তে পৌছনোর চেষ্টা করেছি। সংক্ষেপে বলা যায়, হরিশংকর জলদাস তাঁর কথাবিশ্বে নিম্নবর্গকে তুলে ধরেছেন একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ক্ষেত্রের মধ্যে। অর্থাৎ তথাকথিত জেলে, মেথর, পতিতা, কুমোর ইত্যাদি নিম্নবর্গীয় সমাজের মধ্যেই উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের বৈপরীত্যমূলক অবস্থান। ক্ষেত্র পরিবর্তনে ক্ষমতার পরিবর্তনের বিষয়টি সেভাবে কথাবিশ্বে উঠে আসেনি। নিম্নবর্গীয় সমাজের মধ্যেই তাঁর কথাসাহিত্যের সীমাবদ্ধতা। তাছাড়াও আলোচ্য কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধগুলি তাদের প্রতিশোধস্পৃহাকে সাময়িক সন্তুষ্টি দিলেও উচ্চবর্গের ক্ষমতার কাছে তা ব্যর্থ হয়েছে। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এ আলোচিত কৃষক বিদ্রোহের নিরিখে উঠে আসা কৃষকের বিদ্রোহী চেতনার নেতিবাচকতা আসলে যে শুধু কৃষকই নয়, সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তা আমরা হরিশংকর জলদাসের আলোচ্য কথাবিশ্বের নিরিখেও অনুধাবন করলাম।

প্রাগভাষ

বেশ কয়েক বছর আগে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনা করতে গিয়ে জানতে পারি বাংলাদেশের সাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস রচিত 'জলপুত্র' উপন্যাসটির কথা। একজন জেলেসন্তানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল এই উপন্যাস—এ কথা জানার পর উপন্যাসটি সম্পর্কে কৌতূহল জন্মায়। অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পর পুনরায় একজন জেলেসন্তানের কলমে জেলেদের কথা উঠে আসতে দেখা গেল। উপন্যাসটির কাহিনি-গ্রন্থন ও সামুদ্রিক জেলেজীবনপূর্ণ উপাদান আমাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তখন থেকেই হরিশংকর জলদাসের লেখাপত্র সংগ্রহ করার সূত্রপাত। পরবর্তীকালে তাঁর প্রকাশিত গল্প-উপন্যাসগুলি পড়তে পড়তে নিম্নবর্গীয় জীবন ব্যাখ্যানের সৌকর্যে অভিভূত হই এবং বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করি।

এই বিষয়টি নিয়ে আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি. গবেষণার জন্য সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করি এবং তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পাশে পাই বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক উর্বী মুখোপাধ্যায়কে। 'হরিশংকর জলদাসের আখ্যানবিশ্ব : নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে' শিরোনামের মধ্য দিয়ে আমি বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রকাশিত হরিশংকর জলদাসের নিম্নবর্গপ্রধান উপন্যাস ও গল্পকে নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমার গবেষণার কাজটি শুরু করি। প্রয়োজনীয় মতামত দিয়ে, ভুল-ত্রুটি শুধরে দিয়ে ও সামগ্রিকভাবে সঠিক দিশা দেখিয়ে গবেষণার কাজে ম্যাডাম আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। গুরুঋণ সবসময়ই অপরিশোধ্য, তবুও ম্যাডামের প্রতি জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। বাংলা বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতিও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

কোভিড-১৯ অতিমারির প্রকোপে বই ও তথ্য সংগ্রহের কাজটি অসুবিধাজনক হয়ে উঠেছিল। ফলে বাধ্য হয়ে অনেক ক্ষেত্রেই আমদের আন্তর্জালিক বই-পত্র ও তথ্যাদির ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। মূলত লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এছাড়াও প্রয়োজনীয় বইপত্রের সন্ধান ও মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিনায়ক রায়, বাংলাদেশ থেকে তথ্য সরবরাহ করে পাশে থেকেছেন অধ্যাপক বাকি বিল্লাহ বিকুল, অধ্যাপক মিল্টন বিশ্বাস, সাহিত্যিক চন্দন আনোয়ার এবং হারুন পাশা—তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। সর্বোপরি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সাহিত্যিক হরিশংকর জলদাসকে। তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়ে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকার সন্ধান দিয়ে তিনি আমাদের গবেষণার কাজটিকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন। তাছাড়া আমার বোন স্নেহা বসাক এবং বন্ধু সুস্মিতা দে গবেষণা সংক্রান্ত লেখাপত্র টাইপ ও প্রুফ সংশোধনে নিরন্তর সাহায্য করেছে। তাদের উপকার ভোলার নয়।

সতীর্থ গবেষক হৃদয়রঞ্জন সরকার, দীপঙ্কর সরকার, অলি আচার্য, স্নিগ্ধা চক্রবর্তী, জোতি বোস রায়, টুম্পা খাতুনের কাছে প্রয়োজনীয় সাহায্য পেয়েছি—এদের প্রতি ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। সব শেষে বলি মা-বাবার কথা, তাঁদের আশীর্বাদ ও প্রেরণা গবেষণার কাজটি সম্পূর্ণ করতে নিরন্তর মানসিক শক্তি জুগিয়েছে। মা-বাবার প্রতি ভালোবাসা। সন্দর্ভটির অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণের সবরকম দায়িত্ব নিয়ে আমাকে ভারমুক্ত করার জন্য শ্যামলদাকে অশেষ ধন্যবাদ।

পরিশেষে বলতে হয়, আমাদের গবেষণায় নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বকে বিশ্লেষণ করা হলেও সামগ্রিকভাবে সবটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। ফলে বেশ কিছু দিক অব্যক্ত রয়ে গিয়েছে। পরবর্তীকালের গবেষকদের মধ্য দিয়ে সেই দিকগুলি ব্যক্ত হবে বলে আশা করি। বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা এই সন্দর্ভটিকে পিএইচ.ডি. উপাধির যোগ্য মনে করলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

তারিখ : ২৬|০৭|২০২২

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

সৌরভ বসাক

ভূমিকা

(এক)

> "চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে কম পরে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরে—জীবন-যাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধে সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।" (ঠাকুর ১৩৬৮, পৃ.৬৭৫)

'সভ্যতার পিলসুজ'-ই আজকের পরিভাষায় সাবঅলটার্ন অর্থাৎ নিম্নবর্গ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই 'অখ্যাত লোক'-দের যে স্বরূপের কথা বলেছেন তা নিম্নবর্গের বহিরঙ্গ। তাহলে কাকে বলব নিম্নবর্গ? নিম্নবর্গ ইতিহাসচর্চা, তত্ত্ব ও চেতনার সূত্রপাত কোথায়, কবে, কীভাবে? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে আমরা বলে নিতে চাই সমাজের উঁচু-নিচু ধারণার কথা। যবে থেকে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে থাকতে শিখেছে তবে থেকে সেই সমাজে উঁচু-নিচু, শাসক-শাসিত—এ বৈপরীত্য লক্ষ করা গিয়েছে। শুধু সামাজিক দিক থেকে নয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষমতা-বহির্ভূত এক শ্রেণি বরাবর সমাজের তলদেশে অবস্থান করেছে। এই বৃত্ত বহির্ভূত মানুষগুলিকে ১৯৮২ সালে সমালোচক রণজিৎ গুহ 'নিম্নবর্গ' বলে অভিহিত করেন। এক্ষেত্রে তাদের আমরা ব্রাত্য, দলিত, অন্ত্যজ, প্রান্তিক, অপর, অবতলজন যা-ই বলি না কেন, তাদের একছাদের তলায়, এক পরিভাষায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে 'সাবঅলটার্ন' বা 'নিম্নবর্গ' বলে।

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে বলা প্রয়োজন, 'দলিত'-দের আমরা আলোচনার বাইরে রেখেছি। আসলে বর্তমানে 'দলিত' শব্দটি একটি রাজনৈতিক গুরুত্ব পেয়েছে যার যোগসূত্র রয়েছে সামাজিক জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে। ১৯৩০ পরবর্তী সময়ে বি.আর আম্বেদকরের নেতৃত্বে নিম্নশ্রেণি, নিম্নবিত্ত তথা নিম্নবর্গের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সেখানে এই 'দলিত' শব্দটি বিপুলভাবে উঠে আসে। সাধারণ অর্থে 'দলিত' বলতে বোঝায় যারা সর্বহারা। তা কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়। সর্বহারা বলতে যাদের কিছু নেই, আর দলিত বলতে যারা কিছু নয়। যাদের কিছু নেই, তা একটা সময় পূরণ হয়ে যেতে পারে কিন্তু যারা কিছু নয় তাদের রূপান্তর হবে কী করে? এরই ফলে ১৯৫৬ সালে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দলিত সাহিত্য আন্দোলনের আয়োজন করা হয়, কিন্তু ওই বছর বি.আর আম্বেদকরের অকাল প্রয়াণে তা হয়ে ওঠে না। তবে ১৯৫৮ সালে এই আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল যেখানে বলা হয়েছে দলিত সাহিত্য অন্যান্য সাহিত্যের তুলনায় একেবারেই স্বতন্ত্র। দলিত সাহিত্য রচনা ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমগ্র

বিশ্বের কাছে দলিত চেতনাকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার একটি প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে ১৯৭২ সালে 'দলিত প্যান্থার অফ ইন্ডিয়া' নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। সমালোচকদের মতে, 'নিম্নবর্গ' বলতে আধিপত্য ও অধীনতার ক্ষেত্রে পরাধীনতা বোঝায়, অন্যদিকে 'দলিত' অর্থে ব্রাহ্মণ্য পরাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে পরাধীনতা যার ক্ষেত্র সামাজিক। এই দুটি ক্ষেত্র ভিন্ন হলেও এদের সাধারণ স্বরূপ হল, পরাধীনতা। আসলে জ্যোতিবা ফুলে, দলিত প্যান্থার, আম্বেদকরের লক্ষ্য ছিল, দলিতদের সামাজিক বর্ণভিত্তিক অস্পৃশ্যতা ও অর্থনৈতিক নিপীড়ন থেকে মুক্তি দেওয়া। অন্যদিকে সাবঅলটার্ন প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল, প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসে অভিজাত পক্ষপাত সংশোধনের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গকে আলোকিত করা। ফলে দলিত ও নিম্নবর্গের মধ্যে দুটি সূক্ষ্ম নিজস্ব ধারা গড়ে উঠেছে। (Pankaj 2019, p. 1-29) দলিত সাহিত্য তত্ত্ব ও নিম্নবর্গ তত্ত্ব এই দুটি বিষয়ই তাদের স্বরূপগত দিক থেকে ভিন্ন, ফলে এই তত্ত্বকে মেলানোর অবকাশ আমাদের গবেষণায় নেই। মূলত সে কারণেই আমরা দলিত চেতনা বা দলিত সাহিত্যতত্ত্বকে আমাদের গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করিনি।

(দুই)

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' সমালোচনাতত্ত্ব মূলত উত্তর-ঔপনিবেশিকচর্চার অন্তর্ভুক্ত। বিশ শতকে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' অন্যতম। প্রাথমিকভাবে বলতে গেলে 'সাবঅলটার্ন' হল উপনিবেশের শোষিত মানুষ যারা মূলত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ভৌগোলিক দিক থেকে ক্ষমতার বাইরে অবস্থান করছে। আসলে উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদে বিশেষ করে যে দিকটি লক্ষ করা হয় সেটি হল স্বাধীনতার পর প্রাচ্যের দেশগুলিতে বিকাশের গতি প্রকৃতি। এখানে সমগ্র বিশ্বের আলোচনা স্থান পেলেও বিশেষ করে ভারতবর্ষ, চীন, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের ক্ষেত্রে বিশেষ আলোকপাত করা হয়। ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর প্রতিক্রিয়াগুলোর ওপর ভিত্তি করে ঔপনিবেশিকতাবাদ তত্ত্বটি গুরুত্ব লাভ করেছে। এই তত্ত্ববাদীরা অধিকাংশ সময় দেখিয়ে এসেছেন নিম্নবর্গের কোনো রাজনৈতিক সচেতনতা নেই। তাঁরা নিম্নবর্গকে দেখেছেন সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদী ইতিহাস কাঠামোর ভেতরেই। কিন্তু নিম্নবর্গের সমালোচকেরা প্রমাণ করেছেন নিম্নবর্গের অস্তিত্ব, চেতনা, প্রভাব ও সীমাবদ্ধতাকে। সেক্ষেত্রে সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নবর্গের সচেতনতা ও বিদ্রোহী রূপ ইতিহাসের পাতায় আমরা লক্ষ করেছি বারবার। এখানেই ঔপনিবেশিকতাবাদের সঙ্গে নিম্নবর্গের সমালোচকদের মত পার্থক্য, যেখান থেকে ১৯৮২ সালে নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহের প্রতিনিধিত্বে নতুন তত্ত্ব সম্বলিত 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ পায় যা পরবর্তীকালে নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একটি

বাঁক তৈরি করে। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ১-২০) নিম্নবর্গের ইতিহাস কোনো 'সাবজেক্ট' নয়, তা আসলে একটি পদ্ধতি। উচ্চবর্গের বিপরীতে তাদেরও রয়েছে নিজস্ব স্বকীয়তা, দাবি ও স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর যা নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের জন্ম দেয়। নানা বিতর্ক ও সমালোচনার ভিত্তিতে সৃষ্টি করে এক নতুন তত্ত্বের।

যদিও 'নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা'-য় ক্ষমতার সম্পর্কসূত্রে নিম্নবর্গের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে আধিপত্য-অধীনতার ভিত্তিতে। যেমন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক মনে করেন, ঔপনিবেশিক শাসনে যে কোনো ধরনের অধীনতা ও ক্ষমতার সূত্রে নিপীড়িত অধীনস্ত যারা, তারাই নিম্নবর্গ। রণজিৎ গুহ মনে করেন, গরীব চাষি, প্রায় গরীব ও মাঝারি চাষি, নিরবিত্ত ভূস্বামী, হীনবল গ্রামভদ্র, সম্পন্ন মাঝারি কৃষক ও ধনী কৃষক, গরীব শ্রমিক, ক্ষেত মজুর, নিম্ন মধ্যবিত্ত গ্রাম ও শহরের গরীব জনতা, আদিবাসী ও নারীও নিম্নবর্গ। জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের মতে, অচ্ছুত, গৃহ ভৃত্য, নিরক্ষর অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, নারী, শিশু ও অসংখ্য প্রান্তিক অপর শ্রেণি হল নিম্নবর্গ। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ২২-৪০) ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে নিম্নবর্গের আনুষ্ঠানিক চর্চার সূত্রপাত ও তার সংজ্ঞায়নের পরেই কি ইতিহাস ও সাহিত্যের পাতায় নিম্নবর্গের উত্থান? তা নয়, বলাবাহুল্য। ঠিক যেমন ভাষার আগে ব্যাকরণ নয়, ঠিক তেমনই আমরা যাদের ব্রাত্য, অন্ত্যজ, প্রান্তিক, অপর, অবতলজন বলে জেনে এসেছি, তার যোগসূত্র কোনোভাবেই গ্রামশি ব্যবহৃত 'সাবঅলটার্ন'-এর সঙ্গে নেই। কারণ রবীন্দ্রনাথ কথিত 'সভ্যতার পিলসুজ'রা চিরকাল সমাজের একদল অখ্যাত লোক হয়ে ছিলই। তারা বরাবর এই সচল সমাজের এক অনিবার্য উপাদান। তারা সবসময়ই ইতিহাসেও ছিল, সাহিত্যেও ছিল। পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' এর প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর নিম্নবর্গকে নতুন দৃষ্টিতে, নতুন চেতনা ও তত্ত্বের আলোকে দেখার অবকাশ পাওয়া গেল।

(তিন)

এই অবকাশেই আমরা হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যকে আমাদের গবেষণার জন্য নির্বাচন করেছি। কারণ, তিনি অধুনা স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের জেলেপল্লির একজন জেলেসন্তান। জেলে জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা তাঁর রচনায় বারবার উঠে এসেছে। এখানে আমরা দেখতে চেয়েছি নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে সমাজের একজন তথাকথিত নিম্নবর্গের সাহিত্যিকের রচনা কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভে বর্তমানকাল অর্থাৎ ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হরিশংকর

জলদাসের নিম্নবর্গকেন্দ্রিক উপন্যাস-ছোটোগল্পের (‘জলপুত্র’, ‘দহনকাল’, ‘কসবি’, ‘রামগোলাম’, ‘মোহনা’, ‘অর্ক’, ‘একলব্য’, ‘সুখলতার ঘর নেই’, ‘প্রস্থানের আগে’, ‘কুন্তীর বস্ত্রহরণ’ এবং ‘গল্পসমগ্র ১’, ‘গল্পসমগ্র ২’) মধ্য দিয়ে ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’-চর্চিত নিম্নবর্গীয় চেতনাকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি। আমাদের গবেষণার শিরোনামেই সে কথা স্পষ্ট।

বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভের উদ্দেশ্য ও বিশ্লেষণকে সঠিক পথে চালিত করার জন্য সমগ্র কাজটি হরিশংকর জলদাসের নিম্নবর্গ-প্রধান কথাসাহিত্যের নিরিখকে অনুসরণ করে অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের গবেষণার বিশ্লেষণকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি। গবেষণা করাকালীন বিষয় অনুসারে আলোচ্য অধ্যায়ের শিরোনামকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবর্তন করা হয়েছে। সমগ্র গবেষণা-সন্দর্ভটিকে ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে আলোচনা করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা নিম্নবর্গ ও নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার উৎপত্তি, ভারতবর্ষে এর সূচনা, ক্রমবিকাশ ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে এই অধ্যায়ে। এখানে আমরা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি, নিম্নবর্গ বলতে কী বোঝায় এবং কারা এর আওতাভুক্ত। পাশাপাশি তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, চেতনা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাবিশ্বে নিম্নবর্গের অবস্থান ও উত্থানের সংক্ষিপ্ত রূপরেখাটি সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি। যেহেতু অতীতকে না জানলে বর্তমানকে জানা সম্ভব নয়, সেহেতু প্রাচীনসাহিত্য থকে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থানের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। স্বাধীনতা-উত্তর কালখণ্ডকে বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে বলা যায় বাংলা কথাসাহিত্যের কালখণ্ড দীর্ঘ। এই দীর্ঘ কালখণ্ডের বিচারে নিম্নবর্গকে দেখতে হলে আমরা আলোচনার মূল লক্ষ্য থেকে সরে যেতে পারি, সুতরাং আমাদের এমন একটি কালখণ্ড নির্দিষ্ট করতে হয়েছে যা গবেষণার মূলসুরকে অনুসরণ করে। তাছাড়া এই দীর্ঘ কালখণ্ডের নিরিখে নিম্নবর্গের অবস্থানগত আলোচনাটি একটি স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয় হয়ে উঠতে পারে বলে আমাদের মনে হয়েছে।

হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে আর্থিক-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পাশাপাশি দেখিয়েছেন অন্ত্যজ শ্রেণির সংগ্রাম ও উত্থানকেও। আমরা জানি একদল নিম্নবর্গের সমালোচক দেখিয়ে এসেছেন নিম্নবর্গের কোনো রাজনৈতিক সচেতনতা নেই। হরিশংকর জলদাস-এর কথাসাহিত্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমরা এই সিদ্ধান্তের সত্যতা বিচার করার চেষ্টা করেছি। সমাজসৃষ্ট জাতপাত ও

ধর্মীয় গোঁড়ামি লেখকের কলমে উঠে আসছে কী না এবং নিম্নবর্গ বলতে লেখক কি কেবল খেটে খাওয়া মজুরদের কথাই বোঝাচ্ছেন, না বিস্তৃত অর্থেই নিম্নবর্গকে তিনি লেখায় স্থান দিয়েছেন—সে বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়েছি তৃতীয় অধ্যায়ে।

উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় শাসক-শোষিতের সম্পর্ক। আমরা দেখেছি আলোচ্য লেখক তাঁর সাহিত্য জগৎ তৈরি করেছেন প্রধানত নিম্নবর্গীয় মানুষদের নিয়ে। ফলে সেই সমাজেও নিম্নবর্গের মধ্যে তৈরি হয়েছে শাসক-শোষিতের পারস্পরিক অবস্থান। বিশেষ করে 'জলপুত্র' উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে জেলেগোষ্ঠীর মধ্যেই রয়েছে উচ্চ-নীচ বিভাজন। ফলে সেখানেও দেখা যায় শোষণের নানাবিধ চিত্র। সমাজে শোষণের মূলত যে দ্বিবিধ রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়—সেই বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি চতুর্থ অধ্যায়ে। পুরুষের ওপরে যদি মহাজনদের শোষণ চলে তাহলে মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে অবহেলিত ও অবদমিত করার প্রয়াস।

ক্ষমতার সম্পর্কের একদিকে আধিপত্য থাকলে তার অপর প্রান্তে অবশ্যই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। কিন্তু পঞ্চম অধ্যায়ে দেখা গেল পরিস্থিতি ও ক্ষমতার প্রাবল্যের কাছে প্রতিরোধ কেন, কোনো প্রতিবাদ স্বরূপ প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত লক্ষ করা যায়নি। নিম্নবর্গের এই একান্ত অনুগত জীব হয়ে দৈনন্দিন অধীন জীবনযাপন নিম্নবর্গের নিম্নবর্গীয়তাকে যেমন স্পষ্ট করে তেমনই এই নিষ্ক্রিয়, ভীরুতা ও প্রতিবাদহীনতাই একটা সময় পরোক্ষভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতেও সাহায্য করেছে। পাশাপাশি নিম্নবর্গের প্রতিবাদ ও সেই প্রতিবাদের ব্যর্থতার কথাও যেভাবে উঠে এসেছে তাতে কথাবিশ্বে ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা গিয়েছে। 'জলপুত্র', 'দহনকাল', 'কসবি', 'রামগোলাম', 'অর্ক', 'মোহনা', 'একলব্য' প্রভৃতি উপন্যাসে ইতিহাস কথিত নিম্নবর্গের নেতিবাচক চেতনা হিসেবে প্রতিবাদী চেতনাকে ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে অনুধাবনের চেষ্টা আছে আলোচ্য অধ্যায়ে।

ইতিহাস যিনি লেখেন তিনি যেমন একজন ব্যক্তি; একজন সাহিত্য স্রষ্টাও তেমনই একজন ব্যক্তি। তবে একজন ঐতিহাসিক যখন ইতিহাস লিখতে বসেন তখন তাঁর নিজস্ব কিছু দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করলেও, তিনি আশ্রয় নেন বহু প্রামাণ্য তথ্য, সত্য ও তত্ত্বের। কিন্তু একজন সাহিত্য স্রষ্টার কিন্তু সে দায় থাকে না। ইতিহাসের মধ্যে যে বাস্তব সত্য উঠে আসে, তা অনেক ক্ষেত্রেই সাহিত্যে উঠে আসে না। কারণ সাহিত্য শিল্পকলা, আর ইতিহাস চরম বাস্তব। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গিগত তফাৎ থেকেই একজন ঐতিহাসিক যেভাবে নিম্নবর্গকে আবিষ্কার করবেন একজন সাহিত্যিক হিসাবে নিম্নবর্গের আবিষ্কার সেরূপ হবে না। আমরা এ অধ্যায়ে অন্বেষণ করে দেখেছি সমালোচকরা নিম্নবর্গকে যেভাবে দেখেছেন, একজন

সাহিত্যিক হিসাবে হরিশংকর জলদাস তাঁর আখ্যানে নিম্নবর্গকে সেভাবে দেখছেন কি না, বা নিম্নবর্গ নিয়ে তাঁর আখ্যানে নতুন কোনো দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা গিয়েছে কি না। মূলত সমালোচকদের আবিষ্কৃত নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে হরিশংকর জলদাস-এর কথাসাহিত্যকে ব্যাখ্যা করাই ষষ্ঠ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

পরিশিষ্ট অংশে আমরা হরিশংকর জলদাস-এর ব্যক্তিগত জীবনপঞ্জি ও সৃজনবিশ্ব নিয়ে আলোচনার অবকাশ রেখেছি। পাশাপাশি হরিশংকর জলদাস অর্জিত বিবিধ সম্মাননার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই অংশে তুলে ধরা হয়েছে।

উপসংহারে পৌঁছে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির আলোচনার প্রেক্ষিতে সামগ্রিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছি।

(চার)

গবেষণার পদ্ধতি হিসেবে হরিশংকরের কথাসাহিত্যকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে আমরা মূলত বর্ণনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। প্রাথমিকস্তরে হরিশংকর জলদাসের উপন্যাস ও ছোটোগল্পগুলো পুনঃপাঠের মধ্য দিয়ে তথাকথিত নিম্নবর্গীয় জীবনের নানাদিক, তাদের মানসিক দ্বন্দ্ব-সংকট-সমন্বয়ের নানা বৈশিষ্ট্যগুলো অন্বেষণ করে দেখা হয়েছে। এরপর 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এ বর্ণিত নিম্নবর্গীয় চেতনার বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের নির্বাচিত উপন্যাস ও ছোটোগল্পগুলোতে অন্বেষণ করার ফলে দেখা গিয়েছে, সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গের বৈশিষ্ট্য ও চেতনা উঠে এসেছে। মূলত এই বিষয়টিই আমরা আমাদের গবেষণায় তুলে ধরেছি।

তথ্য সংগ্রহ

বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভের তাত্ত্বিক ভিত্তির অধিকাংশ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' ও বিভিন্ন নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার সমালোচনা সম্বলিত গ্রন্থ থেকে। যার উপর ভিত্তি করে হরিশংকর জলদাস-এর নিম্নবর্গ প্রধান আখ্যানে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি। তাছাড়া লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র, রামমোহন লাইব্রেরি, সুহৃদ ক্লাব ও পাঠাগার, মিলন সংঘ ও পাঠাগার থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করেছি। কোভিড-১৯ অতিমারির প্রকোপে তথ্য সংগ্রহ করা অসুবিধাজনক হলেও আমরা বিভিন্ন লাইব্রেরি ব্যবহারের যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। যেহেতু আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভে বাংলাদেশের লেখককে নির্বাচন করা হয়েছে, সেহেতু সে দেশ থেকে প্রকাশিত নিম্নবর্গ সম্পর্কিত বই, পত্র-পত্রিকা, অনলাইন পত্রিকা ও ব্লগগুলির সাহায্যও আমরা নিয়েছি।

পূর্ববর্তী গবেষণা ও প্রবন্ধসমূহের মূল্যায়ন

গবেষণাকর্ম শুরুর প্রাথমিক পর্যায়ে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল হরিশংকর জলদাস-এর সাহিত্যকর্ম নিয়ে রচিত গবেষণা সন্দর্ভ, সমালোচনা গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের মূল্যায়ন করা। এ পর্যন্ত আমরা আলোচ্য লেখক সম্পর্কিত যা যা গ্রন্থ, প্রবন্ধ-আলোচনা ও সাক্ষাৎকার খুঁজে পেয়েছি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হল।

হরিশংকর জলদাস ও তাঁর কথাসাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ :

- হরিশংকর জলদাস তাঁর আত্মজীবনী রচনা করেছেন ‘নোনাজলে ডুবসাঁতার’ (জলদাস ২০১৮, পৃ. ১-২৬৪) শিরোনামে। সেখানে তিনি তাঁর জন্মবৃত্তান্ত, শৈশব, শিক্ষা, যৌবনকাল বর্ণনার মধ্য দিয়ে জেলেসমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে তাঁর সাহিত্য রচনার প্রেক্ষাপট ও তার পেছনে বহু পরিশ্রমের কথা শুনিয়েছেন। একজন সাধারণ ব্যক্তি থেকে সাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস হয়ে ওঠার যাত্রাপথের পাঁচালী হয়ে উঠেছে গ্রন্থটি। তাঁর আত্মজীবনীর মাধ্যমে আমরা লেখকের সামগ্রিকতার ধারণা পেয়েছি।
- ‘আমার কর্ণফুলী’ (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ১-১৪৩) গ্রন্থের তেরোটি প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে কর্ণফুলী নদী ও সমুদ্রের প্রতি হরিশংকর জলদাসের আত্মিক টান। এছাড়াও লেখকের প্রথম বই প্রকাশের নানা ঘটনার অনুভূতি। রয়েছে জীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনার বিবরণ।
- সুমনকুমার গাঁতাইত তার ‘হরিশংকর জলদাস : দর্পণে জলজীবন’ (গাঁতাইত ২০২২, পৃ. ১-১৬০)গ্রন্থে জলপুত্র, দহনকাল, অর্ক, ‘জলদাসীর গল্প’- এর নিরিখে জেলেজীবনের সংগ্রাম, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাদের অন্ধকার দিকগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্ব বিষয়ক প্রবন্ধ :

বিভিন্ন প্রাবন্ধিক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হরিশংকর জলদাস-এর কথাসাহিত্যকে বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। প্রায় প্রত্যেকে ছোটো ছোটো ক্যানভাসে তাঁর সাহিত্যকর্মকে দেখতে চেয়েছেন।

- প্রাবন্ধিক বীরেন চন্দ তার ‘জলপুত্র : জল ও জেলেজীবনের নবতম মহাকাব্য’ (সাহা (সম্পা.) ২০১৫, পৃ. ৬৮-৭২) প্রবন্ধে ‘পদ্মানদীর মাঝি’ ও তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাস দুটির সঙ্গে ‘জলপুত্র’ উপন্যাসের একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি দেখান নদীকেন্দ্রিক জেলেজীবন ও সমুদ্রকেন্দ্রিক জেলেজীবনের সংগ্রামের প্রকৃতি এক হলেও তা ভিন্ন। সমুদ্রের নোনাজলে জেলেদের

ত্বকের রূক্ষতা, সমুদ্রের সঙ্গে তাদের কঠোর সংগ্রাম, ঐক্যবদ্ধ মানসিকতা, সামাজিক শ্রেণিবিভাজন ও তাদের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

- অধ্যাপক সুশান্ত ঘোষের 'হরিশংকর জলদাসের জলপুত্র : আঞ্চলিকতার বর্ণময় বিস্তার' (ঘোষ ২০১৭, পৃ. : ৯-১৫) প্রবন্ধে মূলত চট্টগ্রামের ভাষা, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক পরিধি ও আঞ্চলিক জীবনযাত্রার কথা আলোচিত হয়েছে।
- 'দহনকাল : শুধু উপন্যাস নয়, ঐতিহাসিক দলিলও' (হালদার (সম্পা.) ১৪১৮, পৃ.২৮৫) নামক প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বরুণ চক্রবর্তী 'দহনকাল' উপন্যাসের কাহিনি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এর ঐতিহাসিকতা ও আঞ্চলিকতা বিচার করতে চেয়েছেন।
- গবেষক মোঃ আফরুক সেখ তাঁর 'বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস : প্রান্তজনের কথাকার' (মল্লিক (সম্পা.) ২০২০, পৃ. ৭৩১-৭৩৪) প্রবন্ধে মূলত 'জলপুত্র', 'দহনকাল', ও 'জলদাসীর গল্প' গ্রন্থের আলোচনার মধ্য দিয়ে সমুদ্র উপকূলের জেলেজীবনের দারিদ্র্য, আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি অন্তশ্রেণি ও আন্তঃশ্রেণির দ্বন্দ্বে জেলেজীবনের শাসক-শোষিতের সম্পর্ককেও ব্যাখ্যা করেছেন।
- 'হরিশংকর জলদাস : নিম্নবর্গীয় জীবনের অন্যতম রূপকার' (মল্লিক (সম্পা.) ২০২০, পৃ.৭৩৫-৭৪৩) প্রবন্ধে সুশান্ত মণ্ডল বিশেষত 'জলপুত্র' উপন্যাস ও 'জলদাসীর গল্প' গ্রন্থে বর্ণিত জেলেসমাজের ভিত্তিতে নিম্নবর্গীয় জীবনের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। জেলেদের প্রতি সমাজের অস্পৃশ্য মনোভাব, সাম্প্রদায়িকতা ও শোষণ-বঞ্চনার ছবিটিও তুলে ধরেছেন প্রাবন্ধিক।
- গবেষক সাথী ত্রিপাঠী তার 'হরিশংকর জলদাসের 'জলপুত্র' : সমুদ্র সংগ্রামী জেলেজীবনের কড়চা' (মল্লিক (সম্পা.) ২০২০, পৃ. ৭৪৪-৭৫১) প্রবন্ধে জলপুত্র উপন্যাসে বিধৃত জেলেদের সামজিক অবমাননা, অর্থনৈতিক সংকট ও শিক্ষা থেকে বঞ্চনার বিষয়টি তুলে ধরেছেন।
- 'হরিশংকর জলদাসের গল্পবিশ্ব : প্রান্তিক জলদাসদের জীবনসংগ্রাম' (মল্লিক (সম্পা.) ২০২১, পৃ. ৪৯০-৪৯৫) প্রবন্ধে মানিকলাল সাহা 'জলদাসীর গল্প', 'লুচ্চা' গল্পগ্রন্থের নিরিখে সমাজের প্রান্তিক মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়নের দিকটির প্রতি আলোকপাত করেছেন।
- গবেষক আঞ্জু মনোয়ারা বেনজির চৌধুরী তার 'হরিশংকর জলদাসের উপন্যাসে প্রান্ত জনগোষ্ঠীর জীবনভেদ' (সরকার (সম্পা.) ২০২১, পৃ. ১৪৭-১৫১) প্রবন্ধে 'জলপুত্র' উপন্যাসের জেলেজীবনের অন্ধকার দিকগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন।

- প্রাবন্ধিক পাতাউর জামান তার ‘বাংলাদেশের কথাসাহিত্য : নদী-সমুদ্র প্রসঙ্গ’ (মুখোপাধ্যায় (সম্পা.) ২০১৫, পৃ. ১৭৬-৮৭)প্রবন্ধে হরিশংকরের ‘জলপুত্র’ উপন্যাসে সামুদ্রিক জেলেদের জীবনচর্যা দেখানোর পাশাপাশি সামুদ্রিক পরিবেশের প্রভাব জেলেদের কীভাবে পড়েছে সেই দিকটির প্রতি আলোকপাত করেছেন।

ইতিপূর্বে হরিশংকর জলদাসের সাহিত্য বিষয়ক যত আলোচনা হয়েছে, তার অধিকাংশই বিষয় ও ঘটনাকেন্দ্রিক এবং চরিত্রায়ণেই সীমাবদ্ধ। হরিশংকর জলদাস-এর নির্বাচিত কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থান, তাদের সংকট সংক্রান্ত আলোচনা কোনো কোনো প্রবন্ধে স্থান পেলেও, নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে তাঁর সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করা হয়নি যা আমাদের গবেষণায় বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে।

তাছাড়া বাংলাদেশ থেকে হারুন পাশার সম্পাদনায় ‘পাতাদের সংসার’ (পাশা (সম্পা.) ২০২১, পৃ. ১-২৩০) পত্রিকা গোষ্ঠী হরিশংকর জলদাস বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। যেখানে প্রাবন্ধিক সুব্রত কুমার দাসের লেখা ‘হরিশংকর জলদাস : নিম্নবর্গের নতুন রূপকার’ প্রবন্ধে ‘জলপুত্র’, ‘দহনকাল’, ‘কসবি’ ও ‘রামগোলাম’ উপন্যাস চারটির প্রধান চরিত্রগুলোর মাধ্যমে দেখিয়েছেন হরিজনপল্লিকে জাগিয়ে তোলা জীবনীশক্তির প্রভাব। প্রাবন্ধিক পিয়াস মজিদের লেখা ‘অদ্বৈতর সার্থক উত্তরসাধক’ প্রবন্ধে বিশেষ করে ‘কসবি’, ‘জলদাসীর গল্প’ ও তাঁর গদ্যধর্মী লেখাগুলো আলোচনা করা হয়েছে। প্রাবন্ধিক মহি মুহাম্মদ তাঁর ‘হরিশংকর জলদাসের উপন্যাসে বিধৃত জীবন’ প্রবন্ধে ‘জলপুত্র’, ‘দহনকাল’, ‘কসবি’ উপন্যাসের মাধ্যমে নিম্নবর্গের মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতির কথা তুলে ধরার পাশাপাশি ‘হৃদয়নদী’ ও ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ উপন্যাসের আলোচনা করে লেখকের লেখনী শক্তির পরিচয় তুলে ধরেছেন। প্রাবন্ধিক হুমায়ূন মালিক তাঁর ‘হরিশংকর জলদাস ও বাংলা কথাসাহিত্যে সাবঅলটার্ন—পতিত, দলিত মানুষ’ শীর্ষক প্রবন্ধে বিশেষ করে জলপুত্র, দহনকাল, রামগোলাম উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান দেখানর পাশপাশি ‘কসবি’ উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে দেখিয়েছেন বারাঙ্গনারাও নিম্নবর্গের অধীন। ইলিয়াস বাবর তাঁর ‘জলদাসীর গল্প : যার ভুবন জুড়ে মানুষ’ প্রবন্ধে নির্বাচিত গল্প অবলম্বনে নিম্নবর্গীয় নারীর অবস্থানের দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাছাড়া সুরঞ্জন মিদ্দে, নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীর, মাসুদ চৌধুরী তাঁদের প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে জলপুত্র উপন্যাসের আঞ্চলিকতা, সামুদ্রিক জেলেদের জীবন সংগ্রাম সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন। হাফিজ রহমান, তপন বাগচী, মুজিব রাহমান যথাক্রমে কসবি, মোহনা ও মুক্তিযুদ্ধের গল্পের ভিত্তিতে নিম্নবর্গীয় চেতনার স্বাতন্ত্র্যের দিকটি চিহ্নিত করেছেন।

সাক্ষাৎকার সংগ্রহ

- হরিশংকর জলদাসের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার একটিমাত্র গ্রন্থ মহি মুহাম্মদ রচিত ‘হরিশংকর জলদাসের অন্তরঙ্গ কথা’ (মুহাম্মদ ২০১৭, পৃ. ১-১৮৬)। যেখানে লেখকের ব্যক্তিগত জীবন, সাহিত্য রচনার প্রেক্ষাপট, জীবন অভিজ্ঞতার কথা উঠে এসেছে। গ্রন্থটি প্রাথমিক স্তরে হরিশংকর জলদাস-এর ব্যক্তিসত্তা ও লেখকসত্তা সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরিতে সাহায্য করেছে।
- হরিশংকর জলদাস-এর ‘নিজের সঙ্গে দেখা’ (জলদাস ২০১৭, পৃ. ৫৫-১০৪) গ্রন্থে তাঁর জীবনের টুকরো অভিজ্ঞতা বর্ণনার সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকা দ্বারা নেওয়া সাক্ষাৎকারগুলিও গ্রন্থবদ্ধ করা হয়েছে। যেখানে তাঁর সাহিত্য রচনার প্রেক্ষাপট, গল্প-উপন্যাস রচনার পেছনে গভীর পড়াশোনা-অনুসন্ধান ও গবেষণার কথা জানা গিয়েছে।

হরিশংকরের কথাসাহিত্য সম্পর্কিত এ পর্যন্ত আমরা নিম্নবর্গ বিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহ যতটা অন্বেষণ করেছি তাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আলোচিত হয়েছে সাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থান, তাদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক ও সর্বোপরি উঠে এসেছে জেলেসমাজের নিত্য সংগ্রাম, বঞ্চনা ও সমুদ্রসংগ্রামী জেলেজীবনের কথা। আবার কিছু কিছু প্রবন্ধে আমাদের গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয়ের কোনো কোনো ভাব তুলে ধরা হলেও নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে কোনো বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে হয়নি। সুতরাং সেই দিক থেকে এই গবেষণা-সন্দর্ভের বিষয় ও বিশ্লেষণ স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখতে পারে।

প্রথম অধ্যায়

নিম্নবর্গ : ইতিহাস ও তত্ত্বের সন্ধানে

১. সূচনা

১.১ পরিভাষার খোঁজে

১.২ আন্তনিও গ্রামশির ভাবনায় 'সাবঅলটার্ন' প্রসঙ্গ, 'হেজেমনি' ধারণা ও 'সিভিল সোসাইটি'

১.৩ আন্তনিও গ্রামশি ও মিশেল ফুকো : ক্ষমতার ধারণায় দুই চিন্তক

১.৪ 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' : ইতিহাস ও তত্ত্বের সন্ধানে

১.৫ নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চায় নিম্নবর্গীয় চেতনা

১.৬ নিম্নবর্গ : সংজ্ঞা ও স্বরূপ সন্ধান

১.৭ সারাংশ

১. সূচনা

'নিম্নবর্গ' শব্দটি উচ্চারণ করলে আমাদের মনে যে ধারণাটি সর্বপ্রথমে জাগরিত হয় তা হল, সমাজে যারা দরিদ্র ও নিচুজাতের মানুষ তাদের কথা। কিন্তু তা আংশিক সত্য। 'নিম্নবর্গ' ধারণাটি আসলে আরো বৃহৎ পরিসরে বিস্তৃত। নিম্নবর্গের সমালোচকরা মার্ক্সবাদী ধারণাকে ভিত্তি করে আধিপত্য ও ক্ষমতার এককে নিম্নবর্গকে নির্ধারণ করেছেন। ফলে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা নিম্নবর্গের পরিভাষা, তাত্ত্বিক ধারণা ও নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্কের বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর হব।

১.১ পরিভাষার খোঁজে

'নিম্নবর্গ'—শব্দটি ইংরেজি 'সাবঅলটার্ন' (Subaltern) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। 'সাবঅলটার্ন' শব্দটি প্রথম পাওয়া গিয়েছিল ইতালির দার্শনিক ও প্রখ্যাত মার্ক্সবাদী নেতা আন্তনিও গ্রামশির 'দ্য প্রিজন নোটবুক' (The Prison Notebook, 1971) গ্রন্থে। গ্রন্থটি লেখা হয়েছিল ১৯২৯-১৯৩৫ সালের মধ্যে যখন মুসোলিনির কারাগারে তিনি বন্দি। সেই সময় ফ্যাসিবাদী দৃষ্টি এড়ানোর জন্য গ্রামশি এমন কিছু পরিভাষা গ্রহণ করেছিলেন যাতে মুসোলিনি- কর্তৃপক্ষের কড়া নজর তাঁর ওপর না পড়ে। এটি করতে গিয়ে তিনি তাঁর গ্রন্থে মার্ক্সের দর্শনকে সাংকেতিকভাবে 'প্রাক্সিসের দর্শন' (the philosophy of praxis) বলেছেন। মার্ক্সের নাম কোথাও উচ্চারণ করেননি, তিনি বলেছেন প্রাক্সিসের দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা- 'Marx reffered to as the founder of philosophy of praxis' (Hoare (eds.) 1971, p. 8)। ফলে প্রচলিত শব্দগুলির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করে লেখার কারণে মার্ক্সীয় ধারণার অনেকটা বদল ঘটেছে। এটা এমনই একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে সাংকেতিক শব্দগুলির পরিবর্তে প্রচলিত শব্দগুলি ব্যবহার করে যদি আমরা একে পড়তে ও বুঝতে চাই তাহলে তার কোনো অর্থই আমরা খুঁজে পাব না। আমাদের আলোচনা যেহেতু নিম্নবর্গ নিয়ে সেহেতু 'সাবঅলটার্ন' বলতে গ্রামশি আসলে কী বুঝিয়েছেন, কোনো ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সাবঅলটার্ন প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছেন, তাঁর হেজেমনি ধারণাটির সঙ্গে 'সাবঅলটার্ন' ধারণার কী সম্পর্ক তা ধাপে ধাপে আলোচনায় প্রবেশ করব। তার আগে দেখে নেব 'সাবঅলটার্ন' শব্দটির বিভিন্ন আভিধানিক অর্থ।

আভিধানিক অর্থে ‘সাবঅলটার্ন’ শব্দটি ব্যবহৃত হয় সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে। ক্যাপ্টেনের অধস্তন কর্মচারী বা অফিসারদের ‘সাবঅলটার্ন’ বলা হয়। শব্দটির আক্ষরিক অর্থ ‘অধস্তন’ বা ‘নিম্নস্থিত’। এ প্রসঙ্গে ‘সাবঅলটার্ন’-এর বিভিন্ন আভিধানিক অর্থগুলিকে দেখে নেওয়া যাক।

➢ The new samsad English to Bengali dictionary. 2001. West Bengal. page 444

ক) শ্রেণি, জাতপাত, বয়স, লিঙ্গ, পদ বা অবস্থান বা অন্য যে কোনো পরিচয়ে প্রাধান্য ভোগী কোনো বর্গের অধীনস্ত নিম্নবর্গ।

খ) সমাজ-বিজ্ঞানীদের একটি বিশেষ ধারা বা ঘরানার অন্তর্গত, এই ধারার সমাজ বিজ্ঞানীগণ নিম্নবর্গীয় জনসাধারণের অভিজ্ঞতা তথা বোধ বা অনুভবের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাস আলোচনায় নিয়োজিত।

➢ Sally Wehmeier, Collin melntosh, Joanna turnbull (eds.). 2000. Oxford advanced learner's dictionary of current English.OUP. NY. Page- 1528

Subaltern (n) : any officer in the british army who is lower in rank .

➢ Pearsall, Judy (eds.), 1999. 10th edition. The concise oxford English dictionary. Oxford university press: ny. Page- 1426

Subaltern: n. an officer in the British army below the rank of captain especially is second lieutenant. Adj. of lower status.

➢ Thompson, Della (eds.). 1996, 8th rev. edition.The pocket oxford dictionary of current English.. OUP. NY page 619.

Subaltern : n. officer below the rank of capation, esp. a second lieutenant.

➢ G & C. Merriam (eds.).1913.Webster's revised unabridged dictionary. Oup. Ny. Page- 998

Subaltern : ranked or ranged below, subordinate, inferior : specially (M.L), ranking as a junior officer, being below the rank of captain, as a subaltern officer.

ii) a person holding a subordinate position : specifically a commissioned military officer below the rank of captain.

iii) lower in rank, subordinate : a subaltern employee.

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রায় প্রত্যেকটি আভিধানিক অর্থে ‘সাবঅলটার্ন’ বলতে বোঝানো হচ্ছে নিম্নস্থিত কর্মচারী বা কারও অধীনস্ত কর্মচারী। এই নিম্নস্থিত বা অধীনতার সূত্র ধরেই গ্রামশি তাঁর ‘হেজেমনি’ ধারণাটি বিস্তারের মধ্য দিয়ে ‘সাবঅলটার্ন’ এবং তার সমার্থক ‘সাবর্ডিনেট’ প্রসঙ্গটির উত্থাপন করেছেন। এই অবকাশে আমরা গ্রামশির ‘হেজেমনি’ ধারণাটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে পারি।

১.২ আন্তনিও গ্রামশির ভাবনায় 'সাবঅলটার্ন' প্রসঙ্গ, 'হেজেমনি' ধারণা ও 'সিভিল সোসাইটি'

আলোচ্য 'সাবঅলটার্ন' শব্দটি গ্রামশি তাঁর 'দ্য প্রিজন নোটবুক'-গ্রন্থে ঠিক কী অর্থে ব্যবহার করেছেন তা আমাদের দেখে নেওয়া প্রয়োজন। তার আগে গ্রামশি সম্পর্কে দু-চার কথা বলে নেওয়া ভালো। আন্তনিও গ্রামশি ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন একাধারে রাজনীতিবিদ, সম্পাদক, দার্শনিক, ভাষাতত্ত্ববিদ, ইতিহাসকার এবং সাহিত্য সমালোচক। মার্ক্সবাদের সৃজনশীল বিকাশ, প্রচার ও ব্যাপ্তিতে তাঁর অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে। আন্তনিও গ্রামশির জন্ম ১৮৯১ সালে সারদিনিয়া-র অ্যালেস শহরে। ১৮৯৮ সালে ঘিলারজা শহরে স্কুল জীবন শুরু করলেও তাঁর পড়াশোনায় কয়েক বছর বাধা পড়ে। উপার্জনের আশায় তিনি কর্মসংস্থানে বের হন। ১৯১১ সালে টিউরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপ পেয়ে ভর্তি হন। কিন্তু ১৯১৩-১৯১৫ সময়কালে তিনি গুরুতর অসুস্থতায় ভুগতে থাকেন এবং সিদ্ধান্ত নেন শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অব্যাহতি নেওয়ার।

> 'It was during his years at Turin University that gramsci first came into serious contact with the intellectual world of his time. ...Here he was introduced to the particular brand of Hegelianised "philosophy of praxis" to which he remained in an ambiguous critical relationship right to the end of his working life.' (Hoare (eds.) 1971, p. xxii)

গ্রামশির ক্ষুদ্র জীবনকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব, ফ্যাসিবাদের বিকাশ এবং শোষিত, অনুন্নত মানুষের মুক্তির দায়বোধে তাঁর চিন্তার পরিসর বৃদ্ধি পায়। নিজস্ব অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবন থেকে এক চিন্তার মহীরুহ তৈরি হয়ে যায় গ্রামশির মধ্যে। দীর্ঘমেয়াদি কারাবাসে তিনি তাঁর চিন্তা-চেতনাগুলি লিপিবদ্ধ করাকালীন ইতালীয় সমাজ-প্রেক্ষাপটে 'হেজেমনি' (Hoare (eds.) 1971, p.245) 'হেজেমনি' ধারণাটি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেন যা শ্রেণি ও সামাজিক শক্তি সম্পর্কে আমাদের নতুন করে ভাবায়। 'দ্য প্রিজন নোটবুক'-এর অনুবাদকদ্বয় কুইন্টিন হোয়ার ও জিওফ্রে নওয়েল স্মিথ ভূমিকাংশে জানান,

> '...we have translated dirigente and direttivo as "directive" in order to preserve what for gramsci is a crucial conceptual distinction, between power based on "domination" and the exercise of "direction" or "hegemony". In this context it is also worth noting that the term "hegemony" in Gramsci itself has two faces. On the one hand it is contrasted with "domination" (and as such bound up with the opposition State/ Civil Socity) and on the other hand 'hegemonic' is sometimes used as an opposite of "corporate" or "economic corporate to designate an historical phase in which a given group moves beyond a position of corporate existence and defence of its economic position and aspires to a position of leadership in the political and social arena. Non-hegemonic groups or classes are also called by Gramsci "subordinate", "subaltern" or sometimes "instrumental."

(Hoare (eds.) 1971, p. xiii-xiv)

মাত্র ৪৬ বছরের জীবনকালে গ্রামশি 'সবার ওপরে মানুষ সত্য' এই ভাবনার উপর জোর দিয়েই যুদ্ধ করে গিয়েছেন। ১৯৭১ সালে গ্রামশির ইতালীয়তে লেখা বইগুলির ইংরেজি অনুবাদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক রূপে অনেকের কৌতূহলের লক্ষ্য হয়ে ওঠেন। গ্রামশি তাঁর 'দ্য প্রিজন নোটবুক'-এ 'সাবঅলটার্ন' শব্দটির সমার্থক হিসাবে 'সাব-অর্ডিনেট' শব্দটি ব্যবহার করেছেন বলে সমালোচকেরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন। কারণ,

> 'Here again we have preserved Gramsci's original terminology despite the strangeness that some of these words have in English and despite the fact that it is difficult to discern any systematic difference in Gramsci's usage between, for instance , subaltern and subordinate.'

(Hoare (eds.) 1971, p. xiv)

তবে গ্রামশি 'সাবঅলটার্ন' শব্দটি যে দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন তা স্পষ্ট। প্রথমত, তিনি সরাসরি 'প্রলেতারিয়েত'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'সাবঅলটার্ন' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। কারণ গ্রামশি মনে করেন পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোয় সাবঅলটার্ন হল শ্রমিক শ্রেণি। সামাজিক ক্ষমতার এক বিশেষ বিন্যাসে তারা শোষিত ও শাসিত হয় এবং প্রলেতারিয়েত এর বিপ্রতীপে অবস্থান করেন হেজেমনি বা বুর্জোয়া শক্তি। দ্বিতীয়ত, 'সাবঅলটার্ন' শব্দটি কেবল পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গেই নয়, শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অন্যান্য ঐতিহাসিক স্তরের সঙ্গেও জড়িত। তাহলে দেখা যাচ্ছে 'সাবঅলটার্ন'-এর অর্থ এখানে শুধু শ্রমিকশ্রেণি নয়, যেকোনো সমাজের ক্ষমতা বিন্যাসের ওপর নির্ভর করে, যার একদিকে 'ডমিন্যান্ট' শ্রেণি এবং অন্যদিকে তার অধীনস্ত 'সাবঅলটার্ন' শ্রেণি অবস্থান করে। (Hoare (eds.) 1971, p. 13) অন্যদিকে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক গ্রামশির 'সাবঅলটার্ন' শব্দের প্রয়োগ নিয়ে মত প্রকাশ করেছেন এইভাবে,

> "Gramsci was not attempting to define 'subaltern'. Although he insisted on the fragmentary nature of subaltern history in a well known passage, in his own writings, based on a fascist Italy, the line between subaltern and dominant is more retrievable than in the work of subcontinental Subaltern Studies. Gramsci's project is not specifically gender-sensitive in its detail but can be made so"

(Chaturvedi (ed.) 2000, p.324)

দক্ষিণ-এশিয়ার ঐতিহাসিকেরা যাঁরা গ্রামশির থেকে 'সাবঅলটার্ন' শব্দটি গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সমাজের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার প্রবণতা থেকে 'সাবঅলটার্ন' শব্দটিকে পৃথক করে দেখাতে চেয়েছেন। গ্রামশির ধারণাকে অনুসরণ করার ফলে মার্ক্সীয় তত্ত্ব ও পরিভাষাকে গ্রহণ করে মার্ক্সীয় ধারণাকে ঔপনিবেশিক সমাজ প্রেক্ষাপটে গতিশীল করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এ। পার্থ

চট্টোপাধ্যায়-এর মতে মার্ক্সবাদী তত্ত্বের বিশ্লেষণের সঙ্গে ঔপনিবেশিক ইতিহাসের সামঞ্জস্য তৈরি করা উচিত।(Chaturvedi (ed.)2000, p. 324) কিন্তু গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক মনে করেন,

> "Since, 'subaltern' in the subcontinental use define those who were cut off from the lines that produced the colonial mindset, s/he did not emerge in the culture value-from. Thus, considerations of cultural problematics in Subaltern Studies are not a substitute for, but a supplement to, Marxist theory." (Chaturvedi (ed.) 2000, p. 325)

ইতালীয় সমাজ প্রেক্ষাপটে গ্রামশি যে 'সাবঅলটার্ন' শব্দের প্রয়োগ করেছিলেন তা মূলত সারদিনিয়ার কৃষক ও শ্রমিক সমাজকে কেন্দ্রে রেখে। সেখানে যেমন তিনি তাদের শ্রেণিচেতনার কথা উল্লেখ করেছেন তেমনই সমাজের উপরিকাঠামোয় রাষ্ট্র গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তি হিসাবেও চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। পাশ্চাত্য সমালোচক গুইডো লিগুওরি তাঁর 'Conception of Subalternity in Gramsci' – প্রবন্ধে গ্রামশির 'সাবঅলটার্ন' শব্দ প্রয়োগের তিনটি দিক তুলে ধরেছেন।

> "... a careful philological reading of Gramsci's use of the concept subaltern in the Prison Notebook reveals that he used the terms subaltern/ subalterns in different manners. First, he used the term with reference to disaggregated section of the population, politically (and therefore culturally) marginalized, whom he judged to be 'at the margins of history'. ...
> Second, Gramsci develops the use of the term 'subaltern' with specipic reference to the advenced industrial proletariat. ...
> Third, the concept is used with reference to individual subjects, either in relation to their social setting or their cultural limitations. It is not my intention to affirm that the prevalent usage of concept in recent years -especially in the fields of Subaltern Studies and Cultural Studies in the United States –ows its origins to a considaration of this aspects of the prasentation of the 'subaltern' in Gramsci." (Macnally (ed.) 2015, p.129-30)

আলোচ্য এই তিনটি দিক থেকে গ্রামশি 'সাবঅলটার্ন' শব্দের প্রয়োগ করেছেন নাগরিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে। যেখানে তাঁর আধিপত্য বা 'হেজেমনি' ধারণাটির সূত্রপাত হয়েছে। এর মধ্যে প্রধানত সিভিল সোসাইটি বা নাগরিক সমাজের কথা গ্রামশি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে ক্ষমতার বিভেদ—এই ব্যাপারটি ঐতিহাসিক পর্বে সিভিল সোসাইটি ও পলিটিক্যাল সোসাইটির মধ্যে সংঘর্ষ বা বলা ভালো রেষারেষির ফলে গড়ে ওঠে।

> 'The separation of powers together with all the discussion provoked by its realisation and the legal dogmas which its appearence brought into being is a product of the struggle between civil socity and political socity in a specific historical period.' (Hoare (eds.) 1971, p. xiii-xiv)

অর্থাৎ গ্রামশির মতে নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের যৌথ ভূমিকায় রাষ্ট্রের স্বরূপ ধরা পড়ে। রাষ্ট্র গড়ে ওঠে শাসকশ্রেণির ক্ষমতা ও আধিপত্যের ওপর নির্ভর করে, যেখানে 'হেজেমনি' বা আধিপত্য

কায়েম রাখার জন্য নাগরিক সমাজ একটি অপরিহার্য উপাদান হিসাবে কাজ করে। কারণ যে নাগরিক সমাজে শ্রমজীবী মানুষেরা বসবাস করে তাদের জন্য যখন রাজনৈতিক সমাজ কোনো নীতি গ্রহণ করে তার পেছনে অবশ্যই তাদের সমর্থন থাকা উচিত। আসলে সিভিল সোসাইটির সঙ্গে পলিটিক্যাল সোসাইটির সম্পর্কটি আনুগত্যের না হয়ে হওয়া উচিত সম্মতির উপর ভিত্তি করে। দেখা যাচ্ছে ডমিন্যান্ট শ্রেণির অপর প্রান্তে অবস্থিত শ্রমজীবী মানুষের প্রতি গ্রামশি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। গ্রামশি মনে করেন আধিপত্য বা হেজেমনি এমন একটি ধারণা যেখানে রাষ্ট্রশক্তি সৃজিত রীতিনীতির আওতায় সিভিল সোসাইটির সচেতন বা অচেতন মানুষেরা প্রতিবাদহীনভাবে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। আর আধিপত্যবাদের মূল কথাই হল শক্তি প্রয়োগ না করে সম্মতি আদায়ের মধ্য দিয়ে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা।

> '...in which one concept of reality is dominant, informing with it's spirit all modes and thought and behaviour. It follows that hegemony is the predominance obtained by consent rather than force of one class or group over other classes. And whereas 'domination' is realized, essentially through the coercive machinary of the state. 'Intellectual' and 'moral leadership' is objectified in, and mainly exercised through, 'civil socity'. the ensemble of educational, religious and associational institutions.' (Jesph 1981, p.24)

এই সম্মতি আদায়ের প্রধান উপাদান হল নাগরিক সমাজ বা সিভিল সোসাইটি যেখানে ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও পেশাভিত্তিক সংগঠনের অবস্থান। এই সব সংগঠনের সম্মতি আদায়ের মধ্য দিয়ে 'হেজেমনি' বা আধিপত্য স্থাপিত হয়। এইভাবে রাষ্ট্রীয়শক্তি সমাজের সর্বস্তরে আধিপত্য কায়েম করেছে এবং শাসকশ্রেণি হিসাবে নিজেদের জায়গা ধরে রাখতে সক্ষম হচ্ছে। এই অবস্থান থেকেই গ্রামশির হেজেমনি বা আধিপত্যের ধারণাটির উদ্ভব হয়েছে। 'হেজেমনি' বলতে শাসকশ্রেণির বিশ্বাস, নৈতিকতা ও বৌদ্ধিক নেতৃত্বের একটি জাল তৈরির ক্ষমতাকে বোঝায় যা সমাজের সকল অংশের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

> 'Hegemony is attained through the myriad ways in which the institutions of civil society operate to shape, directly or indirectly, the cognitive and effective structures whereby men perceive and evaluate problematic social reality.' (Jesph 1981, p.24)

অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী সংগঠন তাদের আধিপত্যকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নাগরিক সমাজকে আকার দিতে ব্যবহার করে। আধিপত্যের প্রভাব সমস্যাযুক্ত সামাজিক বাস্তবতার মূল্যায়ন করে সামাজিক সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে সমাজ-কাঠামোয় 'হেজেমনি' ধারণাটিকে রূপ দেয়। লক্ষণীয়, মার্ক্সবাদের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের দিক থেকে গ্রামশির 'হেজেমনি' ধারণাটির দ্বিবিধ সংজ্ঞার্থ উঠে আসে। পাশ্চাত্য সমালোচক ওয়াল্টার এল. অ্যাডামসন 'হেজেমনি' ধারণার এই দ্বিবিধ দিক নির্দেশ করেছেন,

‘First, it means the consensual basis of an existing political system within civil society. Here it is understood in contrast to the concept of “domination..”

In its second sense, hegemony is an overcoming of the “ economic-corporative”. Here the reference is to a perticular historical stage within the political moment. The hegemonic level represents the advance to a “class- consciousness,..” (Adamson 1980, p. 170-171)

অর্থাৎ রাষ্ট্রের একচেটিয়া সহিংস এবং চূড়ান্ত সালিশির ফলস্বরূপ হেজেমনি ধারণাটির গুরুত্ব হল সর্বহারা শ্রেণির বিকাশের প্রয়োজনের দিকে ইঙ্গিত করার একটি রাজনৈতিক কৌশল যা বর্তমান ক্ষমতাসীন শ্রেণির সম্মতিকে হ্রাস করে। তাহলে একদিকে রাষ্ট্রযন্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি নাগরিক সমাজের ওপর প্রয়োগ করে আধিপত্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে সামাজিক ক্রুটিকে লাঘব ও প্রতিবাদকে স্তিমিত করে দেওয়ার প্রবণতা যেমন রয়েছে তেমনই অন্যদিকে সমাজের ‘প্রলেতারিয়েত’ শ্রেণির রাজনৈতিক কৌশল রপ্ত করার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদী সংগঠনের বাধা কাটিয়ে ওঠার পথ হল ‘হেজেমনি’ বা আধিপত্য। আধিপত্যের স্তরে শ্রেণি-সচেতনতাকে আগে থেকেই প্রদর্শিত করা হয় যেখানে শ্রমজীবী মানুষদের শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক থেকেই বোঝানো হয় না, বৌদ্ধিক এবং নৈতিক সচেতনতার দিক থেকেও বোঝানো হয় যা আধিপত্যবাদের সাধারণ ধর্ম। সুতরাং ‘হেজেমনি’র সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়,

“Hegemony, initially a term reffering to the dominance of one state within a confederation, is now generally understood to mean domination by consent. … Fundamentally, hegemony is the power of the ruling class to convince other classes that their interests are the interests of all. Domination is thus exerted not by force, nor even necessarily by active persuasion, but by a more subtle and inclusive power over the economy, and over state apparatuses such as education and the media, by which the ruling class’s interest is presented as the common interest and thus comes to be taken for granted.

The term is useful for describing the success of imperial power over a colonized people who may far outnumber any occupying military force but whose desire for self-determination has been suppressed by a hegemonic notion of the greater good, often couched in terms of social order, stability and advancement, all of which are defined by the colonizing power.”

(Ashcroft (ed.) 1998, p.116)

সমাজে শাসন বজায় রাখতে গেলে ‘হেজেমনি’ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে, কারণ আধিপত্য বিষয়টি ঔপনিবেশিক চিন্তাভাবনা ও ক্ষমতার প্রভাবে ঔপনিবেশিক অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী একটি ধারণা। আসলে আধিপত্য বিষয়টি গ্রামশি আলোচনা করেছেন রাষ্ট্র-গঠনের কার্যকারিতা সম্পর্কে যেখানে রাষ্ট্রের ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সমাজ ও অর্থনীতি একটি কেন্দ্রীয় শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

এ পর্যন্ত আলোচনায় দেখা গেল গ্রামশি কথিত ‘হেজেমনি’ ধারণাটি বেশ জটিল, কারণ সিভিল সোসাইটিতে কেবল উৎপাদন পদ্ধতি বা তার উপকরণ নয়, সেখানে বসবাসকারী মানুষের কাছ থেকে

বৌদ্ধিক, নৈতিক ও দার্শনিক সমর্থন আদায় করার পদ্ধতির ভূমিকাও যথেষ্ট। সামগ্রিক আলোচনার ভিত্তিতে 'হেজেমনি' বা আধিপত্যের যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা পাচ্ছি তা হল,

- হেজেমনি বা আধিপত্য বলপ্রয়োগ ও দমন পীড়নের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে না, তা সূক্ষ্ম চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটিয়ে জনসাধারণের মধ্যে সর্বব্যাপী সম্পর্ক তৈরি করে তাদের আনুগত্য বা সম্মতি আদায় করে।
- পুঁজিবাদী সমাজ-কাঠামোয় রাজনৈতিক সমাজের পুষ্টতার পাশাপাশি পুরসমাজেরও উন্নতি ঘটে, ফলে সেই নাগরিক সমাজের কাছে পুঁজিবাদীরা হয়ে ওঠে প্রশাসনিক কর্মকর্তা অর্থাৎ তারা পুঁজিবাদীদের অজান্তেই পুঁজিবাদকে সম্মতি জানায় এবং পুঁজিবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে।
- গ্রামশি মনে করেন শ্রমিকশ্রেণির কর্তব্য হল নিজস্ব রাজনৈতিক কৌশলকে উন্নত করা যা আধিপত্যের ক্ষেত্রে নিজেদের সচেতন সম্মতি প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করবে এবং ধনতন্ত্রের প্রভাবকে সংকুচিত করে তাদের নিয়ন্ত্রণ শক্তি থেকে শ্রমজীবীদের মুক্তি ঘটবে।
- সমাজবিন্যাসের দিক থেকে প্রভুত্ব বা অধীনতা সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠিত উৎপাদনের সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যে। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায় দুটি পরস্পর বিরোধী চেতনার বৈপরীত্যে।
- সর্বোপরি হেজেমনির ফলে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে একধরনের শ্রেণিচেতনা তৈরি হয় যেখানে নিজেদের স্বার্থ আদায়ের জন্য শ্রমিকশ্রেণি নিজেই রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়।

কেন্দ্রীয় শক্তির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণির সম্পর্ক পীড়ন বা নির্যাতনের উপর নয় বরং তা হওয়া উচিত পরস্পরের মতাদর্শকে মান্যতা দিয়ে গড়ে তোলার। 'হেজেমনি' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক নন্দদুলাল সমাদ্দার 'বহির্বাংলার বাঙালি কি অপর?' প্রবন্ধে লিখছেন,

> '... কেন্দ্রের মস্তিষ্কে প্রান্তবর্তীর ইমেজটি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রান্তবাসীর উপর অপরত্ব আরোপ করে কেন্দ্র। এই আরোপকরণের উৎস হেগেমনি। গ্রিক অভিধায় হিগেমোনিয়ার অর্থ হল দাপট। গ্রিক ভাষায় অভিধাটির উৎপত্তি হয়েছিল- যেসময়ে প্রাচীন গ্রিসের সবক'টা নগরী-রাষ্ট্র সমান ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও আথেন্স নগরীর ছিল চূড়ান্ত হিগেমোনিয়া। পরবর্তীকালে প্রুসিয়ার হিগেমোনিয়া ছিল জার্মানিতে। একই গোষ্ঠীতে সবাই সমান হওয়া সত্ত্বেও যে দাপট ফলায় তারই হেগেমনি বা বোলবোলা।' (প্রধান (সম্পা.) ২০০৩, পৃ. ৫৫)

সুতরাং বলা যেতেই পারে 'হেজেমনি' হল ক্ষমতার এমন এক অবস্থানিক সূচক যার মাধ্যমে সমাজ কাঠামোয় উচ্চবর্গীয় ক্ষমতার দাপটে নিম্নবর্গকে চিহ্নিত করা হয়। তাহলে এ প্রসঙ্গে ক্ষমতার আস্ফালনের ধারণাকেও আমাদের বুঝে নিতে হবে। আমরা জানি, ক্ষমতাতত্ত্ব সম্পর্কে ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকোর

মতামত ও গবেষণা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। সুতরাং তাঁর দৃষ্টিতে ক্ষমতার স্বরূপ ও গ্রামশির ক্ষমতার ধারণাকে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করলে ক্ষমতা সম্পর্কিত ধারণাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

১.৩ আন্তনিও গ্রামশি ও মিশেল ফুকো : ক্ষমতার ধারণায় দুই চিন্তক

উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা লক্ষ করলাম গ্রামশির ক্ষমতার ধারণার মূলে রয়েছে আধিপত্যবাদ। কিন্তু মিশেল ফুকো ক্ষমতা ও জ্ঞানতত্ত্বকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা আমাদের আলোচনায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। ১৯৭৫ সালে তাঁর 'ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ' (Foucault 1975, p.1-326) নামক বহু সমালোচিত ও বিতর্কিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা ও জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিক উন্মোচিত হয়। তিনি লক্ষ করেছেন সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে কীভাবে সমাজে শাসক দ্বারা আইন তৈরি হয় এবং নিজেদের স্বার্থে তা এমনভাবে শোষিতের জন্য লাগু হয় যা তাদের ভাবতে বাধ্য করে যে সমাজ তাদের জন্য কিছু 'নিয়ম' তৈরি করেছে এবং তা না মানলে তাদের 'শাস্তি' হবে।

> "In Discipline and Punish what I wanted to show how, from the seventeenth and eighteenth centuries onwords, there was a varitable technological take-off in the produtivity of power.... but above all there was established at this period what one might call a new economy of power, that is to say procedures which allowed the effects of power to circulate in a manner at once continuous, uninterrupted, adapted and 'individualised' throughout the entire social body."
>
> (Gordon (ed.) 1980, p.119)

সমাজের সর্বত্র ক্ষমতা রয়েছে। ক্ষমতা সবসময়, সবজায়গায় বিরাজমান। কেউই ক্ষমতাতত্ত্বের বাইরে নয়। ক্ষমতার কোনো সীমা নেই। এক্ষেত্রে শাসক বা শোষক (ফুকো যাদের 'master' বলেছেন) মনে করে তারা শাসিত বা শোষিতদের (ফুকো যাদের 'slave or workmen' বলেছেন) জন্য যে আইন তৈরি করেছেন (হতে পারে সেটা রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন) তা তাদের ওপর আধিপত্য বজায় রাখবে কিন্তু সেই আইন এমনভাবে প্রণয়ন করা হবে যাতে কোনোভাবেই তা শাস্তি হিসাবে প্রদর্শিত না হয় বরং তা দাসের কাছে যেন 'প্রভুর ভালোবাসা' (Gordon (ed.) 1980, p.139) স্বরূপ প্রকাশ পায়। শাসক-শ্রেণির ক্ষমতা বিস্তারের এই পদ্ধতি সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর বক্তব্য,

> "its seems to me that power is 'always already there', that one is never 'outside' it, that there are no 'margins' for those who break with the system to gambol in. But this does not entail the necessity of accepting an inescapable from of domination or an absolute privilege on the side of the law. To say that one can never be 'outside' power does not mean that one is trapped and condemned to defeat no matter what." (Faubion (ed.) 1994, p.xiv)

ক্ষমতা প্রয়োগ করার কৌশলে একটি 'নেটওয়ার্ক' বা কায়দা-কানুন থাকে যা প্রয়োগের সিদ্ধান্তকে পরবর্তীকালে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। তাতে যেন কোনো সন্দেহ না থাকে। কারণ সন্দেহ তৈরি হলেই সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই সমস্যার প্রতিও ফুকো আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন,

> "This reduction of power to law has three main roles : (i) It underwrites a schema of power which is homogeneous for every level and domain- family or state, relations of education or production. (ii) It enables power never to be thought of in other than negetive terms : refusal, limitation, obstruction, censorship, Power is what say no. And the challenging of power as thus conceived can appear only as transgression. (iii) It allwos the fundamental operation of power to be thought of as that of a speech-act : enunciation of law, discoures of prohibition ." (Gordon (ed.) 1980, p.139-40)

যার ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করা হচ্ছে সে যেন এটাই বিশ্বাস করে যে তার ভালোর জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং শাসকের প্রতি যেন তাদের সম্মতি বজায় থাকে। ইতিপূর্বে গ্রামশির আলোচনায় এই কথাটাই তিনি বলতে চেয়েছেন। শাসকশ্রেণির ক্ষমতা মূলত কিছু আইন প্রণয়নের দ্বারা আধিপত্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে যার থেকে পালানোর পথ নেই। আসলে সাধারণ মানুষকে কায়দা-কানুনের বেড়ি পড়িয়ে কোনোদিকে, কীসের আশায় টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে- এই উত্তরই ফুকো সারা জীবন ধরে খুঁজেছেন এবং জেনেছেন ক্ষমতা প্রয়োগের কৌশলগুলো প্রকারান্তরে নতুন জ্ঞানের জন্ম দেয়। আর এখান থেকেই শুরু হয় ক্ষমতা ও জ্ঞানের সম্পর্ক। অবস্থা অনুযায়ী আধিপত্যবাদীরা কখনো বুদ্ধি খাটায়, চিন্তা করে, আবার ক্ষমতা প্রয়োগ করে সম্মতি আদায়ের জন্য। ক্ষমতা প্রয়োগের কৌশলে জড়িয়ে যাওয়া মানুষগুলির মধ্যে এই চেতনাও প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় যে তারা অধীন এবং শাসিত হওয়াই তাদের শ্রেয়। ফুকো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূলত ক্ষমতার নিষ্ঠুরতা দেখাতে চেয়েছেন। তাই তিনি মনে করেন সমাজ কাঠামোয় ক্ষমতা তিন ধরনের উপাদানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, যেমন- সার্বভৌমত্ব বা প্রভুত্ব, অনুশাসন করার কৌশল ও প্রশাসনিকতা।

> "... we need to see things not in terms of the replacement of a society of sovereignty by a disciplinary society and the subsequent replacement of a disciplinary society by a society of government; in reality one has a triangle, sovereignty-discipline- government, which has as its primary target the population and as its essential mechanism the apparatuses of security."
>
> (Faubion (ed.) 1994, p. 219)

ফুকো কথিত আলোচ্য এই তিন ধরনের ক্ষমতার ধারণা সম্পর্কে বলা যেতে পারে-

প্রথমত, সার্বভৌমত্ব বা প্রভুত্ব হল রাষ্ট্রক্ষমতা। যে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চল বা সেই অঞ্চলের প্রজামণ্ডলীর উপর। যেখানে ক্ষমতা দেখানো হয় আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে।

দ্বিতীয়ত, অনুশাসন বলতে বোঝান হয়েছে হাসপাতাল, কারাগার, স্কুল, কারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষকে নজরবন্দি করে রাখা হয়। এই শাসন শারীরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে না বরং মানুষের চেতনায় আঘাত করে। এখানেই ক্ষমতা সবচেয়ে প্রবলভাবে কার্যকর। নজরবন্দি করে অনুশাসন করা একপ্রকার স্বাধীনতা খর্ব করার নামান্তর। কিন্তু আমরা ভাবি আমাদের মঙ্গলের জন্য অনুশাসনের প্রয়োজন রয়েছে। এভাবেই আমরা প্রত্যেকে কোনো না কোনোভাবে নজরবন্দি। এই হল আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র যার অন্যতম অস্ত্র অনুশাসন।

তৃতীয়ত, প্রশাসনিক ক্ষমতা। 'গভর্নমেন্ট' শব্দটি থেকে প্রশাসনিক ক্ষমতাকে পৃথক করার জন্য ফুকো একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন—'গভর্নমেন্টালিটি' (Faubion (ed.) 1994, p.218) অর্থাৎ 'প্রশাসনিকতা বা প্রশাসনিক মানসিকতা'। আধিপত্যবাদীরা ক্ষমতা প্রয়োগ করবে সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য। তবে তা সার্বিক অর্থে কল্যাণ নয়। ক্ষেত্র বিশেষে উন্নয়ন। এই কৌশলে ক্ষমতা প্রয়োগের প্রধান অবলম্বন হল জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে প্রশাসনিক জ্ঞান তথ্য সংগ্রহ করা। অর্থাৎ এই প্রশাসনিক মানসিকতার মূলে রয়েছে বুদ্ধিজীবী সংগঠন। (দত্তগুপ্ত ২০১৯, পৃ.২৭৪) প্রশাসনিক মানসিকতা সম্পর্কে মিশেল ফুকোর অভিমত,

"By this word I mean three things :

1. The ensemble fromed by the institutions, procedures, analyses, and reflections, the calculations and tactics that allow the exercise of this very specific albeit complex form of power, which has as as its target population, as it principal form of knowledge political economy, and as its essential technical means apparatuses of security.
2. The tendency that, over a long period and throughout the west, has steadily led toward preeminence over all other froms (sovereignty, discipline, and so on) of this type of power–which may be termed "government"—resulting, on the one hand, in the formation of a whole series of specific governmental apparatuses, and on the other , in the development of a whole complex of knowledges.
3. The process or, rather, the result of the process through which the state of justice of the Middle Ages transfromed into the administrative state during the fifteenth and sixteenth centuries and gradually becomes "governmentalized". (Faubion (ed.) 1994, p. 219-20)

অর্থাৎ প্রশাসনিক ক্ষমতা হল একধরনের সংস্থা, পদ্ধতি, বিশ্লেষণ বা প্রতিচ্ছবি দ্বারা পরিবেষ্টিত একধরনের কৌশল যা একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অনুশীলনকে মঞ্জুরি দেয় যার মূল লক্ষ্য জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থানের আধারকে প্রয়োজনীয় তথ্য বা সরঞ্জাম হিসাবে প্রযুক্তিগতভাবে সুরক্ষিত রাখা। এই ধরনের ক্ষমতা একদিকে জনগণের সার্বিক গঠন ও বিকাশ এবং অন্যদিকে জ্ঞানের জটিল ধারণাকে একসঙ্গে বহন করে যাকে 'সরকার' নামে অভিহিত করা যায়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে সমাজের ন্যায়বিচারের ধারণাগুলির পরবর্তীকালে সমাজে সরকারীকরণ হয়ে গিয়েছে। দেখা যাচ্ছে,

রাষ্ট্রযন্ত্র যার হাতেই থাক না কেন ক্ষমতার জাল বিস্তারের কৌশল একই কাঠামোতে চলতে থাকে। ক্ষমতার হাত থেকে সমাজের মুক্তি নেই। আসলে গ্রামশি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে দলীয় নেতৃত্বের কাছে সারদিনিয়ার কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির সিদ্ধান্ত ও সম্মতির প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার আবেদন করেছেন। কারণ তাদের মধ্যে শ্রেণি বা সমাজ সচেতনতা তৈরি না হলেও তারা শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম। ফলে আধিপত্য যাতে শোষণ হিসাবে প্রদর্শিত না হয় তার জন্য প্রয়োজন কৃষক ও শ্রমিক সমস্যাকে অবহেলা না করে গুরুত্বের সঙ্গে সমাধান করার চেষ্টা করা। এই চেষ্টার জন্য সমাজসচেতন সংগঠকের উচিত সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেওয়া যা গ্রামশির কাছে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত। এই জন্য তিনি বরাবর শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণিকে নিজেদের রাজনৈতিক চেতনাকে উন্নত করার পরামর্শ দিয়েছেন। (Hoare (eds.) 1971, p.247) মিশেল ফুকোর কাছে এই সমাজচেতনাই হল আধুনিক সমাজে ক্ষমতার উৎস।

লক্ষণীয়, গ্রামশি ও ফুকোর ক্ষমতার ধারণার মধ্যে সূক্ষ্ম বৈসাদৃশ্য থাকলেও উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ ধারণার ক্ষেত্রে বিস্তৃত অর্থে ক্ষমতাকেই শেষ কথা বলে ধরা হচ্ছে। ফুকোর বিশ্লেষণ থেকে ক্ষমতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উঠে আসে। আলোচনার সুবিধার্থে এখানে ক্ষমতার স্বরূপ তাঁদের ভাবনায় কীভাবে ধরা দিয়েছে তা সূত্রাকারে দেখান যেতে পারে-

ক) গ্রামশির মতে পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোয় আধিপত্যবাদীরা শুধু অর্থনৈতিক স্তরেই ক্ষমতার প্রয়োগ করে না অন্যান্য স্তরেও করে। অন্যদিকে ফুকো মনে করেন ক্ষমতা সামাজিক বিন্যাসের সর্বস্তরেই বিদ্যমান এবং তা সামাজিক স্তরে বিভিন্ন কলা কৌশলের মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করা হয়। ক্ষমতা স্থির নয়, সে স্তর ও ক্ষেত্র ভেদে বদলে যায়।

খ) গ্রামশির মতে আধিপত্যবাদীরা তাদের ক্ষমতা কেবলমাত্র দমন পীড়নের মাধ্যমে প্রভাব ফেলে না, বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারাও জন-সাধারণের মধ্যে সর্বব্যাপী সম্মতি আদায় করতেও সক্ষম হয়। অন্যদিকে ফুকো ক্ষমতাকে সার্বভৌম মনে করেননি। তাঁর মতে সবচেয়ে প্রবল প্রভাববিস্তারকারী ক্ষমতা হল—অনুশাসন ও প্রশাসনিক মানসিকতা।

গ্রামশি ও ফুকোর ক্ষমতা সম্পর্কিত দুই প্রেক্ষিতে এ কথাই সাধারণভাবে উঠে আসে—ক্ষমতা প্রয়োগ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার মতো, যা পরবর্তীকালে এ সত্য প্রতিষ্ঠা করে যে ক্ষমতা যাদের ওপর প্রয়োগ করা হচ্ছে তাদের চেতনায় সেটি যেন সম্মতিজনক হয়। ক্ষমতা প্রয়োগের সম্মতি যারা দেয় তারাই নিম্নবর্গ এবং যারা সম্মতি আদায় করে তারাই উচ্চবর্গ। ইতিহাসবিদ পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন,

'গ্রামশির ইঙ্গিতগুলিকে অনুসরণ করেই নিম্নবর্গের ধারণাটির উদ্ভব। কিন্তু তাঁর প্রয়োগ ও বিস্তার করা হয়েছে ভারতবর্ষের সমাজ-ইতিহাসের ক্ষেত্রে।' (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.৫)

সমালোচক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর 'উপনিবেশিক ভারতে ইতিহাসের গতিবিধি' প্রবন্ধের এক জায়গায় সে কথাই বলতে চেয়েছেন। তাঁর মতে সাবঅলটার্ন স্টাডিজের ঐতিহাসিকেরা-

'গ্রামশির কাছ থেকে নিম্নবর্গ ও আধিপত্যের ধারণা এবং ফুকোর কাছ থেকে নিয়েছেন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকৃত অবস্থান ও আপেক্ষিকতার প্রত্যয়।' (ইসলাম চৌধুরী (সম্পা.) ২০০৪, পৃ.৩০)

ইতিপূর্বের আলোচনা সংক্ষেপে বলা যায়, মূলত ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে লেখা গ্রামশির চিন্তা-চেতনা থেকে আধিপত্যবাদ বা 'হেজেমনি'র ধারণা এবং ১৯৭৫ সালে মিশেল ফুকোর ক্ষমতা-তত্ত্বের বিকেন্দ্রীকরণের ধারণার মিশ্রিত ভাবনায় ১৯৮২ সালে রণজিৎ গুহ ও তাঁর নেতৃত্বে একদল সমালোচক দক্ষিণ এশিয়ার ঐতিহাসিক ও ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজের' সূত্রপাত করেন। এরই মধ্য দিয়ে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রাথমিক চর্চা শুরু হয়।

১.৪ 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' : ইতিহাস ও তত্ত্বের সন্ধানে

আমরা জানি প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকানোর কাজটি করতে হয়। বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে রণজিৎ গুহের নেতৃত্বে সাবঅলটার্ন স্টাডিজ-এর প্রথম খণ্ড (১৯৮২) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনাতত্ত্বের বিকাশে একটি অগ্রগামী পদক্ষেপ শুরু হয় এবং নানা সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' স্বতন্ত্র একটি তত্ত্বে পরিণত হয়। ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে যথাক্রমে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' প্রথম খণ্ড প্রকাশ এবং 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এর সূত্রপাত হলেও এই নতুন তত্ত্ব গঠনের প্রস্তুতি ও প্রক্রিয়া এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে আসছিল সত্তর-এর দশক থেকেই। কীভাবে নিম্নবর্গচর্চার সূত্রপাত হল এবং এর ক্রমবিকাশের ধারাটি সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের দেখে নিতে হবে ডেভিড লাডেন-এর 'A brief history of subalternity' প্রবন্ধ।

"SUBALTERN STUDEIS began its impressive career in England at the end of the 1970s, when conversations subaltern theams among a small group of English and Indian historians led to a proposal to launch a new journal in India. Oxford University Press in New Delhi agreed instead to publish three volumes of essay called ' Subaltern Studeis : writtings on South Asian History and society.' These appeared annually from 1982 and their success simulated three more volumes in the next five years, all edited by Ranajit Guha (ed.). When he retired as editor in 1989, Ranajit Guha (ed.) and eight collaborators had written thirty four of thirty seven essay in six subaltern studies volumes, as well as fifteen related books.'' (Ludden (ed.) 2002, p.1)

১৯৯৩ সালে রণজিৎ গুহের অধীনে আটজন সদস্যের (শাহীদ আমিন, ডেভিড আর্নল্ড, গৌতম ভদ্র, দীপেশ চক্রবর্তী, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ডেভিড হার্ডিম্যান, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে এবং সুমিত সরকার) একটি কমিটি নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চায় ব্যাপক সাড়া লক্ষ করে দিকে আরো একধাপ এগিয়ে যেতে উৎসাহিত হন। ১৯৮২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত মোট বারোটি খণ্ডে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে ৪৪ জনের প্রায় ২০০ টিরও বেশি প্রবন্ধ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদসহ জায়গা পেয়েছে। নব্বইয়ের দশকে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং বহুচর্চিত বিষয় হয়ে ওঠে। ১৯৮২, ১৯৮৩, ১৯৮৪, ১৯৮৫, সাল পর্যন্ত প্রকাশিত খণ্ডগুলির ভাবনা-চিন্তার পরিবর্তন ঘটেছে পরবর্তীকালে প্রকাশিত খণ্ডের চিন্তাভাবনার তুলনায়। সমালোচকদের বৌদ্ধিক প্রভাবে চিন্তা-চেতনায় এসেছে পরিবর্তন ও রূপান্তর।

গ্রামশির ধারণাকে সম্পৃক্ত করে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর ঐতিহাসিক গবেষণা শুরু হয়েছিল। সত্তরের দশকের শেষের দিকে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ও সামজিক ইতিহাসের ভেতর দিয়ে গবেষকেরা 'History from bellow' ধারণাকে পোষণ করে আসছিলেন যার ধারণা ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ই. পি থম্পসন-এর 'The Making of the English working class' (Thompson 1963, p. 9-838) গ্রন্থ থেকে গবেষকেরা পেয়েছিলেন। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজের' প্রথম তিন খণ্ডে এগার জন লেখক (শাহীদ আমিন, ডেভিড আর্নল্ড, গৌতম ভদ্র, দীপেশ চক্রবর্তী, এন. কে চন্দ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ এন দাস, ডেভিড হার্ডিম্যান, স্টিফেন হেমিংহাম, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে এবং সুমিত সরকার) সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসকে নিবিড়ভাবে আলোচনা করেছেন।

ইতিহাস অর্থাৎ অতীত। এই অতীতকে অক্ষরের মধ্য দিয়ে সাজানোর কাজটি করেছেন মূলত ক্ষমতালিপ্সু বৌদ্ধিক মস্তিষ্ক। তাই সেখানে স্থান পেয়েছে পুঁজিবাদী উচ্চবর্গের কণ্ঠস্বর। ইতিহাসের কথাই যদি বলতে হয় তাহলে ১৮৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের আগেও ইতিহাস লেখা হয়েছে, তারও আগে লেখা হয়েছে রাজকাহিনিভিত্তিক ইতিহাস। ইংরেজ শাসনকালে লেখা হল জাতীয়তাবাদী ইতিহাস। জাতীয়তাবাদ একটি আধুনিক ধারণা। এর মধ্য দিয়ে স্বদেশ তথা মাতৃভূমির মর্যাদা-অমর্যাদা, গৌরব-অগৌরবকে কেন্দ্র করে দেশের মানুষ বা জাতির মমত্ব, উল্লাস, আবেগ-অনুভূতি, জাতীয় চেতনা ও একাত্মবোধ প্রদর্শিত হয়। ইংরেজরা এদেশে আগমনের পর ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়রা ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের ধারণার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে এবং নিজেরাও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপিত হয়। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের সঙ্গেই রচিত হল মার্ক্সীয় ইতিহাস। যেখানে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, পুঁজিবাদ ও শ্রমিকশ্রেণির বঞ্চিত হওয়ার কথা বলা হল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ধারণা প্রতিষ্ঠিত হল ইংরেজদের

আগমনে। কিন্তু ভারতবর্ষের বুকে যে ইতিহাসবিদ্যার চর্চা শুরু হল তা সম্পূর্ণই উচ্চবর্গের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ইতিহাস। ইতিহাসের মুখ্য হিসাবে উচ্চবর্গের স্থান ইংরেজদের পরেই। এর মধ্যে সামন্ততন্ত্র, জমিদারী প্রথাও অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে যে ইতিহাসে রাজ-রাজার কাহিনি বা ঠাকুর-দেবতার পৌরাণিক প্রসঙ্গ আলোচিত হত, এখন নতুন নিয়মে ইতিহাসের পাতা দখল করল ইংরেজ ও ইংরেজ শাসিত সমাজে যাদের অর্থের জোর বেশি তাদের মাহাত্ম্য। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ভারতের বুকে যেসব কৃষকবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে, কৃষকবিদ্রোহের যে ইতিহাস রচিত হয়েছে সেখানে কৃষকচৈতন্যের স্থান নেই, কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনার উল্লেখের পরিবর্তে সে স্থানে এসেছে উচ্চবর্গ ও ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও পরিচালনার কথা, লেখা হয়েছে কৃষকবিদ্রোহের ব্যর্থতার ইতিহাস। উচ্চবর্গের এই মাহাত্ম্যের বিপক্ষে শুরু হল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। যদিও রণজিৎ গুহ জানিয়েছেন, এই ধরনের জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যাটি হল উচ্চবর্গের রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষিত হওয়ার অপর নাম। যেখানে আদর্শ-নিষ্ঠা বা জনকল্যাণের স্থান নেই, আছে শুধু অর্থ, যশ ও ক্ষমতার লোভ। সেই লোভের লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য ইংরেজ, স্বদেশী উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মধ্যে অসহযোগিতা ও সংঘাতের কাহিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলকথা। ফলে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রথম খণ্ডটি ঔপনিবেশিক ভারতের কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্রে রেখে আলোচনা করা হয়েছে এই মর্মে, যে লক্ষ লক্ষ লোক উচ্চবর্গের বিরোধিতা করে আন্দোলন সংগঠিত করল, প্রাণ দিল দেশের কল্যাণার্থে, তাদের চৈতন্য বলে কি কিছুই নেই? তর্কের খাতিরে যদি নিম্নবর্গের চৈতন্যকে একটি আলাদা সত্তা হিসাবে গণ্য করা হয়, তাহলে তার বৈশিষ্ট্য কী? উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক কোনো তত্ত্ব বা বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে বুঝব? এই প্রশ্নগুলিই উঠে এসেছে উচ্চবর্গের জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ১৪) ঔপনিবেশিক যুগের ইতিহাস ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সবটাই দেশি বা বিলিতি বুর্জোয়াদের কৃতিত্ব। কিন্তু যারা সত্যি সত্যিই এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিম্নবর্গের ভূমিকা বুঝতে চেষ্টা করেছেন তারাও নিরুপায় হয়ে উচ্চবর্গের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার উপরেই নির্ভর করেছেন। ফলে নিম্নবর্গের চৈতন্যের স্বতন্ত্র প্রকাশ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। সুতরাং আলোচনার বাইরে থেকেই একপ্রকার প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে যে নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র চেতনা বলে কিছু নেই। যা আছে তা উচ্চবর্গের কাছ থেকে পাওয়া।

ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদরা ক্ষমতা ও আধিপত্যবাদকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইতিহাসবিদরা নিম্নবর্গের ইতিহাস নির্মাণে ঔপনিবেশিক ভারতের কৃষক ও কৃষক বিদ্রোহের চরিত্র,

তাদের স্বর ও সংকটকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন। উচ্চবর্গ থেকে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক মতাদর্শ, উদ্দেশ্য, পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য এবং নিম্নবর্গের চেতনার নিজস্বতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা অন্বেষণ ও উন্মোচনের অভিপ্রায়ে নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদ গোষ্ঠীর পথচলা। আর এই পথ ধরেই নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার অগ্রযাত্রা। **১৯৮২–১৯৯৯** সাল পর্যন্ত 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' কয়েকটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর নানা তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, যা পরবর্তীকালে একাডেমিক ক্ষেত্রে একটি তাত্ত্বিক পরিসর তৈরি করেছে। এ প্রসঙ্গে আমরা দেখে নেব 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর আলোচ্য বিষয়গুলিকে।

১.৪.১ 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' : আলোচ্য বিষয়

'Subaltern Studies'-এর বারোটি খণ্ড, 'Selected Subaltern Studies', 'Reading Subaltern studies', 'Mapping Subaltern Studies and the Postcolonial', 'Dominance without Hegemony' ইত্যাদি গ্রন্থে সমালোচকেরা যে সব দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নবর্গের ইতিহাসকে দেখতে চেয়েছেন তার মধ্যে বিশেষ করে উঠে এসেছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি।

- 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর সমালোচকরা সিদ্ধান্ত নিলেন এমন এক ইতিহাস রচনার যেখানে উচ্চবর্গীয় চিন্তা-চেতনার বিপরীতে সমাজ-কাঠামোর তলদেশে থাকা নিম্নবর্গ নিজেদের ইতিহাস নিজেরাই তৈরি করছে।
- রণজিৎ গুহ 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে এই গ্রন্থের লক্ষ্য চিহ্নিত করে বলেছেন, দক্ষিণ-এশিয় ইতিহাসচর্চায় নিম্নবর্গের বিষয় ও ধারণার পদ্ধতিগত, তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করা এবং গবেষণার মাধ্যমে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজাত শ্রেণির পক্ষপাতিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করতে সাহায্য করা।

  "Indeed, It will be very much a part of our endeavour to make sure that our emphasis on the subaltern functions both as a measure of objective assesment of the role of the elite and as a critique of elitist interpretations of that role." (Guha (ed.) 1982, p. vii)
- নিম্নবর্গের ইতিহাস-চর্চার মূল দিকটি হল—সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিরোধিতা করে মার্ক্সবাদের আশ্রয়ে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক সচেতনতা বা বলা ভালো উচ্চবর্গের বিপরীতে অবস্থানকালে নিম্নবর্গের নিজস্ব চেতনার স্বাতন্ত্র্য সন্ধানের চেষ্টা করা। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রথম তিনটি খণ্ডে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে উপনিবেশবাদ ও বুর্জোয়ার আভিজাত্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

“Subaltern Studies began as an attemt to transfrom the writing of colonial indian history by drawing on the fluid concepts of class and state articulated in the Prison notebook of Antonio Gramsci. The very name of the project, and title of the series , demonstrated a commitment to further developing the political agenda of this Italian revolutionary socialist.” (Chaturvedi (ed.)2000, p. viii)

- নিম্নবর্গের সমালোচকরা ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকালে জাতীয়তাবোধ ও নবজাগরণের উন্মেষ এবং বিভিন্ন গণআন্দোলন ও কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠার নেপথ্য কারণ অনুসন্ধান করেছেন যেখানে কৃষকদের শ্রেণিচেতনাকে তত্ত্বের কাঠামোয় আলোচনা করার প্রয়াস করা হয়েছে।
- গ্রামশি কথিত শ্রমিকশ্রেণির রাজনৈতিক সচেতনতার কথা মাথায় রেখে নিম্নবর্গের সমালোচকরা ঔপনিবেশিক মহাদেশে কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।
- বিশিষ্ট তাত্ত্বিক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক পুরুষ শাসিত সমাজে নারীদের অবস্থান অনুসন্ধান করার মধ্য দিয়ে নারীর অধীনতা এবং নিম্নবর্গ ধারণা হিসাবে নারী কতটা নিম্নবর্গের আওতাভুক্ত তা স্পষ্ট করতে চেয়েছেন।
- সমাজের মুষ্টিমেয় অভিজাত বা উচ্চবর্গের অবস্থান, রাজনীতি ও মতাদর্শের বিপরীতে অবস্থিত একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে নিম্নবর্গের চেতনা ও স্বতন্ত্র্য বিভেদরেখাটি স্পষ্টভাবে তাত্ত্বিক কাঠামোয় আলোচনা করা হয়েছে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চায়।
- নিম্নবর্গের ইতিহাসের আরেকটি দিক হল, ‘ঐতিহাসিক উত্তরণের সমস্যা।’ উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের সম্ভবনা কতটা এবং নিম্নবর্গের চেতনার স্বতন্ত্র রূপটিতে পরিবর্তনের সম্ভবনা আছে কি না, থাকলেও তা কীভাবে ঘটে— এই দিকটি গুরুত্ব লাভ করেছে।
- সাম্প্রতিক পর্বে ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’-এ তিনটি সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয় উল্লেখযোগ্যভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ প্রথা এবং মহিলাদের সামাজিক অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনা।

১.৪.২ ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’ : উদ্দেশ্য ও গতিমুখ

‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’ দশটি খণ্ডে প্রকাশিত হওয়ার পর প্রকল্পটি বিশ্বব্যাপী একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অর্জন করে। আলোচ্য প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকেরা ঔপনিবেশিক ভারতের

স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাসমূহ প্রস্তুত করেন এই মর্মে যে, অনভিজাত শ্রেণির রাজনীতিকে অস্বীকার করে অভিজাতশ্রেণির অবদানের কথা ইতিহাসে পরিস্ফুট হয়েছে। 'সাবঅলটার্ন' গোষ্ঠী এই ধারণাটির বিপক্ষে 'তল থেকে ইতিহাস' রচনার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন যেখানে নিম্নবর্গ তাদের নিজস্ব ইতিহাস রচনা করবে। তাছাড়াও উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ-এর রাজনৈতিক পদ্ধতির পৃথকীকরণের পাশাপাশি নিম্নবর্গের অধীনতার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গীয় চেতনা অনুসন্ধান করেছেন।

দেখা গেল, প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস রচনার বিরোধিতা করাই 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর মূল শক্তি। যদিও বিরোধিতা করে আধিপত্য-অধীনতা বা শাসক-শাসিত-এর দ্ব্যণুক সম্পর্কের অবসান ঘটানো যাবে না, কিন্তু একজন নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক –

> "... বিরোধী ইতিহাস লিখতে পারেন, যেখানে উচ্চবর্গের আধিপত্য অস্বীকার করে নিম্নবর্গ তার নিজের ঐতিহাসিক উদ্যমের কথা বলতে পারে। নিজের ক্রিয়াকলাপের কর্তা হিসেবে নিজেকে উপস্থিত করতে পারে। সে ইতিহাস কখনোই পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিহাসের সামগ্রিকতা অর্জন করতে পারবে না। নিম্নবর্গ কখনোই গোটা সমাজের হয়ে কথা বলতে পারবে না। নিম্নবর্গের ইতিহাস তাই অনিবার্যভাবে আংশিক, অসংলগ্ন, অসম্পূর্ণ।" (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ১৪)

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' একটি বৌদ্ধিক উৎস যার অন্তঃক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছিল পশ্চিমা মার্কসবাদ এবং ভারতীয় রাজনৈতিক সমাজ-সংস্কৃতির দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়ে। প্রসঙ্গত বলতে হয়, সত্তরের দশকে ব্রিটেনে গ্রামশির চিন্তা-দর্শন যখন গভীরভাবে প্রসারিত হচ্ছিল তখন ই. পি থম্পসন, ক্রিস্টোফার হিল, রডনি হিলটন, হবস্বম প্রমুখ ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা ইউরোপীয় সমাজে গ্রামশির সংস্কৃতি ও আধিপত্যের বিষয়ে মনোনিবেশ করে 'তল থেকে ইতিহাস' দেখার কথা উল্লেখ করেছিলেন যেখানে শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও ভূমিকার প্রসঙ্গ সারা বিশ্বে ইতিহাসের অধ্যয়নে বিপ্লব ঘটিয়েছিল। (Chaturvedi (ed.)2000, p. ix) ইতিহাস অধ্যয়নের এই ধারণা থেকেই নিম্নবর্গের সমালোচকরা ঔপনিবেশিক সমালোচনার অঙ্গ হিসাবে দক্ষিণ-এশিয়ার সমাজ প্রেক্ষাপটে 'তল থেকে ইতিহাস' লেখাকে সংশোধন করার প্রয়াস করেছেন এবং অভিজাতশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক ইতিহাসের ঐতিহ্যবাহী পক্ষপাতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজের' প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে রণজিৎ গুহ বলেছেন,

> "The aim of the present collection of essays, the first of the series, is to promote a systematic and infromed discussion of subaltern themes in the field of south asian studies, and thus help to rectify the elitist bias characteristic of much research and academic work in this particular area... The dominant groups will therefore receive in these volumes the consideration they deserve without,..."
> (Guha (ed.) 1982, p. i)

১৯৮২ সালে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' প্রথম খণ্ড থেকে চতুর্থ খণ্ড পর্যন্ত উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ভারতের 'তল থেকে ইতিহাস' লেখার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। যেখানে গ্রামশির ধারণাকে ভারতীয় ইতিহাসে প্রয়োগ করে দেখার ফলে বিভিন্ন সমালোচনার সৃষ্টি হয় এবং একই সঙ্গে দাবি উঠতে থাকে নতুন করে সমাজের তলদেশ থেকে সংশোধনবাদী ইতিহাস লেখার। প্রথম দিকে ব্রিটিশ মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার বিশ্লেষণাত্মক উপাদান ব্যবহার করা হলেও উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে কৃষকবিদ্রোহ বিষয়ক দীর্ঘ ঐতিহ্যকে ঐতিহাসিক বৃত্তির মধ্যে ফিরিয়ে আনার একটি নতুন প্রচেষ্টা দেখা দিল। ফলে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজের' এই প্রচেষ্টা ও সমালোচনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রথম বিতর্কের সৃষ্টি হল যা পরবর্তীকালে 'Arguments within Indian Marxism' নামে পরিচিতি পায়। ভারতীয় প্রতিক্রিয়ায় 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' ও মার্ক্সবাদের মধ্যে বিভেদরেখা লক্ষ করা যায়। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রথম চারখণ্ডে উনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোহের পটভূমি নির্মাণের ক্ষেত্রে একধরনের স্বায়ত্তশাসিত রাজনৈতিক চেতনা এবং সেই বিদ্রোহ ও বিদ্রোহীদের নিজস্ব চরিত্র-চেতনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। (Chaturvedi (ed.) 2000, p. xi)

১৯৮৬ সালের মধ্যে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' প্রকল্পটি ভবিষ্যতে বিকাশের বিষয়ে একটি আভ্যন্তরীণ বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল যেখানে প্রকল্পটির মধ্যে ইউরোপীয় প্রতিযোগিতার দাবি করা হয়েছিল। আসলে কৃষক সচেতনতার প্রয়োজনীয় কাঠামোটিকে গুরুত্ব দিয়ে এবং ব্রিটেনের বৌদ্ধিক ইতিহাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একদল ঐতিহাসিক 'তল থেকে ইতিহাস' লেখার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন এবং অন্যরা মার্কসবাদ পরবর্তী বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে সমালোচনা করা শুরু করলেন। ফলত উত্তর-ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চায় স্পষ্ট একটি বিভাজন রেখা দেখা দেয়। এখানেই সাব-অলটার্নিষ্টদের সঙ্গে উত্তর-ঔপনিবেশিকবাদীদের পার্থক্য। শুধু তাই নয় মার্ক্সবাদের প্রভাবে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' প্রকল্পটির সূত্রপাত হলেও পরবর্তীকালে পশ্চিমী মার্ক্সবাদ থেকে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকেরা সরে এসেছেন অনেকটাই। আসলে দক্ষিণ-এশিয়ার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা শুরু হলেও নব্বইয়ের দশকে ভারতীয় সমাজ-প্রেক্ষাপটে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চায় একটি বাঁক বদল করেছিল। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকেরা তাঁদের নিজস্ব একটি আদর্শ তৈরিতে সক্ষম হয়েছিল যা পরবর্তীকালে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' একটি সামাজিক তত্ত্ব কাঠামোয় পরিণত হয়েছে। রণজিৎ গুহের মৌলিক যুক্তি হল ইতিহাসবিদেরা বিভিন্ন দিক চর্চা করলেও কৃষক আন্দোলনের নির্দিষ্ট চেতনাকে বিবেচনা করেননি। তাঁরা কেবল কৃষকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমির অধ্যয়ন করেছেন।

রণজিৎ গুহ-র মতে, নব্য ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকতার ক্ষেত্রে ভারতীয় অভিজাতদের ক্রিয়াকলাপ ও ধারণার ওপর ভিত্তি করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যদিকে প্রশ্ন ওঠে প্রচলিত ভারতীয় মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিও কি সেটাই? মার্ক্সবাদী তত্ত্বের সঙ্গে সাব-অলটার্নিস্টদের সম্পর্ক কী? 'Recovering the Subject : Subaltern Studies and Histories of Resistance in Colonial South Asia ' প্রবন্ধে রোসালিন্ড ও'হ্যানলন জানাচ্ছেন,

> "…the teleologies of marxist historical writing have acted to empty subaltern movement of their specific types of consciouness and practice, and to see in the history of colonial South Asia ony the linear development of class consciousness. …As we shall see, by no means all of the contributors are free from the nation of a progression of consciousness, and a teleology which finds some resistances to be backward and primitive, and hence less congenial material for the historian to work on than those which are advance along the road to an enlightened awerness of class interest. A number of critics are made the point that this conflicts with the proclaimed interest in the historical specipicity of subaltern movements." (Ludden (ed.) 2002, p.140-41)

আসলে যখন 'তল থেকে ইতিহাস' লেখার ধারণাটির সূত্রপাত হচ্ছিল তখন সমাজের তলদেশে থাকা মানুষদের অভিজ্ঞতাকে পুনরুদ্ধার করার জন্য 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' প্রকল্পটির উদ্ভাবন হয় যা অভিজাত ইতিহাসের নিচে এতদিন চাপা পড়ে ছিল। 'Hidden from History' (Ludden (ed.) 2002, p.143) বাক্যবন্ধটি শ্রুতিমধুর হলেও তা সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ও শক্তিশালী ধারণাকে আড়াল করে রাখার কৌশলমাত্র। প্রকৃতপক্ষে অধস্তন এবং প্রান্তিক নারীবাদের অন্ধকারের ইতিহাসকে আলোকিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকেরা মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এ সমাজের অন্ধকার দিকটির প্রতি তাঁদের অনুমানগুলির অপর্যাপ্ত বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে চাপা পড়ে যাওয়া অভিজ্ঞতার পুনরুদ্ধারের কাজটি কীভাবে সম্পন্ন হবে তার বিস্তৃত ধারণা তৈরি করেছেন। ইতিহাসের এই শূন্যস্থান পূরণ করার কাজটি করা হয়েছে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এ। পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাই বলেছেন,

> "The task now is to fill up this emptiness, that is, the representation of subaltern consciousness in elitist historiography. It must be given its own specific content with its own history and development… Only then can we recreate not merely a whole aspect of human history whose existence elitist historigraphy has hitherto denied, but also the history of the 'modern' period, the epoch of capitalism." (Ludden (ed.) 2002, p.144)

ইতিহাসের শূন্যতাকে পূরণ করার কাজটি কীভাবে সম্পাদন করা হবে এই নিয়ে নিম্নবর্গের ইতিহাসে নিম্নবর্গের উপস্থিতি একটি অন্তর্নিহিত ও প্রতিরোধী বিষয় হিসাবে দেখা হয়েছে। যেখানে ঐতিহাসিকেরা নিম্নবর্গের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতাকে পুনরুদ্ধার করার জন্য সচেতন ও উদার মানবতাবাদের পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এটি এমন একটি ইতিহাস রচনার দাবি করে যেখানে নিম্নবর্গই তাঁদের নিজস্ব চেতনা,

দাবি, আদর্শ, অনুশীলন ও অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরতে চায়। যে ইতিহাস কোনো বাহ্যিক নেতৃত্ব বা অভিজাতরা নিম্নবর্গকে প্রদান করেনি, এই ইতিহাস নিম্নবর্গের চেতনা ও অনুশীলনের একটি উপায় যার উৎস ক্ষমতার বিপরীতে নিম্নবর্গের নিজস্ব সত্তা পুনরুদ্ধার করে।

১.৪.৩ 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' : ঐতিহাসিক সমালোচনায় তাত্ত্বিক উত্তরণ

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' (১৯৮২) প্রকাশিত হওয়ার পর সমালোচকদের নানা মতবাদ ও সমালোচনার দরুন আলোচ্য প্রকল্পটি বিংশ শতাব্দীর শেষে ঔপনিবেশিক ভারত ও জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গ ছাড়িয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ সমালোচনা তত্ত্বে পরিণত হয়। সাম্রাজ্যবাদের উদ্বেগ ও নতুন আন্তর্জাতিক সামাজিক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় পুঞ্জীভূত শক্তি দ্বারা বহুকাল ধরে চলে আসা আধিপত্যের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক নির্ধারণবাদ, প্রযুক্তি ও সংস্কৃতিগত বিভিন্ন প্রকারের প্রতিরোধমূলক সম্মিলিত এজেন্সি গঠনের সাক্ষ্য বহন করে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'। (Chaturvedi (ed.) 2000, p. xii)

১৯৮২-১৯৯৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত যে সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজে' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যার পেছনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল।

> "… first, as the members of the collective emphasize their own 'autonomous voices' within the project, it was pertinent to select essays which were published indipendently of the series and reflected theoretical shifts in the1980s and 1990s ; second, by presuming an audience which was already familiar with the original essays found in the pages of Subaltern Studies,… The essays are organized according to the intellectual trajectory of the project. Theoretical statements from the members of the Subaltern Studies collective are followed in sequence with critiques, there by providing a historical framework for the discussions and debates centring on the project."
>
> (Chaturvedi (ed.) 2000, p. xiv)

অর্থাৎ 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজে' সংগৃহীত প্রবন্ধগুলি সমালোচনার বিষয়, ধরন, তত্ত্ব ও তথ্য অনুযায়ী ক্রমানুসারে স্থান পেয়েছে যাতে নিম্নবর্গের ইতিহাস পর্যালোচনায় একটি বৌদ্ধিক ও বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব হয়। ফলে রণজিৎ গুহ-এর নেতৃত্বে গঠিত সমালোচকগোষ্ঠী নিম্নবর্গের ধারণাকে যেভাবে সমালোচনা করেছেন সেখানে ধীরে ধীরে সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্ক সৃষ্টির পাশাপাশি একটি তাত্ত্বিক পরিসর তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই পর্যায়ে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজের' সঙ্গে জড়িত সমালোচকদের তাত্ত্বিক-সমালোচনা ও অভিমতগুলিকে সমালোচক-প্রাবন্ধিক ডেভিড লাডেন তিনটি ভাগে (Ludden (ed.) 2002, p.index) বিভক্ত করেছেন। তাঁর এই বিভাজনকে স্মরণে রেখে সমালোচনা ও অভিমতগুলি আমরা

সামগ্রিকভাবে তিনটি স্তরে বর্ণনা করার চেষ্টা করব। আলোচনার সুবিধার্থে সমালোচনাগুলি আমরা নিম্নরূপে বিভাজন করেছ। যেমন-

প্রথম স্তর : উন্মেষ পর্বের তাত্ত্বিক-সমালোচনা ও অভিমত

দ্বিতীয় স্তর : মধ্য পর্বের তাত্ত্বিক-সমালোচনা ও অভিমত

তৃতীয় স্তর : সাম্প্রতিক পর্বের তাত্ত্বিক-সমালোচনা ও অভিমত

১.৪.৩.১ উন্মেষ পর্বের তাত্ত্বিক-সমালোচনা ও অভিমত

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'- গোষ্ঠীর প্রধান রণজিৎ গুহ নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার পূর্বে তিনি যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তাঁর প্রথম বই 'A rule of property for Bengal : An essay on the idea of permanent settelement'(১৯৬৩) এবং দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য মনোগ্রাফ হল 'Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India'(১৯৮৩) যা ভারতবর্ষের কৃষক বিদ্রোহের দিকগুলির উপনিবেশ শাসনকালে একটি সূক্ষ্ম প্রতিরোধের তত্ত্ব উদ্ভাসিত করে। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' প্রকাশের সময় সাবঅলটার্ন-এর অর্থ সংকুচিতই ছিল। গ্রামশির 'সাবঅলটার্ন' শব্দটির অর্থ রণজিৎ গুহ নিম্নস্থিত বা শূন্যতা বুঝেছিলেন। (Guha (ed.),1982 : i) তিনি 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজের' ভূমিকায় জানিয়েছেন,

> 'The project's ambition to rectify the elitist bias in a field dominated by elitism colonialist ditism and bourgeois- nationalist elitism.' (Guha (ed.) 1982, p. i)

রণজিৎ গুহ পরামর্শ দেন যে ভারতের সম্পর্কে ঐতিহাসিক রচনাকে প্রতিষ্ঠা দিতে গেলে কৃষক বিদ্রোহের ওপর জোর দিতে হবে এবং ক্ষমতার সম্পর্ককে বুঝতে গেলে কৃষক ও তাঁদের বিদ্রোহের ইতিহাসকে বাদ দেওয়া যাবে না। 'Dominance without hegemony : History and power in colonial India'(১৯৯৭) রণজিৎ গুহ ঔপনিবেশিক ভারতের ক্ষমতার বিষম বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে হেজেমনিকে ব্যাখ্যা করে আধিপত্য ও অধীনতার বিপরীত ভাবনা থেকে ক্ষমতার স্বরূপ নির্ধারণে সচেষ্ট হয়েছেন। (Guha 1997, p.23-29) নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক গোষ্ঠী এই ধরনের আধিপত্যকে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এ বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ ইংরেজরা সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবে উপনিবেশ গঠনের লক্ষ্যে ভারতীয় সমাজ কাঠামোর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকটিকে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রভুত্ব স্থাপন করেছে। এখানে গ্রামশি কথিত হেজেমনির লক্ষণ ক্ষমতার বিষম বিন্যাসের প্রেক্ষিতে গ্রহণ করা হয়েছে।

কারণ ঔপনিবেশিক ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি সমাজ ও স্থান ভেদে ভিন্ন। ইংরেজ শাসনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে উন্নত করার আশা দেখিয়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

লক্ষণীয় ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের বুকে আধুনিক সমাজ ও ইতিহাস গড়ার জটিল দলিল-দস্তাবেজগুলিকে ভিন্নদৃষ্টিতে সমালোচনা করার লক্ষ্যে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর সূত্রপাত হয়েছে। তাঁরা সেই সব গবেষকদের মতো উচ্চবর্গের শরণাপন্ন হননি, বরং সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের বিরোধিতা করে তাদের অপর প্রান্তে অবস্থিত নিম্নবর্গের সমাজ-সংস্কৃতি, স্বকীয়তা ও সর্বোপরি তাদের স্বতন্ত্র চেতনার সমালোচনা করেছেন। নিম্নবর্গকে বিচার করতে গেলে উচ্চবর্গ ধারণাটিকে বাদ দিলে চলে না। একেই 'দ্ব্যণুক' বা 'বাইনারি' (Guha (ed.) 1982, p.i) সম্পর্ক বলে বোঝাতে চাইছেন ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ। যদিও ক্ষমতা প্রসঙ্গে গৌতম ভদ্র একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

> ''কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাই একমাত্র ক্ষমতা নয়। কিন্তু 'বিকীর্ণ ক্ষমতা' প্রতিনিয়ত আমাদের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে জন্ম হচ্ছে। আমরা শুধু কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার কথা বললে, আমরা শুধু তার স্ট্র্যাটেজির কথা ভাবি। তার সঙ্গে কীভাবে লড়াই করতে হবে কিন্তু আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কে যে বিকীর্ণ ক্ষমতা তৈরি হয়, ছাত্র-শিক্ষক, বাড়িতে-রাস্তায়, সাধারণ স্বাভাবিক আদান প্রদানে, সেই ক্ষমতার আমরা কোনো তাত্ত্বিক কাঠামো গড়ে তুলতে পারিনি। যার ফলে ক্ষমতার সম্পর্ক চলতেই থাকে...।''
> (মহম্মদ (সম্পা.) ২০০৪, পৃ. ৪৪)

আসলে ক্ষমতার সম্পর্কই শুধু নয়, আধিপত্যের অভিজ্ঞতা এবং উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আবহ নিম্নবর্গের চেতনার ধারণাটিকে বুঝতে সাহায্য করে। নিম্নবর্গের ইতিহাস সম্পর্কে রণজিৎ গুহ যে বিশেষ তাত্ত্বিক দিকগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা নিম্নরূপ-

- ঔপনিবেশিক সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মধ্যে প্রভু ও অধীনের সম্পর্কটি যে বিশিষ্ট রূপে প্রকট হয় তা শোষক-শাসিতের সম্পর্ক।
- ঔপনিবেশিক সমাজে নিম্নবর্গের ইতিহাসে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বলে কিছু নেই। পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজের মতো সেখানেও অর্থনীতির অন্তর্গত সব সম্পর্ক আসলে ক্ষমতার সম্পর্ক বা স্পষ্ট করে বললে রাজনীতির সম্পর্ক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত।
- নিম্নবর্গের অন্তর্গত সমস্ত জাতি ও শ্রেণিকে সচেতনভাবে নিম্নবর্গের ইতিহাসের আলোচনায় স্থান দিতে হবে। বিশেষ করে ঔপনিবেশিক সমাজে প্রভুত্ব ও অধীনতার বিষয়টি যাদের জীবনে প্রবল অর্থাৎ আদিবাসী, নিম্নবর্ণ ও নারীদের প্রতি উল্লেখযোগ্যভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। তবেই উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গের অপরায়ন পদ্ধতির সঠিক বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে।

- নিম্নবর্গের ইতিহাস আলোচনায় অধীনতার চরিত্রটির স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কারণ প্রভুত্ব-অধীনতা সম্পর্কটি বৈপরীত্যের সূত্রে বাঁধা। অধীনতাও একটি দ্ব্যণুক সত্তা যা সহকারিতা ও প্রতিরোধের বৈপরীত্যে গড়া। নিম্নবর্গের ইতিহাসে অধীনতার এই দুই বৈপরীত্য সক্রিয়ভাবে উপস্থিত। অবস্থাভেদে কখনো সহকারিতা আবার কখনো প্রতিরোধ গড়ে ওঠে নিম্নবর্গের মধ্যে। তাই শুধুমাত্র প্রতিরোধকেই নিম্নবর্গের একমাত্র চৈতন্য ধরে নেওয়া ঠিক হবে না।
- নিম্নবর্গের চৈতন্যের আরেকটি লক্ষণ হল তাদের ধর্মভাব। ধর্মভাব বলতে ধর্মীয় সংস্কার বা দৈব আরাধনা নয়, ধর্মভাব বলতে সেই চেতনা যা জড় ও জীবের সত্তার সঙ্গে বাস্তবের ভাবনাকে যথার্থ ভাবে ধারণার মধ্যে আনতে পারা। এই ধারণা আনতে না পারাই নিম্নবর্গের রাজনীতির ব্যর্থতা ও প্রধান উপাদান।

নিম্নবর্গের চেতনার মধ্যে একদিকে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা ও অন্যদিকে বাস্তবে সেই আশা সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব ও দুর্বলতার এই দ্বন্দ্বই তাদের চিন্তা-চেতনার ধর্মভাবকে কায়েম করে রেখেছে। শুধু তাই নয়, রণজিৎ গুহ এমন এক ইতিহাস রচনার দাবি করেছেন যেখানে নারীরা সমাজের আংশিক কণামাত্র নয়, যারা ঔপনিবেশিক ভারতে আদিবাসী বা কৃষক আন্দোলনের অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনাকালে অর্থনৈতিক কাঠামোয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রাখার জন্য যে শাসক ও শোষিতের সম্পর্ক বজায় থাকে এবং শাসক দ্বারা শোষিতকে বঞ্চনা ও নিপীড়িত করার যাবতীয় সমস্যাগুলিকে বিশেষ করে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত বলে রণজিৎ গুহ মনে করেন। অন্যদিকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ ধারণা ও নিম্নবর্গের ইতিহাস বিশ্লেষণ সম্পর্কে বলেন-

> 'এর সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয়েছে সামাজিক সম্পর্কের সেই সমতলে যেখানে ক্ষমতাই হল মূল কথা। অর্থাৎ যেখানে প্রভুত্ব/ অধীনতার এক বিশিষ্ট কাঠামোর মধ্যে সামাজিক সম্পর্কটি বাঁধা থাকে। সুতরাং উচ্চবর্গ/ নিম্নবর্গ ধারণাটির অবস্থান উপাদান সম্পর্কের সমতলে নয়। বরং বলা যায়, ঐতিহাসিক বিবর্তন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শ্রেণীদ্বন্দ্বের অসম বিকাশকে চিত্রিত করার প্রয়োজনে উপাদান সম্পর্কের সম্পূরক একটি ধারণা এটি। ফলে উচ্চবর্গ/ নিম্নবর্গের বিশ্লেষণ পদ্ধতি উৎপাদন- রীতির ধারণাটিকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না।' (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.৭)

প্রাসঙ্গিকভাবে বলতে হয়, পার্থ চট্টোপাধ্যায় ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর "More on Modes of Power and the Peasantry" প্রবন্ধে। তিনি মার্কসীয় তত্ত্ব ও ফুকোর ক্ষমতার ধারণার প্রসঙ্গ টেনে ক্ষমতার বিভিন্ন রীতি বা প্রথাগুলিকে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন।

> "I defined three modes of power which could exist, even coexist, in a perticular state formation. These modes are distinguished in terms of the basis of specification of the 'property' connection (the relations of production) in the ordered and the repeated performance of social activities, i.e, the

perticular pattern of allocation of rights or entitlements over material objects…within a definite system of social production. The three modes of power I called the communal, the feudal and the bourgeois modes." (Guha (ed.) 1983, p.317)

সমাজ কাঠামোর সমতলে যেখানে ক্ষমতাই মূলকথা সেখানে ক্ষমতার বিভিন্ন প্রথার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র গঠনের রীতি নির্দিষ্ট হয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় কথিত সাম্প্রদায়িক ক্ষমতা, সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতা ও বুর্জোয়াসি ক্ষমতা হল সেই রাষ্ট্র গঠনের রীতি বৈশিষ্ট্য। ঐতিহাসিকগণ যতই সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য বা বিরোধিতা করুন না কেন, সেই ইতিহাস থেকে নিম্নবর্গের চেতনাকে উদ্ধার করতে গেলে উচ্চবর্গ ধারণাটিকেও সমান গুরুত্ব দিতে হয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন,

'উচ্চবর্গ/ নিম্নবর্গ শব্দ দুটি শাসক শ্রেণী/ শাসিত শ্রেণীর প্রতিশব্দ হিসেবেও সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা চলে না। কারণ অসম বিকাশের অবস্থায় সামাজিক ক্ষমতা সবসময় আইন বদ্ধ রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা হিসেবে প্রতিপন্ন নাও হতে পারে।' (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.৭)

সাবঅলটার্ন স্টাডিজ-এর প্রাথমিক সমালোচনায় শাহিদ আমিন, ডেভিড হার্ডিম্যান, ডেভিড আর্নল্ড, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, গৌতম ভদ্র, স্টিফেন হেনিংহ্যাম, এন. কে চন্দ্র প্রমুখেরা ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষক বিদ্রোহ ও চেতনা, মার্ক্সবাদের নিরিখে রাজনৈতিক অবস্থানের পর্যালোচনা, নিম্নবর্গের অবস্থানের তাৎপর্য এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিম্নবর্গের ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনার মধ্য দিয়ে উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গের অবস্থান, অবদান ও ইতিহাসের নায়ক হিসাবে নিম্নবর্গকে প্রদর্শিত করা হয়েছে।

১.৪.৩.২ মধ্য পর্বের তাত্ত্বিক-সমালোচনা ও অভিমত

নিম্নবর্গের সমালোচকদের মধ্যে বিশেষভাবে যার নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন অধ্যাপক ও বিশিষ্ট তাত্ত্বিক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর চতুর্থ খণ্ডে (১৯৮৫) তাঁর 'Subaltern Studies : Deconstructing Historiography' এবং সেই বছরই প্রকাশিত তাঁর বিতর্কমূলক "Can the Subaltern speak?" প্রবন্ধ দুটি নিম্নবর্গের ইতিহাস সমালোচনায় বাঁক বদল করেছে। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রথম পর্বের কাজের সবচেয়ে মৌলিক সমালোচনা করেছিলেন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর আলোচ্য দুটি প্রবন্ধে। তিনি প্রশ্ন তুললেন,

''ইতিহাস যখন দেখিয়ে দিচ্ছে যে নিম্নবর্গ মানেই 'কোনো এক আদর্শ থেকে বিচ্যুতি', তখন নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা আলাদা করে বিশুদ্ধ কৃষকচৈতন্য অথবা একান্তভাবে স্বতন্ত্র নিম্নবর্গের রাজনীতিকে কেন প্রদর্শিত করতে চাইছেন? ..নিম্নবর্গের ইতিহাসে 'নিম্নবর্গ'-কে "আর-একটি সার্বভৌম কর্তার পোশাক পরিয়ে ইতিহাসের নায়ক হিসেবে উপস্থিত করার প্রয়োজন কী? … ঐতিহাসিকের লেখার ভেতর দিয়ে নিম্নবর্গ তার নিজের কথা বলবে, এটা তো নিতান্তই

গল্পকথা।...আসলে তো ঐতিহাসিক নিম্নবর্গের প্রতিনিধিত্ব করছেন মাত্র।...নিম্নবর্গ তার নিজের কথা কখনোই বলতে পারে না।" (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.১৭)

স্পিভাক তাঁর প্রবন্ধে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর গবেষণা পর্যবেক্ষণ করে নিম্নবর্গের সমালোচকদের কাছে আশা করেছেন যে তারা নিম্নবর্গের অবস্থান নির্ধারণে জোর না দিয়ে বরং উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গের নির্মাণ প্রক্রিয়া নিয়ে বিশদে আলোচনা করুন। কারণ সমগ্র সমাজে নিম্নবর্গের স্বকীয় কণ্ঠস্বরকে পৃথকভাবে সন্ধান করা অর্থহীন। (Ashcroft (ed.) 1995, p.27) অন্যদিকে স্পিভাক নিম্নবর্গের চেতনাকে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন সমালোচকেরা চেতনা ব্যাখ্যার পক্ষে সংবেদনশীল। তাঁদের মতে নিম্নবর্গীয় চেতনার মধ্যে রয়েছে আত্ম-প্রতিরোধ এবং একই সঙ্গে সম্মিলিত হওয়ার চেতনা যাকে কাজে লাগিয়ে উচ্চবর্গ কৌশলগত কাঠামোয় তাদের চালিত করে। স্পিভাক তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধে বলেন,

> "The strategy becomes most useful when 'consciousness' is being used in the narrow sense, as self-consciousness. When 'consciousness' is being used in that way, Marx's notion of unalienated practice or Gramsci's notion of an 'ideological coherent', 'spontaneous philosophy of the multitude' are plausible and powerful." (Landry (eds.) 1996, p.216)

অন্যদিকে, "Can the Subaltern speak?" প্রবন্ধটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটি জোরালো বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে নিম্নবর্গের ইতিহাস আলোচনায়। কারণ স্পিভাক মনে করেন নিম্নবর্গের নিজস্ব কোনো স্বর নেই এবং এক্ষেত্রে মহিলারা আরো বেশি অসহায় ও অবহেলিত। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর বিতর্কমূলক মন্তব্য 'The subaltern cannot speak' (Chakraborty Spivak 1985, p.118) অনেকগুলি অন্তর্নিহিত অর্থ বহন করে। আসলে নিম্নবর্গের সে ক্ষমতা রয়েছে যার দ্বারা কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য যে কোনো পর্যায়ে তারা যেতে পারে। আসল সমস্যাটি রয়েছে প্রাপকের মধ্যে কারণ তিনি প্রেরকের কথা শোনার জন্য প্রস্তুত নন বা বলা ভালো প্রাপক বার্তা শোনার জন্য আগ্রহী নন। অর্থাৎ প্রেরকের বার্তাটি 'ডিকোড' করার মতো অবস্থানে প্রাপক নেই। তাই একজন নিম্নবর্গ যখন কথা বলতে চেষ্টা করে তখন তার মধ্যে সুপ্ত যোগাযোগের উপাদান বিশেষভাবে কাজ করে এবং শব্দের উপাদান বিকৃত হয়ে বার্তার যথাযথ অভ্যর্থনা প্রাপকের কাছে পৌঁছয় না। এমন ঘটনা সামজিক কারণেই ঘটে এবং অবশ্যই একটি অঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক দিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় কারণগুলিও এর জন্য দায়ী। যখন একজন নিম্নবর্গ কথা বলে তখন তার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গটি খুব কমই কার্যকর হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, মহিলারা চারদেওয়ালের মধ্যে বন্দি ছিল, তাদের কথা বলার সুযোগ ছিল কম, বাইরের জগৎ ও শিক্ষার আলো থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। অশিক্ষা বা

নিরক্ষরতা তাদের মনে সর্বদা একপ্রকার হীনমন্যতা সৃষ্টি করত। শিক্ষার অভাবে তারা মার্জিত ও সুসজ্জিত ভাষা প্রয়োগ করে অপরকে প্রভাবিত করতে পারত না। এমনকি তারা কিছু বলার পরেও বার্তাটির লেনদেন সঠিকভাবে হয় না এবং অন্যদেরকেও তাদের অবস্থান বোঝাতে পারে না। ক্ষতি বা বিপদের আশঙ্কায় গর্জনকারী উচ্ছ্বাসের মধ্যে মহিলারা কথা বলার চেষ্টা করতে পারে কিন্তু অপরের কাছে তার কথা শোনার ধৈর্য নেই। যখন বক্তা শ্রোতাকে বোঝাতে সক্ষম হয় না তখনই যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়। নিম্নবর্গকে কথা বলার সুযোগ ও স্থান দেয় না সমাজ।

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের আলোচ্য প্রবন্ধের 'স্পিক' (Speak) শব্দটির সঙ্গে কোনো কোনো সমালোচক 'টক' (Talk) শব্দটির তুলনা করার ফলে আরো একটি বিতর্ক সৃষ্টি হয়। স্পিভাক তাঁর প্রবন্ধের ধারণাটিকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে অনুশোচনা করেছেন। আসলে 'speak' এবং 'talk' শব্দ দুটি একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ কমপক্ষে একজন শ্রোতার সামনে যখন কথা বলা হয় তখন 'speak' শব্দটি অনেক বেশি সক্রিয়ভাবে অবস্থান করে, সেখানে বক্তার স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষণীয়। শব্দটিতে ব্যক্তির অন্তরের যোগাযোগ স্থাপন হয় এবং তার প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিক। এই ধরনের যোগাযোগে একজন ব্যক্তি তার মুখের ভঙ্গিমা ও প্রতিক্রিয়া দেখানোর সুযোগ পায় যাতে সেই যোগাযোগ আরো বেশি প্রভাবিত হয়। অন্যদিকে 'talk' শব্দটি আন্তঃব্যক্তি যোগাযোগের আওতায় পড়ে। এটি একটি অভিনয় নিজের সঙ্গে কথা বলার। এ জাতীয় অভিব্যক্তিগুলি অপরের দ্বারা শোনার নয়। যেমন- ধ্যান, প্রার্থনা প্রভৃতি। (Landry (eds.) 1996, p.215) শুধু তাই নয় 'speak' শব্দের বদলে 'talk' শব্দের ব্যবহারের ফলে যে সমস্যার উৎপত্তি হয় সেদিকেও তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। ডোনা ল্যান্ড্রি ও গেরাল্ড ম্যক্লিন নেওয়া সাক্ষাৎকারে স্পিভাক বলেন,

> "Problems arise if you take this 'speak' absolutely literally as 'talk'. There can be and have been attemps to correct me by way of the fact that some of the women on the pyres did actually utter. Now I think that is a very good contribution, but it really doesn't actually touch what I was trying to talk about."
> (Landry (eds.) 1996, p.291)

সমালোচক রোসালিণ্ড ও'হ্যানলন-এর মতে, ঔপনিবেশিক ভারতে নিম্নবর্গের পরাধীনতার ধারণা, অধীনতার অভিজ্ঞতা এবং নিম্নবর্গ দ্বারা সম্মিলিত প্রতিরোধ 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-প্রকল্পটির একটি প্রধান আলোচনার দিক তৈরি করেছে। তাঁর মতে এই আলোচনার মূলে একধরনের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা ও নিম্নবর্গের একটি প্রতিরোধী উপস্থিতি খুঁজে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজনীয়তার মধ্যে নিম্নবর্গের অনন্যতা সংরক্ষণ করার প্রবণতা রয়েছে। তিনি মনে করেন, 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রাথমিক পর্বের

আলোচনায় ঔপনিবেশিকতা, জাতীয়তাবাদ ও মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে নিম্নবর্গ ও নিম্নবর্গের রাজনৈতিক চেতনা, ও তাদের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধকে পৃথকভাবে আবিষ্কার বা পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে সমালোচকেরা নিম্নবর্গের নারী ও নারীবাদ, জাতিভেদ প্রথা, তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে ততটা গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেননি প্রাথমিক পর্যায়ে। (Ludden (ed.) 2002, p.149) অন্যদিকে তিনি রণজিৎ গুহ কথিত উচ্চবর্গ দ্বারা নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার প্রত্যাখ্যান, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষমতা প্রসঙ্গে মতামত, নিম্নবর্গের রাজনৈতিক চেতনা বিষয়ক আলোচনা ও সর্বোপরি ‘তল থেকে ইতিহাস’ রচনার প্রসঙ্গ টেনে যা কিছু সত্য ও তথ্য ইতিহাসে আড়াল করা হয়েছে যা আসলে নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনায় বাধা দান করে সেই বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন। বিশেষত নিম্নবর্গীয় নারীকে ইতিহাসে কোনো জায়গা দেওয়া হয়নি যা একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন। ফলে তিনি নিম্নবর্গের সমালোচকদের কর্তব্য হিসাবে আশা করেন,

> “The Subaltern contributors would, I think, accept the argument that their won project has been cast in these terms : that they have come together in an effort to recover the experience, the distinctive cultures, traditions, identities and active historical practice of subaltern groups in a wide variety of settings- traditions, cultures and practice which have been lost or hidden by the action of elite historiography.” (Ludden (ed.) 2002, p.142-43)

এছাড়াও জিম মেসেলস, কে. শিবরামকৃষ্ণন, ফ্রেড্রিক কুপার, হেনরি শয়ারজ প্রমুখ সমালোচকেরা যথাক্রমে ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’-এ নিম্নবর্গের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি, ইতিহাস ও নৃবিজ্ঞানের নিরিখে নিম্নবর্গের অবস্থান, ঔপনিবেশিক আফ্রিকার ইতিহাসের সঙ্গে ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’ এর বিভেদ ও যোগাযোগ এবং নিম্নবর্গের রূপকায়িত ইতিহাস বিষয়ক আলোচনা করেছেন যা পরবর্তীকালে ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’এর আলোচনাকে একাডেমিক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে।

১.৪.৩.৩ সাম্প্রতিক তাত্ত্বিক-সমালোচনা ও অভিমত

‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’-এর সাম্প্রতিক সমালোচনায় দীপেশ চক্রবর্তী, কে.বালগোপাল, বিনয় বাহাল, সুমিত সরকার প্রমুখ সমালোচকেরা তাদের মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ ও যুক্তি পরামর্শ প্রদান করেছেন। বিশেষ করে সুমিত সরকারের ‘The Decline of the Subaltern in Subaltern Studies’ (Chaturvedi (ed.) 2000, p.300) প্রবন্ধটি সমালোচনার জগতে বহুচর্চিত ও আলোচিত হয়েছে। ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনায় ভারতীয় সমাজে সুবিধাবঞ্চিত কৃষক, আদিবাসী এবং শ্রমিক বা কর্মীরা আলোচ্য বিষয় ছিল। যেখানে গ্রমাশির ধারণা, মার্ক্সীয় ধারণা সম্পৃক্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। কিন্তু আজ

আলোচ্য প্রকল্পটি পশ্চিমী-সমালোচনার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ঔপনিবেশিক শক্তি ও জ্ঞানের প্রভাবশালী মূল্যবান বিকল্প হিসাবে আলোচিত হচ্ছে।

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' প্রকল্পের দুই দশক কেটে যাওয়ার পরও 'সাবঅলটার্ন' শব্দটির অর্থগুলির স্থানান্তরিতকরণ ও আভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণের জন্য সমালোচকেরা কেন এত বেশি আশাবাদী বা নিম্নবর্গ বিষয়টি একটি ভিন্ন বিতর্কিত প্রসঙ্গ সত্ত্বেও 'সাবঅলটার্ন' শব্দটিকে কেন ধরে রাখার প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে—এই জিজ্ঞাসা ছিল সমালোচক সুমিত সরকারের। (Chaturvedi (ed.) 2000, p. 305) আশি দশকের গোঁড়ার দিকে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' এর আলোচনা গোঁড়া মার্কসবাদী অনুশীলন ও একটি তীব্র সমাজতান্ত্রিক মার্ক্সীয় দিগন্ত ধরে রাখার সঙ্গে মিলিত ছিল।

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' এর শুরুতেই কোনো কোনো সমালোচক অনুভব করেছিলেন পূর্বসূরিদের সমালোচনা ও তাদের দাবি থেকে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করার। ফলে অনেকেরই মনে হতে পারে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' এর কাজ অনেকটা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করা, কিন্তু তা আসলে ইতিহাসের বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের সংকল্প। একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কৃষকের বিদ্রোহী-চেতনা, অন্তর্নিহিত কাঠামো ও ঔপনিবেশিক নিয়মের অনালোচিত, আড়াল করা ইতিহাসে আলো ফেলেছে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'।

সমালোচক সুমিত সরকার তাঁর 'The decline of the Subaltern in Subaltern Studies' প্রবন্ধে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর মতামতগুলির সঙ্গে কিছু ক্ষেত্রে বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতের অভিমুখ মূলত দুটি।

প্রথমত,

> "…for it needs to be imphasized that the bulk of the history written by mordern Indian historians has been nationalist and anti-colonial in content, at times obsessively so. Criticism of Western cultural domination is likewise nothing particularly novel….

দ্বিতীয়ত,

> Here the second kind of misrecognition comes in, for in the Western context there is certain, though much exaggerated, novelty and radicalism in the saidian exposure of the colonial complicity of much European schoralship and literature. Such blindness has been most obvious in the discipline of literary studies, in the West as well as in the ex-colonial world, and it is not surprising that radically inclined intellectuals working in this area have been perticularly enthusiastic in their response to late Subaltern Studies. " (Chaturvedi (ed.)2000, p.314-15)

তাহলে এ পর্যন্ত আলোচনায় প্রশ্ন আসে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' প্রকল্পটি আজ কোন অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে? বিভিন্ন সমালোচকবৃন্দের মননঋদ্ধ আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' প্রকল্পটির আসল কাজটি বুঝতে হলে এর মধ্য থেকে একটি বিষয় উঠে আসে –

> "The original project- as understood here as one that effects a relative separation between the history of capital and that of power- has been developed and furthered in the work of the group."
> (Schwarz (eds.) 2005, p.480)

আলোচ্য প্রকল্পের প্রথম দুটি খণ্ডে ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষক-বিদ্রোহের চেতনার স্বকীয়তা ও স্বতন্ত্রতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রণজিৎ গুহ দেখিয়েছেন, ঔপনিবেশিক ভারতে গণআন্দোলন ও কৃষক বিদ্রোহের স্বকীয় চেতনা, পার্থ চট্টোপাধ্যায় রবার্ট ব্রেনারের সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদ উত্তরণের দৃষ্টি ভঙ্গিতে নিম্নবর্গের বিচার করতে চাইলে তাঁর প্রতিউত্তরে মিশেল ফুকোর ক্ষমতার ধারণার উল্লেখ করে ঔপনিবেশিক ভারতে ক্ষমতার স্তরায়ন আলোচনার করার চেষ্টা করেছেন, শুধু তাই নয়, তিনি বিশদে রণজিৎ গুহের অভিমতের রেশ টেনে ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষকচেতনা ও নারীর অবস্থান বিষয়ক আলোচনা করেছেন, ডেভিড আর্নল্ড দেখান ১৯২৪-৩৯ সালে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে গুডেন রাম্পার উত্থান কাহিনি ও তাদের প্রতিবাদী চেতনাকে। ডেভিড হার্ডিম্যান দেখিয়েছেন পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোয় ঔপনিবেশিক ভারতের গুজরাট রাজ্যে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, গৌতম ভদ্রের আলোচনায় উঠে এসেছে আঠারো ও উনিশ শতকের বঙ্গদেশের কৃষক সমাজ, জ্ঞান পাণ্ডে আলোচনা করেছেন ১৯১৯-১৯২২ সালে অযোধ্যার কৃষক বিদ্রোহ তাদের স্বকীয় চেতনা, দীপেশ চক্রবর্তী লিখেছেন ১৮৯০-১৯৪০ সাল পর্যন্ত ভারতের শ্রমজীবীর অবস্থান, সরকারি কর্মচারী এবং কলকাতার পাটকল শ্রমিকদের অবরোধ বিরোধ সম্পর্কে। আলোচ্য এই লেখাগুলি প্রকল্পটির কার্যকারিতা ও ব্যাখ্যামূলক ঐতিহাসিক উদাহরণ যা সম্ভবনাময় একটি মৌলিক তাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক দিক গড়ে তুলেছে। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর উদ্দেশ্য ও তাত্ত্বিক পরিসরের শেষ টানা যেতে পারে ঐতিহাসিক দীপেশ চক্রবর্তীর মন্তব্য দিয়ে।

> "At the same time, it has to be acknowledge that Subaltern Studies has exceeded the original historiographical agenda that it set for itself in the early 1980s. The series, as I said at the outset, now has both global and even regional locations in the circuits of schoralship that it traverses. This expansion beyond the realms of Indian history has earned for the series both praise and criticism which fall outside the scope of the present discussion. The point of this exercise has been to rebut the charge that Subaltern Studies lost its original way by falling into the bad company of postcolonial theory. I have sought to demonstrate-through a discussion of what Guha (ed.) wrote in

the 1980s- some necessary connection between the original aims of the Subaltern Studies and current discussion of postcoloniality. ” (Schwarz (eds.) 2005, p. 480)

১.৫ নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চায় নিম্নবর্গীয় চেতনা

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' যদি কেবল 'তল থেকে ইতিহাস' লেখার পরিকল্পনা গ্রহণ করত তাহলে এর মধ্যে কোনো অভিনবত্ব থাকত না। আমরা লক্ষ করলাম, 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' শুধুমাত্র নিম্নবর্গচর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আলোচনা যত অগ্রসর হয়েছে ততই উক্ত ইতিহাসচর্চার মধ্যে ঔপনিবেশিকতা, উত্তর ঔপনিবেশিকতা, আধুনিকতা, উচ্চবর্গ বা অভিজাতদের সঙ্গে নিম্নবর্গের সম্পর্ক, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামোয় নিম্নবর্গের অবস্থান, উচ্চবর্গের রাজনীতির সঙ্গে নিম্নবর্গের রাজনীতির পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য এবং বিশেষ করে উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গের নির্মাণ কীভাবে করা হয়েছে—সেই বিষয়গুলি উঠে এসেছে।

আমরা জানি নিম্নবর্গের সমালোচকরা কখনো এই দাবি করেননি যে- তারা কেবল নিম্নবর্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে ইতিহাস রচনা করবেন। এমনটা হলে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার কোনো অর্থই থাকত না। কিন্তু তারা শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ক্ষমতা ও অধীনতার সম্পর্কসূত্রে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি পুঁজিবাদ ও শ্রমের দ্বন্দ্ব প্রদর্শিত করে ঔপনিবেশিক ভারতীয় সমাজে সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তাবাদ, রাজনীতি ও নারীর অবস্থান বিষয়ক যাবতীয় তথ্য অনুসন্ধান করেছেন।

নিম্নবর্গের স্বকীয় কণ্ঠস্বর অনুসন্ধানকালে ঐতিহাসিকগণ নিম্নবর্গের দিকে ঝুঁকলেও 'ইতিহাসের নায়ক' হিসেবে নিম্নবর্গকে প্রতিপন্ন করা তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না বরং উচ্চবর্গের দ্বারা নিম্নবর্গের নির্মাণ কীভাবে ঘটছে তা মূল বিষয় হয়ে দাঁড়াল। ফলে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' শুধু তল থেকে ইতিহাস লেখার গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে উচ্চবর্গের ক্ষমতাচর্চার বিষয়ও হয়ে উঠল।

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এ নিম্নবর্গীয় চেতনা বিষয়ক আলোচনাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক পদ্ধতির পার্থক্য এবং নিম্নবর্গীয় চেতনার নিজস্বতা বিষয়টি উঠে আসে। প্রশ্ন আসে, নিম্নবর্গের রাজনীতির এই স্বতন্ত্রতা কোনো নিয়মে বা সূত্রে নির্ধারিত হয়? এর উত্তর দিয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

"নিম্নবর্গের রাজনীতির চরিত্র নির্ধারিত হচ্ছে নিম্নবর্গের নিজস্ব চেতনার রূপরেখা অনুসারে। সেই চেতনা গড়ে উঠেছে অধীনতার অভিজ্ঞতা থেকে। দৈনন্দিন দাসত্বও, শোষণ আর বঞ্চনার মধ্যেও নিজের অস্তিত্বটুকু বজায় থাকার

সংগ্রামের ভেতর দিয়ে। ... ঐতিহাসিক নথিপত্রে নিম্নবর্গের চেতনার সরাসরি সাক্ষ্য প্রায় কোথাওই পাওয়া যায় না। কারণ সেই নথি তৈরি করেছে উচ্চবর্গেরা।" (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.১২)

অর্থাৎ নিম্নবর্গীয় চেতনাকে ঐতিহাসিকেরা পৃথক হিসেবে দেখতে চান কারণ অধীনতার অভিজ্ঞতা কেবল নিম্নবর্গেরই রয়েছে, তা উচ্চবর্গের নেই এবং নিম্নবর্গীয় চেতনার স্বকীয়তা ধরা পড়ে তাদের রাজনৈতিক পদক্ষেপ ও সম্মিলিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে। উচ্চবর্গের ঐতিহাসিকেরা নিম্নবর্গের এই চেতনাকে অস্বীকার করে বা অজান্তেই উচ্চবর্গীয় চেতনার কাঠামোয় নিম্নবর্গীয় চেতনাকে পরিমাপ করতে চান। এই অবকাশে নিম্নবর্গীয় চেতনার বৈশিষ্ট্যগুলি দেখে নেওয়া যাক।

- নিম্নবর্গ চেতনা একই সঙ্গে আনুগত্য ও প্রত্যাখ্যানের দ্বান্দ্বিকতাকে প্রদর্শন করে।
- নিম্নবর্গ চেতনা একটি স্বতন্ত্র বিষয় হলেও অধীনতার অভিজ্ঞতার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সীমাবদ্ধ।
- নিম্নবর্গের চেতনাকে যে কেবল তার প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ সত্তা দ্বারাই চিহ্নিত করা যাবে এমনটা নয়, নিজ অস্তিত্ব রক্ষা ও বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের উচ্চবর্গের স্বার্থ অনুযায়ী চলতে দেখা যায়।
- নিম্নবর্গের চেতনায় ধরা পড়ে ধর্মভাব।
- নিম্নবর্গ তার নিজস্ব চেতনার অবস্থা অপরকে বোঝাতে অক্ষম। অর্থাৎ নিম্নবর্গ নিজের কথা অপরের কাছে প্রদর্শন করতে পারে না বা করতে পারলেও অপরের কাছে তা বোধগম্য হয় না।
- নিম্নবর্গীয় চেতনার উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য হল সমাজ-কাঠামোয় নিজ অবস্থানকে নির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে তারা প্রাথমিকভাবে সম্মিলিত প্রতিবাদের সৃষ্টি করে এবং এর সফলতা ও বিফলতায় নির্ভর করে নিম্নবর্গীয়তার যা কিছু অপমানকর বা শ্রেণিগত উন্নতির পক্ষে বাধা সৃষ্টিকারী তা সব কিছুকেই প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করে যাতে তারা উন্নতশ্রেণির সমাজে স্থান পায়। অর্থাৎ যে যে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য থাকলে একজনকে নিম্নবর্গের আওতায় ধরা হয়, (যেমন নিচুজাত চিহ্নিতকারী পদবী, অনুন্নত সংস্কৃতি, নিরক্ষরতা, অমার্জিত ভাষা, নিম্নমানের পেশা, প্রান্তিকতা ইত্যাদি) তা সবই ত্যাগ, মার্জনা ও অর্জন করার মধ্য দিয়ে উন্নত সমাজের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা থাকে নিম্নবর্গীয় চেতনায়।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন আসে, নিম্নবর্গীয়তাকে প্রত্যাখ্যান করে কোনো ব্যক্তি বা বর্গ যখন উচ্চবর্গের সমকক্ষে পৌঁছতে যায় বা পৌঁছে যায় তখন কি সে আসলেই তার বা তাদের নিম্নবর্গীয়তাকে ঘোচাতে পারে? এর উত্তর দেওয়া অল্পবিস্তর জটিল হয়ে পড়ে কারণ যে বা যারা এতদিন নিম্নবর্গের মধ্যে নিজেদের অভ্যস্ত

করে রেখেছিল এবং যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাভিত্তিক পরিচয়ে জীবন অতিবাহিত করে আসছিল সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেও সে বা তারা জন্মগত পরিচয় ও অভ্যাসগত অভিজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। ফলে উচ্চবর্গের উন্নত সমাজের মাঝে পৌঁছেও তাদের সমক্ষে বা আড়ালে জন্মগত পরিচয়ের কারণে অপমানিত হতে হয়। আবার উল্টোদিকে নিম্নবর্গের প্রতি সামাজিকভাবে একধরনের প্রচ্ছন্ন সহানুভূতিও প্রদর্শন করা হয় যেখানে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় তারা যতই নিম্নবর্গের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসুন না কেন তাদের শিকড় আসলে নিম্নবর্গীয়তায় প্রোথিত। নিম্নবর্গের এই অধীনতার অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নেয় ভীতি, নিজেকে সর্বসমক্ষ থেকে আড়াল করে রাখার প্রবণতা ও নিরাপদ অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ নিম্নবর্গকে উচ্চবর্গের কাছে 'অলীক' করে তোলে। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর 'Can the subaltern speak?' প্রবন্ধে এ কথাই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যা কিনা নিম্নবর্গের ক্ষেত্রে একটি তাত্ত্বিক ধারণা তৈরি করেছে। তিনি মনে করেন,

> 'subaltern consciousness as self consciousness of a sort is what inhabits…
> subaltern consciousness as emergent collective consciousness is one of the main themes of these books.' (Landry (eds.) 1996, p.215)

নিম্নবর্গের চেতনা একধরনের স্বকীয় স্বচেতনা যা আবিষ্কার করা 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' প্রকল্পের প্রধান বিষয় এবং এই বিশিষ্ট চেতনার মধ্য দিয়েই নিম্নবর্গকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

১.৬ নিম্নবর্গ : সংজ্ঞা ও স্বরূপ সন্ধান

দুই দশক ধরে চলে আসা বিভিন্ন ঐতিহাসিক সমালোচনার পরও নিম্নবর্গের সর্বগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। প্রত্যেক সমালোচক নিজেদের মতো যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। ইতিপূর্বের আলোচনার ওপর নির্ভর করে এই স্থানে আমরা নিম্নবর্গকে সংজ্ঞায়িত করার পাশাপাশি তাদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সূত্রাকারে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব।

রণজিৎ গুহ 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'এর প্রথম খণ্ডে তাঁর 'On some aspects of the historioghraphy of colonial India' (Guha (ed.) 1982, p.i) প্রবন্ধে দক্ষিণ এশিয়ার ঔপনিবেশিক সমাজ প্রেক্ষাপটে 'Elite' ও 'Subaltern' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন। প্রবন্ধের শেষে নোট হিসাবে তিনি 'Elite' ও 'Subaltern Class' এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

> "The term 'elite' has been used in this statement to signify dominant groups, foreign as well as indigenous. The dominant foreign groups included all the non- Indian, that is, mainly British

officials of the colonial state and foreign industrialists, marchants, financiers, planters, landlords and missionaries." (Guha (ed.) 1982, p.8)

অর্থাৎ উচ্চবর্গ হল তারাই যারা ঔপনিবেশিক ভারতে বিদেশি, অ-ভারতীয়, প্রধানত ব্রিটিশ বিদেশি শিল্পপতি, মার্চেন্ট, পুঁজি বিনিয়োগকারী, ভূ-স্বামী এবং মিশনারি। অন্যদিকে তিনি 'People' ও 'Subaltern class' বলতে বুঝিয়েছেন,

"The terms 'people' and Subaltern classes' have been used as synonymous through-out this note. The social groups and elements included in this category represent the demographic difference between the total India population and all those whom we have deccribed as the elite. Some of these classes and groups such as the lesser rural gnntri, improverished landlords, rich peasants and upper middle peasants also 'naturally' ranked among the 'people' and the 'subaltern' could under certain Circumstanees act for the elite..." (Guha (ed.) 1982, p.8)

অর্থাৎ রণজিৎ গুহ 'Elite' ও 'Subaltern' শব্দ দুটি ঔপনিবেশিক সমাজ কাঠামোর মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য তৈরি করতেই ব্যবহার করেছেন। ঔপনিবেশিক ভারতে উপরিউক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী উচ্চবর্গ হিসেবে যারা চিহ্নিত হয়েছে তাদের বাদ দিলে যে বিপুল জনসংখ্যা অবশিষ্ট থাকে তারাই হল রণজিৎ গুহের সংজ্ঞায় 'People' ও 'Subaltern class'। অন্যদিকে তিনি বলেছেন,

"উচ্চবর্গ বলতে আমি বোঝাতে চাই তাদেরই, ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে যারা প্রভু শক্তির অধিকারী ছিল। প্রভু স্থানীয়দের দুভাগে ভাগ করা যায়-বিদেশি ও দেশি। বিদেশি প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যে যারা এই সংজ্ঞাসম্মত তারাও দু-ধরনের-সরকারি ও বেসরকারি।... ঔপনিবেশিক ভারতে যারা এই সংজ্ঞা অনুযায়ী উচ্চবর্গের অন্তর্গত, সমগ্র জনসংখ্যা থেকে তাদের বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তারাই নিম্নবর্গ। এর মধ্যে শহরের শ্রমিক ও গরিব, সর্বোচ্চ পদের আমলাদের বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তের বাকী অংশ ; গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরিব চাষি ও প্রায় গরিব মাঝারি নিম্নবর্গের মধ্যে গণ্য। তা ছাড়াও এই সংজ্ঞার শুদ্ধ অর্থে গণ্য হবে নির্বিত্ত ভূস্বামী, অপেক্ষাকৃত হীনবল গ্রামভদ্র, অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন মাঝারি কৃষক এবং ধনী কৃষকরাও-" (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.৩৩)

সমালোচক দীপেশ চক্রবর্তী 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর সপ্তম খণ্ডে 'সাবঅলটার্ন' বলতে বুঝিয়েছেন গৃহ কর্মচারী বা ভদ্রলোকের বাড়িতে ভাড়া করা চাকর সম্প্রদায়কে। তাঁর মতে,

"The physically harder part of domestic labour, one could reasonably assume, would have been performed by hired servents (or retainers) in many bhadralok families Subaltern groups whose histories we have not even began to imagine." (Chatterjee (eds.) 1993, p.62)

সমালোচক জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে তাঁর বহু আলোচিত 'The prose of Otherness' প্রবন্ধে 'সাবঅলটার্‌ন' বলতে অনেকটা দীপেশ চক্রবর্তীর সুরেই বলেছেন,

"... untouchables, immigrants, woman, children, domestic servants and a myriad others...backward section (unfortunately ill-educated insufficiently enlightned)...lower clasess and marginal groups." (Arnold (eds.) 1994, p.191-98)

অর্থাৎ তিনি অস্পৃশ্য, নারী, শিশু, গৃহ-কর্মচারী বা চাকর, অভিবাসী, অগণিত অপর, পিছিয়ে পড়া শ্রেণি, অশিক্ষিত মানুষ, নিচুজাতি ও প্রান্তিক মানুষদের নিম্নবর্গের আওতায় আনতে চেয়েছেন।

সমালোচক অশোক সেন 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'এর পঞ্চম খণ্ডে 'সাবঅলটার্ন'কে চিহ্নিত করেছেন এইভাবে,

> "The term 'subaltern' is used to denote the entire people that is subordinate in term of class, cast, age, gender and office, or in any other way. The historical processes of colonial India were marked by and admixture of precapitalist and capitalist relations, the nature of power, exploitation and popular rasistance in such a society was not, therefore amenable to adequate understanding in term of distinct class categories that can be clearly enunciated. " (Guha (ed.) 1987, p.203-4)

বিশিষ্ট তাত্ত্বিক ও সমালোচক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক 'Subaltern' কাকে বলা হবে এ বিষয়ে রণজিৎ গুহের সঙ্গে একমত হলেও তিনি নারী সমাজকে পৃথকভাবে নিম্নবর্গের আওতাভুক্ত করতে চেয়েছেন। যদিও তিনি মনে করেন,

> "…every moment that is noticed as a case of subalternity is undermine. We are never looking at the pure subaltern. There is, then, something of a not-speakingness in the very notion of subalternity."
> (Landry (eds.) 1996, p.289)

ফলে তিনি 'Subaltern' বলতে বুঝিয়েছেন-

> "I think the word 'subaltern' is losing its defenitive power because it has become a kind of buzzword for any group that wants something that it dose not have." (Landry (eds.) 1996, p.290)

অর্থাৎ তিনি সরাসরি নিম্নবর্গ বলতে কাকে বা কাদের বোঝানো হবে সে বিষয়ে আলোচনা না করে নিম্নবর্গের ধারণাটি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করতে চেয়েছেন যাতে নিম্নবর্গ কাকে বলা হবে সে ধারণাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে উপরিউক্ত তাত্ত্বিক অভিমতগুলির পরও নিম্নবর্গের স্পষ্ট কোনো সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা নিম্নবর্গের সম্ভাব্য একটি সংজ্ঞা নির্ধারণে অগ্রসর হতে পারি।

১.৬.১ নিম্নবর্গের সম্ভাব্য সংজ্ঞা

ঔপনিবেশিক ভারতে প্রভুত্বের অধিকারীর বিপরীতে অবস্থিত যারা ক্ষমতার সম্পর্কসূত্রে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অধীনতার চেতনাসম্পন্ন এবং পরবর্তীকালে যারা বৃহৎ অর্থে সমাজ-কাঠামোয় উচ্চবর্গের বিপরীতে কোনো এক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েও নিজেদের অধিকার আদায়ের বোধে সম্মিলিত প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ গড়ে তোলে তারাই নিম্নবর্গ। তা ছাড়া সাময়িক

শ্রেণিচেতনা সম্পন্ন এক বৃহৎ অংশ জুড়ে থাকা অপর, ব্রাত্য, প্রান্তিক, অন্ত্যজ জনগণ যারা নিজেদের স্বার্থ বা প্রয়োজনের কথা অশিক্ষা বা হীনমন্যতার কারণে উচ্চবর্গের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয় এবং উচ্চবর্গের কাছে যারা প্রায়শই অলীক হিসেবে বিবেচিত তাদেরই নিম্নবর্গের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে।

যদিও এক্ষেত্রে আমরা আলাদা করে নিম্নবর্গীয় চেতনাকে গুরুত্ব দিতে চাই। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ করেছি নিম্নবর্গকে ক্ষমতার সূচকে নির্ধারণ করা হলেও নিম্নবর্গের প্রতি উচ্চবর্গের এক ধরনের প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি কাজ করে, যা একজন নিম্নবর্গের নিম্নবর্গীয়তাকে প্রমাণ করে। আসলে একজন নিম্নবর্গ যখন উচ্চবর্গের সমকক্ষে পৌঁছতে চায় তখন সেই যাত্রাপথে তাকে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়। সেই সংগ্রাম উচ্চবর্গকে করতে হয় না। এক্ষেত্রে স্মরণে রাখতে হবে, একজন নিম্নবর্গ উচ্চবর্গের সমকক্ষে পৌঁছে গেলেও সমাজে তার নিম্নবর্গীয়তা মুছে যায় না। নিম্নবর্গীয় চেতনা তার মধ্যে বরাবর ক্রিয়াশীল থাকায় সে উচ্চবর্গের সমাজ সংস্কৃতি থেকে ধীরে ধীরে সরে আসে এবং সমাজে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এই ধারণাকে মনে রেখে আমরা নিম্নবর্গের বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে দৃষ্টি দিতে পারি।

১.৬.২ নিম্নবর্গের স্বরূপ

সামগ্রিক আলোচনায় নিম্নবর্গের যে বৈশিষ্টের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে তা আমরা আলোচ্য পরিচ্ছেদে সূত্রাকারে আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

- গ্রামশি তাঁর ‘প্রিজন নোটবুক’-এ পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় ‘সাবঅলটার্ন’ বলতে শ্রমিক শ্রেণিকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে সামাজিক ক্ষমতার এক বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিক শ্রেণি শোষিত ও শাসিত হয়। শুধু তাই নয়, শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অন্যান্য ঐতিহাসিক পর্বেও সমাজের এক মেরুতে প্রভুত্বের অধিকারী ডমিন্যান্ট শ্রেণি এবং অপর মেরুতে যারা অধীন সেই ‘সাবঅলটার্ন’ শ্রেণি অবস্থান করে।
- নিম্নবর্গ তাদের নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সামাজিক সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদানকে বেছে নেয় বলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে উচ্চবর্গের সঙ্গে তাদের একটি বিভেদ তৈরি হয়। ফলে জন্ম নেয় বিরোধ। এই বিরোধ থেকে তৈরি হয় নিম্নবর্গের এক ধরনের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ।
- উচ্চবর্গের চেতনার বিপরীতে নিম্নবর্গের চেতনাও কোনো না কোনোভাবে তার স্বকীয়তা ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়।
- নিম্নবর্গের চেতনা স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও পরাধীন। কারণ অধীনতার অভিজ্ঞতা নিম্নবর্গের মূল বৈশিষ্ট্য।

- বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গকে দেখা যায় নিষ্ক্রিয়, ভীরু, একান্ত অনুগত একটি জীব হিসেবে। অন্যে চালিত করলে তবেই যেন সে চলে। একমাত্র প্রকাশ্য রাজনৈতিক বিরোধ, বিশেষ করে বিদ্রোহের সময়ই শাসকগোষ্ঠী তাকে সক্রিয় প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রাহ্য করে।
- গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক মনে করেন, নিম্নবর্গ ধারণাটি গড়ে উঠেছে কোনো এক আদর্শ থেকে বিচ্যুতির প্রসঙ্গে।
- বিশিষ্ট সমালোচক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক-এর মতে, নিম্নবর্গ তার নিজের কথা কখনোই বলতে পারে না। কারণ তারা যা বলতে চায়, তা কর্তৃপক্ষ শোনার জন্য প্রস্তুত থাকে না বা শুনতে চায় না ফলে বক্তা যখন শ্রোতাকে বোঝাতে ব্যর্থ হয় তখন নিম্নবর্গের কথা বলার সুযোগ ও স্থান থাকে না।
- নিম্নবর্গ তাদের নিম্নবর্গীয়তা ঘোচানোর জন্য উচ্চবর্গকে তিরস্কার করলেও পরবর্তীকালে উন্নত ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে উচ্চবর্গের সমকক্ষে পৌঁছতে চায়।
- উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধার্মিক ও আদর্শগত দিক থেকে অমার্জিত অবস্থানে বিরাজ করে।
- নিম্নবর্গের শ্রেণিচেতনা ও বিদ্রোহ সংগঠনের চেতনায় একধরনের ধর্মভাব প্রাধান্য পায়। ফলে নিম্নবর্গ দ্বারা সংগঠিত বিদ্রোহ বা গণআন্দোলনগুলি কর্মসূচি, পরিকাঠামো ও আত্মবিশ্বাসের অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ব্যর্থ হয়ে যায়।
- নিম্নবর্গ যেহেতু উচ্চবর্গের অধীনতা ও ক্ষমতার মাপকাঠিতে বিচার্য সেহেতু নিজেদের অধীনতাবোধ নিম্নবর্গের মধ্যে একদিকে যেমন শ্রেণিচেতনার জন্ম দেয় তেমনই অন্যদিকে বর্গীয়প্রীতি ও সৌহার্দবোধ তৈরি করে।
- রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের স্বতন্ত্রতা থাকলেও এদের ভূমিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্পষ্ট নয়। জটিল ও বাস্তব সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে এরা অনেক সময়ই উচ্চবর্গের স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করে।

১.৭ সারাংশ

রণজিৎ গুহ বা গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের মতো তাত্ত্বিক-সমালোচকদের মতে সমাজ কাঠামোর তলদেশ থেকে ইতিহাস তুলে আনতে হলে সেই স্তরের বাস্তবতাকে চিনতে ও বুঝতে হবে। ফলে নিম্নবর্গকে তার সমাজ, ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান থেকে বিচার করার অবকাশ থেকে যায়। তাই এমন একজন ঐতিহাসিকের প্রয়োজন যিনি সেই তলদেশেরই একজন বাস্তব অভিজ্ঞতা

সম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে নিরপেক্ষভাবে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু বাস্তবে এমন ঐতিহাসিকের সন্ধান পাওয়া যায় না কারণ সেই রচনাকার প্রাথমিক দিকে নিরপেক্ষ থাকলেও পরবর্তীকালে নানা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে কোনো এক বিশেষ বর্গের পক্ষপাত করতে বাধ্য হন। ফলে নিরপেক্ষ সাক্ষী ও তথ্য সেভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না। তবে যদি আমরা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখা যাবে এমন কিছু সাহিত্যিক রয়েছেন যারা সমাজের সেই তলদেশে অবস্থান করে নিজেদের অভিজ্ঞতা সাহিত্যের আকল্পে সংরক্ষণ করেছেন এবং করছেন। হ্যাঁ, সেখানে কল্পনার আধিক্য রয়েছে কিন্তু সেটুকু অংশ বাদ দিলে একজন সাহিত্যিকের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না সহজে। ফলে সাহিত্যের আকল্পেও নিম্নবর্গীয় চেতনার সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্যরূপে পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সেই সংকল্পেই অগ্রসর হব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনার রূপরেখা

২. সূচনা

২.১ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গ

২.২ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গ

২.৩ স্বাধীনতার প্রাক্-পর্ব : কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের আকল্প নির্মাণ

২.৪ স্বাধীনতা-উত্তর কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের উত্থান : ‘অপর’ থেকে ‘প্রতিপক্ষ’-এ উত্তরণ

২.৫ সারাংশ

২. সূচনা

বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছেন ঠিকই কিন্তু সে শক্তি পৃথিবী সৃষ্টির সময় থেকেই ছিল। ঠিক তেমনই সমাজে নিম্নবর্গীয় চেতনা ও তত্ত্বের আবিষ্কার ১৯৮২ সালে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশের মধ্য দিয়ে হলেও নিম্নবর্গ সমাজে বরাবর ছিলই। সমাজের উচ্চবর্গের মানুষেরা বরাবর নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিম্নবর্গকে পায়ের তলায় পিষে মেরেছে। প্রাচীনকালে 'বর্ণ', 'শ্রেণি', 'পেশা' ও 'বিত্ত' নির্ভর অনগ্রসরতাকে ভিত্তি করে একদল মানুষকে সমাজ কাঠামোর তলদেশে রাখা হয়েছিল। কিন্তু আধুনিক যুগের পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোয় প্রধানত 'বিত্ত'গত ও 'ক্ষমতা'গত অনগ্রসরতা নিম্নবর্গের মূলসমস্যা হয়ে দাঁড়াল। এই সমস্যার কথা ইতিহাসে যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনই সাহিত্যেও। বিশেষত বাংলা কথাসাহিত্যে উপরিউক্ত সমস্যার চিত্র বিস্তৃতভাবে দেখা যায়।

আমরা জানি, ১৯৮২ সালে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গ-চর্চা শুরু হয়। কিন্তু প্রশ্ন আসে, বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের উত্থান কি তারপর? নিশ্চয়ই নয়। ঠিক যেমন ভাষার আগে ব্যাকরণ নয়, ঠিক তেমনই ইদানীং আমরা যাকে সাবঅলটার্ন, নিম্নবর্গ, অপর, ব্রাত্য, দলিত, প্রান্তিক, অন্ত্যজ যা-ই বলি না কেন; তার যোগসূত্র আসলে ১৯২৯-১৯৩৫ সালে লেখা আন্তনিও গ্রামশির 'প্রিজন নোটবুক'-এ উল্লেখিত 'সাবঅলটার্ন'-এর সঙ্গে নেই। বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের আকল্প নির্মাণের সূচনা হয়ে গিয়েছিল প্রাচীনকালেই। যার প্রতিফলন পরবর্তীকালে বিশেষ করে বাংলা কথাসাহিত্যে স্পষ্ট হতে শুরু করে। এক্ষেত্রে লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে একটি বিভাজনরেখা লক্ষ করা গিয়েছে। একদল লেখক এলিট শ্রেণির তরফদারি করলেন এবং আরেকদল নিম্নবর্গীয় সমাজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিম্নবর্গকে সহমর্মিতা ও যথার্থ বিবেচনার সঙ্গে তাদের সংকট-সমস্যাকে তুলে আনলেন। ফলে কথাসাহিত্যে একটি বৈষয়িক বৈচিত্র্য এল। সমাজে তথাকথিত শূদ্র, প্রান্তিক, অপর, দলিত, অন্ত্যজ হিসেবে পরিচিত মানুষগুলি সাহিত্যের মঞ্চে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আওয়াজ তুলতে শুরু করল বা বলা ভালো, বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের উত্থানের একটি আন্দোলন শুরু হল। কথাশিল্পে বিষয় উপস্থাপনে দেখা গেল দুটি ভাগ- (১) উচ্চবর্গের অপর হিসেবে নিম্নবর্গের নির্মাণ। (২) মুখ্য রূপে নিম্নবর্গ-প্রধান কথাসাহিত্য নির্মাণ।

বাংলা কথাসাহিত্যের উন্মেষ পর্ব অর্থাৎ প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' (১৮৬১-৬২) এবং বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের আখ্যানে কাহিনির প্রয়োজনেই নিম্নবর্গকে দেখা গিয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ প্রধান চরিত্র হিসেবে নয়। মেধা,

সহানুভূতি এবং সৃজনশীলতার ক্ষমতায় তাঁরা নিম্নবর্গকে কল্পনা করেছেন মাত্র। কিন্তু কল্লোল যুগ ও তৎপরবর্তীকালে কথাসাহিত্যে আমরা নিম্নবর্গকে স্বমহিমায় উঠে আসতে দেখেছি। নিম্নবর্গপ্রধান কথাসাহিত্য আজ বাংলা সাহিত্যে যে একটি বিশেষ স্থান দখল করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আসলে বাংলা সাহিত্যে আদিকাল থেকেই নিম্নবর্গের নিজস্ব কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছে- কোথাও ক্ষীণ, কোথাও প্রবল। বাংলা সাহিত্যের সূচনা লগ্ন থেকে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের উপস্থিতি কীরূপ- তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা আমাদের সামনে থাকলে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের স্থান কীভাবে প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে মঞ্চায়িত হল—সে ধারণাটি আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে। আলোচনার অবকাশে আমরা সেই দিকটি সংক্ষেপে দেখে নেব।

২.১ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গ

চর্যাপদের সময়কাল গবেষকদের মতে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী। ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা সাহিত্যের পথচলা শুরু হলেও সেখানে নিচুতলার মানুষ উপেক্ষিত নয়। বরং তাদের উপস্থিতি বিশেষভাবে রয়েছে চর্যাপদে। সেদিক থেকেও চর্যাপদের একটি আলাদা গুরুত্ব তৈরি হয়েছে নিঃসন্দেহে। পদকর্তারা স্বয়ং নিম্নবর্ণের বলে নিজেদের পরিচয় দেওয়ার মধ্যেও রয়েছে নিম্নবর্গকে আলাদা করে গুরুত্ব দেওয়ার আভাস। বিভিন্ন চর্যাপদে তৎকালীন সমাজচিত্র লক্ষ করা যায়, যেখানে অন্ত্যজ, প্রান্তিক মানুষদের ছবি উঠে এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ্য- ১০, ১৪, ১৮, ১৯, ২০, ২৫, ২৬, ২৮, ৪৫, ৫০ নং চর্যাপদ। যেমন- ১০ নং চর্যায় বলা হয়েছে, ডোম জাতীয় রমণী অস্পৃশ্য বলে নগরের বাইরে কুড়ে ঘরে তার স্থান, কিন্তু তার রূপ ব্রাহ্মণ জাতিকেও যেন ছুঁয়ে যায়।

> 'নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
> ছোই ছোই জাহ সো বাহ্ম নাড়িআ।। ধ্রু।।' (দাশ ১৯৯৭, পৃ. ১৩৭)

শান্তি পা-র ২৬ নং পদে ধুনুরিদের কথা বলেছেন।

> 'তুলা ধুণি ধুণি আঁসু রে আঁসু।
> আঁসু ধুণি ধুণি নিরবর সেসু।। ধ্রু।।' (দাশ ১৯৯৭, পৃ. ১৭৭)

এরকমই বিভিন্ন পদগুলি থেকে আমরা তৎকালীন সমাজের একটি চিত্রের পরিচয় পাই। যেখানে অন্ত্যজ-প্রান্তিক মানুষদের কথা উঠে এসেছে। লক্ষণীয়, প্রান্তিক-অন্ত্যজ মানুষগুলি কিন্তু কখনোই স্বতন্ত্র চরিত্র রূপে আসেনি, এসেছে সমাজচিত্রকে পূর্ণ করতে। সরাসরি চরিত্রে প্রতিপন্ন না হলেও তাদের উল্লেখ চর্যাপদের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে ত্বরান্বিত করেছে। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৫, পৃ. ১৫-১৬)

প্রাক্-মধ্যযুগের একমাত্র বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাস ভনিতাযুক্ত কাব্য ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’। গবেষকরা মনে করেন, পল্লিগ্রামের পরিবেশের দিকে তাকিয়ে গ্রাম্য রুচিতে ও নাটকীয়তায় গ্রামবাসীর চিত্ত বিনোদনের জন্য কবি এই কাব্যটি রচনা করেছিলেন। গ্রাম্য রুচিতে ও গ্রামবাসীদের জন্য কাব্যটি রচিত বলে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই উঠে এসেছে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা। কৃষ্ণ এখানে কোনো পৌরাণিক অবতার নয়, নিছক নিম্নশ্রেণির একজন রাখাল কামাতুর চরিত্র। রাধা, কৃষ্ণ, বড়ায়ি তিনটি চরিত্রকে কবি গোপজাতি ভুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন। গোপেরা সমাজের নিম্নশ্রেণির কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের চরিত্র বিশ্লেষণ ও পরস্পরের ভাষা ব্যবহারকে লক্ষ করলে তাদের সমাজের অন্ত্যজশ্রেণি বলেই মনে করা হয়। রাধার দুধজাত দ্রব্য বিক্রি করার বর্ণনা নিম্নবর্গের অবস্থানকেই স্পষ্ট করে। এইরকম শ্রমজীবী মানুষের চিত্র উঠে এসেছে কাব্যে। অন্যদিকে রাধার সংস্কারে তেলিনিরা অন্ত্যজ। তাদের তেল বেঁচতে যাওয়ার দৃশ্য দেখা অশুভ। সমগ্রকাব্যে অন্ত্যজ, নিম্নশ্রেণির সামাজিক চিত্রের পাশাপাশি অসংখ্য লৌকিক উপাদানও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। (ভট্টাচার্য ১৯৬৯, পৃ. ১১৫-১২৫)

২.২ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গ

মধ্যযুগে আমরা পেলাম অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবসাহিত্য, জীবনীসাহিত্য, লোকগাথা, গীতিকা, ইসলামী সাহিত্য প্রভৃতি। যেখানে মানুষের জন্য, মানুষের প্রয়োজনে, মানুষের কথাই লেখা হল আর সেই মানুষগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উঠে এল সমাজের নিম্নস্তর থেকে। মধ্যযুগের সাহিত্যের এই বিশাল পরিসর অন্বেষণ করলে দেখা যাবে সর্বত্রই কোনো না কোনোভাবে উঠে আসছে সমাজের নিম্নবর্গস্থিত মানুষ ও তাদের জীবন।

পাঁচালি গানের আকারে রামায়ণের প্রথম বাংলা ভাবানুবাদ করেছিলেন কৃত্তিবাস ওঝা। সমাজের সর্বস্তরের জন্য যে কাব্য লিখিত সেখানে স্বাভাবিকভাবে নিম্নস্তরের মানুষেরা বাদ পড়েনি। মূল রামায়ণে নিম্নশ্রেণির প্রসঙ্গগুলি সেভাবে উঠে না এলেও বাংলা ভাবানুবাদে রামের আর্য পরিবারকে বাদ দিয়ে যে রাক্ষস ও বানর সমাজ রয়েছে তারা সেই আর্যের কাছে ব্রাত্যশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ব্রাত্য হয়েও তারা আর্যদের কাছে হার মানেনি। আবার রাক্ষসদের মতো বানর সমাজ ততটা উন্নত নয়। অন্যদিকে ‘হরিশচন্দ্রের উপাখ্যান’-এ অন্ত্যজ জীবনের একটি চিত্র দেখতে পাই। নিম্নশ্রেণির হাড়িরা শূকর পালন করত, শ্মশানে শবদাহ করত। এই হাড়িরা আর্থিক দিক থেকে যতটা না নিম্নবর্গ তার থেকে অনেক বেশি সামাজিক স্বীকৃতির দিক থেকে। একজন রাজা নিয়তির চক্রে ক্ষমতা বিচ্যুত হয়ে হাড়িতে পর্যবসিত হয়ে

এই উদাহরণই স্থাপন করে যে ক্ষমতা স্থির নয়, ক্ষমতার পরিবর্তনে নিম্নবর্গের স্বরূপ পরিবর্তিত হয়। রামায়ণে যে সব অন্ত্যজবর্ণের মানুষের কথা আছে তারা সকলেই আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে নয়। যেমন গুহক-চণ্ডালরা অন্ত্যজ বর্ণের হলেও তাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। সমগ্র কাব্যেই চেড়ী, হাড়ি, গুহক-চণ্ডাল, শবর, কৈবর্তদের উল্লেখ রয়েছে।

কাশীরাম দাস অনূদিত 'মহাভারত'-এ নিম্নবর্গের উপস্থিতি সেভাবে না থাকলেও বাঙালি জীবনের সাধারণ চিত্র এখানে উঠে এসেছে। মহাভারতের আদিপর্বে মৎস্যগন্ধার কাহিনি প্রসঙ্গে তথাকথিত অন্ত্যজশ্রেণি কৈবর্তদের জীবনযাপনের উল্লেখ রয়েছে। একলব্যের অস্ত্র শিক্ষা প্রসঙ্গেও সমাজের নিষাদ শ্রেণির কথা এসেছে যারা ব্রাত্য বলে বিবেচিত। নিম্নশ্রেণির নিষাদ বংশের একলব্যের গুরুর প্রতি একনিষ্ঠতা, ভক্তির কোনো মূল্যই কেউ দেয়নি। আমাদের অবাক করেছে সমাজের উচ্চশ্রেণিরা কীভাবে নিম্নশ্রেণিদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। শুধু তাই নয়, কর্ণের প্রতি অবিচার আমরা ভুলব কী করে। সমাজ কাঠামোর নির্মম নিয়মে তারা ব্রাত্য থেকে গিয়েছে।

মঙ্গলকাব্যগুলি ছিল সমাজের বৃহত্তর অশিক্ষিত ও নিচু তলার মানুষদের কাছে আত্মতৃপ্তি ও সুধার নামান্তর। মূলত তিনধরনের প্রধান মঙ্গলকাব্য এই ধারাকে পুষ্ট করেছে- (১) মনসামঙ্গল (২) চণ্ডীমঙ্গল (৩) ধর্মমঙ্গল। নিম্নবর্গের ইতিহাস আলোচনায় বলা হয়েছে, উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ ধারণায় ক্ষমতাই হল মূল কথা। এই কথার প্রভাব দেখা গিয়েছে মনসামঙ্গলে। চাঁদ সওদাগর উচ্চবর্গ, ক্ষমতাবান, প্রভাবশালী ও উচ্চবর্ণের। কিন্তু মনসার কোপে যখন তিনি নিঃস্ব হলেন তখন বিত্তশালী জগাই মণ্ডলের কাছে তিনি অন্ন ভিক্ষা করেছেন। তার নির্দেশে চাঁদ সওদাগর ধান নিড়ানির কাজে নিযুক্ত হয়ে সমস্ত ধান গাছ কেটে জগাই মণ্ডলের কোপে পড়ে। প্রহার করা হয় চাঁদবেনেকে। অর্থাৎ প্রমাণিত হয় ক্ষমতা যতক্ষণ আমিত্ব বহন করে ততক্ষণ সে উচ্চবর্গ বা এলিট ক্লাস। ক্ষমতাচ্যুত হওয়া মানেই নিম্নবর্গের সামিল হওয়া। নিম্নবর্গের ইতিহাস- বারবার এ কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছে।

শুধু 'মনসামঙ্গল' নয়, 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও শ্রেণিবিভক্ত সমাজের ছবি স্পষ্ট। কালকেতুর গুজরাট রাজ্যে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র তো ছিলই, এছাড়া কবি মুকুন্দরাম নিম্নবর্গের নির্দিষ্ট পরিচয় তুলে ধরেছেন, যেখানে বৃত্তিনির্ভর নিম্নবর্গ যেমন- কুম্ভকার, তন্তুবায়, সালই, বারুই, নাপিত, ব্যাধ, ধীবর, ছুতোর, মাঝি, চণ্ডাল, চর্মকার, ডোম, হাড়ি ইত্যাদি ব্রাত্যশ্রেণির উল্লেখ করেছেন। নিম্নবিত্ত ও নিম্নবৃত্তির কালকেতু নিম্নবর্গ। কিন্তু দৈবক্রমে দেবী চণ্ডীর বরে সাতঘড়া মোহর পেয়ে হঠাৎ করেই অর্থনৈতিক

ক্ষমতা সৃষ্টি করে নিম্নবর্গ কালকেতুকে রাজা বানিয়ে উচ্চবর্গে পর্যবসিত করা হচ্ছে। কারণ দেবী চান উচ্চবর্গের পুজা পেতে, নিম্নবর্গের নয়।

ধর্মমঙ্গলের চিত্র এখানে একটু ভিন্ন। এখানেও অবশ্যসম্ভাবীভাবে বর্ণগত বিভাজন রয়েছে। লক্ষণীয় ধর্মমঙ্গলে আছে ডোম সমাজের কাহিনি। ব্রাহ্মণ নয়, ডোম সমাজের লোকেরাই ধর্মঠাকুরের পূজারি। কারণ ঐতিহাসিকেরা ধর্মঠাকুরকে বৈদিক সূর্যদেবতা বলে অভিহিত করেছেন, আর এই সূর্যদেবতার পূজা প্রচলিত ছিল এই ডোম জাতির মধ্যেই। মঙ্গলকাব্যগুলি আসলে জাতীয় জনজীবনে ও সমাজের নিচুতলার মানুষেরই জয়গান। কবিরা দেব-দেবীকেও সেই নিম্নস্তরে নামিয়ে এনে নিম্নশ্রেণির মানুষের হারানো গৌরবকেই সম্মান জানতে চেয়েছেন। (মুখোপাধ্যায় ১৪১৩, পৃ. ৮৬-১৮৭)

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্য-শিল্পের পরিবর্তন চোখে পড়ে। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলা গদ্যের যে প্রচলন শুরু হয় তাতে ধীরে ধীরে গদ্যের বিভিন্ন ব্যবহার সাহিত্যকদের মধ্যে পাওয়া যায়। বিশেষ করে উপন্যাস নামক শিল্পের উত্থান এই সময় দেখা যেতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাচেতনায় ‘সভ্যতার পিলসুজেরা’ বরাবরই ছিল। তাঁর কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গেরা প্রধানভাবে উঠে না এলেও তিনি তাদের সমাজের মূল কাণ্ডারি হিসেবে চিনতে পেরেছিলেন। তাঁর নানা প্রবন্ধে এর প্রতিফলন আমরা দেখতে পেয়েছি। সাহিত্যে নিম্নবর্গের উপস্থিতি-অবস্থান থেকে তাদের স্বর-চেতনার প্রকট হওয়া এবং উচ্চবর্গের প্রতিপক্ষ হিসেবে নিম্নবর্গের নির্মাণ বিষয়টির ক্রমবিকাশের ধারাটিকে বুঝতে হলে আমাদের স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের উপস্থিতি ও অবস্থানের বিষয়টিকে সুসংবদ্ধভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে আমরা দেখে নেব স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের উত্থানের প্রাক্‌পর্বকে।

২.৩ স্বাধীনতার প্রাক্-পর্ব : কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের আকল্প নির্মাণ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পর বাংলা কথাসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধ রূপ আমরা মূলত দেখতে পেলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায়। রবীন্দ্রনাথের রচনায় নিম্নবর্গ সেভাবে উপস্থাপিত না হলেও তাঁর কথাসাহিত্যে সমাজের নিম্নবর্গের একটি আকল্প তৈরি হয়েছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বিশেষ করে ‘গল্পগুচ্ছ’-র রবীন্দ্রনাথকে অনেকটাই নিম্নবর্গের কাছাকাছি দেখা গিয়েছে। যেমন ‘অনধিকার প্রবেশ’, ‘মেঘ ও রৌদ্র’, ‘হালদারগোষ্ঠী’, ‘সমস্যাপূরণ’ প্রভৃতি গল্পের কথা যেখানে সামন্ততন্ত্রের ছবি উঠে এসেছে এবং তার সঙ্গে রয়েছে ব্রাত্য প্রজাদের প্রতিবাদী গোষ্ঠীচেতনা। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ক্ষেত্রে ‘গোরা’ (১৯১০)-উপন্যাসে

গোরার চোখে ভারতবর্ষের দর্শন যে স্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সে স্তরে রয়েছে সমাজের ধর্মীয় গোঁড়ামি, অস্পৃশ্যতা, জাতপাতের ভেদাভেদ, অজ্ঞতা, অশিক্ষা, জড়তা, রক্ষণশীলতা। গোরা তাদের চিনতে পেরেছে 'সভ্যতার পিলসুজ' রূপেই। শরৎসাহিত্যেও সমাজবিভক্ত নিচুতলার ব্রাত্যশ্রেণিকে লক্ষ করা গিয়েছে। তাঁর লেখায় হাড়ী-বাগদীর প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে গ্রাম্যজীবন ও মানুষের সুখ দুঃখে সহানুভূতি জানিয়ে তাদের মুখ থেকে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাহিনি বের করে এনেছেন। পল্লিগ্রাম ও পল্লিসমাজের জীবন্ত চিত্র শরৎচন্দ্রের লেখায় আমরা দেখেছি। শরৎসাহিত্যে সমাজের সাধারণ মানুষের নিম্নবর্গ রূপে যে অবহেলা, উপেক্ষা ও নিপীড়নের চিত্র উঠে এসেছে তা অত্যন্ত বাস্তব। 'পল্লিসমাজ', 'অভাগীর স্বর্গ', 'মহেশ', 'বামুনের মেয়ে' প্রভৃতি গল্প-উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছে।

১৯২৩ সালে 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কল্লোল লেখকগোষ্ঠীর আবির্ভাব এবং সেই গোষ্ঠী দ্বারা রবীন্দ্র সাহিত্য ভাবধারার বিরোধিতা, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঁক বদল করেছে। উচ্চবর্গীয় ধারণায় সাহিত্য সৃষ্টি থেকে তাঁরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন সমাজের প্রান্তে থাকা ব্রাত্য মানুষগুলির অন্দরমহলের দিকে। তবে তাঁদের এই বিরুদ্ধাচরণ যে সাহিত্যের মূলমঞ্চে নিম্নবর্গকে এনে দাঁড় করিয়েছে এমন কথা বলার মধ্যে মৌলিকতা নেই। কারণ বঙ্কিম, রবীন্দ্র ও শরৎসাহিত্যে ব্রাত্যজনের অভাব নেই। তবে সমালোচকের কথায়-

> 'তাঁরা সমাজের অন্তেবাসীদের বহু বিচিত্র জীবন যন্ত্রণার বেদগান রচনা করেননি। কল্লোলীয়রা এই উপেক্ষিত দিগন্তের দিকে চোখ মেলে দাঁড়ালেন, কুলি-মুটে-মজুরের অস্তিত্বের নানা সংকট কাহিনির বয়ানে ব্যক্ত করতে চাইলেন।'
>
> (সিংহ রায় ১৯৭৩, পৃ. ১৬৪)

সমালোচকের এই মন্তব্যের যথার্থতা আমরা খুঁজে পেলাম 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত নারায়ণ ভট্টাচার্যের 'দিনমজুর' গল্প প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। সেখানে দেখা গেল, দিন মজুরদের দুঃখ-দুর্দশা ও বঞ্চনার চিত্র। কয়লাখনির শ্রমিকদের নিয়ে শৈলজানন্দ লিখলেন 'কয়লাকুঠি' নামক গল্প যেখানে শ্রমজীবী মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন ও চেতনার প্রতিফলন লক্ষণীয়। যুবনাশ্বের 'পটলডাঙার পাঁচালি' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিতে ব্যঙ্গের ছলে উঠে এসেছে তথাকথিত নিম্নবর্গেরই দৈনিক পাঁচালি। এছাড়া কল্লোল গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা দায়িত্ব সহকারে সমাজের ব্রাত্য বঞ্চিত মানুষের পাঁচালি গ্রন্থনে সচেষ্ট থেকেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জগদীশ গুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, বনফুল, শৈলজানন্দ প্রমুখ লেখকেরা।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের উল্লেখযোগ্য পাঁক (১৯২৪) উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে মুচি, মেথর ও বস্তিবাসীর জীবনযাত্রা। 'উপনায়ন' উপন্যাসেও রয়েছে নিম্নবিত্ত সর্বহারা ভিখারিদের আর্তনাদ ও দুর্দশার জীবনচিত্র। শুধু উপন্যাস নয়, গল্প রচনাতেও সিদ্ধহস্ত লেখক তাঁর গল্পগুলিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তুলে এনেছেন নিম্নবর্গকে। 'মহানগর', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে'-র মতো গল্প সৃষ্টি করে তিনি প্রমাণ করেছেন তিনি নিছক জীবনের রূপকার নন, একজন বিচক্ষণ সমাজবিশ্লেষকও। 'সংসার সীমান্তে'-র নায়ক নায়িকা অস্তিত্বের সংগ্রামে যথাক্রমে বেছে নেয় চৌর্যবৃত্তি ও পতিতাবৃত্তি। সমাজ কাঠামোর নিষ্ঠুর নিয়মে তারা ছিটকে যায় সমাজের মূলস্রোত থেকে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখাতেও এসেছে সমাজের বঞ্চিত গোষ্ঠীরা। তাঁর প্রথম দিকের গল্পের মধ্যে 'ভুখা' গল্পটি এখানে প্রণিধানযোগ্য। শৈল নামক চরিত্রটি বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করেছে তাঁর সন্তানকে বাঁচাতে। কিন্তু ভিক্ষার বদলে তাঁর কপালে জুটেছে প্রহার ও অপমান। সন্তানকে সে বাঁচাতে পারেনি। তাহলে তাঁর সন্তানের জন্য কে দায়ী-এই উত্তর খুঁজেছেন লেখক। আবার 'ধন্বন্তরি' গল্পে রয়েছে একজন গরিব রোগীর অসহায় অবস্থা যে ধনী ডাক্তারের কাছে পেয়েছে অমানবিক আচরণ। 'টুটা-ফুটা' গল্পে আছে পচে যাওয়া সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভাবনা। রাজা নামক চরিত্রের অনুভব-

> '-ওরা সমাজের ডোবার সব-নীচেকার ঘোলাটে পাঁক, আর ঐ যাঁরা দেশোদ্ধারের জন্য কোমর কাছতে কাছা খুলছেন ওঁরা ওপরকার টলটলে জল। ওদের সঙ্গে সমান পংক্তিতে ব'সে জানিয়ে দিতে হবে ওরা আমাদের সগোত্র।'
>
> (সেনগুপ্ত ১৩৫৯, পৃ. ৩৩৬)

শুধু তাই নয়, 'হাড়ি-মুচি-ডোম' (১৯৪৮) নামক একটি গল্পগ্রন্থ রচনা করেছেন লেখক যেখানে ধরা পড়েছে বর্ণগত বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা ও অর্থনৈতিক শ্রেণিভেদ।

কল্লোল গোষ্ঠীর আরেকজন উল্লেখযোগ্য লেখক জগদীশ গুপ্ত তাঁর সাহিত্যে নিম্নবর্গের অসহায় জীবন, বিশ্বাস, সংস্কৃতি, ভাগ্য বিপর্যয় ও সমাজ থেকে ছিটকে থাকার গল্প বর্ণনা করেছেন। লঘু গুরু উপন্যাসে রয়েছে সমাজের উচ্চবর্গের জাত্যাভিমান ও ব্রাত্যজনের প্রতি তাদের হীনমন্যতার ছবি। 'পুরাতন ভৃত্য' গল্পে দেখি অস্পৃশ্যতা জনিত নিম্নবর্গের উপেক্ষা। 'দুলালের দোলা' উপন্যাসে উচ্চবর্গের মুখোশ খুলে দিয়েছেন লেখক।

কল্লোলের প্রভাব ও বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে 'ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়' সাহিত্য রচনায় নিজস্ব ক্ষেত্রে রচনা রীতি, ভঙ্গি, ভাষারীতি ও সর্বোপরি বিষয় চয়নে বিশেষ পরিচয় দানের মাধ্যমে নিজের পথ রচনা করেছেন। তাই তারাশঙ্করের রচনায় স্বভাবতই পেয়ে যাই কাহার, ডোম, বাগদি, সাঁওতাল, বেদে, সাপুড়ে,

ইত্যাদি সমাজের তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণিদের। সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক ভাবে স্মরণীয়। তাঁর মতে,

> 'তারাশংকর এমন এক জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, যেখানে পরিচিত ধর্মাশ্রয়ী লোকসংস্কৃতিকেন্দ্রিক জীবনকে ও অপরিচিত অন্ত্যজ ব্রাত্য জীবনকে ঠাঁই দিয়েছিলেন,...
>
> ...ব্রাত্য জীবনকে গভীর ও ঘনিষ্ঠ করে দেখার পথ তিনিই খুলে দিয়েছিলেন।' (মুখোপাধ্যায় ১৯৭৪, পৃ.৩৪)

লক্ষণীয়, তাঁর কালিন্দী (১৯৪০), কবি (১৯৪৪), নাগিনী কন্যার কাহিনি (১৯৫২), হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৫১), ডাকহরকরা (১৯৫৮) প্রভৃতি উপন্যাস এবং তারিণী মাঝি (১৩৪২), বেদেনী (১৩৪৬), নারী ও নাগিনী (১৩৪১), ব্যাঘ্রচর্ম (১৩৪৩), আখড়াইয়ের দীঘি (১৩৪০) ইত্যাদি গল্পে সমাজের অপাংক্তেয় ব্রাত্য মানুষেরা বর্তমান। 'কবি' উপন্যাসটি নিম্নবর্গের উত্থান পর্বে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কারণ এখানে জন্ম সূত্রে নয় কর্মসূত্রে মানুষের পরিচয় তৈরি হয়েছে। বর্ণ বৈষম্যের অভিশাপ গ্রস্ত সমাজে নিতাই তথাকথিত অন্ত্যজ ডোম হয়েও নিজের পরিচয় সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত নয়। শুধু বর্ণ বৈষম্য নয়, একজন ডোমের কবি হওয়ার ইচ্ছেকেও মর্যাদা দেওয়া হয়নি। তাকে নানা অছিলায় একঘরে করা হয়েছে। বাধ্য হয়ে নিতাই চলে এসেছে গ্রাম ছেড়ে। এসে যোগ দিয়েছে এক অনামী ঝুমুর দলে। কবি থেকে নিতাই নামকরা কবিয়ালে পরিণত হয়েছে। অন্ত্যজ নিতাইয়ের কবি রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়ে মূলস্রোতে ফিরে আসা ও নিজেকে নতুন রূপে চিনতে পারার জীবনযাত্রাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শুধু উপন্যাস নয়, তারাশঙ্করের গল্পেও রয়েছে চিত্র। যেমন 'বেদেনী' গল্পে রাধিকা বেদেনীর হিংস্রতা ও আদিম জৈবিক প্রবৃত্তি ধরা পড়েছে। 'নারী ও নাগিনী' গল্পে জোবেদা সাপুড়ে, ডাকহরকরা গল্পে দিনু ডোম, ব্যঘ্রচর্ম গল্পে রতন হাড়ি, আখড়াইয়ের দীঘি গল্পে কালি বাগদি ইত্যাদি অন্ত্যজ মানুষের অবস্থান লক্ষ করা গিয়েছে।

বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যেও নিম্নবর্গের সমাজচিত্র লক্ষণীয়। বিশেষ করে তাঁর ছোটোগল্পে উঠে এসেছে ডোম, হাড়ি, বাগদী, মাঝি, মোল্লা, মুচি, জেলে, কামার, কুমোর, ফাঁসুড়ে ডাকাত ইত্যাদি নিম্নবর্গ। আবার আদিবাসী সমাজের কোল সাঁওতাল মুণ্ডার মতো বিভিন্ন শ্রেণির ব্রাত্য চরিত্র। ১৯৩৯ সালে রচিত 'আরণ্যক' উপন্যাসে প্রকৃতি বর্ণনার সঙ্গে রয়েছে নিরন্ন নিঃস্ব মানুষের জীবনযাত্রার ছবি। বনফুলের গল্পেও সেই একই ছবি। 'বুধনী' গল্পে এক অন্ত্যজ দম্পতির করুন পরিণতি, 'ছোটোলোক' গল্পে একজন রিকশাওয়ালার আত্মমর্যাদাবোধ নিম্নবর্গের চেতনাকে স্পষ্ট করেছে। আবার 'ভক্তিভাজন' গল্পে রয়েছে জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার কাহিনি। কল্লোল গোষ্ঠীর এই ছক ভাঙার পদক্ষেপ সাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থানকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছে। সমালোচক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন,

'কল্লোলগোষ্ঠীর মধ্যে যে জিনসটা সব চাইতে লক্ষণীয় ও প্রশংসনীয় তা হচ্ছে ওঁরাই প্রথম সচেতনভাবে বাংলা সাহিত্যে নির্যাতিত শোষিত শ্রেণীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সাহিত্যোচিত বিষয়ে মর্যাদা দান করেন।...বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি মুখ্যত অভিজাত স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল; শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্তের স্তরে তাঁর কল্পনাকে সম্প্রসারিত করলেও তার বেশি আর অগ্রসর হননি; কিন্তু শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ মিত্র প্রমুখের লেখায় সমাজের অন্ত্যেবাসী ব্রাত্যজনেরা আর অকুলীন রইল না। সেই থেকে বাংলা সাহিত্যে গণতান্ত্রিকতার বাধাবন্ধনহীন অভিযান শুরু হয়েছে।'

(মুখোপাধ্যায় ১৩৬৩, পৃ. ৬১-৬২)

অন্যদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের দিকটি ধরা পড়েছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য ও তার ফলস্বরূপ নিম্নবর্গের জীবন সংগ্রাম তাঁর লেখাতে গুরুত্ব পেয়েছে। ১৯৩৬ সালে মানিক পদ্মানদীর মাঝির নৌকা করে আমাদের নিয়ে গেলেন সরাসরি জেলেপল্লিতে। সেখানে দেখলাম জেলেদের জীবনযাপন। অর্থনৈতিক দিক থেকে এই প্রান্তিক জেলে-মাঝিরা জমিদারি শোষণে শোষিত ও বঞ্চিত। জেলেরা যে পুরুষানুক্রমিকভাবে শোষিত তার প্রমাণ উপন্যাসে দেখা যায়-

'পুবদিকে গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে।... স্থানের অভাব এ জগতে নাই তবু মাথা গুজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই। সবটুকু সমতোল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না।...পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে।' (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৬, পৃ. ১৭-১৮)

তবে একথা ঠিক যে এখানকার জেলে-মাঝিরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দেয়নি। শ্রেণিচেতনা গড়ে ওঠার সুযোগ নেই এখানে। তাই তো হোসেন মিয়ার মতো শঠ, ধূর্ত লোক এই মাঝিদের ত্রাতা হয়ে উঠতে চায়।

এ পর্যন্ত আলোচনায় দেখা গেল, সাহিত্যের পাতায় নিম্নবর্গকে যেভাবে বঞ্চনা, শোষণ, নিপীড়ন, জাতিগত বিভেদ, বর্ণ বৈষম্য সর্বোপরি অস্পৃশ্যতার জালে জড়িয়ে বৃত্তের বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে সেখানে কেবল উঠে এসেছে সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী নিম্নবর্গের অবস্থানের বিভিন্ন রূপ। সাহিত্য সৃজকেরা মূলত নিম্নবর্গের অভাব-অনটন বা সমস্যা সংকটের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তার মধ্যে বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাবের কথা। এই বিশেষ প্রয়োজনগুলি যখন নিম্নবর্গ মেটাতে চেষ্টা করেছে তখনই কোনো না কোনোভাবে তারা সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্ণ বা উচ্চবর্গের কাছে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত বা অপমানিত হয়েছে। এই লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, অপমানের কথাই কেউ তাদের প্রতি সহানুভূতিবশত, কেউ প্রশ্নমনস্কভাবে, কেউ সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিতে গিয়ে, আবার কেউ বা নিম্নবর্গের মতো নতুন উপাদান সংযুক্ত করে সাহিত্যের ধারা বদলের

চেষ্টায় নিম্নবর্গকে তাঁদের লেখায় স্থান দিয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা উদ্দেশ্যমূলক। এই উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থানকে সুস্পষ্ট করতে গিয়ে নিম্নবর্গের স্বপ্ন, উচ্চাশা, চেতনা, স্বতন্ত্র স্বর ও বিশেষ করে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসার প্রচেষ্টার প্রসঙ্গটি চাপা পড়ে গিয়েছে তাদের দুঃখ-দুর্দশা বর্ণনা করতে গিয়ে। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের মধ্যমঞ্চায়নের যে অঘোষিত আন্দোলনটি চলছিল, তাতে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে এই কালখণ্ডের কথাসাহিত্য আসলে নিম্নবর্গের আকল্প নির্মাণের প্রস্তুতি-পর্ব। এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, এই প্রস্তুতি পর্বে নিম্নবর্গের যে অবস্থান উঠে এসেছে তা অনেকাংশেই অর্থনৈতিক বৈষম্যের দিক থেকে। তাছাড়া সামাজিক দিক থেকে যে সংকট তৈরি হয়েছে তাতে বিশেষভাবে রয়েছে অস্পৃশ্যতা ও বর্ণবৈষম্য। সাংস্কৃতিক দিক থেকেও উচ্চবর্গের কাছে নিম্নবর্গ অবহেলিত। তবে রাজনৈতিক দিক থেকে তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে নিম্নবর্গের ওপর তৈরি হওয়া সংকটের চিত্র ধরা পড়েনি প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের কথাসাহিত্যে। কিন্তু সাবঅলটার্ন স্টাডিজ গোষ্ঠীর সমালোচকেরা নিম্নবর্গ-উচ্চবর্গ নির্ণায়ক একক রূপে যে ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন এবং যার ওপর ভিত্তি করে নিম্নবর্গের স্বর, চেতনা ও প্রতিবাদী সত্তাকে বিচার করেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ পর্বে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা দেখা যায়নি।

২.৪ স্বাধীনতা-উত্তর কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের উত্থান : 'অপর' থেকে 'প্রতিপক্ষ'-এ উত্তরণ

বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থান বা উপস্থিতি বিষয়টি একেবারেই অভিনব বা চমকপ্রদ নয়। কারণ মোট জনসংখ্যার থেকে মুষ্টিমেয় উচ্চবর্গকে বাদ দিলে যারা পড়ে থাকে সেই সাধারণ মানুষকেই গবেষক-সমালোচকেরা 'নিম্নবর্গ' বলেছেন। ফলে সাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থান—বিষয়টি কোনো অভিনবত্বকে ইঙ্গিত করে না। সমাজ, অঞ্চল, প্রকৃতির মতোই নিম্নবর্গ সাহিত্যের উপাদান হিসেবেই বিবেচ্য। তবে লক্ষ করার বিষয় হল- সাহিত্যে নিম্নবর্গের উপস্থিতি সক্রিয় না নিষ্ক্রিয়, বা সাহিত্যে নিম্নবর্গ প্রধান রূপে স্থান পাচ্ছে না অপ্রধান অঙ্গ হিসেবে নামমাত্র রয়ে যাচ্ছে। তবে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের বিস্তারও কিছু কম নয়। যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামজিক অনিবার্যতার কারণে নিম্নবর্গকে দেখা গিয়েছে। ফলে প্রশ্ন আসে, তাহলে আমরা কোন ধরনের কথাসাহিত্যকে আলোচনার বৃত্তে আনব? এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করে নেব প্রাবন্ধিক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্যের ভাষ্য।

'বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্য বা নিম্নবর্গ চরিত্রের দেখা উনিশ শতকেই মিলেছে এমন কথা বলার মধ্যে তেমন অভিনবত্ব নেই। দেখতে হবে চরিত্রগুলি কীভাবে এসেছে? কেবল তাদের উপস্থিতিই গুরুত্ব পেতে পারে না। সমাজ সংস্কৃতির মূল ধারার বিপরীতে তাদের সক্রিয় ও প্রতিবাদী অবস্থানটিই প্রধান আলোচ্য হওয়া উচিত।'

(সরকার (সম্পা.) ২০০৭, পৃ. ১)

ফলে আমরা সেই সমস্ত কথাশিল্পকে আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করব, যেখানে নিম্নবর্গের উপস্থিতি সক্রিয় ও প্রতিবাদী। আসলে বাংলা কথাসাহিত্যে ক্রমে নিম্নবর্গের সক্রিয় ও প্রতিবাদী হয়ে ওঠার পেছনে যেমন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ রয়েছে, তেমনই রয়েছে বিংশ শতকের ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাব—যেমন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, শ্রমিক আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ ও স্বাধীনতা প্রাপ্তি—যা স্বাধীনতার সমকাল ও পরবর্তীকালের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

লক্ষণীয়, প্রায় প্রতিটি ঘটনার সঙ্গেই জুড়ে আছে সমাজের নিচুতলার মানুষজন অথবা সরাসরি যুক্ত না হলেও ফল ভুগতে হয়েছে তাদেরই। ফলে নিম্নবর্গের যন্ত্রণা, জীবনযাপন ও সর্বোপরি তাদের নিজস্ব চেতনার একটি পৃথক গুরুত্ব বা মূল্য তৈরি হয়েছিল তৎকালীন সময়ে। ১৯৪৬-১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-পাকিস্তান বিভাগের মতো ঐতিহাসিক ঘটনার ফলে একদিকে স্বাধীনতার উচ্ছ্বাস এবং অন্যদিকে দেশভাগের যন্ত্রণা-উদ্বাস্তু সমস্যায় জনজীবন জেরবার ও বিপর্যস্ত হয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর রাষ্ট্রক্ষমতা গিয়ে পড়ল তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের হাতে যারা সে সময় তোষণনীতির ফলে ইংরেজদের কাছাকাছি ছিল। পরাধীন দেশে যারা স্বপ্ন দেখেছিল স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে বসবাস করার, তা আসলে বাস্তবায়িত হল না। সমাজের নিচুতলার মানুষগুলোর ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মানে হয়ে দাঁড়াল পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাধারী ও পুঁজিবাদীদের অধীনতার আওতায় আসা। স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার হস্তান্তর হল মাত্র, নিম্নবর্গ নতুন করে অধীনতার জালে জড়িয়ে গেল নতুনভাবে, নতুন নামে, নতুন কৌশলে। প্রশ্ন ওঠে, স্বাধীনতা পূর্ব কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গ যে অবস্থানে ছিল, স্বাধীনতা-উত্তর কথাসাহিত্যে কি তাদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হল? হলেও তা কী ধরনের পরিবর্তন? সাহিত্যে নিম্নবর্গের উত্থানপর্বে কি কোনো বাক বদল লক্ষ করা গেল? যদি লক্ষ করা যায় তাহলে তা কীভাবে বা কোন দিক থেকে হল? এসব প্রশ্নের উত্তরই আমরা আলোচ্য অধ্যায়ে খোঁজার চেষ্টা করব।

সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' (১৯৫০) আমাদের সেই অনুসন্ধানের প্রথম চরণ। কারণ ঢোঁড়াই হল নিম্নবর্গের সেই প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি যাদের জীবনসংগ্রাম ও প্রতিবাদী সত্তাটি প্রমাণ করে যে- 'নিম্নবর্গ কথা বলতে পারে'। উচ্চবর্গসৃষ্ট সমাজের কণ্টকময় পথের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ঢোঁড়াই হয়ে উঠেছে সেই সমাজেরই নিম্নবর্গের পথপ্রদর্শক ও কাণ্ডারি যে নিম্নবর্গকে তাদের চেতনার জাগরণ ঘটিয়ে তাদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত সতীনাথ ভাদুড়ীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'ঢোঁড়াইচরিতমানস' উপন্যাসটি আমাদের আলোচনা শুরু করার ক্ষেত্রে যথাযথ। কারণ,

> 'ভারতীয় সাহিত্যে 'ঢোঁড়াইচরিতমানস' উপন্যাসটি একটি বড়ো জায়গা নিয়ে আছে। নিম্নবর্গের মানুষ বোধ হয় এমনভাবে আগে আর আসেনি। হ্যাঁ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ে সূচনা হয়েছিল সত্য, সতীনাথ তাকে দিয়েছেন মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি। আত্মার আত্মীয় করে গড়ে তুলেছেন নিম্নবর্গের মানুষকে।' (মিত্র ২০১৭)

উপন্যাসের পটভূমি পরাধীন ভারতের বিহারের ধাঙড় ও তাৎমাটুলি অঞ্চল। 'ঢোঁড়াইচরিতমানস' উপন্যাসটি নিম্নবর্গীয় সমাজের মানস ভূগোল যা সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন একদল মানুষ কর্তৃক কৃত্রিমভাবে বানিয়ে তোলা। যেখানে ঢোঁড়াই, রামিয়া, কোয়েরি, ধাঙড় ও তাৎমাটুলির মানুষেরা তাদের নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবিকাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। যুগ যুগ ধরে এভাবেই নিম্নবর্গের ইতিহাস প্রবাহিত হয়ে আসছে। নিজ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামের কাহিনি আলোচ্য উপন্যাসের উপজীব্য। 'ঢোঁড়াইচরিতমানস' উপন্যাসে যেভাবে নিম্নবর্গীয় সমাজের উত্থানের চেষ্টা দেখান হয়েছে এবং লড়াই করেও যেভাবে ঢোঁড়াইদের পিছিয়ে আসতে হয়েছে, তাতে নিম্নবর্গের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে। উপন্যাসটিতে মূলত জিরানিয়ার তাৎমাটুলির তাৎমাসমাজ, ধাঙড়টুলির ধাঙড়সমাজ ও বিস্কান্ধার কোয়েরিটোলার কোয়েরি সমাজের বর্ণনা রয়েছে। তাৎমাদের আদি জীবিকা ছিল তাঁত বোনা। কিন্তু তারা অর্থনৈতিক কারণে সেই জীবিকা ত্যাগ করে কুয়োর বালি ছাঁকার কাজ বা ঘরামির কাজ করে। ধাঙড়রা ওঁরাও জাতির অন্তর্ভুক্ত। উদ্বাস্তু এই সমাজের মানুষগুলো জমিদারদের দয়ায় দল বেঁধে বসবাস করে। সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলে আবার অন্য কোথাও চলে যায়। একটু ভালোভাবে থাকার জন্য এই মানুষগুলো খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে থাকে। যে কোনো কাজ করতে তারা প্রস্তুত। কোয়েরিরা মূলত বর্গাচাষি। তাৎমা, ধাঙড়দের থেকে এদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো। আসলে অর্থনৈতিক ক্ষমতাই যে সব ক্ষমতার উৎস- একথা তারা তাদের নিজের জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে। গোষ্ঠী জীবনে অভ্যস্ত এই মানুষগুলোর আদিম সংস্কার ও অলৌকিকে বিশ্বাসী মনোভাব তাদের চিন্তা চেতনাকে ক্রুশ বিদ্ধ করে রেখেছে। এই রকম স্থবির জনগোষ্ঠী থেকে উঠে আসে ঢোঁড়াই।

লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী এই সব নিম্নবর্গীয় সমাজে পঞ্চায়েত নির্মিত 'পঞ্চ'র বিধানই শেষ কথা। ঢোঁড়াই এদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েই দেশান্তরী হয়েছিল কারণ সমাজের উচ্চবর্গ নিয়ন্ত্রিত এই পঞ্চর বিরুদ্ধতা করেছিল সে। উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের শাসন শোষণ প্রক্রিয়া স্বরূপ বুঝতে পেরে ঢোঁড়াই যখন রাজনীতিতে মাথা চারা দিয়ে উঠতে থাকে তখন দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। একসময় ক্ষমতার কাছে নতজানু ঢোঁড়াইয়ের রাজনীতি থেকে বিশ্বাস উঠে যায়। কারণ ঢোঁড়াই বুঝেছিল উচ্চবর্গরা নিম্নবর্গের সরলতার সুযোগ নিয়ে ও গান্ধিজীকে রামের অবতার বানিয়ে তাদের অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসকে হাতিয়ার করে এক বৃহৎ গণআন্দোলন তৈরি করতে যার দরুন ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়িয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করা যায়। তাই নিম্নবর্গের এই সমাজে শিক্ষার আলো পৌঁছতে দেওয়া হয় না। নিম্নবর্গকে দেখা হয় আন্দোলনের হাতিয়ার ও ভোটদাতা হিসেবে। কথাসাহিত্যে যুগ যুগ ধরে নিম্নবর্গের ব্রাত্য হয়ে আসার কাহিনি যেমন ধরা পরে তেমনই এদের হয়ে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যায় ঢোঁড়াইদের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঢোঁড়াইদের উত্থান ও লড়াই সফল হতে পারে না সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কারণে। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৬, পৃ. ১৫-৫২)

এছাড়াও সতীনাথ ভাদুড়ীর 'আন্টাবাংলা' গল্পটি নীলকর সাহেব দ্বারা অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত একটি ওঁরাও পরিবারের কাহিনি। বীরসা ওঁরাও এক ছুটির দিনে নীলকুঠিতে না গিয়ে নিজের ক্ষেতের কাজ করার অপরাধে নীলকর সাহেব তাকে মাথায় আটটি ইট রেখে সূর্যের দিকে মুখ করে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে বলে। বৃদ্ধ বীরসা এই শাস্তি সহ্য করতে না পেরে দিনের শেষে মারা যায়। বীরসার পুত্রবধূ নীলকর সাহেবের রক্ষিতায় পরিণত হয়। 'রথের তলে' গল্পে দেখা যায় বিহারের নট সম্প্রদায়ের পতনের কাহিনি। নাচ-গানে পারদর্শী ও নাম খ্যাতি থাকা সত্বেও তারা উচ্চশ্রেণির কাছে অবহেলিত। তাদের জীবনের দুর্দশার চিত্র চিত্রিত হয়েছে আলোচ্য গল্পে। (হোসেন ২০০৪, পৃ. ৭০-৭১)

অমরেন্দ্রনাথ ঘোষের 'পদ্মাদীঘির বেদেনী' (১৯৪৯) উপন্যাসটি বাংলাদেশের বেদে-বেদেনীদের দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র্য ও বঞ্চনার কথাচিত্র। 'চরকাশেম' (১৯৫৯) উপন্যাসে দেশবিভাগের প্রেক্ষাপটে শ্রমজীবী মানুষের দৈন্যপীড়িত বাস্তব ছবির সন্ধান মেলে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কাশেম দেশবিভাগকে সমর্থন করতে পারে না। সে শুধু তাদের মতো মানুষগুলোর জন্য একখণ্ড বাসস্থান দাবি করে। ফলে নিম্নবর্গের অধিকার নিয়ে সে তাদের মধ্যে এক ধরনের শ্রেণিচেতনা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। কিন্তু উচ্চবর্গের ক্ষমতা ও শক্তির কাছে কাশেম পারে না লড়ে যেতে।

কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের অপর থেকে প্রতিপক্ষে উত্তরণের পথে গুণময় মান্নার 'লখীন্দর দিগার' (১৯৫০) উপন্যাসটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কারণ 'লখীন্দর দিগার' কেবলমাত্র সমাজের একজন নিম্নবর্গ চরিত্র নয়, সমগ্র উপন্যাসে তার অভিজ্ঞতা যেভাবে তাকে একজন সাধারণ নিম্নবর্গ থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে উত্তীর্ণ করেছে তাতে সমগ্র নিম্নবর্গের স্বতন্ত্রতার পরিচয়টি ধরা পড়ে। মেদিনীপুরের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে থাকা কৃষি জনবসতিকে কেন্দ্র করে আখ্যানের বিস্তার। উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ ভেদাভেদ এখানে স্পষ্ট। অস্পৃশ্যতা এ সমাজে অভিশাপ। উচ্চবর্গের কাছে অবহেলিত হয়ে নিম্নবর্গের মধ্যে দেখা গিয়েছে আত্মমর্যাদা বোধের উন্মেষ। তাদের মনে এ জিজ্ঞাসা দেখা গিয়েছে যে, কর্মই যদি ধর্ম হয় বা সব কর্ম যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে ডাক্তার, উকিল, মোক্তারদের সঙ্গে কৃষিকাজের কী তফাৎ। ফলে কৃষকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষা। সেখান থেকে গড়ে উঠেছে শ্রেণি চেতনা ও প্রতিবাদ। তাই লখিন্দরের প্রতিবেশী মহেন্দ্র বলে,

"...'সব সওয়া যায়, কিন্তু ওরা বেশি হীন-ছিন করে, সেটা সইতে পারিনি।' (মান্না ১৯৫৫, পৃ. ৪৬)

নিম্নবর্গের আনুগত্য লাভে উচ্চবর্গের স্বার্থ পূরণের এই অন্যায় নিয়মের কাছে নিম্নবর্গরা বরাবর বাধ্যতার শিকার। লখীন্দর এই আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তার মনে হয় কৃষকরা যতক্ষণ ঐক্যবদ্ধ আছে তাদের কেউ কিছু করতে পারবে না। কিন্তু তাদের এই একতার মধ্যে প্রবেশ করেছে ধর্মবিশ্বাস। কংগ্রেসি নেতা কৃষ্ণমোহন বিশ্বাস করেন, আমাদের দেশ ঠাকুর দেবতার দেশ, দেবতাকে ভালো না বাসার কারণে আমাদের দেশের আজকে এই অবস্থা। আমরা লক্ষ করেছি নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাকারীরা নিম্নবর্গের চেতনাকে বোঝার ক্ষেত্রে তাদের ধর্মচিন্তাকে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। রণজিৎ গুহের মতে বীরসা মুণ্ডা সাঁওতালদের বিদ্রোহের জন্য ঐক্যবদ্ধ করলেও বিদ্রোহের আগের দিন দেবতার পূজা আরাধনার মধ্যে এই বিশ্বাসের ওপর তারা নির্ভর করেছিল যে ঠাকুরই তাদের জেতাবে। এই বিশ্বাসই তাদের ব্যর্থ করেছিল। কৃষক বিদ্রোহের প্রভাবে উপন্যাসের নিম্নবর্গকে যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে সেভাবে এর আগে কোনো উপন্যাসে তা চিত্রিত হয়নি। এখানে নিম্নবর্গের আবেগ-চিন্তা-চেতনা ও সমস্ত সামাজিক রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক স্তরে নিম্নবর্গের চেতনার সঙ্গে মিলে যায়। উপন্যাসের শেষে দেখাচ্ছেন রামায়ণ পড়া লখীন্দর কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো পড়ছে। স্বার্থপর-আত্মকেন্দ্রিক সুধীর আজ কৃষক বিদ্রোহের সৈনিক। আর এখানেই সাহিত্যের আদলে নিম্নবর্গের উত্তরণ ঘটে যায়। তাছাড়া 'জুনাপুর ষ্টীল' (১৯৬০-১৯৬২) উপন্যাসে ইস্পাত কারখানার শ্রমিকদের জীবন, শ্রমিক শিবলালের রাজনৈতিক চেতনার জাগরণকে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে দেখান হয়েছে।

নকশাল আন্দোলনকে পটভূমি করে রচিত ‘শালবনি’ (১৯৭৮) উপন্যাসে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি গ্রামের দরিদ্র দুলে-মাহাতো-সাঁওতাল মানুষগুলির জীবনসংগ্রামকে তুলে ধরেছেন লেখক। আবার ‘মুটে’ (১৯৮০) উপন্যাসে দেখান হয়েছে ঘাটালের কুলি অর্থাৎ ভারবহনকারীদের পেশা ও পেশাকেন্দ্রিক নানা লাঞ্ছনা, শ্রম, কষ্ট এবং সর্বোপরি তাঁদের আত্মসম্মানের ইতিবৃত্ত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। তাঁর ‘লালমাটি’ (১৯৫১) উপন্যাসটি নিম্নবর্গীয় জীবনের দলিল স্বরূপ। ‘বৈতালিক’ উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের শ্রমজীবী মানুষের কথা অর্থাৎ দিনাজপুরের মুচি জনজীবনের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। শুধু উপন্যাস নয়, তাঁর গল্পগুলির মধ্যেও নিম্নবর্গকে যে ভূমিকায় পাওয়া যায় তা উল্লেখযোগ্য। যেমন- ‘ভাঙা চশমা’, ‘সৈনিক’, ‘দুঃশাসন’, ‘বন্দুক’, ‘হাড়’, ‘কালনেমি’, ‘নীলা’, ‘বীতংস’, ‘ডিম’, ‘ভোগবতী’ ইত্যাদি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকায় অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেন,

> ‘এই বিচিত্র পটভূমিতে কত বিচিত্র মানুষেরই না আবির্ভাব ঘটেছে। আসামের চা বাগানের জন্যে সাঁওতাল পরগণায় কুলি-রিক্রুটার সাধু সুন্দরলাল, পঞ্চাশের মন্বন্তরে মহানগরীর বুকে ব’সে মিন্ডানাও দ্বীপের কাটাবাটুর জংলী সর্দারের নিকট পাওয়া বলি-দেওয়া কুমারী মেয়ের মন্ত্রসিদ্ধ হাড়ের অলস-স্বপ্নে বিহ্বল মনোহরপুকুর পার্কের রায়-বাহাদুর, গোলাপাড়া হাটের মহাজন আর আড়তদার-তুলসীবনের বাঘ, নিশিকান্ত, ... দুঃশাসনেরই প্রতিনিধিস্থানীয়-কাপড়ের ব্যবসায়ী দেবীদাস, টেরাই এর প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতার রাজত্বে মানবশিশুর টোপ দিয়ে বাঘ শিকারের রাজকীয় ব্যসনে উল্লসিত রামগঙ্গা এস্টেটের রাজাবাহাদুর এন আর চৌধুরী, ... মহানগরী কিংবা মফঃস্বল-শহর, কৌলমার্গে অভিজাত ভদ্র সমাজ কিংবা ব্রাত্য ও মন্ত্রহীনের অন্ত্যজ-পল্লি, নদ-নদী-অরণ্য-পর্বত-সমাকীর্ণ বিপুল ও বিশাল পরিবেশ; যেখানেই হোক না কেন, জীবন ও জগৎকে দেখবার মতো অতন্দ্র-জাগ্রত দুটি চোখ আছে লেখকের,’
>
> (ভট্টাচার্য (সম্পা.) ১৩৬১, পৃ. ৫-৬)

বাংলাদেশের অন্যতম কথাকার আবু ইসহাক তাঁর বিখ্যাত ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ (১৯৫৫) উপন্যাসে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উঁচু-নিচু ভেদাভেদের চিত্র তুলে ধরেছেন। যেখানে স্থান পেয়েছে নিরন্ন দরিদ্র নিম্নবর্গের জীবনসংগ্রাম। উচ্চশ্রেণি দ্বারা শোষিত নিপীড়িত মানুষগুলোর জীবন ধারা ও সংকটময় মুহূর্ত উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে। ফেলে দেওয়া এঁটো খাবার কুকুরের সঙ্গে মারামারি করে খেতে গিয়ে তারা ক্ষত-বিক্ষত হয়। একেক সময় মনে হয় এরা কোনো প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীব। মানুষের মতো দেখতে কিন্তু আসলে মানুষ নয়- শিরদাঁড়া বেকে গেছে তাদের, পেটের সঙ্গে পিঠ মিশে গেছে, বুকের পাঁজরের হাড় গোনা যায় তাদের। তবু তারা যেন সভ্যতার কাণ্ডারি হওয়ার স্বপ্নে বিভোর। সমগ্র উপন্যাসটি বাংলাদেশের সমাজের প্রান্তে থাকা মুসলিম জনজীবনের জলছবি। ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’ (১৯৮৬) উপন্যাসটি দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের একবছরের বেশি সময়কালের প্রেক্ষাপটে খাদ্য, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষের দুর্দশা ও কেন্দ্রীয় চরিত্র ফজলের জীবন সংগ্রাম তথা পদ্মার তীরবর্তী অঞ্চলের আঞ্চলিক জীবন পরিক্রমার আখ্যান। (ইকবাল ২০১৪, পৃ.১২১)

মনোজ বসুর 'জলজঙ্গল' (১৯৫১) উপন্যাসটি রচিত হয়েছে মানুষ ও মাটির প্রতি ভালোবাসার টানে। জলজঙ্গলে বসবাসকারী মানুষগুলোর জীবনে প্রাকৃতিক প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করা এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কথা ফুটে উঠেছে। তার সঙ্গে উঠে এসেছে তাদের সংস্কৃতি, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও প্রতিকূল পরিবেশ। সুন্দরবন অঞ্চল সংলগ্ন অঞ্চলে কিছু মানুষের আর্থিক দিক থেকে সবল হওয়ার কারণে তারা সেখানকার জমিদারে পরিণত হয়েছে। ধীরে ধীরে সেখানে তৈরি হয়েছে সামন্ততন্ত্র। যে মানুষগুলো নিজেদের শ্রম দিয়ে জঙ্গলকে বাসযোগ্য করে তুলল তারাই সেখানে ব্রাত্য হিসেবে থেকে যায়। শুধু 'জলজঙ্গল' নয় তাঁর 'বন কেটে বসত' (১৯৬১) উপন্যাসেও উঠে এসেছে প্রায় একই প্রসঙ্গ।

মনোজ বসুর গল্পগুলির ভেতরেও রয়েছে নিম্নবর্গের ভূমিকা। তাঁর 'পৃথিবী কাদের' গল্পে অত্যাচারিত কৃষক পরিবারের দুর্দশার চিত্র বিবৃত হয়েছে। নটবর মন্ডল কৃষিকাজ ছাড়া অন্য কিছু জানে না। দারিদ্র্যের শিকার এই মানুষটি গত তিন বছরের খাজনা জমিদারকে দিতে না পারলে নটবরকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। কিন্তু জমি থেকে সে যেতে চায় না। জমিদার তার সর্বস্ব কেড়ে নিলে তারা রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়। জমিদারের অত্যাচারে একটি দরিদ্র কৃষক পরিবার সম্পূর্ন ব্রাত্য হয়ে পড়ে। 'ধানবনের গান' গল্পটি এক ব্যতিক্রমী বিষয়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কারণ এখানে ব্রাত্য-নিম্নবর্গের দুঃখ-দারিদ্র্য ও অত্যাচার, বঞ্চনার কথা তুলে ধরা হয়নি। বরং এর উল্টো দিকে নিম্নবর্গের জীবনে মিলন-মধুর-আনন্দ উল্লাসের কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। (হোসেন ২০০৪, পৃ. ৭৩)

বর্তমান বাংলাদেশের প্রখ্যাত কথাশিল্পী শহীদুল্লাহ কায়সার তার বিখ্যাত 'সারেং বৌ' (১৯৬২) ও 'সংশপ্তক' (১৯৬৫) উপন্যাস দুটিতে দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র এলাকাকে কেন্দ্র করে সমাজ ইতিহাসের চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বামনছাড়ি গ্রামের লুন্দর শেখ একজন অত্যাচারী আগ্রাসী জমিদার। যার দ্বারা গ্রামের অধিকাংশ নারী লালসার শিকার হয়েছে। 'সংশপ্তক' এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বাকুলিয়া ও তালতলী গ্রামের দরিদ্র মানুষগুলো তাদের শোষণ নির্যাতন ও বাঁচার সংগ্রাম প্রাণবন্ত ভাষায় উপন্যাসের রূপ পেয়েছে। বিশেষ করে ফেলু মিঞা ও রমজানের চরিত্রটি এখানে সামন্ততন্ত্র পুঁজিবাদের

প্রতীক হয়ে উঠেছে। আসলে লেখক সমাজমুক্তির বিষয়টি সাধারণ মানুষের ঐক্যশক্তির ভেতর দিয়ে আমাদের শোনাতে চেয়েছেন। (ইকবাল ২০১৪, পৃ. ১২৫)

প্রফুল্ল রায়ও তাঁর গল্প-উপন্যাসে সমাজের খেটে খাওয়া মানুষগুলির চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর 'স্বপ্নের ট্রেন' গল্পে আর্থিক দিক থেকে বিপর্যস্ত, উদ্বাস্তু সমস্যায় জর্জরিত বাঙালির দুঃখ দুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেছে। 'মাঝি' গল্পে খেটেখাওয়া মাঝি ফজল মিঞা শোষণকারীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। আবার 'চর' গল্পে দেখা যায়, মানুষের মধ্যে কেমন করে পশুশক্তি ও শোষক সত্তার জাগরণ হয়। 'বাঘ' গল্পে সঙসাজা শিল্পী ঘুনুরামের জীবনের আত্মমর্যাদা ও প্রতিবাদী চেতনার গল্প। সে প্রতিবছর মহারাষ্ট্রে গণেশ উৎসবে বাঘ সেজে সকলকে খেলা দেখায়, আনন্দ দেয়। কিন্তু নোনপুরার উত্তরে একটি গ্রামে শম্ভা বেদে জ্যান্ত বাঘের খেলা দেখালে ঘুনুরামের খেলা আর কেউ দেখতে চায় না। শিল্পীর মান বজায় রাখার জন্য সে নকল বাঘ সেজে আসল বাঘের সঙ্গে লড়াই করে নিজের প্রাণ হারিয়েছে।

অন্ত্যজ মানুষের নিপীড়ন, শোষণ ও বঞ্চনার ছবি তাঁর উপন্যাসগুলিতে বিশেষভাবে প্রকটিত। যেমন- তাঁর পূর্বপার্বতী (১৯৫৭) উপন্যাসে ভারতের পূর্ব সীমান্তে নাগাল্যান্ডের পার্বত্য জাতির জীবনচর্যা ও স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এরা কীভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল তার তথ্যভিত্তিক চিত্র বর্ণিত হয়েছে যেখানে একই সঙ্গে এই নিম্নবর্গ মানুষগুলোর প্রতি শোষণ বঞ্চনা ও তাদের রাজনৈতিক চেতনার কথা উঠে এসেছে। 'সিন্ধুপারের পাখি' (১৯৫৯) আলোচিত হয়েছে আন্দামান দ্বীপে জেলে বন্দী কয়েদিদের বঞ্চিত জীবনের আলেখ্য। বন্দী জীবনের নানা নিষ্ঠুর আঘাত বঞ্চনা নিপীড়নের কথা উপন্যাসে নিপুণভাবে বর্ণিত হয়েছে। ১৯৬৯ সালে রচিত তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাস 'কেয়া পাতার নৌকো'-তে পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ জীবন চিত্রিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগের প্রভাব ও আর্থিক রাজনৈতিক সংকটে জর্জরিত হয়ে বাঙালি জীবনে যে সমস্যার উৎপত্তি হয়েছে তার বিবরণ উপন্যাসের উপজীব্য। 'আকাশের নীচে মানুষ' (১৯৮১) উপন্যাসে নিম্নশ্রেণির শোষণ-বঞ্চনার কাহিনি উঠে এসেছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ধম্মা একজন বেগারখাটা ভূমিদাস। প্রজাপীড়ক অত্যাচারী ভূস্বামী রঘুনাথ ভূমিদাসদের অন্যায়ভাবে খাটিয়ে মুনাফা লাভ করে। পুরুষানুক্রমে বিক্রিত ভূমিদাসদের মধ্যে প্রতিবাদী চেতনা গড়ে তোলে গবাদোসাদ। প্রতিবাদের চেহারা বীভৎস হলেও ক্ষমতাশালী ভূস্বামী রঘুনাথ তা স্তিমিত করে দেয়।

সাহিত্যে নিম্নবর্গের রূপকার যদি নিজেই নিম্নবর্গের একজন হয়ে থাকেন তাহলে নিম্নবর্গের নির্মাণ যে অনেকটা বাস্তবসম্মত সমাজসত্যকে বয়ে আনে তা বলাই বাহুল্য। কারণ অভিজ্ঞতা সবসময়ই প্রাণবন্ত দলিল হিসেবে কাজ করে। আমরা এখানে অদ্বৈত মল্লবর্মণের কথা বলতে চাইছি। আমরা জানি

তিনি একজন মালো সম্প্রদায়ভুক্ত সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষ। নিজ শিকড়ের টানেই তিনি রচনা করেছেন তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) উপন্যাসটি। যেখানে নদী হয়ে উঠেছে মালোদের উপার্জনের মূল চালিকা শক্তি। তারা তিতাসের বুক থেকে আহরণ করেছে মীনশস্য। ফলে তিতাসের বুকে চর নামলে তাদের জীবনেও নেমে আসে বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ের সময় পেটের দায়ে তারা জীবিকা বদল করে। তাই বাসন্তীকে দেখা যায় সাররাত সুতো কাটতে, জয়চন্দ্রের বউ ভিক্ষা করতে বের হয়, বনমালী মাছের পোনা বিক্রির কাজ নেয়, কেউ বা বড়োলোকদের নৌকায় কাজ নেয়। উপন্যাসে উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ ভেদাভেদ তো রয়েছেই, কিন্তু নিম্নবর্গের মধ্যেও উচ্চ-নিম্ন ভেদাভেদ দেখা গিয়েছে যা নিম্নবর্গের ইতিহাসে লক্ষণীয়। কালোবরণ চরিত্রটি নিজেকে সুবলের চাইতে উচ্চস্তরের মানুষ ভেবেছে কারণ সে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ও তার নিজের নৌকা রয়েছে, আর সেই নৌকার কর্মচারী সুবল। ফলে কালোবরণ সুবলকে চালনা করে। কালোবরণের আদেশ মানতে গিয়ে নৌকার তলে প্রাণ হারাতে হয় সুবলকে। সুবলের বউকে হতে হয় বিধবা। আর্থিক ক্ষমতার কারণেই কৃষকরা জেলেদের থেকে নিজেদের উচ্চস্তরের ভাবে। তারা নদীর চর দখল করতে চায়। অর্থহীন-ক্ষমতাহীন মাঝি জেলেরা তিতাসকে হাতছাড়া করতে চায় না। রামপ্রসাদ মাঝির মধ্যে আমরা একপ্রকার প্রতিবাদী সত্তা লক্ষ করেছি। সে মাঝিদের মধ্যে শ্রেণিচেতনা গড়ে তুলতে চায় এই বলে যে –তিতাসে জল থাকুক আর নাই থাকুক তা মাঝিদেরই থাকবে। মালোদের সে এককাট্টা হয়ে লাঠি ধরতে বলে। কারণ রামপ্রসাদ জানে যেখানে ক্ষমতার ও অর্থের অভাব, সেখানে একতাই হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড়ো ক্ষমতা ও প্রতিরোধ। কিন্তু মালোদের মধ্যে সেই শ্রেণিচেতনা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয় সে। কিন্তু সে হার মানেনি। নিজেই ভাইদের নিয়ে কৃষকদের সঙ্গে ভীরে যায়। কৃষকদের ক্ষমতা ও বলের সামনে সে টিকতে পারে না। জীবন দিতে হয় তাকে। আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, ক্ষমতার সামনে নিম্নবর্গরা বরাবরই ভীত। সামান্য প্রতিবাদী চেতনা তাদের থাকলেও তা সার্থকভাবে নিজেদের দাবি পূরণে ব্যর্থ হয়েছ বারবার। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক এই সত্যই তার 'ক্যান দ্য সাবঅলটার্ন স্পিক' প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। উপন্যাসের আরো দুজন নিম্নবর্গ চরিত্র বন্দে আলী ও করম আলী তাদের অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে তাদের ন্যুনতম শখ ও ইচ্ছেকে অবদমন করে। 'অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত্রির'- মতো কেটে যায় তাদের জীবন। তিতাস পারের মালোদের জীবনের শিকড় গেঁথে রয়েছে এই নিম্নবর্গীয় জীবনের গভীরেই। (ভট্টাচার্য ২০১০, পৃ. ২৪২-৪৫) তাই উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি পরতেই লক্ষণীয়, উচ্চবর্গের দ্বারা নিম্নবর্গের শোষণের চিত্রটি। রেল কোম্পানি যখন ভৈরবঘাটের মালোদের জমি দখল করে নেয় তখন তাদের মধ্যে

কোনো প্রতিবাদ জন্ম নেয়নি। কিন্তু মালোরা তাদের সমাজ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিজেদের বিদ্রোহী মনকে জাগিয়ে তোলে। কারণ,

> '... নিম্নবর্গরা কেবল মার খাবে তা নয়, তারাও হবে প্রতিবাদী, জানান দেবে নিজেদের বিদ্রোহী সত্তার। মালোরা তাদের সংস্কৃতি রক্ষার দৃঢ় চেতনার পরিচয় দেয়। তাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির মূলটুকু যাত্রার দল কঠোর কুঠারাঘাতে কেটে দিলে তাতে ভাঙন ধরে, ঠেকানোর জন্য প্রতিবাদী হয়ে ওঠে মোহন, বাসন্তী এবং অন্যান্যরা; যদিও তাদের এ চেষ্টা ব্যর্থতার মুখ দেখে।' (ঠাকুর (সম্পা.) ২০১৩, পৃ. ১৩৩)

সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' (১৯৫৮) উপন্যাসেও দেখা যাচ্ছে আধুনিককালের শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা ও তার ফলে নিম্নবর্গের সমস্যা ও সংকটের বর্ণনা। ভূমিপ্রথা, চাষিদের প্রতি অন্যায় অবিচার ও উচ্চবর্গের পোষা পুলিশ প্রশাসন এই নিম্নবর্গের ওপর জুলুম কায়েম করে। এই একমুখী শাসন-শোষণ ও অনিরাপদ সমাজে যুঝতে যুঝতে নিম্নবর্গের মধ্যে প্রতিবাদী সত্তাটুকুও নিঃশেষিত হয়ে যায়। তাঁর ছোটোগল্পগুলিতেও রয়েছে নিম্নবর্গের অবস্থানের চিত্র। 'গোত্রান্তর' গল্পে সঞ্জয় চরিত্রটি মধ্যবিত্ত ও স্বার্থপর। সঞ্জয়ের দৃষ্টিতে নিম্নবর্গ মূল্যহীন। কিন্তু নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিম্নবর্গের নারী নেনিয়াকে সে কিনে নেয় ভোগের জন্য। আবার শ্রমজীবী মানুষদের মিল বিরোধী আন্দোলনে সে যোগ দেয় তাঁর আত্মোন্নতির জন্য। 'পরশুরামের কুঠার' গল্পে রয়েছে উচ্চবর্গের নিম্নবর্গের নারীকে নিজ স্বার্থে কাজে লাগানো এবং তাকে ভোগ করার বাস্তব চিত্র। অর্থাৎ অর্থ দিয়ে সমস্ত কিছু কিনে নেওয়ার উচ্চবর্গীয় মানসিকতার মুখোশ খুলে ফেলা হয় এখানে। উঁচুশ্রেণি যখন ধনিয়া নামক এক নারীর কাছ থেকে মাতৃত্ব ও দেহ কিনে নেয় তখন সে আর অস্পৃশ্য থাকে না। কিন্তু যখন তারা সামাজিক স্বীকৃতি দাবি করে তখন তারা হয়ে যায় অস্পৃশ্য। মধ্যবিত্তের এই নিম্ন ও বিকারগ্রস্ত মানসিকতা এবং অর্থের দাম্ভিকতা নিম্নবর্গের চেতনায় যে আঘাত হানে তার সত্যতা তুলে ধরেছেন লেখক। (ভট্টাচার্য ১৩৫৬, পৃ. ৫০-৭১)

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে অমিয়ভূষণ মজুমদার একজন দিকপাল লেখক। তাঁর সৃজিত কথাসাহিত্যে অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে দেশভাগ পরবর্তী ছিন্নমূল মানুষেরা। উত্তরবঙ্গের মানুষ হিসেবে সেই অঞ্চলের আদিবাসী ও তথাকথিত অনগ্রসর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিপন্নতা, সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি ও রাজনীতিকে তিনি কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। ফলে তাঁর লেখার মধ্যে আমরা প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর জীবনধারাকে উঠে আসতে দেখেছি। ১৯৫৫ সালে 'নীল ভূঁইয়া' উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন তিনি। অমিয়ভূষণ মজুমদারের প্রান্তীয় অনগ্রসর তথা নিম্নবর্গ-প্রধান উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- 'মধু সাধুখাঁ' (১৯৮৮), 'মহিষকুড়ার উপকথা' (১৯৮১), 'সোদাল' (১৯৮৭), 'বিনদনি' (১৯৮৫), 'মাকচক হরিণ' (১৯৯১), 'হলং মানসাই উপকথা' (১৯৮৬) প্রভৃতি। তাঁর

উপন্যাসের বিষয় ও পটভূমির অধিকাংশ ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের লুপ্তপ্রায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে দেখা গিয়েছে - যারা অরণ্যচারী, শিকারি, অর্থাৎ তথাকথিত সভ্যসমাজ থেকে শতহস্ত দূরের মানুষ। 'মহিষকুড়ার উপকথা' ও 'হলং মানসাই উপকথা' উপন্যাসে অরণ্যঘেরা অরণ্যচারী মানুষের কথা তুলে ধরে তাদের জীবন সত্যকে আখ্যানের আড়ালে আমাদের সামনে পরিবেশন করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' বা 'কালিন্দী' উপন্যাস এর মতোই উত্তরবঙ্গের মহিষকুড়া ও হলং মানসাই নদীর তীরবর্তী অরণ্যবাসী মানুষদের নিয়ে রচিত হয়েছে উপন্যাস দুটি। যে সভ্যসমাজ, এই অরণ্যচারী মানুষদের অসভ্য নিম্নশ্রেণি বলে ব্রাত্য করে রেখেছিল অমিয়ভূষণ তাদের জীবনের অব্যক্ত সত্যগুলোকে আমাদের সামনে ব্যক্ত করেছেন। তার 'সোঁদাল', 'মাকচক হরিণ' ও 'বিনদনি' উপন্যাসগুলি উত্তরবঙ্গের হারিয়ে যাওয়া রাভা জনগোষ্ঠীর সমাজ-সংস্কৃতির বয়ান। উপন্যাসে রয়েছে রাভা জনগোষ্ঠীর উৎস, সমাজ-সংস্কার-জীবনযাপন। সমাজের মূল স্রোত থেকে ধীরে ধীরে রাভারা কীভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তাদের অস্তিত্বের পেছনে কীভাবে একটি প্রশ্ন চিহ্ন তৈরি হচ্ছে- এইসব তথ্য ও সত্যের মিশেলে আলোচ্য আখ্যানগুলি রচনা করেছেন তিনি। 'মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্যাসে পুঁজিবাদী যান্ত্রিক সভ্যতার করালগ্রাসে অরণ্যচারী আদিবাসীদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিবর্তনকে দেখান হয়েছে। লক্ষণীয়, বন্য মহিষকে আদিবাসীরা দেবতা জ্ঞানে পূজা করত, মহিষ তাদের শ্রম ও শক্তির প্রতীক। কিন্তু দেশকাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহিষের ব্যবহার অবলুপ্ত হতে থাকল। মহিষের স্থান দখল করল যান্ত্রিক সভ্যতার বড়ো বড়ো লরি। পশু শক্তির বদলে যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহারের ফলে পরিবেশ যেমন বিঘ্নিত হয়েছে তেমনি অরণ্য জনগোষ্ঠীর গ্রামীণ সভ্যতাও বিপর্যস্ত হয়েছে। লেখক কৌশলে লরিকে শোষণের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে যন্ত্রসভ্যতার কুফলটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

গল্পকার অমিয়ভূষণ তাঁর গল্পগুলির মধ্য দিয়েও তথাকথিত প্রান্তীয় নিম্নবর্গকে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর গল্প ভান্ডারে এক'শটিরও বেশি গল্প রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- 'দুলহারিণদের উপকথা', 'সাদা মাকড়সা', 'অরণ্যে রোদন', 'একটি শিকার কাহিনি', 'তাঁতীবউ', 'সাইমিয়া ক্যাসিয়া', 'একটি খামারের গল্প', 'মাকচক' ইত্যাদি। এইসব গল্পে উঠে এসেছে আদিবাসী সমাজের স্বভাব-সংস্কৃতি সভ্যসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বোধ, গ্রামীণ সভ্যতার আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভাঙ্গন, দেশভাগ পরবর্তী ছিন্নমূল মানুষদের নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর কাহিনি। 'সাইমিয়া ক্যাসিয়া' গল্পে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী পাহাড়ি মানুষের কথা স্থান পেয়েছে। 'তাঁতীবউ' গল্পে স্বামী গোকুলের স্বপ্ন তার একটি ফুটফুটে সুস্থ সুন্দর ছেলে। কিন্তু তার এই স্বপ্ন পূরণে গোকুল নিজেই ব্যর্থ, কোনো তাবিজ কবজে

কাজ না হলে গোকুলের ইচ্ছায় তাঁতি বউকে যেতে হয়েছে ফকিরের মন্ত্র নিতে, অপুষ্ট অসুস্থ সন্তানকে নিয়ে তাঁতি দম্পতির জীবন বেদনা গল্পে চিত্রিত হয়েছে। 'মাকচক' গল্পে উঠে এসেছে রাভা জনজাতির অন্তরজীবন। 'সাদা মাকড়সা' ও 'পায়রার খোপ' গল্পে দেখা যায় দেশভাগ পরবর্তী ছিন্নমূল মানুষদের উদ্বাস্তু জীবনের মর্মান্তিক করুণ চিত্র। (মুখোপাধ্যায় ১৯৯৪, পৃ. ১২৫-২৬)

ননী ভৌমিকের কথাসাহিত্যে বিশেষ অবদান না থাকলেও তাঁর গল্পগুলি আমাদের সমাজের তল থেকে দেখা ইতিহাসকে সামনে এনে দাঁড় করায়। সমাজের নিম্নস্তরীয় মানুষগুলির উচ্চস্তরীয় ব্যাখ্যা ও চিত্র তুলে আনতে লেখকের বিশিষ্টতা রয়েছে। তেভাগা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত ননী ভৌমিকের গল্পগুলি এককথায় নিম্নবর্গীয় জীবনের দর্পণ। 'একটি দিন-১৯৪৪' গল্পে ধরা পড়েছে বাংলার জনজীবনের ছবি- যেখানে বিড়ি শ্রমিক ইয়াসিন, ফটোগ্রাফার শকুন্তলা, কম্পোজিটর নীলমণি, চরিত্রের জীবনসংগ্রাম এবং সমগ্র বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জাগরণের ছবি উঠে এসেছে। 'খুনির ছেলে' গল্পে রয়েছে রহিম নামক ঘোড়ার গাড়ি চালকের কাহিনি। 'কেলে পাথরী' গল্পে দেখা যায় ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের ক্ষুধার যন্ত্রণার রূপ। 'হটাবাহার' গল্পে রয়েছে চা বাগানের শ্রমিকদের দুরবস্থা ও শোষণের কাহিনি। বিভিন্ন পত্রিকায় কর্মরত ননী ভৌমিক উপলব্ধি করেছিলেন ক্ষুধা হল এমন এক প্রবৃত্তি যা মানব জীবনের অন্যান্য বৃত্তিগুলিকে ধ্বংস করে দেয়। তাঁর গল্পের মূলসুর হল- প্রয়োজনে নিম্নবর্গীয় মানুষেরা অবস্থা ও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় এবং শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করে।

সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' (১৯৫৭) উপন্যাসটি বাংলা নদীভিত্তিক উপন্যাসের অন্যতম। লেখক এখানে মাছমারা অর্থাৎ জেলেসম্প্রদায়ের জলছবি এঁকেছেন। শুধু জেলেরা নয়, চুনুরী, ও রাজবংশীদের কথাও এখানে উঠে এসেছে। প্রধানত মাছমারা, মালো সম্প্রদায়ের জীবন বৃত্তান্তই এই উপন্যাসের উপজীব্য। মানিক ও অদ্বৈতের মতো লেখক 'গঙ্গা' উপন্যাসে মূলত মাছমারা জেলেদের জীবন সংগ্রাম, জীবন ধারণ ও গঙ্গা বক্ষে মীন আহরণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। সমাজের অঙ্গ হিসেবে এখানেও দেখা দিয়েছে ধনতন্ত্রের প্রভাব। উপন্যাসের নায়ক বিলাস এবং তার সহকারী পাচু। প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত তাদের জীবন সংগ্রাম নিম্নবর্গের যে সাহসিকতা ও অকুতোভয়ের প্রমাণ দিয়েছে তাতে নিম্নবর্গের ইতিহাসের এক অনালোকিত অধ্যায়কে আলোকিত করেছে। সমরেশ বসু তাঁর সাহিত্য রচনার উপাদান সংগ্রহ করেছেন ব্রাত্য অঞ্চল, শিল্পাঞ্চলের বস্তি, নিম্নবর্গীয় মানুষদের অমার্জিত অঞ্চলে। 'মহাকালের রথের ঘোড়া' (১৯৭৭) উপন্যাসটিও সেরকমই। ১৯৬৭ সালে গড়ে ওঠা শিলিগুড়ি সংলগ্ন নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। এই আন্দোলনের মূল কথা ছিল কৃষকদের

শোষণের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া। উপন্যাসে তাই গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলার চেতনা উঠে এসেছে। উপন্যাসের নায়ক রুহিতন কুরমি একজন আদিবাসী নিম্নবর্গ। আট বছর বয়স থেকেই জীবন সংগ্রাম করে চলেছে সে। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিল চা বাগানের কর্মী, কিন্তু তাঁর পিতা পশুপতি কুরমি সে পেশা থেকে সরে এসে জমির স্বপ্ন দেখেছিল। রুহিতনের ভাষায় জোতদার, জমিদার, মালিকরা ইচ্ছে করলেই তাঁর বাবাকে গিলে ফেলতে পারত কারণ তাদের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা। রুহিতনের কথায় উচ্চবর্গের নানা শোষণ পীড়নের কথা বাস্তব কঠিন ভাষায় উঠে এসেছে। রুহিতনের বিদ্রোহী মানসিকতা গড়ে উঠেছে বাবার মুখে শোনা নানা উৎপীড়ন অন্যায়ের কাহিনি শুনে। সে ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধর্মঘট ও আন্দোলনে শামিল হয়। কলকাতায় এসে কৃষকদের হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে সে, জেল খেটেছে এবং একবুক স্বপ্ন সফল করার অঙ্গীকারবদ্ধ এই যুবক লড়ে যায় শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত। কিন্তু রুহিতনের এই স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। জেলে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে সে একপ্রকার পঙ্গু হয়ে যায়। পরিবার পরিজন বিচ্ছিন্ন এই মানুষটি শেষে আশাহত সৈনিকে পরিণত হয় এবং আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে নিজের জীবনের লড়াইকে থামিয়ে দেয়। এইভাবেই নিম্নবর্গ তাদের প্রতিবাদে ব্যর্থ হয়েছে। নিম্নবর্গের ইতিহাসে কৃষক বিদ্রোহ একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা জুড়ে রয়েছে এবং সেখানেও দেখা গিয়েছে বৃহৎ আকারে গড়ে ওঠা আন্দোলন বা বিদ্রোহগুলি কীভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে ক্ষমতার কাছে। এক্ষেত্রে ইতিহাস যে তথ্য পরিবেশন করেছে সাহিত্যেও এর অন্যথা হয়নি। (মুখোপাধ্যায় ১৯৭৪, পৃ. ২৭৯-২৮১) তাঁর ছোটোগল্পগুলিতেও অসহায়, সর্বহারা নিম্নবিত্ত, নিম্নবর্গের পরিচয় উঠে এসেছে। পাড়ি, শানা বাউরির কথকতা ইত্যাদি। সমরেশ বসু তাঁর ছোটোগল্পগুলির মধ্য দিয়েও নিম্নবর্গের আখ্যান নির্মাণ করেছেন। সেখানে আছে প্রান্তিক মানুষের প্রেম-দ্বন্দ্ব-ষড়যন্ত্র-দাম্পত্য-দারিদ্র্য-পীড়ন-বঞ্চনা ও শোষণের চিত্র। 'শেষ মেলায়' ও 'গুণিন' গল্প দুটি নিম্নবর্গের প্রেমপিপাসায় উদগ্র হিংস্রতা ও কামনা-বাসনার কাহিনি। 'অকাল বৃষ্টি' গল্পে দেখা যায়, সিধু নামক এক ডোম চরিত্রকে। সে সারাদিন মরা পোড়ায় ও মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকে। ডোম ও বাউরিদের নিয়ে লেখা আরেকটি গল্প হল 'খিঁচাকবলা'। খিঁচাকবলা একজন ডোম সন্তান। দারিদ্র্যের হাত থেকে বাঁচতে পকেটমারি করে সে জীবন চালায়। একদিন কোনো এক ভিড় বাসে সে একজনের পকেট মেরে ১২৫ টাকা পায়। এই ঘটনা দেখে ফেলে পেরকেশ বাউরি। সে সেই টাকার অর্ধেক দাবি করে। কিন্তু খিঁচাকবলা রাজি হয় না। ঘটনাচক্রেই সেদিন রাস্তায় একসিডেন্টে পেরকেশ বাউরির মৃত্যু হয়। 'শানা বাউরির কথকতা'-গল্পে শানা বাউরি নামক এক অসহায় লাঞ্ছিত পুরুষের কাহিনি। তার স্ত্রী উচ্চবংশীয় কামুক পুরুষদের নির্লজ্জ কামনার শিকার হয়ে বারে বারে ঘর ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যায়।

শানা জীবিকা সুত্রে বাইরে থাকে বলে এত খবর অজানা থাকে তার। উচ্চবর্গীয়দের কামনার শিকার হয়ে শানা বাউরির মতো একজন অন্ত্যজ মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। আবার ‘প্রবর্তন’ গল্পে ব্রাত্য মানুষের উল্টোচিত্র লক্ষিত হয়। গল্পে এক নাপিত পরিবারে অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও ঘটনাচক্রে তাদের পরিবারের সুখ-শান্তি-আনন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। ‘পাড়ি’ গল্পে দেখান হয়েছে নট জাতের এক দম্পতির জীবন সংগ্রামের কাহিনি। তারা গ্রামের এক বাবু সাহেবের বাড়িতে শুকর পালনের কাজ করে। লংকু সর্দার তাদের বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে শহরে আনে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তারা বেকার হয়ে পড়ে। অর্থাভাবে ক্ষুধার যন্ত্রণা চেপে রেখে দিন কাটে তাদের। একদিন গঙ্গার ধারে এক শুকর ব্যবসায়ী শুকর প্রতি এক আনার বিনিময়ে শুকরগুলি গঙ্গা পার করে দিতে বললে তারা পেট ভরে ভাত খেতে পাওয়ার আশায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শুকরগুলিকে পার করে দেয়। শুকরগুলিকে পার করা যেন তাদের কাছে জীবনতরী পার করার মতো। তারা সফল হয়, ভরপেট ভাত খেয়ে তারা নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে।

অন্যদিকে মহাশ্বেতা দেবীর রচনাগুলি নিম্নবর্গের উত্থানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর সৃষ্ট কথাসাহিত্যে মূলত আমরা নিম্নবর্গকে অপর থেকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়াতে দেখি। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গকে নিয়ে একটি গণবৃত্ত সৃষ্টি করেছেন। বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে মহাশ্বেতা দেবীর মতো নিম্নবর্গকে সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আবহের মূলস্রোতে আর কেউ আলোচনা করেননি। তাইতো তাঁর কথাসাহিত্যে লোধা-চুয়াড়-সাঁওতাল-শবর-হরিজনদের আনাগোনা। নিম্নবর্গের ইতিহাসের মতোই তিনি তাঁর লেখায় তেভাগা-নকশাল-কোল-সাঁওতাল- চুয়ার বিদ্রোহকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সিপাহী বিদ্রোহকে পটভূমি করে রচনা করেছেন ‘নটী’ (১৯৫৭) উপন্যাসটি। যেখানে ইংরেজদের সঙ্গে গরিব চাষিদের সম্পর্ক ও শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে চাষীদের লাঙল ছেড়ে অস্ত্র তুলে নেওয়ার চিত্র উঠে এসেছে। তারাশঙ্করের ‘কবি’ উপন্যাসের মতোই মহাশ্বেতা সৃষ্টি করেছেন ‘কবি বন্দ্যঘটি গাঞ্রির জীবন ও মৃত্যু’ (১৯৬৬) উপন্যাসটি। ‘কবি’- উপন্যাসে রয়েছে ডোম নিতাইয়ের কবি হয়ে ওঠার কাহিনি, অন্যদিকে আলোচ্য উপন্যাসটি কবি কলহনের আত্ম-আবিষ্কারের কাহিনি। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, নিতাই তার সামাজিক বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে উঠে একজন কবি হয়ে উঠতে পেরেছিল, কিন্তু চুয়াড় যুবক কলহন তা পারেনি- কবি হয়ে ওঠার ইচ্ছে সমাজের কাছে অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ফলে সমাজ তাকে এই অপরাধের দণ্ড হিসেবে হাতির পায়ের তলে পিষ্ট করেছে। রাজা গর্গবল্লভ চুয়াড় কলহনের কবি হিসেবে উত্থানকে মেনে নিতে পারেনি। কারণ একজন নিম্নবর্গ শিক্ষিত বা প্রতিষ্ঠিত হলে তার দ্বারা সমগ্র চুয়াড় সমাজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, উজ্জীবিত হবে। ফলে নিম্নবর্গের

উত্থানকে স্তিমিত করে দেওয়ার জন্য কলহনকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে বিহারের সামাজিক প্রেক্ষিতে 'মাস্টারসাব'(১৯৭২) উপন্যাসে দলিতশ্রেণির প্রতি মহাজনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি ও শোষণ-নিপীড়নের চিত্র ফুটে উঠেছে। 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭) উপন্যাসটিতে রয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বীরসা মুন্ডার নেতৃত্বে বিদ্রোহের কাহিনি। জমির অধিকার থেকে দীর্ঘদিন বঞ্চিত মুন্ডারা বীরসা মুন্ডার নেতৃত্বে যেভাবে একের পর এক বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে তার ঐতিহাসিক চিত্র উপন্যাসে উঠে এসেছে। কিন্তু একটা সময় ইংরেজদের রাজনীতির শিকার হয়ে বীরসাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। ঠিক একইভাবে 'অপারেশন বসাই টুডু' (১৯৭৮) উপন্যাসে বসাই লক্ষ করে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষেতমজুর ও সাঁওতালরা সমাজের উচ্চবর্গ দ্বারা শোষিত হয়ে আসছে। লেখক বসাইকে সাঁওতালদের প্রতিনিধি ও শোষিত কৃষকদের প্রতিভূ রূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু বসাইকেও একইভাবে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'অগ্নিগর্ভ' (১৯৭৮) উপন্যাসেও উচ্চবর্গ দ্বারা সমাজের সাধারণ মানুষদের শোষণের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। উপন্যাসের ভূমিকায় লেখিকা তাই জানিয়েছেন,

> 'শোষিত ও নির্যাতিত মানুষ, তাদের প্রতি সংবেদী মানুষই আমার লেখার প্রধান ভূমিকায়। ... স্বাধীনতার একত্রিশ বছরে আমি অন্ন, জল, জমি, ঋণ, বেঠবেগারী ,কোনোটি থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না। যে ব্যবস্থা এই মুক্তি দিল না, তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র ও সূর্যসমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরণা।'
>
> (দেবী ১৯৭৮, পৃ. আট)

'চট্টি মুন্ডা এবং তার তীর' (১৯৮০) উপন্যাসটি একজন মানুষ ও তার সমাজ আন্দোলন এর কাহিনি। আলোচ্য উপন্যাসে দেখান হয়েছে, শাসকশ্রেণির শোষণ কীভাবে মুন্ডা সম্প্রদায়কে পদতলে পিষ্ট করে রেখেছে। এর প্রতিবাদ স্বরূপ চট্টি মুন্ডার নেতৃত্বে মুন্ডাদের বিদ্রোহ ও বীরত্বের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। জাতীয় অর্থনীতিতে ভারতীয় সভ্যতার অগ্রগতিতে ব্রাত্য মুন্ডা সম্প্রদায়কে যুক্ত করার জন্য মহাশ্বেতা দেবী তাদের এভাবে উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। 'ব্যাধখন্ড' (১৯৯৭) উপন্যাসে দেখি সমাজের নিম্নবর্গ ব্যাধ ও শবর জীবনের ধারাভাষ্য । অরণ্য নির্ভর ব্যাধ ও শবর জনগোষ্ঠী কীভাবে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের শিকার হয়েছিল- সেই কাহিনি আলোচ্য উপন্যাসের উপজীব্য। 'সরসতীয়া' (১৯৭৯) উপন্যাসে দেখা যায় নিম্নবর্গীয় নারীরা জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার জন্য নিম্নমানের কাজ করতে বাধ্য হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এই নারীরা যে লিঙ্গশোষণের শিকার হয়েছে তার মর্মান্তিক চিত্র রয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। এই অবহেলিত ও অবমানিত নারীদের একজন হল লছমি। যে একই সঙ্গে পুরুষের কামনাকে সন্তুষ্ট করে এবং সমাজের অবমানিতা নারীদের সাহায্য করার সংকল্প করে। এছাড়াও মহাশ্বেতা দেবীর যে সমস্ত উপন্যাসে প্রান্তিক, অন্ত্যজ ও অনগ্রসর শ্রেণির বয়ান রচিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে

উল্লেখযোগ্য হল- 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪), 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৬), 'সিধু কানুর ডাকে' (১৯৮১), টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা' (১৯৯০) প্রভৃতি। (রহমান ২০১৫, পৃ. ৯৭-১২৭)

তবে শুধু উপন্যাসেই নয়, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্পগুলিতেও সমাজের সাধারণ, নিরন্ন, শোষিত-বঞ্চিত মানুষদের উঠে আসতে দেখি। যেমন- 'জাতুধান', 'বান', 'ভাত', 'জন্মতিথি', 'রাক্ষস' প্রভৃতি গল্পে নিরন্ন মানুষের ক্ষুধার যন্ত্রণার কথা প্রকাশিত হয়েছে। 'স্তনদায়িনী' গল্পটি মহাশ্বেতা দেবীর একটি প্রতিনিধি স্থানীয় গল্প। স্তন্যদায়িনী- যশোদা ধনী পরিবারের শিশুদের স্তনদান করত- সে অর্থে যশোদা সেই শিশুদের দুধ-মা। কিন্তু ঘটনাক্রমে তার মারাত্মক কর্কটরোগ ধরা পড়ে। যশোদার কর্কটরোগ যে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গিয়েছে তা স্পষ্ট হয়েছে গল্পে। বিশ্বসংসারকে যে দুধ দিয়েছে তার মৃত্যু হয়েছে নির্জনে-নিঃশব্দে। দাহ করার একজন মানুষও পাওয়া যায়নি। শেষে ডোমই তাকে দাহ করেছে। স্বার্থপর সমাজের বীভৎস রূপ গল্পটির মধ্যে ধরা পড়েছে। 'ভাত' গল্পে রয়েছে উচ্ছব চরিত্রের চিরক্ষুধার পরিচয়। বন্যায় স্ত্রী সন্তানকে হারিয়ে উন্মাদপ্রায় উচ্ছব শহরে এসে বড়োবাড়িতে কাজ পায়। কিন্তু সেই সকাল থেকে খেটে যাওয়া উচ্ছবকে খাওয়ার কথা কেউ বলে না। ভাতের ফ্যানের গন্ধে খিদে আরো মাথাচারা দিয়ে ওঠে তার। কিন্তু সেই সময় মৃতপ্রায় বুড়োকর্তার মৃত্যু হলে অশৌচ সংস্কার পালনে বাসিনী সমস্ত রন্ধন ফেলে দিতে যায়। ভাত ফেলে দেওয়া দেখে উচ্ছবের মাথা ঠিক থাকে না। সে বাসিনীর হাত থেকে ভাত ভরা পিতলের ডেকচি নিয়ে স্টেশনের মাঠের দিকে দৌড়ে যায়। কিন্তু পিতলের বাসন চুরি করার মিথ্যা অপবাদে তার পেছনে পুলিশ ধাওয়া করে। পুলিশ তাকে ধরতে গিয়ে দেখে উচ্ছব দুহাতে মুঠো মুঠো ভাত গোগ্রাসে গিলে যাচ্ছে। জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন ভাতের জন্য একজন নিরন্ন নিম্নবর্গের কাছে সমাজবোধ আশা করা বৃথা। অন্ন, ক্ষুধা, আশ্রয় ও পোশাকের প্রয়োজন বা দাবিকে অন্যায় বা চুরির অপবাদ দেওয়া হয়েছে। নিম্নবর্গের এই করুণ আখ্যান এর থেকে আর কী হতে পারে। আসলে মহাশ্বেতা দেবীর সৃষ্টিকর্ম সময়ের দলিলিকরণে বিশ্বাসী। তাঁর গল্পগুলি

> '... জাতপাত, জমিজঙ্গলের অধিকার, এবং সর্বোপরি ক্ষমতাসীন শ্রেণীর ক্ষমতার আস্ফালনের তথা কায়েম রাখার পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে নিম্নবর্গীয় মানুষের শোষণের ক্রমান্বয়িক ইতিহাস।' (দেবী ১৯৯৩, পৃ.vii)

একশ্রেণির মানুষের তৈরি সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির সঙ্গে আর একশ্রেণির দ্বন্দ্বের সত্য উদঘাটন করা লেখকের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ একশ্রেণি সুবিধাভোগী এবং আরেক শ্রেণি শোষিত-বঞ্চিত। মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য তাই প্রতিবাদের আখ্যান, ক্রুদ্ধ সাহিত্য। সাহিত্যের আকল্পে নিম্নবর্গের অপর থেকে প্রতিপক্ষে উত্তরণের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে।

এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, প্রাক্-মহাশ্বেতা পর্বের আখ্যানবিশ্বে আমরা যে নিম্নবর্গকে দেখলাম তা আসলে নাগরিক মধ্যবিত্ত বা কোনো ক্ষেত্রে উচ্চবর্গীয় চিন্তা চেতনায় গড়ে তোলা নিম্নবর্গ। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী, অভিজিৎ সেন, দেবেশ রায়, ভগীরথ মিশ্র প্রমুখ সাহিত্যিকেরা নাগরিক মানসিকতায় গ্রামীণ জীবন ও নিম্নবর্গকে দেখার বদলে তারা আরো প্রান্তে, গভীর অন্ধকারে, পাহাড়ে, জঙ্গলে প্রবেশ করে সেখানকার মানুষদের কথা টেনে বের করে এনেছেন। তারা বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসের মঞ্চে নিম্নবর্গকে 'অপর' থেকে প্রতিপক্ষে এনে দাঁড় করিয়েছেন। সেদিক থেকে তাদের আমরা স্বতন্ত্র ধারার লেখক হিসেবে গণ্য করতে পারি।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ও সমাজে উপেক্ষিত জনজাতিকে তাঁর সাহিত্যের আধার করে তুলেছেন। তার বিখ্যাত 'বনবিবি উপাখ্যান' (১৯৭৮), 'বাগদা' (১৯৮৩), ও 'সন্ন্যাসী বাওয়ালি' (১৯৮১) উপন্যাসে সুন্দরবন অধ্যুষিত অঞ্চলে দরিদ্র মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিদিনের জীবনসংগ্রাম চিত্রিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর 'দধীচির হাড়' 'শাসখোল' 'কালবেলা', 'অন্নজল' প্রভৃতি গল্পে উঠে এসেছে বাদা অঞ্চলের মানুষদের দুঃখ দুর্দশার চিত্র। 'ধানের গন্ধ' গল্পে দেখা যায় শ্রমজীবী ক্ষেতমজুরদের জীবনের যান্ত্রিকতা।

মাটির সঙ্গে মিশে থাকা মানুষদের কথা উঠে এসেছে আব্দুল জব্বার-এর কথাসাহিত্যে। তাঁর অধিকাংশ আখ্যানে এইসব সাধারণ মানুষদের কথা আমরা পেয়েছি। তাঁর প্রতিনিধি স্থানীয় নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস 'ইলিশমারির চর' (১৯৬২) ধীবরজীবনের ধারাভাষ্য। জেলেজীবন নিয়ে যেসব বিখ্যাত উপন্যাস রচিত হয়েছে, আলোচ্য উপন্যাসটি তার অন্যতম। জেলেদের জীবন-জীবিকা ও তাদের সংগ্রাম উপন্যাসের মূল উপজীব্য। এই ইলিশমারির চরে দুজন মহাজন-তারিনী ও তরবদি মাঝি। জয়নদ্দি উপন্যাসের মূল চরিত্র। সজীব ডাকাবুকো সহজ প্রকৃতির মানুষ জয়নদ্দি মহাজনদের শোষনে সন্তুষ্ট নয়, তাই সে মহাজনদের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়ার জন্য জেলেদের সমবেত করতে চায়। জেলেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সে স্বপ্ন দেখে নিজের জালে মাছ ধরবার- যাতে মহাজনদের থেকে ঋণ নিতে না হয় কোনোদিন। তাই সে তরবদি মাঝিকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে এবং জেলেদের দাবিকে মানতে বাধ্য করেছে। এক্ষেত্রে জয়নদ্দি উচ্চবর্গের কাছে হেরে যায়নি। প্রতিবাদী ও অধিকার চেতনায় জেলেদের অধিকার আদায় করে নিয়েছে সে। এছাড়া 'শঙ্খবালা' (১৯৭৫) উপন্যাস দেখা যায় প্রান্তিক নিম্নবর্গের চিত্র। যেখানে দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র উপকূলে ডুবুরিদের কথা উঠে এসেছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রশিদ একজন ডুবুরি। মহাজন শোষণের শিকার রশিদের পিতা দীর্ঘ ৪০ বছর ডুবুরীর কাজ করে চোখের

দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। এরা মহাজনের হয়ে দিনের-পর-দিন সমুদ্র থেকে শাঁখা তোলার কাজ করে কিন্তু বিনিময়ে মহাজনেরা ডুবুরিদের যা পারিশ্রমিক দেয় তাতে তাদের অভাব মেটেনা। মহাজনদের এই বঞ্চনাকে সহ্য করতে না পেরে রশিদ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। সে অন্যান্য ডুবুরি ও মাঝিদের একত্রিত করে তাদের দাবি-দাওয়া মহাজনদের কাছে পেশ করে। মহাজনরা নানা অছিলায় তাদের নিরস্ত করতে চাইলেও ডুবুরিদের একতা ও প্রতিবাদের কাছে হার মানতে হয় তাদের। জয় হয় প্রতিবাদী চেতনার।

তাছাড়া তাঁর গল্পগুলির মধ্যেও দেখা যায়- দুঃখ-দুর্দশায়, রোগে-শোকে জর্জরিত মানুষগুলিকে। গ্রামগঞ্জের নিম্নবিত্ত দরিদ্র মানুষেরা গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দু। যেমন- 'বেদেনীর ফাঁদ' গল্পে হকার, 'তারাপদ ধাড়া', 'জীবন্ত জগদম্বা', 'বেতাল ভৈরব' প্রভৃতি গল্পে উঠে এসেছে সাধারণ কৃষক ও কৃষক পরিবারের কথা। 'বুভুক্ষা' গল্পে খয়রণ নাম্নী একজন ভিখারিনীর মধ্য দিয়ে সামাজিক বৈষম্য, দারিদ্র্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। 'সাগরদ্বীপের মহাজন' গল্পে রয়েছে সুন্দরবন অঞ্চলে কাঠুরিয়াদের জীবনে একদিকে বাঘের হিংস্রতা অন্যদিকে মহাজনদের শোষণের চিত্র। 'শিকার', 'বদলিওয়ালা' প্রভৃতি গল্পে দেখা যায় শ্রমিক জীবনের কাজের অনিশ্চিয়তা উচ্চবর্গের শোষণের চিত্র। 'সমুদ্র ভৈরবী' গল্পের লেখক ডুবুরিদের জীবন সংগ্রাম ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছেন। আলোচ্য গল্পগুলি ছাড়াও তাঁর 'সোঁদা মাটি নোনা জল' (১৯৯২) গল্প সংকলনের নানা গল্পে চব্বিশ পরগনা অঞ্চলের অন্ত্যজ নিম্নবর্গের জীবনসংগ্রামের কাহিনিকে চিত্রিত করেছেন। 'মানুষজন' গল্প-সংকলনের গল্পগুলিতেও নিম্নবর্গের ভিড়। গ্রামগঞ্জের নানা পেশার মানুষ যেমন- শ্রমিক, চাষী, মৌলবী, পতিতাদের আঁতের কথা লেখক নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

বাংলা গল্প-উপন্যাসকে যাঁরা বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম দেবেশ রায়। স্বাধীনতা-উত্তর কথাসাহিত্যের পালাবদলে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর উপন্যাস-গল্পগুলিতে কাহিনির চেয়ে ব্যক্তি-মানুষের অবস্থান গুরুত্ব সহকারে উঠে এসেছে, যার অধিকাংশ স্থান জুড়ে বিরাজ করছে সমাজের নিম্নবর্গ। তাঁর যেসব উপন্যাসগুলিতে নিম্নবর্গের পাঁচালী রয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'মফস্বলী বৃত্তান্ত' (১৯৮০), 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮), 'ইতিহাসের লোকজন' (১৯৯৭), 'বরিশালের যোগেন মন্ডল'(২০১০) প্রভৃতি। 'মফস্বলী বৃত্তান্ত'-এ দেখা যায়, লেখক উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনগোষ্ঠীর দরিদ্র বুভুক্ষু মানুষের জীবন ও ক্ষুধার যন্ত্রণাকে এক নির্মম সত্যরূপে উদঘাটিত করেছেন। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসটি লেখকের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অন্যতম। এখানে উত্তরবঙ্গের প্রধান নদীগুলির একটি তিস্তার তীরবর্তী অঞ্চলের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পাঁচশো বছরের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

আর যেখানে রাজবংশী ও অধিবাসীরা রয়েছে সেখানে উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় শোষকশ্রেণি ও অবস্থান করছে। জমিদার-জোতদাররা এসব আদিবাসীদের মানুষ বলে গণ্য করে না। কেন্দ্রীয় চরিত্র বাঘারু তার আসল নাম নয়, বাঘ মারার জন্য তার এটি পাওয়া নাম। তার কোনো নাম উপন্যাসে নেই। এই বাঘারুর জীবন ইতিহাসেরই বিবরণ আলোচ্য উপন্যাসটি। তার কোনো সামাজিক পরিচয় নেই- আত্মমর্যাদা ও মনুষ্যত্বহীন বাঘারুর একমাত্র পরিচয় সে গয়ানাথ জোতদারের মুনিস। বাঘারুর মতো লোকেরা কীভাবে চিরকাল বড়োলোকের দাসত্ব করে যায় তার বিবরণ রয়েছে উপন্যাসে। কিন্তু একটা সময়ে গয়ানাথ একনিষ্ঠ বাঘারুকে তাড়িয়ে দিলে সে নিপুছাপুরের শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে যায়। বাঘারুদের মতো মানুষের মুখে তবু কোনো প্রতিবাদ নেই- প্রতিবাদ থাকতে নেই যেন। এরা তাই বরাবর উচ্চবিত্তদের প্রয়োজনে তাদের দিয়ে অমানবিক আজ পর্যন্ত করিয়ে নেয়, এবং প্রয়োজন করে ফেলে দিতেও দ্বিধা করে না। এই কষ্ট সহিষ্ণু মানুষগুলোর কোনো সামাজিক মর্যাদা নেই- দেয় না কেউ। বাঘারুরা বরাবর উচ্চবিত্তের কাছে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সেই কারণেই প্রতীকী অর্থে বাঘারুর কোনো নাম নেই উপন্যাসে। কারণ সেইসব বঞ্চিত-প্রতিবাদহীন-শোষিত মানুষগুলির প্রতিভূরূপে লেখক তাকে সৃজন করেছেন এবং তার জীবন ইতিহাস বর্ণনার মধ্য দিয়ে আসলে লেখক নিম্নবর্গের ইতিহাসকেই লিখতে চেয়েছেন। উপন্যাসের মতোই দেবেশ রায়ের ছোটোগল্পগুলিও নিম্নবর্গের চালচিত্রে ঘেরা। 'মৃত জংশন ও বিপদজনক ঘাট'- গল্পে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের জীবন সংগ্রাম বর্ণিত। 'তিন পুরুষের উপাখ্যান', 'বটা সান্যালের অন্তর্দ্বন্দ্ব' -গল্পগুলিতে রয়েছে তৎকালীন বাঙালি বুর্জোয়া সমাজের শোষন উৎপীড়নের ছবি। 'ক্ষয় ও তার প্রতিকার' গল্পে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় আছে। 'মানুষ রতন' গল্পে দেখানো হয়েছে সত্তরের দশকে বারাসাত ও বরানগরে তৎকালীন প্রশাসক দ্বারা যে বিশালসংখ্যক সাধারণ মানুষদের খুন করা হয়েছিল—তার বিস্তৃত কাহিনি। আসলে দেবেশ রায় তাঁর আখ্যানে নিম্নবর্গকে আলোকিতই শুধু করেননি, সাহিত্যের মঞ্চে নিম্নবর্গকে প্রতিপক্ষ হিসেবে নির্মাণ করেছেন। (নাথ ২০০৭, পৃ. ৮৬-৯০)

দুই বাংলার প্রতিনিধি স্থানীয় লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সমাজ ও ইতিহাস সচেতন আখ্যান সৃষ্টি করেছেন। তাঁর আখ্যান মূলত শ্রমজীবী মানুষের কথা বলে। তার বিখ্যাত দুটি উপন্যাস- 'চিলেকোঠার সেপাই' (১৯৮৬) ও 'খোয়াবনামা' (১৯৯৬) -য় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। 'চিলেকোঠার সেপাই'- উপন্যাসে ১৯৬৯ এর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের গণঅভ্যুত্থানের চিত্র বর্ণিত। 'খোয়াবনামা' উপন্যাসে দেখা যায় গ্রামবাংলার নিম্নবৃত্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রাম। আর এই ঐতিহাসিক আবহে জমিদার,

জোতদার,বর্গাদার, আধিয়ারের সঙ্গে কামলা, কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে যে শোষণ নিপীড়ন ও বঞ্চনার টানাপোড়েন তার চিত্র উঠে এসেছে। তাছাড়া উঁচু-নিচু শ্রেণির বাদ-প্রতিবাদ, আর্থিক অভাবে মাঝি-কলুদের জাতিগত পেশা ছেড়ে কৃষিকর্মকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার করুণ চিত্র উপন্যাসের উপজীব্য হয়ে উঠেছে। উপন্যাসে লেখক যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তাও নিতান্তই নিম্নশ্রেণির সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা।

গ্রাম ও গ্রামের অপমানিত, অবহেলিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের কথাকার হলেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বিখ্যাত 'গহীন গাঙ' (১৯৭৯) উপন্যাসটি এর পরিচয়। উপন্যাসটি রচনার অভিজ্ঞতা ও কারণ সম্পর্কে লেখক 'গহীন গাঙ' এর ভূমিকায় জানিয়েছিলেন,

> "বিশেষ প্রয়োজনে সুন্দরবন অঞ্চলে কাটাতে হয়েছিল বেশ কিছুদিন। প্রত্যক্ষ করেছিলাম অরণ্য, নদী ও মানুষের জীবিকার সংগ্রাম। প্রতিদিনের বেঁচে থাকার পাশাপাশি ধর্ম, লোকাচার, স্বপ্ন, অবিশ্বাসের দোলাচলে যে মানুষ বাঘ-কুমির-কামোট ও 'মনুষ্যদাপট' বুকে নিয়ে নোনা গাঙের 'গোন' 'বেগোন'- এর মতো, ইতিহাস তৈরি করছে- আধুনিকতা যাকে বলে সাবঅলটার্ন-এ উপন্যাস তাদের জীবনের কয়েকটা দিন।" (চট্টোপাধ্যায় ১৪১৮, পৃ. v-vi)

লেখকের ভূমিকাংশ থেকে স্পষ্ট যে উপন্যাসের মূল উপাদান নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন ইতিহাস। বাদা অঞ্চলে মাছমারাদের দাদন দেয় খাটিদারেরা। প্রকৃতপক্ষে এরাই নৌকা ও জালের মালিক। রাজনৈতিক ক্ষমতার বলে এই খাটিদারেরা জেলেদের বাধ্য করে তাদের কাছে কম দামে মাছ বিক্রি করতে। বিভিন্ন আর্থিক ও রাজনৈতিক কারণে জেলেরা তাদের যাতাকল থেকে বেরোতে পারে না। শুধু খাটিদারের অন্যায় শোষণ নয়, এদের সঙ্গে রয়েছে মহাজনরাও। ললিত ঈশ্বর মহাজনের কাছ থেকে তিন বছর আগে পঞ্চাশ টাকা ধার নিলে তার মৃত্যুর পর জানা যায় সেই টাকা সুদে আসলে দু'শো পয়তাল্লিশ টাকায় দাঁড়িয়েছে। উপন্যাসের এই ললিত চরিত্রটি আব্দুল-ঈশ্বরদের মতো খটিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু ললিতের অকস্মাৎ মৃত্যু প্রমাণ করে উচ্চবর্গের রাজনৈতিক কৌশলের কথা। ললিতের নেওয়া ধার ও তার জমি আত্মসাৎ করতে মরিয়া হয়ে ওঠে ঈশ্বর ও আব্দুল। ললিতের মৃত্যুর পর তার পুত্র শ্রীপদও এই মহাজন ও খটিদারের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি। (চক্রবর্তী ১৪২০, পৃ. ১১৪-১২০) উপন্যাসের মতোই তাঁর গল্পগুলোতেও নিম্নবর্গের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। 'বন্ধুর বেশে' গল্পে গ্রামীণ জীবনের কুঁড়ে নামক সৎ যুবকের দুঃখ দুর্দশার কাহিনি চিত্রিত হয়েছে। 'চব্বিশ ফুট' গল্পটিতে মানুষের যাযাবর জীবন ও মেথরদের নিম্নবর্গীয় জীবনযাপনের প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে।

আশির দশকে রচিত অভিজিৎ সেনের 'রহু চন্ডালের হাড়' (১৯৮৫) উপন্যাসটি বাজিকরদের দেড়'শ বছরের ইতিহাস। উত্তরবঙ্গের এই বিশেষ সম্প্রদায়টি সমাজের অন্যান্যদের কাছে মানুষ বলে গণ্য নয়। তারা সমাজের কাছে অচ্ছ্যুৎ। শারিবার স্মৃতিতে শোনা যায়-

> 'শারিবার নানির কথা মনে পড়ে। নানি বলত, আমরা তো অছুতের জাত রে, শারিবা। গোরখপুরে আমরা অছুৎ ছিলাম। তার আগেৎ যেথায় ছিলাম, সেথা তো হামাদের ছেঁয়া মারানো পাপ! সেথায় অছুৎ জাতকে রাস্তাৎ যাতে হলে ক্যানেস্তারা বাজায়ে যাতে হয়। লয়তো, জেতের মানষের গায়েৎ হাওয়া লাগে, ছেঁয়া লাগে। সি বড পাপ!'
>
> (সেন ১৩৬২, পৃ. ২২০)

নানি লুবিনির কথা অনুযায়ী যুগ যুগ ধরে পিতৃপুরুষের পাপের দায়বদ্ধ বহন করে চলেছে।কিন্তু এই ছুৎমার্গের মার্গ কারা প্রশস্ত করেছে। আসলে পিতৃ-পুরুষের পাপ যে আসলে নিম্নবর্গের নির্মাণকে ত্বরান্বিত করেছে তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না।যারা সমাজের ধারক-বাহক তাদের সুবিধার্থে কোনো সম্প্রদায়কে এই অচ্ছ্যুৎ বা পাপের জালে জড়িয়ে চিরকাল নিম্নবর্গ করে রাখতে চায়।উপন্যাসের লেখক এই বাজিকর জনগোষ্ঠীর পূর্ব ইতিহাস বর্ণনা করা থেকে শুরু করে তাদের সমাজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান ও যাযাবরের মতো এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাযাবর জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন। বাজিকরদের জীবন বর্ণনা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে উপন্যাস উঠে এসেছে সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা। কিন্তু সামাজিক দূরত্ব একারণেই বাজিকররা সাঁওতালদের বিদ্রোহে যোগদান করেনি। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রহু দিনের পর দিন আরো কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। সে বুঝতে পারে, উচ্চবর্গের ভ্রষ্টাচারগুলি ধীরে ধীরে তার নিজ গোষ্ঠীর লোকেরাই রপ্ত করে নিচ্ছে। রহু একটা সময় স্বপ্ন দেখে বাজিকরদের নেতৃত্ব দিয়ে তাদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে কিন্তু সে রক্ষা করতে পারে না শেষ পর্যন্ত। বাজিকরদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্বাধীকার প্রদান করা স্বপ্ন নিয়ে উচ্চবর্গের হাতে রহুকে প্রাণ দিতে হয়।কিন্তু রহু পরবর্তীকালে বাজিকরদের কাছে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়। রহুর হাড়কে তারা নিজেদের মুক্তির স্মারক হিসেবে চিহ্নিত করে। তাঁর ছোটোগল্পগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরবঙ্গের গ্রামজীবনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। 'পদ্ধতি' গল্পে নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষের নকশালপন্থী হয়ে ওঠার আদর্শগত পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। 'আইন শৃঙ্খলা' গল্পে আছে মহাজনদের অত্যাচারের কথা, 'ব্রাহ্মণ্য' গল্পে রয়েছে জাতি সংস্কারের প্রেক্ষিতে গ্রামীণ জীবনের আচার শক্তি ও সংস্কারের কথা। (ভট্টাচার্য ২০১০, পৃ. ৩০৫-১৫)

সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যের আঙিনায় নিম্নবর্গকে প্রধানরূপে তুলে ধরেছেন। তাঁর বিখ্যাত 'নদী-মাটি-অরণ্য' (১৯৯৭) 'মহুলবনীর সেরেঞ' (১৯৯৫), 'টাঁড় বাংলার উপাখ্যান',

(২০০০) প্রভৃতি উপন্যাসগুলির পটভূমি গ্রামবাংলা ও তার জনজীবন। তাঁর 'মহুলবনীর সেরেঞ' উপন্যাসটি সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জনজীবন ও তাদের গান নিয়ে রচিত হয়েছে। মেদিনীপুর জেলার সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী মহুলবনী ও লামাডিহির সাঁওতাল জনজীবনে এই উপন্যাসের উপজীব্য। সাঁওতালি শব্দ 'সেরেঞ'-এর অর্থ গান। ভারতের আদিবাসী সংস্কৃতির মধ্যে সাঁওতালি সংস্কৃতি অন্যতম। ১৯৮৫-৮৬ সালের ঝাড়খন্ড আন্দোলনে যখন প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর সাঁওতাল জনজীবন উত্তাল হতে শুরু করেছে তখন উপন্যাসের ঘটনাকাল শুরু হয়েছে। উপন্যাসে জানা যায় মহুলবনি গ্রামে সত্তর ঘর সাঁওতাল বসবাস করে যাদের বেশির ভাগ কৃষি কর্ম করে দিন পরে। আমরা জানি, সাঁওতালদের মধ্যে সারা বছরই কোনো না কোনো উৎসব লেগে থাকে। সেই সারা বছরের উৎসবকে কেন্দ্র করেই লেখক তাদের লোকসংস্কৃতিকে উপন্যাসের উপজীব্য করে তুলেছেন। এখনও পর্যন্ত যেসব গল্প-উপন্যাসকে আমরা দেখলাম সেখানে নিম্নবর্গের সাংস্কৃতিক দিককে কেন্দ্র করে উপন্যাস সৃষ্টি হতে দেখা যায়নি, সেদিক থেকে 'মহুলবনীর সেরেঞ' উপন্যাসটি নিম্নবর্গের আকল্প নির্মাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে আছে। (চক্রবর্তী ১৪২০, পৃ. ১৯০-৯৫) তাছাড়া তার 'নদী-মাটি-অরণ্য' উপন্যাসটি জল-জঙ্গল ভরা সুন্দরবন অঞ্চলের একশ বছরের ইতিহাস। তিন খণ্ডে বিভক্ত এই উপন্যাসে সুন্দরবনের মানুষেরা বন কেটে সেই অঞ্চলকে বসবাসের যোগ্য করে তোলে। কিন্তু জমিদার জোতদাররা তা দখল করে নিতে চায় এবং তাদের সঙ্গে বিবাদ সৃষ্টি হয়। ঈশান সামন্তের পুত্র রামচন্দ্র সামন্ত সুন্দরবনে এসে আবিষ্কার করে এই অঞ্চলের আলো-অন্ধকারের দিকগুলি। দেখা যায় একশ বছরের বেশি সময় ধরে ইংরেজরা খাজনাকে অস্ত্র করে এই অঞ্চলের মানুষদের দ্বারা জঙ্গল কাটার জন্য বাধ্য করে চলছে। দিনের পর দিন এই অন্যায় সহ্য করে এই অঞ্চলের মানুষরা একটা সময় ইংরেজদের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে এবং সুন্দরবনকে ইংরেজদের কবল থেকে স্বতন্ত্র করার লক্ষ্যে বিদ্রোহ করে। সমগ্র উপন্যাসে নিম্নবর্গের তৈরি জমি, আশ্রয় ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—সবটাই ইংরেজদের লালসার শিকার হয়। বাইরে থেকে আসা রামচন্দ্র সুন্দরবনকে রক্ষা করার চেষ্টা করলে ১৯৫০ সালে বর্গাদার আইনের ভিত্তিতে জমির উৎপন্ন ফসলের ভাগে চাষীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা শোষকদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় সুন্দরবন অঞ্চলে। লক্ষণীয়, যারা পরিশ্রম করে জঙ্গলকে বসবাসযোগ্য করে তুলল, তাদের সেই বাসস্থান ও জমিকে দখল করতে বাইরের ক্ষমতা সম্পন্ন শ্রেণির লালসা সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষগুলোকে বঞ্চিত করেছে। একশ বছরের বেশি সময় ধরে তারা অধীন হয়ে ইংরেজদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। এভাবেই বারবার নিম্নবর্গের নির্মাণ করা হয়েছে একদল

স্বার্থলোভী মানুষদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। (সাঁফুই ২০১৮, পৃ. ৮৪-৯০) উপন্যাসের মতোই তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে নিম্নবর্গীয় চিন্তা-চেতনা ও প্রতিবাদ উঠে এসেছে। 'রাজ্যপালের অসুখ' গল্পে- গ্রাম ও শহরের মানুষের সামাজিক বৈষম্যজনিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। 'কর্জ' গল্পে মহাজনী শোষণের চিত্র এবং 'বিষয় যখন গনা' গল্পে ভূমিহীন কৃষক এবং আদিবাসী গনার জমি কীভাবে দলতন্ত্র ও ভোটের রাজনীতির কবলে রাস্তার গর্ভে চলে যায় - সেই কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

সত্তর দশকের বলিষ্ঠ লেখক ভগীরথ মিশ্র নিম্নবর্গের রূপকার হিসেবে পরিচিত। তাঁর কথাসাহিত্যে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়- সেখানে প্রধানত নিম্নবর্গের মানুষ, শ্রমিক, গ্রামীন প্রান্তিকজনের আনাগোনা। তাঁর বিখ্যাত 'চারণভূমি' (১৯৯৪), 'মৃগয়া' (১৯৯৬-২০০০), 'তস্কর' (১৯৯২) 'জানগুরু' (১৯৯৪), ইত্যাদি উপন্যাস নিম্নবর্গের কাব্যরূপে নির্মিত। 'তস্কর' উপন্যাসটি ইতিহাসের আঙ্গিকে নিম্নবর্গের শ্রেণিচেতনায় উত্তরণের কাহিনি। এখানে বানেশ্বর ঘোষ একজন মহাজন, যার অধীনে কাজ করে এলাকার নামকরা সিঁধেল চোর গক্ষুর ভক্তা। বানেশ্বরের নির্দেশে গোক্ষুর বাড়ি বাড়ি চুরি করে। একটা সময় গোক্ষুর এই নিকৃষ্ট কাজ ছাড়তে চাইলে মহাজনের চাপে তা পারে না। বানেশ্বর মাঝেমধ্যে গোক্ষুরকে মিথ্যা চুরির মামলায় ফাঁসিয়ে আবার নিজেই জামিন দিয়ে খালাস করে। গোক্ষুরের পেছনে পুলিশি বা আইনি খরচগুলি গোক্ষুরের ধার হিসেবে ধরে মহাজন। শুধু তাই নয়, আদিবাসী প্রকল্পে যেসব জমি গোক্ষুর চাষের জন্য পায় সেগুলি ছলচাতুরি করে মহাজন নিজের নামে লিখিয়ে নেয়। উপন্যাসে একদিকে বানেশ্বর মহাজন ও তার হস্তগত পুলিশ প্রশাসন এবং অন্যদিকে লধ্বাপাড়ার হতদরিদ্র নিম্নবর্গ। একদিকে শাসক, অন্যদিকে শোষিত অধীনস্ত লোধা জনগোষ্ঠী। তাইতো রাতে চোরের উপদ্রব ঠেকাতে বানেশ্বর পুলিশের উপস্থিতিতে ঠিক করে লোধারা রাতে পাহারা দেবে। কিন্তু লোধারা বুঝতে পারে- বাবুরা রাতে ঘুমাবে, আর তারা সারাদিন পরিশ্রমের পর রাত জেগে পাহারা দেবে বিনা পারিশ্রমিকে। কিন্তু তারা কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না। প্রতিনিয়ত অপমান, বঞ্চনা ও পীড়নের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একসময় তাদের মধ্যে যে শ্রেণিচেতনা তৈরি হয়েছে তাই উপন্যাসের মূলকথা। 'চারণভূমি' উপন্যাসে দেখা যায় ভেরিহার ভকতদের যাযাবর জীবনযাত্রা। বিহারের হাজারিবাগের ভেরিহার ভকতরা মালিকের ভেড়া নিয়ে সারাবছর জলে-মাঠে-জঙ্গলে চরে বেড়ায়। এদের কোনো আশ্রয় নেই। ভেরিহার ভকতদের এই ভ্রাম্যমাণ জীবন চালানোর জন্য বাঘার মালিকের কাছ থেকে ঋণ নেয় তারা, এবং তা বাড়তে থাকে চড়া হারে। এই দাদন থেকে সারাজীবন তারা মুক্তি পায় না , ফলে বাঘার দাসত্ব বরণ করতে বাধ্য হয় তারা। বোঝাই যায়, নিম্নবর্গের নির্মাণ করা হয় অর্থ ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে। অধীনতা

সূত্রে রচিত হয় এইসব ভেরিহার ভকতদের জীবনকথা। এছাড়াও গ্রামজীবনের বিচিত্র জটিল চিত্রের সমাহারে রচিত হয়েছে তাঁর 'জানগুরু' ও 'মৃগয়া' উপন্যাস দুটি। 'জানগুরু' উপন্যাসের বিষয় গ্রাম্য মানুষের অন্ধবিশ্বাস, ডাইন প্রথা, ভুত-প্রেতে বিশ্বাস। এই অন্ধবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এবং সেই বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য ওঝাদের চোখ ধাঁধানো কর্মকাণ্ড চিত্রিত হয়েছে। সরল গ্রাম্য মানুষগুলিকে বোকা বানিয়ে নানা কিংবদন্তির সৃষ্টি করে তারা। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ওঝার পরিচয়ের আড়ালে সরকারি ক্ষমতা অর্জন করে ছতর বাউরি (ওঝা) গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে সেই গ্রামীণ অঞ্চলে প্রভুত্ব ও অধীনতার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। কিন্তু তালডাংরার পরের প্রজন্ম বুঝতে পারে ওঝাদের ভড়ংবাজির কথা। ফলে তারা প্রচলিত লোকবিশ্বাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং ওঝাদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, ভগীরথ মিশ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা 'মৃগয়া' উপন্যাসে ইতিহাসের আড়ালে প্রায় একশ বছরের সময়কালের প্রেক্ষাপটে সামন্ততন্ত্রকেন্দ্রিক ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনকে তুলে ধরা হয়েছে। এককথায় ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের বুকে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা (যেমন, স্বদেশী আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, শ্রমিকদের আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন, জরুরি অবস্থা ও রাষ্ট্রপতি শাসন প্রভৃতি) বিশ্লেষণের পাশাপাশি নিম্নবর্গীয় সমাজের প্রতিবাদ, চেতনা ও সর্বোপরি তাদের আবিষ্কার উপন্যাসের মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। (ভট্টাচার্য ২০১০, ৩৩০-৩৪০)

ভগীরথ মিশ্রের গল্পগুলির মধ্যেও দেখা যায় গ্রাম্য জীবনের নিম্নবর্গীয় সমাজকে। তাঁর 'জাইগেনসিয়া ও অন্যান্য গল্প' (১৯৮৩) ও 'লেবারন বাদ্যিগর' (১৯৮৬) গল্পসংকলন দুটি প্রান্তিক ও নিম্নবর্গীয় জীবন নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। অন্তেবাসী নিম্নবর্গীয় জীবনে সংগ্রাম, বঞ্চনা, শোষণ, পিড়ন ইত্যাদি চিত্র ফুটে উঠেছে – 'ঝোরবন্দি', 'ইন্দোরযোগ', 'হুসমারার ভমরা মাঝি', 'কদমডালির সাধু', ' চিনিবাসের ঘরে ফেরা', 'পাঁঠার চোখ', 'খোলস' ইত্যাদি গল্পে। তাছাড়াও 'সুবচনী' গল্পে সুবচনী বাউরীর ষাট বছরের সংগ্রামময় জীবন ও 'ফসল কাটার গান' এ বাঁকুড়া জেলার নিম্নবর্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পাশাপাশি শোষণের চিত্রটিও বর্ণিত হয়েছে।

সত্তর দশকেরই আরো একজন নিম্নবর্গের কথাকার ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। তিনি মূলত তাঁর কথাসাহিত্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন ও বাদা অঞ্চলকে স্থান দিয়েছেন। ২০০৩ সালে প্রকাশিত 'সহিস' উপন্যাসটি এর প্রধান প্রমাণ। ২০০৭ সালে বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাসটিতে দক্ষিণবঙ্গের বারুইপুর সংলগ্ন ছোটো ছোটো গ্রাম, সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের মানুষজন ও প্রকৃতি উঠে এসেছে।

'সহিস' শব্দের অর্থ ঘোড়া চালক। এই পেশাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বাদা অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনসংগ্রাম উপন্যাসের মূল উপজীব্য। আবেদা ও হাসেম নামক এক মুসলমান দম্পতির পরিবারকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি এগিয়েছে। আমরা দেখেছি বারুইপুর সংলগ্ন গ্রামে প্রতিবছর একটি মেলা হয় যার নাম 'ঘোড়াছুট' মেলা। এই মেলায় প্রত্যেক ঘোড়ার মালিক একজন সহিস নিয়োগ করে যাতে তাদের ঘোড়াকে সে নিয়ন্ত্রণ করে ঘোড়াছুট প্রতিযোগিতায় জয়ী করাতে পারে। এখানে একজন সহিসের সার্থকতা। বাদামতোলীর মানুষগুলির জীবন একরৈখিকভাবে শোষণ-বঞ্চনার মধ্য দিয়ে কেটে যায়। হতাশা, যন্ত্রণা ও ক্ষোভের মধ্যেও কোনো নিম্নবর্গীয় চরিত্রের মধ্যে প্রতিবাদ দেখা যায়নি। ঝড়েশ্বরের গল্পের প্লট গ্রাম বাংলার জীবনে ছড়িয়ে রয়েছে। 'নোনা' গল্পে দেখা বিজয়ের জীবনের বিপন্নতা ও সংগ্রাম। সুন্দরবন অঞ্চলের পটভূমিকে কেন্দ্র করে গল্পে সামাজিক দোলাচলতার কথা উঠে এসেছে। 'সিন্দুক' গল্পে রয়েছে গ্রামের জোতদার ছনুবাবুর শোষণের বিরুদ্ধে ভাগচাষী ও বর্গাদারদের জাগরণ এবং সেই প্রতিবাদের কাছে ছনুবাবুর পরাজয়ের চিত্র। 'জাহাজ-ঘাটা' গল্পে দেখি কীভাবে নদী ভাঙনের বিপন্নতা, নিরাশ্রয় গরিব মানুষদের প্রতিবাদী করে তুলেছে।

আশির দশকের আরেকজন অন্যতম কথাকার হলেন অমর মিত্র। কর্মসূত্রে বাঁকুড়ার বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াত ও অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্য জগৎকে পুষ্ট করেছে। পশ্চিম বাঁকুড়ার ঘটে যাওয়া খরার চিত্র স্বচক্ষে চাক্ষুস করে তিনি 'হাঁস পাহাড়ি' (১৯৯১) ও 'ধ্রুবপুত্র' (২০০২) উপন্যাস দুটি রচনা করেছেন। শালতোড়া, বেলিয়াতোড়ের জলহীনতাকে ধ্রুবপুত্রের প্লট হিসেবে নির্বাচন করেছেন লেখক। 'ধনপতির চর' উপন্যাসে দেখা যায় বহজাতিকের আগ্রাসন থেকে বাঁচাতে চরবাসীরা আপ্রাণ চেষ্টা করে। 'পাহাড়ের মতো মানুষ' উপন্যাসে রয়েছে গ্রামীণ সমাজের পুরাতন জমিদারি ব্যবস্থার ছবি। যেখানে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোতে একটি গ্রামের সমস্ত মানুষের শোষণের চিত্র। অমর মিত্রের আখ্যানগুলি নিম্নবর্গের জীবন, মুসলমান সমাজ ও মানসিকতায় শিল্পসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

সাহিত্যিকরা নিম্নবর্গকে সাহিত্যের মূল আধার করে আখ্যানরচনা করলেও অন্ত্যজ শবর-লোধা জাতিদের নিয়ে মহাকাব্যোপম উপন্যাস রচনা এর আগে হয়নি। সত্তর-আশি দশকের লেখক নলিনী বেরা শবর সম্প্রদায়কে নিয়ে 'শবরচরিত' (২০০১-২০০৫) উপন্যাসটি চার খণ্ডে রচনা করেছেন যা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে এক নবতম সংযোজন। আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্গত নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর থানার কিছু অঞ্চল জুড়ে রয়েছে তপোবন জঙ্গলমহল। সেখানকার লোধা-শবররা বিশ্বাস করে জঙ্গল হল মা এবং লোধা-শবর তার সন্তান। চারপর্বে বিন্যস্ত উপন্যাসের

কাহিনিতে দেখা যায়, লোধা-শবরদের মোড়ল রাইবু ও তার সহকারী গুড়গুড়িয়াকে। শবরদের দৈনন্দিন জীবনের কর্মকাণ্ড যেমন-শালবল্লা চুরি করা, মাছ ধরা, জঙ্গল ঘুরে খাবার সন্ধান করা ও তাদের নানা সংস্কৃতির পরিচয়ের সঙ্গে বনজঙ্গলকে কেন্দ্র করে সরকারের নানা পদক্ষেপ গ্রহণ চিত্রিত হয়েছে। বিশেষ করে ব্রিটিশ সরকার একসময় আইন করে শবর জনগোষ্ঠীকে অপরাধপ্রবণ জাতি হিসেবে চিহ্নিত করলে শবরদের সঙ্গে সরকারের এক প্রকার দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয়। লোধাদের নেতা রাইবু এ প্রসঙ্গে কিছুটা গুরুত্ব পেলও আখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্র আসলে সমগ্র লোধা-শবরগোষ্ঠী। লোধাদের জন্য লড়াইয়ের প্রচেষ্ঠা করেও রাইবু শেষে ব্যর্থই হয়েছে, তারা উপলব্ধি করেছে যে জঙ্গল থেকে তাদের ধীরে ধীরে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। উপন্যাসের শেষে তাই দেখা যায়, বাধ্য হয়ে জীবন ও জীবিকার তাগিদে জঙ্গল ছেড়ে অন্য স্থানে চলে যাচ্ছে যা ভবিষ্যতে লোধাদের জন্য একটি বৃহৎ পরিবর্তনের ইঙ্গিত বয়ে আনে। এছাড়াও সম্প্রতিককালে তাঁর আরো একটি উপন্যাস 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' (২০১৬)। আত্মজৈবনিক উপাদানের পুষ্ট উপন্যাসটির আখ্যান রচিত হয়েছে সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষগুলোকে নিয়ে। লেখকের শৈশবের স্মৃতি নির্ভর উপন্যাস প্রথম পরিচ্ছেদটি পর্যায় ক্রমে দেখা যায়- সুদূর বিস্তারী সুবর্ণরেখা ও ডুলুং নদীর মাঝে জঙ্গলমহল ও কৃষিভূমি ইত্যাদি মিলিয়ে বিস্তৃত ক্ষেত্র সেখানে বর্গী ও মোগল আক্রমণ করেছে। নীল চাষ পর্বে ইংরেজরা এখানকার মানুষদের উপর অত্যাচার করেছে। নতুন চর জাগলে- তার দখল নিয়েও খুনোখুনি-মারামারি ঘটে যায় এখানে। আর এই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি পরবর্তীকালে কীভাবে প্রবাদ ও গানে পরিণত হয়েছে তার বিভিন্ন টুকরো ঘটনার মধ্যে দিয়ে আদিবাসী জীবনের চিত্র কাহিনির আকারে লেখক আমাদের শুনিয়েছেন। উপন্যাসের মতোই গল্পকার হিসেবে নলিনী বেরা স্বতন্ত্র। তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকায় সমালোচক অমলেন্দু চক্রবর্তী বলেছেন,

> 'নলিনী বেরার শিল্পীসত্তার সমগ্রতা জুড়েই গ্রাম বা পল্লি প্রকৃতির সংবৃত্তি। এই নিসর্গ কোনো স্তব্ধ স্থবিরতা নয়। কিংবা আকাশ মাঠ গাছপালা পশুপাখি নদীনালার দিগন্ত প্রসারে মানুষই তাঁর সৃজন ভাবনার অন্তবীজ। সে মানুষ অশিক্ষায় দারিদ্র্যে স্থবির, অস্বাস্থ্যে ভঙ্গুর। ... নাবালকসদৃশ এই মানবগোষ্ঠীই যে তাঁর সর্বাধিক আপন ; বাংলার গ্রামই তাঁর মানসচৈতন্যের যথার্থ আশ্রয়ভূমি নলিনী সেটা জানেন।' (বেরা, ২০০৩ পৃ. ix)

তাঁর 'শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব' গল্পে দেখান হয়েছে দুটি চাষের বলদ একজন চাষীর জীবন কত বড়ো সম্পদ হতে পারে যা একটি পরিবারের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সহায়ক। তার সঙ্গে আর্থিক স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির তুলনা হতে পারে না। 'শতরঞ্চি' গল্পে গ্রামজীবনের স্বার্থ, সংকীর্ণ মানসিকতা ও কুসংস্কারকে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। তাছাড়াও 'বসুন্ধরা', 'এই এই লোকগুলো', 'পুষ্কর' ইত্যাদি গল্পগুলি গ্রাম জীবনের পটভূমি করে গ্রাম্য জীবনকেই ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস লেখকের।

সাম্প্রতিককালে যেসব লেখক নিম্নবর্গ-প্রধান কথা সাহিত্য রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য সাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত। তিনি মূলত 'সাবঅলটার্নদের' নিয়ে লিখেছেন। মফস্বল শহর, গ্রাম এবং গ্রাম জীবন তাঁর লেখার উপজীব্য। আসলে দারিদ্র্যই জীবনের সঙ্গে যোগ করে জীবনের বহুমাত্রিকতা। লেখক এই বহুমাত্রিকতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছেন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে। সৈকত রক্ষিতের জন্ম পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত প্রত্যন্ত এক গ্রামে এবং তাঁর লেখাতেও পুরুলিয়া সাঁওতালি-সাঁওতাল আদিবাসীদের কথাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উঠে এসেছে। তাঁর নিম্নবর্গপ্রধান উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'হাড়িক' (১৯৯০), 'ধুলা উড়ানি' (১৯৯৬) , 'মহামাস' (২০০৫), 'মদনভেরি' (২০০৮) প্রভৃতি। পুরুলিয়া জেলার খরিদুয়ারা ও কুমারী নদী তীরবর্তী এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর অসহায়তা, ব্যর্থতা, দৈনন্দিন জীবন সংগ্রাম, আনন্দ-বিষাদ, ও স্বপ্ন সম্ভাবনা আঞ্চলিক ভাষায় আবহে এক জীবন্ত ক্যানভাস 'ধুলাউড়ানি' উপন্যাসটি। কাহিনির মধ্যে তেমন অভিনবত্ব না থাকলেও দৈনন্দিন জীবন যাপনের মানুষ কতোটা নিচ সংকীর্ণ হয়ে উঠতে পারে তা উক্ত অঞ্চলের প্রান্তিক নিম্নবর্গ সমাজকে দেখলে বোঝা যায়। 'মহামাস' উপন্যাসে দেখা যায়, লম্পপট্টি কারখানার কর্মীদের পুরুষানুক্রমিক জীবিকা বয়ে চলছে। অন্যদিকে 'হাড়িক' উপন্যাসে লেখক প্রাচীন অন্ত্যজ হাড়ি সম্প্রদায়ের জীবন জীবিকার কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। 'মদনভেরি' উপন্যাসে খাসি জনজাতিকে লেখক তুলে ধরেছেন। আসলে উপন্যাসটির মূল বক্তব্য হল- মদনভেরি নামক এক বাদ্যযন্ত্রের মিথ ও লোক বিশ্বাসের সঙ্গে খাসি জনজাতির সামাজিক অবস্থানের নানা চালচিত্র উঠে আসা। খাসিরা বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায় একটি সম্প্রদায়। মদন ভেরি বাজানো তাদের পূর্বপুরুষদের বৃত্তি বা পেশা ছিল, কিন্তু কালচক্রে তারা এই পেশা থেকে সরে এসেছে। আলোচ্য উপন্যাসেও জীবিকার সংকট একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই বিস্ময়কর পেশা ও পেশা সংকট নিয়েই 'মদনভেরি' উপন্যাসটি রচিত। তবে কেবল উপন্যাস নয়, গল্পকার হিসেবেও সৈকত রক্ষিত রাঢ়বঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলের অন্ত্যজ নিম্নবর্গের জীবনচিত্র অংকনে তৎপর। লেখকের 'জন্মভূমি বধ্যভূমি' -গল্প সংকলনে দৃষ্টি দিলেই তা বোঝা যায়। জন্মভূমি বলতে এখানে লেখক তাঁর জন্মভূমি অর্থাৎ পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল পরিবেশের কথা বুঝিয়েছেন। আর বধ্যভূমি বলতে বোঝানো হয়েছে- কীভাবে জন্মভূমি থেকে নিম্নবর্গের অসহায় মানুষদের স্বভূমি থেকে উৎখাত হয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে। 'উৎখাতের পটভূমি' ও 'উচ্ছেদ' গল্পদুটিতে নিজভূমে পরবাসী হওয়ার কাহিনি চিত্রিত হয়েছে। তাছাড়া 'লক্ষণ মহিম'- গল্পে হাড়ি সম্প্রদায়ভুক্ত মহিমের জীবিকা সংকট ও জীবিকা বদলে মোষের সিং এর চিরুনি বানানো তাদের মূল

পেশা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। ‘খাদান’- গল্পে রয়েছে পাথর ভাঙ্গার কাজে নিযুক্ত মানুষদের কথা। ‘ধমন’ গল্পে দেখা যায়, ভ্রাম্যমান ধাতু শিল্পীদের জীবন-সমস্যার চিত্র। ‘মাড়াই কল’ গল্পে আখ মাড়াইয়ের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের দুর্দশার চিত্র রয়েছে। ‘হাম্বা’ গল্পে গোবিন্দ মুচির অভাব-অনটনের চিত্র রয়েছে। এরকম করেই সৈকত রক্ষিতের গল্পে ঘুরে ফিরে এসেছে পুরুলিয়ার অন্ত্যজ, প্রান্তিক মানুষেরা। তাদের জীবন-জীবিকা দুঃখ- দুর্দশা ভাষা -সংস্কৃতির আকর রূপে লেখকের কথাসাহিত্য পুষ্ট ও স্বতন্ত্র।

কথাকার রামকুমার মুখোপাধ্যায়ও তাঁর জন্ম স্থান বাঁকুড়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের প্রকৃতি জনপদ ও মানুষজনদের সংস্কৃতিকে তাঁর কথাসাহিত্যের আধার করে তুলেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘চারণে প্রান্তরে’ (১৯১৩) দেখা যায় বাঁকুড়া জেলার প্রকৃতি পরিবেশ ও গ্রাম্য মানুষগুলির জীবন সংগ্রামের কাহিনি। ‘দুখে কেওড়া উবাচ’ (২০০২) উপন্যাসটি অন্ত্যজ জীবনের দুঃখ-দুর্দশার বয়ান। উপন্যাসের ব্লার্বে কাহিনির মর্মবস্তু হিসেবে দেখা যায়, দুখে একজন কৃষিমজুর। প্রৌঢ়ত্বের ভারে সে এখন দেশি মদের ব্যবসা করে। দুঃখের জীবনের প্রতিটি ধাপ লেখক কৌতুকের আড়ালে বিন্যাস করেছেন। গল্পকার রামকুমার তাঁর গল্পগুলিতেও ব্রাত্য জীবনের ছবি এঁকেছেন। ‘মৌজা ডোমপাটি’ গল্পে প্রান্তিক কৃষিজীবী মানুষদের স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ হতে হয়েছে। ‘গোষ্ঠ’ গল্পে দেখা যায় একজন রাখালিয়া বালকের কাহিনি। গ্রামীণ পরিবেশর ছবি রয়েছে ‘খুকু কিংবা মানুষ’ গল্পে বিশ্বায়নের যুগে নিম্নবর্গ কতটা অসহায় তাদের জীবন-জীবিকা নিয়ে এবং কৃষি ও গ্রামের বিনষ্ঠির সঙ্গে জীবিকার সংকট নিম্নবর্গকে কীভাবে কোণঠাসা করে ফেলে তার বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।

আশির দশকের বিশিষ্ট কথাশিল্পী অনিল ঘড়াই ছিলেন অন্ত্যজ জীবনের রূপকার। তাঁর কথাসাহিত্যের মূল সম্পদ দলিত, নিম্নবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনচর্যা। বিশেষ করে নদিয়া, মেদিনীপুর ও সিংভূম অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের ছবি পাওয়া যায় তাঁর রচনায়। অনিল ঘড়াই-এর প্রথম উপন্যাস ‘নুনবাড়ি’ (১৯৮৯) নুনমারা সম্প্রদায়ের একজন অবহেলিত নারীর ঘুরে দাঁড়ানোর কাহিনি। কালোচাঁদের স্ত্রী লবঙ্গ তার জীবনের সব হারিয়েও হেরে যায় না, বরং অদম্য জেদ নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়, আঁকড়ে ধরে মাটির নুনবাড়ি, যেখানে পাতন পদ্ধতিতে নুন তৈরি করা হয়। এভাবেই নুন ও নারী একাকার হয়ে যায় আলোচ্য উপন্যাসে। ‘মুকুলের গন্ধ’ (১৯৯৩) উপন্যাসটি রচিত হয়েছে জগেন জমাদারের পরিবারকে কেন্দ্র করে। জগেন ও আন্নাকালির শত দুঃখের সংসারে চিত্রের মাঝে তাদের একমাত্র সন্তান অর্জুনের দিন কাটে শূয়োর চড়িয়ে কিন্তু অর্জুনের সমবয়সি বাবলু সমাজের ঢাকি পরিবারের ছেলে হয়েও দেশকালের খবর রাখে। আসলে গ্রামসমাজ বৃত্তিনির্ভর কাজের নিরিখে বিভাজিত

হলেও কালক্রমে অর্থ উপার্জনকেই তারা মুখ্য বলে মনে করতে থাকে। ফলে সকলেই তারা পিতৃপুরুষের পেশা ছেড়ে বিভিন্ন পেশার দিকে ঝুঁকতে থাকে। আলোচ্য উপন্যাসে দেখান হয়েছে, বাবলু একজন নিম্নবর্গের সন্তান হয়েও কীভাবে জাতিগত বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তাই বাবলুর মুখে শোনা যায়,

> '- কি হবে ঢোল বাজিয়ে? আজকাল কেউ ঢাক-ঢোল শোনে? এটা হলো গিয়ে মাইক-তাসা- ব্যান্ডের যুগ। ...ঢাক বাজিয়ে ঢাকির যদি পেট না ভরে -তাহলে সে ঢাক বাজাবে কেন?' (ঘড়াই ১৯৯৩, পৃ. ১১৮)

'মেঘ জীবনের তৃষ্ণা' (১৯৯৬) উপন্যাসের লেখকের হাড়ি সম্প্রদায়ের জীবন-সমাজ-সংস্কৃতি –জীবন ঐতিহ্য ও জীবিকার দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন। 'দৌড়বোগাড়ার উপাখ্যান' (১৯৯৭)- এ আছে বিহারের আদিবাসী জনজাতির শীতকালে নদীতে সোনা খুঁজতে যাওয়ার কাহিনি যা তাদের জীবিকা। 'বনভূমি' (১৯৯৮) উপন্যাসে দেখা যায়- আদিবাসীদের দরিদ্রপীড়িত জীবনের সমান্তরালে বনভূমি সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কাক-শকুনের চিৎকার, মরা ইঁদুরের দুর্গন্ধময় পরিবেশে রোগে জর্জরিত মানুষগুলির চিকিৎসা করতে গুনিন আসে । গুনিন এলে বকরির পূজা হয়। এরকমই নানা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকারে তলিয়ে যায় এই অন্ত্যজ ও প্রান্তিক মানুষেরা। 'নীল দুঃখের ছবি' (২০০১) উপন্যাসটি কাকমারা সম্প্রদায় নিয়ে লেখা প্রথম বাংলা উপন্যাস। সাধারণত এরা শুকর পালন করলেও এদের আসল জীবিকা ভিক্ষাবৃত্তি। 'সামনে সাগর' (২০০৩) উপন্যাস এসেছে শ্রমহীন- ভূমিহীন-সম্বলহীন কিছু মানুষের কথা। দীঘার সমুদ্রকে অবলম্বন করে নানা পেশার মানুষের জীবন চক্রকে দেখান হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। অনিল ঘড়াইয়ের স্মরণীয় সৃষ্টি ও কীর্তি হলো 'অনন্ত দ্রাঘিমা' (২০০৯) উপন্যাসটি। উপন্যাসের আখ্যানে প্রান্তিক জনজীবনের চিত্র বিস্তৃত পরিসরে বর্ণিত হয়েছে। (সিংহ ২০১৭)

অনিল ঘড়াই-এর গল্পগুলিতেও দেখা যায়, গ্রামবাংলার দারিদ্র্য নিম্নবর্গীয় জীবনের চালচিত্র। তার শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির মধ্যে দেখা যায় 'নুনা সামাডের গল্প' যেখানে নুনা সামাড একজন আদিবাসী কৃষক। গ্রামাঞ্চলের ভূমিব্যবস্থা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। 'লাস খালাস' গল্পে নিধু ডোমের কাছে বেঁচে থাকা মানে পেট ভরে খওয়া, নেশা করা, লাশ পোড়ানো আর শরীরটাকে শ্মশান আর বাড়িতে আসা যাওয়ার মধ্যে কাটিয়ে দেওয়া। 'খরা' গল্পে দেখা যায় হতদরিদ্র মানুষগুলি খাবার পাতে সামান্য পান্তা পেলেই খুশি হয়। লক্ষণীয় তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলির মধ্যে কেউ চামার, কেউ মুচি, কেউ ছুতোর, কেউ কাকমারা, হাড়ি, জমাদার, ভিক্ষুক, কেউ ঢাকি ইত্যাদি সমাজের নিম্নবৃত্তি ও নিম্নশ্রেণির মানুষেরা স্থান নিয়েছে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র অনিল ঘড়াই সম্বন্ধে বলেছেন –

‘অনিলের (ঘড়াই) মতো গ্রামজীবনকে নিয়ে এত নিবিষ্টভাবে, এত অনুপুঙ্খ সহকারে আমাদের মধ্যে কেউই বুঝি লেখেননি। গ্রামজীবনে এমন অতলান্ত অবগাহন, আর কারোর কলমেই আসেনি। (ভৌমিক ১৪১২, পৃ. ১১২)

আশি-নব্বই দশকের আরেকজন বিখ্যাত কথাশিল্পী আফসার আমেদ (১৯৫৯-২০১৮) তাঁর সৃজনবিশ্বে মুসলমান সংখ্যালঘুদের স্থান দিয়েছেন। ‘ঘরগেরস্তি’ (১৯৮২), ‘সানু আলির নিজের জমি’ (১৯৮৯), ‘বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা’ (১৯৯৫), ‘কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক’ (১৯৯৬), ‘দ্বিতীয় বিবি’ (১৯৯৭), ‘মেটিয়াবুরুজে কিসসা’ (২০০৩) ইত্যাদি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি সমাজের নিম্নবর্গীয় মুসলিম সমাজের ভাষ্য, তাদের জীবনযন্ত্রণাকে ‘কিসসা’-আকারে তুলে ধরেছেন। এছাড়াও আফসার আমেদের যেসব গল্পে মুসলিম নিম্নবর্গীয় সংখ্যালঘুদের কথা উঠে এসেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য – ‘খরা’, ‘গোনাহ্’, ‘হাড়’, ‘আদিম’, ‘বাগদান’, ইত্যাদি গল্প। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবনে খরা কীভাবে অভিশাপ বয়ে নিয়ে আসে তার মর্মান্তিক চিত্র রয়েছে ‘খরা’ গল্পে। জমি কৃষিদের উপার্জনের মূলভিত্তি। সেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ খরার সৃষ্টি কৃষি জনজীবকে দারিদ্র্যে পর্যবসিত করেছে। এ নিয়ে তাদের মধ্যে নানা আধিভৌতিক সংস্কার ও বিনাশের দিকটি তুলে ধরেছেন লেখক। (খান ২০২০)

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে নগর ও মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রতিফলন লক্ষ করা গেলেও নগর অতিক্রম করে তিনি সাঁওতাল পরগনা, বুরুন্ডির জঙ্গল, চাইবাসার ভৌগলিক অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন। সেইসব অঞ্চলে নিম্নবর্গের জনজীবনকে তাঁর কথাসাহিত্যে অনুপ্রবেশ করতে দেখা যায়। তবে কলকাতা নগরের নিম্নবর্গের চরিত্রকেও তিনি তুলে ধরেছেন। যেমন ‘কলকাতা, তুমি কার?’ উপন্যাসে মেথর-ধাঙড় এবং কলকাতা কর্পোরেশনের সাফাই কর্মীদের কথা উঠে এসেছে। পাঁচের দশক থেকে নয়ের দশক পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চলচিত্রের বিভিন্ন আন্দোলনের প্রভাবের পাশাপাশি জনতার ভিড়ে মিশে থাকা সর্বহারা শ্রেণির মেথর-ধাঙড়দের কথা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় আন্তরিক সহানুভূতির মধ্য দিয়ে তাদের অস্তিত্বের তাৎপর্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার ‘জঙ্গলের দিনরাত্রি’ (১৯৮৮) উপন্যাসে বিজয় ও লেমসা নামক দুই নিম্ন বর্গীয় পুরুষের জীবন-সংগ্রামকে দেখা যায়। বিজয় রেস্তোরাঁর একজন মদ পরিবেশনকারী এবং লেমসা হল হেমাডির বাংলোর একজন চৌকিদার। সন্দীপনের ‘ছেলেটা’ ছোটোগল্পে গণেশ চরিত্রটি পিতামাতাহীন ফুটপাতের ভিক্ষুক। কুড়ি-ত্রিশ পয়সা রোজগার করে মুড়ি বাতাসা খেয়ে কোনোরকমে পেট ভরায় সে। রাস্তার ধারে ন্যাকড়া পেতে ঘুমায়। রাস্তায় ফেলে দেওয়া দইয়ের হাড়ি বা ছেঁড়া জামা কুড়িয়ে নেয় সে। এভাবেই পথশিশুদের দিন অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে

থাকে। 'বনধ এর ১০ দিন' তুলসী দাস নামক এক মেথর চরিত্রের কাহিনি। 'আলমারি' গল্পে দেখা যায় এক গরীব রিক্সাচালককে। তার সঙ্গে ঠাকুর সিং ও তার কুলিমজুরদের দল। সন্দীপনের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের উপস্থিতি থাকলেও তা সরব নয়। (দাস ২০১৯, পৃ. ১৭০-৭৫)

পেশায় সাংবাদিক সাহিত্যিক ঘনশ্যাম চৌধুরী সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষদের সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়েছেন। লাভ করেছেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে জেলেদের নিয়ে রচনা করেছেন 'অবগাহন' (২০০০) উপন্যাসটি। বাংলা সাহিত্যে যে কটি নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস রয়েছে, তার মধ্যে 'অবগাহন' একটি। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লিখিত আলোচ্য উপন্যাসে এক জেলেনারীর দুর্নিবার প্রেম-আকাঙ্ক্ষা ও যৌনচেতনার দিকটি পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর গল্পের ভেতরেও লক্ষ করা যায় প্রান্তিক, শ্রমজীবী মানুষের কাহিনি। সাংবাদিক হওয়ার সুবাদে কয়লাখনির শ্রমিকদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ফলস্বরূপ তাঁর গল্পগুলিতে খনি শ্রমিকের জীবনচিত্র সহজেই উঠে এসেছে। 'আপনজন' গল্পে খনি শ্রমিকরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কীভাবে সুড়ঙ্গ খোদাই করে আকরিক তুলে নিয়ে আসে তার বর্ণনা রয়েছে। এছাড়াও 'নিয়তি ছিল অন্ধকারে', 'মরদ', 'পুরনো পৃথিবীর মানুষ' প্রভৃতি গল্পে কয়লা খনি অঞ্চলের শ্রমিকদের কথা উঠে এসেছে। 'মরদ' গল্পে দেখা যায়, দিলীপ বাউরি তার সহশ্রমিকদের প্রাণ বাঁচাতে নিজে কয়লার ডাম্পারের নিচে পিষে গিয়েছে।

পেশার দিক দিয়ে কৃষক আনসারউদ্দিন তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে কৃষি জীবনের সঙ্গে জমি-মাটি-ফসলের অন্তর্গুঢ় সম্পর্কের পাশাপাশি বন্যা, ফসলের ক্ষতি, কৃষি অর্থনীতর দারিদ্র্য-অভাব-অনটনের দিকটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আনসারউদ্দিনের গল্প সংখ্যা স্বল্প হলেও(২২ টি) তাঁর প্রায় প্রতিটি গল্পে দেখা যায়- কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা কীভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভর করে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে। তাঁর 'আবাদ' ও 'পূবালি' গল্পে এই বিষয়টি উঠে এসেছে। 'কবর' গল্পে দেখা যায়- ভিকু নামক একজন চরিত্র যে কবর খোড়ায় পারদর্শী। কিন্তু একদিন তার মিথ্যে মৃত্যুসংবাদ রটে গেলে তার অসহায় জীবনমৃত অবস্থার সৃষ্টি হয়। 'শত্রুপোকা বন্ধুপোকা' গল্পে পোকামাকড় চাষবাসের কী ক্ষতি করে এবং তার প্রভাব কৃষিজীবনে কী মর্মান্তিক পরিণতি আনে তা দেখান হয়েছে। তাছাড়া তাঁর কৃষি জীবন ও চাষবাস সংক্রান্ত গল্পগুলির মধ্যে 'হাল-বেহাল',' 'ঘুম', দহন', 'গোরস্থানের অধিকার' প্রকৃতি উল্লেখযোগ্য।

অন্যদিকে সোহরাব হোসেনের উপন্যাসগুলিতে লক্ষ করা যায় কৃষক সমাজের উপস্থিতি। লেখক স্বয়ং একজন প্রান্তিক কৃষক পরিবারের সন্তান। নিজের হাতে ধান রোপন ও ধান কাটার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি তাঁর উপন্যাস গল্প ছবি তুলে ধরেছেন। সোহরাব হোসেনের ' মাঠ জাদু জানে' (২০০৪) উপন্যাসে

দেখা যায় একটি কৃষক পরিবারের চার প্রজন্মের উত্থান পতনের কাহিনি। এই কৃষক পরিবারটির মধ্য দিয়ে উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বে কৃষি আন্দোলনে ধারাবাহিক ছবিটি বিস্তৃত আকারে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে দেখা যায়, জমিতে কৃষকরা দিনরাত পরিশ্রম করে ফসল ফলায়,বন্ধ্যা জমিকে উর্বর করে তোলে, কিন্তু সেই জমিতে তাদের ফলানো ফসলের অধিকাংশ চলে যায় জমিদার ও ক্ষমতাবানদের হাতে। জমির ওপর তাদের কোনো অধিকার থাকে না। ফলে ক্ষমতা সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে। ক্ষমতার অধিকারের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকারের লড়াইয়ে তারা সামিল হয়। এবং কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে কৃষক পরিবারটি জড়িয়ে পড়ে। 'গাঙ-বাঘিনি' (২০১১) উপন্যাসে সুন্দরবন অঞ্চলের অরণ্য সংকুল প্রকৃতির মধ্যে মানুষের বাসভূমি গড়ে তোলা, সেই বনভূমির বাস্তুতন্ত্র কে টিকিয়ে রাখার পেছনে মাঝি-মাল্লাদের অবদান আলোচিত হয়েছে। মানুষ বাঘের বাসস্থানে অরণ্যচারী মানুষের বেঁচে থাকার কাহিনি হল - 'গাঙ-বাঘিনি'। (দাস ২০১৯, পৃ. ১৯৩-২০০)

সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যে যারা নিম্নবর্গকে উপজীব্য করে তাদের অধিকারবোধ চেতনা ও প্রতিবাদের কথা বলেছেন তাঁদের মধ্যে মনোরঞ্জন ব্যাপারীর নাম অগ্রগণ্য। আশির দশকে লেখা শুরু করলেও পেশায় রিস্কা চালক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি একুশ শতকের প্রথম দশকে। তাঁর আত্মজীবনীর নাম 'ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন' (২০১৪)। উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'অনভুবন' (২০১৭), ছেঁড়া ছেঁড়া জীবন (২০১৯), 'বাতাসে বারুদের গন্ধ' (২০১৯) ইত্যাদি। তাঁর গল্পগুলি দুটি খণ্ডে সংকলিত করা হয়েছে। প্রথম জীবনে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে গ্রেফতার হন এবং দীর্ঘকাল জেলজীবন অতিবাহিত করেন। জীবনের চরমতোম অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছেন এই জেলজীবনে। সেই অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ একে একে উপন্যাস ও ছোটোগল্প রূপে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'বাতাসে বারুদের গন্ধ' উপন্যাসটি রচিত হয়েছে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। নকশাল আন্দোলনকারীদের মিটিং, মিছিল, পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়ানো ও পুলিশের নির্বিচারে সাধারণ মানুষদের খুন, হত্যা, এনকাউন্টারের মর্মান্তিক চেহারা ফুটে উঠেছে।

এ ছাড়াও অধুনা বাংলাদেশের যে সমস্ত সাহিত্যিকদের রচনায় প্রান্তিক, অন্ত্যজ, অনগ্রসর, শ্রমজীবী তথা নিম্নবর্গের সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলাউদ্দিন আল আজাদের কর্ণফুলী, সেলিনা হোসেনের 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' আবুবকর সিদ্দিকির 'খরদাহ' ও 'জলরাক্ষস', ইমদাদুল হক মিলনের 'যাবজ্জীবন', 'কালাকাল', সালমা বাণীর 'ভাংগারি', সালাম সালেহউদ্দিনের 'জন্মদৌড়' উপন্যাস এবং অবশ্যই এই তালিকার অন্যতম সংযোজন হরিশংকর

জলদাসের ‘জলপুত্র’, ‘দহনকাল’, ‘কসবি’, ‘রামগোলাম’-এর মতো উপন্যাস। এইসব লেখকেরা নিম্নবর্গের জীবনবৈচিত্র্য রূপায়ণে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন।

নিম্নবর্গের আকল্প নির্মাণের প্রবণতা ও প্রাপ্তি

বাংলা সাহিত্যে কথাশিল্পের সূচনালগ্নে নিম্নবর্গ উপস্থিত হয়েছে আখ্যানের প্রয়োজনকে পূর্ণ করার লক্ষ্যে। কাহিনির উদ্দেশ্য পূরণে নিম্নবর্গ সহায়ক হয়েছে মাত্র। লক্ষণীয়, কল্লোল পূর্ববর্তী সময়কালের কথাসাহিত্যে দরিদ্র, ব্রাত্য, প্রান্তীয় সমাজের শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়নের চিত্র তেমনভাবে কেউ সহানুভূতির সঙ্গে তুলে আনেননি। নিম্নবর্গের ঘরের চার দেওয়ালে প্রবেশ করে তাদের আঁতের কথা তুলে ধরার জন্য তেমন কেউ এগিয়ে আসেননি। লক্ষ করা গেল, তাঁদের লেখায় শহরকেন্দ্রিক মজুর তথা শ্রমজীবী মানুষের দিনলিপি রচিত হচ্ছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত গ্রাম্য-প্রান্তীয় ব্রাত্যসমাজের হতদরিদ্র, নিষ্পেষিত মানুষগুলির কাছাকাছি তাঁরা পৌঁছাতে পারেননি। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ভেতরে কীভাবে, কোনো নিয়মে ব্রাত্য-প্রান্তীয় মানুষগুলি শাসিত ও শোষিত হচ্ছে তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র উঠে আসা তখনও বাকি ছিল। আসলে কল্লোলের তরুণ মনের লেখকেরা একপ্রকার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার মতো নিম্নবর্গকে চিত্রায়িত করার ক্ষুধায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁদের লেখায় আমরা যে শ্রমজীবী-কুলি-মজুর-ভিখারিদের পাই, তাদের কথা সত্য ও মর্মান্তিক হলেও বাস্তবতার ছোঁয়া সেখানে পাওয়া যায়নি। কল্লোলগোষ্ঠীর এই বাস্তবতাকে স্পর্শ করতে না পারার সীমাবদ্ধতা আমরা বুঝতে পারলাম ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাবের পর। ‘পথের পাঁচালী’ (১৯২৯) ‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথা’ (১৯৫১) ‘কবি’ (১৯৪৪) ‘পদ্মানদীর মাঝি’ (১৯৩৬) প্রভৃতি উপন্যাস লিখে তাঁরা প্রমাণ করলেন নিম্নবর্গের প্রান্তিকতা, অসহায়ত্ব, বিশ্বাস-সংস্কার, আশা-স্বপ্ন, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও সামাজিক স্বতন্ত্রতাকে। নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র উপস্থিতির বাস্তবচিত্রের পূর্ণতা আমরা পেলাম সতীনাথের ‘ঢোঁড়াইচরিতমানস’ (১৯৫০), অদ্বৈতর ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (১৯৫৬)-এ। এঁদের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে প্রান্তীয় নিম্নবর্গের কেন্দ্রীকরণের সূচনা হয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী কথাসাহিত্যে শুধুমাত্র নিম্নবর্গের উপস্থাপনের দিকটিই উঠে এল না, সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল উচ্চবর্গের বিপরীতে প্রতিনিয়ত কীভাবে নিম্নবর্গের নির্মাণ হয়ে চলেছে। উচ্চবর্গ দ্বারা নিম্নবর্গ কীভাবে শাসিত ও শোষিত হয়ে সামাজিক অবনতির দিকে চলে যাচ্ছে-এই বিষয়টি লক্ষ করা গেল। নিম্নবর্গের নিজস্ব ভাবাদর্শের স্বতন্ত্র পরিচয় এবং অন্যায়-অত্যাচারের বিপক্ষে তাদের শ্রেণিচেতনার দিকটি গুরুত্ব পেল আখ্যানগুলিতে। অদ্বৈত ও সতীনাথের কলমে যার সূচনা হয়েছিল তার পূর্ণাঙ্গ রূপ

আমরা পেলাম অমিয়ভূষণ মজুমদার থেকে শুরু করে মহাশ্বেতা দেবী, ভগীরথ মিশ্র, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাশিল্পে এবং সাম্প্রতিককালের নলিনী বেরা, অমর মিত্র, অনিল ঘোড়াই, সৈকত রক্ষিত, মনোরঞ্জন ব্যাপারী, হরিশংকর জলদাসের কলমের মধ্যে দিয়ে যা আজও অব্যাহত গতিতে সচল।

কল্লোলগোষ্ঠী যে উৎসাহ ও উন্মাদনা নিয়ে প্রান্তজনের দিকে ঝুঁকেছিলেন এবং ব্রাত্য মানুষের আঁতের কথা ও দৈনিক দিনলিপি তুলে আনার প্রয়াস করেছিলেন, তা আজ বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। যেখানে নিম্নবর্গের নর-নারীর সম্পর্কে স্বতন্ত্র নীতিগত চেতনা-প্রেম-স্বপ্ন-ভালোবাসা, আদিম যৌনপ্রবৃত্তি, দাম্পত্য কলহ-বিচ্ছেদ, অবৈধ সম্পর্ক, আদিমবৃত্তি, বিবাদ-ষড়যন্ত্র ও জিঘাংসার বিচিত্র প্রকাশ দেখা গিয়েছে। উচ্চবর্গের অপর হিসেবে নির্মিত নিম্নবর্গের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে গুরুত্ব সহকারে স্থান দেওয়ার পাশাপাশি সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যে লক্ষ করা যায়, তাদের জীবিকার তাগিদে আমৃত্যু পরিশ্রম করার মানসিকতা, জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার জন্য অন্তিম প্রয়াস ও সর্বোপরি শোষিত-বঞ্চিত হওয়ার একই রকম অনুভূতি থেকে বারবার ঐক্যবদ্ধ হওয়া। উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের সম্মিলিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধ তাদের 'বাইনারি' অবস্থানে এনে দাঁড় করিয়েছে।

২.৫ সারাংশ

সামগ্রিক আলোচনার শেষে আমরা দেখলাম, সাহিত্যিকেরা তাঁদের রচনায় সমাজের নিম্নবর্গকে যেভাবে তুলে এনেছেন তাতে কাল ও পরিস্থিতির বদল অনুযায়ী নিম্নবর্গের অবস্থা ও অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। একটি বৃহত্তর কালখণ্ডে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দিক থেকে নানা পরিবর্তন ঘটলেও নিম্নবর্গের প্রতি সমাজের ও উচ্চবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি আজও ঘৃণার। নিম্নবর্গের প্রতি শোষণ, নিপীড়ন, বঞ্চনার ছবিটিও প্রায় একইরকম রয়ে গিয়েছে। নিম্নবর্গীয় জীবনে যে ন্যুনতম চাহিদা- খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-স্বাস্থ্য– তার অভাব চিরকালের সভ্যতায় লক্ষ করা যায়। দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা এই অন্যায় ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করার সামর্থ্য জুগিয়েছে, কেউ নীরবে মার খেয়ে মার সহ্য করেছে। নিম্নবর্গের সক্রিয় অবস্থান, অধিকার আদায়ের লড়াই, প্রতিবাদ, প্রতিরোধের কথাই কেউ নিম্নবর্গের প্রতি সহানুভূতি ও আবেগপ্রবণ হয়ে তাদের কথাকে সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন, কেউ কর্তব্যের দায়ে ও সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়ে, আবার কেউ প্রশ্ন ও যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে অথবা কেউ সাহিত্যে নতুন ধরণের উপাদান সংযোজন করতে গিয়ে নিম্নবর্গকে সাহিত্যের আধার করে তুলেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের বিপুল ও বিস্তৃত সম্ভারে বিভিন্ন লেখকের দ্বারা নিম্নবর্গের জীবন বৈচিত্র্যের অধিকাংশ প্রান্তই

আজ উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে। নিম্নবর্গের আচার-ব্যবহার সংস্কৃতি, অর্থনীতি, পেশা, নেশা, সামাজিকতা, নিয়ম-নীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের মধ্য দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্য বহুমাত্রিক জীবনের শিল্প ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে-যা একই সঙ্গে নিম্নবর্গের ইতিহাস ও আখ্যান। বর্তমান গবেষণার পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা হরিশংকর জলদাসের নির্বাচিত উপন্যাস ও গল্পে নিম্নবর্গের উপরিউক্ত প্রান্তগুলিকে উন্মোচিত করার চেষ্টা করব।

তৃতীয় অধ্যায়

হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে নিম্নবর্গ : আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

৩. সূচনা

৩.১ কথাবিশ্বে নিম্নবর্গের সামাজিক জীবন

৩.১.১ আঞ্চলিক পরিধি ও ভৌগোলিক সীমা-পরিসীমা

৩.১.২ প্রান্তিকতা

৩.১.৩ নিম্নবর্গীয় সমাজের বাসস্থান ও পরিবার জীবন

৩.১.৪ কথাবিশ্বে নিম্নবর্গীয় সমাজব্যবস্থা

৩.১.৫ নিম্নবর্গীয় সমাজে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও সাম্প্রদায়িকতা

৩.১.৬ নিম্নবর্গীয় সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা

৩.২ কথাবিশ্বে নিম্নবর্গের অর্থনৈতিক জীবন

৩.৩ কথাবিশ্বে নিম্নবর্গের সাংস্কৃতিক জীবন

৩.৩.১ নিম্নবর্গীয় সমাজের আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কার-কুসংস্কার

৩.৩.২ নিম্নবর্গীয় সমাজের পোশাক-পরিচ্ছদ

৩.৩.৩ নিম্নবর্গীয় সমাজের খাদ্যাভ্যাস

৩.৩.৪ নিম্নবর্গীয় সমাজে ভাষাপ্রয়োগ

৩.৪ কথাবিশ্বে রাজনৈতিক অনুষঙ্গ ও নিম্নবর্গের রাজনৈতিক চেতনা

৩.৫ সারাংশ

৩. সূচনা

সমাজ গঠিত হয় একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের আচার-ব্যবহার, জীবনযাপনের ধরন, উপার্জনের উৎস ও রাজনৈতিক চেতনার ওপর নির্ভর করে। সমাজে বসবাসকারী মানুষ ও তার আচরণ একটি সমাজ বা জনগোষ্ঠীর বিশিষ্টতাকে বহন করে, এক সমাজগোষ্ঠী থেকে অন্য সমাজগোষ্ঠীকে পৃথক করে। যদিও সমাজ বলতে কেবল গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে থাকাই নয়, তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে সেই সমাজের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিকটিও। সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমাজবিদ জর্জ এম ফস্টার বলেছেন,

'Society means people and culture means the behaviour of people.' (Foster 1979, p.ii)

কেবলমাত্র স্বভাববশত নয়, নিজ প্রয়োজনের স্বার্থে মানুষ সমাজ গড়ে তোলে। একটি নির্দিষ্ট সমাজে বসবাসকারী মানুষদের আচারণও সেই সমাজের মানুষের চেতনায় সামাজিক সত্তার জন্ম দেয়। একজন সাহিত্যিক নিজেও সামাজিক সত্তার অধিকারী। সামাজিক মানুষ হিসেবে তাঁরও রয়েছে বিভিন্ন মতাদর্শ। সমাজে আবদ্ধ থেকেও একজন সাহিত্যিক শুধুমাত্র ব্যক্তিচেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষভাবে তাঁর সাহিত্যবিশ্ব সৃজনের চেষ্টা করেন যাতে সাহিত্যও সমাজের বাস্তব দলিল হিসেবে বিবেচিত হওয়ার বিশ্বস্ততা অর্জন করে।

সাহিত্যিক হরিশংকর জলদাসের সৃজনবিশ্বে দেখা যাবে, তিনি তাঁর আখ্যানে তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সমাজের মানুষের কথা বলেছেন। তাদের সাংস্কৃতিক দিক অর্থাৎ জীবনযাপনের পদ্ধতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ, নিজস্ব আচার-সংস্কার-বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ধর্মমত ও খাদ্যাভ্যাসকেও সমাজ বর্ণনার আবশ্যিক উপাদান স্বরূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। সংস্কৃতির এই সমস্ত উপকরণ একটি নির্দিষ্ট সমাজগোষ্ঠীর স্বতন্ত্রতা ও নিজস্বতাকে নির্ধারণ করে। হরিশংকরের গল্প উপন্যাসে ব্যক্তি-সমাজ নির্বিশেষে সেই নিজস্বতা লক্ষ করা গিয়েছে। তবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকের পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটও সমাজ গঠনে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে যুক্ত। একটি নির্দিষ্ট সমাজ কাঠামোয় অবস্থানকারী মানুষ হিসেবে তার জীবনের সঙ্গে জড়িত তার পেশা বা জীবিকা সম্পর্কিত অংশই সেই সমাজের অর্থনৈতিক দিকটিকে চিহ্নিত করে। তাই অর্থনৈতিক দিকটি ব্যক্তির জীবনের অন্যান্য দিকগুলি থেকে আলাদা নয়, বরং তা তার জীবনাদর্শ, চিন্তাভাবনা, ঐতিহ্য, পরিবেশ, মূল্যবোধ ও অন্যান্য মানসিক চেতনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে যেহেতু তথাকথিত সমাজ কাঠামোর তলদেশের মানুষের কথা প্রাধান্য

পেয়েছে সেহেতু তাদের আয়ের উৎস অর্থাৎ পেশার দিকটিকে আলোচনার কেন্দ্রে রাখলে লেখক বর্ণিত সেই নির্দিষ্ট সমাজের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে বুঝতে পারা আমাদের পক্ষে সহজ হবে।

আমরা জানি, সমাজের বিন্যাস, সচলতা ও বহমানতাই মানবসভ্যতার ইতিহাস নির্মাণ করে। যদিও ইতিহাস আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের তথ্য প্রদান করে না, কিন্তু সাহিত্য মানুষের সেই গলিঘুচিতে প্রবেশ করে খুঁটিনাটি তথ্য কখনো অভিজ্ঞতা, আবার কখনো কল্পনার আশ্রয়ে তুলে আনে। যা ইতিহাসের মতো সাহিত্যেরও একটি সামাজিক ভিত্তি স্থাপন করে। সাহিত্য জীবন ও সমাজের প্রতিচ্ছবি হওয়ার ফলে সাহিত্যের মধ্যে দিয়েও ইতিহাসের আকল্প নির্মিত হয়। বাস্তবে সমাজের গঠন প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল হওয়ার দরুন সমাজের বহুমুখী দিকটি সাহিত্যে রূপ দেওয়া শুধু কঠিনই নয়, দুঃসাধ্যও। তবু সাহিত্য সমাজের বহুমুখী দিকটির বাস্তবসম্মত দলিল প্রস্তুত করার চেষ্টা করে। হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গ ও নিম্নবর্গীয় সমাজের রূপায়ণ ঘটেছে তাঁর 'জলপুত্র' (২০০৮), 'দহনকাল' (২০১০), 'কসবি' (২০১১), 'রামগোলাম'(২০১২), 'মোহনা' (২০১৩), 'একলব্য' (২০১৬), 'অর্ক' (২০১৭), 'সুখলতার ঘর নেই' (২০১৯), 'প্রস্থানের আগে' (২০১৯), কুন্তীর বস্ত্রহরণ (২০২১) ইত্যাদি নির্বাচিত উপন্যাস এবং গল্পসমগ্র ১ ও গল্পসমগ্র ২ গ্রন্থের নানা গল্পে। আলোচ্য অধ্যায়ে হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে বর্ণিত নিম্নবর্গীয় সমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটটিকে আমরা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব।

৩.১ কথাবিশ্বে নিম্নবর্গের সামাজিক জীবন

সাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস একজন জেলেসন্তান। অধুনা স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার উত্তর পতেঙ্গা জেলেপল্লিতে তিনি জীবনযাপন করেছেন। ফলে তাঁর কথাবিশ্বে আমরা স্বাভাবিকভাবেই ওই অঞ্চলের মানুষের সমাজজীবনকে উঠে আসতে দেখেছি। 'একুশে পত্রিকা'-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে সাহিত্য রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে হরিশংকর জানিয়েছেন-

> "…'প্রেক্ষাপট' শব্দটির বিস্তৃত অর্থ যদি মানুষজন হয় তাহলে আমি জেলেদের নিয়ে লিখেছি, 'প্রেক্ষাপট' শব্দটির মানে যদি সমাজ হয় তাহলে আমি ধীবরসমাজ নিয়ে লিখেছি, 'প্রেক্ষাপট' মানে যদি স্থান হয় তাহলে আমি চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গাকে নিয়ে লিখেছি। 'প্রেক্ষাপট' মানে যদি ভাষা হয় তাহলে আমার লেখায় চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে লিখেছি।" (জলদাস ২০১২(ক) : পৃ. ৭৫)

হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্য জুড়ে জেলেসমাজ তো রয়েইছে, পাশাপাশি মুচি, মেথর, ভিখারি, দারোয়ান, গোয়ালা, মাঝি, নাপিত, বাগানের মালী, গাওয়াল বা পান বিক্রেতা, নারীদেহের দালাল, পতিতা,

কৃষক, কেরানী, পিওন ও সমাজের খেটে খাওয়া মানুষেরাও কথাবিশ্বের ঘটনাক্রমের প্রসঙ্গে-অনুষঙ্গে উঠে এসেছে। হরিশংকর জলদাস কেন তাঁর লেখায় সমাজের নিচুতলার মানুষদের স্থান দিলেন, সে বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি জানান,

> 'সাধারণ মানুষ, অবহেলিত মানুষ, নিত্যদিন লাথিঝাঁটা খাওয়া মানুষগুলোর জীবনকথা আমার লেখায় বারবার উঠে আসে। ওই কিল-ঘুষি-লাথি-ঝাঁটা খাওয়া মানুষ আমিও। আমি যে সমাজে জন্মেছি, তারাও। ওদের আমি ভালো করে চিনি। তাই ওদের নিয়ে লিখি। তাদের কম পেয়ে বেশি উল্লাস প্রকাশ করার কথা, না পেয়ে নীরব থাকার কথাও আমার লেখার বিষয়-আশয় হয়। সাধারণ মানুষের হিংসা-রিরংসা, ভালোবাসা-দুর্গতি, অপ্রাপ্তি-উল্লাস—এসব বিষয় আমার লেখায় প্রাধান্য পায়'। (জলদাস ২০১২(ক), পৃ. ৭৩)

'ওদের নিয়ে' লিখতে গিয়ে তাঁর কথাবিশ্বে নিম্নবর্গীয় সমাজের যে ক্যানভাস তৈরি হয়েছে সেখানে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানকে পাওয়া যায় যা প্রধানত বঙ্গোপসাগর ও কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলকে নির্দেশ করে। একজন মানুষের বেড়ে ওঠার পেছনে তার বাসস্থান, সমাজ ও পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ স্থানিক আঞ্চলিকতার ওপর নির্ভর করে চরিত্রগত, সংস্কৃতিগত ও ভাষাগত আঞ্চলিকতা। শুধু তাই নয়, এই ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করছে কথাবিশ্বে বর্ণিত নিম্নবর্গীয় সমাজের প্রান্তিকতার বিষয়টিও। এখানে একদিকে যেমন শিক্ষা-সমাজব্যবস্থা-সুবিধা-অসুবিধার দিকটি লক্ষ করার বিষয় তেমনই তাদের সংস্কৃতিগত ভূমিকাও লক্ষণীয়। পরবর্তী আলোচনার স্তরে আমরা সেই দিকটিকে ব্যাখ্যা করব।

৩.১.১ <u>কথাবিশ্বের আঞ্চলিক পরিধি ও ভৌগোলিক সীমা-পরিসীমা</u>

হরিশংকর জলদাস সমুদ্র উপকূলের জেলেজীবন নিয়ে রচনা করেছেন 'জলপুত্র' ও 'দহনকাল'। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী উত্তর পতেঙ্গা ও কর্ণফুলী নদী তীরবর্তী জেলেপাড়ার আঞ্চলিক পটভূমি নিয়ে রচিত হরিশংকর জলদাসের যে সমস্ত রচনা আমরা পেয়েছি সেগুলি হল—'জলপুত্র', 'দহনকাল', 'অর্ক' ও 'প্রস্থানের আগে' নামক উপন্যাস এবং 'কোটনা', 'দইজ্যা বুইজ্যা', 'দুখিনি', 'ঢেন্ডেরি', 'একজন জলদাসীর গল্প', 'চরণদাসী', 'প্রতিশোধ', 'সুবলজেঠা', 'জামাইখেকো', ও 'জলধরের কীর্তি' নামক গল্প। 'জলপুত্র' উপন্যাসে দেখি বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী জেলেপল্লির পরিচয়।

> 'উত্তর পতেঙ্গা হতে মিরসরাই পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের কূলে কূলে অনেক জেলেপল্লি। উত্তর পতেঙ্গা, হালিশহর, কাট্টলি, খেজুরতলি, ভাটিয়ারি, কুমিরা, সীতাকুণ্ড, মিরসরাই ইত্যাদি গ্রামের জেলেপাড়াগুলো সমুদ্রের কোল ঘেঁষেই গড়ে উঠেছে'। (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১৫)

উক্ত বর্ণনায় উপন্যাসের একটি আঞ্চলিক রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। উপন্যাসের মূল পটভূমি উত্তর পতেঙ্গার জেলেপল্লি, তবে ঘটনাক্রমে অন্যান্য গ্রাম ও জেলেপল্লির উল্লেখও আমরা পেয়েছি। নিম্নে একটি সারণির মাধ্যমে হরিশংকর জলদাসের গল্প-উপন্যাসে বর্ণিত আঞ্চলিক পরিধি ও ভৌগোলিক পরিসীমাকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছি।

আখ্যানের নাম	ভৌগোলিক স্থান	নদী/ সমুদ্র	গ্রামের নাম	শহরের নাম	পাড়া বা এলাকা
জলপুত্র, দহনকাল	চট্টগ্রাম	বঙ্গোপসাগর/ কর্ণফুলী	উত্তরপতেঙ্গা/ কুমিরা, কাট্টলি/ সেলিমপুর/ ইচাখালি		হিন্দুপাড়া/ নাপিতপাড়া/ ফুলছড়িপাড়া/ ফেউন্যাপাড়া/ মাইজপাড়া/
কসবি	চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী/ হাঁড়িধোয়া	সাহেবপাড়া/ বীরপুর/ হাজিপুর		মাদামবাড়ি/ ফকিরপাড়া/ মাঝিরঘাট/ সদরঘাট/ মাইজপাড়া
রামগোলাম	চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী/ বঙ্গোপসাগর	মনোহরখালী/ বাঁশখালী	চট্টগ্রাম/ হালিশহর	ফিরিঙ্গিবাজার/ ঝাউতলা/ মাদামবাড়ি/ বান্ডেল
মোহনা	একাদশ শতাব্দীর বরেন্দ্রভূমি	কালিন্দী/ রায়মঙ্গল	ডমরনগর/ রামাবতী/ গাঙ্গী		
অর্ক	চট্টগ্রাম	বঙ্গোপসাগর	উত্তরপতেঙ্গা/ দক্ষিণ পতেঙ্গা		দক্ষিণপাড়া
প্রস্থানের আগে	চট্টগ্রাম	বঙ্গোপসাগর/ কর্ণফুলী	উত্তর পতেঙ্গা/ চরপাথরঘাটা/ টেকনাফ/ ঘোড়ামারা/ পলাশপুর		মাইজপাড়া/ ডোমপাড়া/
সুখলতার ঘর নেই	চট্টগ্রাম	বঙ্গোপসাগর	উত্তর পতেঙ্গা/ জলধি/ কমলদাহ/ বানুছাড়া/ ঘোড়ামারা/ চৈতন্যপুর		
কুন্তীর বস্ত্রহরণ	চট্টগ্রাম	কাঁকরি / ডাকাতিয়া	চাঁপাতলা/ বিজয়পুর চরখানপুর/ রামপুর		কুমোরপাড়া/ কৈবর্তপাড়া নমঃশূদ্র পাড়া/ নাপিতপাড়া
কোটনা	চট্টগ্রাম	বঙ্গোপসাগর/ কর্ণফুলী	কুমিরা	নারায়ণ গঞ্জ/ টান বাজার	মুচিপাড়া/ জেলেপাড়া

প্রতিশোধ, জলধরের কীর্তি	চট্টগ্রাম	বঙ্গোপসাগর	জলধি/ ঘোড়ামারা	হালিশহর	
দুখিনি, ঢেন্ডেরি, চরণদাসী	চট্টগ্রাম	বঙ্গোপসাগর/ কর্ণফুলী	উত্তর পতেঙ্গা		
একজন জলদাসীর গল্প	চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী	বৈলছড়ি/ ছান্দারিয়া		লাম্বুরহাট/ কালারপুল/ দাঙ্গারচর
আহব ইদানীং, পরীক্ষার ফল	চট্টগ্রাম	বঙ্গোপসাগর	উত্তর পতেঙ্গা		
খালি হাতে ফেরা	ঢাকা	তিতাস	ব্রাহ্মণবাড়িয়া/ হরিপুর	বাড্ডা	দাসপাড়া

উপরিউক্ত সারণিতে উল্লিখিত আঞ্চলিক সীমা-পরিসীমার প্রাথমিক চিত্র উঠে এলেও কথাসাহিত্যের কিছু কিছু ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। যেমন ‘দহনকাল’ উপন্যাসে উত্তর পতেঙ্গার জেলেপল্লির বর্ণনায় দেখি,

> ‘উত্তর পতেংগা গ্রামটির পূর্ব ও দক্ষিণ দিক কর্ণফুলী বেড় দিয়ে রেখেছে। পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের ফোঁসফোঁসানি। উত্তরে হালিশহর গাঁ। উত্তর পতেংগায় আট-দশটি বৌদ্ধ পরিবার আছে। বাসিন্দাদের অধিকাংশই মুসলমান; তবে অনেক বড়ো জায়গা জুড়ে হিন্দুপাড়াটি। এই হিন্দুপাড়াটিকে মাঝখানে রেখে অনেকটা তার গা ঘেঁষেই দুটো নাপিত পাড়া—উত্তরে ও দক্ষিণে ছড়ানো। গ্রামটির মাঝখান দিয়ে একটি প্রশস্ত মেটেপথ উত্তর থেকে দক্ষিণে কর্ণফুলীর মোহনা পর্যন্ত চলে গেছে। এই রাস্তাটির পশ্চিমে, সাগরের ঢেউ-খেলানো বালিয়াড়ির শরীর ছুঁয়ে মেছোপাড়াটি। তিন শতাধিক বছর ধরে জেলেরা বসবাস করছে এখানে’। (জলদাস ২০১০, পৃ. ১২)

গ্রামটির তিনদিক বঙ্গোপসাগর ও কর্ণফুলী নদী। ‘জলপুত্র’ উপন্যাসের মতই ‘দহনকাল’ উপন্যাসের পটভূমি উত্তর পতেঙ্গা জেলেপল্লি হলেও ঘটনাক্রমে এসেছে ইচাখালি জেলেপাড়া কাঠালিয়া গ্রামের ভৌগোলিক পরিচয়। যেমন- উপন্যাসে বর্ণিত কর্ণফুলী নদীর একটি জলধারা বাঁ দিকে বাঁক নিয়েছে যা ‘ইচাখালি’ নামে পরিচিত। কারণ সেখানে প্রচুর ইচামাছ পাওয়া যায়। ইচাখালের গা ঘেঁষে জেলেপল্লিটির নাম-ইচাখালি। এই ইচাখালি জেলেপল্লির ঠিক উল্টো দিকে কাঠালিয়া গ্রাম। গ্রামের নদীর কোল ঘেঁষে অবস্থিত জেলেপাড়াটি হল কৈবর্তপাড়া।

‘দুলারি এবং কয়েকজন’, ‘সুবল জেঠা’, ‘জামাইখেকো’ গল্পে রয়েছে মহেশখালি জেলেপল্লির কথা। বিশেষ করে ‘জামাইখেকো’ গল্পে মহেশখালি জেলেপল্লির অবস্থানগত বর্ণনায় পাই-

'এমনিতে টিলা-পাহাড়ে ভরা মহেশখালি। পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। পূর্বদিকে চ্যানেল। টিলা-পাহাড়ের কোল ঘেঁষে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধদের বসবাস। জেলেপাড়াটি চ্যানেল ঘেঁষা উপকূলে।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৩৭৮)

'আহব ইদানীং' ও 'পরীক্ষার ফল' গল্পে উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের কথা উঠে এসেছে। 'চরিত্রবান' গল্পে দেখি কৈবর্ত পাড়ার উল্লেখ। হরিশংকর জলদাসের প্রায় অধিকাংশ উপন্যাস ও ছোটোগল্পে বঙ্গোপসাগর ও কর্ণফুলীর তীর ঘেঁষে বিভিন্ন জেলেপল্লির কথা উঠে এসেছে। 'কৈবর্তকথা' গ্রন্থের 'কৈবর্তজীবনের চালচিত্র, জালচিত্র' প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন-

'চট্টগ্রামের জেলেরা প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত। সমুদ্রনির্ভর জেলে এবং নদীনির্ভর জেলে। ... নদী বা সমুদ্র থেকে মাছ আহরণ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। তাই বহু প্রাচীনকাল থেকে নদী বা সমুদ্রপাড়ে জেলেরা তাদের আবাসস্থল গড়ে তুলেছে। বাঁশখালী থেকে মিরসরাই পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের উপকূলে ত্রিশটিরও অধিক জেলেপল্লি আছে।'

(জলদাস ২০০৯, পৃ.৬৮)

'মোহনা' উপন্যাসের আঞ্চলিক পটভূমি তৎকালীন বরেন্দ্রভূমি। কালিন্দী নদী বরেন্দ্রি ছাড়িয়ে দক্ষিণে বাঁক নিলে তার নাম হয় রায়মঙ্গল। রায়মঙ্গল আরো দক্ষিণে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলেছে। কালিন্দী নদীর উত্তরপারে ডমরনগর—ভীমের রাজধানী যা কৈবর্তদের অহংকারের জায়গা। এই ডমরনগরে শুধু কৈবর্তরা নয়, নিষাদরাও বসবাস করে, তবে তারা পাহাড়ের গায়ে আর পাদদেশে থাকে।

'ওই দিকে একটু দূরে বসবাস করে ডোমরা।... তারপর সূত্রধর, তন্তুবায়, তৈলকার, নরসুন্দর, কাংস্যকার—এদের বসবাস আলাদা আলাদা। ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন পাড়া'। (জলদাস ২০১৩, পৃ. ৮)

শুধু তাই নয়, মোহনার জন্মস্থান প্রসঙ্গে জানা যায় কালিন্দী নদীর বাঁকে গাঙ্গী নামক একটি জেলেপল্লি রয়েছে- যা নদীর পাড় ঘেঁষে অবস্থিত।

হরিশংকর জলদাসের আধিকাংশ উপন্যাস ও গল্পের আঞ্চলিক পটভূমি হিসেবে দেখা যায় বঙ্গোপসাগর ও কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী জেলেপল্লি, পতিতাপল্লি ও হরিজনপল্লির কথা। মূলত চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের কথা হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে উঠে এলেও চট্টগ্রাম জেলার অন্যান্য অঞ্চলের কথাও এসেছে প্রাসঙ্গিকভাবে। বিশেষ করে তাঁর ছোটোগল্পগুলিতে চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের উল্লেখ আমরা পেয়েছি। 'ম্যাডাম' গল্পে চট্টগ্রাম জেলার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারি,

'ঢাকার মতন চট্টগ্রামও এখন দুটো অংশে বিভক্ত—ওল্ড চিটাগাং আর নিউ চিটাগাং। শহরের উত্তর পশ্চিমে নিউ চিটাগাঙের বিস্তৃতি। কর্ণফুলীর পারে পুরাতন চট্টগ্রাম। নদীপারেই সকল শহর। বেশিরভাগ শহরের পত্তন হয়েছে নদীপারে। একসময় নদীপথই সকল যোগাযোগ আর ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রধান মাধ্যম ছিল। এ কারণে বুড়িগঙ্গা বা টেমস্, যমুনা বা কর্ণফুলী যে নদীই হোক না কেন শহর গড়ে উঠেছে তাদের পারে। চট্টগ্রাম শহরও কর্ণফুলীর পারে

গড়ে উঠেছিল। ওল্ড চিটাগাং এখন এটি। সদরঘাট, মাঝিরঘাট, ফিসারিঘাট—এসব ঘাট দিয়ে আন্তর ও বহির্বাণিজ্য চলত'। (জলসাদ ২০১৬(ক), পৃ. ২৩৯)

গল্পে আরো জানা যায় যে, ফিরিঙ্গিবাজার, কোতোয়ালি, পাথরঘাটা, বংশাল অঞ্চলগুলি নদীর পারেই অবস্থিত। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে এইসব অঞ্চলে ইংরেজদের বসবাস ছিল। সেখানে নেটিভদের বসবাস তো দূরের কথা, যাতায়াতও নিষিদ্ধ ছিল। ইংরেজ ভারতবর্ষ ত্যাগ করলে ফিরিঙ্গিবাজার এলাকাটিতে বনেদী হিন্দু-মুসলমানরা এসব অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। কিন্তু তথাকথিত নিম্নবর্গ শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই নদী- সমুদ্রের তীরবর্তী গ্রামাঞ্চলে তাদের বসতি স্থাপন করে।

সমাজের তথাকথিত অন্যান্য নিম্নবর্গীয় সমাজের আঞ্চলিক অবস্থানও উঠে এসেছে লেখকের অন্যান্য ছোটোগল্পে। উদাহরণ হিসেবে 'ভাঙন', 'রতন', 'থুতু', 'সীমানা ছাড়ায়ে', 'ঢোলদাস', 'উর্বশী', 'ওরা এরকমই'—প্রভৃতি গল্পের নাম করা যেতে পারে। 'ভাঙন' গল্পে বগলা নদীর উত্তর পারে টেকের হাটের ঘাটে চাঁদপুর, ভৈরব, নারায়ণগঞ্জ এমনকি চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ থেকেও বড়ো বড়ো পালতোলা নৌকা ভিড়ত। লোকালয় থেকে দূরে বগলা নদীর তীর ঘেঁষে ডোমপাড়া। ডোমপাড়ার সঙ্গে গা লাগিয়ে চর ও জমিদার গ্রাম। 'দেহ' গল্পে কথকের গ্রামের নাম কাউয়ার দ্বীপ। বাঁকখালি নদীতীর ঘেঁষে কাউয়ার দ্বীপ গ্রামটি অবস্থিত। 'রতন' গল্পে উলাপুর ও কালিকৃষ্ণপুর গ্রামের কথা আছে। 'থুতু' গল্পে ফারহানার পরিবার থাকে বস্তির দুই কামরার ঘরে। গল্পে দেখা যায় মোমিন রোডটি লাভলেইন মেশার আগে ঝাউতলা। চট্টগ্রামে ঝাউতলা দুটো। একটি ঝাউতলা হল মেথরপট্টি। মেথরপট্টির আশে পাশে খোলা নিচু জলো জায়গার একাংশে একটি বস্তি। সেই বস্তিতে ফারহানার পরিবার থাকে। যদিও পূর্বে তার বাবা শামসুর বাড়ি ছিল সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার ইউনিয়নের চরখানপুর গ্রামে। দুর্বাসা নদীর কোল ঘেঁষে দক্ষিণপাড়া চরখানপুর গ্রাম। অন্যদিকে 'সীমানা ছাড়ায়ে' গল্পে অংশুমানের সহযোদ্ধা ছৈদুলের বাড়ি ছিল পূর্ব মাদামবাড়ির বস্তি এলাকায়। 'তিতাস পাড়ের উপাখ্যান' গল্পে হামিদের বাড়ি মেঘনা নদী তীরবর্তী ভৈরব নামক গ্রামে। 'ঊর্বশী' গল্পে সীতাকুণ্ড, নাপিতপাড়া ও সাহেবপাড়ার উল্লেখ পাই। 'খাবার দোকান' গল্পে কক্সবাজার, 'কৈবর্ত অন্ন' গল্পে কলকাতা জানবাজার, 'কষ্টিপাথর' গল্পে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাতমোড়া গ্রামর কথা রয়েছে।

লক্ষণীয়, আলোচ্য উপন্যাস ও ছোটোগল্পগুলির ভৌগোলিক অবস্থান তথা আঞ্চলিক পটভূমি সমগ্র চট্টগ্রাম জেলার মধ্যে আবদ্ধ। যদিও দু-একটি গল্প চট্টগ্রাম অঞ্চল বহির্ভূত, তথাপি আমরা সামগ্রিক অর্থে চট্টগ্রাম অঞ্চলকে হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বের আঞ্চলিক পটভূমি হিসেবে উঠে আসতে

দেখেছি। সেখানে গ্রামাঞ্চল কেন্দ্রিক তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সমাজের পাশাপাশি কথাবিশ্বের ঘটনা প্রসঙ্গে কলকাতা, ঢাকা, ব্রাহ্মন্দি, নরসিংদি, কুমিল্লা শহরের নামও উঠে এসেছে।

ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে বর্ণিত আঞ্চলিক পটভূমি দেখে আমাদের কাছে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, সমাজ কাঠামোর তথাকথিত নিম্নশ্রেণি, নিম্নবৃত্তির মানুষ শহরাঞ্চল তথা তথাকথিত ভদ্রসমাজ থেকে দূরে নিজেদের বসতি স্থাপন করেছে। তাদের বসবাসের আঞ্চলিক অবস্থান দুর্যোগপূর্ণ প্রতিকূল ও সমস্যাযুক্ত। ‘জলপুত্র’, ‘দহনকাল’, ‘অর্ক’, প্রভৃতি উপন্যাসে সাগর-নদীর জলোচ্ছ্বাসে প্রাণহানি ও জেলেপল্লি ভেসে যাওয়ার বর্ণনা পেয়েছি। সমাজের কেন্দ্রের বাইরে অবস্থান করায় নিম্নবর্গের সমাজে উন্নয়ন ও অনুন্নয়নের বিষয়টিও প্রভাবিত হয়েছে। বর্ষাকালের কর্দমাক্ত রাস্তা, স্কুল, অফিস-হাট- বাজার সবই মূল অঞ্চল থেকে অন্তত এক-দেড় মাইল দূরে অবস্থিত হওয়ার কারণে প্রান্তীয় মানুষগুলির নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে আমরা যে নিম্নবর্গীয় সমাজকে দেখলাম তা প্রতিকূল ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক অবস্থান এবং সর্বোপরি তথাকথিত ভদ্রলোকালয় থেকে দূরে অবস্থান করার বিষয়টি তাদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে নির্দেশ করে।

৩.১.২ প্রান্তিকতা :

সাধারণত প্রান্তে অবস্থিত যে বা যারা তারাই প্রান্তিক। মানব সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে ‘প্রান্তিক’ শব্দের ইংরেজি পরিভাষা ‘মার্জিনাল ম্যান’। শব্দটি ১৯২৬ সালে রবার্ট এজরা পার্ক সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন এমন ব্যক্তিকে বোঝাতে যিনি দুই বা ততোধিক সামাজিকগোষ্ঠী, সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির মধ্যে সীমান্ত রেখায় অবস্থান করে। (Park 1928 p. 9-12) অর্থাৎ সমাজের মূল কেন্দ্র থেকে দূরে জাতিগত, সমাজগত, সংস্কৃতিগত ও অর্থনীতিগত মানদণ্ড থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। এই মার্জিনাল জনগোষ্ঠীর একটি সীমানা রয়েছে। নির্দিষ্ট সীমানা ও প্রান্তিকতা বলতে অনুমান করা হয়- পরিবেশগত, সংস্কৃতিগত ও জাতিগতভাবে যারা আলাদা বা ভিন্ন। সমালোচক ফিলিপ রামিরেজ এই প্রান্তিকতাকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

> ‘The boundaries and margins that I will consider are of several types (ecological, cultural, or ethnic), and they can assume a variety of forms, discrete or continuous, among others. The observation of boundaries can obviously contribute to general theories about social processes.’
>
> (Ramirez 2014, p. xx)

হরিশংকর জলদাস তাঁর গল্প-উপন্যাসে সমাজের তথাকথিত এই প্রান্তীয়গোষ্ঠী তথা নিম্নবর্গকে তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসে বর্ণিত জেলেপাড়া, হরিজনপল্লি, পতিতাপল্লিগুলি নদী বা সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে গড়ে উঠেছে, যা তথাকথিত ভদ্রলোকালয় বা শহর থেকে দূরে অবস্থিত। 'জলপুত্র' উপন্যাসে দেখি,

> 'উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়াটি ভদ্র লোকালয় থেকে দূরে। ভদ্র পল্লি থেকে প্রায় মাইল দুয়েক দূরে বঙ্গোপসাগরের কোলে নীরক্ত পাড়াটি শুয়ে আছে। হিন্দু ও মুসলিম পাড়াগুলো এই জেলেপাড়াটি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করছে'। (জলদাস ২০০৮,পৃ. ১৩)

আমরা জানি, 'দহনকাল' উপন্যাসেও উত্তর পতেঙ্গা জেলেপল্লির কথা বর্ণিত। প্রান্তিকতার এই একই দৃশ্য এখানেও দেখা যায়-

> 'পাড়াটি একেবারেই নিঃসঙ্গ। তার নিকটে বা অনতিদূরে অন্য কোনো ভদ্র পাড়া নেই। ... মেছোপাড়াটির তিন দিকে ধূ ধূ মাঠ।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১২)

তবে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় এই যে, উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের মধ্যেই পাঁচঘর যুগীদের বসবাস রয়েছে। হিন্দু সমাজের মধ্যে থেকেও এরা নিম্নবর্গ। উপন্যাসে জানা যায়-

> 'হিন্দুসমাজে এরা প্রান্তিক, তাদের শ্মশানটাও তাই গাঁয়ের এককোনায়—নির্জনস্থানে'। (জলদাস ২০১০, পৃ. ৭২)

প্রশ্ন আসে, একই গ্রামে অবস্থান করে অবস্থানগত বিভাজন কেন? আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি সমাজের তথাকথিত জাতিভেদপ্রথা, দারিদ্র্য-অস্বচ্ছলতা ও সমাজ-সংস্কৃতিগত প্রভেদের ফলেই একটি সমাজ কাঠামোয় প্রান্তীয়-অন্তেবাসী শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। জেলেরা যেহেতু মাছমারা সম্প্রদায়-অশিক্ষিত-দারিদ্র্য সেহেতু অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণির মানুষেরা তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সেই সমাজে অবস্থান করছে।

'কসবি' উপন্যাসেও জেলেপল্লির প্রান্তীয় অবস্থান লক্ষণীয়। হাঁড়িধোয়া নদীর দক্ষিণপারে অবস্থিত হাজিপুর গাঁয়ের সুতো মিহি হওয়ার ফলে সেখানে দ্রুত তাঁত শিল্প গড়ে ওঠে।

> 'তাঁতের প্রকোপে পড়ে হাঁড়িধোয়ার দক্ষিণপারের জেলেপল্লিগুলো সরে পড়তে থাকে গাঁয়ের গভীরে'। (জলদাস ২০১১, পৃ. ২৩)

এই অবস্থান থেকে আমরা বিবেচনা করতে পারি তাঁতি ও জেলেদের পেশাগত ভিন্নতা। তাঁত শিল্পের মাঝে থেকে জেলেদের যে বৃত্তি বা পেশাগত সংকট ও নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয়েছে- তার ফলে জেলেদের সেখান থেকে চলে যেতে হয়েছে গাঁয়ের গভীরে। সদরঘাট অঞ্চলটিতে জেলেদের বসতি ছিল প্রথমে। কিন্তু বিদেশি জাহাজের নাবিকদের আনাগোনায় কালক্রমে জেলেপাড়াটি সাহেবপাড়া নামে একটি পতিতাপল্লিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই সাহেবপাড়া

'পতিতালয়টিকে এড়িয়ে পূর্বে, পশ্চিমে এবং উত্তরে ভদ্র মানুষদের আবাসস্থল গড়ে উঠেছে'।

(জলদাস ২০১১, পৃ. ৩৭)

দেহব্যবসার মতো বৃত্তি সামাজিকভাবে অপাংক্তেয় বলে পতিতাপল্লিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

'অর্ক' উপন্যাসে বর্ণিত উত্তরপতেঙ্গা গ্রামের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়- এই গ্রামটি চট্টগ্রাম শহরের বাইরে, বঙ্গোপসাগর ঘেঁষে। শুধু তাই নয়, গ্রামের হাইস্কুলটি জেলেপাড়া থেকে দেড় মাইল দূরে। একটি মেটে রাস্তার দুই পাশে নানারকমের গাছ।

'জেলেপাড়ার মানুষজনই এই রাস্তা দিয়ে হাঁটে বেশি। ভদ্র পাড়ার হিন্দু-মুসলমানকে এই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হয় না। ... জেলেপল্লিতে তাদের কোনো কাজ নেই। তারা তাই এই রাস্তাটি মাড়ায় না'। (জলদাস ২০১৭, পৃ. ২৪)

'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসেও একই দৃশ্য। মাইজপাড়া জেলেপল্লিটি শহরের মধ্যে থেকেও যেন 'অজ পাড়াগাঁ'।

'পাড়াটির ভূমি নিচু, মাটি কালো। অধিবাসীরা দরিদ্র জলদাস। তাই পাড়াটির খাজনাটাজনা নিয়ে সরকার মাথা ঘামায় না। এই পাড়াটির উন্নয়নে পৌর করপোরেশনের কোনো নজরও নেই'। (জলদাস ২০১৯, পৃ. ১৮)

'সুখলতার ঘর নেই' উপন্যাসটি একটি রূপক উপন্যাস হলেও মাছের রূপকে আসলে মানব জীবনের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। আমরা লক্ষ করলাম, মাছেদের মধ্যে উচ্চ-নীচ-অভিজাত-অনভিজাতের শ্রেণিবিভাজন রয়েছে। মাছেদের জাত-শ্রেণি অনুসারে আঞ্চলিক বিভাজন তৈরি হয়েছে। লইট্যাপাড়া, পাঙাসপাড়া, ইলিশপাড়া ইত্যাদি। উপন্যাসে জানা যায়-

'লাক্ষা, লাম্বু, গাউঙ্গা কই, দাতিনা, তাইল্যা—এ রকম অভিজাত মাছেরা আবার সাধারণের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে না। তারা থাকে পাড়ার একটু বাইরে, দূরে দূরে, বনেদি এলাকায়'। (জলদাস ২০১৯(খ), পৃ. ১২)

'মোহনা' উপন্যাসের পটভূমি একাদশ শতাব্দীর বরেন্দ্রভূমি। কৈবর্ত বিদ্রোহকে কেন্দ্রে রেখে উপন্যাসের কাহিনির অগ্রগতি। আলোচ্য উপন্যাসের বর্ণনায় কৈবর্তদের পাশাপাশি নিষাদ, ডোম, সূত্রধর, তন্তুবায়, তৈলকার, নরসুন্দর, কাংসকার প্রভৃতি তথাকথিত সমাজের নিম্নবৃত্তির মানুষ ও সমাজের সামাজিক অবস্থান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

'পাহাড়ের গায়ে আর পাদদেশে নিষাদরা থাকে। ... ওই দিকে, একটু দূরে বসবাস করে ডোমরা। ... তারপর সূত্রধর, তন্তুবায়, তৈলকার, নরসুন্দর, কাংস্যকার—এদের বসবাস আলাদা আলাদা। ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন পাড়া। তাদের প্রথা, সংস্কার পৃথক পৃথক'। (জলদাস ২০১৩, পৃ. ৮)

'মোহনা' উপন্যাসের নিষাদদের মতোই 'একলব্য' উপন্যাসে লেখক একলব্যের প্রসঙ্গে নিষাদ রাজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। অরণ্যে ঘেরা, লোকালয় থেকে দূরে নিষাদ রাজ্যের উপস্থিতি। গুরু দ্রোণের কাছে অস্ত্র শিক্ষার জন্য যাত্রাকালে একলব্যের কাছে এরকম নিষাদপল্লির উল্লেখ পেয়েছি- যারা

অরণ্য মধ্যে নিজেদের বসতি স্থাপন করেছে। দুর্গম এলাকায় নিজেদের জীবন ধারনের ব্যবস্থা করেছে। শুধু তাই নয়, একলব্য যখন হস্তিনাপুরের প্রায় কাছাকাছি চলে আসে তখন জানা যায়-

> 'নদীর পূর্বপার থেকেই রাজধানীর শুরু। পশ্চিম তীরে বনভূমি। শ্রমজীবী মানুষেরা বসবাস এ তীরে। এখানে-ওখানে ফসলি ক্ষেত। খেটে খাওয়া মানুষরা নানা কৃষিজদ্রব্য নিয়ে রাজধানীতে চলে যায়। বেচাকেনা শেষ করে শ্রমজীবী-কৃষিজীবী এই মানুষেরা পশ্চিম তীরে ফিরে আসে'। (জলদাস ২০১৬, পৃ. ৯০)

জেলে, পতিতা, নিষাদরা সমাজের তথাকথিত ভদ্র, অভিজাত, অর্থসম্পন্ন, বনেদি লোকালয় থেকে দূরে বসতি স্থাপনের মতোই ধাঙর অর্থাৎ মেথর সমাজকেও আমরা ভদ্রলোকালয় থেকে নিরাপদ দূরত্বে বসবাস করতে দেখেছি। 'রামগোলাম' উপন্যাসে দেখা যায়-

> 'ব্রিটিশ আবাসস্থল থেকে নিরাপদ দূরত্বে অথচ প্রয়োজনে যাতে কাছে পাওয়া যায়, এমন জায়গায় এই মেথরদের থাকতে দেয়া হলো'। (জলদাস ২০১২, পৃ. ১২)

ইতিপূর্বের আলোচিত পরিচ্ছেদে আমরা লক্ষ করেছি হরিশংকর জলদাসের উপন্যাসে চট্টগ্রাম জেলার যে আঞ্চলিক পটভূমি উঠে এসেছে, সেরকমই তাঁর ছোটোগল্পের ক্ষেত্রেও একই আঞ্চলিক পটভূমি উঠে এসেছে। অর্থাৎ আলোচ্য লেখকের ছোটোগল্পগুলির অধিকাংশ গল্পের পটভূমি- উত্তরপতেঙ্গা, জলধি, মহেশখালী, মাইজপাড়া, সাহেবপাড়া, ঝাউতলা মেথরপট্টি, চাঁপাতলা, চরখানপুর, হালিশহর জেলেপল্লি- ইত্যাদি অঞ্চল। ফলে ছোটোগল্পের ক্ষেত্রেও যে লেখক পূর্বে উল্লেখিত প্রান্তীয় অঞ্চলের কথাই বলেছেন- সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। যদিও 'দইজ্যা বুইজ্যা', 'ভাঙন' ও 'জামাইখেকো'- গল্পগুলিতে লেখক প্রান্তিকতার কথা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। 'দইজ্যা বুইজ্যা'- গল্পে উত্তরপতেঙ্গা জেলেপল্লিটির-

> 'দূরে নিকটে দু'চারটা মুসলিম পরিবার। কুলীন হিন্দুপাড়াটি বেশ দূরত্ব বজায় রেখে পূর্বদিকে অবস্থিত। (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২৬)

'ভাঙন' গল্পে যে ডোমপাড়ার কথা বলা হয়েছে সেই পাড়াটিও লোকালয় থেকে দূরে।

> 'লোকালয় থেকে দূরে বগলা নদীর তীর ঘেঁষে ডোমপাড়া। ডোমপাড়ার সঙ্গে গা লাগিয়ে চর। তির থেকে সামান্য ঢালু এই চর বগলার জলে নেমে গেছে। ওই চরেই এ অঞ্চলের শ্মশান। ডোমপাড়া আর শ্মশানের মাঝখানে ঢিলছোড়া দূরত্ব।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ১৪৬)

আবার 'কুন্তীর বস্ত্রহরণ' উপন্যাসেও দেখি, কাঁকরি নদীর গা ঘেঁষে চাঁপাতলা গ্রামটি। যেখানে নমশূদ্র, কুমোরপাড়া, কামারপাড়া, সূত্রধরপাড়া, নাপিতপাড়ার অবস্থান। অঞ্চলটি স্যাঁতস্যাঁতে ও একসময় ঝোপ-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ফলে,

> 'জায়গাটি অনুর্বর আর জঙ্গুলে বলে জমিদারের নজর পড়েনি এদিকে। নমঃশূদ্ররা বামন আর কায়েতদের আবাসস্থল এড়িয়ে এই স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় নিজেদের ঘরবাড়ি গড়ে তুলেছিল।' (জলদাস ২০২০, পৃ. ৭)

‘জামাইখেকো’ গল্পে বর্ণিত

‘মহেশখালির জেলেপাড়াটা ভব্যসমাজ থেকে বিচ্ছন্ন। বিদ্যায় যেমন, অবস্থানগতভাবেও তেমনি’।

(জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৩৭৮)

আমরা জানি, সাহিত্য শিল্পের ক্ষেত্রে কথাসাহিত্যের আবির্ভাব নিঃসন্দেহে একটি ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করেছে। মানব জীবন ও সমাজের ওপর সাহিত্য নির্ভরশীল। কারণ সাহিত্য জীবনকে প্রভাবিত না করলেও জীবন সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক- অর্থনৈতিক জীবন কথাসাহিত্যের ভিত্তিভূমি। একইভাবে সমাজের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ অর্থাৎ সমাজ কাঠামোর তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষও ধীরে ধীরে কথাসাহিত্যে তাদের স্থান অর্জন করল। পূর্বের আলোচিত অধ্যায়ে আমরা দেখেছি মানিক-বিভূতি-তারাশংকর-সতীনাথ-সমরেশ-এর কলমে উল্লেখিত অবহেলিত নিম্নবর্গীয় মানুষেরা প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এদের মধ্যে আছে অন্ত্যজ, দলিত, শ্রমজীবী, নিম্নশ্রেণি, প্রান্তীয় বা অন্তেবাসী মানুষজন। প্রান্তীয় বা অন্তেবাসীদের তথাকথিত সভ্য সমাজ থেকে ‘অনগ্রসর’, ‘অনুন্নত’ ও ‘অসভ্য’ অভিধা দিয়ে তাদেরকে সমাজের মূল স্রোত থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। যদিও দুর্গম, প্রতিকূল ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে থেকেও এই প্রান্তীয় জনগোষ্ঠী নিজেদের সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক প্রথা অনুযায়ী জীবন ধারণের চেষ্টা করেছে। উল্লেখিত কথাকারদের লেখাতেও আমরা নিম্নবর্গের আলোচ্য জীবনসংগ্রামের চিত্রটি ফুটে উঠতে দেখেছি।

হরিশংকর জলদাস তাঁর গল্প উপন্যাসে সমাজের যে তথাকথিত নিম্নশ্রেণির কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের অবস্থান নদী বা সাগর তীরবর্তী অঞ্চলে এবং মূলত তথাকথিত ভদ্র সমাজ থেকে দূরে অবস্থিত। লেখক তাঁর কথাসাহিত্যে তথাকথিত নিম্নশ্রেণির প্রান্তীয় অবস্থানই শুধু উল্লেখ করেননি, তাদের প্রান্তীকীকরণের কারণের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। শুধু জেলেসমাজ বা জেলেপল্লি নয় মেথরপট্টি, পতিতাপল্লি ও সমাজের অন্যান্য তথাকথিত নিম্নশ্রেণির সমাজও বঙ্গোপসাগর, কর্ণফুলী অথবা অন্যান্য নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছে। জেলেপল্লির নদী তীরে বসতি স্থাপনের কারণ হিসেবে লেখক জানিয়েছেন,

‘সেই আদিকাল থেকে, সমাজ যখন বর্ণবাদী মানুষের শাসনের অধীনে চলে এল, বসবাসের জায়গাটাও সমাজপতিরা ঠিক করে দিল। উচ্চবর্গীয়দের জন্য নির্ধারিত হল গ্রামের উঁচু পরিচ্ছন্ন জায়গাগুলো। আর মেথর, মুচি, ধোপা, জেলে এদের ঠেলে দেওয়া হল কর্দমাক্ত, ময়লাছয়লা নিচু ভূমিগুলোতে। জেলেদের বলা হল—তোরা তো মাছ ধরিস, তোরা ওই সমুদ্র বা নদীর পারে থাক গিয়া। জাল নিয়ে জলে যেতে সুবিধে হবে। তাদের থাকতে দেওয়া হল জঙ্গলাকীর্ণ, স্যাঁতস্যাঁতে ভূমিগুলোতে।’ (মুহাম্মদ ২০১৭, পৃ. ৪৬-৪৭)

এছাড়াও নিম্নবর্গের প্রান্তীকীকরণের কারণ হিসেবে বলা যায়, ভদ্র-অভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, অভিজাত-অনভিজাত, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্গ, ধনী-দরিদ্র, সভ্য-অসভ্য তথা উচ্চবর্গীয়-নিম্নবর্গীয় সমাজ যখন পাশাপাশি অবস্থান করে তখন পরস্পর মানুষ তথা সমাজের মধ্যে একটি সামাজিক লেনদেনের সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো দিক থেকে সবল ব্যক্তি সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করে। দুর্বলের প্রতি সবলের ঘৃণা, অপমান, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রদর্শিত হয়। ফলে শিক্ষা-সংস্কৃতি, পেশা ও সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া দুর্বল শ্রেণিরা সমাজের তথাকথিত ভদ্র সমাজ বা লোকালয়কে এড়িয়ে তাদের থেকে দূরে অর্থাৎ প্রান্তস্থলে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। এভাবেই দীর্ঘকাল ধরে প্রান্তিকায়নের ইতিহাস রচিত হয়ে চলেছে। নাগরিক সমাজের প্রেক্ষিতে নিম্নবর্গের প্রান্তিকতার কারণ হিসেবে সমালোচক রোসালিন্ড ও'হ্যানলন তাঁর 'Recovering the Subject : Subaltern Studies and Histories of Resistance in Colonial South Asia' প্রবন্ধে জানিয়েছেন,

> 'The subaltern is rendered marginal in quite a different way- in part through his inability, poverty, his lack of leisure and his inarticulacy, to participate to any significant degree in the public institutions of civil society, with all the particular kind of power which they confer; but most of all, and least visibly, through his consequently weaker ability to articulate civil society's self- sustaining myth'. (Ludden (ed.) 2002, P. 177-78)

অর্থাৎ নাগরিক সমাজে নিম্নবর্গকে প্রান্তিক করা হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে। কোনো ক্ষেত্রে তার অক্ষমতা, কখনো দারিদ্র্য, কখনো তার কার্যকারিতার অভাব ও নিরুপায় হয়ে পিছিয়ে আসা, অথবা সমাজের কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে উল্লেখযোগ্যভাবে অংশগ্রহণ না করার মধ্যে দিয়ে সুশীল সমাজের কাছে নিজের কর্মক্ষমতাকে দুর্বল ভাবার মতো একটি দৃশ্যমান মিথ সৃষ্টির কারণে নিম্নবর্গ তথাকথিত সুশীল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। (সেনমজুমদার ২০০৭, পৃ. ১৮-১৯) তবে একথা আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, প্রান্তিক মাত্রই নিম্নবর্গ, কিন্তু নিম্নবর্গ মাত্রই প্রান্তিক নয়। সেদিক থেকে প্রান্তিকতা নিম্নবর্গের একটি বৈশিষ্ট্য। তাহলে একথা আমরা বলতে পারি হরিশংকর জলদাসের গল্প-উপন্যাসে সমাজের যে তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সমাজের কথা উঠে এসেছে তাদের অধিকাংশই প্রান্তীয় জনগোষ্ঠী। যদিও সমালোচক জহর সেনমজুমদার বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে কেন্দ্র থেকে নিম্নবর্গের মধ্যবর্তী দূরত্বের কারণ হিসেবে শিল্পোত্তর সমাজ ও পাশ্চাত্য প্রভাবকে চিহ্নিত করেছেন। বিশ্বজনসংখ্যার সবচেয়ে দরিদ্রতম অংশ, বিশ্ববাজারে যাদের ক্রয়ক্ষমতা নেই- তারাই ধীরে ধীরে শক্তির শাসন ও শোষণের কাছে অবরুদ্ধ দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁর মতে,

'সমাজ বিচ্ছিন্ন এক পাশ্চাত্য পরিমণ্ডলের সঙ্গে উচ্চবর্গেরা আপোষ করতে পারে, তারা (***নিম্নবর্গ**) তো পারে না। আর পারে না বলেই, জ্ঞানত বা অজ্ঞানত, তাদের উচ্ছেদ হতে হয় উৎখাত হতে হয় বহিঃস্কৃত হতে হয় আইন অথবা শক্তির শাসন শিরোধার্য করে positional objectivity- র মধ্যে (অবস্থানগত বাস্তবতা) তখনি কেন্দ্র ও প্রান্তিকের মধ্যবর্তী ব্যবধান ক্রমাগত বাড়তে শুরু করে'। (সেনমজুমদার ২০০৭, পৃ. ১৮-১৯)

৩.১.৩ কথাবিশ্বে নিম্নবর্গীয় সমাজের বাসস্থান ও পরিবার জীবন

মানুষ ও প্রাণী নির্বিশেষের প্রাথমিক ও ন্যুনতম চাহিদা হল খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান। মানুষ তার আশ্রয় স্থল হিসাবে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে, যা সাধারণত পরিবেশের নানা বিপদ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে। নিরাপত্তা দেয় শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার মতো আবহাওয়া থেকে। যদিও ব্যক্তি বিশেষে ঘরবাড়ি নির্মাণ অর্থনীতি সাপেক্ষ। কেউ কংক্রিটের ঘরবাড়ি নির্মাণ করে, আবার কেউ আর্থিক সামর্থ্যহীনতার কারণে বাঁশ-টিন-খড়-মাটি দিয়েও ঘরবাড়ি নির্মাণ করে। সেই ঘর- বাড়িতে মানুষ তার পরিবারসহ বসবাস করে। প্রশ্ন আসে, পরিবার বলতে কী বোঝায়? পরিবার হল মানবসমাজের মৌলভিত্তি। সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা, অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয়গুলি পারিবারিক সুস্থতা ও দৃঢ়তার ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন প্রভৃতি একান্নভুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে একটি পরিবার। আর এই বহু সংখ্যক পরিবারের সম্মিলিত রূপই হল সমাজ। ফলে পরিবার ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় একক পরিবার ও একান্নবর্তী পরিবার দেখা যায়। সাধারণত একক পরিবার হল স্বামী-স্ত্রী ও তাদের অবিবাহিত সন্তান-সন্ততি নিয়ে গঠিত অনু পরিবার এবং যৌথ পরিবার হল- ঠাকুরদা-ঠাকুমা বা পিতা-মাতার কর্তৃত্বাধীনে বিবাহিত পুত্র ও তার সন্তান সন্ততি নিয়ে গঠিত। হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে বর্ণিত পরিবারগুলির মধ্যে যৌথ পরিবারের কথা অধিকাংশ স্থানে উঠে এলেও একক পরিবারের কথাও আছে।

হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে বর্ণিত তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সমাজের যে ক্যানভাস চিত্রিত হয়েছে, সেখানে দারিদ্র্য, অসচ্ছল, অসহায় মানুষের ঘরবাড়ির বর্ণনায় আমরা পেয়েছি মূলত দু- কামরার, শণের ছাওয়া বাঁশের খুঁটির উপর নির্মিত। বিশেষ করে জেলেপল্লির বেশিরভাগ জেলেদের ঘরবাড়িগুলি সেরকমই। যদিও পতিতাপল্লি ও হরিজনপল্লির ঘরবাড়িগুলি কংক্রিট দ্বারা নির্মিত, কিন্তু একটি বা দুটি ঘরের বেশি অতিরিক্ত ঘর সেখানে নেই। ফলে দেখা গিয়েছে যে পরিবারে সদস্য সংখ্যা বেশি সে পরিবারের অসুবিধা তত বেশি।

৩.১.৩.১ জেলেপল্লির ঘরবাড়ি ও পরিবার জীবন

‘জলপুত্র’ উপন্যাসে ভুবনেশ্বরীর বাড়িটি অনেক বড়ো উঠান জুড়ে। পূর্বমুখী ঘর, একটা ছোটো মন্দির, আলাদা রান্নাঘর ও বিশাল পুকুর রয়েছে। আবার কইনপুরার জেলেপাড়ায় বিধবা রাজবালার ‘শণের ছাউনির ঘরটি কোনোরকমে ভিটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ‘দহনকাল’ উপন্যাসে হরিদাসের বাড়িটি সম্পর্কে বলা হয়েছে-

> ‘বাড়ি মানে একটি শোবার ঘর ও একটি রান্নাঘর। ঘর দুটো শীর্ণজীর্ণ। ছনের ছাওয়া, বাঁশের বেড়া। শোবার ঘরটি একটানা লম্বা। মাঝখানে বেড়ার একটি আড়াল। ওই পাশে রাধানাথ তার বউ বসুমতীকে নিয়ে থাকে। এপাশে রাধানাথের মা নাতি-নাতনি নিয়ে রাত কাটায়। বাড়ির পাশেই একটা পুকুর। (জলদাস ২০১০, পৃ. ১২)

আড়ালের একটি ঘরে রাধানাথ ও তার স্ত্রী বসুমতী এবং অন্যপাশে চন্দ্রকলা তার নাতি- নাতনিদের নিয়ে থাকে। ‘কসবি’ মূলত পতিতাদের জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস হলেও এখানে যতটুকু পরিসরে জেলেজীবনের প্রসঙ্গ এসেছে- সেখানে শৈলেশের ঘর বাড়ি সম্পর্কে জানা যায়-

> ‘তিন কামরার একটি টিনের ছাওয়া ঘর আর আলাদা একটা রান্নাঘর নিয়ে শৈলেশের বাড়িটি।’
>
> (জলদাস ২০১১, পৃ. ২৪)

‘অর্ক’ উপন্যাসে জানা যায় জেলেদের ঘরবাড়িগুলি ঘেঁষাঘেঁষি ও ঠাসাঠাসি। অনেক মানুষ একটা জায়গায় দাঁড়ালে যেমন দমবন্ধের সৃষ্টি হয়, জেলেদের ঘরগুলোর একই অবস্থা। দিবাকরদের বাড়ির সামনে উঠান ও পেছনে পুকুর থাকলে বাড়িটি ‘ছনে ছাওয়া ঝুঁকে পড়া’। ‘প্রস্থানের আগে’ উপন্যাসে মাইজপাড়া জেলেপল্লির ঘরবাড়িগুলি শণে ছাওয়া। ফলে প্রতি বর্ষায় ঘরগুলি হেলে পড়ে। কোনো কোনো বছর অর্থাভাবে ঘরবাড়ি মেরামত করতে না পারলে জেলেরা ঝুঁকে পড়া খুঁটির মধ্যে বাঁশের ঠেস দিয়ে রাখে। বর্ষার সময় কোনো কোনো জেলে বাড়ির চালের ফুটো দিয়ে জলও পড়ে। তবে উপন্যাসে বর্ণিত মাইজপাড়ার জগবন্ধুর অন্যান্য জেলেদের মতো খারাপ অবস্থা নয়। প্রতিবছর বাঁশের খুঁটিগুলির মাটির তলার অংশ পচে গিয়ে ঘর হেলে পড়ে বলে সে তার ঘরের চার কোণায় চারটি কংক্রিটের পিলার পুঁতেছে। সেই পিলারের ওপর শণের চালাটি। ফলে তার ঘরটি শক্ত-সামর্থ্য। জগবন্ধুর ঘরটি পশ্চিমমুখী- সামনে উঠান, পেছনে ছোট্ট একটি রান্নাঘর। মূল ঘর থেকে উত্তরে একটা চালা নেমেছে—একে বলে ‘ইয়াচালা’। এই ইয়াচালাটির নিচে সংসারের নানা জিনিসপত্র, মাছ ধরার সরঞ্জাম, বাড়তি বস্তা, থালা বাসন রাখা হয়। উপন্যাসে বর্ণিত জেলেবাড়িগুলির মতোই মাইজপাড়ার বাড়িগুলো গায়ে গায়ে লাগানো। দু-একটা ঘরের চালে টিন। জগবন্ধুর বাড়ি ছাড়া অন্য কোনো জেলেবাড়িতে উঠোন

নেই। তবে উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়ার সব ঘর শণে ছাওয়া এবং প্রত্যেক বাড়ির সামনে ও পেছনে একটু আধটু ফাঁকা জায়গা রয়েছে। বৃন্দাবন ঠাকুরের ঘরটি হরিবন্ধুর ঘরে লাগোয়া- দুই কামরার ঘর বৃন্দাবনের। পেছনের দিকে ছোট্ট একটি রান্নাঘর। জেলেসমাজে বহদ্দার ছাড়া,

'অন্যান্য জেলেদের থাকার জায়গা বড়ো কম। অনেকের নাও আছে, জাল আছে, কিন্তু মাথা গোজার পর্যাপ্ত জায়গা নেই। দুটো থাকার ঘর, ছোটো একটি রান্নাঘর আর গাবঘরে বাস্তুভিটার সবটাই খেয়ে ফেলে। একচিলতে যে উঠান থাকবে, তাও নেই অধিকাংশ জেলের। ... জেলেদের ঘরবাড়িগুলো দড়ি-জাল-দাড়-পাল-শুঁটকি-আবর্জনা নিয়ে বেশ নোংরা। পরিষ্কার- পরিছন্ন রাখার কোনো চেষ্টাই নাই জেলেগিন্নিদের'। (জলদাস ২০১৯, পৃ. ৩৭)

অন্যদিকে কলাবাগিচার জেলেপাড়ার একপাশে শিবশঙ্করের শ্বশুরবাড়ির বর্ণনায় দেখা যায় যে বাড়ির পাশে বড়ো নালা, চারিদিকে পাঁচিল ঘেরা। তিন কামরার টিনের ছাউনি এবং রান্নাঘরটি আলাদা।

'কোটনা' গল্পে গল্পকথক অশোকের সহপাঠী ক্ষীরমোহন একজন জেলেসন্তান। তাদের বাড়ির বর্ণনায় জানা যায়-

'বাড়ি মানে সামনের দিকে হেলেপড়া ছনের ছাউনির আড়াই কামরার মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই। এক ফালি উঠানে কালো কাদা থিকথিক করত'। (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ১১)

'চরণদাসী' গল্পে মঙ্গলচরণ বহদ্দারের বাড়ির উঠানটি বেশ বড়ো। উঠানের পূর্বদিকে পাঁচ কামরার শণের ছাউনি দেওয়া বাড়িটি এবং তার উত্তর দক্ষিণে একটি গাবঘর। আবার 'জামাইখেকো' গল্পে মহেশখালি জেলেপাড়ার বর্ণনায় দেখা যায়-

'মহেশখালির জেলেপাড়ার গড়ন গতানুগতিক। ঘরবাড়ির জীর্ণ দশা, কালোমাটির ভিটে, কেঁচো-আকীর্ণ কাদাময় উঠান, উঠানের এক পাশে গাবঘর, গাবঘরে দুচারটা টাউঙ্গাজাল, বিহিন্দিজাল—এই তো মহেশখালির জেলেপাড়ার বিবরণ'। (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৩৮০)

'তিতাস পাড়ের উপাখ্যান' গল্পে গোকর্ণঘাটের মালোপাড়াটিতে ঘরবাড়িগুলি গায়ে গায়ে লাগান, বেড়ার দেওয়াল ও শণে ছাওয়া চাল। জেলেদের ঘরবাড়ি ও পরিবেশ প্রসঙ্গে মনে পড়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কথা, যেখানে জেলেদের অস্বস্তিকর ও অমার্জিত পরিবেশটি ফুটে উঠেছে এভাবে-

'পুবদিকে গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। প্রথম দেখিলে মনে হয় এ বুঝি তাহাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা, উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তারপর ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়। স্থানের অভাব এ জগতে নাই। তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই। সবটুকু সমতল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে।

তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না। ... পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তারই ফলে জেলেপাড়াটি হইয়া উঠিয়াছে জমজমাট।' (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৬, পৃ. ১৩)

আসলে বঙ্গদেশের প্রায় সকল জেলেপাড়ার গঠন, বৈশিষ্ট্য, অবস্থান, পরিবেশ এরকমই। আর এই কারণেই মানিকের আলোচ্য জেলেপাড়ার বর্ণনাটি ধ্রুপদী ও সার্বজনীন হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে হরিশংকর জলদাসের গল্প-উপন্যাসের আলোচনায় আমরা জেলেদের ঘরবাড়ি সম্পর্কিত যে সব তথ্য উঠে আসতে দেখলাম, তাতে দুটো বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত জেলেরা আর্থিক দিক থেকে অস্বচ্ছল বলে তাদের ঘরবাড়ি বেশিরভাগ শণ, বাঁশ ও মাটি দিয়ে তৈরি। তারা অর্থাভাবে বছর বছর ঘরবাড়ি মেরামত করতে পারে না বলে তাদের ঝুঁকে পড়া বা হেলে যাওয়া ঘরগুলিতে বাঁশের ঠেস দিয়ে রাখে। দ্বিতীয়ত, অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল জেলেদের (যেমন বহদ্দার) ঘরগুলিতে বাঁশের খুঁটির স্থানে কংক্রিটের খুঁটি ব্যবহার করে এবং চালে টিনের ছাউনি দিয়ে অন্যান্য জেলেদের তুলনায় শক্ত টেঁকসই ঘর বানাতে সক্ষম হয়। জেলেদের ঘর-বাড়িগুলির বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা যায়-

- অধিকাংশ ঘরবাড়িতে বাঁশের খুঁটি ও শণের ছাউনি। আর্থিক স্বচ্ছলতার সাপেক্ষে কিছু কিছু জেলেবাড়ি কংক্রিটের খুঁটিযুক্ত টিনের ছাউনি দেওয়া।
- প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই সামনে-পিছনে একটু আধটু ফাঁকা জায়গা। সামনের দিকের অংশটি উঠোন। বাড়ি বিশেষে উঠোনগুলো ছোটো বা বড়ো।
- প্রত্যেক জেলে বাড়িতেই রান্নাঘরটি মূল বসতবাড়ি থেকে আলাদা স্থানে গড়ে উঠেছে।
- কিছু জেলেবাড়িতে নিজস্ব পুকুর, বাড়ির এককোণে ছোটো মন্দির ও গাবঘর রয়েছে।
- বেশিরভাগ জেলেদের বাড়িতে দুই-তিন কামরার ঘর। ঠাসাঠাসির জীবন। যদিও বহদ্দারের বাড়িতে পাঁচ কামরার ঘরও দেখা যায়।

জেলেদের পরিবার ও পরিবার জীবন প্রসঙ্গে বলতে হয়, জেলে পরিবার ও পরিবার জীবন দুটি ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

এক, জেলেদের আচরণ-ব্যবহার অর্থাৎ স্বভাবজাত প্রবণতা এবং

দুই, সমসাময়িককালের অর্থনৈতিক অবস্থা।

দেখা যায় জেলে পরিবারগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌথ পরিবার। সেই পরিবারের গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয় নারী-পুরুষ বিবাহিত হয়ে একসঙ্গে জীবনযাপন শুরু করার মধ্য দিয়ে এবং তখনই একটি পরিবারের ভিত্তি স্থাপিত হয়। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমপূর্ণ যৌনজীবনকে বলা হয় দাম্পত্য জীবন। দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক

ও মিলনই হল পারিবারিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহত্তর সম্পর্ক। কিন্তু জেলেরা তাদের দাম্পত্য জীবনে কোনো ভণিতাকে প্রশয় দেয় না। মেকি শোভনতার স্থান নেই সেখানে, প্রেম-ভালোবাসা নেই, শুধু আছে প্রয়োজনের তাগিদ ও শরীরী নৈকট্য। কোনো পরিবার পরিকল্পনা ছাড়াই স্ত্রীয়ের গর্ভে সন্তান আসতে থাকে একের পর এক। দাম্পত্যের বহুমুখী রূপের পরিচয় পাওয়া যায় নানা আখ্যানে। যেমন,

(ক) প্রেমময় সুখী দাম্পত্য জীবন :

'জলপুত্র' উপন্যাসে লক্ষ করা যায় চন্দ্রমণি ও ভুবনেশ্বরীর প্রেমময় দাম্পত্য জীবনের টুকরো ছবি। ভুবন ধীরে ধীরে চন্দ্রমণিকে ভালোবাসল, প্রতিদানে পেল আরো ভালোবাসা। উপন্যাসে জানা যায়, জেলে দম্পতির মধ্যে এরকম ভালোবাসা হাস্যকর। কিন্তু ব্যতিক্রম হিসেবে জয়ন্ত-পাখিবালার দাম্পত্য প্রেম চোখে পড়ে।

'দহনকাল'-এ রাধানাথ ও বসুমতীর দাম্পত্য জীবনেও প্রেম ও ভালোবাসা ছিল। রাধানাথের পরিবারে দেখা যায় রামকানাই ও চন্দ্রকলার পুত্র রাধানাথ। রাধানাথের স্ত্রী বসুমতী ও তাদের সন্তান হরিদাস, হরিমিলন ও ইন্দ্রবালা। বিয়ের পর ধীরে ধীরে বসুমতী সংসারের সকল দায়ভার নিয়ে সংসারকে এগিয়ে নিয়ে চলে। গাউর কৃষ্ণমিলনের পরিবারে ভাই-বোন মিলে সাতজনের সংসার। সদ্য বিবাহিত কৃষ্ণমিলন পরিবারের স্বার্থে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে চলে যেতে হয়। বিদায় বেলায় বউ মঙ্গলির আপেক্ষমান হয়ে থাকার কথায় কৃষ্ণমিলনের হৃদয় বিগলিত হয়। গভীর সমুদ্রে নৌকায় শুয়ে সে মঙ্গলির কথা চিন্তা করে বিরহ বেদনায় আপ্লুত হয়েছে। অন্যদিকে হরবাঁশি ও শ্যামবালার পঁয়ত্রিশ বছরের দাম্পত্য সম্পর্ক। স্ত্রী তার সুখের বন্ধু, দুঃখের সঙ্গী। আবার রাধেশ্যামের মতো সাধারণ জেলের পরিবার বলতে তার বিয়ে করা বউ। নিঃসন্তান বউটির প্রতি রাধেশ্যাম খেয়াল রাখেনি তেমন। বহুদিন অভুক্ত থেকেও তার স্ত্রীর কোনো অভিযোগ নেই। খাদ্য-বস্ত্রের অভাবেও রাধেশ্যামের প্রতি কোনো অবহেলা করেনি তার স্ত্রী।

'কসবি' উপন্যাসে শৈলেশ ও যশোদার মধ্যেও আমরা দাম্পত্য প্রেম লক্ষ করছি। যশোদা মুখরা হলেও স্বামী শৈলেশকে সে ভালোবাসত। হঠাৎ একদিন সেন্ট-এর আবদার করলে শৈলেশ সেই আবদার মেটাতে ব্যর্থ হয়, ফলে যশোদা তাকে গালমন্দ করে। অভিমানে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেও কয়েকদিন পর ফিরে আসার সময় যশোদার জন্য সেন্ট নিয়ে আসে। যশোদাও সেদিনের জন্য শৈলেশের কাছে ক্ষমা চায় এবং সুখকর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করে। অন্যদিকে যশোদা হঠাৎ মারা গেলে শৈলেশ উন্মাদপ্রায় অবস্থা কাটাতে থাকে। স্পষ্ট হয়ে যায় শৈলেশ যশোদার প্রেমময় সম্পর্কের কথা।

(খ) কলহময় ও অসুখী দাম্পত্য জীবন

‘দহনকাল’ উপন্যাসে বহদ্দার দয়ালহরির পঁয়ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবন, কিন্তু সে নিঃসন্তান। দয়ালহরিদের যৌথ পরিবার। তারা দুই ভাই—দয়ালহরি ও রামহরি। বাড়িতে দুই বউ—সাধনবালা ও মিনুরানি। তাদের পরিবারের ভেতরের দিক সামলায় সাধনবালা ও বাইরে সামলায় দয়ালহরি। দুই বউয়ে সদ্ভাব, মিলেমিশে সংসারের কাজকর্ম করে তারা। কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশীর তা সহ্য হয় না। বড়োবউয়ের বিরুদ্ধে মিনুকে ভুল বোঝায় পাশের বাড়ির অনন্তবালা। কিন্তু সে কথায় কান দেয় না মিনুরানি। ভাইয়ে ভাইয়ে সম্প্রীতিময় পরিবার জেলেপাড়ায় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সেখানেও একদিন ভাঙন ধরে। যে রামহরি বড়োদাদার সব নির্দেশ মুখ বুজে মেনে নিত একসময়, সে দুটো পয়সা বেশি রোজগারের আশায় নিজের বিবেক বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে দয়ালহরির নির্দেশ অমান্য করে। জালাল মেম্বরের চক্রান্তে সংসার আলাদা হয়। যৌথ পরিবার একক পরিবারে পরিণত হয়। আবার নিকুঞ্জ বহদ্দার ও কালিনীবালার দাম্পত্য জীবন সুখ শান্তির নয়। তাদের দুটো ছেলে। বড়ো ছেলের বিয়ে হয়েছে। নিকুঞ্জ তার স্ত্রীকে ভয় করে। বহদ্দারের মেয়ে বলে কালিনীবালার দেমাক বেশি। স্ত্রীর কাছে হার মেনে বাইরের সমাজে সে আরো দাপুটে হয়ে ওঠে।

‘অর্ক’ উপন্যাসে পঞ্চানন একজন খল চরিত্র। তার পরিবারে ঘরভর্তি সন্তান-সন্ততি। সে নিজে উপার্জনহীন কিন্তু তার স্ত্রী উপার্জন করে। ঘরে বিধবা মেয়েটি রয়েছে। তার পরিবারে সুখ শান্তি নেই বলে অন্যের সুখ-শান্তি সহ্য হয়নি।

জেলেপরিবারগুলো বেশিরভাগ যৌথ পরিবার হওয়ার কারণে সংসারে সাংসারিক কলহ, বচসা, ও পরিবারে ভাঙন দেখা গিয়েছে। ‘জলপুত্র’ উপন্যাসে গোলকবিহারীর পরিবারটি যৌথ পরিবারের উদাহরণ। গোলকের চার ছেলে—ধনবাঁশি, কালাবাঁশি, হারাধন, ধর্মচরণ। ধনবাঁশির বউ ক্ষীরবালা ও কালাবাঁশির বউ সুরভিবালা। দুই বউয়ের স্বভাবে বৈপরীত্য আছে। বড়ো বউয়ের রুক্ষ মেজাজ ও মেজ বউ শান্ত-ধীর-স্থির। কিন্তু মিছরির ছুরির মতো কথা দুই বউয়ের মধ্যে সদ্ভাব গড়ে উঠতে দেয়নি। শ্বশুর গোলকবিহারীকে উভয়ই বেশ ভয় করে বলে যৌথ পরিবারের কাজগুলো তারা ভাগ করে নেয় নিজেদের মধ্যে। তবু একান্নবর্তী পরিবারে থাকতে গেলে কলহ-বাকবিতণ্ডা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। গোলকের পরিবারেও দুই বউকে কেন্দ্র করে সমস্যা হয়েছে। কোনো এক সকালে সুরভিবালার ঘুম থেকে উঠতে দেরি হলে বড়োবউ তাকে কথা শোনায়-সুরভিবালাও চুপ থাকে না- সেও দুটো কথা বললে বচসা ও কলহের সূত্রপাত হয় এবং পরে অশ্রাব্য ভাষায় দুই বউয়ের ঝগড়া ও চিৎকারে পাড়া প্রতিবেশী জড়ো

হয়। তাদের মধ্যস্থতায় বচসা থামে। কিন্তু এখানেই শেষ হয় না। ধনবাঁশি ও কালাবাঁশি সমুদ্র থেকে বাড়ি ফিরতেই বড়োবউ ও মেজবউ কলহের বিবরণ দিয়ে স্বামীদের এর বিচার করতে বলে। এককথায়-দুকথায় দুই ভাইও এই বচসায় জড়িয়ে পড়ে। প্রথমে গালিগালাজ, পরে মারামারিতে রূপান্তরিত হয় সেই বচসা। ধনবাঁশি কালাবাঁশির মাথা ফাঁটিয়ে দিলে এক সকালে কালাবাঁশি সস্ত্রীক গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। পরিবারে ভাঙন ধরে। আমরা লক্ষ করলাম গোলকবিহারীর পরিবারে জেলেপুরুষ তার স্ত্রীয়ের প্রেম-শরীর সম্পর্কে নিস্পৃহ। তাদের চিন্তায় কেবল মাছ-জাল-নৌকা-উপার্জন। কিন্তু সাংসারিক কলহে সকলের সমান হস্তক্ষেপ। হরিশংকর তাঁর 'কৈবর্তকথা' গ্রন্থে জানিয়েছেন-

> 'বিয়ের পর শুরু হয় দাম্পত্যজীবনের কলকোলাহল। কৈবর্ত-দাম্পত্যজীবন ভীতিজনক, বিষাদযুক্ত। কদাচিৎ আনন্দ সেখানে উঁকি দেয়।' (জলদাস ২০০৯, পৃ. ৬৩)

'দুখিনি' গল্পে কিষ্টপদ ও রসবালার দাম্পত্য জীবন প্রথমদিকে সুখকর হলেও অর্থাভাব ও দারিদ্র্য সংসারের আনন্দ ও সুখকে ম্লান করে ফেলেছে। স্বামী- স্ত্রীতে মাঝে মাঝেই বচসা-কোন্দল এবং একসময় তা তুমুল ঝগড়াতে পৌঁছায়। কিষ্ট ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে স্ত্রী রসবালাকে পেটায়। সহ্যের বাধ ভেঙ্গে গেলে কিষ্ট একদিন রসবালাকে ছেড়ে পাশের গ্রামের কেতকিবালাকে সাঙ্গা করে। অন্যদিকে 'ঢেন্ডেরি' গল্পে রাইগোপালের সঙ্গে আঙুরবালার অবৈধ সম্পর্কের কথা শুনে স্ত্রী লক্ষ্মীবালার স্বামীর প্রতি ভৎসনা ও খিস্তি-খেউর। পরস্পরের মধ্যে দাম্পত্য কলহের ছবি উঠে এসেছে।

'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে সুধাংশুর পরিবারে ভাই ও তাদের স্ত্রীদের মধ্যে নানা কারণে ঈর্ষা ও কলহের চিত্র ফুটে উঠেছে। শিবশঙ্করের বিয়ের পর সুলেখার সঙ্গে সত্যব্রতের বউ রানিবালার সদ্ভাব গড়ে ওঠেনি। শিবশঙ্করের চাকরি থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা সত্য জানতে পারলে সে একদিন সে দাদা শিবশঙ্করকে বেকার ও বসে বসে খাওয়ার খোঁটা দেয়। অপমানিত শিবুও দুটো কথা বললে আরেক ভাই সীতানাথও সত্যের সঙ্গে যোগ দেয়। ভাইয়ে ভাইয়ে মনোমালিন্য ও বচসা শুরু হয়- এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব সংসারে একসময় ভাঙন ধরায়। সত্যব্রত ও সীতানাথ বউ নিয়ে আলাদা হয়। অন্যদিকে পশ্চিমপাড়ার অচিন্ত্য সর্দারের পরিবারে সুশীল ও সুদাম দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে কোন্দলের সৃষ্টি হয়েছে।

(গ) বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক :

জেলে সমাজের নারী-পুরুষের প্রেম-ভালোবাসা তেমন হয় না। জেলেনারী সংসারে এবং জেলেপুরুষ সমুদ্রে মাছ ধরায় ব্যস্ত থাকে। সারাদিন পর জেলে দম্পতিরা রাতে যখন কাছাকাছি আসে তখন প্রেম-

ভালোবাসার কথা নয়, শারীরিক প্রয়োজন মেটাতে অর্থাৎ যৌনতায় মত্ত হয় তারা। ফলে দৈনন্দিন জীবনে যখন যৌনতাই দুই নরনারীর সম্পর্কের মানদণ্ড তখন তা-ই দম্পতির মধ্যে ভালোবাসা বা প্রেমের নামান্তর হয়ে ওঠে। কিন্তু বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক বা যৌনতার কারণ হিসেবে আমরা বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে দেখলাম, জেলেপুরুষের পঙ্গুত্ব, যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ায় অনিহা বা উদাসীনতা, স্বামীর অনুপস্থিতি এবং জেলেনারীর ক্ষেত্রে কখনো সন্তানের জন্ম দিতে দিতে নিজের শরীরকে রুগ্ন করে ফেলা, কখনো শারীরিক স্থূলতা, কখনো যৌনতায় অনীহা আবার কখনো আর্থিক অসংগতি। 'জলপুত্র' উপন্যাসে এই বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ সম্পর্ক দেখা যায় বিজন বহদ্দার ও গোপালের স্ত্রী বকুলির মধ্যে। বকুলির যৌবন ও সৌন্দর্যের ওপর নজর পড়েছে তার।

'বকুলিকে দেখলেই তার মুখটা তেলতেলে হয়ে ওঠে। চোখে ভেসে ওঠে গিলে খাওয়ার লুব্ধতা'।

(জলদাস ২০০৮, পৃ. ১৮)

অন্যদিকে বকুলিকে বহদ্দারের টাকা দিয়ে সাহায্য করা, কখনো কম টাকা নেওয়া ও তার লোভী কথাবার্তার অর্থ বকুলি বোঝে। মুখে কিছু না বললেও চোখের ভাষায় সেও তাকে প্রশ্রয় দেয়। দীনদয়াল মাস্টার ও বলরামের মেয়ে মঙ্গলীকে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে দেখা গিয়েছে। উপন্যাসে দীনদয়ালের স্ত্রী চরণদাসী মুখরা স্বভাবের। রাত নেই, দিন নেই, সময়-অসময়ের বোধ নেই দীনদয়ালের সঙ্গে একধরনের বচসা লেগেই থাকে। একটা সময় স্থূলকায় স্ত্রীয়ের প্রতি ঘৃণা ও বিরক্তি আসে তার, মন প্রাণ বিষিয়ে ওঠে। এরকমই একদিন দাম্পত্য কলহের পর দীনদয়ালের বাবা-মা চরণদাসীকে নিয়ে সন্দ্বীপে তাদের দেশের বাড়িতে যায়। চরণদাসীর অনুপস্থিতি দীনদয়ালের মনকে বিক্ষিপ্ত করে। সে জানে তার স্ত্রী ঝগড়াটে সন্দেহপ্রবণ হলেও স্বামীর প্রতি গভীর টান আছে। এসব ভাবতে ভাবতেই মঙ্গলী আসে তার ঘরে। রামনারায়ণের বউ রাধারানী দীনদয়ালকে বেতন দিতে গিয়ে দরজা ঠেলতেই দেখে-

'..বিছানো একটা চাটাইয়ে মঙ্গলী চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। শাড়িটা ওপর দিকে তোলা। উদোম বুক। চোখ দুটো আধবোজা। আর দীনদয়াল তার বুকের ওপর হামলে পড়ে ঘন ঘন কোমর দোলাচ্ছে'। (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১১৯)

জেলেসমাজে নরনারীর অবৈধ ও যৌন সম্পর্কের চিত্র 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসেও লক্ষণীয়। উপন্যাসে হরিবন্ধু জলদাস পৈতৃক পেশা ত্যাগ করে কুলির কাজকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে। বস্তা টানতে গিয়ে বস্তার সারিটা হরিবন্ধুর কোমরের ওপর পড়লে হরিবন্ধুর কোমরে গুরুতর আঘাত লাগে। সেই থেকে হরিবন্ধু পঙ্গু। পঙ্গুত্বের কারণে কর্মহীন হরিবন্ধুর সংসারে অভাব নেমে আসে। বাধ্য হয়ে তার স্ত্রী ফুলমালা কাজের জন্য হরিবন্ধুর গোডাউনে সুপার ভাইজার সালাম সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সালাম তাকে হরিবন্ধুর জায়গায় চাকরি দেয়। সংসারে অভাব কমে এলেও দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরে তাদের। পঙ্গু

হওয়ার পর থেকে হরিবন্ধুর শারীরিক উত্তেজনা নিভে গিয়েছে। ফুলমালা কাছে আসলেও হরিবন্ধু সাড়া দেয় না। কিছুদিনের মধ্যে সে বুঝে যায় তার স্বামীর অক্ষমতা। দীর্ঘদিন তারা সঙ্গমহীন জীবনযাপন করলেও হঠাৎ এক রাতে ফুলমালা হরিবন্ধুকে জানায় সে গর্ভবতী। হরিবন্ধু সে কথা শুনে হতচকিত ও অবাক হয়। তার বুঝতে বাকি থাকে না তার স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের কথা। রাগে- অভিমানে, ক্ষোভে সে ফুলমালাকে গালমন্দ করে। কিন্তু ফুলমালার মধ্যে কোনো ভাবান্তর হয় না, বরং সে জানায়-

> 'খানকি হইছি কি আমার জইন্য? এই যে প্রতিদিন ভালা ভালা মাছ দিয়া ভাত খাইতাছ, ভালামন্দ পরতাছ, আজকাল যে খাড়ে শুইতাছ সব তো সালাম সাবের দয়ায়। তা ছাড়া আমারও শরীলের খিদা আছে, আমার মনও তো চনমন কইরে উড়ে মাঝেমইধ্যে'। (জলদাস ২০১৯, পৃ.৪৮)

আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ফুলমালা ও সালাম সাহেবের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠার কারণ, ফুলমালার স্বামীর পঙ্গুত্ব, যৌন অক্ষমতা ও সাংসারিক অভাব। অন্যদিকে চৈতন্য খুড়ার স্ত্রীয়ের সঙ্গে পাশের বাড়ির অবিবাহিত গৌরাঙ্গের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জানা যায়, চৈতন্যের স্ত্রী দুই সন্তানের মা। বয়স পঁয়ত্রিশ পেরোলেও তাকে তরুণী মনে হয়। স্বভাবে চটুল ও সোহাগি দেহভঙ্গির দিকে চৈতন্য খুড়ার কোনো নজর ছিল না। নৌকা-জাল-মাছ নিয়ে রাতদিন কাটত তার। দেখতেও সুশ্রী ছিল না চৈতন্য। তবে চৈতন্য তার স্ত্রীকে অবহেলা করেনি কখনো কিন্তু তার স্ত্রীর দেহ ও মনে সুখ ছিল না। ফলে একরাতে রান্নাঘরে চৈতন্য খুড়ার হাতে গৌরাঙ্গ সমেত ধরা পড়ে তার স্ত্রী। পরদিন চৈতন্যের স্ত্রী ও গৌরাঙ্গ গোপনে গ্রাম ত্যাগ করে।

'কোটনা' গল্পে দেখা যায় শ্যামচাঁদরা দুই ভাই। শ্যামচাঁদ বিয়ে করলেও গৌরচাঁদ অবিবাহিত। শ্যামচাঁদের স্ত্রী অঞ্জনার কোনো এক কারণে ক্ষীরমোহন জন্মাবার পর আর সন্তান হল না। ফলে অঞ্জনার শরীরে যৌবন ও মনে আনচান ভাব থেকে গেল। অন্যদিকে শ্যামচাঁদ সমুদ্রের জলে জাল নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে যৌবন হারাল। গৌরচাঁদ রূপ যৌবন নিয়ে দাদার সংসারে জীবন কাটাতে লাগল। এরকম পরিস্থিতিতে হঠাৎ একদিন ক্ষীরমোহন স্কুল থেকে ফিরে দেখতে পেল

> '... ঘরের ভেতর মা বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। কাকা তার বুকের উপর'। (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২২)

লক্ষণীয়, প্রায় প্রতিটি অবৈধ সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রে যৌন সম্পর্কে পর্যবসিত হয়েছে। আর এর কারণও পরিষ্কার ও স্পষ্ট। জেলে নারী ও জেলে পুরুষ অভাব ক্লিষ্ট সংসারকে সামাল দিতে গিয়ে রাতে শোবার সময় ছাড়া একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উপার্জনে ব্যস্ত থাকে। এই স্বল্প সময়ের জন্য একেঅপরকে কাছে পেলেও শারীরিক উন্মাদনা ছাড়া তেমন প্রয়োজনের কথা হয় না জেলে নারী-পুরুষের মধ্যে। এরমধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যখন জেলে পুরুষের পঙ্গুত্ব, যৌনতায় অনীহা বা উদাসীনতা, যৌন

অতৃপ্ততা বা অকালে যৌবন হারানোর পরিস্থিতি তৈরি হয় তখনই জেলে নারী ও পুরুষের মধ্যে অবৈধ যৌন আকাঙ্খা তৈরি হয়েছে। আবার 'ঢেন্ডেরি' গল্পে দেখা যায় রাইগোপাল তার স্ত্রী লক্ষ্মীবালায় সন্তুষ্ট নয়। তার নজর মথুরার স্ত্রী আঙুরবালার ওপর। আঙুরবালাও তার অসুস্থ কুঁজো স্বামীর সঙ্গে বারো- চোদ্দ বছর নিষ্ক্রিয় জীবন কাটাতে কাটাতে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। গল্পে জানা যায়, শরীর তার দীর্ঘ দিন অমথিত; অনেকটা অস্পর্শিত জীবনই কাটাচ্ছিল আঙুরবালা।

> 'আঙুরবালার রস আছে, রসিক নেই। শরীরে দৌলত আছে, লুটে নেওয়ার লোক নেই। আঙুরবালার দুটো জিনিস আছে—দারিদ্র্য ও যৌবন। রাইগোপাল আঙুরবালার দারিদ্র্য ঘুচিয়ে যৌবন চাকবার অধিকার পেল'।
>
> (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৪৯)

জেলেসমাজের এধরনের অবৈধ যৌন সম্পর্কের প্রসঙ্গে মনে পড়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' ও সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসের কথা। সেখানেও জেলে সমাজে এধরনের অবৈধ সম্পর্কের কথা উঠে আসতে দেখা যায়। 'পদ্মানদীর মাঝি'-তে কুবের ও তার শ্যালিকা কপিলা উভয়েই বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছে। 'গঙ্গা' উপন্যাসে বিলাস ও অমর্ত্যের স্ত্রীয়ের মধ্যে যৌন সম্পর্কের আভাস বর্ণনা জেলে সমাজের অবৈধ সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যের দিকটিকে পরিস্ফুট করেছে।

> 'বিলাস কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো তার হাত ধরে বলল, পালাচ্ছ কেন, কাঁটার গুণ দেখে যাও। বলে টেনে নিয়ে ফেলল গোয়ালের বিচুলি গাদার অন্ধকারে।' (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৮, পৃ. ২১৫)

এই দিকটি ছাড়াও সংসারের দ্বন্দ্ব-কলহ যেমন আছে তেমনি আছে সম্প্রীতিও। ভাইয়ে ভাইয়ে সম্প্রীতি, বউয়ে বউয়ে সদ্ভাব, একপরিবারের সঙ্গে অন্যপরিবারের সম্প্রীতিও আলোচ্য গল্প-উপন্যাসে চোখে পড়ে। উপন্যাসে দয়ালহরি ও রামহরি জলদাস দুই ভাই। তাদের ভ্রাতৃপ্রেম জেলেপাড়ায় রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে তুলনীয়। আবার সেই পরিবারে দুই ভাইয়ের দুই স্ত্রীয়ের মধ্যে সদ্ভাব রয়েছে। সংসারের কাজ তারা ভাগাভাগি করে নেয়। পাশের বাড়ির অনন্তবালা ছোটোবউয়ের কানে বড়োবউয়ের বিরুদ্ধে বিষ ঢাললে সে বলে-

> 'বড়োদি আঁর জাল নো, আঁর ভইন। আঁর ভালাল্লাই রাগ করে'। (জলদাস ২০১০, পৃ. ৭৭)

জেলেসমাজে সম্প্রীতি প্রসঙ্গে 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে জানা যায়

> 'জেলেপাড়ায় সবাই সবার সঙ্গে সম্পর্কিত। কেউ দূরের, কেউ নিকটের। কেউ জেঠা, কেউ খুড়া, কেউ মামা, কেউ-বা দাদা'। (জলদাস ২০১৯, পৃ. ৫৩)

ফলে শিবশঙ্করের সঙ্গে পাড়ার চৈতন্য খুড়া শিবুকে সন্তান প্রেমে স্নেহ করে। শিবুও যে কোনো সমস্যা ও বিষয় চৈতন্য খুড়ার সঙ্গে ভাগ করে নেয়। আর পাঁচটা সমাজের মতোই জেলেসমাজের পরিবারেও

অতিথির আগমন ও তার সৎকারে সম্প্রীতির ছবি ফুটে উঠেছে। ‘দহনকাল’ উপন্যাসে বসুমতীর বাড়িতে তার ভাই বীরেন্দ্রর আগমনে পরিবারের আনন্দ ও সুখকর পরিবেশ দেখা যায়। আবার বীরেন্দ্র যখন বসুমতী ও ভাগ্নে-ভাগ্নিদের তার বাড়িতে নিয়ে আসে তখন বীরেন্দ্রর পরিবারেও আনন্দঘন মুহূর্তের সৃষ্টি হয়। আবার রাধানাথের জালে একদিন বেশি মাছ ধরা পড়ায় কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি স্বরূপ আদাব স্যারের বাড়ি কিছু মাছ দিয়ে আসে। আদাব স্যারের গিন্নিকেও দেখা যায় রাধানাথ ও খু-উ-বুইজ্যাকে নাড়ু, মোয়া-মুড়কি দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করতে।

‘প্রস্থানের আগে’ উপন্যাসে সুধাংশু তার মেয়ে ফাল্গুনীকে তার শ্বশুরবাড়িতে আনতে গিয়ে এক দুঃসম্পর্কের পিসি সুশীলার বাড়িতে বেড়াতে যায়। বহুদিন পর সুশীলা পিসির সঙ্গে সাক্ষাৎ এক আনন্দের মুহূর্ত সৃষ্টি করেছে। আবার যতীন্দ্র বহদ্দার সুধাংশুর বাড়িতে আসে অনুরাধার জন্য তার ছেলে ভরতের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে। সুধাংশু দম্পতি তাদের সঙ্গে দুপুরের ভোজন সারে ও যথাসাধ্য অতিথি সৎকার করে।

দেখা গেল, জেলেপরিবারের দৈনন্দিন জীবনে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো বৈচিত্র্য নেই। প্রায় প্রতিটি পরিবার অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করে চলছে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের মধ্যে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা জড়িয়ে আছে। নিত্যদিনের অভাবে জেলেদম্পতি দিশেহারা হয়। আয়-সক্ষম সদস্যরা রাত-দিন অন্নসংস্থানে ব্যস্ত থাকে। পরিবারে আরো একটু স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির জন্য জেলেনারীরাও ঘরের বাইরে বের হয় উপার্জনের আশায়। তাই দিনের বেলায় নারী-পুরুষ বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে তেমন দেখা সাক্ষাৎ বা কথাবার্তা হয় না। জেলেপরিবারে তাই যত আলোচনা-পরামর্শ-সুখ-দুঃখের কথা সব রাতের বেলাতেই হয়। ‘দহনকাল’ উপন্যাসে দেখা যায়-

> ‘যেরাতে জেলেপুরুষ মাছ ধরতে যায় না, সেরাতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে একত্রে খেতে বসে। ... জেলেবউ ঘুরে ঘুরে সবার পাতে ডাল, মাছ বা সবজি তরকারি তুলে দিতে থাকে। ... এঁটো থালাবাসন পরিষ্কার করে সবার শেষে উদ্বৃত্ত ভাত-তরকারি নিয়ে বসে বউটি। কোনোদিন পর্যাপ্ত খাবার থাকে, অধিকাংশ দিন থাকে না। তার পরও জেলেবউয়ের কোনো অনুযোগ নেই’। (জলদাস ২০১০, পৃ. ৬৯–৭০)

অন্যান্য জেলেপরিবারের মতো রাধানাথের পরিবারের সকলে রাতে একসঙ্গে খেতে বসে। পারিবারিক রীতির মধ্যে দেখা যায়-

> ‘পিঁড়িতে বসে মেঝেতে থালা রেখে ভাত খায় জেলেরা। যতই দরিদ্র হোক কাসার থালা-গ্লাস প্রত্যেকের ঘরে ঘরে। সিরামিক বা সিলভারের থালায় ভাত খাওয়ার রেওয়াজ নেই জেলেসমাজে।’ (জলদাস ২০১০, পৃ. ৪৩)

জেলে পরিবারের আলোচনা প্রসঙ্গে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উঠে আসে তা হল জেলেদের সন্তান আধিক্য। কারণ আমরা পূর্বেই জেনেছি জেলে দম্পতির মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা ততটা প্রকট নয়। পরিবার পরিকল্পনা ছাড়াই বছর বছর সন্তানের জন্ম দেয় জেলে নারীরা। জলপুত্র উপন্যাসে দেখি,

'প্রায় প্রত্যেক পরিবারে আট-দশ জন করে সন্তান।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১৩)

রামহরির চার ছেলে ও এক মেয়ে। দুজন ছেলে কর্মক্ষম ও দুই ছেলে নাবালক। মেয়ে তীর্থবালার বয়স পনের। বলরামের সন্তান-স্ত্রী-মা নিয়ে আট জনের পরিবার।

'তিন ছেলে, তিন মেয়ে, স্ত্রী ও বুড়ো মা নিয়ে সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৬৫)

অন্যদিকে বিজন বহদ্দারের স্ত্রীকে ষষ্ঠ সন্তান প্রসব করতে দেখা যায়। আবার ভোলানাথের বেয়াই রাধামোহনের আটটি সন্তান। তার চতুর্থ কন্যাসন্তানের সঙ্গে বংশীর বিয়ে হয়েছে। 'দহনকাল' উপন্যাসেও জেলে সন্তান-সন্ততির আধিক্যের বিষয়টির কথা জানা যায়-

'সন্তানসন্ততি, মা-বাবা নিয়ে প্রত্যেক পরিবারে কম-সে-কম আট-দশজন তো থাকেই'। (জলদাস ২০১০, পৃ. ৬৯)

উপন্যাসে শিবশরণের পাঁচ সন্তান। তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। গ্রামের শিক্ষক আদাব স্যারেরও পাঁচটি কন্যা সন্তান। 'দুখিনি' গল্পে কালাবাঁশির পরিবার বর্ণনায় দেখা যায়-

'ঘরে তার বৃদ্ধ বাপ জ্ঞানবাঁশি; মা মারা গেছে বহু আগে। সাত-আটজন ভাইবোনে ভর্তি ঘর। তাদের মুখের খাবার যোগাতে জীবন বাজি রেখে উদায়াস্ত পরিশ্রম করে যায় কালাবাঁশি'। (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৪০)

'ঢেন্ডেরি' গল্পে দ্বারকা একজন নৌকার গাউর। জাল-নৌকাবিহীন এই সাধারণ জেলের পরিবারে লোকসংখ্যা নয়জন। যেদিন সে উপার্জনে বেরোত সেদিনই উনানে আগুন জ্বলত। অন্যদিকে 'কুন্তীর বস্ত্রহরণ' গল্পে কুন্তীর চারপুত্র। যুধিষ্ঠির-অর্জুন-নকুল-সহদেব। চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছরের এই নারী মজার ছলে বলে- আরেকটি পুত্র হলে নাম রাখত ভীম। 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে সুধাংশুর পাঁচ পুত্র, দুই মেয়ে। 'জলপুত্র' উপন্যাসে ধনবাঁশির বউ ক্ষীরবালা-

'এর মধ্যে চারটি সন্তান প্রসব করে ফেলেছে। ... পেট থেকে একটা সন্তান বেরিয়ে এলে অন্যটা উপস্থিত হয়'।
(জলদাস ২০০৮, পৃ. ৮৫)

আবার গঙ্গাপদর স্ত্রী সুমিত্রার বাবা যোগেশ বহদ্দারের তিন ছেলে তিন মেয়ে। এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, জেলেপরিবারে একাধিক সন্তানের কারণ জেলেদের মাছ ধরার পেশায় ধনের চেয়ে লোকবলের গুরুত্ব বেশি। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলে- মাঝি, দাঁড়পাল, গাউর, রাঁধুনি, দিয়ে সর্বসাকুল্যে অন্তত দশজনের প্রয়োজন আছে। ফলে কোনো জেলে পরিবারে কমপক্ষে পাঁচজন জেলেপুত্র থাকলে জেলেপিতার বাড়তি পয়সা খরচা করে গাউর রাখার প্রয়োজন পড়ে না। তাদের লভ্যাংশ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, সমাজে থাকতে

গেলে যে কলহ ও বিবাদের সৃষ্টি হয় তার মোকাবিলা করার জন্য পুত্ররা মিলে সেই পরিবারকে নিরাপত্তা দিতে পারে। কিন্তু এর কুফল হিসেবে পূর্বে উল্লেখিত 'দুখিনি' ও 'ঢেন্ডেরি' গল্পের কথাও বলতে হয়। গল্প দুটিতে আমরা দেখলাম, পরিবারে সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ায় তাদের অন্নসংস্থান করার জন্য একজন জেলেপুরুষকে উদায়স্ত সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। এক্ষেত্রে সাধারণ জেলেদের অবস্থা আরো শোচনীয়—একবেলা উপার্জন করতে না পারলে সেই দিন উপবাসে দিন কাটাতে হয় তাদের। হরিশংকর জলদাস তাঁর 'নোনাজলে ডুবসাঁতার' গ্রন্থে জেলেদের অধিক সন্তান প্রসঙ্গে বলেছেন,

> 'আমার যখন একটু বোঝার বয়স হয়েছে, তখন থেকেই মণীন্দ্রের বউকে খালি পেটে দেখিনি। বছর বছর শুধু সন্তান জন্ম দিত। সতেরোটি সন্তান জন্ম দিয়ে মণীন্দ্রের বউ ক্ষান্ত দিয়েছিল। ... এ রকম করে উত্তরপাড়ার গুড়ামোহনের নয়টি, মনোরঞ্জনের সাতটি, ধনবাঁশির আটটি, খু-উ বুইজ্যার এগারোটি সন্তান ছিল। আমি যদ্দুর জানি, সেই সময়ের মতো এখনো উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়ায় সন্তান উৎপাদনে খামতি হয়নি। পাঁচটার নিচে সন্তান থাকলে জেলেপুরুষ এখনো নিজেকে নির্বীর্য মনে করে'। (জলদাস ২০১৮, পৃ. ৫৬-৫৭)

তাহলে জেলেসমাজের পরিবার ও পরিবার জীবন অনুসন্ধানে দেখা গেল-

- জেলে পরিবারগুলি অধিকাংশই যৌথ পরিবার।
- জেলেপরিবারে জেলেকন্যাদের খুব কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে।
- জেলেদের দাম্পত্য জীবন কোলাহলপূর্ণ। কৃত্রিম শোভনতা, প্রেম ভালোবাসার কোনো স্থান নেই তাদের সম্পর্কে। শারীরিক নৌকট্যের প্রাবল্য ছাড়া কৈবর্ত দাম্পত্য জীবন ভীতিজনক ও বিপদযুক্ত। যদিও কথাবিশ্বে ব্যতিক্রমী দাম্পত্য জীবনের দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়েছে।
- কেবল শারীরিক মিলনের প্রয়োজনে জেলেদম্পতিরা কাছাকাছি আসে। কোনো পরিবার পরিকল্পনা ছাড়াই বছর বছর সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে জেলেনারী। ফলে পরিবারে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে অভাবও বাড়তে থাকে।
- জেলেপরিবারগুলি সাধারণত পুরুষতান্ত্রিক। কর্তাস্থানীয় পুরুষটির অবর্তমান তার স্ত্রী বা ছেলের বউ সংসারের প্রধান হয়ে উঠেছে। অর্থ উপার্জনের জন্য জেলেনারীদের বিয়ারির কাজ করতে দেখা যায়।
- জেলেপরিবারের সদস্যরা নিত্যদিন অভাব-অনটন ও জাল-সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে কষ্ট সহিষ্ণু হয়ে ওঠে। জেলেপরিবারগুলি যৌথ ও একান্নবর্তী বলে ভাইয়ে ভাইয়ে বা বউয়ে বউয়ে সম্প্রীতি যেমন আছে তেমনি হিংসা, ষড়যন্ত্র, কলহ, বিবাদ-মারামারির ছবিও আছে। বিশেষ করে সম্পত্তি নিয়ে জেলেপরিবারগুলিতে ভাঙন দেখা দিয়েছে।

- পরিবারের সদস্যদের পরস্পর সম্প্রীতি-দ্বন্দ্ব থাকলেও পাড়ার অন্যান্য পরিবার তথা প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে। পাড়ার সকল পরিবারই সকলের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিয়ের সম্বন্ধ, নাইয়র আসা বা অন্যান্য কারণে এক গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে যাতায়াত ও দুই পরিবারের মধ্যে আতিথেয়তার সুসম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছে জেলে পরিবারগুলির মধ্যে। শত দারিদ্রের মধ্যেও অতিথিকে নারায়ণ রূপে সেবা যত্ন করেছে জেলেরা।

৩.১.৩.২ পতিতাপল্লির ঘরবাড়ি ও পরিবার জীবন

দেহোপজীবিনী—দেহকে উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে যে নারী। অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে যৌনতা বা দেহ বিক্রি। পতিতার সমার্থক শব্দ হিসেবে বেশ্যা, কসবি, বারাঙ্গনা, বারবনিতা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। হরিশংকর জলদাস পতিতা, পতিতাবৃত্তি ও সেই সমাজকে তুলে ধরেছেন তাঁর 'কসবি' উপন্যাসে। উপন্যাসের আঞ্চলিক পটভূমি চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাহেবপাড়া যা পূর্বে সদরঘাট জেলেপল্লি হিসেবে পরিচিত ছিল। প্রায় তিন'শ বছর ধরে সাহেবপাড়া পতিতাপল্লিটি দাঁড়িয়ে আছে।

তথাকথিত ভদ্র সমাজের কাছে পতিতারা নিকৃষ্ট, নিম্নবৃত্তির বলে ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য। কিন্তু রাতের অন্ধকারে সেই অন্ধকার পতিতাপল্লিতেই নানা ভদ্রলোকের সমাবেশ। দিনের আলোয় যারা ঘৃণ্য, রাতের আঁধারে তারাই বরণীয়। দেহক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সমাজের উচ্চ-নিম্নশ্রেণির মানুষ নির্বিশেষে অর্থের বিনিময়ে যৌনলীলায় মাতোয়ারা হয় এই সব পতিতাপল্লিতে। উপন্যাসে সাহেবপাড়া পতিতাপল্লিতে পতিতারা অর্থাৎ চম্পা, জুলিয়েট, মার্গারেট, দেবযানী নামক পতিতারা আসলে কারা? তাদের জীবনবৃত্তান্ত ও পতিতায় রূপান্তরিত হওয়ার কারণ কী? একসঙ্গে একই বাড়িতে মাসি ও সর্দারদের অধীনে থাকতে গিয়ে তাদের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক কি তৈরি হয়? হলেও তা কীরূপ সম্পর্ক? সেই সম্পর্কের মূল্য কি আছে? তারা কোথায় থাকে, কীভাবে থাকে? এইসব প্রশ্নের উত্তরের আড়ালেই রয়েছে পতিতা সমাজের অবস্থান ও গতিপ্রকৃতি।

'কসবি' উপন্যাসে বর্ণিত সদরঘাট জেলেপল্লিটি পতিতাপল্লিতে রূপান্তরিত হওয়ার পর প্রতিটি বাড়ি এক একটি মাসির বাড়িতে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রত্যেক মাসির তত্ত্বাবধানে আট-দশজন পতিতার বাস। উপন্যাসে লেখক সাহেবপাড়ায় পতিতাদের বাসস্থানের সরাসরি উল্লেখ না করলেও তাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আংশিক ইঙ্গিত দিয়েছেন-

'এই সাহেবপাড়ার বয়স এখন তিন শতাধিক বছর। এর মধ্যে এই পাড়াটির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেই জলাভূমি নেই, সেই ঝুপড়িমতন ছনের ঘর নেই, সেই মেটে রাস্তাটিও নেই'। (জলদাস ২০১১, পৃ. ৪২)

জেলেদের অভাবপূর্ণ সংসারে যেখানে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের ঊর্ধ্বে খাদ্যের জোগানই সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন চিহ্ন, সেখানে বস্ত্র-বাসস্থানের ভূমিকা স্বাভাবিকভাবেই গৌণ। কিন্তু দেখা গেল জেলেপল্লি যখন পতিতাপল্লিতে রূপান্তরিত হয় তখন সেই সমাজের অর্থনীতিরও বদল ঘটে। এর মূল কারণ যে পেশা পরিবর্তন তা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। আর্থিক অভাব না থাকার কারণে পতিতাপল্লির ঘরবাড়িগুলি বর্তমানে বৈদ্যুতিক আলো ঝলমলে দোতলা বাড়ির রূপ নিয়েছে। নিচে লম্বা বারান্দার মতো অংশ- যেখানে রাতের বেলা বেশ্যাদের সঙ্গে কাস্টমারের যৌনতার বিকিকিনি হয়। উপন্যাসে জানা যায়, সর্দার, মাসিদের ঘরবাড়িগুলি দোতলা হলেও পতিতাদের দর, বনেদিয়ানা ও রূপের ওপর ভিত্তি করে তাদের থাকার ব্যবস্থাও ভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। কম দরের সাধারণ পতিতারা নিচতলার একটি ঘরে একজন বা দুজন করে থাকে কিন্তু পুব গলিতে যে বেশ্যারা থাকে তারা উচ্চ দরের, বনেদি ও রূপবতী।

'তারা দু'তিন কামরার ঘর নিয়ে দোতলায় থাকে। দোতলার উঠার গেইট বন্ধ থাকে। পরিচিত কাস্টমারের জন্যেই শুধু সেই গেইট খুলে দেওয়া হয়'। (জলদাস ২০১১, পৃ. ৪৩)

সাহেবপাড়ার পুবগলিতে ঢুকতেই মোহিনী মাসির দ্বিতল বাড়ি। দোতলার পশ্চিম দিকের তিনটি ঘর নিয়ে মোহিনী মাসির পরিবার থাকে এবং পুবদিকে দুটো ঘর নিয়ে দেবযানী ব্যবসা চালায়। উপন্যাসে জানা যায়,

'নিচতলায় ছোটো ছোটো অনেকগুলো ঘর। প্রতিটি ঘরে দু'জন করে বেশ্যা থাকে'। (জলদাস ২০১১, পৃ. ৪৪)

নীচতলার প্রায় কুড়ি পঁচিশজন বেশ্যা গভীর রাত পর্যন্ত ব্যবসা চালায়। অন্যদিকে মোহিনী মাসির বাড়ির আট-দশটি বাড়ির পরেই কালু সর্দারের বাড়ি। কালুর বাড়ি দোতলা হলেও মোহিনীর বাড়ির মতো তেমন জৌলুস নেই। মোহিনীর মতো কালু তার বাড়ির দোতলায় পতিতাকে স্থান দেয়নি। তার মতে নীচতলা ও দোতলার মধ্যে দুরত্ব থাকা উচিত। নীচের নোংরা জীবন থেকে কালু তার স্ত্রী-সন্তানকে আলাদা রাখতে চেয়েছে। ওপর তলায় ছোট্ট একটি লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির আছে, কালুর মা সেখানে পূজা দেয়। মোহিনীর বাড়ির নীচতলার মতোই কালুর বাড়ির নীচতলায় অনেকগুলি ঘর আছে। দেখা যায় সেই ঘরগুলোর দেওয়ালের পলস্তারা খোসে পড়েছে, রঙ করা দেওয়াল ফ্যাকাসে ধরনের। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় রিজিয়া রহমানের 'রক্তের অক্ষর' উপন্যাসের কথা। উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায়

'পলেস্তরা খসা ইট বের করা দেওয়ালে সরু রোদের রেখা বিনা পয়সার খরিদ্দারের মতো বেহায়াভাবে লুটোপুটি খাচ্ছে'। (রহমান ২০১২, পৃ. ৭)

প্রবহমানকাল ধরে প্রাচীনতার স্বাক্ষর বহনকারী সাহেবপাড়া পতিতাপল্লির পতিতাদের জীবনধারণ, দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ, সামাজিক দ্বন্দ্ব, কোলাহল, ঈর্ষা ও সর্বোপরি পতিতাপল্লির সর্দার-মাসি ও পতিতাদের পারস্পরিক সম্পর্ক যে জীবন বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে, তাতে দেখা যায় সমাজে পতিতারা মূল্যহীন বা ব্যবহারের পর ছুঁড়ে ফেলার বস্তু। মানুষ হিসাবে তদের অস্তিত্বের সংকট, তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা, ভালোলাগা-ভালোবাসার কোনো মূল্য দেয়নি সর্দার-মাসিরা। তবুও পতিতারা একসঙ্গে অবস্থা অনুযায়ী নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। দিনের পর দিন এভাবে একই ভৌগোলিক এলাকায়, একই ছাদের তলায় বসবাস করতে করতে পতিতাদের মধ্যে একটি পারিবারিক বোধ গড়ে উঠেছে। পরিবারের বৈশিষ্ট্য হল—পরিবারের যেকোনো সদস্যের প্রতি নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ বজায় রাখা। ব্যক্তির আশ্রয়- সহযোগিতা ও নানা বিপদসমূহ থেকে প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধ করে তাঁর সঙ্গে বসবাসকারী অন্যান্য সদস্যরাই। কোনো গোষ্ঠী, গোত্র বা পরিবার যখন তাদের অন্তর্গত সদস্যকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে তখন সেই ব্যক্তির মনে পরিবার বা গোষ্ঠীচেতনা সক্রিয় হয়। কারণ সেই সময় ব্যক্তি অনুধাবন করতে পারে তাঁর স্বপ্ন, সাধ ও আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিফলন। তাকে ঘিরে থাকা পরিবার বা গোত্রের অন্যান্য সদস্যের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। তাদের সঙ্গে বন্ধন স্থাপনের ফলেই একাকিত্বের অবসান হচ্ছে। (কর ১৯৬৫, পৃ. ১৬২)

আলোচ্য বক্তব্যের প্রতিফলন আমরা ‘কসবি’ উপন্যাসে বর্ণিত পতিতাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে লক্ষ করেছি- যেখানে তাদের মধ্যে একটি বন্ধন স্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসে জানা যায়, পতিতাপল্লির পশ্চিম দিকের গলির এক চিলতে জায়গায় একটি পাতকুয়া। এই কুয়ার জলে দিনের বেলা পতিতারা তাদের গন্ধময় শরীরকে পরিষ্কার করে। সেখানে থাকে পশ্চিম গলির আইরিন, বনানী, মমতাজ, ইলোরা, সুইটি আরো অনেকে। গতরাতের বিভিন্ন ঘটনা এইসব পতিতারা একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে মনকে আংশিক স্বস্তি দেয়। কেউ বা তাদের দুঃখ-আনন্দ-প্রতিশোধ-ভালোবাসার কথা বলে। কেউ বা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনায় মশগুল হয়। পতিতাদের এই কথোপকথন ও হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে সাময়িক প্রশান্তি পাওয়ার আকাশ রয়েছে। তাইতো বনানী যখন রেগে যায় তখন সুইটি বলে-

> ‘রাইগো না, রাইগো না দিদি। তুমি আমাগোর জান, তোমার কাছে আইলেই একটু হাসবার সুযোগ পাই। কও তুমি কী কইতাছিলা’। (জলদাস ২০১১, পৃ. ৭৫)

সারাদিনের দুর্গন্ধ-পুঁজময় জীবনের ফাঁকে একটু স্বস্তি বা হাসির সুযোগ ঘটে পতিতাদের একসঙ্গে থাকা বা একই গোষ্ঠীচেতনা বা পরিবারচেতনার মধ্যেই। বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার জন্য আমরা বনানী ও

মমতাজের কথোপকথনকে এখানে তুলে ধরতে পারি। যেমন- কোনো এক সকালে কুয়াপারে অনেকদেরি করে আসে মমতাজ। মলিন মুখ তার। সকলে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করলেও তার বিষণ্ণমুখ দেখে বনানী তাকে দেখে দেরি করে আসার কারণ জিজ্ঞেস করে। মমতাজের নির্বিকার মনোভাব দেখে বনানী লক্ষ করে – তার গলার ও বুকের কাছে সিগারেটের ছ্যাঁকা। বনানী উচ্চকণ্ঠে বলে-

'কী অইছে? কোনো হারামির পোলা তোমার এই অবস্থা করল?' (জলদাস ২০১১, পৃ. ৭৯)

বনানী ও বেবির জিজ্ঞাসায় মমতাজ জানায় বেশি টাকার লোভে সে দুইজন কাস্টমারকে একসঙ্গে ঘরে তুলেছে। কারণ সে তার মেয়ের লেখাপড়ার খরচ জোগানোর জন্য অর্থ সঞ্চয় করে মেয়েকে শিক্ষিত করার স্বপ্ন দেখে। অন্যান্য পতিতারা দুখিনী মমতাজের মনে আর কষ্ট দিতে চাইল না। তারা ভাবল-

'অলীক স্বপ্ন দেখে এই বেশ্যাপল্লির একজন সাধারণ বেশ্যা যদি অসাধারণ আনন্দ পায়, তাতে দোষ কী? বাস্তব যতই কঠিন আর রূঢ় হোক না কেন, তাকে স্বপ্নহীনতার মধ্যে টেনে এনে লাভ কী?' (জলদাস ২০১১, পৃ. ৭৯-৮০)

দেখা গেল, পতিতাদের মধ্যে পরস্পরের জন্য চিন্তা ও সহানুভূতি প্রকাশ এবং পরস্পরকে বয়সানুযায়ী দিদি-বোন সম্বোধন তাদের একটি মানসিক বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। এই বন্ধন ও সহানুভূতি যে পতিতাদের পারিবারিক চেতনারই নামান্তর, তা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই পারিবারিক চেতনা একজন মাসির তত্ত্বাবধানে থাকা আট-দশজন পতিতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র পতিতাপল্লির মধ্যেই দেখা যায়। তাদের পরিবারের অংশ হিসেবে সর্দার ও মাসিরাও রয়েছে। একটি পরিবারের কর্ত্রী হিসেবে মাসিদের গুরুত্ব রয়েছে। কারণ তারাই পতিতাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ করে। মাসিদের সঙ্গে পতিতাদের সম্পর্কের মিশ্র রূপ উপন্যাসে দেখা যায়। কোনো মাসির পতিতাদের প্রতি রুক্ষ মনোভাব এবং কোনো মাসির শান্ত-সহানুভূতিপ্রবণ মানসিকতা। সাহেবপাড়ায় এই দুই বিপরীত স্বভাবের মাসির উদাহরণ হল যথাক্রমে শৈলবালা দত্ত ও মোহিনী জলদাস।

শৈলবালা মাসির রূপবতী ও দামি পতিতা হল দেবযানী। দেবযানীর সিফিলিস রোগ ধরা পড়লে শৈল তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় এবং জানতে পারে দেবযানী বেশিদিন বাঁচবে না। রোগগ্রস্ত দেবযানীর শরীর ভেঙে পড়েছে। ফলে রোগগ্রস্ত, মরণাপন্ন পতিতার মূল্য একলহমায় শূন্য হয়ে গেছে শৈলমাসির কাছে। তাই শৈলর পরামর্শ মতো মিথ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দেবযানীকে লাথি মেরে বের করে দিয়েছে কালু সর্দার। অন্যদিকে ছুঁড়ে ফেলা মূল্যহীন দেবযানীকে পরম মমতায় সেখান থেকে উদ্ধার করেছে মোহিনী মাসি। শহরের বড়ো ডাক্তার দেখিয়ে দেবযানীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করেছে সে। মৃত্যু মুখ থেকে ফিরিয়ে এনে দেবযানীকে নতুন জীবন দিয়েছে মোহিনী। সেই থেকে দেবযানী মোহিনীকে মা রূপে

দেখে ও সম্মান করে। যদিও কালুসর্দারের প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই দেবযানীকে সুস্থ করে তুলেছে মোহিনী, তবুও একজন অসহায় পতিতার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে মোহিনী-দেবযানীর মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে পারিবারিক সম্পর্কের বন্ধন গড়ে উঠেছে।

শুধু তাই নয়, এইসব সম্পর্কের বাইরেও পতিতাদের সঙ্গে কাস্টমারের কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছে। ফলে পতিতা জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে অনেক পতিতাই তাদের বাধা কাস্টমার তথা প্রেমিকের সঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছে। সমাজপ্রথা অনুযায়ী তাদের বিয়ে করে পতিতা সমাজ থেকে তথাকথিত ভদ্র-শিক্ষিত সমাজে নিয়ে গিয়েছে ভদ্রলোকেরা। পতিতার সঙ্গে কাস্টমারের আকর্ষণ ও প্রেমজ সম্পর্ক প্রথম দেখা যায় চম্পা ও রাজেনের মধ্যে। যদিও তাদের সম্পর্ক পরিণতি পায়নি। কিন্তু জুলিয়েট ও জয়নাল আবেদিনের সম্পর্কের পরিণতি আমরা দেখেছি। জুলিয়েটের বাধা বাবু জয়নাল তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে জুলিয়েট প্রথমে নির্বিকার থাকে,

> ‘সে জানে—এ ক্ষণিক আবেগ। ... বিয়ের পর কয়েকটা দিন উন্মাদনায় কাটবে, তারপর জয়নালের মনে সংশয় দেখা দেবে। সংশয় থেকে সন্দেহ জাগবে। সন্দেহ থেকে ঝগড়া মারপিট এবং বিচ্ছেদ’। (জলদাস ২০১১, পৃ. ৮১)

কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়নালের কাছে হার মানে জুলিয়েট। জয়নাল তাকে বিয়ে করে তার সমাজে নিয়ে যায়। কিন্তু জুলিয়েট শেষে টের পায়, জয়নাল তাকে রান্নাঘর সামলানোর জন্য এনেছে। রান্না করা, খাওয়া আর ঘুম ছাড়া জুলিয়েটের জীবনে কোনো বৈচিত্র্য নেই। নেই স্বাধীনতা। ক্রমশ তাদের সম্পর্কে ফাটল ধরে। জুলিয়েটের স্থান হয় সেই পতিতাপল্লিতেই। ঘটনাচক্রে জুলিয়েটের মেয়ে মার্গারেট একদিন তার মা কে জানায়- সে দেবাশিসকে ভালোবাসে এবং তাকে বিয়ে করতে চায়। জুলিয়েটের বিয়ের অভিজ্ঞতা তিক্ত বলে মেয়ের সিদ্ধান্তকে মেনে নেয় না সে। কিন্তু মেয়ের জোরাজুরিতে সে মত দেয় এবং একদিন সন্ধ্যাবেলা দেবাশিস মার্গারেটকে বধূবেশে সাহেবপাড়া থেকে নিয়ে যায়। আবার মোহিনী মাসির অধীনে থাকা রীতাকুমারী নামক পতিতাও তার এক বাধা কাস্টমারকে বিয়ে করে সাহেবপাড়া থেকে মুক্তি পেয়েছে।

তবে শুধু পতিতাদেরই নয়, মোহিনী মাসির বিয়ে-স্বামী-সন্তান ও পতিতাবৃত্তির একটি বৃত্তান্ত রয়েছে। উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়া থেকে উৎখাত হয়ে স্বামী শ্যামচরণের হাত ধরে এই পতিতাপল্লিতে এসে উঠেছিল সে। শুরু করেছিল পতিতাবৃত্তি। তারপর একদিন সে জন্ম দিল কৈলাসকে। কৈলাস জন্মাবার পর পতিতাবৃত্তিতে মন নেই তার। শ্যামচরণের প্রতি উদাসীন মোহিনী কৈলাসকে বুকে করে নতুন স্বপ্ন দেখে। একদিন শ্যামচরণ মারা যায় এবং মোহিনীর জীবনে আসে খায়রুল আহসান চৌধুরী।

অর্থের প্রাচুর্যে ও নিরাপত্তায় মোহিনীর জীবন বয়ে চলে। একটা সময় পতিতাপল্লিতে বিক্রির জন্য নিয়ে আসা নির্মলার সঙ্গে কৈলাসের বিয়ে দেয় মোহিনী। সেখানেই মোহিনী দোতলার তিনটি ঘরে, তার ছেলে-বউ ও নাতনি নিয়ে থাকে।

পতিতাদের এই সমাজ জীবনেও শরীর কেনাবেচার সঙ্গে মনের আদান-প্রদান যেমন ঘটে তেমনই তাদের বিয়ে হতেও দেখা যায়। সন্তান ধারণ ও সন্তানের জন্মও দেয় পতিতারা। যদিও সব পতিতারাই জানে, সন্তান জন্ম দিলে পতিতাদের যৌবনে ভাটা পড়ে, কাস্টমার কমে। তাছাড়া এই অবৈধ সন্তানদের মধ্যে ছেলে সন্তান বড়ো হয়ে পাড়ার গুন্ডা-মস্তান ও কন্যা সন্তানেরা পতিতায় রূপান্তরিত হয়। তবুও তারা সন্তান ধারণ করে, জন্ম দেয় এবং বড়ো হয়ে পতিতা সমাজের জীবনচক্রে মিশে যায়।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় হরিশংকর জলদাসের 'মোহনা' উপন্যাসের কথা। উপন্যাসটি মূলত কৈবর্ত বিদ্রোহের কাহিনি হলেও বারাঙ্গনাপল্লির একটি খণ্ডচিত্র উপন্যাসে উঠে এসেছে। যেখানে মোহনা নিজে একজন পতিতা। ডমরনগরের বাইরে অবস্থিত বারাঙ্গনাপল্লির প্রধানা জানকি মাসি। উপন্যাসে জানা যায়, জানকি একদিন এই পল্লিরই বারাঙ্গনা ছিল। যশোদা মাসির ছত্রছায়ায় সে থাকত। যশোদা মারা যাওয়ার আগে জানকিকে জানায়, সে তার আসল মেয়ে নয়, জানকিকে সে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে। তবুও যশোদা তাকে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করেনি কখনো। আজ জানকির অধীনে চল্লিশ-পঞ্চাশজন বারাঙ্গনা থাকে। মোহনা তাদের মধ্যে একজন। 'কসবি' উপন্যাসের মতো 'মোহনা'তেও দেখা যায়, বারবনিতাদের সন্তান ধারণ করতে নেই। কারণ সন্তানবতী মেয়েদের গ্রাহকদের কাছে কোনো মূল্য নেই। তারপরেও পতিতাদের সন্তান হয়। জানা যায় পুত্রসন্তান থেকে কন্যাসন্তানেই সুখ বেশি পতিতাদের। কারণ পুত্রসন্তানরা বড়ো হয়ে চোর-দালাল-খুনিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু কন্যাসন্তান বড়ো হয়ে পতিতায় রূপান্তরিত হলে বিগত যৌবনে তারা মূলধন হয়ে ওঠে। 'কসবি' উপন্যাসের মতোই 'মোহনা' উপন্যাসেও বারাঙ্গনাদের প্রেম-ভালোবাসার কাহিনি উঠে এসেছে। বারাঙ্গনা মোহনার সঙ্গে ভীমসেনের পালিত পুত্র চন্ডকের প্রেম। সেই প্রেমে কোনো স্বার্থ নেই। চন্ডক ও মোহনার প্রেম চিত্র নিখাদ ও পুষ্ট। চন্ডক মোহনাকে বিয়ে করে এক নতুন জীবন প্রদান করতে চায়। মোহনাও স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সে প্রেম বিয়ে পর্যন্ত পরিণতি পায় না।

দেখা গেল, পতিতাপল্লির সমাজজীবনে শুধু দেহ বিকিকিনিই মূল প্রথা নয়, এর বাইরেও পতিতাদের জীবনে প্রেম-বিয়ে-সন্তান ও পরিবার গঠনের আশা কাজ করেছে। কখনো তা সফল, কখনো বিফল পরিণতিতে পর্যবসিত হলেও অন্যান্য সমাজের মতোই পতিতা সমাজও পারিবারিক জীবনের বাইরে

নয়। যদিও সেখানে তথাকথিত সমাজ- পরিবারের সুষ্ঠতা ও সুস্থতা নেই তবু একই সমাজের ও এক গোত্রের মানুষ হিসেবে পতিতাদের মধ্যে যে পারস্পরিক সহানুভূতি, স্নেহ-মমতা, বাৎসল্য ও সর্বোপরি প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার ভূমিকা রয়েছে তা আসলে একটি পরিবারকেই জন্ম দিয়েছে।

৩.১.৩.৩ মেথরসমাজের ঘরবাড়ি ও পরিবার জীবন

হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে মূলত জেলেসম্প্রদায়ের কথা উঠে এলেও সমাজের অন্যান্য তথাকথিত নিম্নশ্রেণি ও নিম্নবৃত্তির মানুষের দেখা মেলে। তেমনই একটি সম্প্রদায় মেথর, যারা সমাজের তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতিভূ। এরা শ্রমজীবী ও ঝাড়ুদার শ্রেণির মানুষ। সমাজে মেথর সম্প্রদায়কে হাড়ি, মিতর, হর-সন্তান, হরিজন, মহীথর, ঝাড়ুদার ও জমাদারদের সমপংক্তিভুক্ত করা হয়। এই মেথর সম্প্রদায়কে নিয়ে রচিত হরিশংকর জলদাসের 'রামগোলাম' উপন্যাসে দেখা যায়, চট্টগ্রাম শহরে চারটি মেথরপট্টি রয়েছে- পূর্ব মাদামবাড়ি, ফিরিঙ্গিবাজার, বান্ডেল রোড ও ঝাউতলা। সেখানে সরকারি কর্পোরেশন প্রদত্ত কর্মসূত্রে প্রাপ্ত চার-পাঁচতলা বিল্ডিংয়ের খুপরির মতো ঘর একেকটি মেথর পরিবারের জন্য বরাদ্দ। অর্থাৎ মেথরদের আশ্রয়স্থল নিজ অর্থ উপার্জনে নির্মিত নয়। ফলে সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী যতটুকু বরাদ্দ ততটুকু স্থানেই মেথরদের থাকতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, সমগ্র মেথরপট্টির জন্য কেবল পাঁচটি শৌচালয় ও একটি পানীয় জলের টিউবওয়েল।

সমাজের সকল শ্রেণির ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে যারা, তাদের নূন্যতম চাহিদাটুকু পূরণে অক্ষম সমাজের তথাকথিত ক্ষমতাবান শ্রেণি। মানুষ হয়েও মনুষ্যেতর শ্রেণির মতো জীবনযাপন করে চলেছে মেথররা। উপন্যাসের আঞ্চলিক পটভূমি ফিরিঙ্গিবাজার মেথরপট্টি। এই মেথরপট্টির সর্দার গুরুচরণের পরিবারকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি নির্মিত হয়েছে। গুরুচরণের স্ত্রী অঞ্জলি, তাদের এক পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রের নাম শিবচরণ। শিবচরণের স্ত্রী চাঁপারানী। তাদের পুত্র রামগোলাম। মেথরদের আশ্রয়স্থল সম্পর্কে উপন্যাসে জানা যায়-

> 'ফিরিঙ্গিবাজার মেথরপট্টিতে সত্তরটি পরবার থাকে। ... প্রত্যেক পরিবারের জন্য দুটো কামরা বরাদ্দ। একটি রান্নাঘর আর অন্যটি শোবার ঘর।
>
> প্রতিটি পরিবারের তিনটি জেনারেশন একসঙ্গে থাকে। দাদা-দাদি, মা-বাপ আর ছেলেমেয়ে নিয়ে পরিবারে নয়-দশজন সদস্য'। (জলদাস ২০১২, পৃ. ১২-১৩)

একই দৃশ্য আমরা দেখি ঝাউতলা হরিজন কলোনিতে। চারতলার একটি বিল্ডিংয়ে চল্লিশটি পরিবার থাকে। একটি পরিবারে নয়-দশজন সদস্য একটি ঘরে পশুর মতো জীবন কাটায়। এই থাকার জায়গার সংকীর্ণতার জন্য প্রত্যেক মেথর পরিবারে একটি অতি সাধারণ সমস্যা—ছেলে সন্তানের বিয়ে করানো। কারণ দুটো ঘরের মধ্যে একটি রান্নাঘর। ছেলে বিয়ে করলে সে নতুন বউ নিয়ে কোথায় থাকবে এই সমস্যায় প্রত্যেকটি পরিবার জর্জরিত। গুরুচরণের ছেলে শিবচরণের বিয়ের প্রসঙ্গে এরকম সমস্যার উৎপত্তি হয়েছে। শেষে দেখা যায় বাবা-মা রান্নাঘরের এককোণায় শুয়ে শোবার ঘরটি ছেলে-বউয়ের জন্য ছেড়ে দেয়। গুরুচরণের মা-বাবাও তাই করেছিলেন। এখন গুরুচরণদের পালা, শিবচরণকে বিয়ে করানোর পরে তারাও রান্নাঘরে স্থান নেয়। গুরুচরণ ভাবে-

> 'এই আমাদের জীবন। ছেলে বিয়া করালে মা-বাপকে পাকঘরে ঢুকে পড়তে হয় অথবা বারান্দায় খাটিয়া পাততে হয়। আমাদের মানুষ বাড়ে, ঘর বাড়ে না। চোখ বুজে পশুর মতো জীবন কাটাতে হয় আমাদের'। (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৪)

মেথরদের পরিবার ও পারিবারিক জীবনে ঘরের ভিতরে আব্রু বলতে কিছু নেই। সবাই সবার হাড়ির খবর জানে। কারণ ফিরিঙ্গি বাজার মেথরপট্টিতে দুটি বিল্ডিংয়ের সত্তরটি ঘরে প্রায় পাঁচশোর বেশি মানুষ বাস করে। ওপরে ওঠার একটিমাত্র সিঁড়ি। দুদিকে ঘর- সেই ঘরের সামনে দিয়ে বারান্দা বেয়ে অন্য ঘরে যেতে হয়। ফলে বাধ্য হয়েই অন্যঘরের ভিতরে চোখ চলে যায় তাদের। মেথরদের থাকার ঘরগুলোতে জানালা তেমন নেই বলে ঘরগুলো অন্ধকার-গুমোট। একটু আলো বাতাসের আশায় প্রতিটা ঘরের মূল দরজা খুলে রাখা হয়। প্রতিটি ঘরে জীর্ণ খাটিয়া, রংহীন থালাবাসন, মেঝে চটা ও দেওয়ালের পলেস্তারা খসানো। যদিও গুরুচরণের ঘরটি দক্ষিণের একপ্রান্তে বলে ছোটো বারান্দা দিয়ে আসা-যাওয়ার স্থান নেই। ফলে তাদের পরিবারটি বেআব্রু নয়। শিবচরণ ও চাঁপারানীর পুত্র রামগোলাম একটু বড়ো হওয়ার পর ঘরের সংকট বাড়লে গুরুচরণ বারান্দার দক্ষিণের ফাঁকা জায়গায় পাতিবাঁশ দিয়ে একটি ছোটো ঘর তৈরি করে রামগোলামের জন্য। আপাতভাবে ঘর সংকটের সমাধান করলেও সমস্যা পুরোপুরি মেটে না সব পরিবারে। মেথরদের দাম্পত্য জীবনে তার প্রভাব পড়ে। আমরা গুরুচরণের পরিবারের মধ্যে লক্ষ করেছি, ছোটো দুটি ঘরের মধ্যে মা-বাবা ও ছেলে-বউয়ের দুটি দাম্পত্য সম্পর্ক। দাম্পত্য সম্পর্কে যৌনতা বা যৌন সম্পর্ক একটি বড়ো জায়গা নিয়ে আছে। ফলে পাশাপাশি দুটো ঘরে দুই প্রজন্মের দুই দম্পতির যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে লজ্জা ও অসুবিধে দুইয়েরই সৃষ্টি হয়েছে। উপন্যাসে জানা যায়-

> 'রাতের এ সময়ের দাম্পত্য জীবনটা বড়ো লজ্জার। এই সময় গুরুচরণ কখনো অঞ্জলির দিকে হাত বাড়ালে ভয়ে ও লজ্জায় কুঁকড়ে যায় অঞ্জলি। একদিকে স্বামীর কামনা, অন্যদিকে সন্তানের লজ্জা—এই দোটানায় ঘামতে থাকে সে'।

(জলদাস ২০১২, পৃ. ২৪)

দাম্পত্য জীবনে মানিয়ে নেওয়া বিষয়টি জড়িয়ে থাকলেও যৌনজীবনে ব্যক্তির ব্যক্তিগত আড়াল প্রয়োজন, কিন্তু মেথর সমাজে সদস্য অপেক্ষা তাদের বাসস্থানের সংকীর্ণ অবস্থা মেথরদের পশুর মতো জীবনযাপনে বাধ্য করেছে। তবু মেথরদের পরিবার, পরিবার জীবন ও দাম্পত্য সম্পর্কে ভালোবাসা বা প্রেমের ঘাটতি হয়নি। জেলেসমাজের মতোই মেথরসমাজের পরিবারগুলোও অধিকাংশই যৌথপরিবার। প্রত্যেক পরিবারে একসঙ্গে তিনটি প্রজন্মের সদস্যরা বসবাস করে। পরিবারগুলো মূলত পুরুষতান্ত্রিক হলেও সংসারের দায়িত্ব নারীরাই সামলায়। আমরা দেখলাম পুরুষদের মতোই মেথর পরিবারের স্ত্রী- বউরাও করপোরেশনে চাকরি করে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপার্জনে সংসার সংগ্রাম চলতে থাকে মেথরদের।

প্রাসঙ্গিকভাবে বলতে হয়, আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি জেলে পরিবারে যে দাম্পত্য সম্পর্ক তা নিতান্তই শরীরী। সেখানে ভালোবাসা বা প্রেমের স্থান প্রায় নেই। কিন্তু মেথর পরিবারে দাম্পত্য সম্পর্ক প্রেমময় ও মধুর। উদাহরণ হিসেবে আমরা মেথর সমাজের সর্দার গুরুচরণের পরিবারকে দেখে নিতে পারি। তরুণ গুরুচরণ ও অঞ্জলির বিয়ের বাসররাতে অঞ্জলি গুরুচরণের কাছে অনুরোধ করেছিল সে যেন কোনোদিন মদ না খায়। গুরুচরণ স্ত্রীকে কথা দিয়েছিল। জীবনের অনেকটা সময় মদ না খেয়ে পার করে দেওয়ার মধ্যে স্ত্রীয়ের প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সর্দার হবার পর যখন স্ত্রীকে দেওয়া কথা তাকে ভাঙতে দেখা যায়, তখন মদ খেয়ে ঘরে ফেরা গুরুচরণ আড়ষ্ঠ ও সংকুচিত হয়ে থাকে। কথা না রাখতে পারার অপরাধবোধে সে অঞ্জলির সামনে মাথা তোলে না। অঞ্জলিও বোঝে মেথর সমাজের সর্দার হয়ে সে কীভাবে তার স্ত্রীর সামনে ভয়ে গুটিয়ে থাকে। এখানেই তার তৃপ্তি। এখানেই উভয়ের প্রতি প্রেম-ভালোবাসা প্রদর্শিত হয়েছে।

মেথরদের জীবনের অসহায়তা ও অসুবিধার মধ্যেও পরিবারের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য পালন, তাদের নিরাপত্তার জন্য জীবনের শত অসুবিধা ও দুঃখ সহ্য করেছে মেথররা। তাইতো গুরুচরণ যখন প্রথম চাকরিতে ঢোকে তখন মল-মূত্রের গন্ধে বমি করে ফেলে সে। অসহ্য গন্ধে চাকরি ছেড়ে দিতে চায়, কিন্তু পরিবারের নিরাপত্তার দিকে তাকিয়ে শারীরিক অসুস্থাতাকে পাশ কাটিয়ে সে শহরের মলমূত্র বহন করেছে। গুরুচরণের বক্তব্য-

> ‘কতবার যে চাকরি ছেড়ে দিতে চেয়েছি! সামনে তোমার মুখ ভেসে উঠত, ছেলের মুখ ভেসে উঠত। তোমাদের খাওয়াব কী? টাট্টি টানার বিনিময়ে তোমাদের সুখ যে কিনেছি...।’ (জলদাস ২০১২, পৃ. ২২)

গুরুচরণের পরিবারে এই সুখ শিবচরণের জন্মের মধ্য দিয়ে দেখা দিয়েছে। সে তার মৃত পিতাকে যেন পুত্রের মধ্য দিয়ে ফিরে পেয়েছে। আবার সংসারের শত টানাটানি, ঘরের অভাবের মধ্যেও যখন শিবচরণের বিয়ে হয় এবং গুরুচরণ দম্পতিকে রান্নাঘরের এক কোণে শুতে হয় বাধ্য হয়ে, তখনও তার ভেতর দিয়ে একধরনের আনন্দ উপভোগ করে তারা। চাঁপারানী পুত্রবধূ হিসেবে গুরুচরণের পরিবারের আনন্দ বয়ে আনে। শাশুড়িকে সে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করে, তার খেয়াল রাখে, সংসার সামলায়। গুরুচরণও পুত্রবধূকে মেয়ের মতো স্নেহ করে। এই সুখকর মুহূর্তগুলির মতো তাদের পরিবারের আনন্দ আরো দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় যখন চাঁপারানী রামগোলামের জন্ম দেয়। তার জন্মের পর গুরুচরণ চাঁপারানীকে রামগোলামের মা বলে ডাকে। বাৎসল্যের সবটাই উজার করে দেয় সে চাঁপারানীর ওপর। কোনো দিন বাজারে গেলে বউমার জন্য ব্যাগভর্তি আম নিয়ে আসে গুরুচরণ। থালাভর্তি আম কেটে পাশে বসিয়ে চাঁপারানীকে পরম স্নেহে খাওয়ায়।

এ প্রসঙ্গে চাঁপারানী ও শিবচরণের দাম্পত্য জীবনের পরিচয়ও আমরা পেয়েছি। বিয়ের পর পর এই দুই নর-নারীর মনের মধ্যে নানা স্বপ্ন ও শিহরণ। কোনো এক গভীর রাতে চাঁদের মৃদু আলোয় বারান্দায় এসে দাঁড়ায় দুজনে। সাংসারিক নানা কথা হয় দুজনের। বিশেষ করে শিবচরণ যে তার বাবাকে বোঝাতে পেরেছে যে সে মলমূত্র টানার গাড়ির ড্রাইভার হতে চায় না, কারণ সে মলমূত্রের গন্ধ সহ্য করতে পারে না, এই ঘটনাটি শিবচরণের মনকে প্রশান্তিতে ভরিয়ে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে চাঁপারানী বলে যে ঘটনাটি প্রশান্তির হলেও গুরুচরণের স্বপ্নপূরণ হয়নি। কিন্তু চাঁপা তার স্বপ্নের কথা শিবচরণকে জানিয়ে বলে, রামগোলামকে সে স্কুলে পড়াবে। শিবচরণ মেথরদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারটি জানে বলে সে চাঁপার এই স্বপ্নপূরণ হবে না বলে জানায়।

তবে উপন্যাসে শুধু গুরুচরণের পরিবারই নয়, অন্যান্য পরিবারের কথাও উঠে এসেছে। যেমন বাল্লু ও কোকিলার পরিবার। দেখা যায় অঞ্জলি ও কোকিলার মধ্যে এক ধরনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে। কোকিলার প্রথম সন্তানটি গাড়িচাঁপা পড়ে মারা যাওয়ার পর সে অনেকটা উদাসীন। পরে তার বোনের ছেলে ইন্দলালকে চার বছর আগে নিজের কাছে নিয়ে আসে কোকিলা। ইন্দলালের বিয়ের বয়স হয়ে গেলে রূপলালের মেয়ে রূপালীর সঙ্গে বিয়ে হয় তার। অন্যদিকে ব্যান্ডেলপট্টির চমনলালের পরিবারে দেখা যায় এগারো জনের সংসার। তার চার পুত্র ও দুই মেয়ে। পিতামহ, পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে চমনলালের পরিবারের বাসস্থানের সংকট প্রকট। এরই মধ্যে বড়োছেলে শক্তিলালের বিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেয় সেই পরিবার। মাদামবাড়ির রামপ্রসাদের মেয়ে রাধিকাকে পুত্রবধূ করে আনার পর সংসারে

নানা জটিলতা ও কলহের সৃষ্টি হয় চমনলালের পরিবারে। কারণ গুরুচরণের পুত্রবধূর মতো আনন্দ বয়ে নিয়ে আসে না রাধিকা, বরং ঠোঁটকাটা ও স্বার্থপর রাধিকা বাড়ির ননদ, শ্বশুর- শাশুড়ির সঙ্গে নিত্য কলহে জড়িয়ে পরিবেশকে অসুস্থ করে তোলে। শ্বশুরবাড়ির বৃহৎ পরিবারের মাঝে রাধিকা অস্বস্তি বোধ করলে একদিন সে শক্তিলালকে নিয়ে ভদ্র সমাজে মেথর পরিচয় লুকিয়ে বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে যায়। যৌথ পরিবারে ভাঙন ধরে।

আবার হরিলাল ও কাজলীর পরিবারের সমস্যা অন্য ধরনের। বিয়ের চার বছর অতিক্রম হলেও কাজলী সন্তান জন্ম দিতে পারেনি। এই নিয়ে শাশুড়ি বউকে 'বাঁজা'- বলে বলে তার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। কিন্তু ক্লান্ত স্বামীকে দিনের শেষে পারিবারিক সমস্যা ও শাশুড়ির অত্যাচারের কথা বলে না সে। সন্তান না হওয়ার ব্যাপারে হরিলাল ও কাজলি ডাক্তারের কাছে গেলে তারা জানতে পারে হরিলালের সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা নেই। স্বামীর এই অক্ষমতার কথা শাশুড়ির কাছে গোপন রাখে কাজলি- কারণ তার শাশুড়ি কষ্ট পাবে ও স্বামীর সম্মান নষ্ট হবে। স্বামীর সম্মান, পরিবারের সম্মান রক্ষার করার জন্য এই নারীটি নিজে অপমান সহ্য করে এক আদর্শ নারীতে পরিণত হয়েছে। হরিলাল তার স্ত্রীয়ের এই মহত্ত্বে কৃতজ্ঞতায় নুয়ে যায়। তাদের দাম্পত্য জীবনে এক গভীর ভালোবাসার প্রকাশ পায়। এভাবেই সরকার প্রদত্ত ছোটো ছোটো দুটি ঘরে মেথরদের দাম্পত্য জীবন শুরু হয়। পরিবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংসারে অভাব ও ঘরের সংকট দেখা দেয়। জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। কিন্তু এরই মধ্য দিয়ে-

> 'কেউ সুখে জীবনযাপন করে, কেউ ঝগড়া-ফ্যাসাদে মগ্ন থাকে। কেউ মদে সুখ খোঁজে, কেউ মন্দিরে দুঃখ জমা রাখে। কেউ ব্যক্তিস্বার্থ বড়ো করে দেখে, কেউ সামষ্টিক স্বার্থে আনন্দ পায়। কেউ নিজের কথা ভাবতে ভাবতে দিশেহারা হয়। কেউ দিশেহারা সমাজের মঙ্গলের জন্য নির্ভয় এগিয়ে চলে ভয়াল বিপদের দিকে।'
>
> (জলদাস, ২০১২, পৃ. ৮৭)

৩.১.৩.৪ <u>কথাবিশ্বে অন্যান্য নিম্নবর্গের ঘরবাড়ি ও পরিবার জীবন</u>

হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে জেলে, মেথর, পতিতা ছাড়াও কথাবিশ্বের বিভিন্ন প্রসঙ্গে-অনুষঙ্গে সমাজের তথাকথিত অন্যান্য নিম্নবর্গের কথাও উঠে এসেছে। তাদের মধ্যে কুমোর, চাষি, মুচি, গোয়ালা, কুলি, পান বিক্রেতা, নাপিত, ডোম, মুদি দোকানদার, কাজের ঝি, ভিক্ষুক, বেশ্যার দালাল, দিনমজুর, ঢোলবাদক, বাজার সরকার, বেয়ারা, দারোয়ান প্রভৃতি শ্রেণির মানুষদের দেখেছি। কিন্তু তাদের সমাজ ও পারিবারিক জীবনের বিস্তৃত বর্ণনা লেখকের কথাবিশ্বে নেই। এ প্রসঙ্গে বলা ভালো, উল্লেখিত তথাকথিত নিম্নশ্রেণিদের অধিকাংশই লেখকের গল্পবিশ্বের মধ্য দিয়ে আমরা উঠে আসতে দেখেছি। যেমন কুন্তীর

বস্ত্রহরণ উপন্যাস ও 'কোটনা', 'লুচ্চা', 'চিঠি', 'ভাঙন', 'রতন', 'থুতু', 'আহব ইদানীং', 'সুরেন্দ্র গাওয়াল', 'ঢোলদাস', 'কোনো কোনো রাইতে', প্রভৃতি গল্পে। 'কুন্তীর বস্ত্রহরণ' উপন্যাসে কুমোরদের ঘরবাড়ি প্রসঙ্গে জানা যায়,

'কুমোরদের বাড়িঘর যতই জীর্ণ দীন হোক, উঠানটি কিন্তু প্রশস্ত হওয়া চাই। কারণ এই উঠানেই তো মাটির খামি বানানো, এই উঠানেই তো চাক ঘোরানো! ...এজন্য কুমোরদের কাছে বাড়ির চেয়ে উঠানটি মূল্যবান।'

(জলদাস ২০২০, পৃ. ৯)

হরিশংকরের গল্পবিশ্বেও দেখা যায়, নিম্নবর্গীয় জীবনের খণ্ডচিত্র। এর ওপর ভিত্তি করেই আমরা সমাজের অন্যান্য নিম্নবর্গের ঘরবাড়ি ও পারিবারিক চিত্রকে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। 'থুতু' গল্পে শামসুর বাবা একজন চাষি। চরখানপুর গ্রামের উঁচু মতো জায়গায় তাদের বাড়ি, ভিটের ওপর মাটির ঘর ছিল তাদের। 'সুরেন্দ্র গাওয়াল' গল্পে সুরেন্দ্রকাকার ঘরবাড়ি সম্পর্কে জানা যায়,

'বাড়ি মানে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে থাকা দু'কামরার দীন একটা দোচালা ঘর। ছনের ছাউনি। ঘরের বেড়া এখানে ওখানে ভেঙে গেছে। দু'কদম দূরে নুইয়ে-পড়া একটা পাকঘর। চার-পাঁচজন বসতে পাড়ার মতো একটা দাওয়া। দাওয়া-লাগোয়া এক চিলতে উঠান।' (জলদাস ২০১৯(ক), পৃ. ২৫)

'লুচ্চা' গল্পে চন্দনকান্তির বাজেমালের দোকান। তাঁর দুই ছেলে সুধাম ও স্বপন। পড়াশোনা বেশিদূর না করে দুই ভাই বাবার দোকান সামলায়। চন্দনকান্তির কাশ রোগ বলে দোকানের দায়িত্ব ছেলেদের ওপর দিয়ে সে বাড়িতেই সময় কাটায়। বিয়ের পর সুধাম আরো বেশি উপার্জনের আশায় বিদেশে যায়। স্বামীর অনুপস্থিতিতে দেওর স্বপনের সঙ্গে সুধামের স্ত্রীর অবৈধ যৌন সম্পর্ক তৈরি হয় এবং সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। সুধাম ফিরে এসে সব জানতে পারে এবং সে কালক্রমে উন্মাদে পরিণত হয়। প্রায় একই ঘটনা 'কোনো কোনো রাইতে' গল্পে লক্ষণীয়। গল্পে তফজল মিয়া একজন সম্পন্ন চাষি। তার দুই ছেলে সগির ও কবির। সগির বিয়ের চার মাস পর বিদেশে যায় বেশি উপার্জনের আশায়। এদিকে স্ত্রী স্বামীর অনুপস্থিতিতে কবিরের সঙ্গে অবৈধ যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়। 'ভাঙন' গল্পে দেখা যায় দয়ালহরি নামক একজন ডোমকে। একদিন দাম্পত্য কলহে দয়াল তার স্ত্রীকে সজোরে চড় মারলে তার মৃত্যু হয়েছে। ফলে দুঃখে যন্ত্রণায় দয়াল একদিন ভৈরব নদের জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। ফলে তাদের একমাত্র সন্তান রামলাল অনাথ হয়ে জমিদারের বাড়িতে প্রথমে বাগানের মালী ও পরে বজরার মাঝি হিসেবে আশ্রয় পায়। 'আহব ইদানীং' গল্পে কালামের মা, বাবা, স্ত্রী, ভাই, বোন সবই ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন তার মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সব কিছু কেড়ে নেয়। যুদ্ধে গিয়ে সে পঙ্গু হয়ে ফিরে আসে। ফলে তার স্ত্রী সালমাকে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। ঘটনাক্রমে কালাম ধীরে ধীরে সংসারে গলগ্রহ হয়ে ওঠে, ভাইরা

সংসার আলাদা করে নেয়। বাধ্য হয়ে কালামকে ভিক্ষার পথ বেছে নিতে হয়েছে। একজন মুক্তিযোদ্ধার এই করুণ পরিণতি সমাজ বাস্তবতাকে তুলে আনে। ‘কোটনা’ গল্পে মুচি রামদুলাল সমাজের অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করে দারিদ্র্যের মধ্যে দিনপাত করে। তাই ছেলের ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করতে একদিন সে প্রতিজ্ঞা করে ছেলেকে মুচিগিরি করতে দেবে না। ফলে সে শত কষ্ট সহ্য করেও ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে। আবার চিঠি গল্পে দেখি এক নামহীন কৃষ্ণকায় কন্যা পিতার প্রতি শেষ চিঠি লিখেছে এই জানিয়ে যে, তার পিতা কন্যা সন্তান জন্মের পর খুশি হয়নি। সে পুত্র সন্তান আশা করেছিল। কন্যা জন্মানোর তিন মাস পর তাই তার মা আবার গর্ভবতী হয় এবং পুত্র সন্তান লাভ করে তার চাষি পিতা। কিন্তু পুত্র সন্তানটি দুর্বল ও বুদ্ধিহীন। ফলে পিতার সব স্নেহ গিয়ে পড়ে মেয়ের ওপর। সে তার মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করায় ও শিক্ষিত হয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচার কথা বলে। গল্পটির মধ্য দিয়ে এক চাষি পিতার মানসিক জটিলতা, প্রেম, ঘৃণা, বাৎসল্য উঠে এসেছে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পের পরবর্তী অংশ রূপে লেখক ‘রতন’ গল্পটির জীবন সংগ্রামকে দেখিয়েছেন। উলাপুর গ্রাম ছেড়ে পোস্টমাস্টার চলে যাওয়ার পর রতন তার এক দুঃসম্পর্কের কাকার বাড়িতে আশ্রয় পায়। সেখান থেকে এক স্ত্রীহারা বৃদ্ধের সঙ্গে রতনের বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েকমাসের মাথায় বৃদ্ধ মারা গেলে তার আগের পক্ষের ছেলেরা সম্পত্তি নিজেদের নামে লিখিয়ে নিয়ে রতনকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। ফলে অসহায় রতন কলকাতায় পোস্টমাস্টারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। পোস্টমাস্টারের বাড়িতে সে কাজের ঝি হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার কিছুদিন পরেই পোস্টমাস্টারের স্ত্রী সন্দেহের বশে অপমান করে রতনকে বিদায় করে। রতন পুনরায় ভাসমান শ্যাওলার মতো ভেসে যায়।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা গেল, নিম্নবর্গীয় সমাজ ন্যূনতম আশ্রয় ও জীবনধারণের জন্য সামান্য সুবিধে থেকে বঞ্চিত। এর পেছনে আছে তাদের অর্থনৈতিক দুর্বলতা ও প্রান্তিকতা। সমাজের জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতার কারণে নিম্নবর্গ তথাকথিত সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। তা ছাড়া প্রশাসনেরও এই বিচ্ছিন্ন অংশের প্রতি কোনো সুদৃষ্টি নেই, তথাকথিত এই প্রান্তিক অঞ্চল ও মানুষগুলির সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে ভাবনা নেই। ফলে নিম্নবর্গ এভাবেই প্রবহমানকাল ধরে অপাংক্তেয় ও অসহায়ভাবে জীবনযাপন করছে।

৩.১.৪ কথাবিশ্বে নিম্নবর্গীয় সমাজ ও সমাজব্যবস্থা

সমাজ একটি বিমূর্ত ধারণা। মানুষের বহুবিধ সম্পর্কের এক বিচিত্র রূপ হল সমাজ। একটি সমাজের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হল, সেই সমাজের মানুষদের আচার-ব্যবহার, আদর্শ ও পেশাগত ঐক্য। নির্দিষ্ট সমাজে বসবাসকারী মানুষের সামগ্রিক কল্যাণই হল সেই সমাজের উদ্দেশ্য। একটি নির্দিষ্ট সমাজের ঐক্য, উদ্দেশ্য ও নৈতিক মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে সেই সমাজের সমাজব্যবস্থা। হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে আমরা মূলত জেলেসমাজ, পতিতাসমাজ ও মেথরসমাজকে উঠে আসতে দেখেছি। অন্যান্যদের কথা উঠে এলেও তাদের বিস্তৃত সমাজের পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং বর্তমান আলোচনার পরিসরে আলোচ্য ত্রিবিধ সমাজের সমাজব্যবস্থার প্রতি আমরা দৃষ্টি দিতে পারি।

৩.১.৪.১ জেলেসমাজ ও সমাজ ব্যবস্থা

জেলেজীবন জলনির্ভর, জলের দাস। গ্রামীণ বাংলাদেশের জেলেরা যে সাধারণত নদী বা সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট পাড়া বা গ্রামে বংশপরম্পরায় বসবাস করে চলেছে তা আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি। মাছধরা বা বিক্রি করা ছাড়াও সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা পূর্ণ জীবনযাপনই জেলেদের চিরায়ত ঐতিহ্যের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু একটু গভীরে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, জেলেসমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তিনটি প্রধান অনুষঙ্গ।

এক. সাগর বা নদীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব জেলেদের জীবনকে প্রভাবিত করেছে।

দুই. জেলেদের ব্যবহৃত বিভিন্ন জালের বর্ণনা, জাল মেরামত, জাল বোনা ও মাছ ধরার রীতি-কৌশল—যা জেলেদের জীবনকে নানাভাবে ঘিরে রেখেছে।

তিন. জেলেদের বিভিন্ন নৌকার ব্যবহার, নৌকা তৈরি, নৌকা মেরামত ও নৌকার বিভিন্ন অংশের বিবরণ—যার মধ্য থেকে সমাজে একজন জেলের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়।

এক.

যে সম্প্রদায় নদী-সমুদ্র তথা জলের ওপর নির্ভর করে জীবন অতিবাহিত করে, তাদের জীবন সহজ, সরল ও সুরক্ষিত হতে পারে না। একজন জেলের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনে কী পরিমাণ সংগ্রাম থাকতে পারে তা হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে আমরা লক্ষ করেছি। একজন জেলেকে তার ব্যক্তিস্বার্থ ও

পরিবারের স্বার্থে দিন-রাত নদী-সমুদ্রের সঙ্গে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সংগ্রাম করে যেতে হয়। এভাবেই বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিক জেলেজীবন সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রবহমান। কথাবিশ্বে বর্ণিত জেলেজীবনের দুটো রূপ—একটি বাহ্যিক, একটি আভ্যন্তরীণ। জেলেদের জীর্ণ, অর্ধভঙ্গ ঘরবাড়ি, কালো মাটির কাদা থিকথিকে উঠোন, উঠোনের একপাশে গাবঘর, গাবঘরে বিভিন্ন রকম জাল ও মাছ ধরার সরঞ্জাম। আবার কোনো কোনো বাড়ির পিছনে এক-দুটো ডোবা, ছাইয়ের গাদা ও বাড়ির আশেপাশে দু-চারটে আম, জাম, নারকেল গাছ। এই নিয়ে জেলেজীবনের বাইরের রূপ। দ্বিতীয়ত, পরিবারের একটু বেশি স্বচ্ছলতার জন্য ও ভবিষ্যৎ ভাবনায় ভীত জেলেরা তাদের সন্তানদের শিক্ষার জগতে প্রবেশ করতে দেয় না। একটু বড়ো হলেই বাবা দাদাদের সঙ্গে সমুদ্র যাত্রা করে। তারপর রীতিমত শুরু হয় একজন জেলেসন্তানের সমুদ্র সংগ্রাম, মাছ ধরা, জাল ফেলা এবং পরিবার গঠন। এই হল জেলেজীবনের ভেতরের রূপ। 'প্রতিশোধ' গল্পে হরিশংকর জলদাস জেলেজীবনের আভ্যন্তরীণ রূপের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। জেলে সন্তানেরা বাবা দাদাদের সঙ্গে নদী সমুদ্রে যাতায়াত করতে করতে একসময় অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে।

> 'একদিন হাতে দাঁড় তুলে নেয়। কৈশোর ছাড়িয়ে তারুণ্যের প্রথম সোপানে পা রাখলেই বিয়ের আয়োজনে লেগে যায় মা-বাবারা। ... কনে সবে তের বা চৌদ্দ পেরিয়েছে। উশকোখুশকো চুলের উন্মাদিনী বা রসবালাকে বউ করে ঘরে তোলে। রসবালাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তরুণ বর। ... একদিন গর্ভবতী হয়ে পড়ে রসবালারা। যথাসময়ে বা অসময়ে বাচ্চা প্রসব করে, বছর ঘুরতেই আবার গর্ভধারণ। এইভাবে জলদাসদের ঘরে ঘরে সন্তানরা আসে, ঘর ভর্তি হয়, অভাব বাড়ে। খাবারের জন্যে প্রতিঘরে প্রতিনিয়ত আহাজারি, তারপরও বংশ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি যথা নিয়মে চলতে থাকে'। (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৮০)

জেলেজীবনের এই অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ রূপ ছাড়াও তাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি রূপরেখার সন্ধান আমরা পেয়েছি। বাৎসরিক ঋতুচক্রের প্রভাবে জেলেজীবন কীভাবে প্রভাবিত হয়েছে তার সামগ্রিক চিত্র ধরা পড়েছে 'জলপুত্র' উপন্যাসে। বৈশাখ মাস থেকে চৈত্র মাসের বারোমাস্যার জেলেজীবন চিত্রে দেখা যায়-

> 'ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ মাস জেলেদের কাছে বড়ো আকাল। সমুদ্রে মাছ নেই। দখিনা ঝড়ো বাতাসে সমুদ্র মারমুখি। অধিকাংশ বহদ্দার এই সময় মাছমারা বন্ধ করে দেয়। সঞ্চিত টাকা দিয়ে সংসার চালায়'। (জলদাস ২০০৮,পৃ. ৩১)

কিন্তু সাধারণ জেলেদের সঞ্চিত অর্থ থাকে না। এই দুঃসময়েও বাঁচার তাগিদে তারা সমুদ্রে নৌকা ভাসায়। আশানুরূপ মাছ না পেয়ে জলপুত্রদের সংসারে অভাব ঢোকে। সবচেয়ে করুণ ও অভাবী সময় যায় বিয়ারিদের, যারা বহদ্দারদের কাছ থেকে মাছ কিনে বিক্রি করে। কারণ বহদ্দাররা এ সময়ে মাছমারা বন্ধ রাখে। পুরুষ বিয়ারিরা কোনোরকমে এদিক ওদিক করে সংসার চালালেও নারী বিয়ারিদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। মারাত্মক অভাবে তারা কিছু সময় শাকপাতা দিয়ে দু মুঠো অন্ন জোগায়, বেশিরভাগ সময়

উপোস থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের অসহ্য খরতাপে জেলেরা আষাঢ় মাসে মাছধরার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে জেলেরা সমস্ত সরঞ্জাম সংগ্রহ করে সমুদ্রে বিহিন্দিজাল ও টাংজাল বসায়। এইসময় অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল জেলেরা দাদনদারদের কাছ থেকে মাসিক দশটাকা সুদে বা মাছের বিনিময়ে ঋণ নেয়। অর্থাৎ ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এই চারমাস জেলেদের জীবনে এক অন্ধকার সহায়-সম্বলহীন দুঃসময়। 'দহনকাল' ও 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে বছরের এই চারমাসকে জেলেরা সুদিন মাস বলেছে। 'দহনকাল' এ দেখি,

> '...ফাগুন-চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে সমুদ্রে জল কমে, জলের সঙ্গে সঙ্গে মাছও কমে। ওই সময়কে জেলেরা বলে সুদিন-মাস। সুদিনমাসে নিকট-সমুদ্রে মাছ ধরা পড়ে কম, সাধারণ জেলেদের দুর্গতি বাড়ে তখন'। (জলদাস ২০১০,পৃ. ১১৫)

আবার 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসেও বলা হয়,

> 'ফাগুন-চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ—এই চার মাসকে জেলেরা সুদিন বলে। আকাশে গনগনে সূর্য তখন। খরতাপে চারিদিকে ঝাঁ ঝাঁ। প্রত্যেক জেলেবাড়ির উঠানে তখন চুলা বসে—মাটির। গরমের তাড়নায় তখন রান্নাঘরে টেকা মুশকিল। ... ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা এখানে ওখানে ঝাঁট দিয়ে গাছের শুকনো পাতা সংগ্রহ করে। একটু মাথা তোলারা ধানখেত থেকে নাড়া সংগ্রহ করে'। (জলদাস ২০১৯, পৃ. ১৯০)

ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ এই চারমাস জেলেদের জীবনে যতটা নিস্ফলা ও দুঃসময় বয়ে আনে, আষাঢ় থেকে আশ্বিন এই চারমাস ততটাই জেলেজীবনে সুফলা ও সুসময়। 'জলপুত্র' এ দেখি,

> 'শ্রাবণ মাস জেলেদের জীবনে বড়ো সুখের মাস, স্বস্তির মাস। এই মাসে মা-গঙ্গা তাদেরকে উজার করে মাছ দেয়। ... দুর্দিনের দারিদ্র্যের যন্ত্রণা তারা শ্রাবণমাসে ভোলে। আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন—এই চারমাসে তাদের হাঁড়িতে ভাত থাকে, পরনে নতুন কাপড় থাক, মুখে হাসি থাকে। বাকি আটমাস খেয়ে না-খেয়ে তাদের দিন কাটে। তাদের ব্যাঙের সংসার। ঘরে অনেক হা-করা মুখ। অনেক মুখের খাবার জোগাড় করতে পারে না গৃহকর্তারা। অভাব-অসুখের খরতাপে দগ্ধ হতে হতে তারা যখন শ্রাবণে এসে পৌঁছায়, তখন পরম শান্তি'। (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৮-৯)

জেলেরা এই সময়ের জন্যই সারাবছর অপেক্ষা করে থাকে। কারণ এই সময় তাদের পাতা জালে প্রচুর ইলিশ ধরা পড়ে। এই ইলিশ জেলেজীবনে প্রাচুর্য আনে। বহদ্দার থেকে বিয়ারি সকলেই সুখের মুখ দেখে। বর্ষাকাল শেষ হলে জেলেদের পুনরায় দুর্দিনের সুত্রপাত হয়। হরিশংকর জলদাস তাঁর 'জলগদ্য' গ্রন্থে জানিয়েছেন,

> 'বর্ষা শেষে জেলেপাড়ায় নেমে আসে অভাবের জান্তব থাবা। পরবর্তী আটটি মাস দারিদ্র্যে পিষ্ট হতে থাকে তারা। দারিদ্র্যময় জীবন কাটাতে কাটাতে অপেক্ষা করে পরবর্তী বর্ষাকালের জন্যে।' (জলদাস ২০১৭(ক), পৃ. ৯২)

আবার 'আমার কর্ণফুলী' গ্রন্থে লেখক জেলেজীবনে শীত ঋতুর প্রভাব সম্পর্কে জানান,

'শীতের সময় মাছ মারতে যাবার আলাদা একটা আনন্দ আছে। আষাঢ় থেকে কার্তিক পর্যন্ত বঙ্গোপসাগর যেন মাছমারাদের প্রবল প্রতিপক্ষ। কোনোক্রমেই সেই সময়ে সমুদ্রকে বাগে আনা যায় না। শুধু ভাঙে—পালের মাস্তুল, নৌকার আগা, হালের দাঁড়। শুধু কেড়ে নেয়—জাল, নৌকা, জীবন।' (জলদাস ২০১৬(খ), পৃ. ২৩)

'মাছমারাদের প্রবল প্রতিপক্ষ' বঙ্গোপসাগরের আবহাওয়ায় জেলেদের জীবন প্রচণ্ড ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে জেলে জীবন যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে—তার পরিচয় আমরা পেয়েছি 'জলপুত্র', 'দহনকাল', 'অর্ক', 'দুখিনি', 'দইজ্জ্যা বুইজ্জ্যা', 'জামাইখেকো' প্রভৃতি গল্প-উপন্যাসে। 'জলপুত্র' উপন্যাসে উত্তরপতেঙ্গার জেলেপল্লির অনেক নারী বিধবা।

'তাদের স্বামীরা সমুদ্রে মরেছ। কেউ ঝড়ের কবলে পড়ে, কেউ জালের সঙ্গে আটকে অতল পানির নিচে গিয়ে। সাপের কামড়ে কারও কারও জীবনলীলা সাঙ্গ হয়েছে। দু'চারটে সন্তান নিয়ে এইসব বিধবার জীবন কাটে'।

(জলদাস ২০০৮ পৃ. ১৬)

উপন্যাসে ভুবেনেশ্বরী চরিত্রটি সেই রকম একজন বিধবা নারী। তার স্বামী চন্দ্রমণি সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছে। আবার 'দহনকাল' উপন্যাসে দেখা যায় চন্দ্রকলা দাসীর স্বামী রামকানাই জালে আটকে জলের তলায়। শিবশরণের বড়ো নৌকাটি আচমকা সামুদ্রিক ঝড়ে ডুবে গিয়েছে। বারোজন গাউর ও মাঝির মধ্যে মাত্র দু'জন বেঁচে ফিরে এসেছে।

'তাঁর কাছে সংবাদ এসেছে—গত সপ্তাহে কালিধরে তাঁর একটি নৌকা ডুবেছে। মাঝি সহ বারোজন গাউর ছিল ওই নৌকায়। দু'জন ফিরে এসেছে, বাকি দশজনের খবর নেই'। (জলদাস ২০১০, পৃ. ২৯)

আবার 'দইজ্জ্যা বুইজ্জ্যা' গল্পে হরগোবিন্দর পরিবারে নেমে আসে ভরাডুবির বিপর্যয়। জানা যায়-

'তীব্র প্রতিকূল ঝড়-জলকে উপেক্ষা করে হরগোবিন্দ ছেলে দুটোকে নিয়ে পাতানো বিহিন্দিজাল থেকে মাছ আনতে পাড়ি জমিয়েছিল উথালমাতাল সমুদ্রে। মাতাল ঢেউ তার নৌকা ডোবালো। ছেলে দুটো মরল, কিন্তু হরগোবিন্দ বেঁচে গেল'। (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২৪)

'দুখিনি' গল্পে রসবালার ছেলে মনমোহন কালাবাঁশির সঙ্গে ভাগাভাগি করে সমুদ্রে নৌকা ভাসায়। হঠাৎ এক পণ্যবাহী জাহাজ তাদের নৌকার ওপর উঠে আসলে নৌকাডুবি হয়। প্রাণ যায় মনমোহন ও কালাবাঁশির। 'জামাইখেকো' গল্পে জানা যায়,

'ক্ষুদিরাম দুদিন আগে মারা গেছে। সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েই মারা গেছে ক্ষুদিরাম'। (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৩৭৮)

সুতরাং জেলে সমাজজীবনের সামগ্রিক আলোচনা শেষে দেখা গেল, অস্তিত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করা ছাড়া জেলেজীবনে দ্বিতীয় কোনো বৈচিত্র্য নেই। সমুদ্র-নদী তীরবর্তী প্রান্তিক এই জনগোষ্ঠীর সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদেরকে টিকিয়ে রেখেছে। সহজ-সরল জেলে সম্প্রদায় প্রতিনিয়ত সমুদ্র-নদীর সঙ্গে

লড়াই করতে করতে ক্ষেত্রবিশেষে কখনো কঠিন হয়ে উঠেছে, আবার কখনো ভাগ্যের পরিহাসে ভীতও হয়ে পড়েছে। নিত্য অভাব জেলে পরিবারগুলিকে একই সঙ্গে পরিশ্রমী ও কর্মঠ করেছে।

দুই.

নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে উদয়াস্ত জলের সঙ্গে সংগ্রাম চালাতে হয় জেলেদের। সমুদ্র বা নদী থেকে মৎস্য আহরণ করা যেন প্রায় যুদ্ধের সামিল। আর এই যুদ্ধে তাদের অস্ত্র- নৌকা ও জাল। জীবন হাতের মুঠোয় নিয়ে জেলেরা প্রতিনিয়ত এই যুদ্ধ করে যায় পরিবার ও সমাজকে বাচাঁতে। আমরা লক্ষ করি, হরিশংকর জলদাসের জেলেজীবনকেন্দ্রিক আখ্যানগুলিতে মাছ ধরা, জালপাতা, নৌকা চালনার বিষয়গুলি সমাজের সঙ্গে অপরিহার্য উপাদান রূপে জড়িয়ে আছে। তবে কেবল হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যেই নয়, এর পূর্বেও যে সমস্ত জেলেসমাজ কেন্দ্রিক উপন্যাস রচিত হয়েছে, সেখানেও আমরা জেলেদের মৎস্যশিকার-নৌকা-জালকে সেই সমাজের প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে উঠে আসতে দেখেছি। জেলেদের মাছধরার পদ্ধতি, নিয়ম ও অন্যান্য অনুষঙ্গ উঠে এসেছে ‘পদ্মানদীর মাঝি’, ‘তিতাস একটি নদীর নাম’, ‘গঙ্গা’ প্রভৃতি উপন্যাসে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে বিভিন্ন জালের নামের উল্লেখ ও জাল ফেলার পদ্ধতি দেখা যায়। যেমন চুনোজল, কুঁড়োজাল, পাটাজাল, ঠেলাজাল, বিহিন্দিজাল, বেড়াজাল, ভৈরবজাল, বড়োশি ইত্যাদি। আলোচ্য উপন্যাসে জাল সম্পর্কিত বর্ণনায় দেখা যায়, পীতম মাঝির গোয়ালের একদিকে দুটো গোরু থাকে আর-

> ‘...অন্যদিকে থাকে পীতমের প্রসিদ্ধ বেড়া-জাল, এতবড়ো জাল কেতুপুরে আর কাহারো নাই’।
>
> (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৬, পৃ. ৩১)

অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসেও দেখা গিয়েছে মালোদের বিভিন্ন জাল ব্যবহারের বর্ণনা। ঠেলাজাল, ভৈরবজাল, ছান্দিজাল ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, খরার দিনে নদী যখন শুকিয়ে যায় তখন মালোদের মাছ ধরার পদ্ধতি,

> ‘তিন কোণা ঠেলা-জাল কাঁধে ফেলিয়া আর- এক কাঁধে গলাচিপা ডোলা বাঁধিয়া এপাড়া সে- পাড়ায় টইটই করিয়া ঘুরিতে থাকে, ...’ (খান ২০১৪, পৃ. ২৫২)

আবার সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’ উপন্যাসে জেলেদের ব্যবহৃত জালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল টানাছাঁদি, খুঁটেজাল, পাটাজাল, বিনজাল, সাংলো ইত্যাদি। উপন্যাসে পাঁচু ও বিলাসের মাছশিকারের বর্ণনায় দেখি,

> ‘টানাছাঁদি এক রকম তৈরি করেই বেরিয়েছিল পাঁচু। বিলাস চাপন বাঁধলে জালে।... চল্লিশ হাত টানাছাঁদি। পুবে পশিমে লম্বা করে দিয়ে, জাল ছেড়ে দিল জলে।’ (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৮, পৃ. ২৪১)

হরিশংকর জলদাসের জেলেজীবন কেন্দ্রিক গল্প-উপন্যাসেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। জেলে জীবনের প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে জেলে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকারের জাল, জাল সম্পর্কিত সরঞ্জাম, মাছ শিকার, মাছ বিক্রয়জাত করার পদ্ধতি, এমনকি সমুদ্রে বা নদীতে জাল ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার মেরামত ও জাল বোনার ঘটনার বর্ণনাও উঠে এসেছে। জেলেদের বিভিন্ন ধরনের জালের মধ্যে বিহিন্দিজাল ও টংজালকে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধরা হয়। এছাড়াও জেলেদের ব্যবহৃত অন্যান্য জালগুলি হল—পাতনিজাল, বেড়াজাল, হুরিজাল, টাউঙ্গাজাল, পেরিনজাল, ঝাঁকিজাল, কাঠিজাল, খরাজাল, লাক্ষাজাল, পইজ্যাজাল প্রভৃতি। জাল ছাড়াও অনেক জেলেকেই বড়োশি দিয়ে মাছ ধরতে দেখা গিয়েছে। লক্ষণীয়, ‘পদ্মানদীর মাঝি’, ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ বা ‘গঙ্গা’ উপন্যাসে আমরা যে জালের উল্লেখ পেয়েছি, তা মূলত নদীতে মাছ ধরার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে হরিশংকরের গল্প-উপন্যাসে জেলেদের ব্যবহৃত বিভিন্ন জালের (বিহিন্দিজাল ব্যতীত) সঙ্গে নদীতে মাছ ধরা জালের মিল নেই। কারণ হরিশংকরের গল্প-উপন্যাসে বর্ণিত জেলেরা মূলত সমুদ্র নির্ভর। ফলে নদীতে মাছ ধরা ও সমুদ্রে মাছ ধরার কৌশল এবং সরঞ্জামের পার্থক্য দেখা গিয়েছে।

‘জলপুত্র’ উপন্যাসে দেখি জীবিকার প্রয়োজনে জেলেরা জোয়ার-ভাঁটার ওপর নির্ভর করে দিনে দুবার মাছ শিকারে যায়। মাছধরার নানা জাল ও নানা কৌশল। জলের গভীরতার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন জাল ফেলা হয়। যেমন-

১. গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জাল হল—বিহিন্দিজাল ও টংজাল।

২. কম জলের জাল হল—হুরিজাল ও টাউঙ্গাজাল।

৩. সমুদ্র বা নদীর কিনারে অল্পজলের জাল হল—কাঠিজাল।

জানা যায়, বিহিন্দিজাল ও টংজাল দিয়ে মাছ ধরার জন্য জেলেদের অধিক ব্যয় ও লোকবলের প্রয়োজন হয়। লোকবলের অভাব না থাকলেও জেলেদের অর্থবল নেই। অধিকাংশ জেলে অত্যন্ত গরিব বলে সব জেলে বিহিন্দিজাল ও টংজাল দিয়ে মাছ ধরতে পারে না। বিশেষত বহদ্দার শ্রেণি এই জালগুলো দিয়ে মাছ ধরে। উপন্যাসে বিহিন্দিজাল পোঁতা ও সেই জাল দিয়ে মাছধরার কৌশলের বর্ণনায় পাই-

> ‘জাল বসানোর কায়দাও আছে। দুটো গাছের খুঁটি, যাকে ওরা গোঁজ বলে, গভীর পানির নিজে বিঁও দিয়ে ভালো করে পুঁতে দেয়। সে খুঁটিতে বাঁধা থাকে লোহার মোটা তার। তারের অপর মাথায় দুটো লম্বা ভাইজ্যাবাঁশ বেঁধে দেওয়া হয়। দুই বাঁশের আগায় বেঁধে দেওয়া হয় বিহিন্দিজালের দুই পাখা। জালের মুখে থাকে ফং—ছ-সাত হাত দীর্ঘ মোটা বাঁশের অংশ। জোয়ার বা ভাটার টানে জাল জলের তলায় নেমে যায়। জালের হা-করা মুখে মাছ ঢোকে। ... পানির টান কমে এলে জাল জলের ওপরে ভেসে ওঠে। জেলেরা জালের ছঅরি থেকে মাছ নৌকায় তুলে নেয়’। (জলদাস ২০০৮, পৃ.১৫)

সমুদ্রকূল থেকে মাইল দুয়েক দূরে জেলেরা জাল বসায়। সারি সারি বিহিন্দিজাল বসানো হয় পূর্ব থেকে পশ্চিমে। জেলেরা জাল পাতানোর এই সারিকে পাতা বা বেতা বলে। জালের সংখ্যা বেশি বলে এক পাতায় বা বেতায় উত্তর পতেঙ্গার সব জেলেরা জাল বসাতে পারে না। ফলে জেলেরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে জোয়ার ভাঁটা অনুযায়ী এক পাতা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে অন্য পাতার স্থান নির্ধারণ করে। শুধু তাই নয়, জালপাতা বা মাছ ধরার বিভিন্ন সরঞ্জাম দিয়ে মাছ ধরার প্রস্তুতির বর্ণনা আলোচ্য উপন্যাসে পাওয়া যায়। মাছ ধরার সময় এলে জেলেপাড়ার বাড়িতে বাড়িতে সরঞ্জাম সংগ্রহের কাজ শুরু হয়ে যায়। দেখা যায়- দু-তিনজন মিলে ভাইজ্যা বাঁশ, গাছের গোঁজ কিনে আনে। তারপর সে বাঁশ ও গাছের ফাঁদা করা হয়। ওই ফাঁদায় লোহার মোটা তার আটকে গোঁজের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। কোনো কোনো বাড়িতে জেলেরা জাল বুনতে ব্যস্ত থাকে। উপন্যাসে এর বর্ণনায় পাই-

> 'পূর্ণ বহদ্দারের তিন ছেলে। তার জাল বোনা, ছেঁড়া জাল তুনা, গোঁজ-বাঁশ-লোহার মোটা তার, ফং, দাঁড়, দড়িদড়া সংগ্রহ শেষ।...একরাত জালগুলো গাবের পানিতে চুবিয়ে রাখা হবে। ..গাবের পানিতে চুবানো জাল টেকসই হয় বলে একজন জেলে মাছ ধরতে যাওয়ার আগে তার জালগুলোকে গাবের পানিতে এভাবে চুবিয়ে রাখে'।
>
> (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৪৪)

মাছ ধরার বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতির পাশাপাশি ঋতু বা সময়কাল অনুযায়ী জেলেরা জাল পাতে। কারণ জলের গভীরতা ও মরশুমের ওপর নির্ভর করে মাছ আহরণ। ফলে দেখা যায়-

> 'আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র—এই তিনমাস জলপুত্ররা সমুদ্রে দুই ধরনের জাল পাতে। বিহিন্দিজাল আর টংজাল। ডালায় অর্থাৎ পঞ্চমী থেকে দশমী তিথি পর্যন্ত সমুদ্রে তারা বিহিন্দিজাল বসায়। ... এই সময়টাকে জেলেরা বলে জো। জো'তে বিহিন্দিজাল বসানো যায় না। ..জেলেরা এইসময় চিকন নাইলন সুতার হালকা ছোটো আকারের টংজাল বসায়। ..প্রচুর ইলিশ টংজালে ধরা পড়ে তখন।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৬৬)

'দহনকাল' উপন্যাসে জাল দিয়ে মাছ ধরার বর্ণনাতে পাই,

> 'সকালের মাছ তুলে সমুদ্রে পাতানো জালটি গুটিয়ে ফেলা হলো। ... ষাট হাতের এই জালটি নাইলন সুতার। বড়ো বড়ো ফাঁক। এই ফাঁককে জেলেরা বলে পাআ। কালিদইজ্যার জালে কোনো ছঅরি নেই। জালের দুই প্রান্ত দু'দিকের মোটা ভাইজ্যা বাঁশে বাঁধা থাকে। জোয়ার-ভাটার স্রোতের টানে জাল ডুবে যায়। স্রোতের তোড়ে মাছ গেঁথে যায় জালের ফাঁকে।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৫০)

দেখা যায় মাছ ধরার সময় ও তিথি নির্ধারিত রয়েছে জেলেদের। ভরা কোটাল ও মরা কোটাল অনুযায়ী সমুদ্রে জেলেরা জাল পাতে। মরা কোটালকে জেলেরা ডালা বলে অর্থাৎ পঞ্চমী থেকে একাদশী পর্যন্ত সময়কাল জেলেদের কাছে ডালা। ডালায় সব নৌকায় মাছ ধরা বন্ধ থাকে। সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া প্রত্যেকটি নৌকায় দু-তিনটি জাল থাকে। একটি জাল ছিঁড়ে গেলে আরেকটি পাতা হয়। ডালার সময়

সমস্ত ছেঁড়া জালগুলিকে মেরামত করা হয়। উপন্যাসে দেখা যায় গত 'জো' তে দয়ালহরির একটি জাল ফেঁসে গিয়েছে। মথুরা মাঝির আদেশে সেই জাল তুলে এনে অন্য জাল বসানো হয়েছে এবং ছেঁড়া জালটিকে নতুন করে মেরামত করা হচ্ছে। কৃষ্ণমিলন সুতা-ছুড়ি, পা-ই, তইলা এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করছে। 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসেও জেলেদের মাছধরার রীতিনীতির বর্ণনা পাই-

> 'সমুদ্রে এখন মরাকাটাল। মরাকাটালকে জেলেরা বলে ডালা।... ডালাতে জেলেরা সমুদ্র থেকে বিহিন্দিজাল-টংজাল তুলে আনে। ছেঁড়াফাটা জাল তুনা হয়। রোদে শুকানো হয়। গাবের জলে রাতভর চুবানো হয়। মৃতপ্রায় জাল, তাজা হয়ে ওঠে তখন'। (জলদাস ২০১৯, পৃ. ২০১)

মাছ ধরার ক্ষেত্রে বহদ্দার, পাউন্যা নাইয়া ও গাউরদের মধ্যে কিছু শর্ত বা নিয়ম আছে। সব জেলে নিজের ইচ্ছা মতো জাল বসাতে বা মাছ ধরতে পারে না। 'দহনকাল' উপন্যাসে জানা যায়-

> 'জেলেসমাজের অলিখিত অথচ অলঙ্ঘনীয় নিয়ম হলো—বহদ্দারের একটি জালের মাছ তোলার পর পাউন্যা নাইয়্যার জাল থেকেই মাছ তুলতে হবে। তার পরে বহদ্দারের অন্য দুটো বিহিন্দিজালের মাছ তোলা হবে। এটাও নিয়ম যে, বহদ্দার বসাবে তিনটি ও পাউন্যা নাইয়্যা বসাবে একটি বিহিন্দিজাল'। (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৮)

কিন্তু উপন্যাসে কখনো কখনো বহদ্দাররা এই নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। যেমন রমণীমোহন বহদ্দারের নৌকায় রাধানাথ পাউন্যা নাইয়া হিসেবে জাল ফেলার অনুমতি পেলেও নিয়ম না মেনে রমণীমোহন প্রথমে নিজের তিনটি জাল দিয়ে মাছ তুলে নিয়েছে। আবার অন্নচরণ বহদ্দারও জালে বেশি মাছ ধরা পড়ায় নিজের জাল দিয়েই মাছ ধরেছে। সমাজে জাল-নৌকার মালিকানার ওপর জেলেদের মধ্যে শ্রেণি বিভাজন রয়েছে। যেমন যে সব জেলেদের একাধিক বিহিন্দিজাল, অন্যান্য জালসহ নিজের নৌকা রয়েছে তারা বহদ্দার শ্রেণি। যে সব জেলেদের কেবল বিহিন্দিজাল রয়েছে কিন্তু নিজের নৌকা নেই, তারা অন্যের নৌকায় সহযোগিতার বদলে জাল বসানোর অনুমতি পায়, তারা পাউন্যা নাইয়া এবং যাদের কেবল টাউঙ্গাজাল, কাঠিজাল, বেড়াজাল সম্বল তারা সাধারণ জেলে। জেলেসমাজের এই স্তর বিভাজন বিষয়ে আমরা অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত পরিচ্ছেদে বিশদে আলোচনা করব।

জেলেদের জাল ব্যবহার সম্পর্কিত আলোচনায় ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি বিহিন্দিজাল জেলেদের কাছে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশেষ জালটির ওপর নির্ভর করে জেলেদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও সামাজিক মর্যাদা। 'দহনকাল' উপন্যাসে দেখি রাধানাথ প্রথমেই বিহিন্দিজালের মালিক হতে পারেনি। তরুণ বয়সে সে প্রথমে টাউঙ্গাজাল, হুরিজাল, কাঠিজাল দিয়ে সমুদ্রের কূলে কূলে মাছ ধরেছে। তারপর দীর্ঘদিন বহদ্দারের নৌকায় গাউর খাটার পর কিছু টাকা জমিয়ে কুমিরার গোপাল বহদ্দারের কাছ থেকে পুরনো একটি বিহিন্দিজাল কিনে পাউন্যানাইয়া হতে পেরেছে। রাধানাথের শ্বশুর হরবাঁশির ক্ষেত্রে দেখি সে

কর্ণফুলীতে পাতনি জাল বসিয়ে কোনো রকমে ভরণপোষণ করে। 'কসবি' উপন্যাসে দেখা যায়, শৈলেশের-

'বাপ মরে যাবার সময় দুটো পাতনি জাল, দুটো খরা জাল, একটি নৌকা আর গাছগাছালিতে ভরা এই বাড়িটি রেখে গিয়েছিল'। (জলদাস ২০১১, পৃ.২৪)

একই ভাবে 'দুখিনি' গল্পে মনমোহন ও কালাবাঁশির মাছধরা প্রসঙ্গে জানা যায় তারা বিহিন্দিজাল দিয়ে মাছ ধরছিল।

'জোয়ারের আগ-মুহূর্তে জলের তলা থেকে বিহিন্দিজালগুলো ভেসে উঠল। জালের ছঅরি থেকে মাছগুলো তুলে নিয়ে একটি জালের সঙ্গে ঘাইয়ের দড়ি বেঁধেছিল তারা। অনেক লম্বা একটি রশির এক প্রান্ত জালে আর অন্যপ্রান্ত নৌকার সঙ্গে বেঁধে গোটা রাত কাটাতে হবে এখানে। একে ছেলেরা ঘাই বলে'। (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ.৩৮)

মনমোহনের বাবা কিষ্টপদ পরে বহদ্দার হয়েছে। তার একটি নৌকা ও চার-পাঁচটি বিহিন্দিজাল। অন্যদিকে 'ঢেন্ডেরি' গল্পে দেখি রাইগোপালের বাবা যদুমোহনের ছিল একটি বড়ো নৌকা, তিনটি বিহিন্দিজাল ও পাঁচটি টাংজাল। 'চরণদাসী' গল্পে মঙ্গলাচরণ বহদ্দারের একটি নৌকা ও সাত-আটটি বিহিন্দিজাল রয়েছে। অন্যদিকে 'প্রতিশোধ' গল্পে সোমেশ্বরকে উঠানে বসে বিহিন্দিজাল বুনতে দেখা গিয়েছে। 'দইজ্যা বুইজ্যা' গল্পে হরগোবিন্দের একটি নৌকা ও একটি বিহিন্দিজাল ছিল। 'সুবল জেঠা' গল্পে দেখি সুবলের নৌকা-জাল ছিল না। থাকার মধ্যে একটি টাউঙ্গাজাল সম্বল ছিল তার। আবার 'জামাইখেকো' গল্পে ক্ষুদিরামকে আমগাছের নিচে বসে বিহিন্দিজাল বুনতে দেখা যায়। গল্পে মহেশখালি জেলেপাড়া সম্পর্কে আরো জানা যায় যে পাড়ার বেশিরভাগ জেলেদের,

'উঠানের একপাশে গাবঘর, গাবঘরে দুচারটা টাউঙ্গাজাল, বিহিন্দিজাল...' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৩৮০)

সাহিত্যে জেলেদের জীবন সম্পর্কিত এধরনের পুঙ্খানুপুঙ্খ জালচিত্র ও চালচিত্র তুলে আনা একজন জলপুত্রের পক্ষেই সম্ভব। জেলেজীবনের গভীরতার যে ছবি কথাসাহিত্যে বর্ণিত হয়েছে তা জেলেসন্তান হিসেবে লেখকের বাস্তব জীবনবোধেরই পরিচায়ক। জেলেদের বিভিন্ন রকম জাল ব্যবহার, তার মেরামত, মাছ ধরার কলা-কৌশল এবং জেলেদের মুখে জাল-জল সম্পর্কিত যে সমস্ত শব্দ অর্থাৎ গোঁজ, পাতা বা বেতা, ঘাই, ছঅরি, ফাঁদা, পা-ই, তইলা, পাআ প্রভৃতির ব্যবহার সাহিত্যের বর্ণনাকে শুধু বাস্তবমুখী করেনি, প্রাণবন্তও করেছে। 'দহনকাল' উপন্যাসে মাছধরা ও ঝাড়াই-বাছাই করে রোদে শুকিয়ে শুঁটকিতে রূপান্তর করার যে দৃশ্য রয়েছে তা জেলেজীবনের অভিজ্ঞতা ছাড়া বর্ণনা করা সম্ভব নয়। দেখা যায়-

‘নৌকার আগায়-পাছায়, কাঁড়ায় কাঁড়ায়, ছইয়ের ওপরে—যেখানে যেখানে খালি জায়গা আছে, সেখানে সেখানে বাঁশ পুঁতে পুঁতে মাচা তৈরি করা হয়েছে। সেসব মাচায় বড়ো ছোটো মাছ শুকাচ্ছে। জোয়ারে-ভাটায় যে মাছ ধরা পড়ে, তা চিড়ে-ফেড়ে নাড়িভুঁড়ি ফেলে দিয়ে লবণজলে ধুয়ে শুকানো হয়।...

মাছ শুকাতে আট দশ দিন লাগে। শুকানো মাছ চটের বস্তায় ভরে নৌকার খোলে স্তূপ করে রাখা হয়।

...মাচার আধা-শুকানো মাছগুলো নেড়েচেড়ে দিতে হয়। শুকানো মাছ নামিয়ে সদ্যকাটা কাঁচা মাছ শুকোতে দিতে হয়। মাছ ধরার চেয়ে মাছ শুকানোর কাজে পরিশ্রম বেশি’। (জলদাস ২০১০, পৃ. ৪৮)

মাছ শুকানোর মতো পরিশ্রমের কাজগুলো করে নৌকায় থাকা গাউররা। যারা বহদ্দারের নৌকায় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কামলা খাটে। দয়ালহরি বহদ্দারের নৌকায় দেখা যায় রূপণ, কৃষ্ণমিলন ও যদুনাথ গাউররা মিলে মাছ কাটা ও শুকানোর কাজ করে। একজন দা দিয়ে মাছের আঁশ ছাড়ায়। আরেকজন আঁশ ছাড়ানো মাছগুলোর পেট ধারাল ছুড়ি দিয়ে কেটে দেয়। অন্য দুজন নাড়ি ভুঁড়ি বের করে সেখান থেকে ডিম আলাদা করে। পাতিটিনে সেই ডিম ভরে অন্যজন স্তরে স্তরে নুন ছিটিয়ে রাখে।

তিন.

জালের মতোই নৌকাও জেলেজীবনের এক প্রধান অনুষঙ্গ। হরিশংকর জলদাসের গল্প-উপন্যাসে জেলেদের মাছধরার প্রসঙ্গে একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে নৌকার বর্ণনা। শুধু নৌকাই নয়, নৌকার অনুষঙ্গে মাঝির কথাও উঠে আসতে দেখি আমরা। ‘জলপুত্র উপন্যাসে জানা যায়-

‘একটি মাছমারা নৌকায় সাধারণত পাঁচজন জলপুত্র থাকে। চারজন দাঁড় টানে; অন্যজন, যাকে এই চারজন মান্য করে, হাল ধরে। সে হালি। নৌকার গতি ও দিক নিয়ন্ত্রণ করে এই হালি’। (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৩০)

আলোচ্য উপন্যাসে চন্দ্রমণি নৌকা চালনার দক্ষতার কারণে জীবনের প্রথম থেকেই হালির সম্মান পেয়ে এসেছে। হাল ধরার সময় সে একটি হালিশ ব্যবহার করত। জানা যায়, সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়ার দিন মনের ভুলে হালিশটি সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল চন্দ্রমণি।

হরিশংকর জলদাসের গল্প-উপন্যাসে মোট চার ধরনের নৌকার উল্লেখ আমরা পেয়েছি। যেমন- কোঁদা নৌকা, কটি নৌকা, একগাছি নৌকা ও বড়ো নৌকা। ‘জলপুত্র’ উপন্যাসে জানা যায়-

‘দশ-বারো হাতি একটা মোটা গাছের কাণ্ডকে খোদাই করে ছোট্ট নৌকার আকার দেওয়া হয়। একে জেলেরা কোঁদা বলে’। (জলদাস ২০০৮,পৃ. ৪৪)

নৌকার অনুষঙ্গে নৌকা মেরামতের প্রসঙ্গও এসেছে উপন্যাসে। রামনারায়ণ বহদ্দারের নৌকা সারাইয়ের কাজ চলছে সমুদ্র পারে। গোমদন্ডি থেকে নৌকা সারাইয়ের মিস্ত্রি আনা হয়েছে। এই অঞ্চলে প্রায় জেলেদের কাছেই একগাছি নৌকা আছে। নৌকা তৈরির বর্ণনায় দেখা যায়-

'বহু বছরের পুরনো বৃহৎ কোনো চাপালিশ, গাঁউরি গাছের বাইশ-পঁচিশ হাত কাণ্ড থেকে এই একগাছি নৌকাগুলো তৈরি হয়। গাছটাকে খোদানো হয় প্রথমে। পরে বিশেষ পদ্ধতিতে দক্ষ মিস্ত্রিরা সেই খোদানো গাছটির তলায় মৃদু তাপে আগুন জ্বেলে নানা অংশে কোলতার ঢেলে ধীরে অতি ধীরে ধীরে বাঁকাতে থাকে। বেশ কদিনের চেষ্টায় বাইশ-পঁচিশ হাতের সেই খোদানো কাণ্ডটি নৌকার আকার নেয়। সেই একগাছি নৌকার দুই পাড়ে দেড়হাতি প্রস্থের তক্তা যুক্ত করে নৌকাটিকে পূর্ণতা দেয় মিস্ত্রিরা। এই নৌকাই জলপুত্রদের জীবনতরী। অন্ন সংস্থানের এবং মরণ-বাঁচনের'।

(জলদাস ২০০৮, পৃ.৪৫)

রামনারায়ণের নৌকা মেরামতের স্থানের পাশেই গোলকবিহারীর একটি নতুন একগাছি নৌকা ছ্যাঁকা হচ্ছে সমুদ্রে নামানোর জন্য। দেখা যায়- বালির চরে আরো অন্যান্য জেলেদের নৌকাগুলি পূর্বমুখী করে সারিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। নৌকাগুলোর গায়ে ঘন কালো আলকাতরা মাখানো। আষাঢ় শ্রাবণের বৃষ্টি ও ঝড় ঝাপটা উপেক্ষা করে জেলেরা নৌকা করে মাছ শিকারে যায়। 'দহনকাল' উপন্যাসে দেখা যায় নৌকা মেরামতের দৃশ্য-

'নৌকা ছেঁকবার সময় মূলনৌকার স্থানে স্থানে ছিদ্র করা হয়। ওই ছিদ্র দিয়ে তার ঢুকিয়ে টেনে-দাবিয়ে নৌকাকে প্রসারিত করা হয়। নৌকা ছেঁকা হয়ে গেলে কাঠের টুকরা দিয়ে ওই ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। এগুলোকে জেলেরা বলে পে-না। পে-নার চারপাশ পুলটিনে চুবানো পাঁটের আঁশ দিয়ে দিয়ে ভালো মতো বন্ধ করা হয়। তার উপর ঘন করে লাগানো হয় কোলতার'। (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৩৩)

উত্তর পতেঙ্গা জেলেপল্লিতে আট-দশজন বহদ্দার রয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই একটি বা দুটি করে নিজস্ব নৌকা আছে। বহদ্দারদের নৌকাগুলিই অন্যান্য জেলেদের কর্মসংস্থান ও উপার্জনের পথ। কারণ এই নৌকাগুলিতেই কেউ পাউন্যা নাইয়া বা গাউর হিসেবে কাজ করে। 'দহনকাল' উপন্যাসে রাধানাথকে রমণীমোহন বহদ্দারের নৌকায় পাউন্যা নাইয়া হিসেবে কাজ করতে দেখি। আবার দয়ালহরি ও রামহরির আছে একটি বড়ো নৌকা ও একটি কটিনৌকা। গভীর সমুদ্রে যে সব নৌকা পাড়ি দেয়, সে সব নৌকা সমুদ্র ঝড় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আবার ডুবেও যায়। কৈবর্তপাড়ার শিবশরণের নৌকাটি সমুদ্রে ডুবে গিয়েছে। মাঝিসহ বারোজন ছিল সেই নৌকায়। কিন্তু বেঁচে গিয়েছে মাত্র দুজন। এক্ষেত্রে নৌকার মাঝির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ একজন দক্ষ মাঝি একটি ডুবন্ত নৌকাকে বাঁচাতে পারে। আলোচ্য উপন্যাসে মাঝিদের সম্পর্কে জানতে পারি-

'কালিদইজ্যার নৌকায় একজন মূল কাণ্ডারি থাকে—তাকে বলে বড়োমাঝি। তার কথাতেই নৌকা চলে। মাছমারা, জালপাতানো, জালপাতানোর জায়গা ঠিক করা—সবই বড়োমাঝির সিদ্ধান্তেই নির্ধারিত হয়। এককথায় বড়োমাঝিই নৌকার হর্তাকর্তা। এরপর থাকে একজন ছোটোমাঝি। বড়োমাঝি অসুস্থ হলে তার পরামর্শে ছোটোমাঝি মাছধরার কাজ চালায়'। (জলদাস ২০১০, পৃ. ৪৬)

জেলেদের মতোই মাঝিদেরও পোড় খাওয়া জীবন। গভীর সমুদ্রের অভিজ্ঞতা থাকতে হয় একজন বড়োমাঝির। তাদের বয়স সাধারণত চল্লিশ-ষাট বছরের মধ্যে। কম বয়সের কোনো মাঝি রাখে না বহদ্দাররা। কারণ গভীর সমুদ্রে সর্বস্ব সঁপে দিতে হয় তাদের হাতে। মাঝিদের হাতেই বহদ্দারদের লাভ লোকসান নির্ভর করে। একজন বড়োমাঝি-কে হতে হয় অভিজ্ঞ, ধীর-স্থির ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, যাতে ছোটোমাঝি ও গাউররা তাকে মান্য করতে বাধ্য হয়। উপন্যাসে দয়ালহরির বড়ো নৌকার বড়ো মাঝি হল মথুরা এবং ছোটো মাঝি লক্ষ্মীপদ। এদের সঙ্গে কৃষ্ণমিলন, যদুমোহন, রূপণদের মতো গাউররা মাছ কেটে, বেছে শুকোয়। গাউরদের মধ্যে একজন পাঁচক থাকে। তাকে 'রাধাইন্যা' বলে। অন্যদিকে শিবচরণ বহদ্দারের বড়ো নৌকা ডুবে যাওয়ার পরে, ছোটো নৌকাটিও ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। কিন্তু দক্ষ ও কৌশলী ঈশান মাঝির দক্ষতায় মাছ ভর্তি নৌকাটি ভরাডুবির হাত থেকে বেঁচে ফিরে আসে-

> 'অক্ষত নৌকা দেখে, নৌকা ভর্তি মাছ দেখে, সুস্থ মাঝি-মাল্লাদের দেখে শিবশরণ আনন্দে আত্মহারা হলেন। মাঝি-গাউরদের একে একে বুকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠলেন তিনি। তাঁর কান্নায় মাছভর্তি ছোটোনৌকা ফিরে আসার আনন্দ এবং বড়োনৌকা হারানোর হাহাকার মিলেমিশে থাকল'। (জলদাস ২০১০, পৃ. ৬০)

তাছাড়া উপন্যাসে দেখা যায়, নিকুঞ্জ, অবর্ণকুমার, রামচন্দ্র এরা সাধারণ বহদ্দার নয়। এদের প্রত্যেকের দুটো করে নৌকা। মাছ বেশি ধরা পড়ুক বা কম পড়ুক তাদের নৌকা প্রতি জোয়ার ভাটায় সমুদ্রে ভাসে। এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, জেলেপাড়ার যেসব জেলে-বহদ্দাররা 'কালিদইজ্যা' অর্থাৎ গভীর সমুদ্রে নৌকা ভাসায়, সেই সব নৌকাগুলো একদিকে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনই জলদস্যুদের আক্রমণেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিছু ক্ষেত্রে জলদস্যুরা নৌকা চুরি করেও নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে জলদস্যুদের দ্রুত গতি সম্পন্ন 'সাম্পান' ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। উপন্যাসে বহদ্দারদের নৌকা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে এভাবে-

> 'জীবন বহদ্দারের নৌকা ফিরল, কিন্তু গাউর তিনজন নেই। নিকুঞ্জের সব নাইয়া ফিয়ে এল, কিন্তু একটি নৌকাও ফিরল না। গাউররা জানাল—ঝড়ে-জলে নৌকা ভাসতে ভাসতে সন্দ্বীপ উপকূলে পৌঁছালে জলডাকাতরা তাদের মারধর করে নৌকা দুটো কেড়ে নিয়ে গেছে। ... নিকুঞ্জের কূলের নৌকাটির মাথা ভেঙেছে'। (জলদাস ২০১০, পৃ. ১১৭)

মনে পড়ে মানিকের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসেও মাছশিকারে যাবার জন্য নৌকার বিবরণ রয়েছে। সেখানে ধনঞ্জয় মাঝির নৌকাটি বেশি বড়ো নয়, পিছনের দিকে সামান্য ছাউনি ও বাকি খোলা জায়গায় মাছ ধরে রাখার মতো জায়গা রয়েছে। আবার হোসেন মিয়ার একটি পানসি নৌকা ঘাটে বাঁধা থাকতে দেখা যায়। অন্যদিকে সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসে মাছমারা সম্প্রদায় নানা আকৃতির নৌকা নিয়ে গঙ্গায় মাছ ধরতে গিয়েছে। যেমন গাত নৌকা, বলাগড়ের নৌকা, বাছাড়ি নৌকা ও ছোটো বড়ো নানা আকারের

নৌকা। এগুলোর মধ্যে সেরা হল নিবারণের বাছাড়ি নৌকা। এই নৌকা সেগুন কাঠের তৈরি। আবার সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহিন গাঙ' উপন্যাসটি শুরুই হয়েছে- 'গাঙের বাতাসে নৌকাটা খবর নিয়ে ফিরছে'– এই বাক্য দিয়ে। আসলে জেলেজীবনকেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে জাল-নৌকার আনুষঙ্গিক বর্ণনা সহজ ও স্বাভাবিক কারণ জাল-জল-নৌকা-মাছ নিয়েই জেলেজীবনের অস্তিত্ব পূর্ণাঙ্গ রূপে ধরা পড়ে। হরিশংকর জলদাসের গল্প-উপন্যাসও জাল-নৌকা-মাছের অনুষঙ্গ জেলেজীবনের দর্পণে পরিণত হয়েছে।

'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে দেখি জগবন্ধুর বড়ো মেয়ে সাধনবালার স্বামী শম্ভুর ছোটো একটি একগাছি নৌকা রয়েছে। জগবন্ধুরও একটি একগাছি নৌকা আছে। সে এই নৌকাটি লাম্বুরহাট থেকে কিনেছিল।

> 'জেলেদের কাছে একগাছি নৌকার কদর বেশি। একগাছি নৌকা নদী-সমুদ্রের প্রবল স্রোত আর উন্মাতাল ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে'। (জলদাস ২০১৯, পৃ. ২১)

ইতিপূর্বে আলোচিত জেলেদের নৌকার প্রসঙ্গে এই একগছি নৌকার ব্যবহার আমরা লক্ষ করেছি। 'দুখিনি' গল্পে মনমোহন ও কালাবাঁশিকে একগাছি নৌকায় সমুদ্রে মাছ ধরতে দেখা গিয়েছে। মনমোহনের বাবা কিষ্টপদর প্রথমে জাল নৌকা না থাকলেও পরবর্তীকালে সে বহদ্দার হয়েছে এবং একটি একগাছি নৌকা কিনেছে। 'ঢেন্ডেরি' গল্পে রাইগোপালের বাবা যদুমোহনের একটি বড়ো নৌকা ছিল। 'একজন জলদাসীর গল্প'-তে দেখি জগৎহরি জলদাসের একটি নৌকা ছিল। জগৎহরির ছেলে নরহরির বিয়ে দেওয়ার সময় কন্যার বাবা শ্রীপতি বহদ্দার নরহরিকে একটি একগাছি নৌকা উপহার স্বরূপ দিতে দেখা গিয়েছে। 'চরণদাসী' গল্পে দেখি চরণদাসীর বাবা মঙ্গলচরণ বহদ্দারের দুটো বড়ো নৌকা। আলোচ্য তিনটি প্রধান অনুষঙ্গ ছাড়াও জেলেসমাজে যে বিভিন্ন রীতিনীতি ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, তা দেখানো যেতে পারে।

৩.১.৪.১.১ সামাজিক রীতিনীতি ও বৈশিষ্ট্য

'জলপুত্র' উপন্যাসে জানা যায়- ক্ষুদ্রতা, পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ জেলে সমাজকে ঘিরে রেখেছে। ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য এই সমাজে ষড়যন্ত্র হয় না যে এমন নয়, তবু একধরনের ভালোবাসার বন্ধন জেলেদের একসূত্রে গেঁথে রেখেছে। 'জলপুত্র' উপন্যাসের কামিনী বহদ্দার শুক্কুর মহাজনের থেকে দাদন নেয় এই শর্তে যে বাজারদরে সে শুক্কুরের কাছে মাছ বিক্রি করবে। কিন্তু কামিনীর জালে লাম্বু মাছের ঝাঁক ধরা পড়লে সেই মাছ শুক্কুর জলের দামে কিনতে চায়। কামিনী রাজি হয়নি বলে শুক্কুর কামিনীকে চড় মারে। এই ঘটনায় সমুদ্র উপকূলে উপস্থিত বিজন বহদ্দার শুক্কুরের অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। শুক্কুর বিজনকে

তাদের মাঝখানে আসতে না করলে সমস্বরে সকল বহদ্দার জানায় কামিনী বহদ্দারকে রক্ষা করা তাদের সকলের কর্তব্য। রামনারায়ণ পাশ থেকে বলে ওঠে-

> 'খবদ্দার আর কোনোদিন যদি কামিনী বহদ্দার অথবা অন্যকোনো জাইল্যার গাআত্ হাত তোল, তইলে হেই হাত আঁরা বেয়াগ্‌গুনে ছেঁচি দিয়ম।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৫৩)

সব বহদ্দারকে একসঙ্গে কথা বলতে দেখে শুক্কুর নত হয় এবং শশিভূষণ শুক্কুরের হয়ে সকলের কাছে ক্ষমা চায়। কিন্তু এই ঘটনার রেশ থেকে যায়। কামিনী বহদ্দারের অপমানে সব জেলেরা এককাট্টা হয়ে সলাপরামর্শ করে ঠিক করে বাজার দরে মাছ বিক্রি করবে তারা। এরজন্য যদি কোনো অঘটন ঘটে তাহলে সকল জেলে ঐক্যবদ্ধভাবে তার প্রতিরোধ করবে।

আবার 'দহনকাল' উপন্যাসে দেখা যায় শিবশরণের নৌকা সমুদ্রের ঝড়ে ডুবে যায়। বারো জনের মধ্যে দু'জন বেঁচে ফেরে। ডুবে যাওয়া গাউরদের পরিবারকে শিবশরণ বহদ্দার দুই কুড়ি টাকা ও দুই তিন সের শুঁটকি দিয়ে ক্ষতিপূরণের সামান্য চেষ্টা করেছেন। এপ্রসঙ্গে হরিশংকর জলদাস তাঁর আত্মজীবনী 'নোনাজলে ডুবসাঁতার'–এ জানিয়েছেন,

> '... এত সংকীর্ণতা, ঠাসাঠাসি-ঘেঁষাঘেঁষি পরও, এত দারিদ্র্য, এত অনুদারতার পরও জেলেপাড়ার আলাদা নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য অন্য কোনো সম্প্রদায়ের পাড়ায় পাওয়া যাবে না। জেলেরা যতই মারামারি, রেষারেষি করুক না কেন, জীবনসংকটে ওরা সর্বদা এককাট্টা। ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে প্রতিনিয়ত ওরা আক্রান্ত হয়, এই দুর্মর দুর্যোগের সময় ওরা পরস্পরের পাশে দাঁড়ায়'। (জলদাস ২০১৮, পৃ. ৬৬)

জেলেসমাজ পুরুষতান্ত্রিক। সংসারের উপার্জনের কাণ্ডারী একজন জেলে হলেও সংসারের আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম ও প্রয়োজনে উপার্জনের সহযোগী হিসেবে পাশে থাকে জেলেনারী। একজন জেলেপুরুষ নদী-সমুদ্রে সারাদিন যুদ্ধ করে প্রাণ হাতে নিয়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও উত্তাল সমুদ্রের কবল থেকে সে ফিরবে কিনা তার নিশ্চয়তা থাকে না সবসময়। এই কারণে জেলেসমাজে বেশীরভাগ নারী বিধবা।

অন্যদিকে জেলেসমাজে কোনো জেলের মৃত্যু হলে তার শবকে সামনে রেখে স্ত্রীরা আত্মবিলাপ করে উচ্চস্বরে। সেই বিলাপে স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে কোনো সুখস্মৃতির উল্লেখ করে তারা। আবার কখনো ভাবের ঘোরে স্বামীকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করে উচ্চস্বরে বিলাপ করে। 'জলপুত্র' উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে দেখা যায় গঙ্গার মৃতদেহের সামনে সুমিত্রার বিলাপ।

> 'মৃতদেহের পায়ের কাছে কাদায় মাখামাখি হয়ে গঙ্গার বউ চিৎকার করে বিলাপ করছে, 'ভাইরে, অ ভাইরে, আঁরে অকূলত্ ভাসাইদি কড়ে গেলা গইরে ভাই ভাই!'' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১২৮)

'জামাইখেকো' গল্পে ক্ষুদিরামের মৃত্যুতে আরতি বালার উচ্চস্বরে বিলাপ করার দৃশ্য এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে-

'ও ভগবান রে! ও ঈশ্বর! আঁর কোয়াল পুইল্য রে ঠাকুর! মা গঙ্গারে, তোঁয়ার কী দোষ গয্যিলাম রে জননী। তুঁই আঁর সোয়ামিরে কাড়ি লইলা রে মা!' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৩৭৮)

জেলেসমাজে জেলে দম্পতিদের সন্তানরা একটু বড়ো হয়ে গেলে পাড়া-প্রতিবেশীরা তাদের নাম ধরে আর ডাকে না। তখন তারা জেলেদের সন্তানের নামের পর মা-বাপ জুড়ে দেয়। যেমন 'জলপুত্র' উপন্যাসে গঙ্গা একটু বড়ো হয়ে যাওয়ার পর ভুবনকে প্রতিবেশীরা আর নাম ধরে ডাকে না—ডাকে 'গঙ্গার মা' বলে। এরকম আরো কিছু চরিত্রকে দেখা যায়—হরবাঁইশ্যার মা, মালতির মা, বংশীর মা। দেখা যায়, জোনাব আলীর বাবার নাম বর্তমানে সকলে ভুলে গিয়েছে- সে এখন 'জনইপ্যার বাপ' বলে জেলেপাড়ায় পরিচিত। একইভাবে 'ঢেন্ডেরি' গল্পে হরিদাসীর মা-এর কোনো নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে চৈতন্য খুড়াকে ভগীরথের বাপ বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

জেলেসমাজে মানুষদের একটি অভ্যেস হল অন্যকে তার শারীরিক বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকৃত নামে ডাকা। 'জলপুত্র' উপন্যাসে হরিনারায়ণকে পাড়ায় 'আইল্যা' বলে ডাকে। কারণ তার-

'অণ্ডকোষটা বিশাল বলে জেলেপাড়ার দুষ্টু ছেলেমেয়েরা হরিনারায়ণকে আইল্যা বলে ডাকে'। (জলদাস ২০০৮ পৃ. ২১)

আবার ভুবনের ননদ উর্বশীর ছেলে অমৃতলালের খারাপ স্বভাবের ও ভিক্ষুকের মতো অভ্যাস। আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে নিজের পছন্দের জিনিস চেয়ে নেওয়া বা চুরি করা অভ্যাস তার।

'তার এই স্বভাবের জন্যে আত্মীয়স্বজন আর পাড়াপড়শিরা তার নাম দিয়েছে মাগইন্যা। এই নামটার তলায় তার আসল নামটা চাপা পড়ে গেছে'। (জলদাস ২০০৮ পৃ. ২৯)

আবার রামের বউয়ের শারীরিক গঠন ছোটোখাটো বলে তাকে সকলে টুনিবউ বলে ডাকে।

'দহনকাল' উপন্যাসে উত্তরপতেঙ্গা গ্রামের শিক্ষক চিত্তরঞ্জন দে-কে সকলে 'আদাব স্যার' বলে ডাকে। কারণ হিসেবে জানা যায়-

'দীর্ঘজীবনে তিনি এগাঁয়ের পিতা ও মাতাদের পড়িয়েছেন, পরে তাদের সন্তানদের পড়িয়েছেন, এখন এই সন্তানদের সন্তানদেরকে পড়াচ্ছেন। তিন প্রজন্মের শিক্ষক তিনি। তাই গাঁয়ের সবার কাছে তিনি আদাব স্যার'।

(জলদাস ২০১০, পৃ. ৮)

আলোচ্য উপন্যাসে আরেকজন চরিত্র খু-উ বুউজ্যা। তার আসল নাম জানা যায় না। বয়স পঞ্চান্ন- ষাটের মাঝামাঝি এই মানুষটিকে দেখলেই পাড়ার ছেলেরা,

'তাকে দেখলেই পেছন থেকে আওয়াজ দেয়—খু-উ। এই একটি মাত্র শব্দে খু-উ বুইজ্যার মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। অবিরাম গালিগালাজ করতে থাকে সে।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ২২)

'দইজ্যা বুইজ্যা' গল্পে হরগোবিন্দ জলদাস সমুদ্রে সন্তানদের হারিয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। অর্ধ উন্মাদ এই মানুষটি সকলের মুখে তাই দইজ্যা বুইজ্যা নামে পরিচিত।

জেলে সমাজের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, প্রায়শই যুবতী নারী-পুরুষের মধ্যে যৌনতার সম্পর্ক গড়ে ওঠা। 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে মহেন্দ্রর মেয়ে শিউলি ও পরমেশ বর্মার বড়ো ছেলে অপূর্ব বর্মা। অপূর্ব দশম শ্রেণির ছাত্র। অপূর্ব ও শিউলির মধ্যে প্রেমজ সম্পর্ক। দেখা যায়-

> 'গভীর রাতেই বেড়া ডিঙিয়েছে শিউলি। অপূর্বের জানালায় ঠুক ঠুক। চুপিসারে দরজা খুলে দিয়েছে অপূর্ব। অপূর্বের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শিউলি। তারপর বিছানা তোলপাড়। একবার নয়, বারবার'। (জলদাস ২০১৯, পৃ. ১১৫)

সাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস তাঁর আত্মজীবনী 'নোনাজলে ডুবসাঁতার'- এ জেলে সমাজের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন-

> 'সমাজে আরেকটা জিনিস খুব হতো, তা হল প্রেম। ... জেলেসমাজে প্রেম মানে শরীরের সঙ্গে শরীর মেশানো। আঁধার জায়গায়, সে গৃহকোণ হোক বা বাঁশঝাড়তলা, খালপাড়ের কেয়াবন হোক বা খড়ের গাদা, শুধু যৌনচর্চা করে যাবার নাম ছিল প্রেম। দেহনির্ভর এ ধরনের প্রেমের ঘটনা আকছার ঘটত উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়ায়। দেহচর্চার ব্যাপারটি গৃহবধূদের মধ্যে যেমন সংঘটিত হতো, তেমনি হতো কুমারী মেয়েদের মধ্যেও। স্বামী দিবস- রজনীর অধিকাংশ সময় সমুদ্রের পাড়ে থাকে, ঘরে দেবর অথবা পাশের পরিবারে নওজোয়ান। ... এই মিলনের পরিণতি যে সবসময় সুখকর হতো, এমন নয়। কোনো কোনো সময় কুমারী মেয়ে গর্ভবতী হয়ে যেত'। (জলদাস ২০১৮, পৃ. ৬৭)

'চরণদাসী' গল্পে দেখি লুকোচুরি খেলাছলে গাবঘরে লুকানো চরণদাসীকে পেছন থেকে আজলা ঝাপটা ধরে মুখ চেপে ধরে। চরণদাসী ছাড়ানোর চেষ্টা করলেও আজলার চাঁপাচাপিতে সেও গা ভাসিয়ে দেয়। এক সন্ধ্যায় জানা গেল চরণদাসী গর্ভবতী হয়ে পড়েছে।

এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলিবাকের উপকথা' উপন্যাসের কথা। যেখানে সমাজের তথাকথিত প্রান্তিক, অস্পৃশ্য, ভূমিকর্ষণজীবী কাহার সম্প্রদায়ের নারীদের মধ্যে শারীরিক আবেগ প্রকাশ ছিল আরো স্পষ্ট। উপন্যাসে বর্ণিত সমাজে কাহার মহিলারা বিবাহের ক্ষেত্রে অধিক স্বাধীনতা পেয়েছে। বিবাহ বিচ্ছেদ, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক সীমার ভেতরেই অনুমোদিত ছিল বিধবা বা স্ত্রীহীন পুরুষের পুনর্বিবাহের রীতি, যাকে 'সাঙ্গা' বলা হত। সমালোচক-গবেষক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর বর্ণিত কাহার সম্প্রদায় সম্পর্কে জানিয়েছেন,

> '…the kahar women were more forthright in expressing their physical passion, enjoyed more freedom in matters of marriage and divorce, extramarieal affairs were permissible within limits, widow remarriage and '*sanga*' or second marriage between their men and women remained an accepted form of union even in the first half of the twentieth century. Yet, kahar women were

sextually exploited by the high caste men of the village on a regular basis and their men held them responsible for such transgressions,' (Bandyopadhyay 2004, p. 152)

কাহার সম্প্রদায়ের মতো অবশ্য জেলেসমাজে নারীদের সেই স্বাধীনতা ছিল না, কিন্তু হরিশংকরের জেলেসমাজ বর্ণনা অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, যৌন আবেগ ও সম্পর্কের ঘটনা একাধিকবার উঠে এসেছে। কাহার সমাজের মতোই জেলেসমাজে বিধবা নারী ও স্ত্রীহীন পুরুষদের পুনর্বিবাহ অর্থাৎ 'সাঙ্গা' করার কথা 'জলপুত্র' উপন্যাসে পাওয়া যায়।

'সাঙ্গা করার নিয়ম আছে এ সমাজে। কেউ কেউ সন্তান ফেলে আবার কেউ সন্তান নিয়ে দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে যায়। বেশির ভাগ বিধবা পিতৃহারা সন্তানদের মুখের দিকে চেয়ে সাঙ্গা করে না।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১৬)

কেবল বিধবা নারীরাই নয়, জেলে পুরুষকেও 'সাঙ্গা' করতে দেখা গিয়েছে। উপন্যাসে জানা যায়, জেলেপাড়ার দরিদ্র জেলে জয়ন্ত তার প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সে পাখিবালাকে 'সাঙ্গা' করেছে। তবে এমন নয় যে প্রথম স্ত্রী বা স্বামীর অবর্তমানেই কেবল সাঙ্গা করা প্রচলিত, স্ত্রী বা স্বামী বর্তমান থাকা অবস্থাতেও 'সাঙ্গা' করতে দেখা গিয়েছে জেলে সমাজে। যেমন আলোচ্য উপন্যাসের মধুরাম জলদাস। দুই ছেলে ও স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সীতাকুণ্ডে হরগোবিন্দের নৌকায় গাউর খাটতে গিয়ে তার বিধবা মেয়েটিকে 'সাঙ্গা' করেছে সে। তার স্ত্রী তাকে ফিরিয়ে আনতে গেলেও সে উত্তর পতেঙ্গায় আর ফিরে আসেনি। ঠিক এরকম ঘটনাই দেখা যায় 'দুখিনি' গল্পে। রসবালা ও কিষ্টপদর বছর সাতেকের সুখকর দাম্পত্যজীবনে অভাব-দারিদ্র্য একসময় দুঃখ ও অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অভাব মেটাতে কিষ্টপদ কুমিরার নকুল বহদ্দারের নৌকায় গাউর খাটতে যায়। দেখা যায়,

'কুমিরায় কাজ করতে গিয়ে কিষ্টপদ নকুল বহদ্দারের বিধবা মেয়ের সঙ্গে ফেঁসে যায়। কেতকিবালাকে সাঙ্গা করে বসে সে।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৪১)

আবার 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে চৈতন্য খুড়ার স্ত্রীকে পাশের বাড়ির অবিবাহিত গৌরাঙ্গের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে দেখা যায়।

সাঙ্গা বা পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গে বলতে হয়, জেলে সমাজে মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার প্রচলন। ছেলেদের ষোলো-কুড়ি এবং মেয়েদের তের-পনের বছর বয়সে বিয়ে হতে দেখা গিয়েছে হরিশংকরের কথাসাহিত্যে। যদিও গল্প-উপন্যাসে বর্ণিত সমকাল থেকে ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে মেয়েদের বিয়ের বয়স ছিল নয়–বারো বছর। আলোচ্য উপন্যাস অনুযায়ী,

'জেলেকন্যার যখন বিয়ে হয়, তখন সে একেবারেই অপরিপক্ক। ছেলেরাও কৈশোরের গণ্ডি পেরোয় মাত্র। কিন্তু দুটো শরীর কাছাকাছি আসে, শরীর নিয়ে তারা নাড়াচাড়া করে। ... মহাবুভুক্ষা নিয়ে পুরুষ একদিন ঝাঁপিয়ে পড়ে বালিকাবধূর ওপর। শরীরের আড় ভাঙে। এই আড় ভাঙাভাঙিতেই সন্তান আসে পেটে। তাই জেলেপল্লিতে দাম্পত্য-

ভালোবাসা দানা বাঁধে না। শুধু প্রয়োজনের খেলায় মগ্ন হয় তারা। প্রয়োজন ফুরোলেই জেলেপুরুষ বাইরের ও জেলেনারী সংসারের ডামাডোলে ক্লিষ্ট হতে থাকে'। (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১৪)

উপন্যাসে ভুবনের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন তার বয়স মাত্র নয় বছর এবং চন্দ্রমণির বয়স উনিশ বছর। যদিও সময়ান্তরে যখন ভুবনপুত্র গঙ্গার বিয়ে হয় তখন দেখা যায় গঙ্গার বাইশ বছর এবং কন্যা সুমিত্রার পনের বছর। লক্ষণীয়, সাধুবাবা সুমিত্রার সমন্ধের কথা বলতে গিয়ে জানায়-

'কুমিরা গেরামত্ উগ্গা মাইয়া আছে। বয়স ইক্কিনি বেশি। চৈদ্দ-পোঁদর হইবো'। (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১০৬)

তৎকালীন সময়ে কন্যার চোদ্দ-পনের বছর বয়স বেশি মনে হয়েছে জেলেসমাজে। 'সুবলজেঠা'- গল্পে মেয়েদের বিয়ে প্রসঙ্গে স্পষ্টতই উল্লেখ পাই-

'কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ জেলেসমাজে। সুবল জেঠাও চৌদ্দ পেরোতে-না- পেরোতেই মেয়েদের টুপটাপ করে বিয়ে দিয়ে দিল'। (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২৩১)

'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে সুধাংশু ও অহল্যার যখন বিয়ে হয় তখন অহল্যার বয়স ছিলো বারো-তেরো। আবার অহল্যার বড়ো মেয়ে ফাল্গুনীর বিয়ে হয়েছে ষোল পেরিয়ে সতেরো বছর বয়সে। লক্ষণীয়, এই বয়সে ফাল্গুনীকে বিয়ে দিতে চায়নি তার দাদা শিবশঙ্কর। এতে বাড়ির সদস্যরা অবাক হলে, শিবশঙ্করের বক্তব্য-এই বয়সে বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। সংসার- স্বামী এইসব বিষয়ে ফাল্গুনীর এখনও বোধ জন্মায়নি। সুধাংশু ছেলের বক্তব্যকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে মায়ের উদাহরণ দিয়েছে এই বলে যে, তার মা অহল্যা অনেক কম বয়সে বাড়ির বউ হয়ে এসেছে, ফাল্গুনীর তো তাও সতেরো বছর। স্বামীর কথা শুনে অহল্যা জানায়-

"আমাদের জমানা আর এখনকার জমানা আলাদা। মা-বাপরা হেই সময় না বুইঝা কচি মাইয়াগোরে বিয়া দিছে।'... 'কম বয়সে বিয়ার যে কী কষ্ট, সে আমি বুঝি!" (জলদাস ২০১৯, পৃ. ১৪৮)

'জমানা' অর্থাৎ কালচক্রে যে জীবনচক্রের পরিবর্তন হয় তা আমরা আলোচ্য তিনটি উপন্যাসে লক্ষ করলাম। জলপুত্র উপন্যাসে মেয়েদের বিয়ের বয়স যেখানে নয়-বার বছর, সেখানে 'দহনকাল'- এ সেই বয়স বার-পনের। আবার 'প্রস্থানের আগে' এসে দেখা গেল মেয়েদের বিয়ের বয়স পনের-সতেরোতে এসে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে সেভাবে বলা না হলেও শিক্ষিত মানসিকতা ও মেয়েদের পরিপক্কতার অভাব যে তার পেছনে ক্রিয়াশীল তা আমরা অনুধাবন করতে পারি 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে শিবশঙ্করের কথায়। সুধাংশুর ফাল্গুনীকে সতেরো বছর বয়সে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে জানায়,

'না বাবা, এই বয়সে বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। সংসার-স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ি—এইসব বিষয়ে ফাল্গুনীর এখনো বোধ জন্মায় নি।' (জলদাস, ২০১৯, পৃ. ১৪৮)

অন্যদিকে জেলেসমাজে বিয়ের সময় কন্যাপণের প্রচলন ছিল। ভুবনেশ্বরীর বিয়ের সময়

'ছয় কুড়ি টাকা কন্যাপণের বিনিময়ে মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজি হল নৈদরবাঁশি।' (জলদাস ২০০৮, পৃ.১৪)

এই ধরনের কন্যাপণকে জেলেসমাজে 'দাভা' বলা হয়। ভোলানাথকে তার ছেলে বংশীর বিয়ের সময় কন্যাপণ দিতে দেখা গিয়েছে-

'হিতারা হাতকুড়ি টিঁয়া দাবি গয্যিল। কইবুলি চাইর কুড়িত্ রাজি গরাই'। (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৯৭)

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র কথা। উপন্যাসে জেলে সমাজের একদিকে মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার কথা আছে, তেমনই কন্যাপণেরও উল্লেখ রয়েছে। দেখা যায় কুবেরের মেয়ে গোপির বয়স এগারো বছর। কুবের তার মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলে যুগল ও রাসু দুজনেই গোপিকে বিয়ে করতে চায় এবং কন্যাপণ নিয়ে তাদের দুজনের মধ্যে দর কষাকষি হয়। কিন্তু কুবের তাতে রাজি না হলে সে হোসেন মিয়ার ঠিক করা পাত্র সোনাখালির বঙ্কুর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে ঠিক করে, কারণ-

'বঙ্কু পাঁচকুড়ি টাকা পণ দিবে কুবেরকে, গোপিকে গহনা দিবে তিনকুড়ি টাকার, আর একদিন জেলেপাড়ার সকলকে দিবে ভোজ'। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৬, পৃ. ১০৭)

'দহনকাল' উপন্যাসে কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার ঘটনা থাকলেও কন্যাপণের উল্লেখ নেই। উপন্যাসে রাধানাথের চব্বিশ বছরে বিয়ে হয়, তখন বসুমতীর বয়স সতেরো। জানা যায়, বসুমতীর বাবা হরবাঁশি টাকার অভাবে কন্যার বিয়ে দিতে পারছিল না। অন্যদিকে বরপক্ষের যৌতুকের দাবি মেটাতে গিয়ে আদাব স্যার নিঃস্ব হয়েছে। বড়ো জামাই খুব বেশি দাবি না করলেও মেজ জামাইকে পশ্চিমবঙ্গের বেহালায় একটি ওষুধের দোকান করে দিতে হয়েছে। ছোটো জামাই পক্ষের দাবি মেটাতে গিয়ে তার শেষ সম্বল জমি ও পুকুর বিক্রি করে সর্বসান্ত হয়েছে আদাব স্যার। 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে জগৎহরি তার বড়োমেয়ে সুধাকে বিয়ের সময় বরপক্ষের দাবি মেটাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়। লক্ষণীয়, 'জলপুত্র'-এ কন্যাপণের উল্লেখ রয়েছে কিন্তু 'দহনকাল' উপন্যাসে জানা যাচ্ছে- সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কন্যাপণের বিলুপ্তি ঘটেছে এবং বরপক্ষ উল্টে যৌতুক দাবি করেছে।

'আগে কন্যাপক্ষ দাভা নিয়ে মেয়ে বিয়ে দিত। এখন জমানা বদলে গেছে। বরপক্ষ উল্টো যৌতুক দাবি করে।'

(জলদাস ২০১০, পৃ. ২৫)

জেলেসমাজে কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে, কন্যাপণ, বরপক্ষের যৌতুক দাবি এসব প্রসঙ্গের মধ্যেও আরো একটি বিষয় উঠে আসে, তা হল মা-বাবাহীন জেলেপুরুষের সঙ্গে কন্যাপক্ষ তাদের মেয়েকে বিয়ে দিতে চায় না। 'জলপুত্র' উপন্যাসে গোলকবিহারীর নৌকার গাউর হারাধনের সঙ্গে রামহরির কন্যা তীর্থবালার যৌন সম্পর্কে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। সমাজ বিধান অনুযায়ী হারাধনের সঙ্গে তীর্থবালার বিয়ে ঠিক হয়। এই বিধান মেনে নিতে পারে না তীর্থবালার মা। সে চিৎকার করে বলে-

'ইয়ানো আঁরার কোয়ালত্ আছিল! ভাদাইম্যার লগে আঁর মাইয়ার বিয়া দওন পাড়িবো! কডে মা, কডে বাপ!'

(জলদাস ২০০৮, পৃ. ৬৪)

আবার ভুবনেশ্বরী যখন গঙ্গার বিয়ে দেয় সুমিত্রার সঙ্গে তখন বংশীর মা সুমিত্রার গলার নিচে পোড়া দাগ দেখে আপত্তি জানালে ভুবন বলে-

'আঁরারও তো সমস্যা। পোয়ার বাপ নাই। আইজ কাইল বাপ ছাড়া পোয়ারে কেউ মাইয়া দিত নো চা'।

(জলদাস ২০০৮, পৃ. ১০৭)

'কসবি' উপন্যাসে জেলে সমাজের বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখা যায়- শৈলেশের মার মৃত্যুর পর তার দুঃসম্পর্কের জেঠা রামকুমার শৈলেশকে বিয়ে করার কথা বললে শৈলেশ জানায়-

'কারে বিয়া করুম জেডা? কে আমারে মাইয়া দিব? মা নাই, বাপ নাই। কে তার মাইয়াটারে জলে ধাক্কা মাইরা ফেলাই দিব?' (জলদাস ২০১১, পৃ. ২৭)

অন্যদিকে 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে শিবশঙ্করের ছোটো ভাই ব্রজেন্দ্রর পাত্রী সন্ধানকালে তাদের অসুবিধায় পড়তে দেখা যায়। পাত্রীর সন্ধান পেলেও পাত্রীপক্ষ রাজি হয় না। শিবশঙ্করের স্ত্রী শহুরে বলে সে তার দেবর সূর্যকে এর কারণ জিজ্ঞেস করে। সূর্যমোহন জানায়-

'আমাদের মা-বাপ নাই বইলে অনেক পরিবার তাদের মাইয়া দিতে রাজি অয় নাই'। (জলদাস ২০১৯, পৃ. ২৭৬)

'দুখিনি' গল্পে সাতাশ আঠাশ বছরের কালাবাঁশির বিয়েতে বাঁধার সৃষ্টি হয় কারণ তার মা নেই, বাবা উদাসীন ও অর্ধ উন্মাদ। আবার 'চরণদাসী' গল্পেও দেখা যায়- হারাধনের সঙ্গে চরণদাসীর যৌন সম্পর্কে চরণদাসী গর্ভবতী হয়ে পড়লে সমাজ বিধান অনুযায়ী তাদের দুজনের বিয়ে ঠিক হয়। কিন্তু মঙ্গলচরণের ছোটো ছেলে আপত্তি জানিয়ে বলে-

'ভাদাইম্যা, মা-বাপ নাই, ঘরবাড়ি নাই, হিতারে নি বিয়া দিতাম আঁর ভইনেরে?' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৭৫)

আমরা জানি, মা-বাবা হল পরিবারের বটবৃক্ষ। যার ছায়াতলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যারা বেড়ে ওঠে। ফলে বাবা-মা-হীন পুত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে না দেওয়ার পেছনে যে ভবিষ্যতের নিরাপত্তাহীনতা কাজ

করেছে তা আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি। জেলেসমাজে সাঙ্গা, বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ সম্পর্কের কথা প্রসঙ্গে উঠে আসে বিবাহ পদ্ধতির কথা। জানা যায়,

> “সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত, দু’একটা ব্যতিক্রম ছাড়া, কৈবর্তসমাজের সকল বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ‘নামন্ত পদ্ধতি’তে। জেলেসমাজে দু’ভাবে বিয়ে হয়—নামন্ত বিয়ে আর চলন্ত বিয়ে। বর যখন শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বিয়ে করে, তখন তা চলন্ত বিয়ে। আর নামন্ত বিয়েতে বিয়ের একবেলা বা একদিন আগে বরযাত্রীরা গিয়ে ঢোল-বাদ্যবাজনা সহকারে কনেকে বাপের বাড়ি থেকে বরের বাড়িতে নিয়ে আসে এবং লগ্ন-মোতাবেক বরের বাড়িতে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। এই পদ্ধতির বিয়ে এখনও জেলেসমাজে বহুলভাবে প্রচলিত।” (জলদাস ২০০৯, পৃ. ৬৩)

জেলেসমাজে চলন্ত বিয়ের প্রসঙ্গ না এলেও এই নামন্ত পদ্ধতিতে বিয়ের উল্লেখ আমরা পেয়েছি ‘জলপুত্র’ ও ‘প্রস্থানের আগে’ উপন্যাসে। ‘জলপুত্র’ উপন্যাসে ভোলানাথের ছেলে বংশীর বিয়ে প্রসঙ্গে দেখা যায়,

> ‘গতরাতে বংশীর বিয়ে চুকে গেছে। নামন্ত বিয়ে। গতকাল সকালে কনেকে কাট্টলি থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। বিকেলে এসেছিল মেয়ের পক্ষের লোকজন। রাত দশটায় লগ্ন ছিল। পাড়াপ্রতিবেশী, সর্দার-মুখ্যদের উপস্থিতিতে বিয়েটা সুসম্পন্ন হয়েছে। আজ সকালে বাসি বিয়েও হয়ে গেছে।’ (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১০৩)

আবার ‘প্রস্থানের আগে’ উপন্যাসে দেখা যায় মহেন্দ্রর সেজ মেয়ে শিউলির বিয়ে হয় টেকনাফের চনারামের বড়োছেলে মধুসূদনের সঙ্গে। সেক্ষেত্রে জানা যায়,

> ‘পরদিন ভোরে ভোরে শিউলিকে নিয়ে মহেন্দ্রর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল বরযাত্রীরা। উত্তর পতেংগা থেকে টেকনাফ অনেকটা পথ। নামন্ত বিয়ে। দিনশেষে রাতে চনারামের উঠানে বিয়েটা হবে। তার আগেই মহেন্দ্র সপরিবারে চনারামের বাড়িতে পৌঁছে যাবে।’ (জলদাস ২০১৯, পৃ. ১৩৬)

জেলেরা মৎস্যজীবী সম্প্রদায় বলে তাদের জীবিকায় প্রচুর লোকবলের প্রয়োজন হয়। ফলে দেখা যায়, জেলে সমাজের পুত্র সন্তানেরা একটু বড়ো হলেই বাবা- দাদাদের সঙ্গে সমুদ্রে বা নদীতে মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে যে জেলের পুত্র সন্তান বেশি সেই জেলের উপার্জনও তত বেশি। ‘প্রতিশোধ’ গল্পে গল্পকথকের বর্ণনায় জানতে পারি-

> ‘আমাদের সমাজে একটু মাথা তোলা হলেই বাপদাদারা ছেলেদের নদী-সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া শুরু করে। প্রথম প্রথম তারা নৌকার পানি সেঁচে, মাছ বেছে বেছে আলাদা করে, রশি-দাঁড়-পাল গোছগাছ করে। বাপের সঙ্গে, বোনাইদের সঙ্গে, বড়ো ভাইদের সঙ্গে নদী- সমুদ্রে আসা-যাওয়া করতে করতে একসময় সেয়ানা হয়ে ওঠে’।
>
> (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৮০)

‘কোটনা’ গল্পে শ্যামচাঁদ জলদাসের ছেলে ক্ষীরমোহন পঞ্চম শ্রেণি পাশ করার পর পড়াশুনায় বাধা পড়ে। কারণ তার বাবা আর একা পেরে উঠছে না। জেলের ছেলেরা একটু বড়ো হলেই তাদের কেন বাবার সঙ্গে মাছ ধরতে যেতে হয়, তার কারণ ‘জলপুত্র’ উপন্যাসে পাই-

'দশ-বারো বছর পেরোলেই ছেলেকে যেতে হয় সমুদ্রে বা খালে-বিলে, মাছ ধরতে। ... প্রায় প্রত্যেক পরিবারে আট-দশজন করে সন্তান। অকাল বার্ধক্যে ঝুঁকে-পড়া জেলেটির পক্ষে দশ-বারো জনের সংসারের ঘানি টানা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই, ছেলেরা একটু মাথা-উঁচু হলেই বাপের সঙ্গে মাছ ধরতে যায়। যদি সংসারে দুটো টাকা বেশি আসে!'

(জলদাস ২০০৮, পৃ. ১৩)

'দহনকাল' উপন্যাসে দেখি ভুবনের পিতা হরবাঁশির দুই মেয়ে, তিন ছেলে। তিন ছেলের মধ্যে দুই ছেলে একেবারেই ছোটো।

'বড়োছেলে বীরেন্দ্র রাতবিরাতে বাপের সঙ্গে কর্ণফুলীতে মাছ ধরতে যায়'। (জলদাস ২০১০, পৃ.২৫)

'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে চৈতন্য খুড়ার ছেলে ভগীরথ একটু বড়ো হলে তাকে সঙ্গে করে সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া শুরু করে সে। দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক সংকট জেলেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একধরনের ভীতি তৈরি করেছে। ফলে জেলেরা তাদের পুত্রসন্তানদের অপেক্ষাকৃত বেশি উপার্জনের আশায় সমুদ্রে নিয়ে গিয়েছে।

৩.১.৪.১.২ সামাজিক অনুশাসন

জেলেসমাজের সামাজিক বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি তাদের সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক অনুশাসনের দিকটিও বিশেষভাবে উঠে এসেছে। জেলেসমাজের সামাজিক অনুশাসন সম্পর্কে গবেষক জানিয়েছেন,

'জালিয়াদের সমাজে পূর্বে মোড়ল বা মুখিরাই গ্রাম্য বিচারের প্রধান ছিল। পাঁচজনকে নিয়ে মোড়ল একটি সভা তৈরী করে বিচার করতো। তাতে সমাধান না হলে 'বাইশী' এবং 'ছত্রিশী' বিচারব্যবস্থা ছিল। এই 'ছত্রিশী'ই তাদের চূড়ান্ত বিচারের অধিকারী ছিল'। (ঘোষ, ২০০৭, পৃ. ২০৫)

হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে বর্ণিত জেলে সমাজ ব্যবস্থায় মোড়ল বা মুখিয়ার বদলে সর্দারের কথা বলা হলেও 'বাইশী' বা 'ছত্রিশী' বিচার ব্যবস্থার উল্লেখ নেই। দেখা যায়, সর্দার কয়েকজন মুখ্যকে নিয়ে সমাজের যে কোনো সমস্যার সমাধানে সালিশি সভার আয়োজন করে নিরপেক্ষ বিধান দান করেছে। জলদাসের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধানে সর্দার ও মুখ্যদের প্রধান ভূমিকা লক্ষ করা যায়। ফলে জেলেসমাজ একধরনের আইনি নিরাপত্তায় সুরক্ষিত। যে কেউ নিজেদের ইচ্ছে মতো অন্যায় বা অপরাধ করতে পারে না বা করলেও সর্দার দ্বারা গঠিত সালিশি সভার শাস্তি বিধান থেকে রেহাই পায় না।

'জলপুত্র' উপন্যাসে বর্ণিত বিভিন্ন সামাজিক বিধিভঙ্গ, অন্যায়-অপরাধ বা অপকর্মের বিচার ও বিধানের জন্য সর্দার-মুখ্যদের ভূমিকা দেখা গিয়েছে। উপন্যাসে হরিবন্ধু মারা যাওয়ার পর দুঃসম্পর্কের ভাই পরিচয় দিয়ে গোলকবিহারী হরিবন্ধুর পুকুরের পাশে খোলা জায়গা দখল করে, সেখানে একটি ঘর তৈরি করে। হরিবন্ধুর পুত্রবধূ ভুবনের কাছে এই খবর পৌঁছালে সে সাময়িকভাবে অসহায় হয়ে পড়ে। কী

করা উচিত ভেবে না পেয়ে সে বংশীর মায়ের কাছে গেলে সে সর্দারের কাছে জমি জবরদখলের ব্যাপারটি জানানোর পরামর্শ দেয়। জানা যায়, উত্তর পতেঙ্গার জেলেপল্লির পাঁচজন সর্দারের মধ্যে বিজন বহদ্দার একজন। তার অর্থ ও সামাজিক ক্ষমতা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা ভালো, জেলেপল্লিতে সর্দার নির্বাচিত হয় বহদ্দারের মধ্য থেকে। বহদ্দার হল জেলেদের মধ্যে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছল ও নিজস্ব জাল নৌকার অধিকারী। ভুবন ও বংশীর মা বিজন সর্দারকে সব কিছু খুলে বললে সে সালিশি সভার আয়োজনের পরামর্শ দেয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় ভুবনের উঠোনে সালিশি সভা বসে। বিছানো পাটির ওপর গোলাকার হয়ে বসেছে জেলেরা। সর্দার ও বহদ্দাররা সামনের সারিতে, মধ্যম শ্রেণির জেলেরা তাদের পরের সারিতে এবং নিঃস্ব-দরিদ্র জেলেরা তাদের থেকে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে পাটির কোনায় বসেছে। মাঝখানে পানের বাটা, বিড়ির দুটো বান্ডিল ও দেশলাই রাখা। লক্ষণীয় সালিশি সভার আয়োজককে এগুলোর জোগানদারি দিতে হয়। সভার চারিদিকে নানা বয়সের তরুণ, সাধারণ জেলেরা কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সভার মাঝখান থেকে রামনারায়ণ বহদ্দার এই সালিশিসভা ডাকার কারণ জানতে ছাইলে ভুবন সভার মাঝখানে এসে প্রথমে সকলকে উপুড় হয়ে প্রণাম করে এবং বলে-

> ‘ধনবাঁইশ্যার বাপ আঁরঅ জাগার উঅর ঘর বাইন্ধে। কঅদ্যে হিয়ান বলে হিতারো জাগা। আঁরঅ জাগাগিন ফিরি পাইবাল্লাই তোঁয়ারার কাছে বিচার চাইর’। (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৬২)

ভুবনের অভিযোগ শুনে মনোরঞ্জন সর্দার ধনবাঁশির বাবাকে জমি দখলের কারণ জানতে চাইলে সে জানায়, সে চন্দ্রমণির বাবার পিসির ননদের সন্তান। সেই হিসেবে ধনবাঁশির বাবা হরিবন্ধু তার ভাই হওয়ার দরুন সে জমির দাবিদার ও অধিকারী। দেখা গেল সভার মাঝে হঠাৎ শোরগোল। গোলকবিহারীর এই অন্যায় দাবি অর্থহীন বিচার করে অনেকেই একে গোলকের চালবাজি হিসেবে বিবেচনা করল। সর্দারদের মধ্যে নিম্নস্বরে নানা পরামর্শের পর বিধান দেওয়া হল- এই জায়গার মালিক গোলকবিহারী নয়। দুঃসম্পর্কের ভাইয়ের দোহাই দিয়ে জায়গা দখল করার অধিকার তার নেই। ফলে গোলককে ছয়মাসের মধ্যে জায়গা খালি করে দেওয়ার বিধান দেওয়া হল। বিচার শুনে গোলক বিধান অমান্য করতে চাইলে বিজন সর্দার তাদেরকে সমাজে একঘরে করে আগুন-জল বন্ধ করে দেওয়ার শাস্তি ঘোষণা করে।

> ‘জেলেসমাজে একঘরে হয়ে বসবাস করার মতো মর্মান্তিক ব্যাপার আর নেই। একঘরে-লোকেদের সঙ্গে কেউ কোনো সম্পর্ক রাখে না। সকল সামাজিক নিমন্ত্রণ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। একঘরে-পরিবারটি আবার সহজে সমাজভুক্ত হতে পারে না। পুনরায় সমাজভুক্ত হওয়া অনেক সাধ্য-সাধনার ব্যাপার’।
>
> (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৬৩)

শাস্তির ভয়ে গোলকবিহারী জমি খালি করার জন্য রাজি হয়। কেউ চাইলেই নিজের ইচ্ছামতো অন্যায় বা অপকর্ম করতে পারে না। করলে, তার ওপর নেমে আসে সর্দার শাসিত শাস্তি।

ভুবন আয়োজিত সালিশি সভায় ভুবনের পক্ষে ন্যায়বিচার হওয়ার পর দেখা যায়- গোলকবিহারীর পাউন্যা নাইয়্যা রামহরি জানায়, তারও কিছু বিচার চাওয়ার আছে। সভার মাঝে সে সকলের উদ্দেশে বলে, গোলকবিহারীর গাউর হারাধন তার মেয়ে তীর্থবালাকে গর্ভবতী করেছে। এই অভিযোগ শুনে হারাধন ও তীর্থবালাকে সভায় উপস্থিত করা হল এবং উভয়পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণে ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হলে সর্দাররা রায় দিল, তীর্থবালার সাথে হারাধনের বিয়ে দিতে হবে।

> '... আগামী মাসে দিনক্ষণ দেখে হারাধনের সঙ্গে তীর্থবালার বিয়ে হবে। বিয়ের খরচ বহন করবে রামহরি। বিয়ের পর এই পাড়াতেই হারাধনকে থেকে যেতে হবে। কোনো খালি ভিটেয় একটা ঘর তুলে তীর্থবালাকে নিয়ে সংসার পাতবে সে'। (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৬৪)

এরকমই আরো একটি ঘটনা চোখে পড়ে 'চরণদাসী' গল্পে। কাহিনির ঘটনাক্রমে চরণদাসী পনের বছর বয়সে হারাধনের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে গর্ভবতী হয়ে পড়লে তাদের বাড়িতে সালিশি সভা বসে। সেখানে সভামুখ্যদের সলা-পরামর্শে ঠিক হয়,

> '..হারাধনের সঙ্গে চরণদাসীর বিয়ে হবে আগামী লগ্নেই। মঙ্গলচরণের পরিবার তাকে জামাইয়ের যথাযোগ্য মর্যাদা দেবে। দুটো নাইলন সুতোর বিহিন্দিজাল কিনে দেবে। নৌকা কিনতে সাহায্য করবে।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৭৫)

তবে 'জলপুত্র' উপন্যাসে এই অবৈধ সম্পর্কের পরিণতি ভিন্ন। জেলেপাড়ার শিক্ষক দীনদয়ালের সঙ্গে বলরামের মেয়ে মঙ্গলীর অবৈধ যৌন সম্পর্ক প্রকাশ্যে আসায় সালিশি সভা বসে। দীনদয়ালের স্ত্রী চরণদাসী সন্দ্বীপে তার বাপের বাড়ি গেলে কোনো এক বৃষ্টিমুখর দিনে মঙ্গলীর সঙ্গে দীনদয়ালের যৌনসঙ্গম মুহূর্ত রামনারায়ণের বউ রাধারানীর চোখে ধরা পড়ে। দেখা যায়, সেদিন সন্ধ্যাবেলাই বিজন সর্দারের ঘরে সালিশি সভা বসে। সর্দার সভায় দীনদয়ালের কাছে এই কুকর্মের জবাব চাইলে সে তার অপরাধ স্বীকার করে এবং শাস্তি বিধান আশা করে। সর্দাররা পরামর্শ করে যে- মঙ্গলী অবিবাহিত এবং দীনদয়াল বিবাহিত। ফলে তাদের বিয়ে দিয়ে আরেকটি মেয়ের সংসার ভাঙা যাবে না। তাই ঠিক হল ভবিষ্যতে মঙ্গলীর বিয়ে হলে জেলেরা টাকাপয়সা দিয়ে রামহরিকে সহযোগিতা করবে। কিন্তু আজকের বিচারে উভয়কে শাস্তি পেতেই হবে। সেই শাস্তির নাম 'ঢেন্ডেরি'। সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, দীনদয়ালের কাছে কোনো ছেলেমেয়ে আর পড়তে যাবে না। তার পাঠশালা চিরতরে বন্ধ।

‘দীনদয়ালের মাথায় চুল মাঝখান থেকে কামিয়ে দেওয়া হল। মঙ্গলীর চুলের আগা বেশটুকু কেটে নেওয়া হল। উভয়ের গলায় জুতোর মালা পরানো হল। আর মুখমণ্ডলে লেপে দেওয়া হল চুন ও কালি। দুজনকে পাশাপাশি হাঁটিয়ে বাড়ি বাড়ি নিয়ে যাওয়া হল।... এইভাবে গোটা পাড়ায় দুজনকে হাঁটিয়ে ঢেন্ডেরি দেওয়া হল’। (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১২১)

এই ‘ঢেন্ডেরি’ শাস্তিকে কেন্দ্র করে ‘ঢেন্ডেরি’ গল্পের নির্মাণ করেছেন লেখক। সেখানে দেখা যায় বিবাহিত রাইগোপালের সঙ্গে মথুরার বউ আঙুরবালার অবৈধ সম্পর্ক ও যৌনতার ঘটনা প্রকাশ্যে এলে গোবিন্দ সর্দার খবর পেয়ে সেখানে আসে। ধীরে ধীরে পাড়ার মানুষজন জড়ো হয় এবং পাঁচ-সাতজন মিলে তাদের উঠোনে নিয়ে আসে। সমবেত জেলেদের মধ্য থেকে আওয়াজ ওঠে ‘ঢেন্ডেরি’ বলে। সর্দারের নির্দেশ,

‘সে-রাতে হাতেনাতে ধরা পড়া রাইগোপাল ও আঙুরবালাকে ঢেন্ডেরি দেওয়া হল। মাথা মুড়িয়ে, জুতার মালা গলায় ঝুলিয়ে, পেছন পেছন থালা-কাসা-টিন বাজিয়ে বাজিয়ে গোটা জেলেপাড়া ঘুরানো হল দু’জনকে।’

(জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৫৭)

তবে শুধু অন্যায়, অপরাধের ক্ষেত্রে সালিশ সভার আয়োজন করা হলেও সমাজের আনন্দ সমাবেশেও সভার আয়োজন করা হয়েছে। দেখা যায় জেলেসমাজে যখন কোনো জেলেপুরুষ বা জেলেনারীর বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয় তখন সর্দার-মুখ্যকে নিয়ে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সমাজের কাছে বিয়ের অনুমতি প্রার্থনার আশায়। জেলেসমাজে এই অনুমতি নেওয়ার বিশেষ সভাকে বলা হয় ‘পানছল্লার আসর’। ‘জলপুত্র’ উপন্যাসে এই ধরনের আসর বসতে দেখা যায় যখন ভোলানাথ তার ছেলে বংশীর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে। উপন্যাসের বর্ণনা অনুযায়ী-

‘কোনো বিচারের জন্যে আজকের এই জমায়েত নয়। এটা পানছল্লার আসর। বংশীকে বিয়ে করানো হবে আগামী মাসে। সমাজের অনুমতির দরকার। অনুমতি নেওয়ার এই সভাকে পানছল্লা বলে।’ (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৯৬)

‘দহনকাল’ উপন্যাসেও জেলে সমাজের সামাজিক অনুশাসনের দিকটি উঠে এসেছে। জানা যায় উত্তরপতেঙ্গা গ্রামের জেলেপাড়ার পাঁচজন সর্দার। তারাই সমাজ শাসন করে। এদের মধ্যে প্রভাবশালী একজন বহদ্দার ও সর্দার হল- নিকুঞ্জ বিহারী। সমাজ শাসনের মাথা হয়েও নিকুঞ্জকে সাধারণ জেলেদের সঙ্গে অন্যায়-অবিচার করতে দেখা গিয়েছে। ফলে নিকুঞ্জের পাউন্যা নাইয়া পরিমল জলদাস তার বিরুদ্ধে সালিশি সভার আয়োজন করে। একজন সর্দারের বিরুদ্ধে সালিশ ডাকা পরিমলের দুঃসাহসের পরিচয় বহন করেছে। ইতিপূর্বে আলোচিত সালিশি সভার মতোই পরিমলের সালিশে বিছানা পাটির মধ্যে নিকুঞ্জ সর্দার, বৈকুণ্ঠ সর্দার, জীবন সর্দারের ছেলে, অন্নচরণ ও মনোরঞ্জন বহদ্দার এবং আট-দশজন পাউন্যা নাইয়্যাও উপস্থিত। জীবন সর্দারের ছেলে পরিমলকে সালিশি ডাকার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে সভার মাঝখানে এসে নিয়মানুযায়ী দশজনকে প্রণাম করে বলে, নিকুঞ্জ বহদ্দারের পাউন্যা নাইয়্যা হিসেবে সে

পরিমলকে জাল বইতে দেয় না। এক 'জো' পেরিয়ে যাওয়ার পরও সে জালের জন্য গোঁজ পুতে দেয়নি। পরিমলের ভাষায়,

> 'নিকুঞ্জ কাকারে বউত্ বিনয় গইল্লাম গোঁজ গাড়ি দিবাল্লাই। তাঁই কনো পাত্তা নো দিল, হাত- পা ধরি অনুরোধ গইল্লাম, তাঁই নো হুইন্লো। কইলো—সামনর জো যাউক গই। পরে দেখা যাইবো। গত এক জো আঁই জাল বোয়াইত্ নো—পারি। পোয়া-ছা লই হুয়াই মরির। গত রাতিয়া আঁর ঘরত্ চুলা নো—জ্বলে।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৯৪)

পরিমলের অভিযোগ শোনার পর বৈকুণ্ঠ সর্দার নিকুঞ্জকে কিছু বলার জন্য জিজ্ঞেস করলে নিকুঞ্জ মেজাজি স্বরে বলে পাউন্যা নাইয়্যা মানে তার পোষা মাছ। সে যেমন করে চালাবে তেমন করে চলবে। সময় মতো গোঁজ পুতে দিলেই হল। তার জন্য সালিশি কেন? নিকুঞ্জর এই অহংকারী দাপট শুনে রাধানাথ এর প্রতিবাদ করে বলে, পাউন্যা নাইয়া বহদ্দারের পোষা মাছ নয়, তার সহযোগী। সহযোগী না হলে বহদ্দারও জাল বইতে পারবে না। পাউন্যা নাইয়্যার সুখে দুঃখে বহদ্দার গিয়ে আসবে—সেটা নিয়ম কিন্তু নিকুঞ্জ নিয়ম না মেনে পরিমলকে গোঁজ পোঁতার ব্যবস্থা করেনি। রাধানাথের কথা শুনে সমবেত পাউন্যারা সমস্বরে সম্মতি জানায়। বৈকুণ্ঠ সর্দার সকলকে থামিয়ে অন্যান্য সর্দার ও বহদ্দারের সঙ্গে পরামর্শ করে রায় দিল, আগামি দুই দিনের মধ্যে নিকুঞ্জ সর্দার পরিমলের গোঁজ পোঁতার ব্যবস্থা করবে এবং জাল বসাতে কোনো বাঁধা দেবে না তাকে। দশজনের রায় মেনে নিতে বাধ্য হল নিকুঞ্জ সর্দার।

শুধু সামাজিক সমস্যাই নয়, পারিবারিক সমস্যা, যেমন ভাইয়ে-ভাইয়ে সম্পত্তি নিয়ে কোন্দল, সীমানা নিয়ে ঝামেলা, বা শান্তিপূর্ণ সম্পত্তি ভাগের বিষয়ে সর্দার-মুখ্যদের ভূমিকা রয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসে দয়ালহরি ও রামহরির মধ্যে সম্পত্তি ভগের ব্যাপারে দয়ালহরিদের উঠানে সভা বসে। হরবাঁশি দয়ালকে অনুরোধ করে সোনার সংসার না ভাঙতে, কিন্তু নিরুপায় দয়াল সভার মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে। নৌকাটি জালাল মেম্বার সেই সভাতেই কিনে নেয়। টাকা-জমির সমান ভাগ হয় দুই ভাইয়ে। মাঝখানে দেওয়াল ওঠে।

প্রতিবেশীদের মধ্যে সীমানা নিয়ে সমস্যা বা জবরদখলের বিষয়ে মীমাংসার ক্ষেত্রেও সর্দার-মুখ্যদের ভূমিকা দেখা গিয়েছে। 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে দাতারাম ও ভোলানাথের মধ্যে সীমানা নিয়ে ঝামেলার সুত্রপাত হয়। যদিও উপন্যাসে জানা যায়, উত্তরপতেঙ্গা জেলেপাড়ায় বাড়িগুলোর সীমানা বলতে কিছু নেই বা জেলেরা সীমানা নিয়ে তেমন কিছু ভাবে না। দু-একটি পরিবার নিজেদের সীমানার ভাদি গাছ বা নারকেল গাছ লাগিয়েছে। সেরকমই দাতারাম নিজেরও ভোলানাথের সীমানায় নারকেল গাছ লাগিয়েছে। ঝামেলার সূত্রপাত হয় যখন গাছগুলো ফল দেওয়া শুরু করে। হঠাৎ একদিন ভোলানাথ গাছ

ও জায়গার মালিকানা দাবি করে। শুধু তাই নয়, বড়ো ছেলে মহেন্দ্রকে গাছে তুলে দিয়ে বলে সব ডাব-নারকেল পেরে আনতে। দাতারাম শত চেষ্টাতেও ভোলানাথ ও তার পুত্রদের থামাতে না পেরে নিরুপায় হয়ে বাঞ্ছারাম সর্দারের কাছে যায়। সর্দার তৎক্ষণাৎ দাতারামের বাড়িতে এসে সাময়িক মিটমাট করে সন্ধ্যায় সর্দার মুখ্যদের সভায় রায় দেয়, জায়গা ও গাছের মালিক দাতারাম। দাতারামকে সীমানা বরাবর বেড়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে ও ভোলানাথকে ভবিষ্যতে এরকম জোরজুলুম না করার জন্য বলে সমাধান করা হল। উপন্যাসে জানা যায়-

> 'জেলেপাড়াটি সর্দার-শাসিত। সরদারের বিচার না মানলে কঠিন শাস্তি নেমে আসে। আগুন-পানি বন্ধ হয়ে যায় অবাধ্য পরিবারটির'। (জলদাস ২০১৯, পৃ. ৩৯)

'আগুন-পানি বন্ধ' বা একঘরে করে রাখার মতো শাস্তি জেলে সমাজের অনুশাসনকে আরো দৃঢ় করেছে। আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি জেলেপাড়ায় প্রায়শই অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠার ঘটনা ঘটে থাকে। তেমনই একটি ঘটনা জেলেপাড়ার পরমেশ শর্মার ছেলে অপূর্বের সঙ্গে মহেন্দ্রর সেজ মেয়ে শিউলির যৌন সম্পর্ক। ঘটনাটি প্রকাশে এলে মহেন্দ্রের ছেলেরা অপূর্বকে গাছের সঙ্গে বেঁধে বেধড়ক প্রহার করে। অপূর্বর প্রাণ সংকটে শিবশঙ্কর তদের বোঝানোর চেষ্টা করে যে অপূর্ব ও শিউলির যৌনতা ধর্ষণ নয়, স্বজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় তারা এ কাজ করেছে। শিবশঙ্করের কথা শুনে সমবেত জেলেরা সমস্বরে বলে ওঠে দোষী সাব্যস্ত হলে তবে শাস্তি হওয়া দরকার, শুধু অপূর্বর বিচার করা ঠিক নয়। এরপর উপায় না পেয়ে শিবু চেয়ারম্যানকে খবর দেয়। পরদিন বিকেলে চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদিন চৌকিদারকে দিয়ে খবর পাঠায় যে সালিশি বসবে। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় পরমেশ শর্মা প্রথা অনুযায়ী চেয়ারম্যানের কাছে আর্জি জানায়। চৌকিদারও নিয়ম মতো মহেন্দ্র ও পাড়ার সর্দারদের সালিশের দিনক্ষণ জানিয়ে আসে।

দেখা গেল, সালিশি সভার নকুল সর্দার চেয়ারম্যানের কথানুযায়ী দুজন সভা মুখ্যকে নিয়ে শিউলির বয়ান নিয়ে আসে। বয়ানে সে বলে, সেদিন রাতে অপূর্বর ঘরে সে যায়নি, তাদের মধ্যে কোনো যৌন সম্পর্ক হয়নি। বয়ানের ভিত্তিতে চেয়ারম্যান কথা না বাড়িয়ে সর্দারদের সঙ্গে পরামর্শ করে রায় দিলেন, অপূর্ব ও শিউলির মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। অপূর্বের মার খাওয়া অন্যায় হয়েছে। ফলে মহেন্দ্রদের দু'হাজার টাকা জরিমানা এবং সকলকে অপূর্বর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। চেয়ারম্যানের কথা শুনে নিতাই, চণ্ডী ও জোগেন্দ্র হতভম্ব। মহেন্দ্র নিরুপায় হয়ে শাস্তি মেনে নিতে রাজি হয়।

এ ধরনের বিচার যে ন্যায়-অন্যায় মেনে হয়নি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দোষী সাবস্ত্যকারীর বয়ান মেনে বিচার করার পেছনে রয়েছে এক অন্য উদ্দেশ্য। শিবশঙ্করের সঙ্গে চেয়ারম্যানের কথোপকথনে বিষয়টি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে। তার কথায়-

'তোমাদের সমাজ বড়ো কঠিন। এই সমাজে ব্রাহ্মণ আর জেলেতে বিয়ে হয় না। আর হ্যাঁ, এই ঘটনায় অপূর্বর অপরাধও কম নয়। মার খেয়েছে বলে একটি কুমারী মেয়েকে নষ্ট করার অপরাধ থেকে মুক্তি পেতে পারে না অপূর্ব। কিন্তু আমি নিরুপায়। ওর বিচার করতে গেলে মাটির তলা থেকে কেঁচোর পরিবর্তে সাপ বেরিয়ে আসত। তাতে অপূর্ব আর শিউলির দুজনেরই ভবিষ্যৎ-জীবনটা ধ্বংস হয়ে যেত। এই জন্য চোখ বুজে সত্যকে আড়াল করে মিথ্যার বিচার করে গেলাম আমি'। (জলদাস ২০১৯, পৃ. ১২৯)

সমাজের ভালো-মন্দের বিচার যাদের হাতে, তাদের কাছে সমাজ অনুশাসনের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিচার পদক্ষেপ প্রশংসনীয় ও সমাজ কল্যাণের ক্ষেত্রে দূরদর্শিতার পরিচায়ক। সব ক্ষেত্রে অপরাধ প্রমাণ করা বা অপরাধ বিচার করে দণ্ড দেওয়া যে সমীচীন নয়, কিছু ক্ষেত্রে যে মিথ্যের আশ্রয়ে মঙ্গল সাধনও করতে হয় তা চেয়ারম্যানের বিচার সভায় প্রমাণিত হয়েছে। আমরা জানি এ ধরনের অভিযোগে সাধারণত 'ঢেন্ডেরি' নামক শাস্তি হয়। কিন্তু অপূর্বকে প্রহার ও শিউলির মিথ্যে সাক্ষীর ভিত্তিতে ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাদের আরো অপদস্ত করা হয়নি। চেয়ারম্যানের সুবিবেচনায় ঘটনাটির মীমাংসা সেখানেই সম্ভব হয়েছে।

এরকমই একটি ঘটনা 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে চৈতন্য খুড়ার স্ত্রীয়ের সঙ্গে পাশের বাড়ির অবিবাহিত গৌরাঙ্গের অবৈধ যৌন সম্পর্ক প্রকাশ্যে আসে। যথারীতি সালিশি সভায় সর্দাররা রায় দেয়, দোষীদের ঢেন্ডেরি শাস্তি। অন্যদিকে সম্পত্তির ভাগাভাগির বিষয়ে আলোচ্য উপন্যাসে শিবশঙ্কর তার বাড়িতে দশজনের সভা ডাকে। বাস্তু ভিটা পাঁচ ভাগ করা হয় তাদের সামনে। কিন্তু সমস্যা তৈরি করে সীতানাথ ও সত্যব্রত। তারা ভালো জায়গাটা দাবি করে যেটি জেলে সমাজের নিয়মানুযায়ী বড়ো ভাই শিবশঙ্করের পাওয়ার কথা। কিন্তু তারা এই নিয়মে ভাগ মানতে নারাজ। পূর্ণ সর্দার দুই ভাইয়ের উদ্দেশে বলে-

"সুধাংশুর পোলা, বেশি লম্ফঝম্ফ দিয়ো না। আমাগো হাতে ওষুধ আছে তোমার ফড়ফড়ানি থামানোর'। ... 'আগুন পানি বন্ধের ঠেলা তো দেখ নি এখনো'। (জলদাস ২০১৯ পৃ. ৩০০)

এরপর সমস্ত বিবেচনা করে সর্দারের রায় ঠিক হল সম্পত্তি ভাগের সমাধান শিবুর হাতে। সে মানলে সমস্যা নেই, কিন্তু না মানলে প্রথম জায়গার মালিক শিবু। সর্দারদের কথায় শিবু ভাইদের কথা মেনে

নিয়েছে, কারণ সে ভাইদের মধ্যে বিবাদ চায়নি। এইভাবে দশজন সভামুখ্যদের সামনে শিবুদের সম্পত্তি ভাগ হল। আবার 'সুখলতার ঘর নেই' উপন্যাসে জানা যায়,

> 'মানুষের মতো মাছেরও সমাজ আছে, পাড়া-মহল্লা আছে। পাড়ায় সর্দার আছে, মুখ্যও আছে। সমাজনীতি আছে। সর্দার-মুখ্যরা সাধারণ মাছেদের সামাজিক রীতি-পদ্ধতি মেনে চলতে প্রণোদিত করে অথবা বাধ্য করে। সমাজরীতি না মানলে শাস্তি। তবে এই শাস্তি সবার বেলায় সমান নয়। দণ্ড প্রয়োগ নিরীহদের ওপর এক রকম, পেশিওয়ালাদের জন্য অন্য রকম। মাৎস্যন্যায় যাকে বলে, কখনো কখনো সে রকমই অবস্থা হয় মৎস্যসমাজে'। (জলদাস ২০১৯(খ), পৃ. ১১)

আলোচ্য উপন্যাসের আঞ্চলিক পটভূমি জলধি গ্রাম। এই গ্রামের সমাজশাসক ঘোঁওড়া শ্রেণির মাছ। বিনোদ সর্দার তার নাম। বিনোদের আত্মহত্যার পর তার ছেলে পঞ্চানন এই গ্রামের সর্দারিত্ব পায়। উপন্যাসে জানা যায়, সর্দারের ছেলে সর্দার হবে—মৎস্য সমাজের এই প্রথা। বিনোদ সর্দারের পর উত্তরাধিকার সুত্রে পঞ্চানন জলধি গ্রামের সর্দার হয়ে ওঠে। বিনোদ সর্দার বেঁচে থাকতে দেখা যায়- সে প্রতিবেশী গ্রাম মদনগঞ্জে নারী ধর্ষণের সালিশি সভায় যায়। প্রথানুযায়ী ধর্ষিতা সুজলা আর্জি জানায় উচিৎ বিচারের। সেই বিচারে বিনোদ রায় দেয়, কোরালের চোখা ঠোঁট দিয়ে ধর্ষণকারী জিগলুর মাথা গায়ে একশবার আঘাত করে শাস্তি দেওয়ার। সমগ্র জলধি গ্রামে বিনোদ সর্দারের মতোই ইলিশ পাড়ার প্রধান সোমনাথ গ্রামের দ্বিতীয় অবিভাবক। মৎস্যসম্প্রদায় সোমনাথের কাছে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসে ও সমাধান পায়। সোমনাথের মতোই বিভিন্ন জাতের মাছের প্রধান ও মোড়ল আছে। যেমন- কাঁকড়া প্রধান ভীম, গলদা প্রধান বিমল, লইট্যা প্রধান ধনঞ্জয়, প্রভৃতি নানা জাতের প্রধানরা। মৎস্য সমাজের সর্দার মোড়ল বা প্রধানের ওপর আছে জলতলের মহারাজা সুধর্মা তিমি। তার নজরবন্দিতেই মৎস্য সমাজ পরিচালিত হয়। সাধারণ মাছেদের নানা সমস্যা—খাদ্যসমস্যা, বাসস্থানের সমস্যা, দাম্পত্য-কলহ, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, নারী ধর্ষণ, সম্পত্তি নিয়ে কোন্দল—এসব কিছু সমাধানের আশায় মাছেরা সর্দারের কাছে যায়। উপন্যাসের বর্ণনায়-

> 'এই জলের তলায় কত কিছু যে ঘটে যায়! বিশ্বাসঘাতকতা, অপমান, লাঞ্ছনা, তিরস্কার, প্রবঞ্চনা, সম্পত্তি লুণ্ঠন, নারী অপহরণ—কত কিছুই না সংঘটিত হয়!' (জলদাস ২০১৯(খ), পৃ. ৪২)

এসবের বাইরেও মৎস্যসমাজে অর্ণব ব্যাধির সংক্রমণ নিয়ে সর্দার প্রধান তথা সমগ্র মৎস্য সমাজ চিন্তিত। সোমনাথ ইলিশ এই বিষয়ে সমাজের সর্দার মুখ্য, সাধারণদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা বসিয়েছে। পঞ্চু সর্দার এবিষয় নিয়ে কোনো কথা শুনতে চায়নি বলে সোমনাথ হীরামোহন ডাক্তারকে নিয়ে এই সভায় রোগ সংক্রমণকে কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়, তার ব্যবস্থা করেছে। অন্যদিকে উপন্যাসে দেখা যায়, পঞ্চুর সর্দারিতে অনেকেই অখুশি। ফলে মৎস্য সম্প্রদায়ে একধরনের বিশৃঙ্খলা ও বিভেদ দেখা দিয়েছে। মৎস্য

সমাজের বিশৃঙ্খল অবস্থাকে সুস্থির করার লক্ষ্যে পঞ্চু সর্দার প্রীতিবন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য এক মহাসভার আয়োজন করে। সমগ্র মৎস্য সমাজকে আহ্বান করা হয় সভায়। পঞ্চুর এই পদক্ষেপে মৎস্য সমাজে প্রশংসিত হয়।

এ পর্যন্ত জেলেসমাজের সামাজিক অনুশাসনের যে রূপ দেখা গেল, সেখানে একদিকে যেমন অন্যায়-অপরাধের ধরন হিসেবে সালিশি সভার আয়োজন করা হয়েছে, তেমনই বিবাহের মতো সুখবরকে সকলের সঙ্গে ভাগ করার প্রয়াসেও সভা আয়োজিত হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই পরিবারের কর্তাকে সভা নিজ বাড়িতে আয়োজন করতে দেখা যায়। সভা আয়োজনের যে পদ্ধতি আলোচ্য গল্প-উপন্যাসে আমরা দেখলাম, তা নিম্নরূপ-

এক. পাড়ার বিশেষ একজন যে প্রতিবাড়ি গিয়ে সালিশের কথা জানিয়ে আসে, তাকে জেলেপাড়ায় বলা হয়- 'ডাউক্যা'। কখনো কোনো সভার প্রয়োজন হলে 'ডাউক্যা' জেলেদের ডেকে একত্রিত করে। এর জন্য আয়োজক পরিবার তাকে তিন টাকা পারিশ্রমিক দেয়। উত্তর পতেঙ্গা জেলেপাড়ার 'ডাউক্যা' হল যুবরাজ। 'জলপুত্র' উপন্যাসে ভুবন, রামনারায়ণ ও ভোলানাথ যুবরাজকে ডেকে সভার আয়োজন করেছে।

দুই. সালিশি সভা বসার আগে পাড়ার পাঁচজন সর্দারকে আগে থেকেই সমস্যা বা ঘটনার ব্যাপারে অবগত করাতে হয়। ভুবনের সমস্যার ক্ষেত্রে বিজন বহদ্দার তাই জানায়-

> '... আঁরার সমাজত্ তো আরো চাইরজন সর্দার আছে। হিতারারে কথাগিন আগে বুঝাই রাখ'।
>
> (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৬১)

আবার দীনদয়ালের ক্ষেত্রে রামনারায়ণকে দেখা যায়-

> 'অন্যান্য সর্দারদের সঙ্গে কথাটা চালাচালিও করে নিয়েছে ইতিমধ্যে'। (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১২০)

তিন. সালিশি সভার আয়োজককে সর্দারের উদ্দেশে পান, চুন, সুপারি, খয়ের ও বিড়ি প্রভৃতি জিনিস জোগান দিতে হয়। ইতিপূর্বেই আমরা ভুবনকে উক্ত দ্রব্যাদি জোগান দিতে দেখেছি।

আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় হল- সমস্যা, অপরাধ বা অন্যায়ের ধরন হিসেবে শাস্তির বিধান। জেলেসমাজে অপরাধের ধরনের ভিত্তিতে তিন রকম বিচার ও বিধান দেখা যায়।

এক. পারিবারিক সমস্যার বিচারের পর সেই বিচার বা বিধান প্রতিবাদী পক্ষ মেনে না নিলে সেই পরিবারের প্রতি একঘরে করার শাস্তি বিধান। যেমন 'জলপুত্র'-এ গোলকবিহারীর ক্ষেত্রে একঘরে করার শাস্তির হুমকি বা 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে সত্যব্রতকে একঘরে করার ভয় দেখানো, প্রভৃতি।

দুই. অবিবাহিত নর-নারীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক ও গর্ভবতী হওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষ বা নারীটি যদি অবিবাহিত হয়—যেরকম অবস্থাই হোক না কেন, বা তাদের পরিবারের আপত্তি থাকুক না কেন, তাদের বিয়ে করিয়ে দেওয়া। যেমনটা দেখা গিয়েছে তীর্থবালা ও হারাধন এবং হারাধন ও চরণদাসীর ক্ষেত্রে।

তিন. নারী পুরুষের অবৈধ যৌন সম্পর্ক প্রকাশ্যে এলে তার শাস্তি বিধান হিসেবে 'ঢেন্ডেরি'- নামক শাস্তি দেওয়া হয়। যেমনটা দেখা গেল দীনদয়াল ও মঙ্গলী এবং রাইগোপাল ও আঙুরবালার ক্ষেত্রে।

হরিশংকর জলদাস তাঁর 'নোনাজলে ডুবসাঁতার'-এ জেলেসমাজের সামাজিক অনুশাসনের দিকটি সম্পর্কে বলেছেন-

> 'পাঁচজন সর্দার সমাজকে পরিচালনা করত কঠিন হাতে। নিজের ইচ্ছেমাফিক কোনো অন্যায় করে পার পাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। ... সরদারের আদেশ-নির্দেশ অমান্য করার দুঃসাহস কেউ দেখাত না। তাহলেই কঠিন শাস্তি। আগুন-পানি বন্ধ। ... তাই বলে সমাজে ধৃতরাষ্ট্র-দুঃশাসনের অভাব ছিল, এমন নয়। সমাজে ব্যভিচার হতো, অন্যায় হতো। ... ধরা পড়লে অপরাধীর উচিত বিচার হতো। বিচারে অন্যায়কারী শাস্তি পেত'। (জলদাস ২০১৮, পৃ. ৬৭)

দেখা গেল, সমাজে অন্যায়, কুকর্ম বা অপরাধের বিচার করতে গিয়ে সর্দাররা কখনো পক্ষপাতিত্ব করেনি। তারা যথাসাধ্য নিরপেক্ষ বিচার করার চেষ্টা করেছে। এতে জেলেসমাজের সামাজিক অনুশাসনের দিকটিকে যেমন কঠিন করেছে, তেমনই সামাজিক অনুশাসনের ভীতি জেলেসমাজকে নিরাপত্তার বেড়াজালে আবদ্ধ করেছে। ভুবনের মতো একজন অসহায় নারীর প্রতি গোলকবিহারীর অন্যায় কর্মকে সালিশি সভা 'চালবাজ' বলে উল্লেখ করেছে। জমি ফেরানোর বিধান দ্বারা একজন অসহায় নারীর প্রতি যেমন ন্যায় ও সম্মান প্রদর্শিত হয়েছে তেমনই গোলকবিহারীর মতো একজন ঠক-প্রবঞ্চককে একঘরে করার ভয় দেখিয়ে উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যাতে ভবিষ্যতে সমাজের কেউ কারও প্রতি প্রবঞ্চনা না করতে পারে। আবার তীর্থবালার মতো বা চরণদাসীর মতো একজন কুমারী মেয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়া মানে তাদের ভবিষ্যতও যেমন অন্ধকার তেমনই নতুন একটি প্রাণের পিতৃপরিচয়হীনতার অভিশাপও নেমে আসা। ফলে যে পুরুষের জন্য একজন নারী গর্ভবতী হয়ে পড়ে সেই পুরুষের হাতেই তাকে বিবাহের মাধ্যমে সমর্পণ করে দেওয়ার পেছনে একটি নতুন পরিবার গঠন ও তার মধ্য দিয়ে সুন্দর ভবিষ্যৎ তৈরি করার উদ্দেশ্য কাজ করেছে। অন্যদিকে দীনদয়াল ও মঙ্গলীর ক্ষেত্রে যেহেতু দীনদয়াল বিবাহিত সেহেতু মঙ্গলীর জন্য দীনদয়ালের যাতে সংসার না ভাঙে সেদিকেও খেয়াল রাখা হয়েছে। সে কারণেই তাদের বিয়ে দেওয়া হয়নি। আবার মঙ্গলীর দিক থেকেও বিচার করা হয়েছে যে যদি কোনোদিন মঙ্গলীর বিয়ে হয় তাহলে সব জেলেরা মিলে বিয়ের আর্থিক খরচ জোগাবে। সমাজে পাঁচজন সর্দারকর্তৃক এ ধরনের নিরপেক্ষ বিচার ও বিধান সমাজের সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যকেই প্রতিফলিত করেছে। কিন্তু

সাহিত্যে বর্ণিত জেলেসমাজ কাঠামোর বর্তমান পরিস্থিতি পূর্বের মতো আর নেই। সমাজে সর্দারেরা এখন নামমাত্র রয়ে গিয়েছে। লেখক তাঁর আত্মজীবনীতে তাই জানান,

> 'আমি বলছি অনেক বছর আগেকার কথা। এখন ধরা পড়লেও ওরকম শাস্তি কার্যকর করতে পারে না সরদারেরা। সরদারেরা এখন নামে আছে, কামে নেই। বিয়েশাদিতে নিমন্ত্রিত হওয়া ছাড়া সমাজে এখন তারা ঠুঁটো জগন্নাথ। ফলে সমাজে ওরকম ঘটনা ঘটছে, কিন্তু ঘটনাকারীরা শাস্তির মুখোমুখি হচ্ছে না। সমাজে এখন কে কাকে মানে!'
>
> (জলদাস ২০১৮, পৃ. ৬৮)

অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কাঠামোর ভেতরেও একটি বৃহৎ পরিবর্তন হয়েছে।

৩.১.৪.২ পতিতা সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থা

'কসবি' উপন্যাসে দেখি সদরঘাট জেলেপাড়ার একেবারে গা ঘেঁষেই ছিল কাস্টম্‌স হাউস। কর্ণফুলীর তীরে ভিড়ত দেশি-বিদেশী পণ্যবাহী জাহাজ। জাহাজে করে আসত সাহেবরা। কালক্রমে এই দেহলোভী সাহেবদের আগ্রাসনে সদরঘাট জেলেপাড়াটি পতিতালয়ে পরিণত হয়েছে। পতিতালয়ে পরিণত হওয়া সদরঘাট জেলেপাড়াটি বর্তমানে সাহেবপাড়া পতিতাপল্লি নামে পরিচিত। 'কসবি' উপন্যাসের পটভূমি এই সাহেবপাড়া পতিতাপল্লি। উপন্যাসে জানা যায়, সাহেবপাড়ায় বর্তমানে দুটো গলি- পূর্বগলি ও পশ্চিম গলি। পশ্চিমের গলিতে থাকে সস্তা মুল্যের পতিতারা এবং পুবগলিতে জৌলুস ও নষ্টামির মূল কেন্দ্র। দালাল, মস্তান, বেশ্যা ও কাস্টমারের ভিড়ে গলিটি সর্বদা ব্যস্ত। উপনাসের বর্ণনা অনুযায়ী,

> 'জটিলা এই বেশ্যাপাড়ার প্রথম মাসি। বয়স হয়ে গেলে দেহজীবিনীরাই মাসি হয়। যে জটিলা একদা ম্যাগ্রিজ দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছিল, শরীর বেচাকেই যে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল, শরীর থেকে যৌবন তিরোহিত হলে জটিলাই মাসি হয়ে গিয়েছিল'। (জলদাস ২০১১,পৃ. ৪৪)

জটিলার আশ্রয়ে পাঁচ সাতজন পতিতা দেহব্যবসা চালাত। জটিলার পর অনেকটা সময় পার হয়ে বর্তমানে সাহেবপাড়ায় ত্রিশজন মাসি অসহায় অন্যায় সহিষ্ণু। কিন্তু সাহেবপাড়ার মোহিনী মাসি প্রতিবাদী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। পাড়ার সর্দার মস্তানদের সে ভয় পায় না। জানা যায়, সাহেবপাড়ার বেশ্যাপল্লির সর্দার হল কালু। তার সঙ্গে পাঁচ ছয়জন পোষা মস্তান থাকে। বেশ্যাপাড়ায় মোহিনী মাসি ছাড়া টাকে সকলে সমীহ করে চলে বা বলা ভালো সমীহ করতে ভয় পায়। কারণ কালু সর্দার অসৎ, হিংস্র, খুন জখম পরায়ণ ও লোভী।

টাকার জন্য সে সব করতে পারে। প্রয়োজনানুসারে সে নিয়ম তৈরি করে, আবার ভঙ্গ করে। অর্থাৎ বেশ্যাপাড়ায় একচ্ছত্র আধিপতি কালুসর্দার। সামাজিক অনুশাসনে তাঁর কথাই শেষ কথা।

(ক) পতিতাপল্লির সমাজে পতিতাদের দৈনন্দিন জীবন চিত্রটি 'কসবি' উপন্যাসে দেখা যায়। একটি খোলা জায়গায় অবস্থিত বড়ো ও গভীর একটি পাতকুয়ার সামনে সকালে পতিতারা একে একে এসে জড়ো হয়। তারা রাতের পুরুষ বর্জ্য এই কুয়ার জলে পরিষ্কার করে। বাঁধানো একটি স্থানে তাদের জামাকাপড় ধোয় ও স্নান সারে। জানা যায়-

> 'প্রতি সকালের দৃশ্য এটি। খুব সকালে মেয়েদের জটলা হয় না এখানে। শরীরে অত্যাচার এবং অশেষ ক্লান্তি নিয়ে গভীর রাতে ঘুমাতে যায় ওরা। সকালবেলায় অধিকাংশ মেয়ে ঘরে কাস্টমার তোলে না। ...সকালে ঘরে কাস্টমার না তোলা—এ পাড়ার দীর্ঘদিনের রেওয়াজ। মাসিরা বলে—দিনেও কাস্টমার তুললে মেয়েদের শরীরের সজীবতা নষ্ট হয়ে যায়'। (জলদাস ২০১১,পৃ.৭২)

দেখা যায় সারারাতের ক্লান্তি নিয়ে মেয়েরা সকালে তাই দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। পতিতাদের কুয়াপারে আসার আগে খুব সকালে জলমেয়েরা কুয়োর জল নিতে আসে। এরা পতিতা পাড়ায় জল সরবরাহকারী। তাছাড়া পতিতাদের ফায়ফরমাস খাটে তারা। পতিতা পল্লিতে এই জলমেয়েদের খুব কদর। কারণ তাদের আনা জল দিয়ে পতিতারা রাতের অতিথিদের বর্জ্য জামাকাপড় ও শরীর ধুয়ে পরিষ্কার করে। তারপর সেই কুয়া পাড়ে একে একে পশ্চিম গলি থেকে আসে ইলোরা, আইরিন, বনানী, বেবী, মমতাজ, মার্গারেট নামক পতিতারা। পতিতাদের এই জমায়েতে গতরাতের কাস্টমারদের সঙ্গে নানা ঘটনা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় তারা। কখনো তারা নিজেদের শারীরিক গঠনের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনায় মশগুল হয় আবার কখনো দেখা যায়, মমতাজের বুকে-স্তনে কাস্টমারদের সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়ার চিহ্ন। প্রতি সকালে প্রতিনিয়ত এই দৃশ্য পতিতাপল্লির জীবন চিত্রের একটি অংশ হিসেবে বিদ্যমান।

(খ) পতিতাপল্লির নিশিজীবন বর্ণময়। রহমানের পানের দোকানের সামনে সন্ধ্যা থেকেই ভিড় জমতে থাকে। বেশ্যা, মস্তান, দালাল, বাধাবাবুদের আনাগোনা শুরু হয় পুব- পশ্চিম গলিতে। সস্তা পতিতারা কাস্টমারদের জামা হাট ধরে টানাটানি করে। দালালরা নানা রকম কথার ছলে কাস্টমারদের পচ্ছন্দসই পতিতার ঘর দেখিয়ে দেয়। এইভাবে শুরু হয় পতিতাদের নিশিজীবন। কামবাসনার কাছে ধর্ম-শিক্ষা-সমাজ-বয়স কিছুই বাধ মানে না। ফলে পতিতাপল্লিতে নানা ধর্মের অর্থাৎ হিন্দু- মুসলিম- খ্রিস্টান- বৌদ্ধ ধর্মের কাস্টমার ও তাদের মধ্যে বিচিত্র পেশার কিশোর- যুবক- প্রৌঢ়রা আসছে। শুধু তাই নয়, ডাক্তার, গন্যমান্য নেতা, সমাজসেবী, শিক্ষক, সাংবাদিকও তাদের যৌনাকাঙ্খাকে চরিতার্থ করতে সাহেবপাড়ায় দেখা যায়। অন্ধকার জগতের লোকজন অর্থাৎ চোর-ডাকাত-খুনিও নারীদেহের লোভে এই পতিতাপল্লিতে

আনাগোনা করে। এর মধ্যে ব্যতিক্রমী কাস্টমারও রয়েছে যারা কেবল চুক্তি করা পতিতাটির পাশে চুপ করে বসে থাকে। সময় হলে তার পাওনা মিটিয়ে চলে যায়। সাহেবপাড়ার এরকম একজন কাস্টমার রাজন ভৌমিক। পতিতাপল্লির চম্পা নামক পতিতার সঙ্গে তার এই ধরনের ব্যতিক্রমী চুক্তি হতে দেখা গিয়েছে। নিশিজীবনের এই চিত্র উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে এভাবে-

> ‘প্রতিরাতে রাতকুটুমদের নিয়ে এই পল্লির মেয়েরা বারোয়ারি শয্যায় বিনিময়ের খেলা খেলে। ... মদ, বমি, সিগারেটের শেষাংশ আর বাসি ফুলের গন্ধে পতিতাদের ঘরগুলির চেহারা পাল্টে যায়। ... এলোমেলো বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে পতিতারা। দিনের আলো ফুটতে না ফুটতে আরেকটা রাতের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় এই বেশ্যাপাড়ায়’।
>
> (জলদাস ২০১১,পৃ. ৭৮)

(গ) সাহেবপাড়া পতিতাপল্লিতে যে পতিতারা থাকে তারা বেশিরভাগই প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে এই পতিতাপল্লিতে এসে উঠেছে। কেউ আশ্রয়হীন হয়ে, আবার কেউ স্বেচ্ছায় এই অন্ধকার জগতে পা বাড়িয়েছে। বিজলী, চম্পা, ইলোরা, দেবযানী প্রভৃতি পতিতারা প্রবঞ্চিত, প্রতারিত বা ধর্ষিত হয়ে পতিতাপল্লিতে পর্যবসিত হয়েছে। বিজলীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, সে কুষ্টিয়ার এক দারোগার মেয়ে ছিল। কলেজে ফাস্ট ইয়ারে পড়ার সময় তাঁর বাবা এক মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্রকে গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। ঘটনাক্রমে সেই গৃহশিক্ষকের সঙ্গে যৌনতাসূত্রে বিজলী গর্ভবতী হয়ে পড়ে। তার বাবা বিজলীর গর্ভপাত করিয়ে জোর করে বিয়ে দিতে চাইলে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে ঢাকায় এক মহিলা সমাজসেবীর কাছে আশ্রয় নেয়। তার সুপারিশে বিজলী এক ভদ্রলোকের অফিসে চাকরি পায়। সুযোগ বুঝে মালিক বিজলীকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করতে থাকে। অত্যাচারিত হয়ে সেখান থেকে বিজলীর আশ্রয় হয় সাহেবপাড়ায়। অন্যদিকে সৈয়দপুরে বাড়ি ছিল চম্পার। তার বাবা বিহারি। ছয় বোনের এক বোন হল চম্পা। অভাব-অনটনের সংসারে যুবতী চম্পার প্রতি নজর পড়েছিল নুর আলীর। তার হাত ধরেই সে ঘর ছেড়েছিল, তারপর প্রতারিত হয়ে চম্পার স্থান হয় সাহেবপাড়ায়। ইলোরাকেও একইভাবে এই পতিতাপল্লিতে আশ্রয় নিতে দেখা যায়। জানা যায়, তার আসল নাম উমা প্রু চাকমা। রাঙা মাটির প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে সে। এক বাঙালিবাবুর প্রেমে পড়ে সে ঘর ছাড়ে। পরে সেই প্রেমিক তাকে এই পতিতাপল্লিতে বিক্রি করে দিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবযানী নাম্নী পতিতারও একটি জীবন ইতিহাস পাওয়া যায়। জানা যায়, বীরপুরের জেলেপাড়ার শৈলেশ ও যশোদার জ্যেষ্ঠ কন্যা কৃষ্ণা অভাবের তাড়নায় বিবাহিত এক ফল বিক্রেতা তপনের জালে জড়িয়ে যায়। তপন তাকে

বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সাহেবপাড়ায় শামছু দালালের কাছে বিক্রি করে দেয়। পরে শামছু কৃষ্ণাকে কালু সর্দারের কাছে চড়া দামে বিক্রি করে। কালক্রমে কৃষ্ণা হয়ে ওঠে দেবযানী—দামি ও রূপসী বেশ্যা।

এ প্রসঙ্গে জটিলার কথাও বলতে হয়, যে সাহেবপাড়ার প্রথম মাসি। সাহেবপাড়ার পাশেই পূর্বে পূর্বপাড়া নামে এক জেলেপল্লির রাইচরণের স্ত্রী ছিল সে। বিদেশী জাহাজের নাবিক ম্যাগ্রিজ সেই জেলেপাড়ার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় জটিলাকে উঠান ঝাড় দিতে দেখে তাকে ধর্ষণ করে। জেলেপাড়ার সর্দার মুখ্যরা তাদের একঘরে করল। নদীতে মাছ ধরার অধিকার হারিয়ে অভাব অনটন ও সামাজিক নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে জটিলা সিদ্ধান্ত নিল-

> '...সমাজ যখন তাদের কোনো সাহারা দিল না, উপরন্তু ভাত কেড়ে নিল, তাহলে আর সমাজ কেন? শরীর বিকানোর কাজই করবে সে, বেশ্যাই হবে। জেদ এবং অভাবে পড়ে শেষ পর্যন্ত বেশ্যাই হয়ে গেল জটিলা'।
>
> (জলদাস ২০১১, পৃ. ৪১)

মোহিনী মাসির ক্ষেত্রে দেখা যায় সে একসময় উত্তর পতেঙ্গা জেলেপাড়ার এক সাধারণ জেলেনারী ছিল। তার সংসার ছিল, স্বামী ছিল। অভাবের তাড়নায় আব্দুল গফুরকে প্রশয় দিয়েছিল সে। অবৈধ সম্পর্ক প্রকাশ্যে আসায় ঢেন্ডেরি শাস্তি হল তাদের। তারপর স্বামীকে নিয়ে একদিন বেশ্যাপাড়ায় স্থান পাকা করে নিল মোহিনী। প্রথম দিকে বেশ্যাবৃত্তি করে বর্তমানে এ পাড়ার মাসি হয়ে উঠেছে। আবার শৈলবালা মাসির ক্ষেত্রে দেখা যায়, বরিশালের বাড়ি ছিল তার। দত্ত পরিবারের মেয়ে শৈল বিয়ের আগে তার এক দুঃসম্পর্কিয় কাকার সঙ্গে যৌন সম্পর্কে গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল। ঘর ছেড়ে ভাসতে ভাসতে এসে এই পতিতাপল্লির নিরালা মাসির কাছে আশ্রয় পায় সে।

দেখা গেল, সাহেবপাড়া পতিতাপল্লির অধিকাংশ পতিতাই সাধারণ ঘরের মেয়ে-বউ ছিল। প্রেম-অবৈধ সম্পর্ক, অভাবের তাড়নায় নারীদের সুযোগ নেওয়া বা ধর্ষণের মতো কারণে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে অসহায় অবস্থায় বিক্রি হতে হয়েছে তাদের। তারা নিজেদের দেহকে বিক্রি করেছে বেঁচে থাকার তাগিদে। স্বাভাবিক সমাজ থেকে বেরিয়ে এক কৃত্রিম সমাজের বেড়াজালে পতিতা রূপে বন্দি হয়ে গিয়েছে সাধারণ ঘরের কন্যা স্ত্রীরা। পতিতাপল্লিতে এসে একজন পতিতার কী অবস্থা হয় এবং সমাজের কোথায় পতিতাদের স্থান হয় শেষ পর্যন্ত, তার বর্ণনা উপন্যাসে পাওয়া যায় এই ভাবে-

> 'নারীদের দেহবেসাতি পৃথিবীর আদিম ব্যবসা। ... এই ব্যবসায় লিপ্ত মেয়েরা হতভাগ্য, সমাজের করুণার পাত্র তারা; আর এই মেয়েরাই ধনী, শিক্ষিত অথচ উচ্ছৃঙ্খল মানুষের ফুর্তি ও তৃপ্তির খোরাক জুগিয়ে নিঃশেষ হয়। বিনিময়ে তারা সামান্য টাকা পায়। প্রাপ্ত টাকার আবার নানা অংশীদার—মাসি, দালাল, সর্দার, গুন্ডা, থানা ইত্যাদি। ... পতিতাই হল দেহব্যবসার কেন্দ্র। তাদের ঘিরে আবর্তিত হয় মাসি-দালাল-মাস্তানরা। এদের হারানোর কিছুই নেই; হারাতে হয়

পতিতাকেই। তাকে ঘিরে যারা আবর্তিত হয়, তারা শোষণকারী। শোষণকাজ শেষ হলে যৌবনহীন পতিতাকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে তারা একমুহূর্ত দ্বিধা করে না। পতিতাপল্লির কোনো ঘর কখনো খালি থাকে না; এক পতিতা যায় তো অন্য পতিতা এসে সে জায়গা পূরণ করে'। (জলদাস ২০১১,পৃ.১০৬)

যৌবনহীন রোগগ্রস্ত পতিতা দেবযানীকে কালুসর্দার ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। যে দেবযানী একটা সময় কালু সর্দার তথা সমগ্র বেশ্যা পাড়ার দামি বেশ্যা ছিল, যে একটা সময় কালুকে প্রচুর টাকা উপার্জন করিয়েছে- তার কঠিন সিফিলিস রোগ হলে শৈলমাসি ও কালু সর্দার চক্রান্ত করে চম্পার সঙ্গে কৃত্রিম ঝগড়া লাগিয়ে দেবযানীকে বিতাড়িত করেছে। ছুঁড়ে ফেলেছে আস্তাকুড়ে। এখানে স্পষ্ট হয় শৈলমাসি ও কালুর স্বার্থপরতা ও হিংস্রতা। একসময় নাম করা বেশ্যা দেবযানীকে এভাবে বিতাড়িত করার মধ্যে দিয়ে হরিশংকর জলদাস পতিতা সমাজের বাস্তব সত্যকেই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। পতিতাপল্লিতে পতিতাদের কেন্দ্র করে যা ঘটে তা আসলে মাসি-সর্দার-মস্তানদের স্বার্থপরতা বা প্রতিশোধস্পৃহার কারণেই। সেই জন্যই তো মোহিনী মাসি দেবযানীকে আস্তাকুড় থেকে তুলে এনে শহরের নাম করা ডাক্তার দেখিয়ে সুস্থ করে কালুর প্রতি প্রতিশোধ নিয়েছে। আমরা দেখলাম একজন পতিতার সহকর্মী, সহযোগী থাকলেও সহমর্মী কেউ নেই। মোহিনীর মতো জীবনদাত্রীকে দেবযানী কিছু সময়ের জন্য মায়ের মর্যাদা দিলেও পরক্ষণেই তা উবে গিয়েছে। কারণ পতিতাবৃত্তির জন্যই মোহিনীমাসি তাকে সুস্থ করে তুলেছে, মুক্তি দেওয়ার জন্য নয়। দেবযানী উপলব্ধি করতে পেরেছে যে এ শুধুই যেন হাত বদল, মুক্তি নেই।

'মায়ের চেহারা দেবযানীর মন থেকে মুছে গেছে। সে জায়গায় মোহিনীর চেহারা জ্বলজ্বল করে। ... এই জীবন থেকে মুক্তির কোনো পথ নেই। কালু সর্দারের হাত থেকে মোহিনী মাসির হাতে, ভবিষ্যতে হয়তো মোহিনী মাসির হাত থেকে আরেক কোনো মাসি বা মাস্তানের হাতে বন্দি হয়ে থাকতে হবে তাকে। ঘূর্ণয়মান এই বন্দি খাঁচাতেই একদিন মৃত্যু হবে তার'। (জলদাস ২০১১, পৃ.১১৪)

অন্যদিকে 'মোহনা' উপন্যাসে লক্ষ করি বিদ্রোহী কৈবর্ত্যদের কথা বলতে গিয়ে মোহনা নামক বারবনিতা ও বারাঙ্গনাপল্লির কথা এসেছে। উপন্যাসে একাদশ শতাব্দীর পটভুমিতে আলোচ্য বারাঙ্গনা পল্লিটি রাজ্যের বাইরে বারাঙ্গনাপল্লির অবস্থান হলেও তারা নগরের শোভা। উপন্যাসে জানা যায়-

'নারীদেহে যেমন অলংকার, নগরদেহে তেমনি বাররামা। রাজসভায় বা কোনো উৎসবের আসরে এই নগরলক্ষ্মীরা সুরসিক নাগরিকদের নাচে-গানে মুগ্ধ করে। আবার শয্যাসঙ্গিনী হয়ে নাগরিকদের দেহসুখ দেয়। ... তাদের অন্য ভূমিকাও আছে। রাজার হয়ে গুপ্তচরের কাজও করে তারা'। (জলদাস ২০১৩, পৃ. ১৮)

উপন্যাসে যে বারাঙ্গনাপল্লির উল্লেখ আছে, সেখানকার প্রধানা জানকি মাসি। 'কসবি' উপন্যাসের মোহিনী মাসির মতো সেও প্রথমে এই পল্লির বারাঙ্গনা ছিল। বর্তমানে চল্লিশ-পঞ্চাশজন পতিতা তার অধীনে দেহব্যবসা করে। আসলে পৃথিবীর সর্বদেশের, সর্বকালের পতিতাপল্লির সারকথা যেন একটিই—ভোগের পর তাদের ছুঁড়ে ফেলা। 'মোহনা' উপন্যাসেও দেখি একই চিত্র,

> 'ডমরনগরের এই বারাঙ্গনাপল্লির মেয়েরা জানে, তারা ভোগের সামগ্রী। ভোগের পর আবার ছুড়ে ফেলারও। মোহনা, কুন্তী, জানকি, অলকা, সুবর্ণা, দময়ন্তী, উর্বশী, অঙ্গনা, মেনকারা জানে, সমাজে তারা আদরণীয়। তবে এই বাস্তব সত্যকেও এরা ভুলে যায় না যে সমাজ- মানুষদের কাছে তাদের কদর তত দিন পর্যন্ত, যত দিন তাদের গতরে যৌবন আছে, ...' (জলদাস ২০১৩, পৃ.১৯)

জানা যায়, বারাঙ্গনাদের প্রতি নিরাপত্তার কড়া নজর জানকি মাসির। পল্লির চারিদিকে সুউচ্চ পাচিল ও দক্ষিণে একমাত্র প্রবেশদ্বার। সেই প্রবেশদ্বারের ওপর থেকে কয়েকজন পুরুষ সতর্ক নজর রাখে। এই পুরুষেরা কোনো না কোনো বারাঙ্গনার জারজ সন্তান। জানকি এই প্রহরীদের ভরণ পোষণ করে। দেখা যায়, কোনো অতিথি দেহ ভোগের পর টাকা না দিলে বা কম দিলে এই পুরুষেরা এগিয়ে আসে। এদের সতর্ক দৃষ্টিতে কোনো অতিথিদের অন্যায় করে পার পাওয়ার উপায় নেই।

বারাঙ্গনাপল্লিতে যে সব পতিতারা বাস করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই হয় কুড়িয়ে পাওয়া অথবা পরিবারকে হারিয়ে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় এই পল্লিতে আশ্রয়ের আশায় আগত বা কখনো পাশের গ্রাম থেকে চুরি করে আনা কন্যা শিশু এরা। উপন্যাসে দেখা যায়, জানকির সামনে হঠাৎ একদিন একটি কালো বর্ণের ডোমের মেয়ে কালিন্দীর দক্ষিণপার থেকে এসেছে আশ্রয়ের জন্য। তার স্বামী মদ খেয়ে মারা যাবার পর থেকে তার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। আবার জানকি মাসির ক্ষেত্রে দেখা যায়, যশোদা মাসি তাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে আপন সন্তান হিসেবে পালন করেছে। আবার একসময় সনকা মাসি গাঙ্গি নামক গ্রাম থেকে মোহনাকে শিশু অবস্থায় চুরি করে নিয়ে আসে এই পল্লিতে। সনকার কাছ থেকে জানকি মাসি মোহনাকে কিনে নেয়।

(ঘ) কসবি উপন্যাসে পতিতাপল্লির একটি অন্ধকার দিকও রয়েছে। যার মূলে আছে কালু সর্দার ও তার পোষা গুন্ডা-মস্তানরা। সাহেবপাড়া চোর-গুণ্ডাদের আঁতুড়ঘর। মারপিট, ছিনতাই, খুন-জখম প্রায়শই ঘটে থাকে। উপন্যাসের বর্ণনা অনুযায়ী-

> 'সাহেবপাড়াটি চুরি, বাটপাড়ি, মারপিট, ছিনতাই, অন্যায়-অত্যাচার, ধর্ষণ, মেয়ে বিক্রি, বেআইনি মদ ও মাদকদ্রব্য বিক্রি—সবেরই অবাধ দুর্গ। এটি চোর, ডাকাত, খুনি, গুন্ডা, মাস্তানদের স্বাধীন বিচরণক্ষেত্র আর নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রও। জোরাখুনের আসামি কোর্ট থেকে পালিয়ে এখানে আশ্রয় নেয়'। (জলদাস ২০১১, পৃ. ৯৪)

দেখা যায়, কোনো অপরাধী পুলিশের তাড়া খেয়ে বা শহরের কোনো নামকরা গুণ্ডারা রাজনৈতিক পালাবদলের ভয়ে এই সাহেবপাড়ায় আশ্রয় নেয়। প্রচুর টাকার বিনিময়ে কালু সর্দার তাদের লুকিয়ে রাখে মন্দিরের পিছনের একটি একচালা ঘরে। কালুর সঙ্গীরা তাদের দেখাশুনা করে। পতিতাপল্লির মন্দিরের পিছনের এই একচালা ঘরটি আসলে কালু সর্দারের 'নীতি নির্ধারণী ঘর'। জানা যায়, রাতের অন্ধকারে কালু সর্দার তার পোষা গুন্ডা মস্তানদের সঙ্গে এই ঘরে বসে ঠিক করে- কোন পতিতার দেমাক কমাতে হবে, কোন মস্তানকে শায়েস্তা করতে হবে, কোন বাঁধাবাবুকে ধমকে দিতে হবে। আবার তার নির্দেশ মতো কাজগুলো ঠিকঠাক হয়েছে কিনা তা পরের দিন রাতে খবর নেয় সে। সর্দারের এই দুষ্কর্মের কথা আর কেউ না জানলেও মন্দিরের পুরহিত জানে। কিন্তু তার অত্যাচার ও শাসনের ভয়ে পুরোহিত এর প্রতিবাদ করতে পারে না।

(ঙ) পতিতাপল্লির সামজিক অনুশাসনে কালু সর্দারের ভূমিকা প্রধান। তার পোষা গুন্ডা-মস্তানদের পরের স্থানে রয়েছে মাসিরা যাদের তত্ত্বাবধানে পতিতারা আশ্রিত। পতিতাদের ব্যবসার কাজে দালালদের একটি বড়ো ভূমিকা রয়েছে। উপন্যাসে জানা যায়, এই দালালদের মধ্যে কোনো সহানুভূতি নেই-

> 'তারা নরকের কীট, গুয়ের পোকা। তাদের কানে কোনো অসহায় নারীর হাহাকার পৌঁছে না। নারীর দৈহিক পবিত্রতার কোনো মুল্য নেই তাদের কাছে। তাদের কাছে নারী মানে বেচাকেনার পণ্য'। (জলদাস ২০১১, পৃ. ১২৮)

তাইতো শামছুর মতো দালাল যখন কৃষ্ণাকে হোটেল থেকে উদ্ধার করে তখন সে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয় না বরং তপনের কাছ থেকে কিনে নেয় এবং পরে সাহেবপাড়ায় এসে কালু সর্দারের কাছে চড়া দামে বিক্রি করে দেয়। এই শামছুই একসময় বিজলীর দালাল ছিল। বিজলীর জন্য ধনী-শিক্ষিত কাস্টমার ধরে আনত এই শামছু। বদলে তার ভরণপোষণ চালাত বিজলী। এরকমই আমরা মোহিনী মাসির দালাল আইয়ুবকে দেখেছি। সে মোহিনীর রূপ ও দেহ সৌন্দর্যের বর্ণনা করে ধনী-শিক্ষিত ও ভদ্র কাস্টমারদের মোহিনীর কাছে নিয়ে আসে। আবার সেলিম প্রথমে মোহিনী মাসির আশ্রিতা রীতাকুমারীর দালাল ছিল। পরে এই সেলিমকেই মোহিনী দেবযানীর দালাল বানাল। সে দেবযানীর জন্য ধনী কাস্টমারের খোঁজ আনে। এভাবেই চক্রাকারে চলতে থাকে পতিতা সমাজের অন্তরমহল ও বহির্মহল। সমাজের প্রয়োজনে, সমাজদ্বারা সৃষ্ট পতিতাপল্লি সমাজের কাছেই ঘৃণ্য ও প্রান্তিক। সাম্প্রতিককালেই নয় প্রাচীনকাল থেকেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নিজেদের বিনোদন ও কামবাসনার্থে পতিতাপল্লি সৃষ্টি করেছে। উপন্যাসে তাই স্বাভাবিকভাবেই বর্ণিত হয়-

'রম্ভা, মেনকা, উর্বশীর মাধ্যমে স্বর্গে বেশ্যাবৃত্তি শুরু হয়েছিল। রামায়ণ মহাভারতীয় যুগেরও আগে শুরু হওয়া বেশ্যাবৃত্তি পৌরাণিক যুগ পেরিয়ে, মুঘল-পাঠান-ব্রিটিশ যুগ অতিক্রম করে আজ আধুনিক যুগেও সগৌরবে চলছে। স্বর্গ থেকে বেশ্যাদের পতন হয়েছে আজ এই জটিল মর্ত্যে। ... বেশ্যাপল্লিতে ইলোরা, সালমা, মমতাজ, মোহিনী, দেবযানী, বনানী, মার্গারেট, জুলিয়েট নামে তাদের দেহগুলো তুলে দিচ্ছে মানুষ নামধারী কামান্ধ পশুদের হাতে'।

(জলদাস ২০১১, পৃ. ১০৯)

বেশ্যাবৃত্তির প্রধান কেন্দ্র হয়েও বিনিময়ে পতিতারা পায় সর্দার-মাসি দ্বারা অত্যাচার, নিপীড়ন। যত রোগ-শোক সব পতিতাদের জন্য। পতিতাদের দেহ বিক্রির টাকার নব্বই শতাংশই কেড়ে নেয় সর্দার- মস্তান-মাসিরা। সেই টাকায় তারা বড়ো বড়ো বাড়ি গাড়ি কিনে স্বচ্ছন্দে থাকে, মাছ, মাংস, পোলাও এর মতো সুখাদ্য খায়। কিন্তু পতিতারা এসব থেকে বঞ্চিত হয়ে রঙচটা, পলেস্তরা খসা ছোটো খুপরিতে দিন কাটায়।

'মোহনা' উপন্যাসে পতিতাদের সমাজ সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া না গেলেও 'কসবি' উপন্যাসে সমাজচেতনা গভীর ও বিস্তৃত। আলোচ্য উপন্যাসের সমাজচেতনা কোনো স্তর থেকে ব্যাখ্যাত- সেই প্রশ্নের উত্তরে 'একুশে পত্রিকা'-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে হরিশংকর বলেন-

'আমরা তথাকথিত শরীরলোভী কাম-জর্জর ভদ্দরনোকরা তাদের শরীর ঘাঁটি, মনের হদিস নিই না। প্রয়োজন মিটিয়ে রুমালে মুখ ঢেকে ধোয়া তুলসিপাতা হয়ে পারিবারিক মূলস্রোতের সঙ্গে মিশে যাই। ওই দূরে রেড এরিয়াতে পড়ে থাকে রক্ত-পুঁজ মাখা শরীর নিয়ে কসবিরা'। (জলদাস ২০১২(ক), পৃ. ৭৬)

৩.১.৪.৩ মেথর সমাজ ও সমাজব্যবস্থা

মেথর সমাজের দিকে দৃষ্টি দিলে প্রথমেই যে বিষয়টি উঠে আসে তা হল তাদের প্রতি তথাকথিত ভদ্র সমাজের ঘৃণা ও অস্পৃশ্যতা প্রদর্শন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, যেখানে তাদের মানুষ বলে মনে করা হয় না। শত কষ্ট সহ্য করেও মেথররা সমাজের সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করে বলে তাদেরকেও নোংরা বা আবর্জনার সঙ্গে তুলনা করা হয়। মেথরদের জীবন তাই কাকের জীবনের সঙ্গে তুলনীয় হয়েছে উপন্যাসে। আমরা জানি, কাককে বলা হয় ঝাড়ুদার পাখি। কাকের নিজের কোনো বাসা নেই, কোকিলের বাসায় ডিম পারে তারা। সেরকমই যেন মেথরদের জীবন ও সমাজ। উপন্যাসে তাই গুরুচরণ মেথর জীবনকে কাকের জীবনের সঙ্গে তুলনা করে।

'আমরা আর কাকরা সমান। সকাল হবার সাথে সাথে ওরা ময়লা-আবর্জনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর সকাল হলে আমরা কী করি? কাঁটা, টুকরি, বেলচা-কোদাল নিয়ে এই আবর্জনা সাফাইয়ে লেগে যাই। রাস্তার পাশে পড়ে থাকা গু

খায় কাকরা। আর আমরা সেই গু মাথায়- কাঁধে করে ছিপাতলির কুয়ার দিকে রওনা দিই। কাকদের সাথে আমাদের পার্থক্য আছে কি কোনো?' (জলদাস ২০১২, পৃ. ৬৫)

কাকদের মতো মেথররা একপ্রকার বাস্তহারা। এক পরিবারে অনেক মানুষ থাকলেও শোবার ঘর একটি। মেথরদের অন্তর্জীবন যতটা সংকীর্ণ, সামাজিক জীবন ততটাই সংকীর্ণ। সামাজিক চাপে মেথররা দিশেহারা, সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন ও উন্মূল। আনন্দ-দুঃখ-বেদনা নিজেদের মধ্যেই ভাগ করে তারা তৃপ্ত হয়। এরই মধ্যে মেথরদের মধ্যে মানসিক শক্তি জাগায় হরিজনপল্লির সত্তর বছর বয়সী চিরকুমার পুরোহিত বাবাঠাকুর। মেথররা তাকে খুব ভক্তি করে। নানা সমস্যা বা বিপদে মেথরা বাবাঠাকুরের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ পায়। তাইতো বাবাঠাকুরের অসুস্থতায় রামগোলাম ডাক্তারের পায়ে ধরে বলে-

'উনি মরলে হরিজনদের সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। তিনি আমাদের রাস্তা দেখানেওয়ালে'। (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৩৪)

হরিজনদের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক। তবে নারীদের গুরুত্ব মেথরদের কাছে অপরিসীম। বিশেষ করে কুমারী মেয়েরা মেথর সমাজের কাছে রত্নস্বরূপ। তাদের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা সমাজে দণ্ডনীয় অপরাধ। দেখা যায় সামাজিক অনুশাসন বজায় রাখার ক্ষেত্রে জেলে সমাজের মতোই মেথর সমাজেও সর্দার মুখ্যরা আছে।

'হরিজন-সমাজ পুরুষশাষিত। সেই সমাজের ক্ষমতাধর ব্যক্তিটি হলো সর্দার। মুখ্যরা তার পরামর্শক। সহায়ক শক্তিও'। (জলদাস ২০১২, পৃ. ৮৩)

সমাজ কল্যাণ ও অনুশাসনে সর্দার মুখ্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। যেমন মনুলালের বোনাই জনি ঝাউতলা মেথরপট্টির রূপলালের মেয়ে রূপালির শ্লীলতাহানির চেষ্টা করলে পট্টির অন্যান্যদের কাছে ধরা পড়ে সে। সেই সন্ধ্যাতেই সর্দার মুখ্যদের নিয়ে সালিশ বসে এবং জনিকে মাথা মুড়িয়ে পট্টি ছাড়া করা হয়। সর্দারের বিচারের কেউ প্রতিবাদ করে না, কারণ এই জঘন্য অপরাধের পক্ষে কথা বললে তাকে একঘরে করা হবে। জেলে সমাজের সামাজিক অনুশাসনের ক্ষেত্রও আমরা একই শাস্তি বিধান লক্ষ করেছি। জেলে সমাজের মতোই মেথর সমাজেও মাঝে মধ্যেই এরকম অবৈধ যৌন সম্পর্ক ধরা পড়ে। সেক্ষেত্রে মেয়ে ও ছেলে অবিবাহিত হলে তাদের বিয়ে করিয়ে দেওয়া নিয়ম। কিন্তু কেউ যদি জোর পূর্বক কোনো নারীর দিকে লালসার হাত বাড়ায় এবং নারী তা প্রত্যাখ্যান করে, তবে পুরুষটিকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়। জনির ক্ষেত্রে সেই ঘটনাই ঘটেছে-

''ওই সন্ধেয় সালিস বসল ঝাউতলার পট্টিতে। চারটা পট্টি থেকে মুখ্যরা এল, গণ্যমান্যরা এল। জবানবন্দি নেয়া হলো দুজনের। নিচতলার অন্যান্য ঘরের নারীরা জনির বেলেল্লাপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। দোষী সাব্যস্ত হলো জনি। সবাই

সর্দারের দিকে তাকাল। গম্ভীর মুখে গুরুচরণ বলল, 'শাস্তি পেতে হবে জনিকে। মুখ্যের শালা হলেও রেহাই নেই। জঘন্য অপরাধ। মাথা মুড়িয়ে দাও। আগামি সকালে যাতে জনিকে এই পট্টিতে দেখা না যায়।''

(জলদাস ২০১২, পৃ. ৮২-৮৩)

হরিজনপল্লিতে মেথরদের পারিবারিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পুরুষেরা নিত্যদিনের বাজার করাকে বোঝা বলে মনে করে। তারা ভাবে বাজার করা মেয়েলি কাজ। এর থেকে মদ-গাজা খেয়ে তাস খেলা ও সিনেমার গল্প করাকে পুরুষত্ব বলে মনে করে তারা। গুরুচরণের পরিবারে তাই দেখা যায়- অঞ্জলি কাজের শেষে বাজারের ব্যাগ নিয়ে বাজার করতে যায়। অঞ্জলির বয়স হয়ে গেলে তার পুত্রবধূ চাঁপারানি বাজার করার দায়িত্ব নিয়েছে।

অন্যদিকে মেথররা কাজের অবসর দিনে অর্থাৎ সাপ্তাহিক ছুটির দিন যেভাবে কাটায় তার মধ্যে দিয়ে মেথর সমাজের সামাজিক চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। মেথরদের সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার। সেদিন সকালটা শুরু হয় একটু দেরিতে। মেথররা এই দিনটি নিজের মতো করে উপভোগ করে। সকালে বড়ো মগ নিয়ে চা-দোকানে গিয়ে চা-পরোটা নিয়ে ঘরে ফেরে তারা। পরিবারের সকলে মিলে তা ভাগাভাগি করে খায়। দেখা যায়, উঠানের এক কোণে শূকর জবাই করা হয় এবং মেথররা সাধ্য মতো দাম চুকিয়ে মাংস নিয়ে যায় ঘরে। বেলা একটু গড়িয়ে গেলে পুরুষরা একক বা দল বেঁধে মদ নিয়ে বসে। নারীরা বাজারে যায়- এই ছুটির দিনে অপেক্ষাকৃত ভালো খাবার খাওয়ার জন্য।

জেলে সমাজের মতোই মেথর সমাজেও কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ। গুরুচরণ তার দুই মেয়েকে বারো-তেরো হতে না হতেই বিয়ে দিয়েছে। ছেলেদের ক্ষেত্রে সেই বয়স আঠারো থেকে কুড়ি। গুরুচরণ আঠারো বছর বয়সে বিয়ে করেছে। শিবচরণের বয়স কুড়ি হলে গুরুচরণ ছেলের বিয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু ঘরের অভাবে অঞ্জলি বিয়ে দিতে নারাজ হয়। কারণ মেথর সমাজে ছেলে বিয়ে করালে মা-বাবাকে শোয়ার ঘর ছেড়ে দিয়ে বাধ্য হয়ে রান্নাঘরে রাত কাটাতে হয়।

হরিজন সমাজের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল- সমাজ কখনো সর্দার শূন্য থাকে না। পট্টির নিয়মানুযায়ী স্বেচ্ছাচারী না হলে কোনো সর্দার আজীবন সর্দারি করতে পারে। গুরুচরণ স্বেচ্ছায় সর্দারিত্ব ছেড়ে দেয়। কারণ তার আত্মবিশ্বাস ও সাহস কমে গিয়েছে। ফলে কোনো এক ছুটির দিন চারপট্টির মেথররা একত্রিত হয়েছে নতুন সর্দার নির্বাচনের ক্ষেত্রে। বিভিন্ন শলা-পরামর্শের পর মেথরদের মৌখিক সমর্থন অনুযায়ী রামগোলামকে পরবর্তী সর্দার ঘোষণা করা হয়েছে।

এছাড়াও কলহ, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা মেথর সমাজকে সবসময় অস্থির করে তুলেছে। অস্পৃশ্য, বঞ্চিত মেথর সমাজ অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করে। যোগেশ নামক মেথর করপোরেশনের বড়ো সাহেবকে তোষামোদ করে চলে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। ফলে সে মেথরদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাও করে। জেলে সমাজের মতো মেথর সমাজে একতা লক্ষ করা না গেলেও বিপদের সময় রামগোলামের মেথর সমাজকে একত্রিত করতে অসুবিধা হয়নি। আসলে চাকরির উপার্জনে সংসারে অভাব মেটে না তাদের। সদস্য অনুযায়ী ঘর বরাদ্দ হয় না মেথরদের। অলিখিত অথচ অলঙ্ঘনীয়ভাবে তাদের পুরুষানুক্রমে নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার করে যেতে হয়।

৩.১.৫ নিম্নবর্গীয় সমাজে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও সাম্প্রদায়িকতা

মানব সমাজে বর্ণ-জাতিগত বিষয়টি সুপ্রাচীন ও বহুসমালোচিত। বৈদিক যুগে আর্যরা বর্ণাশ্রম প্রথা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে সামাজিক শ্রেণি বিভাজনকে ত্বরান্বিত করেছে। কালক্রমে বর্ণভেদ জন্ম দিয়েছে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতাকে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক কে এম পানিক্কর তাঁর 'Cast and Democracy'-গ্রন্থে আর্য প্রবর্তিত বর্ণ ও জাত সম্পর্কে জানান,

> '… as the vedic period, a fair skinned people, who called themselves Aryans entered India by the north-west side. The evidence afforded by the Rig-Veda conclusively proves that when the Aryans first entered India and settled down in the Punjub, they had no developed system of cast. … The contact between the two races resulted in the conquest of the Aborigines of North India by force of arms, and thus came into existence the primary difference of Caste Varnabheda or the difference in colour.' (Panikkar. 2007. p.5)

শ্বেতবর্ণের আর্যরা কৃষ্ণবর্ণের ভারতীয়দের বাহুবলে পরাজিত করে তাদের দাসে পরিণত করে। পরাজিতরা দাস ও সাধারণ লোকেরা বৈশ্যে পরিণত হল। বর্ণ বিভাজনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত ব্রাহ্মণেরা উচ্চস্থানে নিজেদের অবস্থান ঘোষণা করে ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে সমাজ শাসন করা শুরু করে। আর এই তিন বর্ণের সেবাকার্জে বহাল হয় সমাজের চতুর্থবর্ণ শূদ্র। শুধু তাই নয়, এই বিভিন্ন বর্ণের নারী পুরুষের মিলনের মধ্য দিয়ে বর্ণের সংকরায়ণ ঘটতে থাকে,

> "উচ্চবর্ণের পতি ও নিম্নবর্ণের পত্নী হলে তাকে অনুলোম ও উচ্চবর্ণের পত্নী ও নিম্নবর্ণের পতি হলে তাকে প্রতিলোম বিবাহ বলা হত। প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সমাজে বর্ণসংকর ঘটতে থাকে। বর্ণসংকরের ফলেই বিভিন্ন জাতি বা 'কাস্ট' এর উদ্ভব হয়।" (মুখোপাধ্যায় ২০১৯, পৃ. ২৪)

জাতের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই জাতিভেদ ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রাসঙ্গিকভাবে বলতে হয়, 'Caste' শব্দটির ভারতীয় পরিভাষা করা হয়েছে 'জাত'। ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষে কাস্ট বা জাত শব্দের ব্যবহার ছিল না। জানা যায়, পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে সব পর্তুগিজ বণিক বাণিজ্যের জন্য ভারতবর্ষের উপকূলে এসে যে সব বণিক ও কারিগর গোষ্ঠীদের সঙ্গে পরিচিত হতেন, কর্ম অনুযায়ী সে গোষ্ঠীকে পর্তুগিজ শব্দ 'Casta' (কাস্তা) দ্বারা চিহ্নিত করতেন। 'কাস্তা' শব্দের অর্থ জন্তু বা গাছের প্রজাতি। পেশা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাস্তাও পরিবর্তিত হয়। ইংরেজ ও ফরাসিরা যখন এদেশে বণিক থেকে শাসকে পরিণত হল তখন তারাও বিভিন্ন গোষ্ঠীকে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ, বর্ণ ও পেশার মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করার পদ্ধতি হিসেবে 'কাস্ট' বলে চিহ্নিত করলেন। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে চতুর্বর্ণের সঙ্গে কাস্ট বা জাতকে মিলিয়ে যে ভুলটি করেছিল তার ফলস্বরূপ কাস্ট সিস্টেমের জন্ম হয়েছে ভারতবর্ষে। (প্রধান (সম্পা.) হাওয়া ৪৯, পৃ. ২২-২৬) বর্তমানে যেভাবে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত তার মধ্যে কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, যেমন-

- জন্মসূত্রে জাতি নির্ণয় করা।
- গুণ বা মর্যাদালাভের মাধ্যমে জাতি পরিবর্তন সম্ভব নয়।
- বিয়ে বা পরিণয় একটি নির্দিষ্ট জাতির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে।
- অন্যান্য আচার সংস্কারও ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন। ফলে সেখানে উচ্চ জাতির সঙ্গে নিম্ন জাতির মেলবন্ধনে বিধি নিষেধ রয়েছে।
- জাতিগত পার্থক্য সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতিসূচক পদবি ব্যবহার।
- কিছু কিছু গ্রাম বা গ্রামীণ অঞ্চলে জাত অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচন বাধ্যতামূলক।

অর্থাৎ দেখা গেল, জাতিভেদ প্রথায় এক জাতি থেকে অন্য জাতিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পথ চিরতরে রুদ্ধ। আসলে প্রায় প্রত্যেক সমাজেই মূল্যভিত্তিক মানদণ্ডে শ্রেণিবিভাগ হয়ে থাকে। জাতিভেদ প্রথাতেও পেশা বা বৃত্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যেমন কিছু কিছু বৃত্তি যেমন চর্মকার, জেলে, মেথর, পতিতা, তাঁতি, নাপিত বৃত্তি সমাজে নিম্নবৃত্তি বলে গণ্য। অপর পক্ষে পুরোহিতবৃত্তি, শিক্ষকতা ও অন্যান্য সাহেবি কাজ উচ্চবৃত্তি বলে পরিগণিত। জাতির মধ্য থেকেই বৃত্তির মানদণ্ডে আবার উপজাতির বিভাজন হয়েছে। জাতিভেদের মূলে রয়েছে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ইংরেজদের রাজনৈতিক স্বার্থপরতা। শ্রেণির বদলে জাত বা বর্ণের ভিত্তিতে বিভাজন সৃষ্টি করে হিন্দু ও মুসলমান দুই বিপরীত জাতির জন্ম দেয় তারা। গবেষক শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় জানান,

> 'ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতিপ্রথা দৃঢ়মূল হয় এবং তা বঙ্গ সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত করে।... ইংরেজ জাতিভেদ ভাঙার কোনো সক্রিয় উদ্যোগ নেয়নি বরং তাকে প্রশ্রয় দেয়। ইংরেজ শাসনের পরোক্ষ ফলে জাতিপ্রথা ক্ষয় পাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলেও ভারতের শাসকশ্রেণি আজও জাতিপ্রথা বা 'কাস্ট সিস্টেম'কে বাঁচিয়ে রেখেছে। বর্তমান ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিপ্রথার বিষবৃক্ষে বারি সিঞ্চন করে।' (মুখোপাধ্যায় ২০১৯, পৃ. ৫৭)

হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে বর্ণিত সমাজের প্রথা ও বৈশিষ্ট্য হিসেবে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও সাম্প্রদায়িকতা লক্ষ করা গিয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের সমাজে যে বর্ণাশ্রমের মধ্য দিয়ে জাতিভেদ প্রথা শুরু হয়েছিল তার প্রমাণ রয়েছে 'রামায়ণ', 'মহাভারত'-এর মতো প্রাচীন মহাকাব্যে। মহাভারতের আদিকাণ্ড অবলম্বনে রচিত আলোচ্য লেখকের 'একলব্য' উপন্যাসে একলব্যের গুরু দ্রোণের কাছে অস্ত্র শিক্ষা লাভের আশা প্রসঙ্গে জাতিভেদজনিত ঘৃণা প্রদর্শিত হয়েছে। উপন্যাসে দেখি, নিষাদ জাতির উৎপত্তি ও আর্য দ্বারা তাদের হীনজাতি আখ্যা দেওয়ার প্রসঙ্গ। ঠাকুরদা অনোমদর্শীর কাছে একলব্য জানতে পারে, রাজা বেণের পুত্র নিষীদ হল নিষাদদের আদিপুরুষ। নিষীদ নাম থেকেই নিষাদগোষ্ঠীর উৎপত্তি। নিষাদরা অরণ্যচারী, তাদের পেশা হল পশু শিকার করা। সমাজের তথাকথিত নিম্নমানের বৃত্তি অবলম্বনে এরা নিম্নশ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। এই নিষাদ সম্প্রদায়ে রাজা হিরন্যধনুর পুত্র রূপে একলব্যের জন্ম। সে অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ হওয়ার লক্ষ্যে গুরু দ্রোণের কাছে শিক্ষা লাভের আশায় হস্তিনাপুরে যাত্রা করে। যাত্রা পথে নদী পার করাকালীন একলব্যের কাছে কড়ি না থাকায় মাঝি তাকে নৌকায় তুলতে চায় না। একলব্য তার কাছে পার করে দেওয়ার অনুরোধ করলে মাঝির বক্তব্য,

> 'দেখে তো মনে হচ্ছে অরণ্যচারী। শবর, ব্যাধ বা ডোম। আমি আর্য। ...যাও যাও, দূরে যাও।'
>
> (জলদাস ২০১৬, পৃ. ৯১)

মাঝির বক্তব্যে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যভাব ধরা পড়েছে নিষাদদের প্রতি। নিজেকে আর্য বলে দাবি করার মধ্য দিয়ে জাতিভেদ প্রথা প্রকাশ পেয়েছে মাঝির কথায়। শুধু তাই নয়, একলব্য গুরু দ্রোণের কাছে শিষ্যত্ব কামনা করলে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন,

> 'আমি উঁচু জাতের অস্ত্রগুরু। হীন শূদ্রবংশে জন্ম তোমার। ব্রাহ্মণ আমি। ব্রাহ্মণ হয়ে নীচ জাতির নিষাদকে অস্ত্রশিক্ষা দিতে পারি না আমি। তুমি ফিরে যাও।' (জলদাস ২০১৬, পৃ. ১০১)

গুরু দ্রোণের মুখে জাতি-বর্ণবিদ্বেষমূলক কথা শুনে স্তম্ভিত একলব্য ফিরে গিয়েছে অরণ্যে। একজন গুরু হয়ে জাতপাতের বিচারে একলব্যকে অপমান করেও তার মনে কোনো ভাবান্তর দেখা যায়নি। বর্ণাশ্রমের ভিত্তিতে মানুষের কর্ম ও গুণের কোনো মূল্য ছিল না সমাজে, জন্ম বা বংশ পরিচয়ই মানুষের পরিচয়ের মানদণ্ড। ফলে কর্ণকেও সূতপুত্র হওয়ার দরুন সমাজে নিচুজাতের অপমান সহ্য করতে হয়েছে বারবার।

নিচুজাত হওয়ার কারণে যোগ্য হয়েও গুরু দ্রোণের কাছে ব্রহ্মাস্ত্র লাভে বঞ্চিত হয়েছে কর্ণ। সমাজে জাতিপ্রথার যে আজও অন্যথা হয়নি তা বোঝা যায় 'তুমি কে হে বাপু' গল্পে অদ্বৈতের কণ্ঠে। সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ মৃত্যুর পরে স্বর্গে বেদব্যাসের সঙ্গে দেখা হলে তিনি বর্তমান সমাজের জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে জানায়,

'এখনকার পৃথিবীতে গুণ আর কর্মকে ভিত্তি করে মানুষের বিভাজন হয় না।

…

কোথায় জন্মালাম, সেটাই মুখ্য বিষয়। বিএ, এমএ পাস দিয়ে মন্ত্রী ব্যারিস্টার হলেও পরিচয়ের সময় ব্রাহ্মণ সন্তান শূদ্র সন্তান এসব বলে পরিচয় দেওয়া হয়। জন্মস্থানটাই আসল, গুণের মূল্য শূন্য।' (জলদাস ২০১৯(ক), পৃ. ৩১)

জেলেসমাজের পরিপ্রেক্ষিতে অদ্বৈত ব্যসদেবকে যে জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে জানিয়েছেন তার পরিচয় পাওয়া যায় 'দহনকাল' উপন্যাসেও। দেখা যায়, কৈবর্তপাড়ার পরিবারগুলো স্বচ্ছল, শিক্ষিত। মাছ ধরা তাদের পেশা হলেও প্রধানতম পেশা নয়। এদের নিজেদের জমি আছে। মাছমারা ছাড়া এরা প্রয়োজন অনুযায়ী জমিতে হাল চাষ করতে পারে বলে এরা হালিক কৈবর্ত। কিন্তু জালিক কৈবর্তদের একমাত্র ভরসা নদী- সমুদ্রে জাল ফেলা। এদের কোনো চাষযোগ্য জমি নেই। ফলে হালিক কৈবর্তরা জালিক কৈবর্তদের ছোটো মনে করে।

'হিতারা তো ছোড জাত, মাউছ্যা। মাছ মারণ ছাড়া হিতারার গতি নাই। আঁরার জবিন আছে। আঁরা শিক্ষিত, চাউরি গরি। আঁরা হিতারাওোনও বড়ো। আঁরা উচ্চ বংশর কৈওর।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ২৯)

অনুষ্ঠান বাড়িতে ইচাখালির জেলেরা বুঝে গেল, কৈবর্তপাড়ার জেলেরা কী নিদারুণ ঘৃণা করে তাদের। শুধু মাছ মারার অপরাধে তারা যে এত ঘৃণার পাত্র, সেটা আগে তেমন করে জানত না তারা। আবার একই বক্তব্য 'মোহনা'- উপন্যাসেও জানা যায়,

'কৈবর্তদের দুটো ধারা—হালিক কৈবর্ত আর জালিক কৈবর্ত হালিকরা চাষবাস, গো-পালন নিয়ে থাকে।..জালিকদের ফসল নদীতে। মৎস্যশিকারই জালিকদের একমাত্র পেশা।' (জলদাস ২০১৩, পৃ. ৭)

আমরা লেখকের 'কৈবর্তকথা' প্রবন্ধগ্রন্থে জানতে পারি-

'কৈবর্তদের দুটো ভাগ—হালিক বা চাষী কৈবর্ত এবং জালিক বা আদি কৈবর্ত।…

যারা হাল দ্বারা কৃষিকর্ম করে, তারা হালিক বা হাইল্যা। আর যারা জাল দিয়ে মাছ ধরে, তারা জালিক বা জাইল্যা।'

(জলদাস ২০০৯, পৃ. ৭৩)

হিন্দু সমাজে বসবাস করেও জাতিভেদজনিত ঘৃণা জেলেসমাজের প্রতি দেখা গিয়েছে 'জলপুত্র' উপন্যাসে।

'হিন্দুছাত্ররা গঙ্গার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে না। জেলে বলে দূরে সরিয়ে দেয়। এক সঙ্গে বেঞ্চে বসলেও মাঝখানে অনেক দূরত্ব রাখে। দুষ্টু ছেলেরা জাইল্যা, ডোম বলে ঘৃণামিশ্রিত ইয়ার্কি করে তার সঙ্গে। ... সমাজ হিন্দুদেরকে মান্যতা দেয়। জেলেরা করুণার পাত্র। ঘৃণা, তিরস্কার তাদের জন্যে সর্বদা তোলা থাকে।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৩২-৩৩)

আবার কোনো অনুষ্ঠান বাড়িতে অতিথিদের পাতে নানা লোভনীয় খাবার পরিবেশিত হলেও ঢুইল্যা অর্থাৎ ঢোলবাদকদের পাতে তা জোটেনি। কারণ এরা সমাজে অস্পৃশ্য। বিয়ের অনুষ্ঠানে এরা প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু বর্ণবাদিতার নিরিখে এরা অচ্ছুৎ, নিম্নবর্গ।

'অ প্রদীপ, ঢুইল্যা অলেরে কও, খাওনর পরে আঁইডা আর কলাপাতা যেএন খালপাড়ত্ পেলাই দি আইয়ে। হিতারার আঁইডা কেউ ছুঁইতো নো।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৭৩)

'দহনকাল' উপন্যাসে হরবাঁশিকে শশধর ও প্রদীপের জাতপাত নিয়ে অপমানের পর সেই দুঃখ সে নিজের মধ্যেই চেপে রাখে এবং মনের যন্ত্রণাকে উপশম করার জন্য জাতপাত প্রসঙ্গে গান করে হরবাঁশি। উপন্যাসে তার কণ্ঠে জাত সম্পর্কিত গান শোনা যায়,

'জাত গেল জাত গেল বলে একি আজব কারখানা।
সত্য কাজে কেউ নয় রাজি সব দেখি তা-না-না-না।।
যখন তুমি ভবে এলে
তখন তুমি কী জাত ছিলে
কী জাত হবে যাবার কালে
সেই কথা কেন বল না।।
ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-চামার-মুচি
এ জলেতে সকল শুচি
দেখে শুনে হয় না রুচি
যমে তো কারেও ছাড়বে না।।
গোপনে যে বেশ্যার ভাত খায়
তাতে ধর্মের কী ক্ষতি হয়
লালন বলে জাত কারে কয়
এই ভ্রম তো আর গেল না।।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৬৩)

লালন ফকিরের গানটির মধ্য দিয়ে যে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধতা করা হয়েছে তা আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি। হরবাঁশির মুখে এই গান শুনে জেলেরা নিজেদের মধ্যে জাতপাত নিয়ে অপমানিত হওয়ার অভিজ্ঞতা একে একে ভাগ করেছে। জানা যায়, কাঁইচোবালা ও রাধাগোবিন্দের বউয়ের নাপিতদের দ্বারা

অপমানিত হওয়ার কথা। আবার ব্রাহ্মণ নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাছে জেলেরা ছোটো জাত, ফলে তার পুকুর থেকে জল নিতে গেলে জেলেদের মাঝে মধ্যেই অপমানিত হতে হয়েছে।

আবার ‘প্রস্থানের আগে’ উপন্যাসে দেখা যায়, মাঝিরঘাট এলাকার কুলিরা জানে যে এখানকার স্থানীয় লোকেরা জেলেদের ঘৃণার চোখে দেখে। ফলে এক কুলি নির্দ্বিধায় শিবশঙ্করের গায়ে হাত তুলতে পারে। শুধু তাই নয়, বহুকাল আগে থেকে শিকলভাঙা গ্রামের প্রথা হল, নাপিতরা জাতিগত ঘৃণার কারণে জেলেদের চুল কাটে না। শুধু জেলে নয়, মুচি-ধোপাদের চুল কাটতেও এদের আপত্তি। জেলে, ধোপা, মুচিদের থেকে নাপিতরা নিজেদের উঁচুজাত বলে মনে করে। তাদের মতে উঁচু জাত নিচুজাতের সেবা করে না। গঞ্জের কোনো নাপিতের কাছে তথাকথিত ছোটোজাতের মানুষেরা চুল কাটাতে পারে না। তাদের বাধ্য হয়ে দূর গ্রামে বা নদীর ওপারে গিয়ে তাদের ক্ষৌরকর্ম করে আসতে হয়। উপন্যাসে দেখা যায়, সীতানাথের এই প্রথা জানা ছিল না। ফলে সে ফাল্গুনীর ছেলে-মেয়েকে নিয়ে গঞ্জের বঙ্কিম শীলের দোকানে যায় চুল কাটাতে। গ্রামের নতুন মুখ দেখে বঙ্কিম তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে সীতানাথের জেলে পরিচয় প্রকাশ্যে আসে। বঙ্কিম হতভম্ভ হয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলে ওঠে,

‘তুই আমারে দিয়া জাইল্যার চুল কাটাইলি! মহাপাতক কইরলি তুই আমারে!’ (জলদাস ২০১৯, পৃ. ২১১)

‘সুবিমলবাবু’ গল্পে সুবিমল গঙ্গোপাধ্যায় কক্সবাজারের হারবাং সরকারি কলেজের রসায়নের অধ্যাপক। নরসিংদীর ব্রাহ্মন্দি গ্রামের এক কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে তার জন্ম। তার পিতা হরিচরণবাবু গোঁড়া কুলীন ব্রাহ্মণ। এই কৌলীন্য সংকটে তিনি তার মেয়েদের সময় মতো বিয়ে দিতে পারেননি, ফলে সুবিমলবাবুও অবিবাহিত থেকে গিয়েছেন। কৌলীন্যের গৌরবে তিনিও আচ্ছন্ন, ফলে জীবনে তার নানা বাছ-বিচার। ব্রাহ্মণ ছাড়া কারও হাতে খান না, কলেজ ছুটি হলে গ্রামের বাড়িতে যান। সেখানে সুজলা নাম্নী কাজের মেয়েটিও ব্রাহ্মণ। নিঃসঙ্গ একাকী জীবনে সুজলার যৌবনের ঝলকে তার প্রাণ মনে জোয়ার আসে, কিন্তু কোনোরকমে সামলে তিনি নিজের কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসেন। সেখানে গুরুতর অসুস্থ হলে সুবিমলবাবুর সহকর্মীরা মালতী জলদাস বলে একজন অসহায় বিধবা জেলেনারীকে তার সেবায় নিয়োজিত করে। প্রথমে জেলে নারী বলে আপত্তি থাকলেও সকলের কথায় তিনি রাজি হয়ে যান। মালতীর সেবায় তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে কোনো একদিন দুপুরে মালতীর শরীর উপভোগের ইচ্ছে তাকে পেয়ে বসে। কুলীন ব্রাহ্মণ সুবিমলবাবু জাতপাতের অচ্ছুতাচার ভুলে গিয়ে মালতীকে ভোগ করলেন। আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে মানবসমাজের অসহায় দরিদ্র্য মানুষগুলিই উচ্চবর্গের ভোগের বস্তু। মালতীর মতো অসহায় মানুষগুলি নিরুপায় হয়ে কেবল নিজেদের তাদের কাছে সঁপে দেয়। অন্যদিকে ‘দুলারি এবং কয়েকজন’

গল্পে দুলারি জলদাস মহেশখালী জেলেপাড়ার একজন জেলেনারী। উপার্জনের আশায় সে চট্টগ্রাম শহরে আসে এবং একটি গার্মেন্টস এ ইনচার্জ হিসাবে কাজ করে। গ্রামের সরলমনা মেয়েটি শহরের ঠগবাজ শ্যামল দত্তের ফাঁদে পড়ে তাকে বিয়ে করে। বেকার শ্যামল দুলারির উপার্জনে বসে বসে খায়। দুটি সন্তান হওয়ার পর দুলারি শ্যামলের আসল স্বরূপ জানতে পারে। শ্যামলের কোনো অনুতাপ নেই বরং সে বলে,

> 'তুমি তো একটা সস্তা মেয়ে। গার্মেন্টসে চাকরি কর। তোমাকে এই শ্যামল দত্ত বিয়ে করেছে—এ-তো তোমার সৌভাগ্য।'...
>
> জাইল্যার মাইয়ারে বিয়া কইরা এই শ্যামল দত্ত তো তোমাকে জাতে তুলছে।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৯৩)।

কোটনা গল্পে দেখা যায় গল্প কথক মুচির ছেলে বলে স্কুলে বর্ণবাদী পরিবারের ছেলেরা তাকে ঘৃণার চোখে দেখেছে। শুধু ছাত্ররাই নয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভবতোষ চক্রবর্তী স্কুলে ভর্তির প্রথমদিনই কথককে বলেছে,

> 'ক্লাসের একেবারে শেষ বেঞ্চে বসবি তুই, খবরদার সামনে বসবার চেষ্টা করবি না কখনো।'
>
> (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ১২)

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, ভীমরাও আম্বেদকর সমাজে অস্পৃশ্যদের অধিকারকে উদ্ধার করার লক্ষ্যে ১৯২৪ সালে 'বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল, অস্পৃশ্যদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা, তাদের আর্থিক উন্নয়নে পদক্ষেপ নেওয়া ও তাদের প্রতি উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রচার করা। পরবর্তীকালে তিরিশের দশকে অস্পৃশ্য দূরীকরণ আড়ম্বরে পরিণত হয়। এই সময় ১৯৩২ সালে গান্ধিজির পৃষ্ঠপোষকতায় 'হরিজন সেবক সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে অস্পৃশ্যদের তিনি 'হরিজন' অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্তান বলে সম্বোধিত করেন। ১৯৩৬ সালে আম্বেদকর লাহোরের 'জাতপাত তোড়ক মণ্ডল' সংগঠনের বাৎসরিক অধিবেশনে একটি বক্তৃতা করার জন্য যান। সভায় পাঠ করার জন্য তিনি যে ভাষণ রচনা করেন, তার নাম 'Annihilation of Cast'। সেই রচনায় তিনি প্রশ্ন তোলেন, সমাজের অস্পৃশ্যরা কেন তাদের প্রতি অন্যায় মেনে নিয়েছে? পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সমাজ বিপ্লব হলেও ভারতবর্ষে কোনো সমাজ বিপ্লব হয়নি কারণ প্রাচীনকাল থেকেই নিম্নবর্ণের মানুষদের কোনো অস্ত্রবহন বা শিক্ষার অধিকার ছিল না, ফলে অস্ত্র ছাড়া তার প্রতিবাদও করতে পারেনি। ভারতবর্ষে অধিকাংশই ছিল কৃষক, তারা লাঙলের ফলাকে তরোয়ালে পরিণত করার অধিকার থেকে কৌশলে বঞ্চিত হয়েছে। এই জাতিভেদ প্রথার কারণেই অস্পৃশ্যরা কোনো শিক্ষা পায়নি। অন্ত্যজ বলে তারা সমাজে অপমানিত হয় এবং চিরকালীন দীনদশা মানতে বাধ্য হয়। (Anand 2014, p. 133-45) হরিশংকরের 'রামগোলাম' উপন্যাসে

মেথরদের সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে এই অস্পৃশ্যতাকে লক্ষ করা যায়। ময়লা আবর্জনা টানার গাড়ির ড্রাইভার গুরুচরণের মুখে শোনা যায়,

> "বড়ো হতভাগা জাতি আমরা। হিন্দুসমাজে আমরা অচ্ছুত। বড়ো অপবিত্র জাতি আমরা। আমাদের ছোঁয়া তো দূরের কথা, আমাদের ছায়া মাড়ালেও হিন্দুরা, বামুনরা অপবিত্র হয়ে যায়। বড়ো পাপ হয় তাদের। ..যেখানেই যাই আমরা শুধু দূর-দূর, ছেই-ছেই শুনি। আমাদের জন্য তাদের মনে এক টাঙ্গি ঘৃণা। তাদের দেখাদেখি মুসলমানরাও আমাদের ঘেন্না করে, মানুষ ভাবে না। জন্তুর মতো আচরণ করে আমাদের সাথে।" (জলদাস ২০১২, পৃ. ১০-১১)

তাইতো বাল্লু জমাদারের ছেলেটা কোর্টহিলের চায়ের দোকানের সামনে গাড়ির ধাক্কায় মরে পড়েছিল, মেথরের ছেলে বলে কেউ ছুঁয়েও দেখেনি। অস্পৃশ্যতার অভিশাপে এর থেকে বড়ো অমানবিকতার পরিচয় আর হতে পারে না। সমাজের তথাকথিত ভদ্র সামজের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে এদের জীবন কাটে। উপন্যাসে লেখক মেথর সমাজের উৎপত্তি সম্পর্কে তাই পৌরাণিক কাহিনির প্রসঙ্গ এনেছেন। জানা যায়, ব্রহ্মা একদা বনপথে হাঁটতে গিয়ে পথের সামনে মল পড়ে থাকতে দেখলেন। তার পক্ষে মল পরিষ্কার করা সম্ভব নয় বলে তিনি তার দেহের ঘাম-ধুলো মিশ্রিত ময়লা দিয়ে মাত্রক নামক এক মানুষের জন্ম দিলেন এবং তাকে আদেশ করলেন পথ থেকে সেই মল পরিষ্কার করার জন্য। সে ব্রহ্মার আদেশ পালন করলে তিনি খুশি হয়ে বললেন আজ থেকে তুই মহীথর, ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার মধ্য দিয়েই তোর জীবন ধন্য হবে। যদিও এই পৌরাণিক কাহিনির স্রষ্টা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। নিজেদের উচ্চস্থান বজায় রাখার জন্য নানা শাস্ত্রীয় ছলে কৌশলে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল তারা। শুধু পৌরাণিক ব্যাখ্যাই নয়, মেথরদের অস্পৃশ্য হিসেবে দেখার প্রসঙ্গে বি আর আম্বেদকরের কথাও এসেছে উপন্যাসে। জানা যায়, আম্বেদকর মেথরের ঘরে জন্ম নিয়ে সারাজীবন জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার অভিশাপে জর্জরিত হয়ে জীবন কাটিয়েছেন। তবু দমিয়ে রাখা যায়নি তাঁকে। নিজ চেষ্টায় শিক্ষা অর্জন করে বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরেছিলেন আম্বেদকর। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা রূপে বর্তমান ভারতের সংবিধান রচনার একজন অন্যতম কারিগর তিনি। কিন্তু হিন্দুধর্মের উচ্চজাতের কর্মীরা তাঁকে নিচুজাত বলে ঘৃণা করত। শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ হয়েও তাঁর কপাল থেকে নিচু জাতের তকমা মুছে যায়নি। অপমানে, ঘৃণায় তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে প্রায় পঞ্চাশ হাজার অন্ত্যজ মানুষদের নিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। মেথররাও সমাজে অচ্ছুত, অন্ত্যজ বলে বিবেচিত। তাই বাবা ঠাকুর আম্বেদকরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মেথরদের মধ্যে উদ্দীপনা ও তাদের নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করতে চেয়েছেন। আম্বেদকরকে অশিক্ষিত মেথরদের কাছে আদর্শ প্রাণপুরুষ রূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে একধরনের প্রতিবাদ প্রদর্শিত হয়েছে বাবা ঠাকুরের বক্তব্যে। আর এই প্রতিবাদ জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সরব হতে মেথরদের মধ্যে অনেকটাই

সাহস সঞ্চারিত করেছে। দেখা যায়, স্কুলের প্রধান শিক্ষক মেথর ছাত্রদের শেষের বেঞ্চে বসার আদেশ জারি করে এবং স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান থেকে মেথরদের তাড়িয়ে দিয়ে বলে,

> ‘তোরা এই অনুষ্ঠানে একেবারেই বেমানান। যা, সবাই বেরিয়ে যা এখন স্কুল থেকে।’ (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৪১)

বিকাশ নামক এক মেথর ছাত্রকে এর প্রতিবাদ করতে দেখা গেলে প্রধান শিক্ষক দপ্তরিকে দিয়ে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাকে বের করে দেওয়া হয়েছে। শুধু কর্মক্ষেত্র বা শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, সামাজিক ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে এই অচ্ছুৎ আচার ও জাতিভেদজনিত ঘৃণা। উপন্যাসে দেখা যায় শক্তিলাল ও রাধিকা মেথর পরিচয় গোপন করে তথাকথিত সভ্য সমাজে বাড়ি ভাড়া নিয়ে দাম্পত্য জীবন শুরু করলে ঘটনাক্রমে একদিন তাদের মেথর পরিচয় সামনে আসে। দেখা যায় গর্ভবতী রাধিকাকে কেউ সাহায্য না করে জাতপাত নিয়ে চিন্তিত। শক্তিলালকে এর জন্য লাঞ্ছিত হতে দেখা গিয়েছে এভাবে,

> ‘অই চোদানির পোয়া মেথইয্যা, পরিচয় লুকাই ভদ্র লোক সাজি বাসা লইয়ছ আঁরার পাড়াত্। হিন্দু-মুসলমানর বসবাস এন্ডে। বিয়াগ্গুনর জাত খাইয়ছ খানকির পোয়া। জান লওনর আগে ডিমপারনিরে লইয়া ধা এত্তোন।’
>
> (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৪৬)

শুধু তাই নয়, মেথরদের সামাজিক সংস্কারেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা। গুরুচরণের মৃতদেহ সৎকারের জন্য ভলুয়ার দীঘির শ্মশানে নিয়ে আসা হলে ডোম রামদাস তাদের বাধা দিয়েছে। কারণ শহরের উঁচু বর্ণের গণ্যমান্য হিন্দুরা শ্মশান কমিটির কর্তৃপক্ষ এবং তাদের নির্দেশ-মেথর, জেলে, হাঁড়ি—এসব নীচু জাতের মৃতদেহ খালের পাড়ে পোড়াতে হবে। আর এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাঁধানো চুলাটি উঁচু বর্ণের জন্য। এই নির্দেশের অন্যথা হলে রামদাসের চাকরি চলে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে তারা। ফলে রামদাস নির্দেশ অনুযায়ী মেথরদের বলে,

> ‘তোরা মেথর আছিস। তোদের জায়গা এটা নয়। এইটা বাবুদের জন্য। তোরা পোড়াবি ওই খানে। আর হ্যাঁ, মরা পোড়ানোর জন্য ট্যাক্স দিতে হোবে, আড়াই শ টাকা।’ (জলদাস ২০১২, পৃ. ১১০)

আমরা জানি মৃতের কোনো জাত নেই, কিন্তু এখানে শ্মশানেও জাতিভেদের জাঁতাকল পেতে রেখেছে সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্ণেরা। প্রাচীনকাল থেকেই জাতিভেদ প্রথা ও ঘৃণায় জর্জরিত মেথর সম্প্রদায় এভাবেই আজীবন অসহায় হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করেছে যা সাম্প্রতিককালেও অপরিবর্তিত।

জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতার পরিচয়ও আমরা পেয়েছি হরিশংকরের গল্প উপন্যাসে। সম্প্রদায় অর্থাৎ গোষ্ঠী। সে গোষ্ঠী ‘ধর্ম’, ‘বর্ণ’, ‘জাত’, ‘জন্ম’, ‘বিত্ত’, ‘ভাষা’ এমন কি ‘পেশা’র উপর নির্ভর করেও তৈরি হতে পারে। আর এসবের ওপর ভিত্তি করে মানুষকে মানুষ হিসাবে বিচার না করে বিভেদ সৃষ্টি করাই হল সাম্প্রদায়িকতা। আসল অর্থে সাম্প্রদায়িকতা হল এক জাতের ওপর অপর

জাতের আধিপত্যের লড়াই। সাম্প্রদায়িকতার ইংরেজি পরিভাষা হল 'কমিউনালিসম'। কমিউনালিসমের বিপরীতে উচ্চারিত হয় 'সেক্যুলারাইজেশন' অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষকরণ। এ প্রসঙ্গে বলা ভালো সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্ম কিন্তু এক নয়। অর্থাৎ ধর্মের ভিত্তিতে সম্প্রদায় তৈরি হয়েছে ঠিকই কিন্তু সব ধর্মের মূল কথা শান্তি, প্রেম, মৈত্রী, সাধনা ও সম্প্রীতি। ধর্মের এই মূলতত্ত্বের বাইরে গিয়ে এক সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ বা আক্রোশ প্রদর্শনই হল সাম্প্রদায়িকতা। তাহলে এই সাম্প্রদায়িকতার মূলে দেখা যাচ্ছে মানুষের স্বার্থ-লোভ-আকাঙ্খা। ফলে এই বিভেদবুদ্ধিতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে মানবিকতা। যুগ-যুগান্তরের সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিচ্ছে ভয়ানক অভিশাপ রূপে। কিন্তু একটু ভাবলেই দেখা যাবে সেই প্রস্তর যুগে মানুষ কিন্তু মানুষ হিসাবেই গণ্য হয়ে আসছিল। যখনই মানুষ নিজেদের সুবিধার জন্য পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা শুরু করল তখনই আত্ম-স্বার্থ রক্ষার্থে দেখা দিল বর্ণাশ্রম, এল জাতপাত, তৈরি হল ধর্ম-গোত্র। এরই ভিত্তিতে সৃষ্টি হল সম্প্রদায়। ফলে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল সাম্প্রদায়িকতা। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বহুচর্চিত হয়েছে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে ব্রিটিশ শাসন ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবণতাকে ধীরে ধীরে অনেকটাই শক্তিশালী করে তুলেছিল। সমালোচক এম.এন. শ্রীনিবাস তাঁর 'Secularization' প্রবন্ধে বলেছেন, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও সাম্প্রদায়িকতার মূলে রয়েছে 'pollution' ও 'purity' এই দুটি শব্দ। কারণ ভারতীয় ভাষায় 'পলিউশন' বলতে বোঝানো হয় অপরিষ্কার, অমার্জিত, অপবিত্র, অশুদ্ধ, দূষিত ইত্যাদি। অন্যদিকে 'পিওরিটি' বলতে বোঝায় পরিষ্কার, মার্জিত, পবিত্র, শুদ্ধ, ইত্যাদি। হিন্দু ধর্মের আচরণে এই পবিত্র-অপবিত্রের ধারণাটিকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা নেই। ফলে বিভিন্ন জাত ও ধর্মের মধ্যে কাঠামোগত একটি দূরত্বের সৃষ্টি হয়।

> 'The structural distance between various castes is defined in terms of pollution and purity. A higher caste is always ''pure'' in relation to a lower caste, and in order to retain its higher status it should abstain from certain froms of contact with the lower.' (Srinivas 1969, Pp. 120)

১৯৪৬ সালে দেশভাগ নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টির মূলে ছিল এই পবিত্র-অপবিত্রের সুবিধা-অসুবিধা ও হিন্দুদের উঁচুজাতি ভেবে মুসলমানদের মধ্যে হীনমন্যতা ও নিরাপত্তাহীনতা বোধ। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের অধীনতা থেকে মুক্তির জন্য তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের সমস্ত বাঙালি একত্রিত হয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করেছিল তার প্রভাবেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হয়েছে। এই মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত হরিশংকরের 'থুতু' গল্পে বিমল শীল নামে একজন নাপিত

পরিবারের ওপর রাজাকারদের অত্যাচার বর্ণিত হয়েছে। দেখা যায়, জোরপূর্বক বিমল শীলের পরিবারকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছে, যা সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় বহন করে।

'... শুক্রবারের দুপুরে রাজাকারের দল নিয়ে নাপিতপাড়ায় বিমলের উঠানে হাজির হলো বশিরউদ্দিন।... সেদিন জুমার নামাজের পর গোটা পরিবারকে মুসলমান করা হলো। বিমলের ছোটো দুই ছেলের সুন্নত করানো হলো। বিমলের মুসলমানি নাম রাখা হলো ইজ্জত আলী।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২১৩)

সাম্প্রদায়িকতার আরো পরিচয় পাওয়া যায় যখন মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব প্রান্তিক গ্রামাঞ্চলে এসে পড়েছে। বিশেষ করে 'দহনকাল', 'অর্ক' উপন্যাসে সাম্প্রদায়িকতার উদাহরণ প্রকট। 'দহনকাল'-এ দেখা যাচ্ছে, ষাটের দশকের মাঝামাঝি ভারত শাসিত কাশ্মীরে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার প্রভাব পূর্ব-পাকিস্তানের ঢাকা নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, উত্তর পতেঙ্গাতেও এসে পড়েছে। সাতচল্লিশের দেশভাগের সময় ভারতের বিহারি মুসলমানেরা উত্তরপতেঙ্গায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল এবং এখানে তারা পাকিস্তানি শাসকের প্রশ্রয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। এরা হিন্দুপ্রধান এলাকায় আক্রমণ চালায়, লুঠ করে, ধর্ষণ করে। ফলে দেখা গেল, নিকুঞ্জ ও হামিদের এতদিনের সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কে ফাটল ধরে। নিকুঞ্জ ভালোভাবে কথা বললেও হামিদের ব্যবহারে ঘৃণার ভাব ফুটে ওঠে-

'রাখ তোর মিডা কথা। ইন্ডিয়াত্ আঁরার মুসলমান ভাই অলেরে কাডি তুচ্চি তুচ্চি গরের। তুই ডোম আইস্যস্ দে আঁর লগে মিডা কথা কথি।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১১০)

একধরনের ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত জেলেরা নিজেদের একতা ও সম্প্রীতির মধ্যে অবিশ্বাস, ষড়যন্ত্র ও বেইমানিকে আসল সত্য বলে মনে করেছে।

'এই ভাবে কোথাকার কোনো কাশ্মীরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চট্টগ্রামের উত্তর পতেংগা গ্রামের গতানুগতিক জীবনপ্রবাহে ঘূর্ণি তোলে, হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃত্বে ও বিশ্বাসে ফাটল ধরায়। একে অপরের দিকে হিংসা ও সন্দেহের চোখে তাকাতে থাকে। পথে দেখা হলে মাথা নিচু করে একে অপরেকে এড়িয়ে যায়।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১১২)

'অর্ক' উপন্যাসেও দেখা যায় ইন্ডিয়া পাকিস্তানের যুদ্ধের প্রভাব উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়ায় সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিয়েছে। দিবাকর মনে মনে ভাবে,

'এ কেমন হল? গাঁয়ে হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাইয়ের মতো বসবাস করত।... ঈদেচাঁদে হাত ধরাধরি করত। এখন কী রকম যেন রেষারেষি। পরস্পরের প্রতি সন্দেহ। পতেঙ্গার মুসলমানরা ভাবছে—হিন্দুরা ইন্ডিয়ার গুপ্তচর। পূর্ব-পাকিস্তানের সকল গোপন তথ্য ভারতে চালান করে দিচ্ছে।... এদেশে এইসব বিশ্বাসঘাতক হিন্দুদের থাকার অধিকার নেই।...

..আগে হিন্দু আর মুসলমান ছাত্ররা ক্লাসে এক বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসত। হঠাৎ হিন্দু আর মুসলমান ছাত্ররা আলাদা আলাদা বেঞ্চে বসা শুরু করল।' (জলদাস ২০১৭, পৃ. ৪০-৪১)

তাহলে দেখা গেল, শুদ্ধ-অশুদ্ধের মানদণ্ডের ওপর নির্ভর করে একদিকে যেমন সমাজ-মানুষের মধ্যে শ্রেণি বিভাজন হয়েছে তেমনই অন্যদিকে সমাজের কিছু বৃত্তিকে হেয় জ্ঞান করে তাদের নিম্নজাতি বলে গণ্য করা হয়েছে। যেমন মেথরবৃত্তি, চর্মকার, পশুশিকার, মাছমারা ইত্যাদি পেশার সঙ্গে অশুদ্ধি বা অপবিত্রতা যুক্ত হয়ে আছে বলে সমাজে এগুলো নিম্নবৃত্তি। অপরপক্ষে যাগ-যজ্ঞ করা, শিক্ষকতা বা পরিশ্রম বর্জিত প্রায় সবরকম তথাকথিত বাবুশ্রেণির কাজ হল উচ্চবৃত্তির। এক্ষেত্রে সামাজিক মানুষ হিসেবে নিম্নবৃত্তি ত্যাগ করে উচ্চবৃত্তি গ্রহণ করার মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন ইতিপূর্বে আমরা 'জলপুত্র', 'দহনকাল', 'অর্ক', 'রামগোলাম', 'প্রস্থানের আগে', 'কোটনা', 'জামাইখেকো', 'সুবল জেঠা', 'চিঠি' প্রভৃতি উপন্যাস-গল্পে দেখেছি জেলে, মেথর, চাষি নির্বিশেষে তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করে পূর্বপুরুষের তথাকথিত নিম্নবৃত্তি থেকে তথাকথিত উচ্চবৃত্তি গ্রহণ করার স্বপ্ন দেখেছে। কিছু ক্ষেত্রে তা সফলও হয়েছে। যেমন 'সুবল জেঠা' গল্পে জেলের ছেলে হীরামোহন শিক্ষিত হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, 'কোটনা' গল্পে রামদুলাল মুচির ছেলে অশোক শিক্ষক হয়েছে, 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে জেলেসন্তান শিবশঙ্কর অধ্যাপক হয়েছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে নিম্নশ্রেণি সূচক পদবী পরিবর্তন করে উচ্চশ্রেণিতে উন্নীত হওয়ার প্রচেষ্টা। যেমন 'কোটনা' গল্পে দেখা যায় মুচি রামদুলাল তার ছেলের ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করতে স্কুলে ভর্তির সময় প্রধান শিক্ষকের কাছে অনুরোধ করে তার ছেলের দাস পদবী পাল্টে চৌধুরী করার। 'অর্ক' উপন্যাসে দেখা যায়, স্কুলের প্রধান শিক্ষক সত্যব্রত চক্রবর্তী দিবাকরকে জলদাস পদবী পরিবর্তন করে উচ্চশ্রেণির কোনো পদবী গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। আবার 'রামগোলাম' উপন্যাসেও দেখা যায়, গুরুচরণ তার নাতির নামকরণের সময় হিন্দুদের মান্য দেবতা রাম ও মুসলমান শব্দ গোলাম যুক্ত করে রামগোলাম নাম রেখেছে যাতে হিন্দু-মুসলমানরা অন্তত নামের খাতিরে রামগোলামকে ঘৃণা না করে। উঁচুজাতির আচার-আচরণ বা বৃত্তি অনুকরণ করে নিচু জাতির উচ্চজাতে উন্নীত হওয়ার চেষ্টাকে সমালোচক এম.এন শ্রীনিবাস 'Sanskritization' বলেছেন।

> 'Sanskritization is the process by which a "low" Hindu caste, or tribal or other group, changes its customs, ritual, ideology, and way of life in the direction of a high, and frequently, "twice-born" caste. Generally such changes are followed by a claim to a higher position in the caste hierarchy than that traditionally conceded to the claimant caste by the local community. The claim is usually made over a period of time, in fact, a generation or two, before the "arrival" is conceded.'
>
> (Srinivas 1969, p. 6)

৩.১.৬ নিম্নবর্গীয় সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা

প্রত্যেক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুপ্রাচীন মানব ইতিহাসের মতোই শিক্ষার ধারণাটিও প্রবহমান। শিক্ষা মানবজীবনকে পরিশীলিত ও উদ্দেশ্যমূলক করে তোলে। শিক্ষা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা শিশু বা অপরিণত ব্যক্তিকে জীবনের উপযোগী দক্ষতা ও কৌশল অর্জনে সাহায্য করে। আর এই শিক্ষার প্রাথমিক সূচনা হয় পরিবার, প্রকৃতি ও সমাজ থেকে। পরিবারের মধ্য দিয়েই একজন শিশু সমাজের মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ও আচার-সংস্কার সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে। শিক্ষার মধ্য দিয়েই একজন মানুষের মানসিকতা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, শিক্ষা হল মানুষের মধ্যে বিদ্যমান পূর্ণতার প্রকাশ (Education is the manifestation of the perfection already present in man)। সাম্প্রতিককালে বিশ্বের প্রায় সব জায়গাতেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত, যাকে আমরা প্রথাগত শিক্ষা বলি। আলোচ্য বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা শিক্ষাকে মূলত দুটি অর্থে ব্যাখ্যা করতে পারি। একটি ব্যাপক অর্থে, অন্যটি সংকীর্ণ অর্থে। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল মানুষের জীবনের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি পরিবেষ্টিত সমাজ-মানুষ হল শিক্ষক ও শিক্ষার অঙ্গ। আর এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সর্বাধিক সুযোগ পায়। অন্যদিকে সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষা হল সচেতনভাবে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্যার্জন করা বা কোনো কৌশলকে আয়ত্ত করা। এই অর্থেই আমরা সাধারণত শিক্ষা শব্দটি ব্যবহার করি। সামাজিক শিক্ষার সঙ্গে পুঁথিগত শিক্ষার কিছু পার্থক্য রয়েছে।

প্রথমত, পুঁথিগত শিক্ষার্জনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়। শিক্ষার্থীকে নিয়মিত সেখানে গিয়ে বিদ্যা অর্জন করতে হয়। যেমন- বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়।

দ্বিতীয়ত, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক তৈরি হয়। যেমন শিক্ষক পাঠদান করে শিক্ষার্থী তা গ্রহণ করে।

তৃতীয়ত, পুঁথিগত বিদ্যার্জনে শিক্ষা একটি উদ্দেশ্যমূলক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। যেমন কলাবিদ্যা, মানবীয় বিদ্যা, বিজ্ঞানচর্চা, বাণিজ্যবিদ্যা ইত্যাদি। (কর ১৯৬৫, পৃ. ২৩৫-৩৬)

প্রায় প্রত্যেক সমাজেই এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সমাজের উদ্দেশ্য, প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী সুসংগঠিতভাবে গড়ে তোলা হয়। ফলে সমাজভেদে শিক্ষাব্যবস্থায় ভিন্নতা দেখা যায়। প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পাঠক্রম ও প্রতিষ্ঠান-এই চারটি বিষয় যুক্ত থাকে এবং এই বিষয়গুলির ওপর শিক্ষার গতিশীলতা নির্ভর করে। ফলে সমাজের সর্বস্তরে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। যদিও মানব সভ্যতার আদিপর্বে শিক্ষাদান করা হত পরোক্ষভাবে। অর্থাৎ পরিবার-

পরিজন কর্তৃক সামাজিক শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে গুরুগৃহে ছেলেমেয়েদের নানা কলা-কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া হত। যেমনটা আমরা দেখেছি রামায়ণ ও মহাভারতের সময়কালে। যদিও সেখানে মূলত রাজপরিবারের সন্তানদের বিশেষ উপায়ে শাস্ত্রশিক্ষার পাশাপাশি শস্ত্রশিক্ষাও প্রদান করা হত। তৎকালীন সময়ে গুরুগৃহ ছিল শিক্ষালাভের একটি মাধ্যম। হরিশংকরের 'একলব্য' উপন্যাসে আমরা লক্ষ করেছি গুরু দ্রোণের গৃহে পাণ্ডব ও কৌরব সন্তানদের ধর্ম, পুঁথি, অস্ত্রবিদ্যা প্রদান করা হয়েছে। উপন্যাসের বর্ণনায়

> 'পাণ্ডব-কৌরব সকল কুমার নিয়ে দ্রোণাচার্য তাঁর শিক্ষাদান কার্যক্রম শুরু করলেন। দ্রোণাচার্যের ইচ্ছাতেই রাজপ্রাসাদের বাইরে তাঁর আবাসস্থল নির্ধারিত হলো।' (জলদাস ২০১৬, পৃ. ৭২)

গুরু দ্রোণ জানেন, রাজপ্রাসাদের বাইরে মাতা-পিতার স্নেহচ্ছায়া ও রাজ ঐশ্বর্য থেকে বেরোতে না পারলে শিষ্যদের শিক্ষাজীবন সুসম্পন্ন হবে না। গুরুগৃহে শিক্ষার্জন করার অন্যতম কারণ শিষ্যদের গুরুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রাখা এবং একাগ্র মনে শিক্ষা লাভ করার মানসিক শক্তি অর্জন করা। গুরু গৃহে এই ধরনের শিক্ষার মধ্যেই যে সাম্প্রতিককালের প্রাতিষ্ঠানিক প্রথাগত শিক্ষার বীজটি রোপিত হয়েছিল তা আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না।

হরিশংকর জলদাস তাঁর কথাসাহিত্যে যে তথাকথিত নিম্নশ্রেণি তথা নিম্নবর্গীয় সমাজের কথা তুলে ধরেছেন সে সমাজে আলোচ্য পুঁথিগত শিক্ষার আলো প্রবেশ করতে পারে না। ফলে দিন আনা দিন খাওয়া নিম্নবর্গীয় সমাজ শিক্ষা নিয়ে খুব বেশি ভাবে না। এইসব তথাকথিত প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার উদ্যোগে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ হয় না। যদি তা বহু চেষ্টায় নির্মিত হয়ও, তথাপি তা গ্রাম থেকে সাত-আট মাইল দূরে অবস্থিত। দূরত্বের কারণে অনেকেই শিক্ষার্জনে আগ্রহ হারায় এবং স্থানীয় গৃহ শিক্ষকের কাছে অক্ষর জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করে। জেলেসমাজের শিক্ষা সম্পর্কে 'সুবল জেঠা' গল্পে জানা যায়,

> 'জেলেপাড়াগুলোতে এমনিতেই শিক্ষার আলোবাতাস নেই।... দিন এনে দিন খাওয়াতে ব্যস্ত অধিকাংশ জেলেপরিবার।'
> (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২৩০)

ফলে পরিবারের আর্থিক উন্নতি, কায়িক পরিশ্রমের কষ্ট লাঘব ও লোকবলের কারণেই জেলেসমাজের ছেলেরা শিক্ষার থেকে বঞ্চিত। তাছাড়া আলোচ্য গল্পে দেখা যায় জেলেপাড়ার ছেলেদের শিক্ষার্জন বা পড়াশোনার প্রতি সেরকম ঝোঁক নেই। কারণ তাদের কাছে শিক্ষার চাইতে ক্ষুধার গুরুত্ব অনেক বেশি। তাইতো দেখা যায় একটু মাথা তোলা হলেই জেলে সন্তানেরা জাল ঘাড়ে করে বেরিয়ে পড়ে অধিক রোজগারের আশায়। আসলে সংসারের প্রয়োজনে ও আগামি দিনের ভয়ে তারা তাদের ছেলেদের পড়ায়

না। জেলেসমাজে এটিই প্রচলিত নিয়ম। তাই বলে এমনটা নয় যে, সকলের চিন্তা-চেতনাই এক। সমাজের মধ্যে ব্যতিক্রমী চিন্তা-ভাবনার মানুষেরাও বাস করে, যারা বোঝে শিক্ষার গুরুত্ব, যারা বোঝে সমাজে নিম্নবৃত্তির যন্ত্রণা। তাইতো 'জলপুত্র' উপন্যাসে চন্দ্রমণি সমুদ্রে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর ভুবনেশ্বরী সিদ্ধান্ত নেয়, গঙ্গাপদকে পাড়ার অন্যান্য জেলেসন্তানদের মতো জাল নিয়ে সমুদ্রে যেতে দেবে না।

> 'এরই মাঝে ভুবনেশ্বরী প্রতিজ্ঞা করে—তার ছেলে গঙ্গাপদ পড়াশোনা করবে। হিন্দু-মুসলমানের সন্তানদের মতো সেও শিক্ষিত হয়ে বাপের অপমৃত্যুর দাগ ভুবনেশ্বরীর হৃদয় থেকে মুছে দেবে।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১৩)

যেখানে পড়াশোনা জেলেদের কাছে বিলাসিতা, যেখানে মেয়েরা জন্মেছে সংসার সামলানো আর বছর বছর সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য, যেখানে কোনো জেলে বা জেলেনি চিন্তাই করে না তার সন্তানটি লেখাপড়া শিখুক, সেখানে সন্তানের সুস্থ ভবিষ্যতের জন্য ভুবন শত কষ্টেও ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করায়। স্রোতের বিপরীতে গঙ্গা স্কুলে ভর্তি হলেও তার লেখাপড়ায় বাধা পড়েছে। সাধুবাবার গঙ্গার লেখাপড়ার সম্পর্কিত জিজ্ঞাস্যে ভুবন জানায় তার শ্বশুরের মৃত্যু, গোলকের জায়গা দখল, গঙ্গাকে প্রাণঘাতী কুকুরে কামড়ানো ও সর্বোপরি মায়ের কষ্ট লাঘবের সংকল্পের কারণেই সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। সাধুবাবা সব শুনে দুঃখ প্রকাশ করলেও মনে তার একটিই সংকল্প-

> 'জাইল্যাঅলরে জাগান পড়িবো, অশিক্ষার ঘুমেত্তোন জাগান পড়িবো।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৭৬)

শিক্ষার আলো বঞ্চিত জেলেপাড়ায় তাই সাধুবাবা মৃদঙ্গ বাজিয়ে ঘুরে ঘুরে 'বিদ্যা অমূল্য ধন'- এই কথার মর্মার্থ বুঝিয়ে বেড়ান। সাধুবাবার এই আশায় আলো জাগায় দীনদয়াল মাস্টার। সে তার বাড়ির উঠোনে জলপুত্রদের পাঠদান করে। দীনদয়ালের শিক্ষাদানে জেলেদের মধ্যে আশা সঞ্চিত হয়। কিন্তু সে আশা নিরাশায় পর্যবসিত হয় যখন মাস্টারের সঙ্গে মঙ্গলীর অবৈধ যৌন সম্পর্ক প্রকাশ্যে আসে। সামাজিক বিচার অনুযায়ী তাদের দুজনকে ঢেন্ডেরি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠশালাও চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়। ফলে দেখা যায়-

> 'এই ঢেন্ডেরির মধ্য দিয়ে উত্তর পতেঙ্গার জেলেসন্তানদের শিক্ষিত হওয়ার সকল স্বপ্ন-সাধ ধুলিস্মাৎ হয়ে গেল।'
> (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১২১)

আবার 'দহনকাল' উপন্যাসটি শুরু হচ্ছে রাধানাথ জলদাস তার সাত বছরের ছেলে হরিদাসকে হাত ধরে আদাব স্যারের কাছে পড়তে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দিয়ে। শোনা যায়, শিক্ষকের কাছে রাধানাথের আকুল অনুরোধ,

> 'মাস্টরবাউ, আঁই অশিক্ষিত একজন জাইল্যা, রাধানাথ আঁর নাম। আঁর এই পোয়াউয়ারে তোঁয়ার পাআর উঅর রাই গেলাম। হিতারে মানুষ গইয্যো।' (জলদাস ২০১০, পৃ.৮)

শিক্ষক চিত্তরঞ্জন দে গোটা উত্তর পতেঙ্গা গ্রামে আদাব স্যার নামে পরিচিত। হরিদাস আজ প্রথম তার উঠোন স্কুলে পড়তে গিয়েছে দেখে মা বসুমতীর অপার আনন্দ। সে ভাবে হরিদাসের বয়সী ছেলেরা যেখানে জাল নিয়ে বাবার সঙ্গে মাছ মারতে যায়, সেখানে হরিদাস তাদের বিপরীতে পড়তে গিয়েছে। ভুবনেশ্বরীর মতো বসুমতী ও রাধানাথেরও একই সংকল্প,

> 'হরিদাসেরে আঁই পড়াইয়ম। মাছ মারইন্যা জাইল্যা হইতাম দিতাম নো। পড়ালেখা শিখইন্যা জাইল্যা বানাইয়ম।'
>
> (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৩)

ছেলেকে শিক্ষিত করে তার ভবিষ্যৎ সুন্দর করার সংকল্পের কারণ রাধানাথের পিতার সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে মৃত্যু। এই কারণেই সেও ছেলেবেলায় পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিল। জেলেপাড়ার তৎকালীন শিক্ষিত প্রবীণ জেলে যতীন্দ্রনাথ জলদাসের কাছে রাধানাথ অক্ষর জ্ঞানের পাঠ নেওয়া শুরু করেছিল। কিন্তু গঙ্গাপদর মতোই সে মায়ের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের সংকল্পে লেখাপড়া ছেড়ে মায়ের সঙ্গে মাছ বিক্রি করতে গিয়েছে। শিক্ষার ব্যাপারে উত্তর পতেঙ্গা জেলেপাড়ার অবস্থা আমরা ইতিপূর্বে 'জলপুত্র' উপন্যাসে দেখেছি। 'দহনকাল' উপন্যাসেও সেই একই অবস্থার কথা উল্লেখ আছে। দেখা যায়,

> 'লেখাপড়ার প্রচলন জেলেপাড়ার ধারে-কাছে নেই। এই পাড়া থেকে কেউ স্কুলেও যায় না। শুধু দু'চারজন প্রবীণ থেমে থেমে কোনোরকমে মনসাপুঁথি পড়তে পারে।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৬)

যে পাড়ায় শিক্ষার কোনো গুরুত্ব নেই, সেখানে খু-উ বুইজ্যা নামক বিকৃত মস্তিষ্কের প্রবীণ চরিত্রের কাছে শিক্ষার গুরুত্ব বোঝার মানসিকতা লক্ষ করা যায়। মানুষটি অর্ধ-উন্মাদ বলে পাড়ার ছেলে মেয়েদের কাছে সে এক বিভীষিকা। হরিদাসকে পড়া থেকে ফিরতে দেখে একদিন সে তার পথ আটকায়। হরিদাসকে নানা প্রশ্নের পর তার ওপর এক বিনম্র ভাব জাগে তার। সেও যে কিছুটা পড়াশোনা জানে তা বোঝা যায়। হরিদাসকে সে পড়াশোনার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। একজন প্রকৃত শিক্ষিত মানুষের মনোভাব নিয়ে খু-উ বুইজ্যা হরিদাসকে চিনে নেয় সহজেই। খু-উ বুইজ্যার মতোই শিক্ষার মূল্যবোধ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আরেকজন চরিত্র হল অনন্ত দর্জি। রাধানাথের কাছে হরিদাসের হাইস্কুলে ভর্তি হওয়ার কথা শুনে সে আনন্দিত ও অবাক হয়। জেলেপাড়ায় অশিক্ষার অন্ধকারকে মুছে ফেলার অভিলাষে অনন্ত দর্জি বলে ওঠে,

> 'তোঁয়ার পোয়া হাইস্কুলত্ ভর্তি অইয়ে! আঁত্তোন যে কী ভালা লাগের! লেখাপড়া যে শুধু হিন্দু মুসলমানল্লাই নো, হিয়ান তুঁই প্রমাণ কর।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৯৭)

এক্ষেত্রে 'জলপুত্র'-এর গঙ্গাপদর মতো হরিদাসের পড়াশোনায় কোনো বাধা আসেনি। শত কষ্টেও সে পতেঙ্গা বোর্ড প্রাইমারি স্কুল থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ হয়ে পতেঙ্গা হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। দেখা যায় মেধাবী ছাত্রদের জন্য বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ রয়েছে হাইস্কুলে।

হরিদাস সে সুযোগ পায় এবং কৃতিত্বের সঙ্গে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ করে। উপন্যাসের শেষে রাধানাথের মৃত্যুর পর পিতার স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ভবিষ্যতে সে শিক্ষিত হয়ে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে।

জেলেপাড়ার শিক্ষা প্রসঙ্গে 'দহনকাল'-এর মতোই 'অর্ক' উপন্যাসেও অনেকটা একই ঘটনা দেখি। দিবাকর প্রথম থেকেই মেধাবী ছাত্র। সেও হরিদাসের মতো পতেঙ্গা বোর্ড প্রাইমারি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি পাশ করে। বলরাম জানে বিদ্যার চেয়ে মূল্যবান কিছু নেই, সেও ছেলেবেলায় পড়াশোনা করেছে, কিন্তু সাংসারিক চাপে মাঝপথে পড়াশোনা বন্ধ করতে হয়েছে তাকে। সে চায় দিবাকর পড়াশোনা করুক কিন্তু বলরাম দরিদ্র, অসহায় পিতা। তাই দিবাকরের শিক্ষার অবসান ঘটাতে চায়। কিন্তু দিবাকরের ঠাকুমা ছেলের সিদ্ধান্তে রাজি নয়। সে বলত,

> '...ধনসম্পদ চুরি হয়ে যায়, নাও জাল দরিয়ায় ভেসে যায়, কিন্তু লেখাপড়া চুরি হয় না, ভেসেও যায় না। তুই তো পারলি না বলরাম লেখাপড়া করতে, তোর ছেলেমেয়েকে পড়াশোনা করাস। তাহলে তাদেরকে তোর মতো রাক্ষুসী সমুদ্রে যেতে হবে না, আমার মতো মাথায় খাড়াং নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় মাছ বেচতে হবে না। হিন্দুপাড়ার বাবুদের মতো তারা অফিস-আদালতে চাকরি করবে।' (জলদাস ২০১৭, পৃ. ১২-১৩)

এরই মধ্যে ঘটনাক্রমে দেখা যায় দিবাকর প্রথম স্থান অধিকার করে পঞ্চম শ্রেণি পাশ করে। পতেঙ্গা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সত্যব্রত চক্রবর্তী এই খবর শুনে দিবাকরকে প্রায় বিনা বেতনে স্কুলে ভর্তি করার আর্জি নিয়ে আসে। বিনা বেতনে দিবাকরের পড়ার সুযোগ শুনে বলরামের সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর হয়। জানা যায়, পতেঙ্গায় তিনটি সরকারি প্রাইমারি স্কুল। এই স্কুলগুলো থেকে পাশ করে ছেলেমেয়েরা আর পড়াশোনা করে না, কারণ গ্রাম থেকে সাত মাইল দূরে অবস্থিত বেগমজান হাইস্কুল। সেখানে পড়ানোর আর্থিক সঙ্গতি নেই জেলেদের। প্রাসঙ্গিকভাবে বলতে হয়, জেলেপাড়ায় শিক্ষা নিয়ে কেউ না ভাবলেও আলোচ্য উপন্যাসে কিন্তু এর উল্টো ঘটনা দেখা গিয়েছে। হঠাৎ করেই পতেঙ্গা গ্রামের কিছু অল্প শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে জোয়ার এলো যে তারা গ্রামে একটি হাইস্কুল নির্মাণ করবে। জানা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পতেঙ্গার কাটগড়ে আমেরিকান সৈন্যরা থাকা খাওয়ার জন্য একটি হলরুম বানিয়েছিল। সেই পরিত্যক্ত ঘরে

> 'এক সকালে ঘরটির সামনে সাইনবোর্ড টাঙানো হল—পতেঙ্গা হাইস্কুল, স্থাপিত : ১৯৬২ খ্রি.। ওই বছরেই পড়ানো শুরু হয়েছিল।..শিক্ষক সর্বসাকুল্যে পাঁচজন।' (জলদাস ২০১৭, পৃ. ১৯)

এই স্কুলেই দিবাকর পড়াশোনা করেছে এবং দশম শ্রেণিতে এসে পৌঁছেছে 'জলপুত্র'-এর সাধুবাবা, 'দহনকাল'-এর খু-উ বুইজ্যার মতো 'অর্ক' উপন্যাসেও জানা যায় এক নামহীন অর্ধ-উন্মাদ প্রবীণের কথা

যিনি পিঠে বস্তা নিয়ে জেলেপাড়ায় ঘোরে। সকলে তাকে ছেলেধরা ভাবলেও দিবাকরের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে একজন শিক্ষিত গুণী মানুষ হিসেবেই। সেই নামহীন ব্যক্তি দিবাকরকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা শোনায়, কিং লিয়ার নাটকের সংলাপ শোনায়, আর দিবাকরকে নানা প্রশ্ন করে। দিবাকরের মেধার পরিচয় পেয়ে উন্মাদ প্রবীণ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। খু-উ বুইজ্যার মতোই সে দিবাকরের মধ্যে শিক্ষার পরিচয় পায়।

'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসেও লক্ষণীয় গতানুগতিক জেলেজীবনের বিপরীতে গিয়ে শিবশঙ্কর প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অর্জন করে জেলেসমাজের প্রথম এম.এ পাশ একজন শিক্ষিত মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। শত বাধা সত্ত্বেও মাইজপাড়ায় তার পিতার মামার বাড়িতে থেকে চট্টগ্রাম কলেজে পড়াশোনা শেষ করেছে শিবু। ইতিপূর্বে আলোচিত উপন্যাসগুলিতে ভুবনেশ্বরী, রাধানাথ, বলরামদের মতো শিবুর পিতা সুধাংশুও ছেলেকে জেলে হতে দিতে চায়নি। শিবু যখন কলেজে ভর্তি হয়েছে তখন আনন্দে-বিস্ময়ে একজন অসহায় পিতার মুখ দিয়ে শোনা যায়,

> '...তুই আমাকে আজ জয়ী করলি বাপ।... সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নেমে বারবার হেরেছি। যতবার হেরেছি, গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সমুদ্রকে বলেছি—দেখে নিস বঙ্গসাগর, একদিন আমি তোকে হারাবই।... আজ দেখ, আমার বেটা শিবশঙ্কর তোর দিকে পিছন ফিরে কলেজে গেছে। সে এখন তোর দাস নয়, সে জলদাস নয়, সে এখন মা সরস্বতীর দাস। সে আমার মতো তোর ক্রীতদাস হবে না।' (জলদাস ২০১৯, পৃ. ১১)

'জলপুত্র', 'দহনকাল', 'অর্ক' উপন্যাসের মতোই 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসেও জানা গেল পিছিয়ে পড়া গ্রামের মধ্যে উত্তর পতেঙ্গা একটি। সেখানে পাকারাস্তা নেই, বিদ্যুৎ নেই, স্কুলও ছিল না একটা সময়। পরবর্তীকালে পতেঙ্গা হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হলেও শিক্ষক সংকটে নামমাত্র স্কুলে পরিণত হয় হাইস্কুলটি। জেলেপাড়ার সুধাংশু শিক্ষামনস্ক বলে সে তার ছেলেদের লেখাপড়ার দিকে মনোযোগ দিয়েছে। দেখা যায় শিবু বাদে সূর্যমোহন, সীতানাথ ও ব্রজেন্দ্র যথাক্রমে হাইস্কুল ও প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা করে। মেয়ে ফাল্গুনীও পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে। এম.এ পাশ করে শিবু গ্রামে ফিরে এলে পতেঙ্গা হাইস্কুলের সিরাজ স্যার শিবুকে পাশের গ্রামের নবনির্মিত সাজনমেঘ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে চাকরির প্রস্তাব দেন। শিবুর চার বছরের প্রচেষ্টায় স্কুলটি সুনাম অর্জন করে। তাহলে দেখা গেল, অশিক্ষা ও অন্ধকার পরিবেশ থেকে উঠে আসা একজন জেলেসন্তান শিক্ষা অর্জনের মধ্য দিয়ে সমাজে যে নিজের মূল্যবোধ ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে তা জেলেসমাজের কাছে স্বপ্নের নামান্তর। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে কলেজের অধ্যাপক হয়েছে। শিক্ষার মান মর্যাদায় পূর্ণ শিবু সন্তানদের সুস্থ ও শিক্ষার পরিবেশ দেওয়ার জন্য উত্তর পতেঙ্গা ত্যাগ করে চট্টগ্রাম শহরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে যায়। আমরা দেখেছি তার

কন্যা ও পুত্র দুজনেই ইংরেজি মাধ্যম স্কুল থেকে পড়াশোনা করে পরবর্তীকালে যথাক্রমে শিক্ষক ও ডাক্তার হয়ে ওঠে। যে সমাজে জেলের ছেলে জেলে হওয়াই ভবিতব্য সেখানে শিবশঙ্কর যেন জেলেসমাজের ভগীরথে পরিণত হয়েছে।

জেলেসমাজে পড়াশোনাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া না হলেও কিছু ভিন্ন মানসিকতার জেলে বিদ্যাকে অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচনা করে। তারা শত বাধা বিপত্তিতেও তাদের সন্তানদের স্কুলের চৌকাঠ অব্দি পৌঁছে দিয়েছে। 'প্রতিশোধ' গল্পে দেখা যায়,

> ''এই সমাজে অন্যরকম দু'একজন তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠায়। তারা সমাজে একটু আউলাঝাউলা মানুষ হিসেবে বিবেচিত। সমাজমানুষরা তাদের দিকে করুণা বা উপহাসের দৃষ্টিতে তাকায়। বলে, 'দুইবেলা ভালো করে ভাত জোটে না, তার উপর পড়ালেখা। নিজের শোয়ার জায়গা নেই, অন্তরারে ডাকো।'' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৮০)

আবার 'সুবল জেঠা' গল্পে সুবলের দারিদ্র্য ও অসহায়তা থাকা সত্ত্বেও ছেলেদের ভালো শিক্ষা দেওয়ার জন্য বাড়ির চালের টিন পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে চেয়েছে। কিন্তু হীরামোহন ও সুখমোহন মেধাবী বলে বাড়িতে নিজের চেষ্টায় পড়াশোনা করেছে তারা। গল্পে জানা যায়,

> 'প্রাইভেট টিউটর ছাড়া নিজ চেষ্টায় ভালোভাবেই এসএসসি পাস করল হীরামোহন। পাস দিয়ে সরকারের তরফ থেকে বৃত্তিও পেল। কক্সবাজার সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে মেরিন একাডেমিতে ভর্তি হলো হীরামোহন।'
> (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২৩২)

দাদার প্রচেষ্টা দেখে সুখমোহনও বিজ্ঞান বিভাগে এইচএসসি পাস করে চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজে ভর্তি হয়। দুই ভাইয়ের পড়াশোনার খরচ মেটাতে গিয়ে সুবল জেঠার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লেও কখনো দুঃখ প্রকাশ করেনি সে। শুধু মনে তার একটিই সংকল্প জেলের ছেলে জেলে হবে না কিছুতেই। জীবনের সর্বস্ব দিয়ে ছেলেদের শিক্ষিত করার মধ্য দিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছে সুবল জলদাস।

'কসবি' উপন্যাসে ইতিপূর্বে পতিতাদের যে সমাজের আমরা পরিচয় পেয়েছি সেখানে পতিতারা সর্দার-মাসিদের হাতের পুতুল। দেহ বেচাকেনা ও পতিতাদের দিয়ে অর্থ উপার্জনই সমাজের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু এর মাঝেও পতিতাদের মনে প্রেম-ভালোবাসা ও বিয়ের মতো পরিণতি রয়েছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গর্ভে জারজ সন্তান ধারণ করেছে তারা। সেই সন্তানদের মাতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি তাকে শিক্ষিত করে পতিতাপল্লির ঘৃণ্য সমাজ থেকে আলাদা অর্থাৎ তথাকথিত ভদ্র সমাজের জগতে পাঠাতে চেয়ে এক সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে চেয়েছে পতিতারা। উপন্যাসে তাই দেখি, পতিতাপল্লির মমতাজ নাম্নী একজন পতিতার গর্ভে এক জারজ কন্যাসন্তান জন্ম নেয়। পেশায় একজন বেশ্যা হলেও তার স্বপ্ন মেয়েকে শিক্ষিত করে সভ্যসমাজের মেয়েদের মতো জীবন দেওয়ার। তাই বেশি উপার্জনের আশায় দুজন কাস্টমারকে সে

একসঙ্গে ঘরে তোলে। তারা সিগারেটের ছ্যাঁকা দেয় তার স্তনে ও বুকে। এই পাশবিক নির্যাতন সহ্য করেও সে তার মেয়েকে শিক্ষিত করার স্বপ্নে অটল থাকে। কিন্তু বনানী নামক কসবি জানে এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না এখানে। তাই সে বলে,

'মাইয়া পড়াইয়া লাভ কী? হেও তো তোমার মতো একদিন রাস্তার ধারে দাঁড়াইবো।' (জলদাস ২০১১, পৃ. ৭৯)

আবার মোহিনী মাসি তার ছেলে কৈলাসকে পতিতাপল্লির নোংরা ঘৃণ্য জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য জলধি গ্রামের মরিয়ম একাডেমিতে পড়াশোনার জন্য পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে এসএসসি পাস করে একদিন পতিতাপল্লিতেই ফিরে আসে কৈলাস। কৈলাসের ফিরে আসা পতিতাপল্লিতে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করে। সে দেখে পল্লির ছোটো ছোটো পতিতা সন্তানরা অশিক্ষায় নিমজ্জিত। কৈলাস ঠিক করে সে তাদের পড়াবে। মন্দিরের বারান্দায় কৈলাস তাদের অক্ষর জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করলে পাড়ার সর্দার-মাস্তানরা তাকে বাধা দেয়। কারণ শিক্ষিত ব্যক্তি সচেতন ও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এই বেজন্মা ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হয়ে উঠলে ভবিষ্যতে তারা বাধার কারণ হয়ে উঠবে, ফলে

'শিক্ষাকে তারা শত্রু ভাবে। শিক্ষিত মানুষ প্রতিবাদী হয়। অশিক্ষিতদের সহজে শোষণ করা যায়। অশিক্ষিতরা নির্বিরোধী। পতিতার সন্তানরা শিক্ষিত হয়ে উঠলে তারা সচেতন হবে, অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হবে।'

(জলদাস ২০১১, পৃ. ১১৩)

কিন্তু কৈলাস বাধা মানে না। তার সংকল্প হল, পতিতা ও পতিতা সন্তানদের জন্য সুস্থ ও সুন্দর ভবিষ্যৎ তৈরি করা। কিন্তু সর্দার ও মাস্তানরা মিলে কৈলাসকে খুন করে তাকে চিরতরে থামিয়ে দেয়।

'রামগোলাম' উপন্যাসেও দেখি সমাজের অস্পৃশ্য মেথর জাতিরা যতই শিক্ষিত হোক না কেন, তাদের ভবিতব্য ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করা। মেথরদের ভবিতব্য জানা সত্ত্বেও চাঁপারানী সিদ্ধান্ত নেয় সে রামগোলামকে পড়াবে। তার স্বপ্ন ছেলে তথাকথিত ভদ্র সমাজের বাবুদের মতো শিক্ষিত হয়ে বড়ো চাকরি করবে। ময়লা আবর্জনা টানবে না সে। স্ত্রীর মুখে এই স্বপ্নের কথা শুনে চুপ করে থাকে শিবচরণ।

'চাঁপারানীর স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের যে কত বড়ো ফারাক, তা বোঝাবে কী করে শিউচরণ! মেথরদের যে লেখাপড়া করতে নেই, তাদের যে স্কুলে যেতে নেই, স্কুলে বসার ঠাঁই নেই, ভদ্রলোকের সন্তানদের পাশে বসে মেথর সন্তানের পড়ার যে অধিকার নেই—এই রূঢ় কঠিন কথাগুলো এই প্রশান্ত রাতে চাঁপারানীকে বলতে ইচ্ছে করল না শিউচরণের।'

(জলদাস ২০১২, পৃ. ২৭)

বিশেষত মেথরদের জন্য পাকিস্তান সরকার দ্বারা ফিরিঙ্গিবাজার সেবক কলোনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও সমাজের তথাকথিত ভদ্রলোকেরা স্কুলটি দখল করে মেথরদেরই সেখানে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছে। সর্দার গুরুচরণ সব মেথরদের একত্রিত করে প্রতিবাদ করলে এক রাতে তাকে মারধর

করে ভদ্রলোকেরা। বর্তমানে স্কুলে চারজন শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক কল্যাণী সরকার এবং অন্য তিনজন হলেন কুতুবুদ্দীন, শ্যামলী দে ও হরিমোহন জলদাস। একদিকে ভদ্রলোকেদের বঞ্চনা অন্যদিকে মেথরদের প্রতি অবহেলার মনোভাবও রয়েছে কিছু শিক্ষকের। বিশেষ করে শ্যামলী ও হরিমোহনের একমত যে মেথররা জন্মেছেই ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য।

'নোংরা ঘৃণ্য এই মানুষগুলো ভদ্রলোকদের গু-মুত টানার জন্য জন্মেছে। পড়ালেখা তাদের জন্য না।'

(জলদাস ২০১২, পৃ. ৪২)

আমরা জানি, একজন শিক্ষকের কাছে তার ছাত্রের জাতবিচার করা অনৈতিক ও অনুচিত। শিক্ষকের ধর্ম জাতপাত, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে শিক্ষাদান করা। কিন্তু মেথর সমাজের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ধর্ম পালন করতে দেখা যায়নি শ্যামলী ও হরিমোহনকে। কিন্তু অন্যদিকে কল্যাণী ও কুতুবুদ্দিনকে শিক্ষকের ধর্ম পালন করতে দেখা গিয়েছে। খুব বেশি মেথর সন্তানেরা স্কুলে পড়তে আসে না দেখে কুতুবুদ্দিন চিন্তিত। কারণ তাদের জন্যই এই স্কুল নির্মিত। কিন্তু চারটি মেথরপট্টি থেকে একমাত্র মেথর সর্দারের নাতি রামগোলাম এইস্কুল থেকে যখন এসএসসি পাস করে তখন কুতুবুদ্দিন ও কল্যাণীর আনন্দের সীমা থাকে না। রামগোলাম এসএসসি পাস করার পর তার পড়াশোনায় বাধা পড়ে। গুরুচরণই তাকে এক প্রকার থামিয়ে দেয়। কারণ

'বিদ্যার পরিমাণে চাকরি পাবে না রামগোলাম। যতই পাস দিক, চাকরি তো একটাই—গু-মুত আর আবর্জনা সাফাই করা। ভদ্রলোকদের অফিসে চাকরি চাইতে গেলে রামগোলামকে চাকরি দেবে না। ... মেথর-সন্তান হিসেবে পরিচয় পেয়ে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে। বেশি বিদ্যা রামগোলামের জীবনে তখন কাল হয়ে দেখা দেবে।'

(জলদাস ২০১২, পৃ. ৬২)

তাহলে দেখা গেল, সমাজভেদে শিক্ষা অর্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেলেসমাজে শিক্ষা অর্জনে জাতপাতের প্রশ্ন উঠলেও কিছু শিক্ষামনস্ক জেলেরা তাদের সন্তানদের সর্বস্ব ত্যাগ করে পড়াশোনা করিয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ জেলেরা অত্যন্ত দরিদ্র বলে পড়াশোনার বাড়তি খরচ চালাতে পারেনি ফলে অর্ধপথে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা থামিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। তবে শিবশঙ্কর, হীরামোহন জেলেসন্তান হয়েও সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। পতিতাসমাজেও পতিতা সন্তানদের শিক্ষা অর্জনে বাধ সেধেছে সমাজের সর্দার-মস্তানরা। আবার মেথরসমাজেও মেথর সন্তানদের লেখাপড়ার বিষয়টি একটি স্পর্ধার ব্যাপার হয়ে উঠেছে। আলোচ্য প্রতিটি সমাজের ক্ষেত্রেই শিক্ষার একটি সাধারণ বাধা হল শিক্ষার্থী অন্ত্যজ শ্রেণি থেকে উঠে আসা। শুধু তাই নয়, মুচি সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রেও একই বাধার সৃষ্টি হয়েছে। 'কোটনা' গল্পে দেখি মুচি রামদুলাল সিদ্ধান্ত নেয়, ছেলেকে মুচিগিরি করতে দেবে না।

ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করাতে নিয়ে গেলে প্রধান শিক্ষক ভর্তি করাতে নানা টালবাহানা করেছেন। তার বক্তব্য,

'মুচির ছেলে পড়বে! জুতো সেলাই করবে কে?' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ১২)

নিম্নবর্গীয় সমাজ শিক্ষার মান ও মূল্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হলেও কিছু পরিবারের মাতা-পিতার স্বপ্ন- ছেলেকে শিক্ষিত করে নিম্নবর্গীয় সমাজের অবমাননা থেকে মুক্তি দিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখান। 'জলপুত্র'-এর গঙ্গাপদ, 'দহনকাল'-এর হরিদাস, 'কসবি'-এর কৈলাস, 'রামগোলাম'-এর রামগোলাম, 'অর্ক'-এর দিবাকর, 'প্রস্থানের আগে'-এর শিবশঙ্কর, 'সুবল জেঠা' গল্পের হীরামোহন নিম্নবর্গীয় চেতনায় নিমজ্জিত না থেকে প্রথাগত শিক্ষা অর্জন করেছে, সমাজের আর পাঁচজনের মতো শিক্ষিত হয়েছে তারা। এর মধ্যে কেউ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কেউ সংসারের অভাব মেটাতে বা সাংসারিক ও সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে, কেউ উচ্চবর্গের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পড়াশোনা মাঝপথে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। এই বাধা-বিপত্তিকে নিম্নবর্গের মানুষগুলি দুর্ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, নিম্নবর্গীয় সমাজ ছেলেদের শিক্ষিত করার যে চেষ্টা দেখিয়েছে সেদিক থেকে নারীশিক্ষার প্রয়োজন তেমন অনুভব করেনি নিম্নবর্গের সমাজ। তাইতো 'দহনকাল' উপন্যাসে নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে আদাব স্যারের কণ্ঠে শোনা যায়,

'আমাদের গ্রামটি তো একেবারে অন্ধকারে ডুবে আছে। তোমরা দু'তিনজন লেখাপড়া করে এগাঁয়ে একটু হলেও পিদিম জ্বালাবে। নারীদের শিক্ষা আগে প্রয়োজন। গাঁয়ের লোকেরা সেটা বুঝতে চায় না। মেয়েদের পড়াতে চায় না।'

(জলদাস ২০১০, পৃ. ৮)

'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসেও লক্ষ করি শিবশঙ্করের পিতা সুধাংশু ছেলেদের পড়ার প্রতি দৃষ্টি দিলেও মেয়ে ফাল্গুনীকে পড়ানোর সময় আপত্তি করেছে। কিন্তু শিবুর মতে শুধু ছেলেদের শিক্ষিত করলেই হবে না মেয়েদেরও শিক্ষিত হওয়া উচিত। একজন নারী হয়ে তাই তার স্ত্রী অহল্যাও বলে ওঠে,

'আমি মুরখ বইলে আমার মাইয়া মুরখ থাইকবে ক্যান? তুমি ফাল্গুনীরে ইস্কুলে পাঠাও।' (জলদাস ২০১৯, পৃ. ৫০)

'কোটনা' গল্পে রামদুলাল ছেলেকে পড়ালেও মেয়েকে পড়ানোর সময় প্রশ্ন তুলেছে,

'দুলালীকে পড়ানোর দরকার কী? আইএ, বিএ পাস করেও তো মুচির ঘরে গিয়া চুলা ঠেলবো। মুচির ঘরে শিক্ষিত ছেলে কই?... দরকার নাই দুলালীকে পড়ানোর।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ১৪)

আবার 'সুবল জেঠা' গল্পে দেখা যায়, সুবল জেঠা তার মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার পর ছেলেদের পড়াশোনার দিকে মনোযোগ দিয়েছে। তবে এর উল্টো ঘটনাও দেখা যায় 'প্রতিশোধ', 'জামাইখেকো', 'চিঠি' প্রভৃতি গল্পে। প্রতিশোধ গল্পে দেখি সোমেশ্বর জলদাস তার কন্যা মাধুরীকে

পড়াশোনা করাবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। যেখানে ছেলেদেরই স্কুলে পাঠান হয় না সেখানে মেয়েদের লেখাপড়ার কথা সমাজে একটি স্পর্ধা হিসেবেই দেখা হয়েছে। গল্পে দেখি,

> 'সবাই আকাশ থেকে পড়ল। পাড়াপড়শিরা বলল, 'সোমেশ্বর পাগল অইয়া গেছে। যেইখানে মরদপোলাদের ইস্কুলে পাঠানো হয় না, সেইখানে মাইয়াপোলাকে পড়ানো! সাহেবদের কোয়ার্টারে চাকরি কইরা মাথাডা আইলাঝাউলা হইয়া গেছে সোমেশ্বরের।''
> (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৮০)

লক্ষণীয় মেয়েদের পড়ানোর বিষয়ে জেলেসমাজ রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছে। নারী শিক্ষার সমর্থনে এক পিতাকে পাগল আখ্যা দিয়েছে সমাজ। কিন্তু তবু সমাজকে উপেক্ষা করে মাধুরীকে লেখাপড়া শিখিয়েছে সোমেশ্বর। অন্যদিকে 'জামাইখেকো' গল্পে আরতি শিক্ষার ব্যাপারে ভিন্ন মানসিকতার। কেবল অক্ষর জ্ঞান অর্জনে সে তৃপ্ত নয়। সে নিজে এইচএসসি পাস। তাই সে চায় তার মেয়ে উর্বশী স্কুল কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ুক। নিজের অপূরিত আকাঙ্ক্ষা মেয়ের মধ্য দিয়ে পূরণ করতে চেয়েছে সে। কিন্তু নারীশিক্ষায় সমাজের বাধা রয়েছে।

> 'উর্বশীকে পড়ালেখা শেখাবে—এই-ই বাসনা আরতির। জেলেদের মধ্যে ছেলেরাই পড়ে না তেমন করে, তার ওপর মেয়েদের পড়ালেখা! ...দু'চার পাতা পড়তে শিখলেই বিদ্বান বলে স্বীকৃত। দু'চার পাতা বিদ্যে দিয়েই পুঁথিপাঠ, রামায়ণ-মহাভারত অধ্যয়ন। ওতেই তৃপ্ত জেলেরা।'
> (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৩৭৮-৭৯)

আবার 'চিঠি' গল্পে নামহীন চাষি পিতাকে লেখা নামহীন মেয়ের চিঠিতে জানা যায় মেয়ের জন্ম হওয়ায় পিতা খুশি নয়। কারণ সমাজ ও শাস্ত্র অনুযায়ী মেয়ে দিয়ে বংশরক্ষা হয় না। তাই মেয়ে জন্মানোর তিন মাস পরে তার মা পুনরায় গর্ভবতী হয়। এবার তার পিতা একটি পুত্র সন্তান লাভ করলেও পরবর্তীকালে সে জড়বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। ফলে তার মায়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করায় পিতা।

> 'তুমি আমাকে শ্যামাসুন্দরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিলে। প্রথমদিনে স্কুলের পথে হাঁটতে হাঁটতে তুমি আমাকে বলেছিলে, 'তোমারে অনেক পাস দিতে অইবো। অনেক বড়ো অইতে অইবো।'
> (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ১৩০)

তাহলে দেখা গেল, সমাজে ন্যুনতম প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে বিস্তর বাধা তো রয়েছেই, কিন্তু তারমধ্যেও বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষার্জনের প্রতি রয়েছে সামাজিক অবহেলা। তাছাড়া নিম্নবর্গীয় সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় অচল, অনুন্নত ও নিম্নমানের। কিন্তু তবুও হরিশংকরের কথাবিশ্বে বর্ণিত কথাবিশ্বের কেন্দ্রীয় পরিবারের সন্তানেরা পড়াশোনার জন্য শত বাধা অতিক্রম করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথাগত শিক্ষা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। লক্ষণীয় এই শিক্ষা কেবল পুঁথিগত শিক্ষা হয়ে থাকেনি, শিক্ষা অর্জনের মধ্য দিয়ে গল্প-উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রদের সামাজিকীকরণও হয়েছে।

'অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার দ্বারা সমাজ প্রত্যেক সদস্যকে তার রীতিনীতি, আচার-আচরণ ইত্যাদি গ্রহণ করতে শিক্ষা দেয় বা তার বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চালিত করে তাকেই বলা হয় সামাজিকীকরণ।' (চক্রবর্তী ২০০২, পৃ. ২২১)

আসলে মানুষ সামাজিক প্রাণী হলেও সে সামাজিক হয়ে জন্মায় না। তাকে সামাজিক করে তুলতে হয়। মানুষ যে সমাজে জন্ম নেয়, সেই সমাজের রীতিনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়, যা সেই সমাজে বসবাসকারী মানুষ দ্বারা সৃষ্ট সামগ্রিক জীবনবোধ। তবে শুধুমাত্র এই জীবনবোধই ব্যক্তিকে সামাজিক করে তুলতে পারে না। এর সঙ্গে সঙ্গে পুঁথিগত শিক্ষার কলাকৌশল ও দক্ষতারও প্রয়োজন হয়। তবেই ব্যক্তির উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ও বিচার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে শুধু সামাজিক জীবনবোধই নয়, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দ্বারা মানুষের যে পরিশীলিত মানসিকতা তৈরি হয় তা সেই নির্দিষ্ট সামজিক জীবনবোধকে আরো প্রসারিত দৃষ্টিতে দেখার ক্ষমতা প্রদান করে। সুতরাং ব্যক্তি-মানুষের সামাজিকীকরণের জন্য যে সব পথ অবলম্বন করা হয় শিক্ষাব্যবস্থা তার মধ্যে অন্যতম। শিক্ষাই ব্যক্তি ও সমাজকে সমন্বিত করে এবং সমাজের মধ্যে মানুষকে একটি মর্যাদা দান করে। এর ফলে মানুষের সমাজভেদে একটি সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ শিক্ষা ও সমাজবোধের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও পরিবর্তন সাধিত হয়। কারণ বুদ্ধি দ্বারা জীবনধারার বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পরিচিত হলে তা ব্যক্তির মনন ও চিন্তনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। ফলে ব্যক্তির পরিবর্তিত মননপ্রকৃতির সঙ্গে সমাজপ্রকৃতির সাযুজ্য ঘটে এবং সমাজ-মানুষের ভালো-মন্দের দিকটি সম্পর্কে ব্যক্তি সচেতন হয়ে ওঠে।

উপরিউক্ত বক্তব্যের প্রতিফলন আমরা কথাবিশ্বের গঙ্গাপদ, হরিদাস, শিবশঙ্কর, রামগোলাম, কৈলাস, দিবাকর, আরতি, মাধুরী ইত্যাদি চরিত্রের মধ্যে লক্ষ করেছি। নিম্নবর্গীয় গতানুগতিক সমাজে আলোচ্য চরিত্রেরা সমাজের নানা স্থবিরতাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছে। গঙ্গাপদ শিক্ষিত হয়ে উঠলে সে বুঝতে পারে মান-অপমানের ভেদাভেদ। তাইতো হাটে মাছ বিক্রি করতে গিয়ে এক মৌলবি ভুবনকে আঘাত করলে সে প্রতিবাদ করে ওঠে। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে দাদনদারদের শোষণ সম্পর্কে সে জেলেদের বোঝায়। গঙ্গা তাদের থেকে দাদন না নেওয়ার পরামর্শ প্রদান করে এবং জেলেদের একত্রিত করে প্রতিবাদ করে। আবার 'দহনকাল'-এ হরিদাসকে দেখা যায়, স্বল্প ইংরেজি জ্ঞান দ্বারা সে পাকসেনাদের বোঝাতে সমর্থ হয় যে তার বাবা রাধানাথ সামান্য জেলে, সে ইন্ডিয়ার দালাল নয়। পরবর্তীকালে হরিদাস এই পাকসেনাদের অত্যচারের বিরুদ্ধে জেলেদের একত্রিত করে প্রতিবাদ গড়ে তোলে। 'অর্ক' উপন্যাসে দিবাকর শিক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ হয়

এবং সে ঠিক করে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেবে। উপন্যাসের শেষে তাই সে মুক্তিযোদ্ধা রহমালির সঙ্গে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ে। আমরা ইতিপূর্বে 'কসবি' উপন্যাসে জেনেছি, অশিক্ষিত মানুষ নির্বোধ হয়। শিক্ষা মানুষকে অধিকার সচেতন ও প্রতিবাদী করে তোলে। শিক্ষিত মানুষকে সহজে শোষণ করা যায় না। যেমনটা আমরা দেখলাম কৈলাসের ক্ষেত্রে। শিক্ষিত মানসিকতা নিয়ে সে উপলব্ধি করতে পারে পতিতা সমাজে পতিতাদের নিদারুণ যন্ত্রণার কথা। তাই সে তাদের মধ্যে সত্যাসত্যের পার্থক্য বোঝায় ও প্রতিবাদ করার পরামর্শ দেয়। শুধু তাই নয়, পতিতা সন্তানদের শিক্ষিত করার সংকল্পে সে নিজে তাদের মন্দিরে পাঠদান করে। আবার 'রামগোলাম' উপন্যাসে রামগোলাম শিক্ষিত হয়ে মেথর সমাজের অন্ধকার দিকগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়। যে চাকরি কেবল মেথরদের জন্য বরাদ্দ সেই চাকরি সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয় কর্পোরেশন। রামগোলাম বুঝতে পারে এর পরিণাম মেথরদের জন্য মারাত্মক, ফলে সে মেথরদের একত্রিত করে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। সুতরাং নিম্নবর্গীয় সমাজে নিরক্ষর অশিক্ষিত মানুষগুলির সহজ ও সরলতার সুযোগ নিয়ে যেভাবে তাদের বঞ্চনা করা হয়েছে, সেখানে শিক্ষিত মনস্ক কিছু মানুষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। কারণ শিক্ষা সেইসব চরিত্রদের মধ্যে উন্মুক্ত উদ্ভাবনী শক্তির জাগরণ করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, সমাজের এই তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষ শিক্ষা সম্পর্কে তেমন সচেতন নয়। বর্তমান যুগে দাঁড়িয়েও অসচেতনতার কোনো পরিবর্তন হয়নি। যেদিন নিম্নবর্গীয় সমাজ শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন হয়ে শিক্ষাকে জীবনের আবশ্যিক শর্ত হিসেবে গ্রহণ করবে সেদিন নিম্নবর্গের সার্বিক অর্থে সামাজিকীকরণ ঘটবে।

৩.২ হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে নিম্নবর্গের অর্থনৈতিক জীবন

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা সকল সমাজেই আছে। কিন্তু সেই উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে নানা শ্রমবিভাগ। সেই শ্রমবিভাগ পেশার ভিত্তিতে হতে পারে, নারী-পুরুষ অর্থাৎ লিঙ্গ ভেদেও হতে পারে। কার্ল মার্ক্সের মতে, শ্রমবিভাগ প্রবর্তনের ফলেই সামাজিক শ্রেণি বিভাগের সৃষ্টি হয়েছে, যা সামাজিক মানুষের মধ্যে একটি বিচ্ছিন্নতা-বোধ তৈরি করেছে। সেই কারণেই মার্ক্স ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করে সমাজতন্ত্রের মধ্য দিয়ে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য,

> 'In communist society, where nobody has one exclusive sphere of activity but each can become accomplished in any branch he wishes, society regulates the general production and thus makes it possible for me to do one thing today and another tomorrow, to hunt in the morning, fish in the

afternoon, rear cattle in the evening, criticise after dinner, just as I have a mind, without ever becoming hunter, fisherman, shepherd, or critic.' (Feuer (ed.) 1989, p. 254)

অর্থাৎ, কমিউনিস্ট সমাজে কাউকেই কোনো নির্দিষ্ট কাজে আবদ্ধ থাকতে হবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ রুচি ও ইচ্ছে অনুযায়ী কাজকর্ম করতে পারবে। উৎপাদন ব্যবস্থা সমাজের নিয়ন্ত্রণে থাকলে একজনের পক্ষে আজ এক কাজ ও কাল অন্য কাজ করা সম্ভব হবে। এমন কি একজন সকালে পশু শিকার, দুপুরে মৎস্য শিকার, বিকেলে পশুপালন এবং রাতে খাওয়ার পর তার্কিক আলোচনা করে সময় কাটাতে পারবে। সুতরাং কাউকেই আজীবন শিকারি, জেলে, পশুপালক বা সমালোচক হয়ে থাকতে হবে না। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। ফলে শ্রমভেদে সামাজিক শ্রেণিবিভাজন সামাজিক প্রথায় পরিবর্তিত হয়েছে। শ্রমবিভাজিত মানুষ তাই নিজেদের ইচ্ছে মতো কাজ করতে পারে না। কামার, কুমোর, মেথর, মুচি, নাপিত, জেলে, পতিতা, চাষি ইত্যাদি পেশার মানুষকে আজীবন বাধ্য হয়ে পুরুষানুক্রমিকভাবে সেই পেশাতেই আবদ্ধ থাকতে হয়। আর এই পেশাই হয়ে উঠেছে তাদের সামাজিক পরিচয়।

ইতিপূর্বে আমরা আলোচ্য অধ্যায়ের ভূমিকা অংশে স্পষ্ট করেছিলাম যে হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে বর্ণিত তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সমাজের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট সেই নির্দিষ্ট সমাজের মানুষের আয়ের উৎস বা পেশার দিকটির ওপর ভিত্তি করে আলোচিত হবে। সে ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করেছি, কথাসাহিত্যে বর্ণিত জেলে, মুচি, মেথর, পতিতা, চাষি, ইত্যাদি তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সমাজে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে বিভিন্ন বৈচিত্র্য উঠে এসেছে। নিম্নবর্গ অর্থেই যে তারা সমাজে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল বা অভাবগ্রস্ত এমনটা সব ক্ষেত্রে নয়। আলোচ্য পরিচ্ছেদে গল্প-উপন্যাসে বর্ণিত তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈচিত্র্যকে আমরা শ্রমবিভাগ ও পেশার ভিত্তিতে স্পষ্ট করার চেষ্টা করব।

'জলপুত্র', 'দহনকাল', 'অর্ক' 'প্রস্থানের আগে', 'দুখিনি', 'দইজ্যা বুইজ্যা', 'প্রতিশোধ', 'চরণদাসী', 'সুবল জেঠা', 'জামাইখেকো' প্রভৃতি জেলেসমাজকেন্দ্রিক গল্প-উপন্যাসে জেলেজীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তির পাঁচটি সূক্ষ্ম স্তর বা বিভাজন লক্ষ করা যায়।

এক. এমন জেলে যারা নিজেরাই বিভিন্ন প্রকার জাল ও নৌকার মালিক। জেলেসমাজে এরা বহদ্দার বলে পরিচিত।

দুই. এমন জেলে যাদের নিজের জাল আছে কিন্তু নৌকা নেই। এরা বহদ্দার বা অন্যের নৌকায় অংশীদার ও সহযোগী হিসেবে মাছ ধরে। সমাজে এরা পাউন্যা নাইয়া বলে পরিচিত।

তিন. এমন মৎস্যজীবী যাদের জাল-নৌকা কিছুই নেই। এরা বহদ্দারদের নৌকায় মাসিক চুক্তিতে অর্থ ও মাছের বিনিময়ে কামলা খাটে। এদের গাউর বলা হয়।

চার. মাছধরা কিছু জেলের প্রধান উপজীবিকা হলেও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে যারা সাময়িকভাবে নিজেদের জমিতে চাষ-আবাদ করে ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে ঢোল বাদ্যবাজনা বাজায়। এবং

পাঁচ. যাদের মাছ ধরা ও বহদ্দারদের কাছ থেকে মাছ কিনে বিক্রি করার স্বাধীনতা আছে। এরা বিয়ারি বলে পরিচিত। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়কেই মাছ বিয়ারির কাজে যুক্ত থাকতে দেখা গিয়েছে।

'জলপুত্র' উপন্যাসে জানা যায়, উত্তর পতেঙ্গা থেকে মিরসরাই পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের কূলে কূলে অনেক জেলেপল্লি। এই জেলেপল্লির জেলেদের জীবন ও জীবিকা সমুদ্র-নদীর সঙ্গে বাঁধা। বেশি মাছ ধরা পড়লে জেলেজীবনে স্বচ্ছলতা আসে, কম মাছে জীবন বিপর্যস্ত হয় তাদের। তবে সব জেলেদের আর্থিক অবস্থা সমান নয়। যাদের নৌকা ও জালের মালিকানা রয়েছে তারা স্বচ্ছল জেলে। এরা বহদ্দার। জানা যায় উত্তর পতেঙ্গায় দশজন বহদ্দার রয়েছে যাদের মধ্যে বিজনবিহারী, কামিনীমোহন, মণীন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, রামনারায়ণ নামকরা বহদ্দার। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলে বহদ্দাররা মরশুমে নানা গ্রাম থেকে গাউর আনে।

> 'এই গাউররা চার-পাঁচ মাসের জন্যে থোক-টাকার বিনিময়ে বহদ্দারদের বাড়িতে আসে। থাকা-খাওয়া মুফত। সকাল-সন্ধ্যায় মাছ ধরতে সমুদ্রে যায় তারা, মাছ ধরার কাজে কঠোর কায়িক-শ্রম দেয়।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১৬)

বহদ্দাররা মাছ ধরে খাড়াং ভর্তি করে উঠোনে রাখে। তাদের কাছ থেকে মাছ ক্রেতা অর্থাৎ বিয়ারিরা মাছ কিনে হাটে বিক্রি করে। উপন্যাসে দেখি গোপাল, গুড়াইয়া, মোহনবাঁশি, সতীশ, শম্ভু, মালতীর মা, হরবাইশ্যার মা, বংশীর মা-রা বিজন বহদ্দারের বাড়িতে মাছ কিনবে বলে ভিড় করে। লক্ষণীয়, নারী বিয়ারিদের অর্থের জোর কম বলে তারা পুরুষ বিয়ারিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাছ কিনতে পারে না। ফলে পুরুষ বিয়ারিরা মাছ কেনার পর যা পড়ে থাকে, তা-ই নারী বিয়ারিরা কেনে। 'দহনকাল' উপন্যাসে রাধানাথের মা চন্দ্রকলা সংসারে আরো একটু বেশি উপার্জনের আশায় মাছ বিয়ারি হয়েছে। দেখা যায়, বিয়ারিরা বহদ্দারদের কাছ থেকে বাকিতে মাছ কেনে এবং পাড়ায়-বাজারে মাছ বিক্রি করে দিন শেষে বহদ্দারের টাকা মিটিয়ে আসে। টাকা মিটিয়ে দিয়ে আসার ক্ষেত্রে দেখা যায়,

> 'বউকে দিয়ে বহদ্দারের বাড়িতে টাকা পাঠানোর রেওয়াজ জলদাসদের মধ্যে আছে। বউরা কাকুতিমিনতি করে বহদ্দারকে কম টাকা গছাতে পারে।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১৮)

বোঝাই যায় জেলেদের অর্থ ব্যয়কে সামান্য লাঘব করা ও পরিবারের জন্য সামান্য অর্থসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে জেলেরা তাদের স্ত্রীদের বহদ্দারদের কাছে পাঠায়। দেখা যায়, মাছ বিক্রি শেষে লভ্যাংশ দিয়ে চাল-ডাল-

সবজি কিনে বাড়ি ফিরলে তবে তাদের উনুনে আগুন জ্বলে আর লোকসান হলে সপরিবারে না খেয়ে থাকে। সমাজে আরেক শ্রেণির জেলেরা আছে যাদের নিজেদের জাল থাকলেও নৌকা নেই।

> ‘কিছু জেলে আছে যাদের নৌকা নেই, কিন্তু জাল আছে। সেই জেলেরা নৌকাওয়ালা জেলেদের নৌকায় জাল বসায়। এই ধরনের জেলেকে পাউন্যা নাইয়া বলে। নৌকার মালিকের তিন-চারটি জাল বসানোর অধিকার থাকলেও একটির অধিক জাল পাউন্যা নাইয়া বসাতে পারে না। তারা নৌকাওয়ালা বহদ্দারের করুণার ওপর নির্ভর করে সমুদ্রে মাছ ধরে।’ (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৪২-৪৩)

আলোচ্য উপন্যাসে চন্দ্রমণি হল সেরকম একজন জেলে। চন্দ্রমণির নৌকা ছিল না কিন্তু দুটো বিহিন্দিজাল ছিল। অন্যের নৌকায় পাউন্যা হিসেবে জাল বসাত সে। অর্থ ও লোকবলের ভিত্তিতে জেলেসমাজে যে শ্রেণি বিভাজন ঘটেছে তার বর্ণনা রয়েছে ‘দহনকাল’ উপন্যাসেও। দেখা যায়, জেলেদের নুন আনতে পান্তা ফুরনোর সংসার। খরা ও অভাবের দিনে বহদ্দারের ঘরে অভাব ঢুকতে পারে না, কারণ তাদের সঞ্চিত অর্থ আছে। পাউন্যা নাইয়াদের ঘরেও দু-চার দিনের রসদ থাকে। কিন্তু সাধারণ জেলে ও বিয়ারিদের ঘরে নিত্য অভাব। অন্যদিকে ‘সুবল জেঠা’ গল্পে মহেশখালী জেলেপল্লির জেলেদের স্তরবিভাজনের বর্ণনায় পাই,

> ‘এ পাড়ায় দু’ চার দশটি যে বহদ্দার-পরিবার নেই এমন নয়। তাদের বড়ো বড়ো নৌকা। টঙজাল, বিহিন্দিজালে তাদের গাবঘর ঠাঁসা। মধ্যম স্তরের জেলেরা বহদ্দারের নৌকায় গাউর হিসেবে কাজ করে। তিন মাসের চুক্তিতে এরা বহদ্দারের নৌকায় কামলাগিরি করে। শেষ স্তরের জেলেদের সহায়সম্বল কিছুই নেই বললেই চলে।’
>
> (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২৩০)

তবে জেলেদের অর্থনৈতিক কাঠামোয় এই স্তর বিভাজন সুনির্দিষ্ট বা সুস্থির নয়। মাছ ধরার মরশুমে কোনো জেলে বেশি অর্থ উপার্জন করলে সেই অর্থ দিয়ে সে যখন নৌকা ও জাল কেনে তখন সেই জেলে বহদ্দারের সমগোত্রে অবস্থান করে। একই ভাবে কোনো সাধারণ জেলে বিহিন্দি বা টংজাল কিনে পাউন্যা নাইয়া হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য এর উল্টো ঘটনাও ঘটে। কোনো সময় বহদ্দার বা পাউন্যা তার সমস্ত হারিয়ে সাধারণ জেলেদের স্তরেও নেমে আসতে পারে। আলোচ্য উপন্যাসে এরকম অবস্থান পরিবর্তন আমরা দেখি গোলকবিহারীর ক্ষেত্রে। তার বহুদিনের শখ—সে একদিন বহদ্দার হবে। তার একক চেষ্টায় তা সম্ভব না হলেও ছেলেদের কর্মক্ষমতায় তা সম্ভব হয়েছে।

> ‘ধনবাঁশিরা তিন ভাই—ধনবাঁশি, কালাবাঁশি ও ধর্মচরণ। এই বছরেই প্রথম এরা বহদ্দার হিসেবে মাছ ধরায় নামছে। গত ক’বছর নানা বহদ্দারের নৌকায় পাউন্যা নাইয়া হিসেবে জাল বসিয়েছে এই তিন ভাই। বৃদ্ধ গোলকবিহারীর পুত্র এরা। গোলকের বহুদিনের খায়েশ ছিল বহদ্দার হবার। কিন্তু নিজের অভাবী জীবনে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ছেলেরা বড়ো হবার পর ধীরে ধীরে তার মনে পূর্বতন আশা দানা বাঁধতে থাকে। গত বছর বেশ ভালো আয় হয়েছে তার। সেই আয়ের টাকা দিয়ে গোলকবিহারী এই একগাছি নৌকাটি লাম্বুরহাটের রফিক্যা দালালের কাছ থেকে কিনেছে।’

(জলদাস ২০০৮, পৃ. ৪৫)

'দহনকাল' উপন্যাসে রাধানাথ প্রথম জীবনে গাউর ছিল, পরবর্তীকালে সঞ্চিত অর্থে একটি বিহিন্দিজাল কিনে অন্নচরণ বহদ্দারের নৌকায় পাউন্যা নাইয়া হিসেবে কাজ করেছে। অন্যদিকে দয়ালহরি বহদ্দার ভাই রামহরির লোভের কারণে জ্বালাল মেম্বারের চক্রান্তে সর্বস্ব হারিয়ে সাধারণ বিয়ারিতে পরিণত হয়েছে। 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে সুধাংশু প্রথম জীবনে পাউন্যা নাইয়া থাকলেও আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে সে নিজের জাল নৌকা কিনে বহদ্দার হয়েছে। 'দুখিনি' গল্পে কিষ্টপদর কোনো জাল-নৌকা ছিল না। সে কুমিরার জেলেপাড়ার নকুল বহাদ্দারের নৌকায় চারমাসের চুক্তিতে গাউরের কাজ করে এবং পরবর্তীকালে নিজের নৌকা-জাল কিনে বহদ্দারে পরিণত হয়। জেলেদের জীবনের এই অর্থনৈতিক সচলতা কখনো তাদের দুর্দশা, অভাব-অনটনের কারণ হয়েছে আবার কখনো স্বচ্ছলতাও এনেছে। তাইতো চন্দ্রমণির সমুদ্রে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর ভুবনের পরিবারের আয় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। অভাবের কারণে গত পাঁচ বছরে ভুবন স্বামীর ব্যবহৃত মাছ ধরার প্রায় সকল সরঞ্জাম একে একে বিক্রি করে দিয়েছে। বিক্রি করার মতো আর কিছু নেই তাদের। ফলে বাধ্য হয়ে ভুবনকে মাছ বিয়ারির কাজ নিতে হয়। এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, জেলে সমাজে বেশিরভাগ নারী বিধবা বলে তাদের বিয়ারির কাজ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। তাই বলে এমন নয় যে শুধু বিধবা নারীরাই এ কাজ করে, পরিবারে আরো একটু বেশি উপার্জনের আশাতেও নারীরা বিয়ারির কাজ করেছে। পরিবারে দায়িত্ব স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ভাগ করে নিয়েছে। যেমন বংশীর মা। তার স্বামী ভোলানাথ একজন পাউন্যা নাইয়া, কিন্তু সংসারে বেশি আয়ের আশায় সে মাছ বিয়ারি হয়েছে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায়, 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কথা।

> 'পুরুষেরা মাছ ধরিয়া আনে, পাইকারি কেনা বেচা করে, চুপড়ি মাথায় করিয়া বাড়ি বাড়ি মাছ যোগান দেওয়া তাদের কাজ নয়। ও কাজটা জেলেপাড়ার মেয়েরা সন্তান প্রসবের আগে পিছে দু'একটা মাস ছাড়া বছর ভরিয়া করিয়া যায়।'

(বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৬ পৃ. ৪৭)

এভাবেই জেলেদম্পতিরা তাদের সংসারের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে যায়। কখনো দিনের পর দিন জেলে পুরুষ সমুদ্রে থেকে ফিরে আসে না, জেলেনারী স্বামীর অপেক্ষায় অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করে যায় সারাজীবন, কেউ বা আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির আশায় বেশি পরিশ্রম করে বহদ্দার হয়ে উঠতে চায়। কেউ পারে, কেউ আর্থিক ক্ষতিতে অকুল দারিদ্র্যে দিন কাটায়।

গতানুগতিক এই দারিদ্র্যময় জীবনধারার মধ্যেও অভিশাপের মতো নেমে আসে দাদনদারেরা। দাদনদার অর্থাৎ সুদখোর ব্যবসায়ী। মাছ মারার কাজে যে সব সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়, তা সংগ্রহ করতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। সব জেলেরা তা সঞ্চয় করতে পারে না বলে দাদনদারের কাছ থেকে বাধ্য হয়ে

চড়া সুদে টাকা ঋণ নিতে হয় তাদের। 'জলপুত্র' উপন্যাসে উত্তর পতেঙ্গা জেলেপাড়ায় আব্দুস শুক্কুর ও শশিভূষণ রায় এই সুদের ব্যবসাকে কুক্ষিগত করে রেখেছে। বিশেষত ইলিশের মরশুমকে লক্ষ্য করে এরা জেলেদের ঋণদান করে।

'দুটো শর্তে এরা জেলেদের ঋণ দেয়। মাসিক শতকরা দশ টাকা সুদে অথবা যত মাছ ধরা পড়বে, তার সবই দাদনদারের দামে তাদেরই কাছে বিক্রি করতে হবে। জেলেরা নিরুপায়। দু'একটা পরিবার আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ধার-উধার করে মাছ ধরার ব্যবসায়ে নামলেও অধিকাংশই শুক্কুর-শশির ফাঁদে জড়িয়ে যায়। আর একবার তাদের কাছ থেকে যারা ঋণ নেয়, তারা বংশানুক্রমে সে ঋণ থেকে মুক্তি পায় না।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৪২)

ফলে দাদন নেওয়া জেলেদের কাছে একপ্রকার অভিশাপ স্বরূপ। ঋণী জেলেরা বেশি মাছ ধরলেও শর্তানুযায়ী তাদের নামমাত্র মূল্যে তা দাদনদারদের কাছে বিক্রি করতে হয়। ফলে সংসারে যেমন অভাব তেমনই থাকে। শুধু তাই নয়, ঋণ নেওয়ার পরেও সমাজে নানা চুক্তির ভিত্তিতে মাছ ধরার নিয়ম তো রয়েছেই। এরকমই এক চুক্তি হল 'হাজা' চুক্তি। চুক্তিটি মৌখিক হলেও অমোঘ ও অলঙ্ঘনীয়। উপন্যাসে দেখি,

'চৈত্রমাসেই বহদ্দাররা ঠিক করে পরবর্তী এক বছর কার সঙ্গে কার সহযোগিতার ভিত্তিতে সমুদ্রে জাল বসাবে। এটাকে তারা হাজা বলে। হাজা একটা বাৎসরিক চুক্তি। এই এক বছর মাছ ধরার সকল কাজে একটি নৌকার মালিক আরেক নৌকার মালিককে সর্বান্তকরণে সহযোগিতা দেবে। মৌখিক চুক্তি হলেও এটা অমোঘ। কোনো বহদ্দার এই বাৎসরিক চুক্তি ভাঙতে সাহস পায় না।... চুক্তি ভঙ্গকারীকে একঘরে করে রাখা হয়।... ফলে চুক্তি রক্ষার ব্যাপারে সব বহদ্দারই সচেতন।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৪২)

এছাড়াও যে মৌখিক চুক্তিগুলো রয়েছে তার মধ্যে প্রথমত সমুদ্রে একজন বহদ্দার বসাবে তিনটি বিহিন্দিজাল ও পাউন্যা নাইয়া বসাবে একটি বিহিন্দিজাল। বহদ্দারের একটি জালে মাছ ধরার পর পাউন্যা নাইয়ার জাল দিয়ে মাছ ধরা হবে। দ্বিতীয়ত, একজন বহদ্দার তার পাউন্যা নাইয়াকে সমুদ্রে গোঁজ পুঁততে সাহায্য করবে। তবে এই মৌখিক চুক্তিদুটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বহদ্দাররা মানেনি। 'দহনকাল'-এ দেখা যায় নিকুঞ্জ বহদ্দার তার পাউন্যা নাইয়া পরিমলকে গোঁজ পুঁততে সাহায্য করেনি। রমণী বহদ্দার তার তিনটি জালে মাছধরার পর রাধানাথের জালে মাছ ধরার অনুমতি দিয়েছে। এভাবেই জেলেসমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে ছল-চাতুরী, ষড়যন্ত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়েছে।

জেলেসমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোটি মাছ-জাল-নৌকা নির্‌ভর। তবুও সংসারের প্রয়োজনে কিছু জেলেকে পেশাবদল করতেও দেখা গিয়েছে। যেমন 'জলপুত্র' উপন্যাসে মধুরামের স্ত্রী টুনিবউ অন্যান্য অসহায় জেলে নারীদের মতো বিয়ারির কাজ করেনি। সে কারও বাড়িতে লঙ্কা বেটে দেয়, কারও বাড়িতে

চাল ঝাড়ে, কারও বাড়িতে গিয়ে মাছ বাছে। তার সাহায্যের বদলে বাড়ির লোকেরা তাকে কেউ মাছ বা দু-চার টাকা ধরিয়ে দেয়। জানা যায়, মাছের খাড়াং নিয়ে মাছ বিক্রি করা তার ভালো লাগে না, ফলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভিক্ষে করাকেই শ্রেয় বলে মনে করেছে সে।

> 'মাছের পানির আঁশটে গন্ধে তার বমি আসে।... এসব খাটাখাটুনি তার দ্বারা হবে না। তার চেয়ে এই-ই ভালো। বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করা।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১০০)

আবার জয়ন্তকে দেখা যায়, সে ছোটো জাল নিয়ে সমুদ্রের কিনারে কিনারে মাছ ধরলেও উপার্জনের ভিন্ন পথ হিসেবে বৈরাগী ঢুইল্যার বাদনদলের সানাই বাদক হিসেবে যুক্ত হয়। ভুবনের অভাবের দিনেও গঙ্গাকে জয়ন্তর সঙ্গে সহযোগী হিসেবে কাসর বাজাতে দেখা গিয়েছে। আবার 'দহনকাল' উপন্যাসে বসুমতীর বাবা হরবাঁশি মাছ ধরার পাশাপাশি বাড়তি উপার্জনের আশায় নানা আচার-অনুষ্ঠানে ঢোল বাজিয়েছে। জেলেদের উপজীবিকার প্রসঙ্গে বলতে হয়, জেলেদের মধ্যে দুটো ভাগ- জালিক ও হালিক। 'দহনকাল'-এ কৈবর্তপাড়ার কৈবর্তদের সম্পর্কে জানা যায়,

> 'মাছ ধরা তাদের পেশা হলেও প্রধানতম পেশা নয়। এদের আছে জমিজিরাত। এরা হালিক কৈবর্ত। হালিক কৈবর্তরা হালচাষ করে জীবন নির্বাহ করে।... নদী-সমুদ্র শস্যশূন্য হলে জমিজিরাতে শস্য ফলাতে এরা মনযোগী হয়ে ওঠে।
>
> কিন্তু জালিক কৈবর্তদের একমাত্র ভরসা নদী-সমুদ্র।... জাল দিয়ে মাছ ধরাই তাদের একমাত্র পেশা, অবলম্বনও।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ২৯)

জেলেদের মধ্যে এই বিভাজন আমরা 'মোহনা' উপন্যাসেও লক্ষ করেছি। বহু প্রাচীনকাল থেকেই যে জেলেদের মধ্যে হালিক-জালিক বিভাজন ছিল তা একাদশ শতাব্দীর পটভূমিতে রচিত আলোচ্য উপন্যাসে এর উল্লেখ থেকেই বুঝতে পারি।

> কৈবর্তদের দুটো ধারা—হালিক কৈবর্ত আর জালিক কৈবর্ত। হালিকরা চাষবাস, গো-পালন নিয়ে থাকে। মাঠে মাঠে ফসল ফলায় তারা। জালিকদের ফসল নদীতে। মৎস্যশিকারই জালিকদের একমাত্র পেশা। (জলদাস ২০১৩, পৃ. ৭)

অন্যদিকে 'অর্ক' উপন্যাসে বংশী হুরিজাল দিয়ে মাছ ধরার পাশপাশি উপজীবিকা হিসেবে নাউট্যাপোয়া সেজে নানা যাত্রাপালায় ভাড়া গিয়েছে। নন্দলাল আবুল ফজলের সহায়তায় বিদেশি জাহাজে বাটলারের চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে গিয়েছে। 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে হরিবন্ধু জেলেসন্তান হয়েও মাছধরার কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞাত। ফলে সে বাধ্য হয়ে সে পৈতৃকপেশা বদল করে মাঝিরঘাটে খান অ্যান্ড খান ব্রাদার্স কোম্পানির গোডাউনে কুলিগিরি করেছে। 'ঢোলদাস' গল্পে জন্মান্ধ মনমোহন নিরুপায় হয়ে মাছধরার পৈতৃক পেশা ছেড়ে একজন দক্ষ ঢোলবাদকে পরিণত হয়েছে। নানা আচার-অনুষ্ঠানে সে ঢোলবাজায়। তার দুই ভাইয়ের একজন স্টিল মিলে সুইপারের কাজ করে ও অন্য ভাই ভবঘুরে। সংসারে

টান পড়লে সে জাল নিয়ে মাছ ধরতে যায়। ‘প্রতিশোধ’ গল্পেও দেখি, সোমেশ্বর মাছ ধরা ছেড়ে দিয়ে স্টিল মিলে সুইপার বা ঝাড়ুদারের কাজ নিয়েছে এবং অবসর সময়ে বিভিন্ন প্রকারের জাল বুনেছে।

জেলেদের গভীর সমুদ্রে মাছধরা ও মাছের ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি বড়ো ভূমিকা পালন করে নৌকা। নৌকার মাঝিরাও জেলেদের মতোই পেশাগত দায়িত্ব, অভিজ্ঞতা ও বেতনের ভিত্তিতে স্তরায়িত হয়েছে। ‘দহনকাল’ উপন্যাসে জানা যায়,

> ‘কালিদইজ্যার নৌকায় একজন মূল কাণ্ডারি থাকে—তাকে বলে বড়োমাঝি। তার কথাতেই নৌকা চলে।... এরপর থাকে একজন ছোটোমাঝি। বড়োমাঝি অসুস্থ হলে তার পরামর্শে ছোটোমাঝি মাছধরার কাজ চালায়। এছাড়া অন্য বারোজন গাউর। এরা সাধারণ। এদের বেতনও সাধারণ।... ছোটোমাঝির একটু বেশি বেতন—চৌদ্দকুড়ি থেকে সতেরোকুড়ি। বড়ো মাঝির বেতন সবচাইতে বেশি—বাইশকুড়ি থেকে পঁচিশকুড়ি টাকা।’ (জলদাস ২০১০, পৃ. ৪৬)

জেলেদের মতোই মাঝিদেরও দারিদ্র্য কলুষিত জীবন। লক্ষণীয়, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যবসায় মাঝি–গাউর এই দুটি শ্রেণি যথাক্রমে অভিজ্ঞতা ও বাহুবলের প্রতিভূ। বহদ্দাররা তাদের নৌকায় চল্লিশ-ষাট বছর বয়সী মাঝি নিযুক্ত করে। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার অভিজ্ঞতা থাকতে হয় মাঝিদের। কারণ, মাঝিদের হাতেই সর্বস্ব নিহিত থাকে, তাদের একটি ভুল সিদ্ধান্তে ভরাডুবি পর্যন্ত হতে পারে। অন্যদিকে সমুদ্রে অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রয়োজন হয় বাহুবল। ফলে গাউরদের হতে হয় বলবান ও কমবয়সী। জাল টেনে মাছ তোলা, গোঁজ পোতা বা অন্যান্য কাজ গাউররা করে থাকে। প্রাসঙ্গিক ভাবে বলতে হয়, জেলেজীবনে নৌকার গুরুত্ব থাকলেও একগাছি নৌকার চাহিদা বেশি। ফলে দেখা যায় এই চাহিদাকে কাজে লাগিয়ে একদল অসাধু ব্যবসায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের গভীর বন থেকে গাছ কেটে চোরাচালান করে লাম্বুরহাটে। ‘প্রস্থানের আগে’ উপন্যাসে জানা যায়,

> ‘পার্বত্য চট্টগ্রামের গহিন বন থেকে গাছচোররা বড়ো বড়ো গাছ কেটে কাণ্ডটাকে চব্বিশ-পঁচিশ হাতের টুকরা করে। ... কর্ণফুলীর জলের তলায় লুকিয়ে লুকিয়ে লাম্বুরহাটে নিয়ে আসে। লাম্বুরহাটে নৌকা বেচাকেনা হয়।’
>
> (জলদাস ২০১৯, পৃ. ২১)

সমুদ্র জেলেদের মাছ দেয়, আবার অনেক কিছু কেড়েও নেয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে নৌকাডুবি ছাড়াও সমুদ্রে জেলেদের বড়ো বিপত্তি জলদস্যু অর্থাৎ নৌ-ডাকাত। ‘জলপুত্র’ ও ‘দহনকাল’ উপন্যাসে জেলেদের নৌকাসহ জাল লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে নৌ-ডাকাতরা। এই লুণ্ঠনে তারা সমুদ্রে দ্রুতগামী সাম্পান ব্যবহার করে যাতে জেলেরা তাদের পিছু না নিতে পারে। নৌকা জাল চুরি যাওয়া জেলেদের জীবনকে মৃত্যুসম বিপর্যস্ত করে তোলে। ‘জলপুত্র’-এ দেখি, নৌকাগুলো যখন ইলিশ মাছে ভরে উঠেছে

তখন হঠাৎ সাত-আটটি সাম্পান ভর্তি জলদস্যু বিজন বহদ্দারসহ অন্যান্যদের নৌকাগুলির সমস্ত মাছ লুঠ করে পালিয়ে গিয়েছে।

> 'অতি অল্পসময়ের মধ্যে জেলেদের নিঃস্ব করে দিয়ে সাম্পানগুলো দূরে ভেসে গেল। অধিকাংশ জেলেনৌকাই আজ লুণ্ঠিত হয়ে গেছে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে মার খেয়েছে অনেকে। বিজনের মাথা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে।'
>
> (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৭৯)

পরদিন সকালে সমুদ্রকূলে মর্মান্তিক হাহাকারের মাঝে দেখা যায়, বিজনের মতো আরো চার-পাঁচ জনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে জলদস্যুরা। পূর্ণ বহদ্দারের ছেলে রামপদকে পিটিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে তারা। কোনোমতে তাকে বাঁচান গিয়েছে কিন্তু ভয়ে সে অপ্রকৃতিস্থ। রামপদ আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারেনি। এই ঘটনা জেলেজীবনকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। একদিকে অভাবের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে জেলেদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, অন্যদিকে জলদস্যুদের এই লুণ্ঠনে জেলেদের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠেছে। 'দহনকাল' উপন্যাসেও দেখা যায়, এই জলদস্যুদের তাণ্ডব। রাধানাথ, জীবন বহদ্দার, গুরুপদ পাউন্যা, বৈকুণ্ঠ সর্দারের জালসহ মোট সাতটি জাল সমুদ্রে পাতানো অবস্থায় লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে চকোরিয়ার নৌ-ডাকাতরা। বহদ্দারদের ক্ষেত্রে জালচুরির ঘটনা তাদের আর্থিক ক্ষতিকে তেমন ত্বরান্বিত করতে পারে না, কারণ তাদের একাধিক জাল আছে। যেমন নিকুঞ্জ, অবর্ণকুমার, রামচন্দ্র, শিবশরণ বহদ্দারদের জাল চুরি গেলেও আরেকটি জাল তারা সমুদ্রে পাততে পারে। শিবশরণের নৌকা ডুবে গেলেও সে তার ফসলি জমিতে চাষ করে আর্থিক সঙ্গতি তৈরি করেছে। কিন্তু পাউন্যাদের ওই একটি জালই সম্বল। ফলে রাধানাথের জাল চুরি তাদের পরিবারে অন্ধকার ঘনিয়ে এনেছে। এইভাবেই বয়ে যেতে থাকে জেলেদের দ্বন্দ্বময় জীবন। কখনো বহদ্দার-পাউন্যার মধ্যে আর্থিক জটিলতা ও স্বার্থদ্বন্দ্ব, কখনো দাদনদার ও জেলেদের মধ্যে ঋণ পরিশোধ না করা নিয়ে বচসা, আবার কখনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নৌ-ডাকাতদের তাণ্ডবে জেলে জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। বিপদে পড়ে এরা বহদ্দারের কাছে সাহায্যের জন্য গেলেও বহদ্দারেরা জানে তারা খুবই অভাবী মানুষ, এরা নিতে জানে, দিতে জানে না। ধার নিলেও শোধ করার ক্ষমতা তাদের নেই, ফলে বহদ্দারের কাছ থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয় তাদের। প্রস্থানের আগে উপন্যাসে জেলেনারীদের অভাবের দিনে এরকম ধার নেওয়ার বর্ণনা রয়েছে,

> 'ঠেকায় পড়লে খুল্লনার কাছে ধার-উধার চাইতে আসে জেলেনারীরা। সের খানেক চাল, পোয়ামতন ডাল, দু-চারটা আলু-মুলো, এক চেরাগ কেরোসিন, এক খাবলা লবণ অকুণ্ঠ চিত্তে ধার দেয় খুল্লনা। সবাই যে উধারের দ্রব্য ফেরত দেয়, এমন নয়।... তা ছাড়া বিধবা চন্দ্রকুমারের বউ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত লালবাঁশির বোনের ক্ষমতা কোথায় যে গৃহীত বস্তু ফেরত দেবে!' (জলদাস ২০১৯, পৃ. ৩৭)

অভাব-অনটন, ধার-ঋণ এর বাইরেও দেখা যায়, এই তথাকথিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সরকারি রিলিফ ফান্ড তৈরি করা হয়েছে। সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা থেকে যথা সময়ে আর্থিক সাহায্য পৌঁছলেও সাধারণ জেলে সকলের কাছে তা নির্ধারিত অঙ্কে যথা সময়ে পৌঁছয়নি। কারণ এর মাঝখানে রয়েছে জেলেসমাজেরই অর্ধশিক্ষিত, স্বার্থপর, অসাধু কিছু মানুষ। যারা অশিক্ষিত সরল জেলেদের নামমাত্র অর্থ দিয়ে সেখানে নিজেদের ভাগ বসিয়েছে। কেউ বা ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রিলিফের তালিকা থেকে নাম কেটে বা ভুল নাম লিখে দিয়েছে। 'দহনকাল' উপন্যাসে প্রাকৃতিক দুর্যোগে জেলেদের সাহায্যের জন্য কানাডার এক বেনামি সংস্থা ত্রাণ হিসেবে নৌকা, জাল, সুতো পাঠালে ত্রাণ শিবিরের সভাপতি নিকুঞ্জ তার প্রতিশোধ নিতে রাধানাথের নাম ভুল লিখেছে। ফলে সে ত্রাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। একইভাবে 'অর্ক' উপন্যাসে জেলেদের জন্য সরকারি আর্থিক সাহায্য এলেও ছোবান মেম্বার তা নামমাত্র জেলেদের দিয়ে বাকিটা নিজের কাছে রাখে। দেখা যায় দিবাকর স্কুলে ভর্তি হওয়ার সরকারি টাকা ছোবানের কাছে চাইতে গেলে সে তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয় প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। আসলে জেলেদের আশা আকাঙ্ক্ষা খুবই সামান্য, তবু সেটুকুও তাদের জোটে না। দুর্নীতি, ষড়যন্ত্র, নিচু স্তরের ছল-চাতুরী, অবিশ্বাস ও অন্ধ ধর্ম-বিশ্বাসকে আজন্ম সহ্য করে চলা সরল-সাধারণ জেলেজীবনে এভাবেই ঘনিয়ে আসে অপেক্ষাকৃত অর্থ-ক্ষমতাশালীদের বঞ্চনা ও প্রতিশোধ। প্রবহমানকাল ধরে পূর্বপুরুষের গতানুগতিক পেশায় নিয়োজিত জেলেরা নিত্য অভাব ও দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেও তাদের উত্তরপুরুষ সৃষ্টির কামনায় জর্জরিত হয়। সমাজ ও অর্থনীতির জটিল বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জেলেজীবন এক অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়। 'দহনকাল' উপন্যাসে জেলেদের এই গতানুগতিক আর্থ-সামাজিক জীবনের সারমর্ম ধরা পড়েছে এভাবে,

> ''নিত্যদিনের অভাবের আবর্তে পড়ে জেলেদম্পতিরা দিশেহারা। নুন-পান্তার সংযোগ ঘটাতে ঘটাতে প্রাণান্ত হয় স্বামী-স্ত্রীর।... স্বাচ্ছন্দ্যের চাকায় আরেকটু গতি আনতে অধিকাংশ জেলেনি গৃহকোণ ছেড়ে বেরিয়ে আসে।... সন্তান হলে সংসারের বোঝা বাড়ে। শুধুমাত্র স্বামীর খাটনিতে সংসারের হাঁ-করা মুখ বন্ধ করা যায় না। উপোসে উপোসে স্ত্রীও নিরুপায় হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত মাথায় মাছের খাড়াং নিয়ে বেরোয়—পাড়ায়, বাজারে।... পুরুষ ব্যস্ত থাকে ঢেউ-সমুদ্রে আর নারী ব্যস্ত থাকে মাছবিক্রিতে বা সংসার সামলাতে।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৬৯)

কেবল জেলেসমাজের কথাই নয়, বৃহত্তর অর্থে বাংলাদেশের গ্রামনির্ভর নিম্নবর্গ মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিবেশকেও দেখা যায় হরিশংকরের কথাসাহিত্যে। যেমন সমাজের পতিতারা। 'কসবি' উপন্যাসে বর্ণিত পতিতা সমাজে অর্থনীতির একমাত্র মূল ভিত্তি পতিতারা। অথচ এই পতিতারাই সেই সমাজে সর্দার-মাসির বেড়াজালে আবদ্ধ ও শোষিত। ইতিপূর্বে সদরঘাট জেলেপাড়ার সাহেবপাড়া

পতিতাপল্লিতে রূপান্তরের কাহিনি আমরা জেনেছি। দেখেছি সাধারণ ঘরের, সাধারণ পরিবারের মেয়েরা কখনো ধর্ষিত হয়ে, কখনো অভাবে পড়ে, আবার কখনো সামান্য আশ্রয়ের খোঁজে বা কখনো কোনো প্রতারক পুরুষ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই পতিতাপল্লিতে মেয়েদের বিক্রি করে দিয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কোনো না কোনোভাবে অর্থের যোগাযোগ রয়েছে। এই বিক্রিত, আশ্রিতা মেয়েদের পতিতায় রূপান্তরিত করেছে সেই পাড়ার সর্দার-মাসিরা, কারণ এই পতিতারাই তাদের ভবিষ্যতের আয়ের উৎস। উপন্যাসে জানা যায়,

> 'পতিতাই হল দেহব্যবসার কেন্দ্র। তাদের ঘিরে আবর্তিত হয় মাসি-দালাল-মাস্তানরা। এদের হারানোর কিছু নেই; হারাতে হয় পতিতাকেই।... পতিতাপল্লির কোনো ঘর কখনো খালি থাকে না; এক পতিতা যায় তো অন্য পতিতা এসে সে জায়গা পূরণ করে।' (জলদাস ২০১১ পৃ. ১০৬)

পতিতাপল্লির অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি হয়েও পতিতারা অধীন ও বঞ্চিত। সর্দার-মাসিরা তাদের দেহ বিক্রির টাকা জোর করে কেড়ে নিয়ে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করে, কিন্তু পতিতাদের জন্য বরাদ্দ অন্ধ গৃহকোণ। কৈলাস তাই পতিতাদের অধিকার সচেতন করে বলে, দেহবিক্রির কুড়ি শতাংশ টাকা মাসিদের দিয়ে বাকি আশি শতাংশ নিজেদের কাছে রাখার জন্য। শুধু তাই নয়, পতিতাদের প্রধান পণ্য যেহেতু তাদের দেহ, সেহেতু সেই শরীরের বিশ্রাম প্রয়োজন। ফলে সপ্তাহে একদিন ব্যবসা বন্ধ রাখার দাবি জানায় কৈলাস। অধিকার বোধে সচেতন পতিতারা কৈলাসের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে চাইলে সর্দারের শাস্তি ও নিপীড়ন জোটে তাদের। ফলে তারা নিরুপায় হয়ে গতানুগতিক জীবনে পুনরায় ধাবিত হয়।

উপন্যাসে জানা যায় পতিতাদের দেহ ব্যবসার বিভিন্ন প্রথা ও পদ্ধতির কথা। রাতের অন্ধকারে পতিতারা কাস্টমারদের সঙ্গে দরাদরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এরা কম দরের পতিতা। কিন্তু বনেদি ও উচ্চ দরের পতিতাদের ব্যক্তিগত দালাল রয়েছে। তারা এই রূপসী পতিতাদের জন্য ধনী-শিক্ষিত কাস্টমার ধরে আনে। দেখা যায়,

> 'সাহেবপাড়ার পতিতারা আধিয়া, ছুকরিকাটা, নথখোলা, কিস্তি ইত্যাদি প্রথায় তাদের দেহব্যবসা চালায়।' (জলদাস ২০১১ পৃ. ৬৩)

উপন্যাসে আলোচ্য প্রথাগুলির বর্ণনায় জানা যায়, যখন কোনো পতিতা দেহবিক্রির অর্ধেক টাকা মাসিকে দেয় তখন তাকে আধিয়া প্রথা বলে। এই প্রথা পতিতা সমাজে বহুলভাবে প্রচলিত। আধিয়া প্রথা আবার দু'রকম। প্রথমত যে পতিতারা বরাবর মাসির আশ্রয়ে থাকে, তাদের মাসিকে মাসিক ঘর ভাড়া দেওয়ার পাশাপাশি দেহ বিক্রির অর্ধেক টাকা দিতে হয়। দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো পতিতা মাসির খালি ঘর ভাড়া নিলেও সে ঘরে থাকে না, কেবল ব্যবসার সময় এসে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে উপার্জনের অর্ধেক টাকা

মাসিকে দিয়ে যায়। অভিজ্ঞ পতিতারা এই প্রথায় দেহব্যবসা চালায়। আবার ছুকরিকাটা প্রথা হল, যে পতিতারা সদ্য দেহব্যবসায় নেমেছে তাদের জন্য। এক্ষেত্রে যে সব মেয়েদের সর্দার ও মাসিরা দালালদের কাছ থেকে কিনে নেয় তাদের কেনা মূল্যের সঙ্গে সুদের পরিমাণ যুক্ত করে মোট মূল্য নির্ধারিত হয়। সেই পরিমাণ টাকা কাস্টমারদের কাছ থেকে তুলতে প্রায় দুই-আড়াই বছর লেগে যায়। এই সময় সেই পতিতার দেহ বিক্রির সম্পূর্ণ টাকার দাবিদার সর্দার বা মাসি। বদলে মেয়েটির থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা সবকিছুর দায়িত্ব নেয় তারা। পতিতার থেকে সম্পূর্ণ টাকার দাবিদারিত্বকে বলে ছুকরিকাটা প্রথা। এছাড়া নথখোলা প্রথা হল সেই মেয়েটির জন্য, যে প্রথম তার কুমারিত্ব কোনো কাস্টমারকে দান করবে এবং প্রথম সম্ভোগের মধ্য দিয়ে মেয়েটি পতিতাবৃত্তিতে পদার্পণ করবে। উপন্যাসে দেখা যায়, সাহেবপাড়ায় শৈলমাসির কাছে বিক্রিত কৃষ্ণার জন্য কালু সর্দার ধনী কাস্টমার আনার জন্য জামাল দালালকে দায়িত্ব দেয়। কারণ কৃষ্ণাকে নথখোলা প্রথায় দেহবিক্রি করানো হবে।

লক্ষণীয়, পতিতাপল্লি ও পতিতাবৃত্তিকে কেন্দ্র করে সেই সমাজে অর্থনীতির একটি শৃঙ্খল সৃষ্টি হয়েছে। যেমন পতিতার উপার্জিত টাকা বিভিন্ন প্রথা অনুযায়ী বা শোষণ করে সর্দার-মাসি-মস্তানদের মধ্যে ভাগ হলেও ব্যবসাকে বাধাহীনভাবে চালানোর জন্য পুলিশকে সেই উপার্জনের কিছু অংশ তাদের ভাগ দিতে হয়। এক্ষেত্রে পুলিশ কর্মীদের এটি একটি বাড়তি উপার্জনের অন্যায় পথ সৃষ্টি করেছে। আবার পতিতাপল্লিতে যৌন বাসনায় নানা স্তরের ও পেশার মানুষের যাওয়া-আসার জন্য আশেপাশে পানশালা, খাবার হোটেল, মুদিদোকান, পান-সিগারেটের দোকান গড়ে উঠেছে যেখানে সমাজের অন্যান্য শ্রেণির মানুষদের উপার্জনের একটি অন্য মাধ্যম তৈরি হয়েছে। যেমন, রুস্তমের হোটেল, রহমানের পানের দোকান। পতিতরা তাদের দোকান থেকেই তাদের খাবার কেনে বা কোনো ধনী কাস্টমারদের জন্য মদ, সিগারেট, বিরিয়ানি নিয়ে আসে। আবার এই পতিতাদের কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে দালালচক্র। ধনী কাস্টমারদের পতিতামুখী করে এরা কাস্টমারের কাছেও বকশিস নেয়, আবার মাসির কাছেও অংশ পায়। উপরি উপার্জন হিসেবে সেই নির্দিষ্ট পতিতার কাছ থেকেও কিছু অংশ পায়। উপন্যাসে দেখা যায় বিজলীর দালাল শামছু, দেবযানীর দালাল সেলিম—এদের ভরণপোষণ করেছে পতিতারাই। অন্যদিকে পল্লির পুরনো যৌবনহীন পতিতারা নিরুপায় হয়ে পতিতাবৃত্তি ছেড়ে অন্যান্য পতিতাদের ফরমাশ খাটে। বিশেষ করে কুয়ো থেকে জল এনে দেওয়া এদের প্রধান কাজ। সমাজে এরা 'জলমেয়ে' বা 'আফতাবচি' বলে পরিচিত। পতিতাদের ঘরে ঘরে জল সরাবরাহ করার পাশপাশি এরা কেউ পতিতাদের জামাকাপড় ধুয়ে দেয়, কেউ তাদের চুল বেঁধে সাজসজ্জায় সাহায্য করে। পরিবর্তে পতিতারা তাদের টাকা দিয়ে ভরণ

পোষণ করে। অর্থাৎ পতিতাকে কেন্দ্র করেই সমাজে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলাটি গড়ে উঠেছে। তবে এই পতিতাপল্লির সর্দারের আরো একটি উপার্জনের মাধ্যম রয়েছে, তা হল অপরাধ জগতের ব্যবসা। আসলে সাহেবপাড়া পতিতাপল্লিটি চুরি, ছিনতাই, ধর্ষণ, মেয়ে বিক্রি, বেআইনি মদ ও মাদক দ্রব্য বিক্রির অবাধ দুর্গ। শুধু তাই নয় ফেরারী আসামী, গুন্ডা-মস্তানদের আশ্রয়স্থলও। পুলিশের নজর এড়িয়ে,

> 'প্রচুর টাকার বিনিময়ে এইসব খুনি-মাস্তান-ডাকাতদের এই পাড়ায় আশ্রয় দেয় কালু। মন্দিরের পেছনের একচালায় লুকিয়ে রাখে তাদের। সাঙাতদের দু'একজন তাদের দেখাশোনা করে।' (জলদাস ২০১১, পৃ. ৯৪)

লক্ষণীয়, জেলে সমাজের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট মাছধরা, সেখানে জেলেরা কীভাবে, কত মাছ ধরতে পারল বা পারল না, তার ওপর নির্ভর করে তাদের দারিদ্র্য ও স্বচ্ছলতা। এক্ষেত্রে তাদের লাভালাভ নিজেদের সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু পতিতাসমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি পতিতারা হলেও, দেহবিক্রির টাকা তাদের নিজেদের নয়। এর মধ্যে ভাগ আছে সর্দার, মাসি, মস্তান, দালাল, পুলিশ প্রভৃতি শ্রেণির মানুষদের। ফলে শেষ পর্যন্ত পতিতাদের উপার্জিত অংশের প্রায় কিছুই থাকে না তাদের হাতে। পতিতারা কেবল অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যৌবনহীন বা রোগগ্রস্ত পতিতাকে তাই আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে ফেলে দিতেও দ্বিধাবোধ করে না সর্দার-মাসিরা। তবে জেলেসমাজের মতো সে অর্থে পতিতাদের দারিদ্র্য বা অভাব-অনটন নেই। প্রত্যেক পতিতাই কোনো না কোনো মাসির আশ্রয়ে থাকে এবং মাসিরা তাদের ভরণ-পোষণ-স্বাস্থ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যোগানের দায়িত্ব নেয়। কিন্তু যাদের কারণে পতিতাসমাজের অর্থনীতি সুদৃঢ়, সেই পতিতারাই আনন্দ-বিলাস-প্রাচুর্য ও ন্যায্য অর্থ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত ও ব্রাত্য হয়ে থাকে।

অন্যদিকে 'রামগোলাম' উপন্যাসে মেথর সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে জেলেসমাজের মতো দিন আনা দিন খাওয়ার মতো নিত্য অভাব না থাকলেও চাকরির নামমাত্র বেতনে সংসার চালান কঠিন হয়ে পড়ে তাদের। ফলে দেখা যায় শুধু পুরুষরাই নয় পরিবারের নারীরাও কর্পোরেশনে ঝাড়ুদারের কাজ করে। কারণ কর্পোরেশনে মেথরদের চাকরি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বংশানুক্রমিকভাবে বাঁধা।

> 'মেথরপট্টির পুরুষরা রাস্তাঘাটের আবর্জনা টানে, বাড়ি বাড়ি থেকে টাট্টি টানে আর মেয়েরা পরিষ্কার করে রাস্তা। মেথরপট্টির প্রায় সব পুরুষ-নারী মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনে চাকরি করে। আঠারো বছর পেরোলেই চাকরি পাওয়ার অধিকার জন্মে তাদের।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৪)

উপন্যাসের কেন্দ্রে গুরুচরণের পরিবারকে রেখে ঘটনা আবর্তিত। গুরুচরণ কর্পোরেশনে ময়লা টানার গাড়ির ড্রাইভার। তার স্ত্রী অঞ্জলি ঝাড়ুদার ও ছেলে ট্রাক থেকে ময়লা-আবর্জনা তোলা ও নামানোর কাজ করে। মেথর সমাজের পেশা ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করা হলেও তারা শখে বা স্বেচ্ছায় এই কাজ করে

না। যুগ ও সমাজ তাদের এ কাজ করতে বাধ্য করেছে। উপন্যাসে দেখা যায়, গুরুচরণ যখন টাট্টি টানার গাড়ির ড্রাইভারির চাকরি পায় তখন প্রথম দিনের কাজে টাট্টির গন্ধে বমি করেছে সে। ফলে কয়েকবার চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবলেও পরিবারের ভরণ-পোষণের চিন্তা করে বাধ্য হয়ে ড্রাইভারি করেছে গুরুচরণ। ঠিক একইভাবে শিবচরণ ডাস্টবিনের ময়লার গন্ধে বমি করেছে, কিন্তু বাধ্য হয়ে পরিবারের জন্য দুর্গন্ধ সহ্য করে সামান্য অর্থের জন্য কাজ করে যায় সে। লেখক তাই মেথরদের উৎপত্তির পৌরাণিক কারণ বর্ণনা করে কৌশলে সমাজের অন্যায় রীতিনীতি ও জাতিভেদ প্রথার প্রতি ব্যঙ্গ করেছেন। জানা যায়, ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশরা তৎকালীন পূর্ববঙ্গে মেথরদের বিহার, উড়িষ্যা, কানপুর, এলাহাবাদ ও অন্যান্য স্থান থেকে আমদানি করেছে এই শর্তে যে তাদের থাকার জন্য বিল্ডিং তৈরি ও তাদের পুরুষানুক্রমে সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করা হবে। দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় ও চাকরির লোভে তারা জন্মভূমি ত্যাগ করে বঙ্গদেশে পাড়ি দিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের আশ্রয় ও জীবনরক্ষার উপযোগী পারিশ্রমিকে নিশ্চয়তা ছিল মেথরদের, কিন্তু

> ‘পাকিস্তান আমলে তাদের স্বস্তির জায়গায় ভাঙন শুরু হয়, ময়লা পরিষ্কারের চাকরি নিয়ে টানাটানি শুরু হয়।... স্বাধীনতার পর তাদের অর্থনৈতিক জীবনের ভাঙন প্রায় সম্পূর্ণ হয়। তাদের বলা হয়—চাকরির বয়স শেষ হয়ে গেলে কলোনি ছাড়তে হবে। পেটের সন্তানকে ভাতা দেওয়া তো দূরের কথা, রেশন প্রথাও বন্ধ করে দিল করপোরেশন। করপোরেশন সবার জন্য ঝাড়ুদারের চাকরি উন্মুক্ত করার উদ্যোগ নিল। ধীরে ধীরে উন্মূল হয়ে পড়তে লাগল চট্টগ্রামের মেথর সম্প্রদায়।’ (জলদাস ২০১২, পৃ. ৩১)

মেথর সমাজের জন্য কাজের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা এতদিন সেই সমাজের অর্থনৈতিক মূল ভিত্তি ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে কর্পোরেশন ঘোষিত সেই চাকরি সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের জন্য উন্মুক্ত হলে মেথরদের পেশাগত নিরাপত্তাহীনতার প্রশ্ন উঠে আসে। কারণ মেথররা সমাজে তথাকথিতভাবে অস্পৃশ্য ও নিম্নশ্রেণির মানুষ। তারা শিক্ষিত হয়ে তথাকথিত ভদ্র সমাজের সঙ্গে মিশতে চাইলেও তাদের সেখানে কোনো স্থান বা সুযোগ মেলে না। তাইতো রামগোলাম এসএসসি পাস করার পর গুরুচরণের বক্তব্য,

> ‘ছোটো জাতের লোকদের বেশি পড়তে নেই। বেশি পড়লে জীবনে বিড়ম্বনা বাড়ে শুধু।... যতই পড়ো না কেন, করপোরেশনের গু-মুত টানা, নর্দমা সাফ করা আর রাস্তা ঝাঁট দেয়ার চাকরিই তোমার জন্য নির্ধারিত। তোমার আগে এই হরিজনপল্লির কেউ সাহেবি চাকরি পায়নি, তোমার পরেও কেউ পাবে না।’ (জলদাস ২০১২, পৃ. ৬৭-৬৮)

মেথরদের জন্য নিশ্চিত চাকরি সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য রামগোলাম যখন সকল মেথরশ্রেণিকে নিয়ে কর্পোরেশনের বড়োবাবুর সামনে প্রতিবাদ করে তখন বড়োবাবু তাদের প্রতিবাদকে প্রতিহত করার জন্য রামগোলামকে জুনিয়ার জমাদার পোস্টে চাকরি দেয়। তবে সে থেমে থাকে না,

মেথরদের জন্য লড়াই করে। কিন্তু কর্পোরেশনের ক্ষমতার কাছে হেরে যায় মেথররা এবং শেষ পর্যন্ত চাকরি সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। প্রতিবাদের অপরাধে কর্পোরেশনের বড়োবাবু আইন করেন, মেথরদের মধ্য থেকে কেউ কোনোদিন জমাদার হতে পারবে না। দেখা যায়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মেথররা চাকরি ও ঘর পেয়ে সেগুলি মেথরদের ভাড়া দেওয়া শুরু করল, অর্থাৎ চাকরির খাতায় নাম থাকল অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষদের, কিন্তু কাজ করে যেতে লাগল মেথররা। বিনিময়ে মোট বেতনের অর্ধেক পেল তারা।

হরিশংকরের কথাবিশ্বে জেলে, মেথর ও পতিতা সমাজ যতটা বিস্তৃতভাবে দেখা গিয়েছে, ততটা সমাজের অন্যান্য নিম্নবর্গের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। কথাবিশ্বে বিভিন্ন পেশার মানুষ দেখা গেলেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটনা বা কাহিনির অনুষঙ্গ হিসেবে উঠে এসেছে। যেমন 'লুচ্চা' গল্পে দেখা যায় সুধামের পিতা চন্দনকান্তির ছিল বাজেমালের দোকান। সেই দোকানই ছিল আয়ের উৎস। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে তার দোকানের আয় কমে গেলে চন্দনকান্তির পরিবার অথই জলে পড়ে। সুধাম ও স্বপন দুইভাই দোকানটিকে আবার সচল করার প্রয়াস করে এবং কিছুটা সফল হলেও সংসারের অভাব তাতে ঘোচে না। এই পরিস্থিতিতে সুধাম ঠিক করে সে বিদেশে যাবে ও যে কোনো ধরনের কাজ করে অনেক টাকা রোজগার করবে।

> '... সে বিদেশ যাবে। কুয়েত অথবা দুবাই বা লিবিয়া। যেকোনো চাকরি হলেই চলবে। সুইপার, পিয়ন, দারোয়ান, মাছমারা এমনকি ডুবুরির কাজ করতেও তার আপত্তি নেই। তার টাকা কামানো দরকার। টানাটানির সংসার, নুন আনতে পান্তা ফুরায়। বছর বছর ঘরের চালটা পর্যন্ত মেরামতের ক্ষমতা নেই। কত বর্ষায় যে চাল চুঁইয়ে চুঁইয়ে বৃষ্টির জল পড়েছে গায়ে। এসব কষ্টের লাঘব করতে হবে।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ১২২)

অল্পশিক্ষিত এই মানুষগুলির আর্থিক পরিস্থিতি দুর্বল বলে এরা উপার্জনের আশায় বিদেশেও পাড়ি দিয়েছে। সুধাম সেখানে গিয়ে মাছধরার ট্রলারে ডুবুরির কাজ নিয়েছে। প্রাণের অনিশ্চয়তা জেনেও এরা তাদের আর্থিক পরিস্থিতিকে স্বচ্ছল করার জন্য উপার্জন করে। সেদিক থেকে তারা কষ্টসহিষ্ণু প্রকৃতির। আবার 'ভাঙন' গল্পে রয়েছে ডোমপাড়ার নামকরা ডোম দয়ালহরির সন্তান রামলালের কথা। রামলাল তার মাতা পিতাকে অকালে হারালে,

> 'এখানে ওখানে চড়-লাথি খেতে খেতে একটা সময় জমিদারবাড়িতে আশ্রয় পেয়ে গেল রামলাল।'
>
> (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ১৪৭)

সেই বাড়িতে প্রথমে বাগানের মালী এবং পরবর্তীকালে জমিদারের বজরার পরিচর্যার কাজ পায় সে। রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্পের বিনির্মাণ 'রতন' গল্পটিতে দেখা যায় রতন মাতাপিতাহীন এগার-বার

বছরের শিশুকন্যা। রতনকে আশ্রয় দেয় তার দুঃসম্পর্কের হিমাংশু কাকা। দিনমজুর হিমাংশুর আয় নেই বলে সংসারে টানাটানি। তিনি তাই রতনকে পোস্টমাস্টারের কাছে কাজের পরিচারিকা হিসাবে পাঠায়,

> 'কিন্তু সে জানল না—এ শুধু ঘাটবদল। শেওলা যেমন নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে এঘাট থেকে ওঘাটে যায়, রতনেরও তাই হয়েছিল...' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ১৯৮)

শুধু তাই নয়, পোস্টমাস্টার উলাপুর গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে রতন আবার অসহায় হয়ে হিমাংশু কাকার কাছে ফিরে আসে। পরে এক বৃদ্ধের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হয়। বৃদ্ধ মারা গেলে বাড়ির ছেলেরা রতনকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। আরো একবার অসহায় রতন কলকাতা শহরে পৌঁছে যায় পোস্টমাস্টারের খোঁজে। পুনরায় রতন পোস্টমাস্টারের বাড়িতে পরিচারিকা হিসাবে নিযুক্ত হয়। কিন্তু সেখান থেকেও তাকে বিতাড়িত করা হয়েছে। রতন শ্যাওলার মতো ভেসে বেরিয়েছে।

'কুন্তীর বস্ত্রহরণ' উপন্যাসে লেখক কুমোরসমাজের এক খণ্ড চিত্র তুলে ধরেছেন। চাঁপাতলা গ্রামের একটি কোণে প্রায় একশো কুমোর পরিবার নিয়ে কুমোরপাড়াটি অবস্থিত। শান্তিপূর্ণ পাড়াটিতে হঠাৎ করে চেঙ্গুটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নজর পড়ে। কুমোরদের শ্মশানের স্থানে সে একটি বাগানবাড়ি বানাতে চায়। কুমোররা বাধা দিলে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জায়গাটি ভয়, মার ও অত্যাচার করে দখল করে। সমাজের ক্ষমতাধারীরা এভাবেই নিম্নবর্গের কাছ থেকে তাদের অবলম্বন কেড়ে নেয়। 'একটি মনগড়া কাহিনি' গল্পে দেখা যায় যারা সমাজে একসময় দারিদ্র্য কবলিত, অসহায় ও ক্ষুধার্ত ছিল এবং কালচক্রে কেউ কমবেশি উপার্জন করে নিজেদের অভাব মেটাতে পেরেছে, তারাই একটা সময় সমাজের দরিদ্র, অসহায় ক্ষুধার্ত মানুষগুলির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছে। 'উস্টা' গল্পে কথক একজন বেসরকারি ব্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তার জন্ম একজন দিনমজুরের ঘরে।

> 'বাবা রাজমিস্ত্রির হেল্পারগিরি করত। পাঁচ সন্তান আর স্ত্রীর ভরণপোষণ নিয়ে বাপকে হিমসিম খেতে হত। সবসময় বাবা কাজ পেত না। যেদিন বেকার থাকত বাবা, সেদিন চুলা জ্বলত না আমাদের।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৩২৪)

সেই কথকই একদিন রাস্তায় বেরিয়ে দুলাল নামক এক পথশিশুকে অবহেলা করে। ক্ষুধায় কাতর এক কিশোর তার কাছে ডাবের জল খেতে চেয়ে পা জড়িয়ে ধরলে কথক তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের অতীত স্মরণ করে সে দুলালকে খুঁজে বেড়ায় এবং নিজের আচরণের জন্য অনুশোচনায় ভুগতে থাকে। ক্ষুধার্ত, চালচুলোহীন দুলালের প্রতি কথকের অবহেলা প্রমাণ করে দেয় নিম্নবর্গের অন্যের কাছে সাহায্য কামনা করাও উচ্চবর্গের কাছে অত্যাচারের শামিল। কথক একসময়ে দুলালের মতোই অসহায় পীড়িত ও ক্ষুধার্ত ছিল, কিন্তু তার অবস্থা বদলের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নবর্গের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে বদলে গিয়েছে। এক মুহূর্তের জন্য হলেও নিম্নবর্গের প্রতি অবহেলা

জন্মেছে। প্রমাণিত হয়েছে সমাজে নিম্নবর্গের অবস্থান। আবার ‘একটি মনগড়া কাহিনি’ তেও দেখা যাচ্ছে হামিদ নামের এক যুবক গ্রাম থেকে ঢাকায় এসে নিত্য লাঞ্ছনা অপমান ও পীড়িত হয়েছে। ক্ষুধার্ত পেটে হাচিরামের পিঠার দোকানে এসে পিঠা চাইত। আজ সেই হামিদের জায়গায় ছিল এক ভিক্ষুক। সেও ক্ষুধার তাড়নায় তার কাছে এসে পিঠা চেয়েছে , কিন্তু কাষ্টমারের ভিড়ে সে তাকে অবহেলা করেছে, কথা শুনিয়েছে। পরিবর্তে ভিক্ষুক প্রশ্ন করে,

> ‘জিগাই খিদা কি শুধু বড়োলোকের লাগে, গরিবের খিদা পায় না?’ (জলদাস ২০১৯(ক), পৃ. ১১৯)

‘সুরেন্দ্র গাওয়াল’ গল্পে কেষ্টপুর গ্রামে সুরেন্দ্রর দারিদ্র্য ও জীবনসংগ্রাম উঠে এসেছে। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ গরিব। চাষের সময় এই গরিব মানুষগুলো ধনী গৃহস্থদের খেতখামারে কামলাগিরি করে। চাষের সময় ফুরোলে আবার তারা দারিদ্র্যে ডুবে যায়। কিন্তু সুরেন্দ্র কামলাগিরি না করে গ্রামের খেজুর গাছ লিজে নিয়ে তার রস সংগ্রহ করে বিক্রি করে আর নারকেল গাছ ঝাড়াই করে সংসারের অভাব মেটায় সে। কিন্তু তার পরিবার বৃদ্ধি পেলে,

> ‘খেজুর রস বেচে, নারকেল গাছ ছিলে সংসার আর চলে না। তখন এক বুদ্ধি বার করল সুরেন্দ্র গাছি। গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় পান-সুপারি বেচা শুরু করল। কুমিল্লার এ অঞ্চলে যারা পান সুপারি বিক্রি করে, তাদের গাওয়াল বলে।’
> (জলদাস ২০১৯(ক), পৃ. ২৬)

আবার ‘ভোলা কাকা’ গল্পে দেখা যায় বিভিন্ন নিম্নবৃত্তির মানুষদের। প্রথমেই দেখা যায় হরিপদ শীলকে যিনি একজন নাপিত, গোয়ালা, ভোলা কাকা, চালচুলোহীন জলিল যার পিতা একজন গরিব চাষি, যারা সংসারের অভাব অনটন মেটাতে সারাজীবন এভাবেই সংগ্রাম করে গিয়েছেন। কিন্তু সমাজের এই নিম্নবৃত্তির মানুষগুলোর কোনো মূল্য সমাজ দেয়নি। নাপিত হরিপদ শীলের কাছে ক্ষৌরকর্ম করে গিয়েও নানা অছিলায় তার ন্যায্য পারিশ্রমিক না দিয়ে চলে যায় তদাপেক্ষা অর্থশালী সমাজের সভ্য মানুষেরা। গোয়ালা ভোলা কাকা সংসারের অভাব অনটনে জর্জরিত হয়ে গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে হয়। সমাজ এদের কোনো খবর রাখে না। তাই ভোলা কাকার মৃত্যুর পরে জলিলদের মানুষেরাই ভোলাকাকাদের মতো মানুষদের জন্য দুদণ্ড দুঃখের অশ্রু বিসর্জন করে। ‘ভিখারি’ গল্পে দেখা যায় শহরে ভিক্ষুকদের করুণ অবস্থার ছবি। সভ্য সমাজ ভিখিরিদের মানুষ বলে মনে করেনি। প্রহার, প্রশাসনিক ভয় দেখিয়ে তাদের নিপীড়ন করেছে যা একটা সময় ভিখিরিদের মনে বাঁচার ইচ্ছে বা ভয়ের মৃত্যু ঘটিয়েছে। আবার ‘থুতু’, ‘আহব ইদানীং’, ‘সীমানা ছাড়ায়ে’ গল্পে রয়েছে মুক্তিযোদ্ধার পঙ্গুত্বে পর্যবসিত হয়ে ভিক্ষুকে পরিণত হওয়ার কথা। ‘থুতু’ গল্পে দেখা যায় সৈকত ও ফারহানাকে। সৈকতের কথায়,

‘আমি কোনো ধনী ঘরের সন্তান নইরে ফারহানা। বাপ গোয়ালা। গৃহস্থদের কাছ থেকে দুধ কিনে গঞ্জে নিয়ে বেচে। ওই দিয়ে আমাদের সংসার চলে।’ (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২১০)

আর ফারহানারা থাকে একটি মেথরপট্টির বস্তিতে। ফারহানার বাবা এবং ঠাকুরদাদা ছিল চাষি। শামসুর মুক্তিযুদ্ধ থেকে পঙ্গু হয়ে ফিরলে তারা এক ওভার ব্রিজের বস্তিতে গিয়ে উঠল। কিন্তু সেখানে টেকা মুশকিল হল তাদের। কারণ আশেপাশের ঝুপড়ির ছেলেরা চুরিচামারি করে, ছোটো খাটো জোচ্চুরি ও ছিনতাই লেগে রয়েছে। বস্তি জীবনের বর্ণনায় দেখা যায়,

‘কেউ কেউ ছুটকাছাটকা কুলিগিরি করে। মেয়েরা পিঠে বস্তা ঝুলিয়ে প্লাস্টিকের বোতল, ছেঁড়া জুতা, কাগজের টুকরা—এসব কুড়িয়ে যায় সারাদিন। কেউ কেউ মায়েদের সঙ্গে বাসাবাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতে যায়।’

(জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২১৯)

সংসার চালানোর জন্য শামসুর ভিক্ষাবৃত্তি করে, স্ত্রী নিলু এক অধ্যাপকের বাড়িতে কাজ করে উপার্জন করে। ফলে বাড়িতে ফারহানাকে একা পেয়ে পাশের ঝুপড়ির সিরাজের বাপ ঘরে ঢোকে। জাপটে ধরে তাকে। ফারহানাদের মতো নিম্নবর্গের মানুষদের প্রায়শই সমাজের দ্বারা এভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়। আবার ‘আহব ইদানীং’ গল্পে এককালের মোহাম্মদ কালামউদ্দিন বর্তমানে কোমর ভাঙা কাউল্যা ভিক্ষুক। মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার আগে কালাম চিটাগং স্টিল মিলের জাপানি ইঞ্জিনিয়ারদের বাংলো দেখাশোনার কাজ করত। যুদ্ধে কোমর ভেঙে পঙ্গু হয়ে ফেরার পর কালামকে ভিক্ষাবৃত্তিকেই বেছে নিতে হল।

‘প্রথম প্রথম কী শরম যে লাগত! মা যখন হুইল চেয়ার ঠেলে ঠেলে আমাকে চৌরাস্তার মোড়ে নিয়ে যেত, পথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অঝোর ধারায় কাঁদতাম।’ (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২৭২)

পঙ্গুত্বের কারণে সংসারের গলগ্রহে পরিণত হয়ে স্ত্রীয়ের সংসর্গ থেকে বিচ্ছেদ হয় তার। নিম্নবর্গের জন্য সমাজ ও পরিবারের অসহযোগিতা এখানে চোখে পড়ে। ‘সীমানা ছাড়ায়ে’ গল্পের চরিত্র অংশুমান মিত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। সঙ্গী ছিল ছইদুল। যুদ্ধে অংশু নিহত ও ছইদুল আহত হয়। মারা গিয়ে স্বর্গে গিয়েছে অংশু। সেখান থেকে যমরাজের অনুমতি নিয়ে মর্তে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে সে। ছইদুলকে খুঁজে পেয়ে সে দেখলও,

‘তিন চাকার জীর্ণ, মরমরে একটা হুইল চেয়ার ঠেলে আনছে এক কিশোরী। হুইল চেয়ারে বসা ছৈয়দুল। সামনে ভিক্ষার থালা।’ (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৩৪৪)

উপরিউক্ত তিনটি গল্পে দেখা গেল বর্তমান সমাজ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্য সম্মানটুকু দেয়নি। যে দেশের জন্য যারা একটা সময় মৃত্যু বা পঙ্গুত্ব বরণ করল তারা আজ ভিখিরি। আর বিশ্বাসঘাতক রাজাকাররা হল

দেশের কর্তা। বোঝাই যায় সমাজ সেদিকেই ধাবিত হয় যেখানে ক্ষমতা রয়েছে। দেশের জন্য ভালোবাসা ও ত্যাগ স্বীকার করে সমাজে ভিখিরি হয়ে বাঁচতে হয় তাদের।

'ওরা এরকমই' গল্পে একজন কুলি সন্তানের সততার পরিচয় রয়েছে। আসলে সমাজের ভেতর নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি উচ্চবর্গের যে ঘৃণা ও অবিশ্বাস, তার প্রতি লেখকের একধরনের প্রতিবাদ এটি। এছাড়াও যেসব গল্পে সমাজের নিম্নবৃত্তি ও নিম্নবিত্তের মানুষের কথা উঠে এসেছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'পরীক্ষার ফল' যেখানে রয়েছে একজন সুইপারের জীবনের খণ্ড চিত্র, 'উর্বশী' গল্পে পতিতাপল্লির দালালের কথা উঠে এসেছে, 'ভাবাতো ভাই' গল্পে রয়েছে দুজন ব্যাঙ্কের দারোয়ানের কথা, 'কষ্টিপাথর' গল্পে রয়েছে একজন চাষিবউয়ের কথা, 'খালি হাতে ফেরা' তে দেখা যায় একজন গোয়ালা ও ডাকাতের কথা। এভাবেই বিভিন্ন ও বিচিত্র পেশার মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে লেখকের গল্প-উপন্যাসে।

সুতরাং দেখা গেল, আলোচ্য নিম্নবর্গীয় সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি তাদের পেশাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে। তবে জেলে, মুচি, চাষি, নাপিত ইত্যাদি পেশার মানুষেরা পুরুষানুক্রমিকভাবে একই পেশাকে অবলম্বন করে জীবন অতিবাহিত করলেও তাদের মধ্য থেকে কেউ শিক্ষা অর্জন করে তথাকথিত ভদ্র সমাজে নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। কেউ পৈতৃক পেশা বদল করে কুলি, বাদনদলের বাদক, কেউ ভিক্ষে করে বা কেউ হাল চাষ করে জীবনধারণ করেছে। কিন্তু পতিতা ও মেথর সমাজের ক্ষেত্রে শিক্ষা অর্জন করে সমাজের মুলস্রোতে মেশার কোনো সুযোগ তৈরি হয়নি। তাদের মধ্যে কেউ সে চেষ্টা করলেও তথাকথিত ভদ্র সমাজ তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমবিভাগের মধ্য দিয়ে এভাবেই সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা-বোধ সৃষ্টি করেছে।

৩.৩ হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে নিম্নবর্গের সাংস্কৃতিক জীবন

ইংরেজি 'কালচার' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'সংস্কৃতি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। বিখ্যাত ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'সংস্কৃতি' শব্দটির মূল উৎস সন্ধানে পেয়েছেন ইউরোপের 'Culture' শব্দটিকে। যে শব্দটির মূলে আছে লাতিনের 'cultura' শব্দ। লাতিনের 'col' ধাতু চাষ করা, যত্ন করা, বা পূজা করা অর্থে প্রযোজ্য। সুনীতিকুমার মনে করেন 'কালচার' শব্দটির অনুরূপ প্রতিশব্দ 'উৎকর্ষ সাধন' যথাযথ হয়। পরবর্তীকালের গবেষণায় তিনি দেখেছেন 'চাষ করা' অর্থেই 'কৃষ্টি' শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, 'কালচার' অর্থে নয়। 'সংস্কৃতি' শব্দটি 'culture' বা 'civilization' অর্থে সুনীতিকুমার পেয়েছিলেন ১৯২২ সালে, প্যারিসে, তাঁর একজন মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কাছে। তারা শব্দটি

মারাঠি ভাষায় প্রধানত জনসমাজ ও নগর অর্থে বহুকাল থেকেই ব্যবহার করে আসছেন। (চট্টোপাধ্যায় ১৩৬৭, পৃ. ৭-৮) 'সংস্কৃতি' বলতে পোশাক-পরিচ্ছদ, কথ্যভাষা, খাদ্যাভ্যাস, ধর্মবিশ্বাস, আচার-ব্যবহারকে ইঙ্গিত করেছি, কিন্তু প্রকৃত অর্থে সমাজবিন্যাসের ইতিহাসই সংস্কৃতি। আসলে সংস্কৃতি হল একটি সমাজ বা জনগোষ্ঠীর ভেতরের রূপ এবং সমাজ তার বাইরের অঙ্গ। বঙ্গদেশ তথা বাঙালির সংস্কৃতি প্রসঙ্গে গবেষক-প্রাবন্ধিক গোলাম মুরশিদের মন্তব্য এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, বাঙালি সংস্কৃতি অখণ্ড বা অভিন্ন সংস্কৃতি নয়। সমাজ যেমন বহুধাবিভক্ত তেমনই সংস্কৃতিও সমাজভেদে বিভাজিত। কারণ একই ধর্মের মধ্যে উচ্চ-নীচ বিভেদ রয়েছে। যেমন, হিন্দু সমাজে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের পার্থক্য, আবার ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্যের কারণেও ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পার্থক্য লক্ষণীয়। ধর্ম ও বর্ণের মতোই বাংলার গ্রামীণ সমাজ ও নাগরিক সমাজের মধ্যেও দুস্তর ব্যবধান রয়েছে। আসলে তিনি বলতে চান বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধন। তাঁর বক্তব্য,

> '... বাঙালি সংস্কৃতি হিন্দু, মুসলমান, উচ্চবর্ণের হিন্দু, নিম্নবর্ণের হিন্দু, বৈষ্ণব, শাক্ত, বাউল, আসরাফ, আতরাফ, বৌদ্ধ, খৃস্টান-সবার সংস্কৃতি। শহরের, গ্রামের, ধনীর, গরিবের-তাবৎ মানুষের সংস্কৃতি। এবং সে কারণে এ সংস্কৃতির অবয়ব আদৌ শাদামাটা অথবা একমাত্রিক নয়।' (মুরশিদ ২০০৬, পৃ. ১৪-১৫)

বাঙালি সংস্কৃতি সকল ধর্ম-বর্ণ-শহর-গ্রাম-ধনী-গরিবের সংস্কৃতি বলেই তা বহুমাত্রিক। সুতরাং উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতির পার্থক্য লক্ষণীয়। আমরা জানি, মানুষে মানুষে মেলবন্ধন না ঘটলে বুদ্ধির বিচার বা উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ সম্ভব নয়। কিন্তু নিম্নবর্গ সমাজ অনেকাংশেই প্রান্তিক বলে তারা নিজেদের বৃত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সমাজের কেন্দ্রের সঙ্গে তাদের মেলবন্ধনের কোনো সুযোগ নেই। ফলে তাদের সংস্কৃতিগত চিন্তাচেতনার মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ সম্ভব হয় না। সুতরাং বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যেই উচ্চ-নীচ ভেদাভেদে কেন্দ্র ও প্রান্তের বিভাজন হয়েছে। সেখানে তথাকথিত ভদ্র, মার্জিত, শিক্ষিত, রুচিশীল উচ্চবর্গীয় সমাজ থেকে দূরে বসবাসকারী প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর আচার-ব্যবহার, খাদ্যাভ্যাস, কুসংস্কার, অমার্জিত রুচিশীলতা, নিম্নমানের শিক্ষা ও সর্বোপরি লোকসংস্কৃতি বা লোকাচার বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই নিম্নবর্গের সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। এ কারণেই যে কোনো সমাজে দ্বিবিধ সংস্কৃতির সন্ধান আমরা পেয়ে থাকি। এক. উচ্চবর্গের সংস্কৃতি ও দুই. নিম্নবর্গের সংস্কৃতি।

নিম্নবর্গের সাংস্কৃতিক দিকটি আলোচনায় গ্রামশি ফোকলোর অর্থাৎ লোকসংস্কৃতি-কে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ফোকলোর বলতে তিনি লোকায়ত বা লোকসংস্কৃতিকেই বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে,

> 'Folklore should instead be studies as a 'conception of the world and life' implicit to a large extent in determinate (in time and space) strata of society and in opposition (also for the most part implicit,

mechanical and objective) to 'official' conceptions of the world (or in a broader sense, the conceptions of the cultured parts of historically determinate societies) that have succeeded one another in the historical process. ...This conception of the world is not elaborated and systemetic because , by defination, the people (the sum total of the instrumental and subaltern classes of every from of society that has so far existed) cannot possess conceptions which are elaborated, systematic and politically organizedand centralized in their albeit contradictory development. ...In fact, it is only a folklore that one finds surviving evidence, adulterated and mutilated, of the majority of these conceptions'
(Forgacs 2000, p.360)

অর্থাৎ লোকসংস্কৃতির সঙ্গে নিম্নবর্গের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। গ্রামশির মন্তব্যে এ কথা পরিষ্কার যে, লোকসংস্কৃতিকে দেখতে হবে দার্শনিক চেতনায়, বিশ্ববীক্ষায় ও জীবনযাপনের ধারণা থেকে যা নিম্নবর্গের সাধারণ চৈতন্যের সঙ্গে একটি দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করে। তাঁর মতে, লোকসংস্কৃতি নিম্নবর্গের সামাজিক অস্তিত্বের বয়ান ঘোষণা করে। এই লোকায়ত সংস্কৃতি বহুস্তরীয় এবং বহুরৈখিক। ফলে সমাজের অংশ হিসাবে এখানে একদিকে যেমন প্রতিরোধের উপাদান রয়েছে তেমনই অন্যদিকে উচ্চবর্গের সংস্কৃতির উপাদানও রয়েছে। সুতরাং সংস্কৃতিগত দিক থেকে একধরনের আধিপত্যমূলক বৈপরীত্য দেখা গিয়েছে সমাজে। যদিও এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে সংস্কৃতিগত আধিপত্যমূলক বৈপরীত্য ব্যাপারটি সে অর্থে উঠে আসেনি, কারণ তাঁর আখ্যানগুলি নিম্নবর্গ-প্রধান এবং সেখানে নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতিরই বর্ণনা আমরা পেয়েছি। হরিশংকর জলদাসের সাহিত্যে যে সমাজ ও সংস্কৃতিকে দেখি তা মূলত নিম্নবর্গকেন্দ্রিক। এই পর্বে আমরা হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে নিম্নবর্গের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে আলোচনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করতে চাইছি।

৩.৩.১ নিম্নবর্গীয় সমাজের আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কার-কুসংস্কার

মানুষ হিসেবে মানুষের আসল পরিচয়ই হল তার সংস্কৃতি। এই কৃতি বা কাজের মধ্য দিয়েই মানুষ প্রকৃতির নিয়ম ও বাধা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছে। মানুষের সংস্কৃতির মূল প্রেরণা হল নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য নানা জীবিকার মাধ্যম খুঁজে প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করার চেষ্টা। ফলে সংস্কৃতি বলতে কেবল আচার-সংস্কার, অনুষ্ঠান, নৃত্য-গীত, ধর্ম, বিশ্বাসই নয়, পাশাপাশি মানুষের চিন্তা, কল্পনা, দর্শনকেও বোঝায়। আসলে মানুষের বাস্তব ও মানসিক কৃতি বা সৃষ্টি নিয়েই সংস্কৃতি—যা জীবনসংগ্রামের মোট প্রচেষ্টারই নামান্তর। সমালোচক গোপাল হালদার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সংস্কৃতির তিন ধরনের অবয়ব বা অবলম্বনকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তাঁর বক্তব্য,

‘প্রথমত উহার মূল ভিত্তি সেই জীবন-সংগ্রামের বাস্তব উপকরণসমূহ (material means); দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতির প্রধান আশ্রয় সমাজযাত্রার বাস্তব ব্যবস্থা (social structure); আর তৃতীয়ত সংস্কৃতির শেষ পরিচয় মানস সম্পদে—উহা এই হিসাবে সমাজ-সৌধের ‘শিখরচূড়া’ মাত্র (superstructure)। তাহা হইলে সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কাল্‌চার জাতিগত, দেশগত বা ধর্মগত, তাহাও যেমন একটি অর্ধ সত্য, তেমনি সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কাল্‌চার মানে কাব্য, গান, চারুকলা, বড়ো জোর দর্শন বা বিজ্ঞান পর্যন্ত, তাহাও তেমনি আর একটি অর্ধ সত্য। কথা এই যে, উহা সমাজ-দেহের শুধু লাবণ্য-ছটা নয়, তাহার সমগ্র রূপ। তাই সমাজের পরিচয় দিয়াই সংস্কৃতির পরিচয়—এইটিই আসল কথা।’ (হালদার ১৩৪৮, পৃ. ৩১-৩২)

‘সমাজের পরিচয় দিয়াই সংস্কৃতির পরিচয়’- এই বিষয়টি আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। বর্তমান পরিচ্ছেদে সাধারণভাবে সংস্কৃতির জাতিগত, আচার-সংস্কার-বিশ্বাস ও তাদের পোশাক-খাদ্যাভ্যাসকে দেখে নেওয়ার মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গীয় সমাজের সম্যক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে বুঝে নেব।

৩.৩.১.১ জেলেসমাজের আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কার-কুসংস্কার

জেলেজীবনের বারোমাস্যায় একেক ঋতু একেক রকমের প্রভাব ফেলে। ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ মাসে জেলেরা দুঃসহ জীবন অতিবাহিত করে। কারণ চারিদিকে খরা-জলশূন্যতা ও মাছের অভাব। চৈত্রের শেষে খাদ্যাভাব–অনটন-দুর্ভিক্ষের রূপ নেয় জেলেপাড়াগুলিতে। চারিদিকে অনাহার ও জেলে সন্তানদের ক্ষুধার যন্ত্রণার আর্তনাদ শোনা যায়। তবে আষাঢ়-শ্রাবণ এই দুই মাসের সঙ্গে জেলেদের জীবনের সুখ-দুঃখ জড়িয়ে আছে। কারণ আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল। বর্ষার জলে খাল-বিল-পুকুর-নদী-সমুদ্র কানায় কানায় ভরে ওঠে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাই জলের ওপর নির্ভরশীলতায় জেলেরা মা গঙ্গাকে আরাধ্যা দেবী হিসেবে পূজা করে। ‘জলপুত্র’ উপন্যাসে দেখি-

‘শ্রাবণমাস জেলেদের জীবনে বড়ো সুখের মাস, স্বস্তির মাস। এইমাসে মা-গঙ্গা তাদেরকে উজাড় করে মাছ দেয়। আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন—এই চারমাসে তাদের হাঁড়িতে ভাত থাকে, পরনে নতুন কাপড় থাকে, মুখে হাসি থাকে।...

মনসা তাদের অন্যতম প্রধান দেবী।... তারা বিশ্বাস করে—মনসাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে সর্পের কোপানল থেকে রেহাই পাবে। তাই, গোটা শ্রাবণমাস জেলেদের ঘরে ঘরে সর্পদেবী মনসার পূজা হয় সাড়ম্বরে। প্রতিরাতে মনসাপুঁথি পাঠ হয়—এর বাড়ি, ওর বাড়ি।’ (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৮-৯)

লেখক তাঁর ‘কৈবর্তকথা’ গ্রন্থেও জানিয়েছেন,

‘জেলেদের প্রধানতম পুজো-উৎসব আষাঢ়-শ্রাবণকে ঘিরেই আবর্তিত। মা-গঙ্গা, মা-মনসা তাদের প্রধান আরাধ্যাদেবী। মা-গঙ্গা তাদের অন্নদাত্রী আর মা-মনসা তাদের রক্ষাকর্ত্রী।’ (জলদাস ২০০৯, পৃ. ৭৬)

শুধু পুঁথিপাঠই নয়, এর সঙ্গে একটি বিশেষ রীতিও জড়িয়ে আছে, তা হল যাত্রাপালা। আঞ্চলিক ভাষায় যাকে বলা হয় 'নাউট্যাপোয়া'। চৌদ্দ থেকে ষোল বছরের নৃত্যে দক্ষ কিশোরেরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নারী-পুরুষ সেজে বিরহ-বিচ্ছেদের গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে নাচে। জয়কৃষ্ণের বাড়িতে মনসার পুঁথিপাঠের আসরে কোলাগ্রাম থেকে প্রেমদাশ নাউট্যাকে ভাড়া করে আনা হয়েছে। আসরের শুরুতে প্রেমদাশ নাউট্যাপোয়া বন্দনাগীতি শুরু করে,

''শত নমস্কার আমার শত নমস্কার,
অধীনে গান করি সবার মাঝার,
আমার শত নমস্কার।
অধীন এই কাঙাল ছেলে, গান করিব আজ্ঞা পেলে
গান করিব আজ্ঞা পেলে,
সরস্বতীর পদতলে শত নমস্কার,
আমার শত নমস্কার।...'' (জলদাস ২০০৮ পৃ. ১০)

কোনো অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত জেলের মুখনিঃসৃত এই গানগুলি জীবনের মর্মবেদনা, প্রেম-বিরহ, দুঃখ-দুর্দশা ও দাম্পত্য জীবনের প্রতিচ্ছবিকে পরিস্ফুট করে। গীতের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষত জোরখাই, ঢোল, করতাল, হারমোনিয়াম, কাঁসা, মন্দিরা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজে এবং বিরহ-বিচ্ছেদের গান শুরু করে আনন্দমোহন-

"এ সংসারে থাকা যাবে না।
আজ নহে কাল যেতে হবে চিন্তা করে দেখ না।
সংসারে করিলে গমন অবশ্য হইবে মরণ,
চিরজীবী নয়রে কখন কর না ভুল ধারণা।
অনিত্য সংসার মাঝে নিশার স্বপন,
পথিকে পথিকে যেমন পথের আলাপন;
যখন মুদিবে নয়ন তোমার তো কেউ রবে না।" (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১১)

আনন্দমোহনের গানের শেষ কথাগুলি পুঁথিপাঠে ধুয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। নিয়মানুযায়ী নাচ ও গানের শেষে পুঁথিপাঠ শুরু হয়। জগবন্ধু পাঠ করছে লখিন্দরকে সাপ কামড়ানোর অংশ থেকে। বেহুলার স্বামীর জন্য আর্তনাদ ও হাহাকার অংশটি ভুবনের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। কারণ তার স্বামীও সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছে। বেহুলার স্বামীর জন্য হাহাকার ভুবনের স্বামী হারানোর যন্ত্রণার সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছে।

'অর্ক' উপন্যাসেও দেখা যায়, নাউট্যাপোয়ার প্রসঙ্গ। দিবাকর যখন তার ঠাকুমার কাছে নাউট্যা সম্পর্কে জানতে চায় তখন উত্তরে তার ঠাকুমা জানায়,

> 'যে পুরুষপোলা নাচে, তারে নাউট্যা বলে। বংশীদাদা ছোটোবেলা থেকেই নাইচত। শাওন মাসে গেরামে গেরামে ভাড়া যেত নাকি। মুখে পাউডার-সোনো মাইখা শাড়ি পইরা মনসাপুঁথিপাঠের আসরে নাইচত।' (জলদাস ২০১৭, পৃ. ৫৮)

শুধু মনসাপুঁথি পাঠই নয়, এর সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত পাঠ ও বিচ্ছেদের গানের আসরও বসতে দেখা গিয়েছে এসব জেলেপল্লিগুলিতে। 'চরণদাসী', 'সুরেন্দ্র গাওয়াল', 'কুন্তীর বস্ত্রহরণ' প্রভৃতি গল্পে পুরাণ পাঠ ও বিচ্ছেদের গানের আসর বসতে দেখা গিয়েছে। 'চরণদাসী' গল্পে দেখি,

> 'আজকে এবাড়ির উঠানে কালকে ওবাড়ির বারান্দায় গানের আসর বসে। বিচ্ছেদের গানের আসর। কৃষ্ণের বিরহে রাধার যে আকুলিবিকুলি, রাধাবিহনে কৃষ্ণের যে হাহাকার সেসব গানে ঝরে ঝরে পড়ে। লালমোহন, রবিশংকর, কেষ্টলাল বিচ্ছেদ গানের আসরকে মাতিয়ে রাখে। কিন্তু বাবরি চুলের হারাধন যখন গান ধরে—'বিচ্ছেদের সাগরে আর কতকাল ভাসিব/ কোথা গেলে শ্যামের দেখা পাবো', তখন গানের আসরে নিস্তব্ধতা নামে। আসর করুণরসে ভেসে যায়। দূরবর্তিনী দু'চারজন জেলেনারী আঁচলে চোখ মোছে।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৭১)

আবার 'সুরেন্দ্র গাওয়াল' গল্পেও সুরেন্দ্র ও তার ছেলেকে সুর করে মহাভারত পাঠ করতে দেখা গিয়েছে।

চৈত্র মাসের শেষে জেলেদের সংসারে খাদ্যাভাব ও অর্থাভাব এমন রূপ নেয় যে একে একরকম দুর্ভিক্ষ বলা যায়। কিন্তু তারই মধ্যে তাদের জীবনে উৎসব পরবের মতো চৈত্রসংক্রান্তি ও পয়লাবৈশাখ আসে। বর্ণ হিন্দুদের দুর্গাপূজা ও মুসলমানদের ঈদের মতোই জেলেদের কাছে গঙ্গাপূজা, মনসাপূজা, চৈত্র সংক্রান্তি ও পয়লা বৈশাখের সমান গুরুত্ব। আমরা লক্ষ করেছি যে, সমাজে চৈত্রসংক্রান্তির এক-দুদিন আগে জেলে নারীরা বহুকষ্টে জমানো টাকা তাদের স্বামীদের হাতে তুলে দেয় এবং স্বামী সেই টাকা দিয়ে সীমবিচি, সিদ্ধচাল, খইয়ের ধান, বাদাম, গুড় ও অন্যান্য জিনিস কিনে আনে। বাড়ির মা, ঠাকুমা, পিসিরা সেই সামগ্রী দিয়ে রাত জেগে মোয়া, মুড়কি, নাড়ু বানায়। জেলে সমাজ বহু প্রাচীন সমাজ। ফলে বেদের যুগ থেকে চলে আসা বিভিন্ন ভেষজ পদ্ধতি, লোকবিদ্যা ও প্রথা জেলে সমাজ বহন করে চলেছে। চৈত্র-সংক্রান্তি দিনটি ঘিরেও রয়েছে প্রাচীন সংস্কৃতির প্রথা। স্থানীয় ভাষায় একে বলা হয়েছে 'যাগ' বা 'যাক' দেওয়া। এই প্রথায়-

> 'চৈত্রের শেষদিনে জেলেপাড়ার প্রত্যেক পরিবারের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে যাকের উপকরণ সংগ্রহে নেমে পড়ে। বেতগাছের আগা, বটের পাতা, পাতাসুদ্ধ আমের ছোট্ট ডাল, কেয়ার ঝোপ, নিমপাতা, থানকুনিপাতা, বাসকপাতা, কাঁচা বাঁশপাতা ইত্যাদি উঠানের মাঝখানে এনে জড়ো করে। চৈত্রসংক্রান্তির ভোরসকালে প্রত্যেক সন্তানবতী জেলেনি তার সন্তানদের মঙ্গলকামনায় পূর্বমুখী হয়ে ভক্তিভরে সেই স্তূপীকৃত সংগ্রহে আগুন দেয়। একে বলা হয় 'যাক দেওয়া।'
> (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৪০)

এই বিশেষ ক্রিয়াকর্মে জেলে নারীরা ভোরে উঠে স্নান করে তাদের সন্তানদের যাকের আগুনের পাশে এমনভাবে দাঁড় করায় যাতে যাকের ধোঁয়া তাদের নাকে-মুখে-গায়ে লাগে। জেলে নারীদের বিশ্বাস-এই ধোঁয়া তাদের সন্তানদের সকল বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত করবে। ধোঁয়া গায়ে লাগার সময় জেলে নারীরা উচ্চস্বরে ছড়া বলে-

‘যাকরে যাক, যত আপদ বালাই আছে,
বিয়াগ্নিন হাত দইজ্যা পারই যাক।
যত টিঁয়া পইসা ধন দৌলত আছে,
বিয়াগ্নিন আঁর পোয়ার সিন্দুকত্ থাক।
যত রোগ বালাই আছে যত শত্রু আছে
বিয়াগ্নিন হাত দইজ্যা পারই যাক।’ (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৪১)

এই দিনটিতে দুপুরবেলা জেলে নারীরা পাঁচন রান্না করে। পাঁচন বলতে বোঝান হয়েছে-

‘পাঁচন হল হরেক তরিতরকারির সমষ্টি। ...বাজার ও পাড়াগাঁয়ের গাছগাছড়ায়, মাঠে-ঘাটে, ভক্ষণযোগ্য যত ফলফলাদি, লতাপাতা পাওয়া যায়, তার প্রায় সবগুলো দিয়ে জেলেনিরা পাঁচন রাঁধে।’ (জলদাস ২০০৯, পৃ. ৭৫)

রান্না শেষে জেলেরা তাদের বাড়িতে বন্ধু-আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করে এবং ক্ষণিকের আনন্দে মেতে ওঠে। চৈত্রসংক্রান্তির পরদিন পয়লা বৈশাখ। দিনটি জেলে জীবনেও ভিন্ন মাত্রা নিয়ে আসে। নববর্ষকে বরণ করার জন্য গোটা চৈত্রমাস জুড়ে চলে তার প্রস্তুতি। ‘জলপুত্র’ উপন্যাসে দেখি-

‘চৈত্রসংক্রান্তি ও পহেলা বৈশাখ পাশাপাশি। জেলেরা এ দুটো দিনকে তাদের মতো করে বিশেষভাবে উদ্‌যাপন করে।’
(জলদাস ২০০৮, পৃ. ৪০)

পয়লা বৈশাখের সকালে জেলে নারীরা ঘুম থেকে উঠে নিম পাতার সঙ্গে কাঁচা হলুদ বেটে নারকেলের মালায় রাখে। জেলে সন্তানরা স্নান করার সময় সেই বাটা সারা শরীরে মেখে নেয় তারা। জেলে সমাজের নারীদের বিশ্বাস- এতে সারাবছর ত্বক সুস্থ থাকবে। স্নান সেরে পরিষ্কার, ধোয়া জামা পরে বয়স নির্বিশেষে প্রত্যেক জলপুত্রকে দু-হাতের মুঠোভর্তি খই নিয়ে দু-কাঁধের পাশ দিয়ে উড়িয়ে দিতে হয়। জেলেদের বিশ্বাস- খই যেভাবে বাতাসে উড়ে যায়, তাদের শত্রুও সেভাবে বাতাসে উড়ে যাবে। তারপর সকলে সকলের বাড়ি গিয়ে একে অপরের বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে আসে। শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ ভুলে জেলেসমাজের পয়লা বৈশাখ এক মিলন উৎসবে পরিণত হয়। শুধু তাই নয়, আষাঢ় মাসে বর্ষণের পূর্বে জেলেরা যখন সমুদ্রে জাল পাতার জন্য গোঁজ পুঁততে যায় তখন তারা শুভ দিন দেখে সমুদ্র যাত্রা করে। যাত্রার আগে জেলেরা গঙ্গা পুজো করে। ‘জলপুত্র’ উপন্যাসে দেখি,

'আজ ৩ আষাঢ়, মঙ্গলবার। আজকেই মা-গঙ্গার পূজার সর্বোত্তম সময়—পঞ্জিকা ঘেঁটে বামুনঠাকুর বলে দিয়েছেন।'

(জলদাস ২০০৮, পৃ. ৪৬)

গঙ্গাপূজার নিয়ম অনুসারে সমুদ্রপাড়ে উত্তরমুখী একটি মাটির বেদি তৈরি করা হয়েছে। বেদির ওপর একটি কলাগাছ। সাগু, কলা, আম কাঁঠাল, নানা ফলমূল সহযোগে কলাপাতায় রাখা হয়েছে। বেদির সামনে মাঝারি আকারের একটি জলভর্তি কলসি এবং আম্রপল্লব। জেলে পাড়ার সকলে পূজা স্থানে উপস্থিত থেকে পূজার কাজ সম্পন্ন করা হয়। জেলেসমাজে গঙ্গা ও মনসা পূজাতে পাঠা বলি দেওয়ার রীতি। এই পাঠাবলি দেওয়ার মধ্য দিয়ে পূজার মূল কাজ শুরু হয়। তাছাড়া জেলেরা বেশিরভাগ বিষ্ণুর ভক্ত, অর্থাৎ বৈষ্ণব। 'দহনকাল' উপন্যাসে দেখা যায়,

'ইচাখলি জেলেপাড়াটি বিষ্ণু-ভাবাপন্ন। এপাড়ার অধিকাংশ নরনারীর গলায় তুলসীমালা। ...প্রতি সন্ধ্যায় কারও না কারও বাড়িতে কৃষ্ণনামের আসর বসে।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ২৬)

'চরণদাসী' গল্পে চরণদাসীর মুখে সবসময় কৃষ্ণনাম শোনা যায়। তাদের বাড়িতে মাঝে মধ্যেই রাধা কৃষ্ণের বিরহ বিচ্ছেদের গানের আসর বসে। জেলেসমাজের এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ধর্মান্তরিতকরণের বাতাবরণও লক্ষ করা যায়। 'মুখার্জী পরিবার', 'জলধরের কীর্তি' প্রভৃতি গল্পে ধর্মান্তরিতকরণের প্রসঙ্গটি এসেছে। যদিও উল্লিখিত বাকি দুটি গল্পে ধর্মান্তরিতকরণের কারণটি ভিন্ন। 'মুখার্জি পরিবার' গল্পে অরিন্দম মুখার্জি স্বেছায় খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে জন টমাস হয়েছন, কারণ-

'অরিন্দম মুখার্জি আইরিন ডি কস্টাকে বিয়ে করার পর জন টমাস হয়েছেন। বামুনের ছেলে খ্রিস্টান হয়ে গেছে।'

(জলদাস ২০১৯(ক), পৃ. ১৩২)

আবার জলধরের কীর্তি গল্পে দেখা যায় জলধি গ্রামের মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিস্টানদের সহাবস্থান। সেখানে মরিয়ম আশ্রমকে ঘিরে তাদের বসবাস। লেখক জানান,

'গির্জার ফাদারদের প্রভাবে-প্রলোভনে অনেকে খ্রিস্টান হয়েছে। বেশি খ্রিস্টান হয়েছে জেলেপাড়া থেকে।... পেশাও বদলেছে তারা।' (জলদাস ২০১৯(ক), পৃ. ১৪১)

জেলে সমাজের এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বাইরে রয়েছে বেশকিছু বাছ-বিচার ও কুসংস্কার। যেমন, জেলেরা নৌকা নিয়ে সমুদ্রে গোঁজ পুঁততে যাওয়ার আগে-প্রত্যেক নৌকায় বিচিত্র রং করে এবং কৌশলে দুটি চোখ আঁকায়। জেলেদের বিশ্বাস- এই চোখ দিয়ে নৌকা গভীর সমুদ্রে তাদের মালিকের জাল খুঁজে নেয়।

'চোখগুলোর পাশেই 'মা-গঙ্গা, মা-গঙ্গাদেবী পদেসু' ইত্যাদি কথাংশ লেখা। পাছার দিকে নানা ফুল-পাতা আঁকা। তারই ফাঁকে ফাঁকে নৌকার মালিকের নাম লেখা।... সবকিছু মিলে প্রত্যেকটি নৌকার আলাদা আলাদা বিশেষত্ব।'

(জলদাস ২০০৮, পৃ. ৪৮)

'দহনকাল' উপন্যাসে দেখা যায় ইচাখালি অঞ্চলের জেলেরা কেউ মাংস খায় না। যদিও বা কেউ পাঁঠার মাংস খায় কিন্তু মুরগির মাংস খাওয়াকে তারা পাপ মনে করে। কারণ-

'মুরগিকে এরা বলে রামপক্ষী। অবতার রামের অনুগত পক্ষী হিসেবে তারা মুরগিকে ভক্তি করে।'

(জলদাস ২০১০, পৃ. ২৮)

আবার শীতে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে কালিদইজ্যা অর্থাৎ গভীর সমুদ্রে জাল ফেলার সময় মাঝিরা দু'মাস আগে থেকে চুল দাড়ি কাটে না, কাটলে অমঙ্গল হয়। নৌকার মালিকের ক্ষতি বা তার আমাশয়-ডায়রিয়া ইত্যাদি রোগ হয়। আবার 'অর্ক' উপন্যাসে দেখা যায় দিবাকরকে পায়জামা পাঞ্জাবি পরে সুন্দর দেখালে, মা তার দিকে আড়চোখে তাকায়, সোজাসুজি তাকায় না। কারণ,

'শাশুড়ি বলেছে—আপন ছেলেমেয়েদের দেখতে সুন্দর লাগলে তাদের দিকে সোজাসুজি তাকাতে নেই। তাতে নজর লাগে। আপনজনের নজর বড়ো সাংঘাতিক। সন্তানের খুব ক্ষতি হয়ে যেতে পারে তখন।' (জলদাস ২০১৭, পৃ. ২৪)

জেলেজীবনের বিচিত্র বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কারের মধ্যে আরো যেসব আচার-সংস্কার লক্ষণীয় তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংস্কার হল- স্বামী সমুদ্রে নিখোঁজ হলে স্ত্রী বারো বছর সধবা জীবনযাপন করবে। বারো বছর অতিক্রান্ত হলে স্ত্রী সেই সধবা বেশ ত্যাগ করে বৈধব্যের বেশ ধারণ করবে। 'জলপুত্র' উপন্যাসে ভুবনেশ্বরীকে সংস্কার পালন করতে দেখা গিয়েছে। চন্দ্রমণি সমুদ্রে নিখোঁজ হলেও বার বছর সে তার অপেক্ষা করে সধবা বেশ ধারণ করেছিল। কিন্তু সময় ফুরোলে বাড়িতে ব্রাহ্মণ ডেকে বৈধব্যবরণের আচার তাকে পালন করতে দেখা গিয়েছে–

'বারো বছর পর সধবার সকল বেশ—শাঁখা, সিঁদুর, রঙিন শাড়ি সব ত্যাগ করে পাড়হীন ধুতি পরিধান করতে হবে। এটাই জেলেসমাজের অলিখিত অথচ স্বীকৃত প্রথা। আজ ভুবনের স্বামীহারা জীবনের বারো বছর পূর্তির দিন।

(জলদাস ২০০৮, পৃ. ৪৯)

ধুতি পরনে ভুবনের কপালে সিঁদুর নেই। পূজার স্থানে হাতের শাখা ভেঙেছে। পূজাতে বসার আগে নাপিত ডেকে মাথার দীঘল চুল কেটে ছোটো ছোটো করে বৈধব্যবরণ করেছে সে। এছাড়াও অন্যান্য সংস্কারের মধ্যে দেখা যায়, জেলে সমাজে কেউ কোনো শুভ কাজে বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় পরিবারের কাছে যাওয়ার অনুমতি চাইলে, পরিবারের মেয়ে বউরা দেবী দুর্গার স্মরণ করেছে। 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে সুধাংশু অহল্যার কাছে তার ছেলে সত্যব্রতর জন্য কন্যা সন্ধানে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলে অহল্যা তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে,

'যাইতে নাই। আইসো। দুগ্গা দুগ্গা!' (জলদাস ২০১৯, পৃ. ২১৫)

জেলেসমাজের নানা আচার সংস্কারের পাশাপাশি রয়েছে মানসিক প্রশান্তির জন্য জেলেদের লোকগান গাওয়ার অভ্যেস। আসলে জেলেরা গান পাগল সম্প্রদায়। প্রায় জেলেই কমবেশি গান করতে পারে। আসলে জেলেজীবনে নদী বা সমুদ্রভিত্তিক লোকগীতিগুলো একেকটি খণ্ডিত সুখ-দুঃখের গাঁথা। জল-জাল-নৌকা যেমন জেলেজীবনের মুখ্য উপাদান, তেমনই লোকগানও একটি অপরিহার্য উপাদান। চরিত্রের মানসলোক উদ্ঘাটনে বা কোনো জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করার লক্ষ্যে সাহিত্যিকেরা তাদের রচনায় লোকগানকে সংযুক্ত করে থাকেন। যেমন 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে মানিক তিনটি গান সংযুক্ত করেছেন। গণেশের গলায় দুটো ও হোসেন মিঞার কণ্ঠে একটি গান আমরা শুনেছি। হোসেন নৌকায় জেলে-মাঝিদের মতো গান ধরে,

'আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা থোও
বোনধু, কত ঘুমাইবা।
বাঁয়ে বিবি ডাইনে পোলা আকাল ফসল রোও
মিয়া, কত ঘুমাইবা।'... (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৬, পৃ.৩৮)

আবার 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে মালো জীবনকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে গানের ডালি নিয়ে হাজির হয়েছেন। পূর্ণাঙ্গ ও আংশিক নিয়ে মোট উনষাটটি গান রয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে।

হরিশংকরের কথাসাহিত্যেও এর অন্যথা হয়নি। বিশেষত 'জলপুত্র' ও 'দহনকাল' উপন্যাসে আমরা জেলেসমাজের গানের উল্লেখ পাই। তবে এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, মানিক ও অদ্বৈত-র উপন্যাসে ভাটিয়ালি, মুর্শিদী বা প্রেম-বিরহের গান শোনা গেলেও হরিশংকরের গল্প-উপন্যাসে বিশেষত রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-বিরহ-বিচ্ছেদ ও লালন সঙ্গীত শোনা গিয়েছে। কারণ ইতিপূর্বেই আমরা জেনেছি, জেলেরা বৈষ্ণব এবং পাড়ায় প্রায়শই কোনো না কোনো বাড়িতে কৃষ্ণনামের আসর বসে। সে যা হোক, 'জলপুত্র' উপন্যাসে পূর্ণাঙ্গ ও আংশিক গানের কলি মিলিয়ে মোট পাঁচটি গান রয়েছে। এর মধ্যে একটি বংশীর বাবা ভোলানাথের কণ্ঠে ভোরবেলায় কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম এবং বাকি চারটি দরিদ্র জেলে জয়ন্তর কণ্ঠে শোনা গিয়েছে। গঙ্গাপদকে যখন কুকুর কামড় দেয় তখন জয়ন্ত গঙ্গার গা থেকে কাদা পরিষ্কার করতে করতে গুনগুন করে গান করে,

'বড়ো দুঃখের কথা সুবল আজি,
প্রাণ খুলে কই তোমার কাছে।
ভাইরে, আমার মতো জনম দুঃখী,
এ সংসারে আর ক'জন আছে?' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৭০)

গানের কথাগুলির মধ্য দিয়ে গঙ্গার যন্ত্রণার সঙ্গে জয়ন্তর মানসিক বেদনাও একাকার হয়ে গিয়েছে। উপন্যাসে জানা যায় জয়ন্তর কোনো নৌকা-জাল নেই। প্রথম স্ত্রীকে সে খুব ভালোবাসত। সে মারা যাওয়ার পর পাখিবালাকে বিয়ে করেছে জয়ন্ত। প্রথম স্ত্রীয়ের জন্য মাঝে মাঝেই তার মনে গভীর উদাসীনভাব জাগে, কোনো কাজে তখন মন বসে না। তখন আপন মনেই বিচ্ছেদ গান শোনা যায় তার কণ্ঠে,

'অতি যত্নের শুয়া পাখি গেল আমায় ছাড়ি,
পাখির বিরহ জ্বালা সইতে না পারি।
এমন বান্ধব কেবা আছে পাখি দিবে ধরি।
যে ভাবেতে ডাকতাম পাখি, সেভাবে দিত সাড়া,
কেমন করে শিকল কেটে পাখি রে দিল উড়া।
তার জন্যেতে আত্মহারা ঘরেতে থাকতে নারি।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৭১)

গঙ্গাপদ জয়ন্তর এভাবে সবসময় বিরহ দুঃখের গান গাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে জানায়, তার বাবা জয়সিন্ধু ছিল এই গ্রামের নামকরা বহদ্দার। অনেক ছোটো থাকতে তার বাবা মারা যায় যক্ষ্মা রোগে। বছর খানেকের মধ্যে তার মা-ও মারা যায়। ছোটোবেলা থেকেই সকলের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মানুষ হওয়া জয়ন্ত একসময় বিয়ে করলে তার স্ত্রীও সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায়। সুতরাং জয়ন্তর নিজের বলে আর কেউ থাকল না। কথায় আছে, সংসারে যার কেউ নেই, তার ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরকে ভরসা করেই জয়ন্ত প্রিয়জনের বিরহে বিরহী চরিত্রে পরিণত হয়েছে। উঠানে একাকী বসে মাঝে মধ্যেই কোলে ঢোল নিয়ে উদাসীন জয়ন্তর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে,

'বিচ্ছেদের সাগরে আর কতকাল ভাসিব,
কোথা গেলে শ্যামের দেখা পাব।
কথা বুঝাতে দরদি নাই, কারে বা বুঝাব।
হতাশার জোয়ার ভাটায়, সদা আমি ভেসে বেড়াই,
কূল কিনারা বুঝি নাহি পাব।
কোথা যাই বা কোথা থাকি, কিসে আমি জীবন রাখি,
এইবার আমি নিশ্চয়ই মরিব।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৯৫)

আবার 'দহনকাল' উপন্যাসে রয়েছে মোট পাঁচটি গান। এর মধ্যে দু'টি লালন সঙ্গীত ও তিনটি রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-বিরহ-বিচ্ছেদের গান রয়েছে। হরবাঁশির কণ্ঠে লালন সঙ্গীত ও কৃষ্ণনামের গান শোনা গিয়েছে। হরবাঁশির মতোই কৃষ্ণমিলনেরও গানের গলা ভালো। তার কণ্ঠেও শোনা যায় একটি বিচ্ছেদের

গান। জানা যায় হরবাঁশি জলদাস জেলেপাড়ায় এমন একজন মানুষ যিনি একই সঙ্গে গান রচনা করতে ও গাইতে পারে। দরিদ্র হরবাঁশির কণ্ঠে শোনা যায়,

> 'কৃষ্ণনাম শুনিলে কানে প্রাণে মানে না,
> পরিণামে কী হইবে সখি আমায় বল না।
> কৃষ্ণ নামে করিল এমন, বল বল অগো সখি
> কী করি এখন। (জলদাস ২০১০, পৃ. ২৬)

অন্যদিকে সদ্য বিবাহিত কৃষ্ণমিলন দেনার দায়ে পড়ে বাধ্য হয়ে রামহরির নৌকায় গাউর খাটতে গিয়েছে। কাজের অবসরে নববধূর বিরহে সে মনকষ্টে গেয়ে ওঠে,

> 'রাধে, তোমার প্রেম-শিকলে আর তো আমি
> বান্ধা থাকবো না,
> রাধার নামে বাজাতাম বাঁশি আর তো আমি
> বাজাবো না।
> মথুরাতে হয়েছি রাজা, বামেতে আছে কুব্‌জা
> তাই কী জানো না,
> বাঁকাকে করেছি সোজা চেয়ে দেখো না।
> আমার মনে ছিল আশা, পাবো তোমার ভালোবাসা
> আশা পূর্ণ হল না।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৫৩)

কৃষ্ণমিলনের গান শুনে নৌকার অন্যান্য জেলেরা তাকে ঘিরে গোল হয়ে বসে। জানা যায় সবাই গাইতে না পারলেও সবাই কিছু না কিছু বাজাতে পারে। ফলে কেউ কাঁসা, কেউ মন্দিরা, কেউ একতারা বাজিয়ে বিশাল সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র কোণে অপূর্ব আবহ সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে কৈবর্তপাড়ার শিবশরণ বহদ্দারের বাড়ির এক অনুষ্ঠানে জেলেরা একত্রিত হয়। হরবাঁশি সকলের সঙ্গে খেতে বসলে হালিক কৈবর্ত শশধর জালিক কৈবর্তদের সঙ্গে খেতে রাজি হয় না। হরবাঁশিকে উদ্দেশ্য করে জাতিভেদজনিত ঘৃণা ও অপমান প্রদর্শিত হয়। হরবাঁশি সেই অপমান সহ্য করলেও মনকষ্টে জর্জরিত হতে থাকে এবং সেই অপমানের কথা মনে পড়লে, তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে চিরপরিচিত লালন গীতি,

> 'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে।
> লালন বলে জেতের কী রূপ দেখলাম না এ নজরে।। (জলদাস ২০১০, পৃ. ৬৬-৬৭)

হরবাঁশিকে গান করতে শুনে পাড়া থেকে একে একে জেলেরা তার উঠানে সমবেত হয়ে গান উপভোগ করে। গান শুনে ঠাকুরদাস হরবাঁশির যন্ত্রণার কথা জিজ্ঞেস করলে সে পূর্বের অপমানের কথা সকলের

সঙ্গে ভাগ করে কষ্ট লাঘব করে। আবার রামহরি তার দুর্ব্যবহারের জন্য অনুশোচনায় যখন হরবাঁশির কাছে ক্ষমা চায়, তখন হরবাঁশির কণ্ঠে শোনা যায়,

> 'তুমি বিনে ভাইরে সুবল এমন বান্ধব কে আছে,
> আমায় নিয়ে চলরে সুবল শ্রীরাধার কাছে।
> আমার দেহেতে প্রাণ আছে কেবল
> মন চলিয়া গিয়েছে।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৩১)

তাহলে দেখা গেল, অর্থাভাব, দারিদ্র্য, ক্ষুদ্রতা, পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, ষড়যন্ত্র চারিদিক থেকে তাদের ঘিরে রাখলেও একধরনের ভালোবাসার বন্ধনে জেলেসমাজ একসূত্রে বাঁধা। শতদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও গঙ্গাপূজা, মনসাপূজা, পুঁথিপাঠের আসর, চৈত্রসংক্রান্তি, পয়লা বৈশাখের মতো উৎসবগুলি আসলে আনন্দের ও মিলনেরই নামান্তর হয়ে উঠেছে।

৩.৩.১.২ পতিতাপল্লির আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কার-কুসংস্কার

বারাঙ্গনাপল্লিরও নিজস্ব সংস্কৃতি-আচার-বিচার-বিশ্বাস-অবিশ্বাস রয়েছে। 'কসবি' ও 'মোহনা' উপন্যাসে পতিতাদের বিভিন্ন ধর্মাচরণ-নিষ্ঠা-আচার-অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ ও উল্লেখ পাওয়া যায়। 'কসবি' উপন্যাসে বর্ণিত সাহেবপাড়ার পতিতাপল্লিতে মা মগধেশ্বরী কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত।

> 'বছরে একবার, কার্তিক মাসের চতুর্দশী তিথিতে মহাড়ম্বরে কালীপূজো হয় সাহেবপাড়া পতিতাপল্লিতে। পতিতারা বিশ্বাস করে—মা মগধেশ্বরী এই পতিতালয়কে ছায়া দিয়ে রেখেছেন।... পাপবোধ, ভবিষ্যৎ-নিরাপত্তাহীনতা আর অনন্ত যৌবন লাভের আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে ধর্মভীরু করে তুলেছে। সর্দার-মাসি-গুণ্ডা-মাস্তান-দোকানদার-দালাল—সবারই একই মনোভাব। মা কালী রুষ্ট হলে তাদের সমূহ ক্ষতি হবে, প্রতিপক্ষ প্রবল হবে, ব্যবসা লাটে উঠবে—এই বিশ্বাস সকলের।' (জলদাস ২০১১, পৃ. ৮৫)

শুধু কালীপূজোই নয়, শিবপূজাতেও সাহেবপাড়াতে এক মহোৎসব লেগে যায়। উপন্যাসে দেখা যায়, পতিতাপল্লিতে হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ সব ধর্মের একত্রে বসবাস। প্রতি রাতে চরম লাঞ্ছনার শিকার হতে হতে পতিতাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতা উবে যায়। জাতের সংঘাত তাদের মধ্যে নেই বললেই চলে। তাই সকলে তারা নির্দ্বিধায় কালীমন্দিরে যায়, শিবরাত্রি পালন করে, দুর্গাপূজায় অংশ নেয়। তাছাড়া যারা মুসলিম ও বৌদ্ধ তারা বোরখা পরে বলে মন্দিরে সবসময় যেতে পারে না ফলে তারা ঘরেই তারা তাদের ঈশ্বরকে স্মরণ করে। নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে পতিতাদের সকলকে পরম নিষ্ঠায় কার্তিক পূজা করতেও দেখা গিয়েছে। তারা কামনা করে প্রতি রাতে অন্তত কার্তিক ঠাকুরের মতো

একজন সুদর্শন পুরুষ খদ্দের যেন তাদের জোটে। 'মোহনা' উপন্যাসে পতিতাদের ঘরগুলির মধ্যে দেখা যায় এক বিশেষ বিশেষত্ব। প্রতিটি ঘরে একটি মাত্র দরজা এবং তা কারুকার্যময়। তা ছাড়া,

> 'দরজার দুদিকে দুটো কচি কলাগাছ। কলাগাছের গোড়ায় পূর্ণ ঘট, মাটির। এগুলো মাঙ্গলিক চিহ্ন। বারাঙ্গনারা বিশ্বাস করে, দরজার সামনে কলাগাছ আর জলভরা ঘট থাকলে তাদের যৌবন কোমলতা আর পূর্ণতায় ভরা থাকবে চিরকাল।'
> (জলদাস ২০১৩, পৃ. ১৫)

আলোচ্য উপন্যাস অনুযায়ী বারাঙ্গনাপল্লির সংস্কৃতিতে কোনো পতিতার দেহব্যবসায় প্রথম হাতেখড়ির দিন ভোরসকালে নাপিতিনী এসে তার নখ কেটে দিয়ে যায়, তারপর আসে চুল বিন্যাসকারিণী, সে ভালো করে সুবাসিত তেল চুলে ও শরীরে মর্দন করে তাকে নদীতে নিয়ে যায়। সেখানে অন্যান্য বারাঙ্গনারা সেই অক্ষতযোনির মেয়েটিকে ভালো করে স্নান করিয়ে ঘরে নিয়ে আসে এবং নতুন জামাকাপড় পরিয়ে কাজল, সুগন্ধি দ্রব্য, আলতা দিয়ে চিত্তাকর্ষকভাবে সাজিয়ে তোলে। তারপর তার মাথায় ধান-দূর্বা দিয়ে উলুধ্বনি দেওয়া হয়। তারপর রাতে বামুন ঠাকুরের সহায়তায় সিদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে লোহার বঁটির সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। বামুন ঠাকুর সেই পতিতার কপালে সিঁদুর ও গাঁদা ফুলের মালা দিয়ে বঁটির সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন করান।

> 'এই পাড়ার অক্ষতযোনিদের গাছ বা লোহার সাথে বিয়া দেওয়া নিয়ম।' (জলদাস ২০১৩, পৃ. ২৫)

জেলেপল্লি হোক বা বারাঙ্গনাপল্লি কিংবা হরিজনপল্লি—সংস্কৃতির অংশ হিসেবে পুরাণ-আদি পাঠের আসর সর্বত্র লক্ষ করা গিয়েছে, যা নিম্নবর্গীয় সমাজে একধরনের সংস্কৃতিমনা পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

৩.৩.১.৩ মেথর সমাজের আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কার-কুসংস্কার

'রামগোলাম' উপন্যাসে দেখা যায়, মেথররা রামনামি হিন্দু। ঈশ্বর দেবতায় বিশ্বাসী মেথররা গোরুকে মাতা হিসেবে মান্য করে। পুজো হিসেবে মেথরপট্টিতে কালীপূজা ও দুর্গা পূজা উভয়ের প্রসঙ্গ এসেছে। জানা যায় ব্যান্ডেল মেথরপট্টিতে জমজমাট কালীপূজা হয়। উপন্যাসে আশ্বিন মাসের শেষে দুর্গাপূজা ও ঈদ পাশাপাশি হওয়ায় চারিদিকে খুশির আমেজ লক্ষণীয়।

> 'আশ্বিনের শেষাশেষি। দুর্গাপুজোর আমেজ লেগেছে চারিদিকে। এ বছর পুজো আর ঈদ গায়ে গায়ে লাগানো। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মনে আনন্দের ছোঁয়া।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৩৫)

কালী ও দুর্গা পূজার পাশাপাশি শ্রাবণ মাসের শেষ দিনে মনসা পূজার প্রসঙ্গও এসেছে উপন্যাসে। আবার মেথরদের মৃত্যু হলে অশৌচ পালনে দেখা যায়,

'পরিবারের কেউ মারা গেলে সে বেলা ভাত রাঁধার নিয়ম নেই হরিজন-সমাজে। চুলায় আগুন দিতে নেই। ঘরে যদি রান্না করা কোনো ভাত-তরকারি থাকে, তা-ও ফেলে দিতে হয়।... বড়োরা উপোস দেয় সে বেলা, ছোটোদের এঘরে-ওঘরে নিয়ে যায় হরিজন-নারীরা। ছোটোদের খাওয়ার নিষেধ নেই।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ১১৪)

এছাড়াও প্রতিবছর মেথরপট্টিতে অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তনের মহোৎসব হয়। এই মহোৎসবকে ঘিরে ধর্ম সভারও আয়োজন করা হয় মেথরপট্টিতে।

এছাড়াও 'কুন্তীর বস্ত্রহরণ' উপন্যাসে কুমোরপাড়াটি সর্বদা ধর্মকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। পুরাণাদি পাঠের মধ্যে এরা শান্তি লাভ করে। লেখক জানিয়েছেন, কুমোরদের নাম পুরাণঘেঁষা। রামায়ণ, মহাভারত অনুযায়ী এদের নাম নির্ধারিত হয়। কুন্তী ও ভীষ্মের চার সন্তানের নাম যথাক্রমে, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল, সহদেব। কুন্তী অজয় জেঠার মহাভারত-আসরের নিয়মিত শ্রোতা।

'আজ আসরে পড়া হবে 'সভাপর্ব্ব'। 'সভাপর্ব্বে'র পাশা খেলার অংশটি।' (জলদাস ২০২০, পৃ. ৮৮)

৩.৩.২ নিম্নবর্গীয় সমাজের পোশাক-পরিচ্ছদ

নিম্নবর্গীয় সমাজের আনন্দ-উৎসব বা আচার-সংস্কার–অনুষ্ঠানই নয়, তাদের ভাষা-পোশাক-পরিচ্ছদ-খাদ্য প্রভৃতি বিষয়গুলিও একটি সমাজের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে নির্ধারণ করে। আসলে পোশাক-পরিচ্ছদ নির্ভর করে মূলত দেশের সংস্কৃতির ওপর। আবার অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গেও এর যোগ আছে। অন্যদিকে ধর্মের সঙ্গে পোশাকের যোগসূত্র থাকার ফলে অনেক ধর্মভীরু মানুষরা বিশেষ ধরনের পোশাক পরে থাকে। বর্তমানকালেও হিন্দুদের মধ্যে কপালে চন্দনের ফোঁটা, গলায় তুলসীর মালা ধারণ করতে দেখা যায়, মুসলমানরা মাথায় টুপি পরে। বাঙালি সংস্কৃতি অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে নারী-পুরুষের যে পোশাকের কথা জানা যায় তা হল- ধুতি অথবা শাড়ি। সংস্কৃতিবিদ গোলাম মুরশিদের 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি' গ্রন্থ থেকে জানা যায়,

'নারী এবং পুরুষ—উভয়ই পরতেন একটি মাত্র বস্ত্র—শাড়ি অথবা ধুতি। শাড়ি এবং ধুতির মধ্যে পার্থক্য ছিলো এই যে, ধুতির চেয়ে শাড়ি দৈর্ঘ্যে ও ঝুলে বড়ো হতো। সমাজের একেবারে ওপর তলার পুরুষরা হাঁটুর নিচে খানিকটা নামে এমন ঝুলের ধুতি পরতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষরা ধুতি পরতেন অত্যন্ত খাটো মাপের। সে ধুতি সাধারণত হাঁটুর ওপরই সীমাবদ্ধ থাকতো।' (মুরশিদ ২০০৬, পৃ. ৪৬১)

জেলেসমাজের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে উপরিউক্ত বক্তব্যের প্রতিফলন। স্বাভাবিকভাবে একজন জেলেকে দেখা গিয়েছে–পরনে ধুতি, গায়ে একটি হাফহাতা গেঞ্জি এবং কাঁধে একটি গামছা ঝোলান।

যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধুতিটি ময়লা, বিবর্ণ, গায়ের গেঞ্জি শতছিন্ন। জেলেদের পোশাক সম্পর্কে 'জলপুত্র' উপন্যাসে জানা যায়-

'দৈনন্দিন জীবনে জলদাসরা হাঁটু অবধি ঝুলানো ধুতি পরে।... বেশির ভাগ সময় তাদের শরীরের ঊর্ধ্বাংশ উদলা থাকে। কাঁধে সর্বদা ঝুলানো থাকে আধময়লা একখানা গামছা। শীতে বা বর্ষায় অথবা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে তারা গায় দেয় ফতুয়া বা হাফ-হাতা গেঞ্জি। কেউ কেউ শার্টও পরে। কিন্তু জাল বাইতে যাওয়ার সময় তারা পরনের ধুতিটা পাগড়ির মতো করে মাথায় জড়িয়ে নেয়।... আর পরিধান করে কোনোরকমে আব্রু ঢাকা ছোট্ট একটি নেংটি, গায়ে দেয় ওমওয়ালা ছেঁড়া কোনো জামা।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১২৫)

আবার বিধবা জেলে নারীদের পোশাক সম্পর্কে আলোচ্য উপন্যাসে দেখি,

'ফুলমালার মা ও মালতির মা বিধবা। তাদের পরনে ধুতি। ময়লা লেগে লেগে সেই সাদা কাপড় একটা বিদ্‌ঘুটে রঙ ধারণ করেছে। তাদের অধিকাংশের গায়ে কোনো চুলি নেই। বয়স্ক জেলেনিরা চুলি পরে না। শীতের সময় পরিধেয় কাপড়কে দু'ভাঁজ করে গায়ে জড়ায়।' (জলদাস ২০০৮, পৃ.২০)

'দহনকাল' উপন্যাসে রাধানাথকে দেখি,

'গায়ে হাফ-হাতা ফুটোফাটা গেঞ্জি, পরনে হেঁটোধুতি। ধুতিটা ময়লা, বিবর্ণ; ডান কাঁধে আধ-পুরনো একটা গামছা। খালি পা, সেখানে লেপটে আছে কাদা।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৭)

আবার হরিদাসের পরিচ্ছদ বর্ণনায় দেখি-

'পরনে হাফপ্যান্ট—জীর্ণ, রঙচটা। গায়ের জামাটি বহুদিনের পুরনো, কিন্তু বেশ পরিষ্কার।... খালি পা, সেখানে ধুলোর মাখামাখি।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৮)

সমাজের অর্থশালী বহদ্দারের পোশাকেও কোনো পার্থক্য নেই। 'চরণদাসী' গল্পে চরণদাসীর বাবা মঙ্গলচরণ বড়ো বহদ্দার। তার পোশাকের বর্ণনা এরকম-

'হাঁটুনামা ধুতি পরে, হাফহাতা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বাম কাঁধে ভাঁজ করা গামছা ফেলে ধীরেসুস্থে এগিয়ে যায় সে...' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৬৭)

'সুবল জেঠা' গল্পে সুবল জেঠাকে দেখা যায়, ধুসর মলিন একটি ফতুয়া ও কাদা মাখানো হাঁটুনামা ধুতি পরতে। আমরা লক্ষ করলাম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জেলেরা পায়ে চটি বা জুতো পরিধান করে না। এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় লেখকের 'কোটনা' নামক গল্পে মুচি রামদুলালের কাজ প্রসঙ্গে,

'জেলেপাড়ায় বাবা কোনো কাজ পেত না। কারণ জেলেরা জুতাই পরত না।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ১১)

'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে দেখা যায় যদুনাথ জলদাসের পোশাকের বিবর্ণ,

'গায়ে তার আধময়লা ফতুয়া, কাঁধে গামছা। হাঁটুনামা একটা লুঙ্গি পরেছে যদুনাথ।' (জলদাস ২০১৯, পৃ. ১০০)

শুধু সাধারণ হিন্দু জেলে নয়, মুসলমানদের পোশাকের উল্লেখও রয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। যেমন মনির আহমেদ ও নাজমুল আলমের পোশাক বর্ণনা যথাক্রমে এরকম,

'পরনে রোহিতপুরি লুঙ্গি। গায়ে ধবধবে পাঞ্জাবি। পায়ে দামি স্যান্ডেল। মাথায় জিন্নাটুপি।' (জলদাস ২০১৯, পৃ. ৯৭)

আবার নাজমুল আলমের পোশাকের বর্ণনায় দেখা যায় তিনি,

'পায়জামা পরে। পায়জামার ওপর হাঁটুঢাকা পাঞ্জাবি। সর্বদা মাথায় টুপি।' (জলদাস ২০১৯, পৃ. ৩৪১)

অন্যদিকে 'রামগোলাম' উপন্যাসে মেথর সমাজে নারীদের পোশাক পরিচ্ছদের ভিন্নরূপ দেখা গিয়েছে। হরিজনপল্লির নারীরা-

'...সেজেগুজে থাকতে বেশ পছন্দ করে। খুব দামি কাপড়চোপড় কেনার সামর্থ্য তাদের নেই। তিব্বত স্নো, সস্তা দামের লিপস্টিক, নেলপলিশ—এগুলো মেখেমুখে নিজেদের সাজিয়ে তোলে এরা। সামান্য সাজপোশাকে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তারা।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ১২০)

উনিশ শতকের শেষ দিকে বাঙালি সংস্কৃতিতে ইংরেজদের কিছু পোশাকের অনুকৃতি ঘটেছিল। তবে বৃহত্তর বাঙালি সমাজে ধুতি-পাঞ্জাবির মতো সনাতনী পোশাকই বহাল ছিল। নতুন যা দেখা যায়, তা হল, ঘড়ি ও চেইন। 'রামগোলাম' উপন্যাসে হারাধন জমাদার, যে একজন মেথরের থেকে সমাজে উচ্চস্থানে বিরাজ করে, তাঁর পোশাকে দেখা যায় উপরিউক্ত ঔপনিবেশিক প্রভাব।

'ধুতির ওপর তিন পকেটের ফতুয়া। সাদা ফতুয়ার দুই পাশে দুটো জেব। বুকের বাঁ পাশে একটা। ওই বুকপকেটে বাহারি ঘড়ি। বুকপকেটের তলায় ঘড়িপকেট। চিকন চেইনে ঘড়িটি বাঁধা।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ৮৯)

'কসবি' উপন্যাসে বারাঙ্গনাপল্লির পতিতাদের পোশাকে দেখা যায়, তারা নিজের দেহবল্লরীকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যাতে পুরুষের চোখ লালায়িত হয়। দেহকে আকর্ষিত করে তারা বিভিন্ন প্রসাধনী দ্রব্য দিয়ে। 'কসবি' উপন্যাসে লেখক এর বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন,

'মেয়েরা সেলোয়ার-কামিজ পরে, কপালে উজ্জ্বল টিপ লাগিয়ে, ওড়নাকে পিঠের দিকে ঝুলিয়ে স্তন দুটোকে আকর্ষণীয় করে ঘরের কাছে পথ জুড়ে প্রতীক্ষা করতে থাকে।' (জলদাস ২০১১, পৃ.৭৮)

আমরা জানি বারাঙ্গনাপল্লি অন্ধকারের জগৎ। রাতের আধারে এর চমক বাড়ে। যৌনতৃপ্তি বা কামবাসনাকে পূর্ণতা দিতে সকলের জন্য বারাঙ্গনাপল্লির অবারিত দ্বার। সমাজের ভদ্র-অভদ্র নির্বিশেষে সকলের আনাগোনা এখানে। লেখক পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি স্পষ্ট করতে চেয়েছেন-

'কেউ শার্ট প্যান্ট পরে, কেউ মিহি কাপড়ের চুড়িদার পাঞ্জাবি পরে, আবার কেউ লুঙ্গিশার্ট বা পাঞ্জাবি পরে সাহেবপাড়ায় ঢোকে।' (জলদাস ২০১১, পৃ.৭৮)

তাহলে দেখা গেল, ধর্ম ও পেশার সঙ্গে পোশাকের একটি অনুষঙ্গ রয়েছে। সমাজভেদে পোশাক-পরিচ্ছদে বৈচিত্র্য লক্ষ করা গেলেও বিস্তীর্ণ গ্রামীণ এলাকায় পোশাক ব্যবহারে বাঙালি সংস্কৃতি আজও অবশিষ্ট

রয়েছে। কিন্তু দরিদ্র ও ধনীর পোশাক এক নয়, আবার হিন্দু ও মুসলমানের পোশাকও ভিন্ন, এমনকি পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের পোশাকও পার্থক্য রয়েছে।

> ‘এখনো গ্রামের কোটি কোটি পুরুষ গরমের সময়ে একটি মাত্র লুঙ্গি অথবা ধুতি পরেন, সেই সঙ্গে একটি গেঞ্জি। বাইরে যেতে হলে একটা পাঞ্জাবি, ফতুয়া অথবা জামা পরেন।... পুরুষের ন্যূনতম পোশাকে আগেকার সঙ্গে তেমন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু মেয়েদের ন্যূনতম পোশাকের ক্ষেত্রে আগের যুগের সঙ্গে একটা পার্থক্য তৈরি হয়েছে, সে হলো: তাঁরা শাড়ির সঙ্গে একটা পেটিকোট এবং ব্লাউজ পরতে চেষ্টা করেন।... মোট কথা, বাঙালির পোশাকে যুগে যুগে অনেক বিবর্তন ঘটেছে, এক সম্প্রদায়ের পোশাক দিয়ে অন্য সম্প্রদায় প্রভাবিত হয়েছে; এক অঞ্চলের পোশাক অন্য অঞ্চলের ওপর ছায়া ফেলেছে। বিশ্বায়নের মুখে সে পোশাক বিশ্বমুখী হয়েছে। তবু বাঙালিকে তার চেহারা এবং পোশাক দিয়ে হয়তো এখনো শনাক্ত করা যায়।’ (মুরশিদ ২০০৬, পৃ. ৪৮২)

৩.৩.৩ নিম্নবর্গীয় সমাজের খাদ্যাভ্যাস

নিম্নবর্গীয় সমাজে খাদ্যাভ্যাসের যে ধরন লক্ষ করা গিয়েছে তার বিবরণ আমরা নিম্নে আলোচনা করার চেষ্টা করব। ইতিপূর্বের আলোচনায় নিম্নবর্গীয় সমাজের যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ধরা পড়েছে তাতে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, তা আসলে বাঙালি সংস্কৃতি। ফলে তাদের আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রাচীনপন্থী হলেও তা বাঙালি সংস্কৃতিরই অন্তর্গত। সে হিসাবে তাদের খাদ্যাভ্যাসে তেমন কোনো অভিনবত্ব নেই। বিশেষ করে জেলেসমাজকেন্দ্রিক গল্প-উপন্যাসগুলিতে জেলেসমাজের প্রায় প্রত্যেক পরিবারে সকালবেলার খাবারে গতরাতের বাসি তরকারি দিয়ে এক থালা পান্তাভাত খেতে দেখা গিয়েছে-

> ‘ক্ষীরমোহন পান্তাভাত খেয়েই স্কুলে আসে। পান্তাভাতের সঙ্গে কখনো থাকে বাসি তরকারি, কখনো পোড়া মরিচ।’ (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ১৭)

‘জলপুত্র’ উপন্যাসে জেলেদের খাদ্যাভ্যাসে যে অর্থনৈতিক প্রভাব পড়েছে তা সহজেই অনুমেয়। অতিরিক্ত অভাবে জেলেরা,

> ‘...ডাল আর পুকুরপাড় থেকে সংগ্রহ করা শাক দিয়ে দুবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে।’ (জলদাস ২০০৮, পৃ. ২২)

আবার ‘কসবি’ উপন্যাসে শৈলেশ জেলে বাড়িতে কিছুদিন অনুপস্থিত থাকায় সংসারে অভাব দেখা যায়। এই অবস্থায় যশোদা কোনোরকমে মেয়েদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। শৈলেশ ফিরে এলে তাই তার মেয়ে সোমা বলে,

> ‘বাবা, কই গেইছিলা তুমি, এত দিন? আমাগোর কী কষ্ট অইছে! শুধু আলুর ভর্তা আর ডাইল আর শাক দিয়া ভাত খাইছি।’ (জলদাস ২০১১ পৃ. ৪৯)

অসুস্থতায় জেলেরা সাগু সিদ্ধ করে খায়। তবে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যে জেলেরা মীনশস্য আরোহণ করে তারাই খাওয়ার পাতে মাছ থেকে বঞ্চিত। জেলেদের অভাব-অনটনের সংসারে তাই মাছ-ভাত উচ্চমানের ভোজ্য। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি জেলেরা কুসংস্কারবশত মাংস খায় না, ফলে ভাতের পাতে মাছ দেখে জেলেরা প্রফুল্লিত হয়। তাই, বংশীর মা মাছ বিক্রি করতে বেরিয়ে ইলিশ মাছটি বিক্রি করতে চাইলে তার ছেলে বংশী মাছটি বেচতে মানা করেছে,

'মা, আজিয়া ইলিশমাছ ইবা নো বেইচ্যো। ইবা আঁরা খাইয়ম। বউত দিন ইলিশমাছ নো খাই।'

(জলদাস ২০০৮, পৃ. ৫৮)

আবার 'দহনকাল'-এ হরিদাস খাওয়ার পাতে দু-তিন রকম মাছ দেখে উৎফুল্লিত হয়ে ওঠে-

'কড়কড়ে হয়ে যাওয়া ভাতের পাশে একটি ভাজা তপসে মাছ বা দু'চারটে ফাঁইস্যা মাছ। বাটিতে ঝোল-ঝালের ইলিশ মাছ। ভাতের পাশে একদলা শাক। এসব দেখে হরিদাসের মরে-যাওয়া খিদেটা চাগিয়ে ওঠে। গোগ্রাসে এইসব খাবার গিলতে থাকে সে' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৩২)

'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে হরিবন্ধু সকালে পান্তাভাত খেয়ে কুলির কাজ করতে গিয়েছে। তাছাড়া শিবশঙ্করের স্ত্রী সুলেখা পরিবারের জন্য রান্না করেছে,

'ছুরি শুঁটকি দিয়ে ডিম, হিলঞ্চি শাক, কাঁঠাল বিচির ভর্তা, ইচা শুঁটকি দিয়ে মুগডাল—এসব এবেলার তরকারি।'

(জলদাস ২০১৯ পৃ. ২০২)

দেখা যায় জেলেদের যেমন সকালে পান্তাভাত খেতে দেখা গিয়েছে, তেমনই অন্যদিকে মেথর সামাজে সেঁকা রুটি-সবজি খাওয়ার প্রচলন দেখা যায়-

'খুব ভোরে চাঁপারানী বিছানা ছাড়ে। আলু ভাজে বা একটা সবজি রাঁধে। তারপর রুটি তৈরিতে বসে। মোটা সেঁকা রুটি। ...রুটি-সবজি খেয়ে করপোরেশনের উদ্দেশে রওনা দেয়।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ৫৬-৫৭)

মেথর সমাজে শূকরের মাংস ভক্ষণ প্রচলিত।

'যদি বলো আমি এখনই শূকরের মাংস খেতে চাই, যেকোনো দামে জোগাড় করব।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ৫৬)

এ প্রসঙ্গে বলা ভালো, মেথররা সমাজের আবর্জনা পরিষ্কার করে বলে,

'ঘৃণাবোধ থেকে বাঁচার জন্য, বিবমিষা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাই তারা টাঙ্গি সাফাইয়ের কাজে হাত দেওয়ার আগে মদ খায়, বাংলা মদ।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ৭২)

অন্যদিকে পতিতাদের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে তেমন উল্লেখযোগ্য বর্ণনা পাওয়া না গেলেও কসবি উপন্যাসে জানা যায়,

'..তোলাপানি দিয়ে দাঁত মেজে হাত মুখ দিয়ে মুগ ডাল বা মুরগির সুপ দিয়ে পরোটা-লুচি খায়, ভাঙা কাপে চা খায়।'

(জলদাস ২০১১ পৃ. ৭৩)

এ প্রসঙ্গে বলতে হয় পোশাক এবং অন্যান্য জিনিসের মতো বাঙালির খাবারের ওপর নানা সময়ে নানা প্রভাব পড়েছে। তা সত্ত্বেও হরিশংকরের কথাসাহিত্যে দেখা গেল ডাল, ভাত, মাছ, তরকারি, আলুর ভর্তা, রুটি, বিভিন্ন প্রকারের শাক-সবজি, মাংস, আচার—যা এখনও বাঙালি সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

৩.৩.৪ নিম্নবর্গীয় সমাজে ভাষাপ্রয়োগ

যে কোনো সমাজের সংস্কৃতিতে ভাষা ও রুচিশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ মার্জিত, শিষ্ট, উন্নত ভাষা ব্যবহার ও আচরণ একটি সমাজের শিক্ষিত, রুচিশীল ও সংস্কারপূর্ণ মানসিক ভিত্তিকে উপস্থাপন করে। সেদিক থেকে বিচার করলে হরিশংকর জলদাসের গল্প-উপন্যাসে বর্ণিত তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সমাজের ভাষায় ধরা পড়েছে আঞ্চলিকতা। অধিকাংশ নিম্নবর্গীয় মানুষ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার দরুন মার্জিত ও শিষ্ট ভাষা প্রয়োগে ব্যর্থ। ফলে নিম্নবর্গীয় সমাজের মানসিকতা সংস্কারপুষ্ট হতে পারেনি। লক্ষণীয় নিম্নবর্গীয় সমাজে কেউ যদি প্রথাগত শিক্ষা অর্জনের চেষ্টা করে বা শিষ্ট মার্জিত ভাষা ব্যবহার করে, তবে তাকে সহজভাবে নেয়নি অন্যান্যরা। 'দহনকাল' উপন্যাসে দেখা যায় হরিদাস যখন মার্জিত ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে তখন তার সহপাঠী সুধীর তাকে ব্যঙ্গ করেছে,

> 'ও মা মা মা! জাইল্যার পোলার মুখত্ সিদ্ধ ভাষা! কী বলে রে বেটা।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৪১)

'জাইল্যার পোলার মুখত সিদ্ধ ভাষা!' কথাটির মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গীয় ভাষা-সংস্কৃতির অমার্জিত ও অনুন্নত হওয়ার দিকটি পরিস্ফুট হয়েছে। নিম্নবর্গীয় সমাজের ভিত্তি এমনভাবে গঠিত যে, মার্জিত রুচিশীল ভাষা প্রয়োগ সেই সমাজ সহজে মেনে নিতে পারে না। এর মূল কারণ অশিক্ষা বা বলা ভালো ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন নিম্নবর্গের শিক্ষার প্রতি রুচিহীনতা বা অনাস্থা। আখ্যানগুলিতে আমরা লক্ষ করলাম, নিম্নবর্গীয় সমাজে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে কুরুচিপূর্ণ তথাকথিত অশ্লীল ভাষার বহুল প্রয়োগ, যা ভাষাকে করেছে মলিন ও অমার্জিত। আসলে মনের নানা রাগ ও ক্ষোভ প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে 'অশ্লীল' শব্দপুঞ্জের ব্যবহার করা হয়, যা এককথায় গালি হিসেবে পরিচিত। তথাকথিত ভদ্র-শিক্ষিতজনেরা ক্ষোভ প্রকাশ করে পরিশীলিত গালির মাধ্যমে এবং অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত মানুষেরা ব্যবহার করে অশ্রাব্য গালি। হরিশংকরের গল্প উপন্যাসে বর্ণিত নিম্নবর্গীয় সমাজে অশিক্ষার অন্ধকার। প্রান্তিক এই জনগোষ্ঠীর মানুষেরা তাই স্বভাবতই তাদের দুঃখ, ক্ষোভ প্রকাশ করেছে অশ্রাব্য, রুচিহীন শব্দ প্রয়োগ করে। অশ্রাব্য গালির ব্যবহার নিম্নবর্গীয় জীবনের মানসচিত্রকে স্পষ্ট করেছে। 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে যদুনাথ জলদাসের মুখে তাই শোনা যায়,

'গালি তো আমাগোর মুখের বুলি। আমাগোর তো রাগ দেখানোর আর কোনো পথ নাই। তাই গালি দিয়া দুঃখ মিটাই।'

(জলদাস ২০১৯, পৃ. ৯৮)

ক্ষোভ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে এ ধরনের গালি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বিভিন্ন উপন্যাস-গল্প থেকে দেওয়া যেতে পারে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা নিম্নে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করছি।

জেলেসমাজকেন্দ্রিক গল্প-উপন্যাসে আঞ্চলিক অমার্জিত ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে নারী-পুরুষ উভয়ের কণ্ঠেই। 'ঢেন্ডেরি' গল্পে রাইগোপাল ও লক্ষ্মীবালার দাম্পত্য কলহে যে ভাষা ব্যবহার দেখা গিয়েছে তা এরকম-

'কী কইলি তুই অডি চোদানি? তুই খানকি ছাড়া আর কি?' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৪৫)

প্রতি-উত্তরে স্ত্রীর কণ্ঠে শোনা যায়,

'আঁই জামাই ছাড়া অন্য বেডার হঙ্গে নো ফুতি। হেতল্লাই আঁই খানকি নো। খানকি আঁই নো, খানকি তুঁই। তুঁই ঘরত্ বউ রাখি অন্য বেডির লগে ফুত।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৪৫)

অন্যদিকে 'দুলারি এবং কয়েকজন' গল্পে শ্যামল ও দুলারির দাম্পত্য কলহে যে ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে তা এককথায় প্রাকৃতজনের ভাষা। শ্যামলের কণ্ঠে শোনা যায়,

'চুপ থাক মাগি। গার্মেন্টসে চাকরি করস। অন্য বেডার সঙ্গে ফুতস। আমার কাছে আইসা পবিত্র মারাস। বুঝি না আমি! তুই খানকি আমার বংশের গাঁয়ে মুতে দিতে চাস?' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৯৪)

অন্যদিকে দুলারিও গর্জে ওঠে,

'শুয়োরের বাইচ্চা শ্যামইল্যা! আমার খাইয়া, আমার লগে ফুইত্যা, গাঁয়ে বাতাইস লাগাইয়া কাটাইছস এতদিন। এখন আমার ঘর থেইক্যা বাইর অইয়া যা খানকির পোলা।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৯৪)

'দহনকাল' উপন্যাসে খু-বুইজ্যা এমন একজন চরিত্র, যার মুখে সর্বদা গালাগাল লেগেই থাকে। কাউকেই সে ছেড়ে কথা বলে না, কারণে-অকারণে ছোটো-বড়ো সকলকেই সে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় আক্রমণ করে। অন্যদিকে বারাঙ্গনাপল্লি যে উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে সেখানে তথাকথিত অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ কোনো অবাক করা ঘটনা নয়, বরং তা সেই পরিবেশের সঙ্গে মানানসই। তিন'শ বছর পুরনো সাহেবপাড়ার এই পতিতাপল্লিতে তথাকথিত অমার্জিত-অশ্লীল ভাষা সকলের মুখের বুলি। পতিতা, মাসি, সর্দার, দালাল সকলের মুখে গালি। বিশেষ করে রাতে ব্যবসার সময় কাস্টমার ও পতিতাদের মধ্যে এই ধরনের ভাষা শোনা যায়,

'অই খানকির পোলা মাগিখোর। তুই যেইটার লোভে যাইতাছিস সেইটা আমার কাছেও আছে তো। তোর চনুতে সিফিলিস অইবো চোদমারানির পোলা।' (জলদাস ২০১১, পৃ. ৪২)

আবার কালু সর্দার পতিতাদের প্রতিবাদের জবাবে বনানীর গালে চড় বসিয়ে বলেছে,

‘চোদমারানি বেহেনচোদ, দশ টেইক্যা সস্তা খানকি, তুঁই চাইতাছস ছুটি—সাপ্তাহিক ছুটি? মাগি, বড়ো অফিসের অফিসার হইছস, ভদার বিশ্রামের লাইগ্যা ছুটি চাস?’ (জলদাস ২০১১, পৃ. ১৫২)

কিন্তু শিক্ষিত কৈলাস এই অমার্জিত ভাষা প্রয়োগ থেকে বিরত থেকেছে। কারণ তার মধ্যে রুচিশীলতা আছে। তাইতো সর্দার যখন তাকে অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করে তখন সে শান্ত কণ্ঠে বলে,

‘গালি দিচ্ছেন কেন? গালি দিবেন না’ (জলদাস ২০১১, পৃ. ১২৪)

হরিজনপল্লিতেও এধরনের অশ্লীল ভাষার প্রয়োগ লক্ষ করা গিয়েছে। রামগোলাম উপন্যাসে যোগেশের বিশ্বাসঘাতকতা ধরা পড়ে যাওয়ার পর কার্তিক তাকে আক্রমণ করেছে অমার্জিত ভাষায়,

‘মা-চোদ, খানকি কা লেড়কা, কুত্তা কা বাচ্চা যোগেইশ্যা! বেইমান শালা।’ (জলদাস ২০১২, পৃ. ৯৬)

আবার রূপালী ও দোকানদার রশিদের মধ্যে বচসায় রূপালীর কণ্ঠে শোনা যায়,

‘ওই খানকির পোলা সওদাগর, আমার লগে বাজে কথা কস?’ (জলদাস ২০১২, পৃ. ১২২)

অন্যদিকে রশিদ বলে ওঠে,

‘কি কইলি, খানকি? চোদমারানি, চিনস আমারে? তোর মতো মেথরানিরে বিনা পয়সায়ও চুদি না আমি।’ (জলদাস ২০১২, পৃ. ১২২)

নিম্নবর্গের এই রুচিহীন ভাষা প্রয়োগের মধ্যেও শিক্ষিত রামগোলামের রুচিশীলতার পরিচয় আমরা পেয়েছি, যখন কর্পোরেশনের কর্ণধার বড়োবাবু আব্দুস ছালাম অমার্জিত-অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে তখন রামগোলাম প্রতিবাদের স্বরে বলে,

‘স্যার, গালি দেয় মেথর-জেলেরা। লোকে বলে, মেথরের মতো গালি দিচ্ছ কেন, জাইল্যার মতো মুখ খারাপ করছ কেন? আপনি তো ভদ্রলোক, শিক্ষিত মানুষ। এত বড়ো করপোরেশনের প্রচণ্ড ক্ষমতাবান অফিসার আপনি। আপনার মুখে কি আমাদের মতো গালাগাল সাজে?’ (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৮৫)

আবার ‘প্রস্থানের আগে’ উপন্যাসে মনির আহমদ শিক্ষিত বলে তার গালি দিতে রুচিতে বেধেছে। তাই যদুনাথের মুখে অশ্রাব্য গালি দিতে শুনে তার গালি দেওয়াকে কাজে লাগাতে চায় রইসুদ্দিনের গালির জবাবে। অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে যদুনাথকে গালি দেওয়ার জন্য ভাড়া করে মনির। কারণ হিসাবে সে জানায়,

‘লেখাপড়া শিখেছি আমি। গালি দিতে জানি না। তা ছাড়া খানদানি পরিবার আমাদের। গালি দেওয়া আমার সাজে না।’ (জলদাস ২০১৯, পৃ. ৯৯)

আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়, শিক্ষার প্রভাবে ভাষা প্রয়োগে রুচিশীলতা ও রুচিহীনতার পার্থক্য। সুতরাং আমাদের কাছে একথা স্পষ্ট যে, ভাষা প্রয়োগে রুচিশীলতা ও রুচিহীনতার পার্থক্যে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নিম্নবর্গের সমাজ-সংস্কৃতি-পরিবেশের গঠন অনুযায়ী ভাষা প্রয়োগে

পার্থক্য দেখা গিয়েছে। নিম্নবর্গের মধ্যে যারা স্রোতের বিপরীতে গিয়ে শিক্ষা অর্জন করেছে, তাদের মধ্য দিয়ে এই অমার্জিত-অশ্লীল ভাষা প্রয়োগের পার্থক্য লক্ষণীয়। ফলে এই ভাষা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নিম্নবর্গের সংস্কৃতির একটি বিশেষ পার্থক্য ধরা পড়েছে। তবে এক্ষেত্রে বলতেই হয় তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষের মুখে এ ধরনের রুচিহীন অশ্রাব্য গালাগালের অনায়াস ও স্বাভাবিক প্রয়োগ গ্রামীণ ও নিম্নবর্গের সমাজকে ভিন্নতা দিয়েছে। এই স্বাভাবিক রুচিহীনতা কোনোভাবেই আমাদের কাছে বিরক্তিকর মনে হয়নি। বরং গালি দেওয়ার এই স্বভাবিক প্রবণতা সংলাপে না থাকলে সমাজবাস্তবতাকে যেমন ক্ষুণ্ণ করা হত তেমনই সংলাপ ও সমাজকে কৃত্রিম করা হত। অশিক্ষিত মানুষের মুখে এরকম অবাধ গালি প্রকাশ আমাদের নিম্নবর্গীয় সমাজকে একান্তভাবে চিনে নিতে সাহায্য করে, যা একই সঙ্গে সমাজচিত্রকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

৩.৪ কথাবিশ্বে রাজনৈতিক অনুষঙ্গ ও নিম্নবর্গের রাজনৈতিক চেতনা

রাজনীতি অর্থে কেবল কোনো বিশেষ পার্টি বা রংয়ের কুক্ষিগত মতাদর্শ নয়, কোনো সরকারি বা বেসরকারি সিদ্ধান্ত নয়, রাজনীতির বৃহৎ অর্থ হল—বুদ্ধি-বল-অর্থ বা ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে কৌশলে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করা। এক্ষেত্রে সমাজে দু-ধরনের রাজনীতি লক্ষণীয়। উচ্চবর্গের রাজনীতি ও নিম্নবর্গের রাজনীতি। নিম্নবর্গের ইতিহাসেও সমালোচকেরা উক্ত এই দুই ধরনের রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তাদের কর্মসূচির প্রাথমিক আলোচ্য বিষয় ছিল- ঔপনিবেশিক আর দেশীয়, দু-ধরনের উচ্চবর্গের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আর পদ্ধতির সঙ্গে নিম্নবর্গের রাজনীতির পার্থক্য নির্ধারণ করা। আলোচনার এই পর্বে আমাদের উদ্দেশ্য হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে এই দুই ধরনের রাজনীতির প্রেক্ষাপটটি স্পষ্ট করা।

হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে একটি রাষ্ট্রীয় সীমানা রয়েছে। ভারতবর্ষের পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার বঙ্গোপসাগরের কুল ঘেঁষে গড়ে ওঠা প্রান্তিক অঞ্চলগুলি কথাবিশ্বের আঞ্চলিক পরিধি। লেখক নিজেও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার উত্তর পতেঙ্গায় অবস্থিত এক জেলেপল্লির বাসিন্দা। ফলে অভিজ্ঞতাজনিত কারণেই হরিশংকর জলদাসের অধিকাংশ কথাবিশ্বের আঞ্চলিক পটভূমি গড়ে উঠেছে উত্তর পতেঙ্গা অঞ্চলকে ঘিরেই।

হরিশংকর জলদাসের গল্প ও উপন্যাসে রাজনৈতিক পটভূমিকার একটি বিশেষ স্থান জুড়ে রয়েছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ ও প্রভাব। তবে মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব যে সমাজের প্রান্তিক মানুষগুলির মধ্যে আলোড়ন তোলে না, তা লেখক তার ‘দহনকাল’ উপন্যাসে জানিয়েছেন-

‘পাকিস্তানিদের শোষণ, অর্থনৈতিক নিপীড়নের সংবাদ অশিক্ষিত জেলেপাড়ায় পৌঁছায় না।... বাইরের রাজনৈতিক অস্থিরতার ঢেউ উওর পতেংগার জেলেপল্লিতে ক্ষীণভাবেও আলোড়ন তোলে না। শুধুমাত্র অন্নসংস্থানের জন্যে উদায়স্ত কঠোর কায়িক পরিশ্রমে রত থাকে যে জেলেসম্প্রদায়, তার কাছে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, আটান্নতে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল, ছ’ দফা আন্দোলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এগারো দফা দাবি, ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনের সংবাদ পুরোপুরি পৌঁছায় না।’ (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৩৫-৩৬)

উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে সমগ্র জেলেপাড়া যখন উত্তাল তখন পাকিস্তানি সেনারা উত্তরপতেঙ্গায় আস্তানা গারে, যাতে মুক্তিযোদ্ধাদের তারা ধরে শাস্তি দিতে পারে। এই কাজ করতে গিয়ে প্রভু স্থানীয় এই সৈন্যদের সহকারি হিসেবে দেখা গিয়েছে সেই জেলেপাড়ারই শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান- আব্দুল খালেককে। পাকিস্তানি সৈন্যদের ত্রাস সৃষ্টি করার ব্যাপারে এই মীরজাফর আব্দুল খালেক জেলেদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে সহকারিতা করেছে। ফলে দেখা গেল –

‘দিন সাতেকের মধ্যে পাকিস্তানি হায়েনারা উত্তর পতেংগার জনজীবন অস্থির করে তুলল। তাদের সঙ্গে জুটল মীরজাফরের দল। আবদুল খালেক ও তার রাজাকার বাহিনী পাকিস্তানি বর্বরদের সঙ্গে একজোট হয়ে বাড়ি বাড়ি ঢুকে পড়ল। ধরে আনতে লাগল যুবক-কিশোর, মধ্যবয়সী ও বৃদ্ধদের। দিনের বেলায়, সন্ধের সময় মানুষ সংগ্রহের উছিলায় নারী ধর্ষণ শুরু করল বর্বররা।’ (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৫৯)

একদিকে মুক্তিযোদ্ধা, অন্যদিকে পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার বাহিনী। প্রভুত্ব ও অধীনতার এই লড়াইয়ে রাজাকার বাহিনীর গুরুত্ব রয়েছে। আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি উচ্চবর্গের রাজনীতি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, যেকোনো প্রকারে অধীনদের সম্মতি আদায় করা। ‘রাজাকার’ হলো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে কিছু বিশ্বাসঘাতক বাঙালির যোগদান। এই বিশ্বাসঘাতক বাঙালির গায়ে পুলিশের পোশাক পরিয়ে হাতে বন্দুক ধরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর এরা পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে লুণ্ঠন ও ধর্ষণে অংশ নেয়- এক কথায় এরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী বিশ্বাসহন্তার দল। ফলে স্থানীয় কিছু ক্ষমতাশালী মীরজাফর ব্যক্তিদের প্রলোভনের জালে ফাঁসিয়ে পাকিস্তানি সেনারা তাদের সাহায্যে সমগ্র গ্রামে ত্রাস ও রাজাকার বাহিনী গঠন করল, যাতে শাসন ও শোষণ কার্যে সুবিধা হয়। ভীতি হোক বা বাধ্যতা যেকোনো পরিস্থিতিতে যাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা গোটা গ্রামকে ব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থা

করা হল। এক্ষেত্রে উচ্চবর্গের রাজনীতির হাত মজবুত করেছে নিম্নবর্গেরই কিছু ক্ষমতাশালী মানুষ। যাদের মধ্যে খালেক অন্যতম। তার দ্বারাই রাজাকার বাহিনী গঠন করেছে পাকিস্তানি সৈন্যরা।

'মোহনা' উপন্যাসে দেখা যায়, যে চন্ডককে রাজা ভীমসেন একদা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে রাজপ্রাসাদে স্থান দিয়ে তাকে পুত্রের মর্যাদা দিয়েছিল, যাকে শাস্ত্রে-অস্ত্রে পারদর্শী করে তুলেছিল, সে-ই একদিন পাল রাজাদের সঙ্গে চক্রান্ত করে কৈবর্ত্যরাজ ভীমসেন তথা সমগ্র কৈবর্ত্য সমাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কৈবর্তদের উত্থান পালরা মেনে নিতে পারেনি। তাদের মতে,

'যাদের পায়ের জুতা বহন করার কথা, তাদের মাথায় আজ রাজমুকুট শোভা পাচ্ছে।' (জলদাস ২০১৩, পৃ. ২৯)

ভীমসেনের পিতৃসুলভ আচরণের মূল্য চন্ডক বুঝতে পারেনি। সে সর্বদা হীনমন্যতায় ভুগেছে। হিংসা, ক্ষোভ মনে পুষে রেখে পিতাসম ভীমসেনকে অবিশ্বাস করে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যে কৈবর্ত্যরা বারবার পাল আক্রমণকে প্রতিহত করার মত শক্তি জুগিয়ে সাহসের পরিচয় দিয়ে এসেছে, তাদের সেই সাহস ও আত্মবিশ্বাসকে চন্ডক এক মুহূর্তে ভেঙে দিয়ে পাল রাজাদের পক্ষ নিয়ে কৈবর্তদের ধুলিস্যাৎ করেছে। ভেতরেই কোনো ব্যক্তির ষড়যন্ত্র বা ঈর্ষা-লোভ ও স্বার্থসিদ্ধির কারণে উচ্চবর্গের সহযোগিতা করেছে চন্ডক। ফলে কৈবর্তদের প্রতিরোধ পাল রাজাদের কাছে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

আলোচনার এই পরিসরে কথাবিশ্বে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিচয় আমরা দেখে নিতে পারি যা নিম্নবর্গের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা জানি, নিম্নবর্গের ইতিহাস প্রসঙ্গে রণজিৎ গুহ মন্তব্য করেছিলেন যে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনায় ঔপনিবেশিক উচ্চবর্গ এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী উচ্চবর্গের আধিপত্য চলে আসছে। আর এই দুই ধরনের উচ্চবর্গীয় আধিপত্যের বিরোধিতা করাই নিম্নবর্গের ইতিহাস-চর্চার লক্ষ্য। আসলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হল- উচ্চবর্গের নীতিহীন, আদর্শহীন ক্ষমতা দখলের কৌশলমাত্র, যেখানে জাতি-ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতাকে কাজে লাগিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ব্যবহার করা হয়েছিল। সাবঅলটার্ন স্টাডিজের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে, জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক চেতনা শুধুমাত্র উচ্চবর্গেরই ক্রিয়াকলাপের ফসল। এখানেই নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের আপত্তি। তাঁরা কখনোই মানতে চাননি যে, জাতীয়তাবাদী ও রাজনৈতিক ইতিহাসে নিম্নবর্গের নিজস্ব রাজনীতির কোনো স্থান নেই।

'থুতু', 'সীমানা ছাড়ায়ে', 'আবহ ইদানীং', 'অর্ক' প্রভৃতি মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক গল্প-উপন্যাসে দেখা যায় নিম্নবর্গের জাতীয়তাবাদী চেতনা। পাকিস্তানের হাত থেকে পূর্ব-পাকিস্তানকে মুক্ত করতে মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের নির্মাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি আপামর বাঙালিদের

মনন যন্ত্রণাকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং তাদের একত্রিত করে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর ডাককে উপেক্ষা করেনি বাঙালি। কারণ পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠেছিল যে, সে সময় বাঙালিদের পক্ষে ঘরে বসে থাকা সম্ভব ছিল না। জাতীয়তাবাদের স্ফুলিঙ্গ দাবানলে পরিণত হয়ে গিয়েছিল সে সময়। দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল যুদ্ধে অনভিজ্ঞ বাঙালিরা। কেউ আবেগে, কেউ স্বেচ্ছায়, কেউ স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

> 'সেই মিছিলে কত কিসিমের মানুষ! লুঙ্গিপরা থেকে জিনসের প্যান্টপরা, রিকশাওয়ালা-ঠেলাওয়ালা থেকে রিটায়ার্ড সরকারি কর্মকর্তা, টোকাই থেকে ভবঘুরে ভিক্ষুক।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২০৭)

চাষি পরিবারের সন্তান শামসুর আবেগ ছিল খুব। অশিক্ষিত এই মানুষটির কোনো কাজে মন বসত না। যুদ্ধের প্রাক্কালে মন অস্থির হয়ে উঠেছিল তার। সদ্য বিবাহিত শামসু হঠাৎ একদিন খেতে বসে তার বাবাকে বলে,

> 'বাবা, আমি যুদ্ধেত যাইতাম। মুক্তি যুদ্ধেত' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২১১)

উচ্চবর্গ পরিচালিত জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক মঞ্চে শামসুরা এভাবেই প্রবেশ করেছিল। কিন্তু এই নিম্নবর্গদের পরিণতি কী হয়েছিল? স্বাধীনতাবিরোধী, বিশ্বাসঘাতক রাজাকারদের অত্যাচারে ও ষড়যন্ত্রে দলে দলে মুক্তিযোদ্ধা ধরা পড়েছিল। কেউ মৃত্যু বরণ করেছিল, কেউ বা আহত হয়ে চিরজীবনের মতো পঙ্গুত্বকে বরণ করে বাড়ি ফিরে এসেছিল। শামসুর পরিণতিও সেরকমই। যুদ্ধে একটি পা খুইয়ে সে বাড়ি ফিরেছে এবং উপার্জনের তাগিদে রাজপথের ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে। 'আহব ইদানীং' গল্পে গল্পকথক মোহাম্মদ কালামউদ্দিন একজন বেয়ারা। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার মা তাকে বিয়ে করিয়েছিল। কিন্তু,

> 'মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আমার মধ্যে একটা উচাটন ভাব জেগেছিল। রেডিওতে আর জনমুখে যুদ্ধের কথা শুনতাম আর একটা প্রচণ্ড আলোড়নে চুরমার হতে থাকতাম। আজ বুঝছি, সেই আলোড়নের নাম দেশপ্রেম। দেশের টানেই বউ-মা-ভাই-চাকরি সব ছেড়েছুড়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২৬৮)

এক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য নিম্নবর্গকে অনুরোধ বা উপরোধ করতে হয়নি, বাধ্য করতে হয়নি। তারা স্বেচ্ছায় জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই প্রতিরোধে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু নিম্নবর্গীয় রাজনৈতিক চেতনার বৈশিষ্ট্য হিসেবে আমরা দেখলাম, যে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করতে বাঙালিরা এত যন্ত্রণা ও ত্যাগ করেছিল, তারাই শেষ পর্যন্ত দেশ থেকে কিছুই পেল না। যুদ্ধের নামে তারা কেবল শাসন, শোষণ, নির্যাতন, পীড়ন ও বঞ্চনাই পেল। যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা-বঞ্চনার কারণে দেশকে মুক্ত করা বাঞ্ছনীয় ছিল, সেই দেশকে মুক্ত করে নিম্নবর্গ যে অন্ধকারে ছিল সেই অন্ধকারেই রয়ে গেল। মাঝখান থেকে যে রাজাকারের দল বিশ্বাসহন্তা ছিল, তারাই দেশের কর্মকর্তা রূপে অধিষ্ঠিত হল।

সেদিক থেকে উচ্চবর্গ দ্বারা ডাক দেওয়া জাতীয়তাবাদী রঙ্গমঞ্চে নিম্নবর্গের স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণ করাকে উচ্চবর্গের বাড়তি শক্তি প্রদান করা ছাড়া কিছুই বলা যায় না। ‘সীমানা ছাড়ায়ে’ গল্পে অংশুমান ও ছইদুল দুইজন মুক্তিযুদ্ধের সহযোদ্ধা। কিন্তু দেখা গেল একজন মৃত্যু বরণ করেছে আর অন্যজন পা হারিয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করে উপার্জনের তাগিদে ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে।

> ‘একী! তিন চাকার জীর্ণ, মরমরে একটা হুইল চেয়ার ঠেলে আনছে এক কিশোরী। হুইল চেয়ারে বসা ছৈয়দুল। সামনে ভিক্ষার থালা।’ (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৩৪৪)

এভাবেই নিম্নবর্গ স্বেচ্ছায় জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করলেও তাদের পরিণতি মর্মান্তিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। ‘অর্ক’ উপন্যাসে জেলেপাড়ার জেলেসন্তান দিবাকর শিক্ষিত হয়ে কৈশোরে পদার্পণ করলে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে সে প্রভাবিত হতে থাকে। বাবা মায়ের নজর এড়িয়ে সে মিছিলে যেতে পারে না, কিন্তু সব খবর রাখে। এমদাদ মিয়ার বক্তৃতা, ছোবান মেম্বারের প্রতিক্রিয়াশীল ভাষণের কথা তার কানে আসে। মনে মনে সে প্রস্তুত হতে থাকে। কিন্তু এমদাদ মিয়ার ডাকে উত্তরপতেঙ্গার মানুষেরা যখন রাজপথে নেমে আসে,

> ‘দিবাকর এইসময় ঘরে বসে থাকে কী করে? পড়ে থাক লেখাপড়া, ভেসে যাক পরীক্ষা।... মিছিলে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে স্লোগান দিল—বীর বাঙালি অস্ত্র ধর...’ (জলদাস ২০১৭, পৃ. ১০৪)

কিশোর বলে এমদাদ মিয়া তাকে এসব থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিলেও দিবাকর ততদিনে দেশপ্রেমে নিজেকে নিয়োজিত করে ফেলেছে। গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা রহমালি একদিন গ্রামে ফিরে ছোবান মেম্বারের কুকীর্তি শুনে তাকে খুন করে। তারপর দিবাকর মুক্তিযোদ্ধা রহমালির সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে দেশমাতাকে মুক্ত করতে।

সুতরাং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নিম্নবর্গ যে ত্যাগ স্বীকার করেছে, তারপরেও কি আমরা বলতে পারি, নিম্নবর্গের কোনো জাতীয়তাবাদী চেতনা নেই? আসলে এই জাতীয়তাবাদী চেতনা উচ্চবর্গের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়লেও দেশপ্রেমে নিজেকে নিয়োজিত করার পরিকল্পনা নিম্নবর্গের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। আর এই সিদ্ধান্তই নিম্নবর্গের রাজনৈতিক চেতনার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়বাহক।

৩.৫ সারাংশ

‘‘রাজা আসে যায়　রাজা বদলায়
নীল জামা গায়　লাল জামা গায়
এই রাজা আসে　ওই রাজা যায়
জামা কাপড়ের　রং বদলায়…
দিন বদলায় না!’’ (চন্দ (সম্পা. ২০০০, পৃ. ৯২)

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কথিত আলোচ্য কবিতার কথাগুলো হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে বর্ণিত তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষদের জন্যও প্রাসঙ্গিক। কারণ, সাম্প্রতিক বাংলাদেশের ‘যুগান্তর’, ‘দৈনিক আজাদী’, ‘কালের কণ্ঠ’, ‘প্রথম আলো’, ‘বিডি রাইজিং বাংলা’, ইত্যাদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সংবাদ মাধ্যমে জেলে, মুচি, মেথর, পতিতা তথা নিম্নবর্গীয় সমাজের যে বর্তমান অবস্থার কথা পাই, তাতে দেখা যায় তথাকথিত এই নিম্নবর্গীয় সমাজ আজও অস্পৃশ্যতা, ঘৃণা, জাতিভেদের অভিশাপ, পুরুষানুক্রমিক পেশার মধ্যে জর্জরিত হয়ে সমাজের মধ্যে থেকেও একটি অন্ধকার বিচ্ছিন্ন দ্বীপের জগতেই আবদ্ধ হয়ে আছে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই তাদের উন্নয়ন নিয়ে। হরিশংকর তাঁর কথাসাহিত্যে তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সমাজ সম্পর্কে কোনো কথাই বাড়িয়ে বলেননি। তিনি যা দেখেছেন, তা-ই লিখেছেন।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, দেশ স্বাধীন হলেও সাধারণ মানুষ কি স্বাধীন হয়? সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কি তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সমাজের অগ্রগতি হয়? সময়ের সঙ্গে কি তারা তথাকথিত ভদ্রসমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসতে পারে? দুর্ভাগ্যজনকভাবে এর সবকটি প্রশ্নের উত্তর বর্তমানকালেও ‘না’ হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে যা আমরা হরিশংকরের কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়ে দেখলাম। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা কথাবিশ্বে বর্ণিত তথাকথিত নিম্নবর্গের প্রতি শোষণ ও বঞ্চনার দিকটি আলোচনা করব।

চতুর্থ অধ্যায়

হরিশংকর জলদাসের আখ্যানবিশ্ব : নিম্নবর্গের শোষণ ও বঞ্চনার বিবিধ রূপ

৪. সূচনা

৪.১ নিম্নবর্গীয় সমাজে শোষণ-বঞ্চনার বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতি

৪.১.১ সামাজিক শোষণ ও বঞ্চনা

৪.১.২ অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা

৪.১.৩ রাজনৈতিক ও সম্প্রদায়গত শোষণ-বঞ্চনা

৪.১.৪ নারী শোষণ ও বঞ্চনা

৪.২ সারাংশ

৪. সূচনা

সমাজে যখন বা যেখানেই শোষক ও শোষিত—দুটি শ্রেণির উত্থান হতে দেখা গিয়েছে সেখানেই শোষণ, বঞ্চনা, অন্যায়-অত্যাচার, নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে বারংবার। শ্রেণিবিভক্ত সমাজ সৃষ্টির পূর্বে মানুষ ছিল গোষ্ঠীবদ্ধ। তখন রাষ্ট্র বলে কিছু ছিল না। কিন্তু কালক্রমে সমাজ এমন কয়েকটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হল যাদের মধ্যে কেউ কেউ স্থায়ীভাবে অন্যের শ্রমের ফল কুক্ষিগত করার ক্ষমতা অর্জন করল এবং সেই মানুষদের প্রতি বলপ্রয়োগ করে তাদের সমস্ত কিছু কেড়ে নেওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হল। ইতিহাসে দেখা যায়, এই শোষণ প্রক্রিয়া প্রথম শুরু হয়েছিল সমাজের দাসপ্রথার মধ্য দিয়ে, যার পরবর্তী স্তর হল—সামন্ততন্ত্র। সামন্ততন্ত্রে মালিক-শ্রমিকরা পরিণত হল যথাক্রমে জমিদার ও ভূমিদাসে। জমিদাররা ভূমিদাস বা কৃষককে নিজেদের অস্থাবর সম্পত্তি বলে মনে করত। জমিদার হল ভূমি ও কৃষকের শ্রমের মালিক এবং তারা তাদের দিয়ে শ্রম করাতে বাধ্য করতে পারে। আসলে সামন্ততন্ত্র বহুবিস্তীর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মূল দ্বন্দ্ব ছিল সামন্ত প্রভু ও উৎপাদিত উদ্বৃত্তের সঙ্গে। সামন্ত প্রভু দ্বারা উদ্বৃত্ত উৎপাদন ভূমিদাসদের থেকে কেড়ে নেওয়ার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল এক ধরনের শোষণমূলক সামাজিক সম্পর্ক। কারণ প্রত্যক্ষ উৎপাদকের কাছ থেকে মজুরি বঞ্চিত উদ্বৃত্ত শ্রম যে বিশেষ অর্থনৈতিক রূপের মাধ্যমে নিষ্কাশিত করা হয়, সেটাই শোষক ও শোষিতের সম্পর্ককে নির্ধারিত করে। এই দ্বন্দ্ব যখনই শত্রুতায় পরিণত হয়েছে, তখনই তা কৃষক বিদ্রোহের রূপ নিয়েছে। পরবর্তীকালে উৎপাদকদের এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি ভেঙে পুঁজিবাদের উদ্ভব হয়েছে। কীভাবে সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণ হয়েছে, এর কারণ হিসেবে বলা যায়—উৎপাদকেরা সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে মুক্তির আশায় বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে আংশিক সফল হলে তারা উদ্বৃত্ত ফসলের কিছু অংশ নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে। পরবর্তীকালে ভূমিদাসরা সেই উদ্বৃত্তকে বিক্রি করে পুঁজির মাধ্যমে কৃষির উন্নতি ঘটায় এবং নতুন নতুন জমিতে চাষ করা শুরু করে। এর মধ্য দিয়ে জমিদারদের সঙ্গে ভূমিদাসদের বৈরিতা আরো প্রকট হয় এবং সামাজিক প্রক্রিয়ায় তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছল ও উন্নতকামী কৃষকদের সঙ্গে শোষিত কৃষকদের একটি শ্রেণি বিভাজন সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে মজুরি শ্রমের ভিত্তিতে উৎপাদনের রাস্তা তৈরির সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী উৎপাদনের সম্পর্কের ভ্রূণ সঞ্চার হয়। এভাবেই বাণিজ্য-মুদ্রা প্রচলন ও বিকাশের মধ্য দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে পুঁজিবাদী উৎপাদন ও সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। (হিলটন ২০১২, পৃ ১৩৯-১৪১) পণ্যদ্রব্য ও মুদ্রার বিনিময়ে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মধ্য থেকেই উদ্ভূত হল পুঁজিপতি শ্রেণির। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকেই পৃথিবীব্যাপী

পুঁজিবাদী বিপ্লবের সূচনার মধ্য দিয়ে সামাজিক শ্রেণি বিভাজনের রূপ মৌলিকভাবে বদলে গিয়েছে। ইতিহাসে দেখা যায়, সব পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেই পুঁজির মালিক, জমির মালিক, কল-কারখানার মালিকরা রাষ্ট্রের সমগ্র জনসংখ্যার একটি নগণ্য অংশ। বাকি জনগণের শ্রমের ওপর তাদের অবাধ বিধি আরোপিত নিয়ন্ত্রণ। ফলে সেদিক থেকে সমস্ত শ্রমজীবীদের ওপর তারা প্রভুত্ব করে এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদের ওপর উৎপীড়ন ও শোষণ করে। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রবক্তারাও ঔপনিবেশিক কালখণ্ডে রাষ্ট্রের সমগ্র জনসংখ্যার পুঁজিপতি শ্রেণির একটি নগণ্য অংশকে উচ্চবর্গ বা এলিট এবং বাকি জনসাধারণকে নিম্নবর্গ বা সাবঅলটার্ন বলে চিহ্নিত করেছেন। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রথম খণ্ডে এলিট সম্পর্কে রণজিৎ গুহের সিদ্ধান্ত,

> "The term 'elite' has been used in this statement to signify dominant groups, foreign as well as indigenous. The dominant foreign groups included all the non- Indian, that is, mainly British officials of the colonial state and foreign industrialists, marchants, financiers, planters, landlords and missionaries." (Guha (ed.) 1982, p. 8)

অন্যদিকে সাবঅলটার্ন বলতে তিনি বুঝিয়েছেন,

> "The terms 'people' and Subaltern classes' have been used as synonymous through-out this note. The social groups and elements included in this category represent the demographic difference between the total India population and all those whom we have deccribed as the elite. Some of these classes and groups such as the lesser rural gnntri, improverished landlords, rich peasants and uper middle peasants also 'naturally' ranked among the 'people' and the 'subaltern' could under certain Circumstanees act for the elite…" (Guha (ed.) 1982, p. 8)

ঔপনিবেশিক ভারতে উপরিউক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী উচ্চবর্গ হিসেবে যারা চিহ্নিত হয়েছে তাদের বাদ দিলে যে বিপুল জনসংখ্যা অবশিষ্ট থাকে তারাই হল রণজিৎ গুহের সংজ্ঞায় 'People' ও 'Subaltern class'। লক্ষণীয়, সামন্ততন্ত্রে সামাজিক শোষণ সম্পর্কের সঙ্গে পুঁজিবাদী শোষণের তেমন কোনো পার্থক্য নেই। আসলে সামন্ততন্ত্রে ভূমিদাস বা কৃষকরা সরাসরি তাদের শ্রমকে বিনিয়োগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেও উদ্বৃত্তের অংশ থেকে বঞ্চিত হত, কিন্তু পুঁজিবাদের ফলে কৃষকদের এক অংশ বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে উদ্বৃত্ত ফসলকে পুঁজিতে পরিণত করে সম্পন্ন কৃষক হয়ে দাঁড়াল এবং এক অংশ সর্বহারা হয়ে পড়ল। সমালোচক পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান,

> 'সামন্তশ্রেণীর আধিপত্য ও কৃষকের অধীনতাকে কেন্দ্র করে যে উৎপাদনব্যবস্থা, তার ভঙ্গুর অবস্থা; পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে কৃষি উৎপাদনের সূত্রপাত; কৃষকদের মধ্যে পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া; জমি ও উৎপাদনের উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন এক সর্বহারা শ্রেণির সৃষ্টি; একই সঙ্গে শহরাঞ্চলে পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায় শিল্পোৎপাদনের প্রসার—মোটামুটি এইভাবেই সামাজিক উৎপাদনের সামগ্রিক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের উদ্ভবকে দেখা হয়ে এসেছে। এরই সমান্তরাল প্রক্রিয়া হিসেবে যুক্ত

হয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণির সামাজিক কর্তৃত্ব বিস্তার—ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও যুক্তিবাদী সমাজদর্শন, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক আদর্শ, প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা ইত্যাদি।' (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ৫)

অর্থাৎ পুঁজিবাদের উদ্ভবের পরে সামাজিক শ্রেণিশোষণের রূপ বদল হলেও তা বজায় রয়েছে। এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রে উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ নামে এক নতুন সামাজিক সম্পর্কের উদ্ভব ঘটেছে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে (বিস্তারিত আলোচনা, পৃ. ১৭-১৮) আমরা জেনেছি, আন্তনিও গ্রামশি 'সাবঅলটার্ন'-শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। প্রথমত, সিভিল সোসাইটি অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সাবঅলটার্ন হল শ্রমিক শ্রেণি এবং দ্বিতীয়ত, শ্রেণিবিভক্ত সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত অধস্তন কর্মচারী বা সাব-অর্ডিনেট অর্থে। লক্ষণীয়, প্রথম অর্থটি সরাসরি শ্রমিকশ্রেণি হিসেবে প্রয়োগ করা হলেও দ্বিতীয় অর্থে সরাসরি শ্রমিক হিসেবে 'সাবঅলটার্ন' শব্দটি প্রতিপন্ন হচ্ছে না। যদিও দুটি অর্থই ক্ষমতার নিরিখে কর্তৃত্ব ও অধীনতার মানদণ্ড গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে গ্রামশি দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদী শ্রেণি কেবল শাসনের মাধ্যমে প্রভুত্ব বা কর্তৃত্বই প্রতিষ্ঠা করে না, সৃষ্টি করে এক সামাজিক সর্বজনসম্মত কর্তৃত্ব, যাকে তিনি 'হেজেমনি' বলেছেন। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে সাবঅলটার্ন স্টাডিজের প্রবক্তারা ভারতীয় সমাজে ঔপনিবেশিক শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চবর্গ এবং নিম্নবর্গ-এই বৈপরীত্যমূলক বাইনারি অবস্থানের কথা বলেছেন। যদি এই অর্থে উচ্চবর্গ এবং নিম্নবর্গ ধারণাটিকে গ্রহণ করা যায়, তবে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সাহিত্যের রূপবদলের সাপেক্ষে নিম্নবর্গের অবস্থান ও চেতনাকে আমাদের বুঝে নিতে হবে।

হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে সমাজের তথাকথিত যে নিম্নশ্রেণি অর্থাৎ জেলে, মেথর, মুচি, পতিতা, নাপিত ইত্যাদি নিম্নবর্গকে উঠে আসতে দেখি, তারা উপরিউক্ত আলোচনার সাপেক্ষে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল ও পেশাগত দিক থেকে তথাকথিতভাবে নিম্নবৃত্তির। তাদের জীবন অসহায়, দুর্বিষহ, অভাবগ্রস্ত ও অস্বচ্ছল। তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল, দিন-রাত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে নিজের ও পরিবারের জন্য খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। কথাসাহিত্যে বর্ণিত নিম্নবর্গীয় সমাজে যে শুধু সর্বহারাদের কথাই ব্যক্ত হয়েছে তা নয়, আসলে সমগ্র সমাজের একটি ক্ষেত্র বিশেষে যে সমাজ-মানুষের বসবাস তাদের মধ্যে কেউ কেউ অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থ ও ক্ষমতার অধিকারী। ক্ষমতার প্রেক্ষিতে তারা সেই নির্দিষ্ট সমাজের বিপরীত অবস্থানে বসবাস করে। ফলে একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েও তাদের আচরণে অর্থ ও ক্ষমতার দম্ভ এবং বৈপরীত্যমূলক অবস্থান সৃষ্টি হয়। যার দরুন তারা তাদের অপেক্ষাকৃত নিম্নবিত্তের মানুষের ওপর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার এক অলিখিত অধিকার পেয়ে যায়। কিন্তু এরাই

আবার সেই নির্দিষ্ট সমাজের বাইরে অন্য কোনো প্রভুশক্তির অধীন। এইভাবে সমাজের সর্বত্র ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষমতার শৃঙ্খল বিরাজমান। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে রণজিৎ গুহ সমাজের এই ক্ষমতা বদলে অধীনতার বিষয়টি সম্পর্কে বলেছেন,

> '...সামগ্রিক ও শুদ্ধ অর্থে উচ্চবর্গের এই অংশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার অসমতা, এবং সেই অসমতার কারণ দ্বিবিধ: এক—সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের আঞ্চলিক বৈষম্য; আর দুই—এই অংশটির সামাজিক গড়নের সাংকর্য, অর্থাৎ তার অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলির মধ্যে গুণগত পার্থক্য। এই দ্বিবিধ অসমতার ফলেই যে-শ্রেণি বা সমূহ এক অঞ্চলে প্রভুস্থানীয় বলে গণ্য তারাই আবার অন্যত্র আর এক প্রভুগোষ্ঠীর অধীন।' (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.৩৩)

হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষেরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের বৈষম্যের ফলে একপক্ষ অন্যপক্ষের কাছে শোষিত ও শাসিত হয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা কথাবিশ্বে বর্ণিত সমাজের তথাকথিত সেই নিম্নবর্গীয় সমাজে সংঘটিত শোষণ-বঞ্চনা-অন্যায়-নিপীড়নের প্রকৃতি ও রূপরেখা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করব।

৪.১ নিম্নবর্গীয় সমাজে শোষণ-বঞ্চনার বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতি

হরিশংকরের কথাসাহিত্যে আলোচ্য এই দ্বিবিধ অসমতার মধ্যে সামাজিক বৈষম্য ততটা প্রকট না হলেও অর্থনৈতিক বৈষম্য রয়েছে। ফলে আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল ও ক্ষমতাবান নিম্নবর্গ একই সমাজে বসবাস করেও সর্বহারাদের ওপর নিজেদের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। দেখা গিয়েছে সাধারণের ওপর তাদের অন্যায়, শোষণ, বঞ্চনার নানারূপ। তবে এই শোষণ-বঞ্চনা কেবল অর্থনৈতিক দিক থেকেই নয়, সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্র বিশেষেও দেখা যায়। গল্প-উপন্যাসগুলি গভীর অধ্যয়নে আমরা দেখেছি নিম্নবর্গীয় সমাজের মানুষেরা শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে নিম্নলিখিত দিক থেকে। যেমন-

ক) সামাজিক শোষণ-বঞ্চনা

খ) অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা

গ) রাজনৈতিক ও সম্প্রদায়গত শোষণ-বঞ্চনা

ঘ) নারী শোষণ ও বঞ্চনা

হরিশংকরের কথাসাহিত্যের ভিত্তিতে উপরিউক্ত শোষণ-বঞ্চনার রূপ ও প্রকৃতিগুলি নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা হল।

৪.১.১ সামাজিক শোষণ-বঞ্চনা

সমাজ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হওয়ার কারণে সেখানে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রবণতা দেখা যায়, যাকে আপাত অর্থে সামাজিক শৃঙ্খলা বলে। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধান সন্ধানে সমাজ দ্বারা সৃষ্ট নানা বিধি-নিয়মের মধ্য দিয়ে সমাজকে বিশৃঙ্খল মুক্ত করার প্রয়াস থাকে। কিন্তু সেই বিধি নিয়মে যখন পক্ষপাতিত্বের সঞ্চার হয় তখন সামাজিক মানুষের মধ্যে জাতিভেদ, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ, সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় বঞ্চনা, শিক্ষা বিস্তারে অসমতার মতো বিভিন্ন সমস্যা সমাজের একপক্ষের ক্ষেত্রে লাভ ও সুবিধাজনক এবং অন্যপক্ষের ক্ষেত্রে ক্ষতি ও অসুবিধাজনক ফল বয়ে আনে। সেক্ষেত্রে সমাজের মানুষ হিসেবে সমান অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। একই সমাজে বসবাসকারী মানুষেরা কেউ জাতপাতজনিত কারণে, কেউ আয়ের ভিত্তিতে আবার কেউ পেশাগত কারণে উচ্চ-মধ্য-নিম্ন এই মানদণ্ডে শ্রেণিবিভাজিত হয়ে পড়ে। ইতিপূর্বেই আমরা জেনেছি, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শাসক ও শোষিত শ্রেণির উদ্ভব হয়। শ্রেণি বিভাজনে এক শ্রেণি সুবল এবং অপর শ্রেণি দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক চলতেই থাকে। সাহিত্যের আকল্পে হরিশংকরের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় সমাজে এ ধরনের সামাজিক শোষণ ও বঞ্চনার রূপ দেখা গিয়েছে, যা নিম্নে আলোচিত করা হল।

৪.১.১.১ জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতাজনিত শোষণ-বঞ্চনা

‘জলপুত্র’ উপন্যাসে দেখা যায় বর্ণ-হিন্দুরা জেলেদের ঘৃণা মিশ্রিত চোখে দেখেছে, কারণ সমাজে তারা নিম্নবৃত্তির মানুষ। দেখা যায়, গঙ্গাপদ স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর বর্ণ-হিন্দু পরিবারের সন্তানরা তার থেকে দূরে দূরে থাকে। একসঙ্গে বেঞ্চে বসলেও মাঝখানে খানিকটা দূরত্ব বজায় রাখে-

> ‘দুষ্ট ছেলেরা জাইল্যা, ডোম বলে ঘৃণামিশ্রিত ইয়ার্কি করে তার সঙ্গে। তাদের নিষ্ঠুর আচরণ গঙ্গাকে বিপন্ন করে।’
>
> (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৩২)

শ্রেণিবিভাজিত সমাজ হিন্দুদের মান্যতা দিলেও জেলেসম্প্রদায় করুনার পাত্র। ঘৃণা, তিরস্কার, বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার অভিঘাতে গঙ্গার মতো এক শিশুর মনে বিদ্যালয়, পড়াশুনা, সহপাঠী এসবই অসহনীয় হয়ে উঠেছে। ‘দহনকাল’ উপন্যাসেও হরিদাসের হাইস্কুলের প্রথম দিনে স্কুলের অন্যান্য ছাত্ররা তাকে ‘জাইল্যা’, ‘ডোম’ বলে ঘৃণা প্রদর্শন করেছে। শুধু তাই নয়, একই সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও জেলেরা দ্বিধাবিভক্ত। পেশাগত কারণে জেলেদের মধ্যে দুটি ধারা রয়েছে—যাদের মধ্যে একটি ধারা মাছমারার পাশাপাশি নিজেদের জমি জমায় চাষ আবাদ করার সুযোগ পেয়েছে এবং অন্যধারাটি কেবল মাছমারার ওপরই

নির্ভরশীল। ফলে হালিক কৈবর্তরা জালিক কৈবর্তদের নিম্নজাতের বলে ঘৃণা প্রদর্শন করেছে। এর উদাহরণ হিসেবে আলোচ্য উপন্যাসে দেখা যায়- কৈবর্তপাড়ায় শিবশরণের বাড়িতে নিমন্ত্রিত কৈবর্তদের সঙ্গে হরবাঁশির মতো জালিক কৈবর্ত একই সারিতে খেতে বসলে শশধর তার সঙ্গে খেতে নারাজ। প্রদীপও তার সঙ্গে বলে ওঠে-

'...তোঁয়ারার লগে এক লাইনত্ বই আঁরা ভাত খাইয়ম কেএনে? তোঁয়ারা ছোডজাত।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৫৬)

নিজসম্প্রদায়ে নিচুজাতের কাছেও জেলেরা ছোটোজাত হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসে কাঁইচোবালা গ্রীষ্মের কোনো এক দুপুরে নাপিত পাড়ায় মাছ বেঁচতে গিয়ে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে। শীল বাড়ির বড়ো বউয়ের কাছে জল চাইলে সে তাকে হাতের আজলা ভরে জল খাওয়ার নির্দেশ দেয়। কাঁইচোবালার বুঝতে আসুবিধ হয় না যে, জেলেদের নাপিতরাও ঘৃণার চোখেই দেখে। তাই তো রাধাগোবিন্দের মনে প্রশ্ন জাগে-

'বাওনর কাছে ছোড জাত, কাস্থর কাছে ছোড জাত, নাইতর কাছেও ছোড জাত।এ-ন কি আঁরার জাতভাই কইত্তরঅলেও কইলো আঁরা ছোড জাত। তই, আঁরা কি আসলে ছোড জাত না জেডা?' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৬৬)

রাধাগোবিন্দের প্রশ্নের উত্তর বৃদ্ধ ঠাকুরদাসের অজানা। তথাকথিত নিম্নবর্গ হয়েও সামগ্রিক সমাজের অন্যান্য স্তরেও অচ্ছুৎ ও অন্ত্যজ হিসেবে সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে জেলেরা। সামাজিক শ্রেণিভেদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে কর্ম ও গুণের ভিত্তিতে মানুষের মূল্য ও মর্যাদা শূন্য। জন্মই আসল পরিচয়। ফলে জাতিগতভাবে আবহমানকাল ধরে জেলেরা সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও শোষিত হয়ে এসেছে।

'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে জাতিভেদের ঘৃণ্যরূপ আমরা লক্ষ করি। শিকলভাঙা গ্রামে নাপিতরা জেলেদের চুল কাটে না। শুধু জেলে নয়, মুচি-ধোপা এদেরও চুল কাটতে তাদের আপত্তি। কারণ নাপিতরা জেলে-মুচি-ধোপাদের থেকে নিজেদের উঁচুজাতের বলে মনে করে। তাদের মতে, উঁচুজাতি নিচুজাতির মানুষদের কোনোরূপ সেবা করে না। বহুকাল আগে থেকেই শিকলভাঙা গ্রামে এই প্রথা চলে আসছে। এই অঞ্চলের তথাকথিত নিম্নজাতের মানুষেরা গঞ্জের কোনো নাপিতের কাছে ক্ষৌরকার্য করাতে পারে না—তাদের যেতে হয় দূর গ্রামে বা নদীর ওপারে। উপন্যাসে উত্তরপতেঙ্গার ছেলে সীতানাথের শিকলভাঙা গ্রামের এই জাতিবিদ্বেষের কথা জানা নেই বলে সে তার ভাগ্না-ভাগ্নিকে নিয়ে গঞ্জের বঙ্কিম শীলের দোকানে যায়। সেখানে সীতানাথের আসল পরিচয় প্রকাশ্যে এলে বঙ্কিম চেঁচিয়ে ওঠে,

'তুই আমারে দিয়া জাইল্যার চুল কাটাইলি! মহাপাতক কইরলি তুই আমারে! (জলদাস ২০১৯, পৃ.২১১)

জাতিভেদের নামে এ ধরনের অমানবিক ঘটনা সামাজিক অন্যায় ও নিপীড়নে পর্যবসিত হয়েছে।

'অর্ক' উপন্যাসেও জেলেদের ওপর হিন্দু-মুসলমানের জাতবিদ্বেষ দেখা যায়। যুগ যুগ ধরে জেলেরা যে সমাজের অপমান লাঞ্ছনা মুখ বুজে সহ্য করে এসেছে তার জন্য দায়ী তাদের প্রতিবাদহীনতা। উপন্যাসে দিবাকরকে স্কুলে ভর্তি করাতে গিয়ে বলরামদের মতো জেলেদের জাতপাতের নামে কঠিন সংগ্রামের মুখে পড়তে দেখা যায় বারবার। উপন্যাসে জানা যায়,

'বংশানুক্রমে এতটি বছর তারা মুখ বুজে হিন্দু-মুসলমানের অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করে এসেছে। কথায় কথায় জাইল্যা-ডোম বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে। ঘরে আসন পেতে বসতে বলেনি কোনোদিন। নৌকা থেকে পাঙাশ মাছটি, ইলিশ মাছটি, কোরাল মাছটি হাতে ধরে নিয়ে গেছে, দাম চাইবার সাহস করেনি। কখনো বা দাম চাইলে ছাতার বাঁট দিয়ে মাথায়-গায়ে বাড়ি মেরেছে। এসব অত্যাচারের কোনোই তো প্রতিবাদ করেনি তারা। প্রতিবাদ করার কথা মনেই আসেনি কোনোদিন।' (জলদাস ২০১৭, পৃ. ২৩)

তবে শুধু জেলেরাই নয়, জাতপাতের শিকার হয়েছে সমাজের তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণি মুচি- মেথররাও। 'রামগোলাম' উপন্যাসে জাতপাতের নামে যে সামাজিক অন্যায় ও বঞ্চনা দেখা যায়, সেখানে মেথরদের মানুষ বলে ভাবা হয় না। কারণ তারা নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার করে। সামাজিক বঞ্চনার চাপে মেথররা দিশেহারা। 'রামগোলাম' উপন্যাসে দেখি, বাল্লু জমাদারের ছেলেটি কোর্টহিলের চা-এর দোকানের সামনে গাড়ি চাপা পড়ে থাকলেও মেথর সন্তান বলে কেউ ছুঁয়েও দেখেনি। এর থেকে অমানবিক দৃশ্য উপন্যাসে দ্বিতীয় নেই। জেলে সম্প্রদায়ের মতোই মেথররাও সামাজিকভাবে নিম্নবর্গের মধ্যে অস্পৃশ্য ও ছোটোজাত। তাই তো রামগোলাম যখন রিক্সা করে শহরে বাবাঠাকুরকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় তখন তার মেথর পরিচয় জেনে রিক্সাওয়ালার চোখে ঘৃণা ভেসে ওঠে। রামগোলাম যাওয়ার পর একটি কাপড়ের টুকরো দিয়ে সে রামগোলামের বসার জায়গাটি মুছতে থাকে। আবার ফিরিঙ্গিবাজার মেথরপট্টিতে মেথরদের জন্য তৈরি স্কুলে মেথররাই বঞ্চিত হয়েছে। স্কুলের হেডমাস্টার মেথরদের একেবারে শেষের বেঞ্চে বসার আদেশ দেন। প্রতিনিয়ত মেথররা অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের অভিশাপ বহন করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, মেথরপট্টির সর্দার গুরুচরণের শবদেহ দাহ করার জন্য রামগোলাম, চেদিলাল, কার্তিকরা শ্মশানে পৌঁছলে ডোম রামদাস তাদের মরা পোড়াতে দেয় না। উপন্যাসের বর্ণনা অনুযায়ী,

'রামদাস এই শ্মশানের ডোম। মরা পোড়ানোর দায়দায়িত্ব তাকে দিয়েছে শ্মশান-কমিটি। শহরের উঁচু বর্ণের গণ্যমান্য হিন্দুরা এই কমিটির সভাপতি, সেক্রেটারি, সদস্য। ... ওরাই তাকে বলে দিয়েছে—মেথর, জেলে, হাঁড়ি—এসব নীচু জাতের মৃতদেহ পোড়াবে ওই ওদিকে, খালের পাড়ে। আর এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাঁধানো চুলাটি উঁচু বর্ণের জন্য।... খবরদার, এর ব্যতিক্রম করলে চাকরি খাব তোমার।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ১০৯-১০)

'কোটনা' গল্পেও দেখা যায় রামদুলাল মুচি অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের কারণে হাটে-বাজারে বিনা প্রতিবাদে কিল-চড়-লাথি সহ্য করে। আবার শিক্ষাক্ষেত্রেও মুচির সন্তান বলে গল্পকথক অশোককে ক্লাসের শেষ বেঞ্চে বসার আদেশ দিয়েছেন প্রধান শিক্ষক ভবতোষ চক্রবর্তী।

নিম্নবর্গীয় সমাজে এই জাতিভেদ জনিত সামাজিক ব্যাধি সমাজের তথাকথিত নিচুতলার অন্ত্যজ মানুষকে কোণঠাসা করেছে। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর সাম্প্রতিক আলোচনাতেও জাতিভেদ প্রথার প্রসঙ্গটি উল্লেখযোগ্যভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। দেখা গেল, জাতিভেদ প্রথার ধর্মীয় ভিত্তি সাম্প্রতিককালে নেই। এখন জাতিভেদ বলতে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর অবস্থানকে নির্দেশ করে। তথাকথিত সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সাপেক্ষে জাতপাতজনিত পরিচয় গণ্য করা বা না-করার সাধ্যের মধ্যে সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্গের আধিপত্য বিস্তারের কৌশল রয়েছে। অর্থাৎ উঁচুজাতের ব্যক্তি (যেমন ব্রাহ্মণ/ ক্ষত্রিয়) নিচুজাতের (শূদ্র) ব্যক্তির প্রতি সহজেই ক্ষমতা বিস্তার করার অধিকার পায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে জাতিভেদজনিত সামাজিক শোষণের কারণ হিসেবে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-র সমালোচকদের মধ্যে নানা তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। মার্কসবাদী সমালোচকদের মধ্যে জাতিভেদ নিয়ে দু-ধরনের মতবাদ রয়েছে,

> "Most have argued that caste in a feature of the superstructure of Indian society and ought to be understood in terms of its efficacy as an ideological system which reflects the basic structure of material (i.e. productive) relations the letter of course being characterized in terms of class relations. Others have suggested that cost is in fact the specially Indian form of material relations at the base, within its own historical dynamic; caste, in other words, is the form in which classes apear in Indian society."
> (Guha (ed.) 1999, p.175)

অর্থাৎ ভারতীয় শ্রেণিবিভক্ত সমাজে বর্ণ হল উপরিকাঠামোর একটি বৈশিষ্ট্য এবং এটিকে একটি আদর্শ ব্যবস্থা হিসেবে এর কার্যকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা উচিত যা উৎপাদন সম্পর্কে মৌলিক কাঠামোকে প্রতিফলিত করে। বর্ণ হল প্রকৃতপক্ষে তার নিজস্ব ঐতিহাসিক গতিশীলতার সঙ্গে মৌলিকভাবে বস্তুগত সম্পর্কের বিশেষ ভারতীয় রূপ। বর্ণ বা জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় সমাজে পেশা ও জন্মগত শ্রেণিবিভাজনের বহু প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার সার্বিক রূপ। যার দরুন উঁচুশ্রেণি বা জাতির মানুষেরা তাদের থেকে অপেক্ষাকৃত নিচুজাত, শ্রেণি বা পেশার মানুষের ওপর নানাভাবে সামাজিক শোষণ করে। ইতিপূর্বে গল্প-উপন্যাসের আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি, তথাকথিত নিচুজাত, শ্রেণি ও পেশার মানুষেরা একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিচুজাতি ও অস্পৃশ্য বলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এই সামাজিক অপমান আসলে

সামাজিক শোষণেরই অন্যরূপ। হরিশংকর তাঁর আত্মজীবনী 'নোনাজলে ডুবসাঁতার'-এ এই সামাজিক অবমাননা সম্পর্কে তাই বলেন,

'এই একবিংশ শতাব্দীতেও শুধু জেলে হবার অপরাধে কী পরিমাণ নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয় আমাদের, তা আমার মতো ভুক্তভোগী ছাড়া, অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা বুঝবেন না।' (জলদাস ২০১৮, পৃ.৩৮)

৪.১.১.২ বিবাহ-পণজনিত শোষণ

শুধু জাতিভেদজনিত শোষণ-বঞ্চনাই নয়, নানাবিধ সামাজিক অন্যায় অত্যাচার ও নিপীড়নের চিত্রটিও হরিশংকরের গল্প-উপন্যাসে উঠে এসেছে। সামাজিক শোষণের একটি চিত্র হল বিবাহ-পণপ্রথা। হরিশংকরের আখ্যানে পণপ্রথার চিত্রটি দু'রকম। যেমন 'জলপুত্র' উপন্যাসে বিবাহের সময় কন্যাপণ নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিবাহ করার সময় বরপক্ষকে কন্যার পিতার দাবি অনুযায়ী নগদ অর্থ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিতে হয়েছে। ভুবনেশ্বরী ও চন্দ্রমণির বিয়ের সময় ভুবনের পিতা নৈদরবাঁশিকে কন্যাপণ নিতে দেখা গিয়েছে।

'ছয় কুড়ি টাকা কন্যাপণের বিনিময়ে মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজি হল নৈদরবাঁশি।' (জলদাস, ২০০৮, পৃ.১৪)

আবার বংশীকে বিয়ে করানোর সময় পিতা ভোলানাথকে কন্যার পিতা রাধামোহনকে কন্যাপণ দিতে হয়েছে। রাধামোহন পাঁচ কুড়ি টাকা দাবি করলেও ভোলানাথ তাকে চার কুড়ি টাকায় রাজি করিয়েছে। কিন্তু 'দহনকাল' উপন্যাসে বিবাহপণের চিত্রটি উল্টো। কাল পরিবর্তনে সামাজিক নিয়মের পরিবর্তন হয়েছে এক্ষেত্রে। এখানে দেখা গেল কন্যাপণের অবলুপ্তি এবং বরপক্ষের যৌতুক দাবি করার ঘটনা। উপন্যাসে বসুমতীর বাবা হরবাঁশি টাকার অভাবে ছোটো মেয়েটির বিয়ে দিতে পারছে না। বরপক্ষের লোভের মাত্রা দেখে হরবাঁশি পিছিয়ে গিয়েছে বারবার। আমরা জানি একই সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে শ্রেণিবিভাজন থাকলেও পরস্পরের সমাজ-সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফলে সামাজিক প্রথার পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে জেলে সমাজে বরপক্ষের যৌতুক দাবির প্রথা ছিল না।

'কুলীনসমাজ থেকে এই প্রথা জেলেসমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। জেলেসম্প্রদায়ের বরপক্ষ কুলীনসমাজ থেকে আর কিছু না শিখলেও এই কুপ্রথাটি ভালো করে রপ্ত করে নিয়েছে।' (জলদাস ২০১০, পৃ.২৫)

বিবাহপণ—সে কন্যাপণ হোক বা বরপক্ষের যৌতুক দাবিই হোক, পণপ্রথা আসলে সামাজিক অবস্থান ও আধিপত্যের নামে আর্থ-সামাজিক শোষণ মাত্র। গবেষক আর. এম কাম্বলে পণ সম্পর্কে বলেছেন-

'Basically the dowry was not based on greed and extortion as it is identifies in the present scenario; in reality, it was suposed to be a token of love affection and sonic kind of regared of the bridegrooms. In the ancient documents such as thindu shastras the term 'Varadakshina',was nothing

> but some kind of ‘Dakshina’, payment of a purely voluntary nature; further, It was considered as on the of the important rituals to fulfill the act of ‘Kanyadanum’- giving away the bride in marriage. Hare it is to be remembered, that the brides’ present, through the dowry were ensuring her security enabliny her to lead a dignified and harmonious relationship with the groom’s family.’
>
> (Kamble,2021 P-142-43)

পণপ্রথার কারণে শ্বশুরবাড়িতে একজন বধূকে যে পরিমাণ নির্যাতন সহ্য করতে হয় যা কিছু ক্ষেত্রে আত্মহত্যা বা হত্যা পর্যন্ত পৌঁছে যায়—এরকম কোনো ঘটনার উল্লেখ হরিশংকরের আখ্যানে পাওয়া যায় না। কিন্তু বরপক্ষের দাবি মেটাতে গিয়ে ‘দহনকাল’ উপন্যাসের আদাব স্যারকে সর্বস্বান্ত হতে দেখা গিয়েছে,

> ‘গত চার বছরে চারটা মেয়েকে বিয়ে দিয়ে ফতুর হয়ে গেলেন আদাব স্যার। ...মেজজামাইকে বেহালায় একটি ওষুধের দোকান সাজিয়ে দিতে হলো।... তৃতীয় মেয়ে সে-সময়ের মেট্রিক পাস। তাই বিদ্বান ছেলের কাছেই বিয়ে দিতে হলো সুজাতাকে। ...এই জামাইয়ের খাই মেটাতে সর্বস্বান্তই হতে হলো আদাবস্যারকে।’ (জলদাস ২০১০, পৃ. ৩৮)

শেষ সম্বল জমিটুকু কম দামে আব্দুল খালেক মেম্বারের কাছে বিক্রি করে দিলেন আদাব স্যার। দুটো বড়ো পুকুরের একটি বড়ো মেয়ের বিয়ের সময় বিক্রি করেছিলেন। আরেকটি পুকুর সদানন্দ মহাজনের কাছে বন্ধক রেখেছিলেন চতুর্থ মেয়ের বিয়ের সময়। ফলে আদাব স্যার কন্যাদানের পরিবর্তে নিঃস্ব হয়েছেন। গবেষক কাম্বলের মতে, বরপক্ষের পণের দাবী মেটানোর মধ্যে দিয়ে কন্যার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা রক্ষা, শ্বশুরবাড়ির সামনে কন্যার মধ্যে দিয়ে নিজের মানমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা এবং বরপক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরির উদ্দেশ্যে অভিভাবকরা পণ নামক শোষণ সহ্য করে। পণপ্রথার বিরোধিতা করে 'The Dowry prohibition Act’ নামে ১৯৬১ সালের ২০ মে পার্লামেন্টে আইন পাস হয়। কিন্তু তাতেও পণপ্রথা রোধ করা যায়নি। হরিশংকর জলদাসের গল্প-উপন্যাসে জেলেসমাজ বর্ণনা প্রসঙ্গে পণপ্রথার কথা উঠে এসেছে সামান্যভাবে।

৪.১.১.৩ পারিবারিক শোষণ ও বঞ্চনা

জীবনযাপন করার জন্য মানুষ যে সব প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তার মধ্যে বিয়ে ও পরিবার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন। সমাজ গঠনের পেছনে পরিবার ও পরিবারভুক্ত মানুষের অগ্রগণ্য ভূমিকা রয়েছে। এর মধ্যে বিয়ে নামক আচার ব্যবস্থাটি এক পরিবারের সঙ্গে অপর পরিবারের মিলনের মাধ্যম। পারিবারিক মিলনে নতুন সম্পর্কের জন্ম হওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তি-পরিবারের সঙ্গে প্রেম-ভালোবাসা, বৈরিতা, ঈর্ষা ও ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে একজন নারীকে তার নিজস্ব পরিবার ছেড়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন

অপরিচিত এক পরিবারে এসে উঠতে হয় বিবাহের মাধ্যমে। সেই বিবাহিত নারীকে সবসময় সকল পরিবার সমান গুরুত্ব দিয়ে স্বাগত জানাবে এমনটা নয়। পরিবারে একসঙ্গে থাকতে হলে ইতিবাচক সম্পর্কের পাশাপাশি নেতিবাচক সম্পর্কেরও সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে কিছু ক্ষেত্রে শাশুড়ি-ননদের সঙ্গে পুত্রবধূর মান-অভিমান, দ্বন্দ্ব, বচসা, ঈর্ষার রেশ চলতেই থাকে যা কখনো কখনো শোষণ, নির্যাতনের পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে মূলত জেলে, মেথর, পতিতা, মুচি ইত্যাদি নিম্নবর্গীয় সমাজের পারিবারিক জীবনের কথা উঠে এসেছে। যেখানে প্রায় প্রতিটি পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। কারণ বংশবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি করা উক্ত সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া একান্নবর্তী পরিবার হয়ে বাস করার মধ্যেও উপার্জনের জন্য অধিক সহায়তা পাওয়ার সুযোগ থাকে। এই কারণেই কথাসাহিত্যে বর্ণিত জেলে বা মেথর সম্প্রদায়কে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যৌথ পরিবারের অন্তর্গত হতে দেখেছি। তাছাড়া তথাকথিত জেলে-মুচি-মেথর-পতিতা সমাজে স্ত্রীয়ের অর্থনৈতিক উপার্জনের পেছনে সাময়িক ভূমিকা থাকলেও অন্যান্য মূলত নানা প্রকার অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব কর্তব্য পালন করার ক্ষেত্রে পুরুষরাই এগিয়ে আসে। ফলে মেয়েদের আর্থিক নির্ভরতা অর্জন করার সম্ভাবনা থাকলেও পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের ক্ষমতা এবং মর্যাদা অনেক সীমিত এবং সংকুচিত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সমতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না। তাছাড়া পারিবারিক সম্পর্কগুলোও সবসময় স্থির থাকে না। সম্পর্কের উন্নতি-অবনতির মধ্য দিয়ে একটি পরিবার ও পারিবারিক প্রকৃতির স্বরূপ ফুটে ওঠে।

প্রাসঙ্গিকভাবে বলতে হয়, সমাজে শ্রেণিবিন্যাসের কারণে যেমন শোষক-শোষিত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে, তেমনি পরিবার ও পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে মর্যাদা ও ক্ষমতার বিন্যাসে এক ধরনের শাসক-শাসিতের বৈপরীত্য ধরা পড়ে। হরিশংকর জলদাসের গল্প-উপন্যাসে বর্ণিত নিম্নবর্গীয় সমাজের মধ্যে পারিবারিক শোষণ, অন্যায়, অত্যাচার ও বঞ্চনার দিকগুলি যেভাবে উঠে এসেছে তা আমরা আলোচ্য পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যা করব। পরিবার বা পারিবারিক সম্পর্কের কথা থাকলেও পারিবারিক শোষণের চিত্রটা ততটা প্রকট নয়। আখ্যানের প্রয়োজনে ও সমাজ বাস্তবতা বজায় রাখার নিমিত্তেই আমরা পারিবারিক শোষণের ঘটনা বর্ণিত হতে দেখেছি। যেমন-

'জলপুত্র' উপন্যাসে বর্ণিত কেন্দ্রীয় পরিবারটি ভুবনেশ্বরী, গঙ্গাপদ ও হরিবন্ধুকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। ভুবনের স্বামী চন্দ্রমণি এক সময় সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হয়। অসুস্থ শ্বশুর কর্মক্ষমতা

হারিয়ে শয্যাশায়ী হওয়ার দরুন পরিবারের কর্ত্রী ভুবনেশ্বরী। উপন্যাসে জানা যায়, হরিবন্ধুর এক দুঃসম্পর্কের ভাই গোলকবিহারী। ভাই হওয়ার সুযোগ নিয়ে সে তার ছেলে, ছেলে-বউ, স্ত্রী নিয়ে হরিবন্ধুর উঠানের পূর্বপাশের খোলা জায়গাটি দখল করার পরিকল্পনা করে। বিষয়টি স্বার্থসংশ্লিষ্ট বলে তার ছেলেরাও সমর্থন জানায়।

> 'দিন দুয়েকের মধ্যে গোলক ও তার তিনপুত্র তিন-চারজন ঘরামির সহযোগিতায় ভুবনদের সেই খালি জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় চার-কামরার একটা চৌচালা ঘর তুলে ফেলল। পাড়া প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাকে এড়িয়ে কতকটা রাতের আঁধারেই সেই ঘরে পরিবার-পরিজন নিয়ে উঠে এল।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৬০)

এখন প্রশ্ন হল, গোলকবিহারীর জায়গা দখল ও বাড়ি তৈরি করে সেখানে বাস করার সাহস বা বলা ভালো ক্ষমতা এল কীভাবে?

প্রথমত, আধিপত্যকামীর মনে স্বার্থের উৎপত্তি হওয়া। যেমন গোলকের ক্ষেত্রে দেখা যায়। সে তার স্ত্রী, ছেলে, ছেলে বউ, নাতি-নাতনি নিয়ে যে সংকীর্ণ স্থানে বসবাস করছিল সেখানে তার সংকুলান হচ্ছিল না। ফলে বড়ো কোনো জায়গা জুড়ে বাড়িঘর তৈরির প্রয়োজন দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত, গোলকবিহারী হরিবন্ধুর দূর সম্পর্কের এক ভাই বলে নিজেকে দাবি করে। সেই সূত্রে হরিবন্ধুর জমি জায়গার অংশীদার হিসেবে নিজেকে মনে করে।

তৃতীয়ত, চন্দ্রমণির মৃত্যু, হরিবন্ধুর অসুস্থতা, গঙ্গাপদর নাবালকত্ব ও ভুবেনেশ্বীর অক্ষমতা সম্পর্কে গোলক ওয়াকিবহাল।

চতুর্থত, গোলকবিহারীর তিন পুত্র সবসময়ই একজন পিতার বাহুবল হিসেবে কাজ করেছে।

সুতরাং ক্ষমতার শৃঙ্খলায় গোলকবিহারীরা আধিপত্যকামী বা ডমিন্যান্ট শ্রেণি ও ভুবনেশ্বরীর পরিবার হল সাবঅর্ডিনেট বা অধীনস্ত। আধিপত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে গোলকবিহারী প্রথমে 'Persuasion' অর্থাৎ প্ররোচনা সাহায্য নিয়েছে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে 'Coercion' অর্থাৎ জোরজবরদস্তি করার জন্যও প্রস্তুত থেকেছে। গোলকবিহারীর পরিবার কর্তৃক ভুবনেশ্বরীর পরিবারের জমি জায়গা দখল করা পারিবারিক শোষণেরই একটি উদাহরণ।

আবার ভুবনেশ্বরী স্বামী হারানোর বারো বছর পর বৈধব্য ধারণ করলে তার নতুন সধবা অবস্থার শাড়িগুলো নিয়ে যায় ননদ উর্বশী।

> 'তোঁয়ার সুট্‌কেশত্‌ দেইলাম দে বউত্‌ শাড়ি পড়ি রইয়ে। তোঁয়ার তো এখন বিধবার বেশ। ধুতি পরো। রঙিন কাওর পরইন্যা কেউ নাই। তোঁয়ার শাড়িগিন আঁরে দি ফেলাও না।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৮২)

ভুবন শাড়িগুলি রেখেছিল তার স্বামীর স্মৃতি হিসেবে। কিন্তু উর্বশীর এই আচরণে বাধ্য হয়ে পরদিন সে তাকে তিনটি শাড়ি বের করে দিলেও একটি নতুন শাড়ি প্রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়েছে উর্বশী। শুধু তাই নয়, কাউকে কিছু না জানিয়ে যাওয়ার সময় একটা বস্তার মধ্যে পাঁচটা নারকেল, দুটো ভাত রাঁধার সিলভারের বড়ো পাতিল ও দুটো হাঁস বেঁধে নিয়েছে সে।

'জলপুত্র' উপন্যাসে মধুরামের পরিবারে তার স্ত্রী মধুরাম দ্বারা বঞ্চিত ও প্রত্যাখ্যাত হয় বিনা অপরাধে। জানা যায়, মধুরামের পরিবারে অভাব দেখা দিলে সে হরগোবিন্দ বহদ্দারের বাড়িতে গাউর খাটতে যায়। মরসুম শেষে মধুরাম আর উত্তর পতেঙ্গায় ফিরে আসে না। উপন্যাসে দেখি-

> ‘হরগোবিন্দ বহদ্দারের বিধবা মেয়েটিকে সাঙ্গা করে সেখানেই থেকে গেছে। টুনিবউ নাবালক বাচ্চা দুটোকে নিয়ে তার কাছে গেছে। নানা কাকুতিমিনতি করেও মধুরামকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। বাচ্চা দুটোকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে সে ভিক্ষে করতে শুরু করেছে।’ (জলদাস ২০০৮, পৃ.৯৯)

বোঝাই যাচ্ছে, সংসারে অভাব অনটনের সম্মুখীন হয়ে মধুরাম আরো একটু আর্থিক স্বচ্ছলতার আশায় হরগোবিন্দের বাড়িতে গাউরের কাজ করতে গিয়েছিল। কিন্তু ঘরের চার দেওয়ালের বাইরের পরিবেশের প্রভাবে সে স্ত্রী-সন্তানের প্রতি দায়-দায়িত্ব ভুলে গিয়েছে। অন্য একজন স্ত্রীকে ‘সাঙ্গা’ বা বিয়ে করতে তার বাধেনি। টুনি বউয়ের শত অনুরোধেও ফিরে না আসা মধুরাম স্ত্রীর প্রতি বঞ্চনা ও অন্যায় করেছে।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ‘দুখিনি’ গল্পে। গল্পে কিষ্টপদ ও রসবালার দাম্পত্য জীবন সুখের হলেও অভাব দারিদ্র্যে সংসারের আনন্দটুকু ধীরে ধীরে মুছে গিয়েছে। দিনমজুরি দিয়ে সংসার চালানো সম্ভব হচ্ছে না বলে সে বাধ্য হয়ে কুমিরার নকুল বহদ্দারের বাড়িতে গাউর খাটতে যায়। সেখানে নকুল বহদ্দারের বিধবা মেয়ে কেতকিবালাকে সাঙ্গা করে। মধুরামের মতোই সে আর উত্তর পতেঙ্গায় ফিরে আসে না। রসবালা বড়োছেলে মনমোহনের হাত ধরে কিষ্টপদর কাছে গিয়ে শত অনুনয় করলেও সে ফিরে যেতে নারাজ। তার মতে,

> ‘বউত জ্বালাইয়স চোদানির ঝি। এখন যা, তোর লাং অল লই দিন কাডা গই।’ (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ.৪১)

পারিবারিক সমস্যার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল, শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ি ও বৌমার দ্বন্দ্ব ও ঈর্ষা। এই ঈর্ষা একসময় এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে তা অত্যাচার বা শোষণের রূপ গ্রহণ করে। ‘দহনকাল’ উপন্যাসে জানা যায় কৃষ্ণমিলনের স্ত্রী মঙ্গলি বড়ো ভালো মেয়ে। সদ্য বিবাহিত মঙ্গলি শ্বশুরবাড়িতে সকলের মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করে। কিন্তু কৃষ্ণমিলনের মা ঝগড়ুটে স্বভাবের। এর মধ্যে বোনেরা তার মাকে ইন্ধন জোগায়।

> ‘দুই মাসে মা-মেয়েরা মিলে মঙ্গলির জীবনটাকে তছনছ করে ছেড়েছে।’ (জলদাস ২০১০, পৃ. ৪৯)

বউয়ের প্রতি শাশুড়ির অত্যাচার অন্যায়ের ঘটনা 'প্রতিশোধ' গল্পেও লক্ষণীয়। গল্পে দেখা যায়, মাধুরী বাপের বাড়িতে আসার সময় তার শাশুড়ি তাকে দশ দিনের মধ্যে ফিরে আসতে বলে। খারাপ পরিস্থিতির কারণে দশদিনের মধ্যে ফিরতে না পারায় মাধুরীর চরম অপমান করেন শাশুড়ি,

> 'বেয়াক্কেল বেয়াইকে বলছিলাম দশদিনের মাথায় বউয়েরে দিয়া যাবেন, পাত্তা দেন নাই আমারে। আজ সতেরো দিন। কান ধইরা নাকে খত দিতে দিতে ঢুক দুইজনে।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৮৬)

বউয়ের বাপের বাড়িতে কিছুদিন বেশি থাকা সহ্য করতে পারেনি মাধুরীর শাশুড়ি। শুধু তাই নয়, ঘটনাচক্রে জানা যায় মাধুরীর স্বামী বিচিত্রবীর্য ছোটোবেলা থেকেই জুয়াখোর, চরিত্রহীন, চিটিংবাজ ও মাতাল। মাধুরীর বিয়ের সময় বরপক্ষ এইসব কথা চেপে রেখে অন্যের বাড়ির মেয়েকে সারাজীবন কষ্ট সহ্য করতে বাধ্য করার মধ্যে শোষণের চিত্রই ফুটে উঠেছে।

'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসেও সুধাংশু বড়ো মেয়ে ফাল্গুনীর মাধুরীর মতো পরিণতি হয়েছিল। বিয়ের আগে পাত্র সম্পর্কে সেভাবে খোঁজ খবর না নিয়ে শিকলভাঙার অরবিন্দ জলদাসের সঙ্গে বড়ো মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল সুধাংশু। কিন্তু পরে ঘটনাক্রমে সুধাংশু এক দুঃসম্পর্কের পিসি সুশীলার কাছে অরবিন্দর আসল চেহারা ব্যক্ত হয়। জানা যায় 'প্রতিশোধ' গল্পের বিচিত্রবীর্যের মতো সেও জুয়ারি, মদমাতাল ও চরিত্রহীন। অরবিন্দের শাশুড়ি হিসেবে ফাল্গুনীর ওপর নানা অত্যাচার করেছে। অরবিন্দের মা সম্পর্কে সুশীলা পিসির বক্তব্য-

> 'যে বেডির বিয়ার দুই মাসের মইধ্যে বেয়াইয়ের লগে এমুন ভাষায় কথা কইতে পারে, হে পুতের বউয়ের লগে কী বেবহার কইরব বুইঝা লও। ওই দজ্জাল বেডির যন্ত্রণায় টিকতে না পাইরা বড়ো পোলা বউ লইয়া গেরাম ছাড়ছে।'
> (জলদাস ২০১৯, পৃ. ১৭৮)

অন্যদিকে 'আহব ইদানীং' গল্পে দেখা যায়, কালামউদ্দিন নামক একজন মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধকালীন গুরুতর আঘাতে পঙ্গু হয়ে ফেরে বাড়িতে। পঙ্গুত্বের কারণে সে একটা সময়ে পরিবারের সকলের কাছেই গলগ্রহ হয়ে ওঠে। এক দুপুরে খেতে বসে ডালে লবণ কম দেখে কালাম ভাতের থালা ছুড়ে ফেলে। এই ঘটনার জেরে মেজভাই জসিম বেজায় চটে গিয়ে বলে,

> 'তোমার খারাপ ব্যবহার আমরা অনেক সহ্য করেছি, আর না। খাচ্ছ তো মাগনা। আমাদের কামাইয়ের টাকায় পেট পুরাচ্ছ।...আর না। তোমার পথ তুমি দেখ। তোমার সঙ্গে আমরা আর নাই।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২৭২)

প্রসঙ্গত স্মরণীয় 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর অন্যতম সমালোচক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক নিপীড়িত অধীনস্তকেই নিম্নবর্গ বুঝিয়েছেন। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ১৩) সেক্ষেত্রে পঙ্গু একজন ব্যক্তি যিনি শারীরিকভাবে অক্ষম এবং দৈনন্দিন সামগ্রিক কাজে অন্যের সহায়তার প্রয়োজন হয়, সেও একপ্রকার

অন্যের অধীন। অধীনে থাকতে হলে আধিপত্য স্বীকারের বদলে নিজ অস্তিত্ব প্রকাশ করার চেষ্টা করলে, অধিপতি সেখানে তাকে স্বভাববশত দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কোনো ক্ষেত্রে তা বলপ্রয়োগ পর্যন্ত পর্যবসিত হয়।আলোচ্য গল্পে কালামউদ্দিনের পঙ্গুত্ব এ কথাই প্রমাণ করে। তবে শুধু তার ভাইরাই তাকে ত্যাগ করেনি, স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে। সবদিক থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে কোণঠাসা কালাম শেষ পর্যন্ত হুইলচেয়ারে বসে ভিক্ষুক এ পরিণত হয়েছে।

অন্যদিকে 'রামগোলাম' উপন্যাসে শাশুড়ি-বউয়ের দ্বন্দ্বে উল্টো চিত্র দেখা গিয়েছে। দেখা যায়, বান্ডেল পট্টির বাসিন্দা চমনলালের পরিবারে এগারো জনের সদস্য। বাসস্থানের সংকটের কারণে বিবাহযোগ্য পুত্র শক্তিলালের বিয়ে হচ্ছে না। অনেক অসুবিধা সহ্য করে চমনলাল ছেলের বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বউ রাধিকা তাদের সংসারের সুখ নিয়ে আসেনি। কারণ

> 'রাধিকা ঠোঁটকাটা স্বভাবের। নিজের ছাড়া অন্য কারও স্বার্থের বা সুখের কথা ভাবতে সে নারাজ।... প্রথমে ননদিনীদের সঙ্গে খাটাসখুটুস শুরু হয়। মধ্যস্থতা করতে এসে শাশুড়িও খোঁচা খায় রাধিকার। মায়ের অপমানে দেবররা ক্ষেপে যায়। পারিবারিক পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে ওঠে।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ১০১)

পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়, যখন রাধিকা শক্তিলালকে বাড়ি ভাড়া নিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার কথা বলে। শক্তি প্রথমে ইতস্তত বোধ করলেও রাধিকার কূটচালে হার মেনে অন্যত্র চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সকলে আটকানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। বাবা চমনলাল তাকে বোঝায়-

> 'তুমি চলে গেলে সমাজে আমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে।... বউয়ের প্ররোচনায় ভদ্রসমাজে বাসা নিতে চাইছো তুমি?' (জলদাস ২০১২, পৃ. ১০১)

শক্তির উদাসীনতা দেখে চমনলাল রাধিকার কাছে অনুনয় করে। কিন্তু তারা তাদের সিদ্ধান্তে অটল। সাংসারিক কাজকর্ম থেকে মুক্তি পেতে স্বামীকে ভুল বুঝিয়ে মাতা-পিতা পরিবার থেকে পুত্রকে পৃথক করেছে রাধিকা। সেদিক থেকে শক্তিলালকে নিয়ে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করার সিদ্ধান্ত পারিবারিক বঞ্চনাকেই প্রমাণ করেছে।

৪.১.১.৪ সামাজিক অন্যান্য শোষণ ও বঞ্চনা

'কসবি' উপন্যাসে রহিজ পাগলা চরিত্রটি সামাজিক শোষণে প্রাণ হারায়। দেখা যায়, পতিতাপল্লির কালু সর্দার তার মা শৈলবালার কাছে জানতে পারে মোহিনী একজন জেলেনারী। অবৈধ সম্পর্ক প্রকাশ্যে আসায় জেলেপাড়া থেকে উৎখাত হয়ে সে এই পতিতাপল্লিতে আশ্রয় নিয়েছে। একজন জেলেনি কালুকে

তোয়াক্কা করে না—এই ব্যাপারে কালু যথেষ্ট বিরক্ত ও অপমানিত। ফলে সে মোহিনী মাসিকে হেনস্থা করার জন্য পতিতাপল্লির রহিজ পাগলকে ডাকে। খাবারের লোভ দেখিয়ে রহিজকে জাইল্যা, জ্যাইলানি সম্পর্কিত একটি গান শিখিয়ে মোহিনীর বাড়ির সামনে প্রতিদিন গাইতে বলে কালু সর্দার। হীন-দরিদ্র-পঙ্গু রহিজ প্রতিদিন গানের বদলে খাওয়ার পাওয়ার আশায় ওই একই গান গেয়ে যায়। মোহিনীর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তাকে অপমানিত করার জন্য কালু রহিজকে দিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। মোহিনীও দমে থাকার পাত্রী নয়, সে প্রেমদাসকে দিয়ে রহিজ পাগলকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, কেন সে কালুর কথায় এই কাজ করেছে। রহিজ জানায়,

> ‘সর্দার লোভ দেখাইল—দুইবেলা ভাত দেব, মদ দেব। বিনিময়ে শুধু একখান গান গাইবি—জাইল্যা-জাইল্যানির গান। খাওনর লোভে রাজি অইয়া গেলাম। গান গাইতে তো আমার কষ্ট হয় না। খাইতে না পাইলে বড়ো কষ্ট হয় আমার।’
>
> (জলদাস ২০১১, পৃ. ৯৯)

একজন নিঃস্ব, হতদরিদ্র মানুষের ক্ষুধার যন্ত্রণা সুযোগ নেয় মোহিনী মাসিও। রহিজকে দু'বেলা ভাত ও টাকা দেওয়ার বিনিময়ে কালু সর্দারের বাড়ির সামনে চিৎকার করতে বলে। রহিজও বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে শিখিয়ে দেওয়া ছড়া কাটতে থাকে,

> ‘ওই হারামজাদা ইবিলিস, সর্দারের ঘরে সিফিলিস, ঘরের ভিতর যাইস না, পোকা আম খাইস না।’
>
> (জলদাস ২০১১, পৃ. ১০০)

এই কথা শুনে কাস্টমাররা সর্দারের দরজা থেকে সরে যায়। কালুর সমূহ ক্ষতি হয়। ক্রোধে জর্জরিত কালু রহিজ পাগলার খোঁজ করে এবং তিন দিন পর মোহিনী মাসির দরজার সামনে রহিজ পাগলার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

প্রচলিত প্রবাদ আছে যে- ‘রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।’ রহিজ পাগল এক্ষেত্রে উলুখাগড়ায় পরিণত হয়েছে। লক্ষণীয় রহিজ পাগলকে কাজে লাগিয়ে দুই পক্ষের সংগ্রাম ও ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি কিন্তু মাঝখান থেকে নিঃস্ব, হতদরিদ্র ও বিকৃত মস্তিস্কের একজন নিম্নবর্গকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষক বিদ্রোহের প্রসঙ্গে কৃষক চৈতন্যের সম্পর্কে আধিপত্য ও নিম্নবর্গের কথা বলতে গিয়ে বলেন-

> ‘One there by has the means to conceptualize the unity of that consciousness as grounded in a relationship of power, namely, of domination and subordination. Peasant consciousness, then is a contradictory of two aspects: in one, the peasant is subordinate where he accepts the immediate reality of power relations that dominate and exploit him; in the other he denies those conditions of subordination and asserts his autonomy.’ (Chaturvedi (ed.) 2000, p.17-18)

অর্থাৎ কৃষক চৈতন্য হল আধিপত্য ও অধীনতার একটি বিরোধী ঐক্য যার দুটি দিক রয়েছে। একটিতে কৃষক হল একজন অধীনস্ত, যেখানে সে ক্ষমতার সম্পর্কের তাৎক্ষণিক বাস্তবতাকে মেনে নেয় যা তাকে অধীনস্ত ও শোষণ করে এবং অন্যদিকে একজন কৃষক অধীনতার শর্তগুলিকে আস্বীকার করে তার স্বায়ত্ত শাসন দাবি করে।

আলোচ্য উপন্যাসে রহিজ পাগলের ক্ষেত্রে আমরা আধিপত্য ও অধীনতার বিরোধী ঐক্যের প্রথম দিকটিকে লক্ষ করেছি, যেখানে রহিজ একজন অধস্তন নিম্নবর্গ এবং সে সামান্য খাবারের আশায় ক্ষমতার সম্পর্কের তাৎক্ষণিক বাস্তবতাকে মেনে নেয় যা পরবর্তীকালে তার প্রাণ নাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে নিরক্ষরতা বা শিক্ষাহীনতা যে শোষিত শ্রেণির উৎপত্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তা 'কসবি' উপন্যাসে জানা যায়। তাইতো কালু সর্দার এবং দলবল কৈলাসকে পতিতাপল্লির জারজ সন্তানদের শিক্ষিত করে তুলতে বাঁধা দিয়েছে। শিক্ষাকে তারা শত্রু ভাবে, কারণ তারা জানে,

> 'শিক্ষিত মানুষ প্রতিবাদী হয়। অশিক্ষিতদের সহজে শোষণ করা যায়। অশিক্ষিতরা নির্বিরোধী। পতিতার সন্তানরা শিক্ষিত হয়ে উঠলে তারা সচেতন হবে, অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। তখন মাসি-সর্দার-দালাল-মস্তানদের শোষণযন্ত্র বিকল হয়ে পড়বে'। (জলদাস ২০১১, পৃ ১১৩)

ভবিষ্যতে শোষণ যন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কৈলাসকে চিরতরে থামিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করে কালু সর্দাররা। কারণ কৈলাস শুধু ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষিতই করছে না, বরং পতিতাদের মধ্যেও অধিকার বোধ জাগিয়ে তুলেছে। তাই তো ক্ষমতার বলে কালু তার পোষা গুণ্ডাদের দিয়ে কৈলাসকে হত্যা করিয়েছে গোপনে। চার-পাঁচদিন পর কৈলাসের লাশ পাওয়া গিয়েছে পাতকুয়ার মধ্যে। আধিপত্য ও শোষণের মূল একক যে ক্ষমতা তা দেবযানী নামক পতিতা জীবন অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছে। সে কালু সর্দার দ্বারা এই অন্যায়-শোষণের ভবিষ্যৎ আন্দাজ করতে পারে। তার ভাবনায়-

> 'একটা সময় কৈলাস হত্যার হইচই স্তিমিত হয়ে আসবে। কালু টাকা দিয়ে থানা বশ করবে, উকিলদের মুখ বন্ধ করবে, দু'চার ছয় মাস কেটে গেলে কালু আবার এই পতিতাপাড়ায় সাঙাতদের নিয়ে ঘুরবে। ঘরে ঘরে চাঁদা তুলবে, একে তাকে মারবে, ধমকাবে। আর মোহিনী মাসির বাড়ির সামনে এসে ওপর দিকে তাকিয়ে শ্লেষের হাসি হাসবে। তখন মোহিনী মাসির করার কিছুই থাকবে না,...' (জলদাস ২০১১, পৃ ১৬১)

কালু সর্দার এই বেশ্যাপাড়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। তার ইচ্ছাতেই পতিতাপল্লির গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়। শুধু পতিতারাই নয়, মাসি-মস্তানরাও তার হাতে প্রায় প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হয়েছে। নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য হত্যা পর্যন্ত করেছে কালু সর্দার। তাহলে দেখা গেল, ক্ষমতার শৃঙ্খলে সমাজ শ্রেণিবিভাজিত হওয়ার দরুন একপক্ষের কাছে অপরপক্ষকে শোষিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, বঞ্চিত ও

নিপীড়িত হতে হয়েছে। আর এসব সংঘটিত হয়েছে তখনই যখন অপেক্ষাকৃত শক্তিধর ও ক্ষমতাবান ব্যক্তির কাছে অধস্তন ব্যক্তি ক্ষমতার সম্পর্কের তাৎক্ষণিক বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছে।

একই ঘটনা দেখা যায়, 'কুন্তীর বস্ত্রহরণ' উপন্যাসে। আবুল কাশেম চেঙ্গুটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। ইউনিয়ন তার কথায় ওঠে-বসে। অর্থাৎ ক্ষমতার বলে সে তার চারপাশের বলয়কে অধস্তন হিসেবে শাসন ও শোষণ করেছে। জানা যায়, আবুল কাশেমের চোখ পড়েছে কুমোরদের শ্মশানের ওপর।

> 'বড়ো সুন্দর জায়গা। দিনে দিনে কঠিন পরিশ্রম করে কুমোররা কাঁকরির মাটি এনে এনে শবদাহের জায়গাটি ভরাট করেছে। নানা ধরনের গাছ শ্মশানজুড়ে। ...সেগুন গাছই বেশি। শ্মশানের সমস্ত গাছের দাম বর্তমান বাজারমূল্যে কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।
>
> চেয়ারম্যান আবুল কাশেমের খায়েশ হয়েছে—ওই জায়গায় একটা বাগানবাড়ি করবে'।
>
> (জলদাস ২০২০, পৃ. ৯৬)

নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আবুল তার দলবল নিয়ে কুমোরপাড়ায় উপস্থিত হয় এবং কুমোরদের জানায় শ্মশানটি তার খুব পছন্দ, সেখানে সে একটি এবাদতখানা বানাতে চায়। মানুষকে দাহ করার জন্য এত বড়ো জায়গার বদলে অন্য জায়গায় একটি শ্মশান বানিয়ে দিতে চায় সে। আবুলের এই প্রস্তাবে মালো পাড়ার হর্তাকর্তারা চুপ করে থাকে। তাদের চুপ থাকতে দেখে সে বলে-

> 'চুপ থাইকো না তোমরা। ভাবাভাবির দরকার নাই। যা কইলাম, মাইনা নেও, রাজি হইয়া গেলে আখেরে তোমাগোর লাভ। কথা দিতাছি, লাভ ছাড়া লোকসান অইব না তোমাগো'। (জলদাস ২০২০, পৃ. ৯৮)

আবুল কাশেমের শাসন-ক্ষমতা ও অনুরোধের মিশেলে তৈরি প্রস্তাবটি আমাদের গ্রামশি কথিত 'হেজেমনি'-র কথা স্মরণ করায়। ইতিপূর্বে প্রথম অধ্যায়ে (বিস্তারিত আলোচনা, পৃ. ১৭-২১) আমরা জেনেছি- আধিপত্যের মূল কথা হল—শক্তি প্রয়োগ না করে সম্মতি আদায়ের মধ্য দিয়ে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা। এক্ষেত্রে আবুল কাশেম মিশেল ফুকোর ক্ষমতায়নের ভিত্তিতে 'Love of the master' (প্রভুর ভালোবাসা) প্রদর্শন করতে চেয়েছেন প্রাথমিকভাবে। কারণ আধিপত্যের অর্থ সরাসরি বল প্রয়োগ করা নয় বরং অধস্তনদের সর্বসম্মতি আদায় করা হয় এমনভাবে যাতে মনে হয়, তাদের ভালোর জন্যই একাজ করা হচ্ছে বা হবে। ফুকোর মতে এটি ক্ষমতা প্রয়োগ করার কৌশল মাত্র। আলোচ্য গল্পেও আবুল কাশেম অন্য একটি শ্মশান গড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং কুমোরদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে এই বলে যে, লাভ ছাড়া তাদের লোকসান হবে না। পূর্বপুরুষের বহু প্রাচীন ঐতিহ্যময় শ্মশান ছেড়ে দিলে তাদের কোনো লোকসান হবে না—এই কথাটির আড়ালে আসলে আধিপত্যকেই নির্দেশ করছে। কিন্তু এই আধিপত্য ও

অধীনতার বিরোধী ঐক্যের মধ্যে নিম্নবর্গ যখন অধীনতার শর্ত অস্বীকার করে স্বায়ত্তশাসন দাবি করে তখন নিম্নবর্গের মধ্যে প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। কুমোরদের সমাজের প্রধানরা যখন অধীনতা মেনে নিয়ে নিশ্চুপ তখন অধীনতার শর্ত লঙ্ঘন করে কুন্তী প্রতিবাদ করে উঠেছে। আর ঠিক সেই সময়ে আধিপত্যের ভিত্তিতে আবুল কাশেম তার দলবলের সাহায্য নিয়ে কুমোরদের ওপর শক্তি প্রদর্শন করেছে।

...ফখরে আলমরা কুমোর-কৈবর্তদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এত কিরিচ, এত রামদা, এত বল্লম, এত লাঠিসোঁটা কোথায় ছিল কে জানে! আক্রমণকারীদের হাতে হাতে মারণাস্ত্র'। (জলদাস ২০২০, পৃ. ১১৮)

দেখা গেল, আবুলদের আক্রমণে কুমোর-কৈবর্তরা কেউ কেউ পালিয়ে বাঁচল। শহীদুল কুন্তীর শাড়ি খুলে ফেললে সম্মান বাঁচানোর জন্য নিরূপায় কুন্তী কাঁকরি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অন্যদিকে 'সুখলতার ঘর নেই' উপন্যাসটিতে মৎস্য সমাজের আড়ালে মানব সমাজের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। যেখানে দেখা যায় জেলে-মেথর-পতিতা সমাজের মতোই মৎস্য সমাজেও সর্দার রয়েছে। এই সর্দারের হাতেই সমগ্র গ্রামের দায়ভার। ক্ষমতার লোভে পঞ্চু তার পিতা বিনোদকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করিয়ে নিজে সর্দারের পদ ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। উপন্যাসে জানা যায়, পঞ্চুর আমলে জলধি গ্রামের মৎস্য সমাজে মাৎসান্যায় শুরু হয়। কারণ,

'সর্দার হয়েই পঞ্চু শাসনের সঙ্গে শোষণকে যুক্ত করল। সে কোনো নিয়ম-প্রথার তোয়াক্কা করল না। সততা আর সুবিচার তার কাছে উপেক্ষিত হলো।... পঞ্চু সেখানে প্রতিষ্ঠা করল পেশিশক্তির রাজত্ব। সে একটি মাস্তান দল তৈরি করল। মাস্তান দলের নিপীড়নে গোটা গাঁয়ের মাছেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল'। (জলদাস ২০১৯(খ), পৃ.১৮)

লক্ষণীয় পেশি শক্তির রাজত্ব অর্থাৎ ক্ষমতার ভিত্তিতে শাসন। সেই ক্ষমতা একক কোনো ব্যক্তির নয়, তা সমষ্টিগত। কারণ পঞ্চু জলধি গ্রামের সর্দার নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পদমর্যাদা ও পদের ক্ষমতার আসক্তিতে চারপাশ থেকে সে কিছু শক্তিশালী কর্মঠ মাছেদের নিয়ে একটি মস্তান দল তৈরি করার সুযোগ পেয়েছে। যার দ্বারা সে মৎস্য সমাজে আধিপত্য বা হেজেমনি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এই আধিপত্য সৃষ্টির পর জলতলের সমাজে বিশ্বাসঘাতকতা, অপমান, লাঞ্ছনা, নারী অপহরণ, শোষণ-বঞ্চনার মাত্রা বৃদ্ধি পায় স্বাভাবিকভাবেই। আমরা জানি সুশাসনের মূল ভিত্তি নিরপেক্ষতা। অন্যদিকে পক্ষপাতিত্বের শাসনে প্রদর্শিত হয় আধিপত্যের জোর, যা একই সঙ্গে কুশাসনকেও প্রদর্শন করে এবং পরবর্তীকালে তা শোষণ বঞ্চনায় পরিণত হয়। আলোচ্য উপন্যাসে তাই পঞ্চুর স্ত্রী যমুনা তার ছেলে জগাইকে তার হতাশার কথা বলতে গিয়ে বলেছে-

'তোর বাপ সরদারিটা ভালা চালাইতেছে না। বিচার করে নাকি পক্ষ টাইনা। অসহায় মাছেরা সুবিচার থেইকে বঞ্চিত হয়'। (জলদাস ২০১৯(খ), পৃ. ৫১)

সুবিচার থেকে বঞ্চিত হওয়া প্রজারা প্রশাসনের কাছে এইভাবে শোষিত হয়েছে। গ্রামশি নাগরিক সমাজকে চালনা করার জন্য যে হেজেমনি বা আধিপত্যের কথা বলেছিলেন সেখানে তাঁর বক্তব্যের মূল ভিত্তি ছিল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। তাঁর মতে-

'…the supremacy of a social group or class manifests itself in two different ways: 'domination' (dominio) or coercion, and 'intellectual and moral leadership'… This latter type of supremacy constitutes hegemony. Social control, in other words. Such 'internal control' is based on hegemony." (Jesph 1981, p. 24)

অর্থাৎ সামাজিক প্রভাব বিস্তারের দুটি পথ হল—এক, আধিপত্য বা ডোমিনেশন এবং দুই, জবরদস্তি করা, বাধ্য করা বা ভয় দেখান। দেখা গেল সামাজিক প্রভাব বিস্তারকারী কোনো মানুষ যখন দ্বিতীয় পন্থা অর্থাৎ জোর করা, বাধ্য করা বা ভয় দেখানর পথ অবলম্বন করে, তখন সেখানে সাধারণ নাগরিক বা মানুষ শোষিত হয়। হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে সামাজিক শোষণের যে রূপ আমরা দেখলাম তা আসলে সামাজিক আধিপত্য বিস্তারে গ্রামশি কথিত দ্বিতীয় পন্থার অনুসরণকারী যেখানে ক্ষমতা একটি বিশিষ্ট ভিত্তি রূপে কাজ করেছে।

৪.১.২ অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা

সমাজ অন্তর্ভুক্ত মানুষ অর্থনৈতিকভাবে প্রতিনিয়ত কীভাবে শোষিত ও বঞ্চিত হচ্ছে তার বিস্তৃত আলোচনা করার আগে অর্থনীতি সম্পর্কে মার্কসের সমাজ অভিব্যক্তিগুলিকে দেখে নিতে হয়। মার্কসের সমাজ চিন্তায় শ্রেণি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কার্ল মার্কসের সামাজিক অভিব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করতে গেলে দুটি বিষয় প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে—এক. উৎপাদন ব্যবস্থা এবং দুই. উৎপাদন ব্যবস্থা উদ্ভূত নানা পারস্পরিক সম্পর্ক। আসলে কোনো বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থায় যে শ্রেণির কাছে উৎপাদনের মালিকানা থাকে সেই শ্রেণি অন্যান্য শ্রেণির ওপর প্রভূত্ব বিস্তারে সক্ষম হয়। অন্যদিকে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন হলে সামাজিক সম্পদেরও পরিবর্তন হয়। ফলে উৎপাদনের মালিকানারও পরিবর্তন ঘটে। এক্ষেত্রে শ্রেণিতে শ্রেণিতে স্বার্থ সংঘাতের ফলে বিরোধী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কার্ল মার্কস পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় প্রধানত তিনটি শ্রেণির উল্লেখ করেছেন। i. ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া—যারা পুঁজির নিয়ন্ত্রক ii. ভূস্বামী—যারা ভূমি বা জমির স্বত্বাধিকারী এবং iii. শ্রমিক শ্রেণি—উৎপাদন কার্যে প্রয়োজনীয় শ্রম সরবরাহ করে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই তিন শ্রেণির উৎপাদকের উপস্থিতি ব্যাহত হলে উৎপাদন প্রক্রিয়াও ব্যাহত হয়। কিন্তু মার্কসের মতে

পুঁজিবাদী শ্রেণির সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণির সম্পর্ক আসলে বিরোধী সম্পর্ক, অর্থাৎ শোষক-শোষিতের সম্পর্ক। কারণ পুঁজিবাদীরা মুনাফা হিসেবে শ্রমিকের শ্রমকে উদ্বৃত্ত হিসেবে শোষণ করে। সুতরাং শোষণের উপর ভিত্তি করে পুঁজিবাদী কাঠামো গড়ে ওঠার অবকাশ পায়। (কর ১৯৬৫, পৃ. ১১৩)

পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামো শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের রূপান্তর ঘটেছে সমাজের সর্বস্তরে। শুধুমাত্র অর্থের জোরে ক্ষমতায়নকে কুক্ষিগত করা এবং তা জনসাধারণের ওপর প্রয়োগ করার অর্থ শাসন করা হলেও শোষণ নয়। শোষণ ও বঞ্চনার রূপ প্রকাশিত হয় তখনই যখন সমাজে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পুঁজির মালিক ক্ষমতার জোরে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে—তা সে বল প্রয়োগ করেই হোক বা বুদ্ধি প্রয়োগ করে। হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে বর্ণিত নিম্নবর্গীয় সমাজের ক্ষেত্রেও এ ধরনের অর্থনৈতিক শোষণ বঞ্চনার প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে।

আসলে সমাজ গঠন প্রক্রিয়ার পরবর্তীকালে দাসপ্রথা-ভূমিদাসপ্রথা-সামন্তপ্রথা থেকে পুঁজিবাদী বা বুর্জোয়া শ্রেণির উৎপত্তি হওয়া পর্যন্ত সমাজ তিনটি স্তরে বিভক্ত হয়ে আছে আজও। অর্থাৎ একদিকে শাসকবর্গের শাসন-শোষণ, অন্যদিকে শাসকবর্গকে সহায়তা প্রদানকারী মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি। এই দুটোর মাঝে আবহমান কাল ধরে পিষ্ট হয়ে আসছে নিম্নবর্গ। ত্রিস্তরীয় এই সমাজ বিন্যাসর মধ্যে রয়েছে সামাজিক ক্ষমতার বিন্যাস, প্রতিষ্ঠা, প্রভুত্ব, এবং পুনরাবর্তনের প্রক্রিয়া। লক্ষণীয়, উৎপাদক শ্রেণি হিসেবে নিম্নবর্গীয় মানুষের শ্রম শোষণ যন্ত্রে নিষ্পেষিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। নিম্নবর্গের মধ্যে যেমন আছে অন্ত্যজ, দলিত শ্রমজীবী মানুষ এবং অন্যদিকে আছে জীবিকাহীন অতিদরিদ্র মানুষেরাও। সেক্ষেত্রে নিম্নবর্গীয় সমাজ একটি বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার স্বরূপ। কিন্তু সেখানেও ক্ষমতার শৃঙ্খলায় নানাবিধ শ্রেণিবিভাজন রয়েছে। জাতিগত উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ, বর্ণভেদ, শিক্ষিত অশিক্ষিতর মধ্যে ভেদাভেদ ও সর্বোপরি অর্থ ও ক্ষমতার ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাজন। নিম্নবর্গীয় সমাজে বসবাসকারী একজন নিম্নবর্গের মানুষ আলোচ্য শ্রেণিবিন্যাসের ফলে আরো কোণঠাসা ও শোষিত হয়েছে। সমালোচক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর ‘Can the subaltern speak?’ প্রবন্ধে রণজিৎ গুহের ‘এলিট’ ও ‘সাবঅলটার্ন ’ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ক্ষমতা ও আধিপত্যের ভিত্তিতে সমাজ কাঠামোকে তিনটি স্তরে সাজিয়েছেন এভাবে,

ELITE : 1. Dominant foreign groups.
2. Dominant indigenous groups on the all-India level.
3. Dominant indigenous groups at the regional and local levels.
4. The terms “people” and “subaltern classes” have been used as synonymous throughout this note. The social groups and elements included in this category represent the demographic difference between the total Indian population and all those whom we have described as the “elite.”

(Morris (ed.) 2010 p. 253)

হরিশংকরের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় সমাজ যেভাবে চিত্রায়িত হয়েছে সেখানে উপরিউক্ত সমাজ কাঠামোকে সরাসরি সেভাবে লক্ষ করা না গেলেও অপেক্ষাকৃত অধস্তনের সঙ্গে ক্ষমতার ভিত্তিতে এক ধরনের শ্রেণিবিন্যাস সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, কথাবিশ্বে জেলেসমাজ সম্পর্কে জানা যায়, জেলেদের জনবলের অভাব নেই। অভাব শুধু টাকার। বেশিরভাগ জেলে অত্যন্ত গরীব ইতিপূর্বেই জেলেদের পেশা ও উপার্জনের ভিত্তিতে জেলে সমাজ শ্রেণি বিভাজিত। সচ্ছল জেলেদের নিজস্ব নৌকা- জাল আছে। এরা সমাজের বহদ্দার। এদের মধ্য থেকেই সমাজের সর্দার নির্বাচিত হয়। বহদ্দারদের নৌকা সহায়ক হিসেবে কাজ করা জেলেদের বলা হয় পাউন্যা নাইয়া এবং এর নিচুস্তরের রয়েছে ছোটো মাপের জাল সম্বলিত সাধারণ জেলে ও বিয়ারিয়া। অর্থাৎ জেলের সমাজও শাসকবর্গ-সহায়কবর্গ ও নিম্নবর্গ এই তিন শ্রেণিতে বিভাজিত। ফলে এক্ষেত্রে শোষণের প্রকৃতি অর্থনৈতিক ভিত্তিক।

৪.১.২.১ ঋণজনিত শোষণ-বঞ্চনা

'জলপুত্র' উপন্যাসে দেখি উত্তরপতেঙ্গা গ্রামের জেলেপাড়ায় দশজন বহদ্দার রয়েছে। এদের মধ্যে বিজনবিহারী, পূর্ণচন্দ্র, কামিনীমোহন, রামনারায়ণ নামকরা বহদ্দার। যদিও জেলেপাড়ার অন্যান্য জেলেরা সব বহদ্দারকে সমানভাবে পছন্দ করে না। দু-একজন ছাড়া অধিকাংশ বহদ্দার মাছ মারার মরশুমে শুধু নিজেদের স্বার্থ দেখে। আর ওই স্বার্থসিদ্ধির থেকে শোষণ-বঞ্চনার সূচনা হয়। দেখা যায়, বহদ্দাররা নিজেদের নৌকার সহায়ক হিসেবে পাউন্যা নাইয়াকে ব্যবহার করে। এই ব্যবহার করার নামে চলে শোষণপ্রক্রিয়া। আধিপত্যের ভিত্তিতে বহদ্দাররা বাইরে থেকে এ-সত্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে যে- তারা পাউন্যা নাইয়ার মঙ্গলার্থে নানা সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু আড়ালে রয়েছে নানা ছলচাতুরী।

> 'তাদের খাটিয়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে এরা। এরকম স্বার্থসন্ধানী, লোভী বহদ্দারদের একজন বিজনবিহারী। তার নৌকায় পাউন্যা উঠতে তাই অনেকে নারাজ। ওর নৌকায় পাউন্যা উঠলে লাভের আশা দূরে থাক, বিরাট আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে'। (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৪৩)

জেলেসমাজের মধ্য থেকে সাধারণ ও পাউন্যা জেলেরা বহদ্দারের দ্বারা শোষিত হয়েছে এবং বহদ্দাররাও শোষিত হয়েছে দাদনদারদের হাতে। আমরা পূর্বেই দেখেছি জেলেদের মাছ ধরার কাজে জনবলের পাশাপাশি অর্থবলেরও প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে নিজস্ব জাল-নৌকা সম্বলিত জেলেরা অর্থাৎ বহদ্দাররা মাছমারার মরশুমে নৌকা- জাল ও অন্যান্য সামগ্রী কেনার জন্য সবসময় নিজেদের সঞ্চিত অর্থ যথেষ্ট হয় না। তখন বাধ্য হয়ে তারা দাদনদারদের কাছ থেকে অর্থ ঋণ নেয়। উপন্যাসে উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের

জেলেপাড়ায় দাদনের ব্যবসা আব্দুস শুক্কুর ও শশিভূষণ রায় নামক দুজন ব্যক্তি কুক্ষিগত করে রেখেছে। জানা যায়, এই দুজন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে দাদন নেওয়ার উপায় নেই জেলেদের। কারণ কেউ দাদন দিতে চাইলেও শুক্কুর ও শশিভূষণের কূটকৌশলে তারা দাদনের ব্যবসা থেকে সরে গিয়েছে। দাদনের নামে নানা ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে তারা অশিক্ষিত জেলেদের বংশানুক্রমে ঠকিয়ে শোষণ ও বঞ্চনা করেছে। 'জলপুত্র' উপন্যাসে জানা যায়,

'দুটো শর্তে এরা জেলেদের ঋণ দেয়। মাসিক শতকরা দশ টাকা সুদে যত মাছ ধরা পড়বে, তার সবই দাদনদারের দামে তাদেরই কাছে বিক্রি করতে হবে। জেলেরা নিরুপায়। দু'একটা পরিবার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ধার-উধার করে মাছ ধরার ব্যবসায়ে নামলেও অধিকাংশ শুক্কুর- শশির ফাঁদে জড়িয়ে যায়। আর একবার তাদের কাছ থেকে যারা ঋণ নেয়, তারা বংশানুক্রমে সেই ঋণ থেকে মুক্তি পায় না।' (জলদাস ২০০৮, পৃ.৪২)

উত্তর পতেঙ্গার কামিনী বহদ্দার প্রত্যেক বছরের মতো শুক্কুরের কাছ থেকে দাদন নিয়েছে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার বাজারদরে কামিনীর কাছ থেকে মাছ কেনার কথা। কিন্তু শুক্কুর জলের দামে সেই মাছ কামিনীর কাছ থেকে কিনতে চাইলে কামিনী এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি ও বচসার জেরে শুক্কুর কামিনী বহদ্দারকে চড় মারে। উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে,

'খানকির পোয়া, ডোমর বাইচ্যা, টিয়া লইতর সমত্ হুঁশ নো আছিল? আব্বারে মাছ দওনর কথা ভুলি গেইয়চ দে না?'
(জলদাস ২০০৮, পৃ. ৫২)

লক্ষণীয় 'আব্বারে' শব্দ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে অর্থ ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশিত হয়েছে শুক্কুরের মধ্যে। 'আই যেই রইম্যা দাম দিয়ম, হেই দামে বেচিবি দে'- হুমকির মধ্য দিয়ে শুক্কুরের বল প্রয়োগ ও শোষণের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু শশিভূষণ দাদনদারের চরিত্রটি অন্যরকম। সে নাগরিক সমাজের বুদ্ধিজীবীদের মতো। শুক্কুর-শশিভূষণের আধিপত্য বিস্তারের দুই পৃথক অভিমুখ। শুক্কুর স্বার্থসিদ্ধি করতে চেয়েছে বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে। কিন্তু শশিভূষণ কৌশল প্রয়োগ করে জেলেদের সম্মতি আদায় করতে সচেষ্ট। তাইতো শুক্কুর কামিনীকে চড় মারলে জেলেদের উত্তেজনাকে কৌশলে থামিয়ে দিয়েছে সে।

"শুক্কুর মিয়া, তুঁই ই'ন কিইল্যা? জাইল্যার গাআত্ হাত! ঠিক নো গর। হিতারার কারণে আঁরার বেবসা। তুঁই হিতারারে অপমান গরি পাপের কাম গইয্যো' বলতে বলতে কামিনীর গায়ে ও মাথায় হাত বুলাতে লাগল ষটোত্তর শশিভূষণ"
(জলদাস ২০০৮, পৃ.৫৩)

জেলেদের বেদনার সঙ্গে সমবেদনা পোষণ করে শশিভূষণ শুক্কুরের হয়ে জেলেদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয় তৎক্ষণাৎ। শশিভূষণের এই কুটকৌশল আর কেউ না বুঝলেও শুক্কুর বুঝতে পারে-

'...এটা শশিভূষণ মহাজনের চাল। জেলেদের না ক্ষেপিয়ে শোষণ করার চালটি বুঝতে তার দেরি হল না।'

(জলদাস ২০০৮, পৃ.৫৩)

উপন্যাসে দেখি, দাদনদাররা ইলিশের মরশুমকে কেন্দ্র করে টাকা লগ্নি করে এবং তাদের শোষণ প্রক্রিয়াকে সচল করে। ইলিশের মরশুম শেষ হলে তারা জেলেদের সঙ্গে হিসেব-নিকেশ করতে বসে। আর স্বাভাবিকভাবেই সেই হিসেবে থাকে প্রচুর গোঁজামিল, অশিক্ষিত জেলেদের সঙ্গে ছলচাতুরি করার জন্য গোঁজামিলের মতো নিরাপদ ও সুবিধাজনক পথ দ্বিতীয় নেই দাদনদারদের কাছে। দেখা যায়, মরশুমের সময় তারা জেলেদের সব 'জোআ'র টাকা পরিশোধ করে না। বরং জেলেদের বলে যে হিসেব খাতায় লেখা আছে। সহজ-সরল জেলেরা তাদের কথায় আস্থা রাখে, কিন্তু মরশুম শেষে জেলেদের হিসেবের সঙ্গে দাদনদারদের হিসেবের বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। জেলেদের মুখের হিসেবের মূল্য দেয় না তারা, বরং তাদের গোঁজামিল দেওয়া হিসেবের খাতা জেলেদের সামনে তুলে ধরে দাদনদারেরা। তখন নিরুপায় জেলেরা নিজেদের অশিক্ষিত ভেবে দাদনদারদের কথা বিশ্বাস করে। 'জলপুত্র' উপন্যাস দেখা যায় রফিকের চায়ের দোকানে এবছরের জেলেদের সঙ্গে হিসেব নিয়ে বসে শুক্কুর ও শশিভূষণ। জেলেদের চোখে মুখে চাপা আনন্দ, কারণ এবার তারা ঋণ অনুযায়ী প্রচুর মাছ দিয়েছে দাদনদারদের। ফলে ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার দিন আজ। কিন্তু হিসেবের খাতা প্রকাশ্যে এলে দেখা যায়- মহিম পাউন্যা নাইয়া শশিভূষণের কাছ থেকে তিনহাজার টাকা দাদন স্বরূপ নিলেও মাছের দাম অনুযায়ী তা শোধ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু শশিভূষণের গোঁজামিল হিসেব অনুযায়ী মহিম তাকে দুই হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকার মাছ দিয়েছে। ফলে আরো আড়াইশ টাকা মহিমের কাছে পাওনা দাবি করে শশিভূষণ। আসল হিসেব অনুযায়ী মহিমের সম্পূর্ণ টাকা শোধ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু আরো আড়াই'শ টাকা ঋণ অবশিষ্ট শুনে অবাক মহিম অসহায় বোধ করে। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই বাড়তি আড়াই'শ টাকা শশিভূষণ মহিমকে ঠকিয়ে নিতে চেয়েছে। মহিম হিসেবে সন্দেহ প্রকাশ করলে, তাকে থামানোর জন্য শশিভূষণ পূর্বাপর কৌশলে জেলেদের সমর্থন ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য বলে ওঠে,

> 'তোঁয়ারা হইয়ো যে আঁরার আত্মার আত্মীয়। জাত আলাদা হইলে কি অইবো। বিয়ানে উডিবার সময় একজন আরেকজনের মুখ দেখি, হেই মাইন্ষেরে ফাঁকি দিলে ঈশ্বর মাফ না গরিবো। তোঁয়ারা আঁরার উওদ্দি বিশ্বাস রাখ। তোঁয়ারারে আঁরা কনোদিন ঠগাইতাম নো'। (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৯০)

স্বাভাবিকভাবেই সরল জেলেদের কাছে শশিভূষণের এই কৌশল সফল হয়। অন্যান্য ঋণগ্রহীতারা বিনা প্রতিবাদ ও সন্দেহে শশিভূষণের কাজ থেকে হিসেব বুঝে নেয়। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হয় কামিনী বহদ্দারের সঙ্গে শুক্কুর মহাজনের। কারণ হিসেব অনুযায়ী কামিনীর ঋণ ও মাছের দাম সমান-সমান। কিন্তু কামিনী বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে দয়াল মাস্টারের কাছে প্রতিদিনের মাছের হিসেবে রেখেছে। সেই খাতার হিসেব

অনুযায়ী কামিনী উল্টে শুক্কুরের কাছে দেড় হাজার টাকা পায়। শুক্কুর ভেবেছিল প্রতিবছরের মতো এবারও মিথ্যে হিসেব দিয়ে পার পেয়ে যাবে- কিন্তু কামিনী হিসেবে রাখার পদক্ষেপে শুক্কুর ফেঁসে গিয়েছে।

> ‘দুটি খাতা পরীক্ষার পর দেখা গেল, কামিনীর খাতাই ঠিক। শুক্কুর তার খাতায় টাকার সংখ্যা ঠিকই লিখেছে। কিন্তু যোগফল লিখে রেখেছে কম। অন্যান্য বছরের মতো এবছরও সে ভেবেছিল মিথ্যে হিসেব দিয়ে পার পেয়ে যাবে।’
>
> (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৯১)

সেখানে উপস্থিত জেলেরা বুঝে যায়, এতদিন ধরে দাদনদারেরা তাদের কতটা ক্ষতি করেছে। ফলে নিজেদের শোষিত বঞ্চিত হতে দেখে জেলেরা ঠিক করে তারা কেউ আর শুক্কুর-শশিভূষণের কাছ থেকে দাদন নেবে না। জেলেদের এই পদক্ষেপে দাদনকারীরা জেলেদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য কূটকৌশল প্রয়োগ করেছে। এতদিন তারা টাকা নয়-ছয় করে জেলেদের ঠকিয়েছে। এবার তারা জেলেদের অন্ন যোগাবার রাস্তায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তারা প্রতিবেশী অঞ্চল সন্দ্বীপ থেকে মুসলমান মাছমারাদের ভাড়া করে এনে সমুদ্রে জেলেদের নির্ধারিত স্থানে জাল পাতে। ফলে-

> ‘জেলেপাড়া হইচই পড়ে গেল। এতদিন সমুদ্রটা তাদের এক্তিয়ারে ছিল। আজকে ভাগ বসাচ্ছে শুক্কুর ও শশিভূষণ। এক অজানা আশঙ্কায় জলদাসদের বুক কেঁপে উঠল।’ (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১২২)

এই অন্যায়-বঞ্চনার প্রতিকার খুঁজে পেতে জেলেরা একত্রিত হয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আফজালুর রহমান চৌধুরীর কাছে গেলে সে তাদের এই বিপদ থেকে বাঁচাতে অক্ষম বলে জানান। জেলেরা অসহায় ও নিরুপায় হয়ে ফিরে এলেও গঙ্গার নেতৃত্বে শুক্কুর-শশিভূষণকে মারার পরিকল্পনা করে তারা। এই খবর দাদনদারদের কাছে পৌঁছালে শুক্কুর-শশিভূষণ জেলেদের পরিকল্পনার মাথা গঙ্গাকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার সংকল্প করে। গঙ্গাকে রাতের অন্ধকারে গোপনে হত্যা করায় শুক্কুর-শশিভূষণ। ক্ষমতার সামনে এভাবেই গঙ্গারা মৃত্যুর মুখে পতিত হয়।

সুতরাং দেখা গেল, উচ্চবর্গ তাদের আধিপত্য ও প্রভুত্বকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যেমন সকলের সম্মতি আদায়ের জন্য কৌশল প্রয়োগ করে, তেমনই প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করে নিজেদের বাধাকে উচ্ছেদও করে।

৪.১.২.২ শ্রমজনিত আর্থিক শোষণ ও বঞ্চনা

‘জলপুত্র’ উপন্যাসে দেখি বহদ্দারদের পাশাপাশি দাদনদারদের শোষণ চিত্র। কিন্তু ‘দহনকাল’ উপন্যাসে বহদ্দারদের সাধারণ জেলেদের প্রতি শোষণ-বঞ্চনা চিত্রটি স্পষ্ট। উপন্যাসে রাধানাথ পাউন্যা নাইয়া হিসেবে রমণী বহদ্দারের নৌকায় সহকারী হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু রমণীমোহন

রাধানাথের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তাকে বঞ্চনা করেছে। জেলে সমাজের অলিখিত অথচ অলঙ্ঘনীয় শর্ত হল- বহদ্দারের একটি জলের মাছ তোলার পর পাউন্যা নাইয়ার জাল থেকে মাছ ধরতে হবে। তারপরে বহদ্দারের অন্য জাল থেকে মাছ ধরতে পাউন্যা নাইয়ারা সাহায্য করবে। এছাড়াও নিয়ম অনুযায়ী বহদ্দারের তিনটি ও পাউন্যা নাইয়ার একটি বিহিন্দিজাল বসানোর অধিকার আছে। কিন্তু রাধানাথ পাউন্যা হিসেবে প্রথম বলে রমণীমোহন উল্লেখিত নিয়ম ও শর্ত মানেনি। সে সম্পূর্ণ অনৈতিক শর্ত আরোপ করে।

'বহদ্দার শর্ত দিল—জোআর সময় প্রথমে তার সব জাল থেকে মাছ তোলা হবে, সময় থাকলে তারপর রাধানাথের জাল থেকে'। (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৮)

এটি সম্পূর্ণ অনৈতিক জেনেও রাধানাথ রাজি হয়। সে জানে পাউন্যা নাইয়া হিসেবে সে নতুন বলে প্রচলিত নিয়ম ভেঙে রমণীমোহন তাকে এই অসম শর্তটি দিয়েছে। রাধানাথের শ্রমকে রমণীমোহন বিনা পারিশ্রমিকে কাজে লাগায়। শুধু রমণীমোহন নয়, রাধানাথ যখন অন্নচরণের পাউন্যা নাইয়া হিসেবে কাজ করতে যায়,সেই সময় অন্নচরণও প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করেছে।

'কিন্তু অন্নচরণ সবসময় এ নিয়ম মানে না। জালে মাছ যখন বেশি পড়ে, তখন নিয়মকানুনের ধার ধারে না বহদ্দার।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৩৩)

নিয়ম ভেঙে মাছ ধরার ফলে বহদ্দাররা নৌকা ভর্তি মাছ নিয়ে ফেরে। রাধানাথের মতো পাউন্যা নাইয়ারা ফেরে শূন্য হাতে। এই বঞ্চনা ও শোষণের পরেও রাধানাথরা কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না। বহদ্দারদের এই অত্যাচার ও বঞ্চনা তারা মুখ বুজে সহ্য করে। এমন নয় যে তাদের প্রতিবাদের ভাষা জানা নেই, কিন্তু প্রতিবাদ করলে বিপদ নেমে আসে পউন্যাদের ওপর। এ ব্যাপারে জেলে সমাজের বহদ্দাররা এককাট্টা। প্রতিবাদের শাস্তি হিসেবে বহদ্দাররা তাদের গোঁজ পোঁতার সময় বিত্ত দেয় না। আসলে একটি নৌকা দিয়ে গোঁজ পোঁতা যায়না। দুটো নৌকার প্রয়োজন হয়। আর এই সুযোগই নেয় বহদ্দাররা। নৌকা ধার চাইতে গেলে তারা নানা অজুহাতে নৌকা দিতে মানা করে দেয়। পাউন্যা নাইয়াদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এটা বহদ্দারদের চাল- তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এই কৌশল। তাই বহদ্দারদের শোষণ বঞ্চনার প্রতিবাদ করলে তাদের অসহযোগিতা সাধারণ জেলেদের জীবনকে জেরবার করে তোলে।

এরকম ঘটনারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় নিকুঞ্জ বহদ্দারের ক্ষেত্রে। নিকুঞ্জ উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের জেলেপাড়ার প্রভাবশালী বহদ্দার এবং পাঁচজন সর্দারের একজন। পরিমল তার নৌকার পাউন্যা নাইয়া। এই পরিমলই বাধ্য হয়ে তার বিরুদ্ধে সালিশ ডাকে। তার অভিযোগ-

'নিকুঞ্জ কাকারে বউত্ বিনয় গইল্লাম গোঁজ গাড়ি দিবাল্লাই। তাঁই কনো পাত্তা নো দিল, হাত-পা ধরি অনুরোধ গইল্লাম, তাঁই নো হুইন্‌লো। কইলো—সামনর জো যাউক গই। পরে দেখা যাইবো। গত এক জো আঁই জাল বোয়াইত্ নো-পারি। পোয়া-ছা লই হুয়াই মরির। গত রাতিয়া আঁর ঘরত্ চুলা নো—জ্বলে'। (জলদাস ২০১০, পৃ. ৯৪)

পরিমলকে গোঁজ পুঁততে সাহায্য না করার মধ্যে বঞ্চনার চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বহদ্দারের কাছ থেকে সাহায্য না পেয়ে পেটের জ্বালায় পরিমল সাহসের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু নিকুঞ্জের মধ্যে কোনো ভাবান্তর নেই। ক্ষমতা ও অর্থের দম্ভে সে পরিমলের মতো সাধারণ জেলের দুঃসাহস দেখে স্তম্ভিত। তাইতো সে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলে–

'পাউন্যা নাইয়া মানে আঁর পইরর মাছ। আঁই যেএন গরি চালাইয়ম হেএন গরি চলিবো। গোঁজ হাঁইয়্যে, সময়মতো গাড়ি দিয়ম। আঁল্লাই সালিশ!' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৯৪)

নিকুঞ্জের এই কথায় রাধানাথ প্রতিবাদ করে বলে,পাউন্যা তার গোলাম নয়, পাউন্যা নাইয়া বহদ্দারের সহকারী। তার সুখ দুঃখে বহদ্দার এগিয়ে আসবে- সেটাই জেলে সমাজের নিয়ম। রাধানাথের কথায় সমবেত জেলেরা সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে এবং নিকুঞ্জের অন্যায় বঞ্চনার বিরুদ্ধতা করে। নিকুঞ্জ দশজনের রায় মেনে নিলেও তার সমস্ত ক্ষোভ গিয়ে পড়ে রাধানাথের ওপর। সভার মাঝখানেই নিকুঞ্জ তাই রাধানাথকে হুমকি দেয়,

'রাধানাইথ্যা, তইলে তুই বউত্ কাবিল অই উঠ্যস। লিডার হইয়স। ভালা ভালা। চোখ-কান খোলা রাইস'।

(জলদাস ২০১০, পৃ. ৯৫)

অন্যদিকে উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের নামকরা বহদ্দার দয়ালহরি ও তার ভাই রামহরি। দয়ালহরি দয়ালু, মিষ্টভাষী। কিন্তু রামহরি তার বিপরীত। সাধারণ জেলেদের প্রতি তার অগ্রাসী ও কঠোর ব্যবহার রামহরিকে কুখ্যাত করেছে। লক্ষণীয়, কৃষ্ণমিলন ও রূপণ নামক দুজন গাউরের কথা প্রসঙ্গে তাদের প্রতি রামহরির শোষণ ও বঞ্চনার কথা ধরা পড়েছে। জানা যায়, দয়ালহরির নৌকায় গাউর হয়ে কাজ করতে আসার আগে কৃষ্ণমিলন সদ্য বিয়ে করেছে। বিয়ের খরচ সামলানোর জন্য সে দয়ালহরির কাছ থেকে টাকা ধার এবং গাউর খাটার জন্য বায়না নিয়েছিল। বিয়ের পর স্ত্রীকে কিছু সময় দেওয়ার জন্য সমুদ্রে গাউর খাটতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পাল্টে বায়নার টাকা দয়ালহরিকে সে ফেরত দিতে চায়, কিন্তু রামহরি কৃষ্ণমিলনকে হুমকি দিয়েছে,

'ভালায়ভালায় নৌকাত্ উঠ গই। নইলে বিপদত্ পরিবি।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৪৯)

আবার রূপণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তার বাবা দয়ালহরির কাছ থেকে গাউর খাটার অগ্রিম বায়না নেয়। কিন্তু হাঁপানি রোগের কারণে সে আসতে পারে না। রামহরি এই নিয়ে তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল

করেছে। বাবাকে অপমানিত হতে দেখে রূপণ সহ্য করতে পারে না। তাই সে এই অপমানের জবাব দিয়ে বলে-

'গাইল নো দিও, গাইল নো দিও। বাপ নো গেলে আঁই যাইয়ম। এখন যাও। সময় অইলে নৌকাত্ উইঠ্যম'।

(জলদাস ২০১০, পৃ. ৪৯)

লক্ষণীয় সমগ্র জেলেপাড়ায় ছবিটি প্রায় একই রকম। বহদ্দারদের ইচ্ছে অনুসারে পাউন্যা ও সাধারণ জেলেদের জীবন চলে। অর্থ ও ক্ষমতার জোরে তারা জেনে বুঝে সাধারণ জেলেদের শোষণ ও বঞ্চনা করে। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পায় না। কারণ তারা জানে প্রতিবাদ করলে তাদের জীবনে অসহযোগিতা ও শাস্তি নেমে আসবে। তাদের এই প্রতিবাদহীনতা বহদ্দার শ্রেণিকে ভিন্ন এক শোষণ-বঞ্চনার সুযোগ করে দেয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় নিম্নবর্গের সমালোচক রণজিৎ গুহের- 'Dominance without Hegemony'-গ্রন্থের কথা। সেখানে তিনি গ্রামশির আধিপত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, আধিপত্য সৃষ্টি না করেও কীভাবে আধিপত্য সৃষ্টি করা হয়। এমনটা বাধ্যতামূলক বা বলা ভালো অবশ্যসম্ভাবী নয় যে প্রতিটি নাগরিক সমাজে আধিপত্য সৃষ্টি করা হবে জনগণের সর্বসম্মতির ওপর ভিত্তি করে। যদিও এক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবে প্রভুত্ব স্থাপনের বা আধিপত্য কায়েমের জন্য রাস্তাটি হল হেজেমনি তৈরি না করেও বলপ্রয়োগ বা ক্ষমতার জোরে স্বার্থসিদ্ধি করা। এই বিষয়টি রণজিৎ গুহ তাঁর আলোচ্য গ্রন্থে বিশদে আলোচনা করেছেন। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে ক্ষমতার সাধারণ বিকল্প সম্পর্কে রণজিৎ গুহের বক্তব্য-

'… Dominance (D) and subordination (S). These two terms imply each other: it is not possible to think of D without S and vice versa … As such, they permit us to conceptualize the historical articulation of power in colonial India in all its institutional, model, and discursive aspects as the interaction of these two terms- as D/S in short'

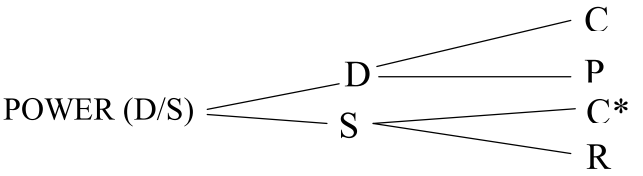

Figure1: General Configuration of Power (Guha 1997, p. 20)

উপরিউক্ত রেখাচিত্র রণজিৎ গুহ 'D' সংকেত দ্বারা Dominant আধিপত্য, 'S' দ্বারা Subordinant অর্থাৎ নিম্নবর্গীয়, 'C' সংকেত দ্বারা Coercion অর্থাৎ বাধ্যকরা বা জবরদস্তি, 'P' দ্বারা Persuasion অর্থাৎ প্ররোচনা, 'c* দ্বারা Collaboration অর্থাৎ সহযোগিতা এবং 'R' দ্বারা Resistant অর্থাৎ প্রতিবাদ বা প্রতিরোধকে ইঙ্গিত করেছেন। ক্ষমতা শৃঙ্খলার প্রবাহমানতায় ডোমিন্যান্ট শ্রেণি ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে

'C' ও 'P' দ্বারা। অর্থাৎ জোর করা বা জবরদস্তিভাবে বাধ্য করা এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্ররোচনামূলক বার্তা দেওয়া। অন্যদিকে তাদের এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নবর্গের মধ্যে C* অর্থাৎ সহযোগিতা ও শ্রেণি চেতনার সঞ্চার এবং'R' অর্থাৎ প্রতিবাদের ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয়। রণজিৎ গুহ উপরিউক্ত বক্তব্যে ব্যাখ্যা করেছে এভাবে-

> '… the relation between the terms of each of the constitutive pairs is not quite the same as that between the terms of the parent pair. D and S imply each other just as do C and P on the one hand, and C* and R on the other. But while D and S imply each other logically and the implication aplies to all cares where an authority structure can be legitimately defined in those terms, the same is not true of the other dyads. … In other words, mutual implication of D and S has a universal validity for all power relations informed by them, whereas that of C and P or of C* and R is true only under given condition.' (Guha 1997, p. 21)

সুতরাং আলোচ্য 'জলপুত্র' ও 'দহনকাল' উপন্যাসে জেলেদের ওপর দাদনদার বা বহদ্দারদের ক্ষমতার শৃঙ্খলা উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডোমিন্যান্ট শ্রেণি 'c' অর্থাৎ জবরদস্তি করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করেছে। তবে শুধু 'Coercion' দ্বারা নয় 'Persuasion' দ্বারাও আধিপত্যকামীরা নিম্নবর্গকে শোষণ ও বঞ্চনা করেছে। 'দহনকাল' উপন্যাসে দেখি রাধানাথের মা চন্দ্রকলা মাছ বিয়ারির কাজ করে। প্রত্যেকদিন লাভজনক ফল পাওয়া যায় না। হতদরিদ্র জেলেদের দিন আনা দিন খাওয়া জীবন। এর মধ্যে কেউ যদি মাছ নিয়ে নানা অজুহাতে দাম বাকি রেখে যায় তাহলে তাদের বড়ো ক্ষতি হয়ে যায়। এরকমই একদিন-

> 'একজন বয়স্কলোক দুই সের সুন্দরী মাছ কিনে 'বড়ো নোট ভাঙ্‌তি নাই, ভাঙাই আনি দির' বলে চলে গেছে। ফিরে আসেনি। জেলেদের রক্ত-জল-করা মাছ কত সহজেই এরা নিয়ে যায়—বউ বাচ্চাদের খাওয়ায়, নিজে খায়! অথচ এই চাতুরির কারণে হতদরিদ্র জেলের যে কত বড়ো ক্ষতি হয়ে যায়—তা ভেবে দেখে না ওরা। জেলেদের গালি দিতে, তাদের গায়ে হাত তুলতে, বিনিপয়সায় মাছ নিয়ে যেতে এরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। তাদের বিবেক তখন বোবা, বয়রা, অন্ধ হয়ে যায়।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৪৩)

সমাজের উচ্চবর্গের এ ধরনের প্ররোচনায় স্বাভাবিকভাবেই নিম্নবর্গের জেলেরা মাছের দাম থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তাদের উনুনে আগুন জ্বলে না। কারণ ওই মাছের দামই তাদের লভ্যাংশ। বহদ্দারকে মাছের দাম চুকিয়ে দিয়ে তাদের হাতে চাল-ডাল-তেল-নুন কেনার অর্থ থাকে না। চন্দ্রকলার মতোই রাধানাথও আব্দুল খালেক মেম্বারের কাছে বঞ্চিত হয়েছে। দেখা যায়, তিন টাকা মূল্য বেশি দামের একটি ইলিশ মাছ সে তার কাছে বিক্রি করেছিল। কিন্তু খালেক সাহেব রাধানাথকে তিন টাকা ধরিয়ে দিয়ে চলে যায়। রাধানাথ কিছু বলতে পারে না।

‘কী কইত্ পারি? মেম্বর রাইতরে দিন গরে। জীবন বাজি রাখা মাছ লেজত্ ধরি সামনে দি লই গেল গই। ...’ রাধানাথের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। সেই দীর্ঘশ্বাসে বঞ্চনার বেদনা মিশে আছে’।

(জলদাস ২০১০, পৃ. ৪৪)

তবে শুধু যে জেলেদের ওপর এমন বঞ্চনা, তা নয়, উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের অনন্ত দর্জির ক্ষেত্রেও দেখা যায় একই বঞ্চনা। কমলমুন্সির রবিবার ও বৃহস্পতিবার হাটের দুইদিন অনন্ত দর্জির কাজ। সেই কাজের পর অধিকাংশ মানুষই তাকে মজুরি দেয়, কেউ আবার নানা অজুহাতে টাকা বাকি রেখে যায়। অনন্ত দর্জি জানে-

‘... ওই লোক আর কোনোদিন এই দোকানের সামনে দিয়ে হাঁটবে না, পয়সা দেওয়াতো দূরের কথা। তারপরও মুখে কিছু বলেন না তিনি, ঘাড় কাত করে সম্মতি জানান।’ (জলদাস ২০১০, পৃ. ৯৭)

অন্যদিকে উপন্যাসের খু-উ বুইজ্যা চরিত্রটি মানসিক ভারসাম্যহীন বলে তাকে কাজের বদলে ভাত খাওয়ানোর আশ্বাস দিয়ে কার্যসিদ্ধি করেছে অন্নচরণ বহদ্দার। কিন্তু ভাত খাওয়ার সময় ভাত দেয়নি সে, ক্ষোভে, রাগ, দুঃখে খু-উ-বুইজ্যাকে গালাগাল করতে শোনা গেছে। অসহায়, দরিদ্র, সহায়সম্বলহীন অর্ধপাগল মানুষটির বঞ্চনার ঘটনাটি তার কথাতেই ধরা পড়েছে-

‘মাছ বাছনর আগে কইয়ে—বাছ বাছ, মাছ বাছ—ভাত দিয়ম, পেট পুরাই ভাত দিয়ম। মাছ বাছি শেষ গরনর পরে কঅদ্দে—কালিয়া খাইস, কালিয়া খাইস, এখন যা’। (জলদাস ২০১০, পৃ. ৩৫)

খু-উ-বুইজ্যার একজন অসহায় মানুষের প্রতি এ ধরনের আচরণ অমানবিক শোষণ ও বঞ্চনাকে নির্দেশ করেছে।

বঞ্চনার একই ঘটনা দেখা যায় ‘প্রস্থানের আগে’ উপন্যাসে শিবশঙ্করের বন্ধু প্রিয়রঞ্জনের বাবার ক্ষেত্রে। প্রিয়রঞ্জনের বাবা সুরঞ্জন পেশায় নাপিত। পুজো ও ঈদের মরসুম বাদে তাঁর দোকানে তেমন কাস্টমারের আসা-যাওয়া নেই। যাও বা দু-একজন আসে, তারাও বাকির খাতায় ক্ষৌরকর্ম করিয়ে যায়। টাকা চাইলে বলে,

‘অ সুরঞ্জন, টাকা আনতে ভুলে গেছি। পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে চলে এসেছি। আজকে আবার জুম্মার দিন। তাড়াতাড়ি মসজিদে যেতে হবে। এখন যাই। পরে নিস টাকা।’ (জলদাস ২০১৯, পৃ. ৭৭)

আলোচ্য উপন্যাসে এরকমই একজন হলেন জব্বার মৃধা। সুরঞ্জন তাকে বহুবার টাকার কথা মনে করিয়ে দেওয়ার পরও তার কাছে টাকা থাকে না। তার দুই ছেলের একজন থাকে আমেরিকায় এবং অন্যজন বিদেশি জাহাজে চাকরি করে। ছেলেদের পাঠান টাকায় জমি কেনে সে। কিন্তু সুরঞ্জনের মতো দরিদ্র নাপিতের চুল কাটার পারিশ্রমিক দেওয়ার টাকা তার কাছে থাকে না। আসলে জব্বারের মতো মানুষেরা

সমাজের তথাকথিত মানুষদের পরিশ্রমের মূল্য শোধ করার প্রয়োজন মনে করে না। তারা ভাবে এদের কাজই হল সমাজের উচ্চশ্রেণির সেবা করা। সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণিকে অধীনস্ত ভেবে জব্বাররা এভাবেই আধিপত্যবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং তাদের বঞ্চনা করার সাহস অর্জন করে।

অন্যদিকে 'অর্ক' উপন্যাসে দেখা যায়, তিন মাইল পথ রহমালির রিকশায় এসে মাত্র পাঁচ টাকা পারিশ্রমিক দেয় ছোবান মেম্বার। রহমালি সাত টাকা দাবি করলে ছোবান তাকে রাস্তার ওপর ফেলে জুতো দিয়ে বেধড়ক পেটায়।

> 'হয়রান না হওয়া পর্যন্ত রহমালিকে পিটিয়ে গেলেন ছোবান মেম্বার। আশেপাশের লোকেরা নির্বাক দর্শক হয়ে থাকল। কেউ প্রতিবাদ করার সাহস করল না।' (জলদাস ২০১৭, পৃ. ১০৯)

এইভাবে দিনের পর দিন সমাজের তথাকথিত নিচুতলার মানুষ মার খেয়ে মার সহ্য করে এসেছে। তাদের প্রতিবাদহীনতাই উচ্চবর্গের সবচেয়ে বড়ো শক্তি।

৪.১.২.৩ ষড়যন্ত্রমূলক আর্থিক শোষণ ও বঞ্চনা

জেলেসমাজে বহদ্দার তথা সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী মানুষেরা তাদের অধস্তনে থাকা মানুষগুলোর উপর অন্যায় বঞ্চনা ও শোষণ করেছেন। কিন্তু বহদ্দাররা ক্ষেত্রবিশেষে অন্য এক প্রভু গোষ্ঠীর কাছে শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে। 'দহনকাল' উপন্যাসে কৈবর্তপাড়ার জালাল মেম্বার রামহরির সঙ্গে কালিদইজ্যার ভাগীদারি ব্যবসায় নামে। এর পেছনে রয়েছে মেম্বারের অন্য উদ্দেশ্য। জালালের সাকরেত সুদীপের বুদ্ধিতে সে এই ব্যবসায় নেমেছে। সুদীপের কথায়,

> 'মেম্বার সাব, রামহরির লগে কালিদইজ্যার নৌকা গরন। রামহরি জাইল্যা, মাথা মোটা। আখেরে আওনর লাভ অইবো। কাসেইম্যারে টাইট দি রামহরির উপকার গইয্যন। আওনেরে ফিরানোর সাহস গইত্যো নো রামহরি'।
>
> (জলদাস ২০১০, পৃ. ১০১)

লক্ষণীয় জালাল মেম্বার ব্যবসায় নেমেছে প্রথম থেকে নেতিবাচক ও বঞ্চনার উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই সে সুযোগ বুঝে রামহরিকে হুমকি দিয়ে আদায় করার মানসিকতা পোষণ করেছে। উপন্যাসে দেখি, হঠাৎ একদিন জালাল মেম্বার রামহরিকেকে জানিয়েছে, আসছে বছর নৌকায় কিছু মুসলমান গাউর রাখতে হবে। মেম্বারের কথা শুনে রামহরি জানায়, মুসলমান গাউর গভীর সমুদ্রে কাজ করতে পারবে না। গভীর সমুদ্রের কাজ সোজা নয়। কিন্তু মেম্বার ধমকের সুরে জানায়, সোজা-কঠিন সে বুঝে নেবে। তার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। প্রথম বছর প্রাপ্যের চেয়ে বেশি মাছ নিয়ে যাওয়ার পর মেম্বারের অভিসন্ধি টের পেয়ে যায় দয়ালহরি। পরবর্তীকালে শেয়ারের টাকা ফেরত দিতে চাইলেন মেম্বার তা নিতে মানা করলে

দয়ালহরির কাছে মেম্বারের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়। আব্দুল হক রামহরিকে হুমকি দেয়, মেম্বারের ইচ্ছের বিরুদ্ধে সে যেন কোনো কথা না বলে। রামহরি বুঝতে পারে জালালের ইচ্ছা মানে আদেশ। সে যা ইচ্ছা প্রকাশ করবে তা রামহরিকে মানতে হবে। মাছ মারার মরসুমে রামহরি মেম্বারের কাছে শুঁটকির ভাগ চাইতে গেলে নানা অছিলায় ভাগ দিতে অস্বীকার করে সে। বরং উল্টে সে রামহরির কাছে হিসেবের গরমিল করে আরো টাকা দাবি করে। নির্বিকার জালাল মেম্বার বলে-

'তোঁয়াত্তোন মনত্ আছে কিনা নো জানি। টিঁয়া দিবার সমত্ কইলাম দে আঁই লাভের মালিক, লোকসানর নয়'।

(জলদাস ২০১০, পৃ. ১২৭)

জালালের কথা শুনে রামহরি হতভাগ ও স্তম্ভিত। অশিক্ষিত রামহরি সরল বিশ্বাসে মেম্বারের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল, কতটাকা নিয়ে কত টাকা লিখে রেখেছে মেম্বার, তাও সে জানে না। মেম্বারের এত বড়ো অন্যায়ের পরও সে জানায়, রামহরির কাছ থেকে বাকি টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত তার জমি মেম্বারের কাছে বন্ধক থাকবে। শুধু তাই নয়, রামহরি আজ থেকে মেম্বারের কালিদইজ্যার নৌকায় বড়োমাঝি হিসেবে কাজ করবে। লক্ষণীয় রামহরির সরলতার সুযোগ নিয়ে জালাল তাকে নিঃস্ব করেছে। এবং এই অন্যায়ের উপশম হিসেবে নিজেই তার নৌকায় রামহরিকে বড়োমাঝি নিযুক্ত করে উদারতাকে প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, জালাল মেম্বার ক্ষমতার একপ্রান্ত 'D' অর্থাৎ ডোমিন্যান্ট শ্রেণির প্রতিভূ। রামহরিকে শোষণের ক্ষেত্রে সে কখনোই 'C' (Coercion) অর্থাৎ জবরদস্তির আশ্রয় নেয়নি বরং 'P' (Persuasion) অর্থাৎ প্ররোচনার আশ্রয় নিয়েছে। যেমন-

ক. রামহরির সঙ্গে কালিদইজ্যার ব্যবসায় অংশীদারী হিসেবে লোভনীয় প্রস্তাব পেশ জালালের।

খ. সমান অংশীদারের নামে যা প্রাপ্য তার চেয়ে বেশি অংশ হস্তগত করা।

গ. হিন্দু গাউরদের বদলে মুসলমান গাউর রাখা।

ঘ. রামহরি নৌকা ভর্তি শুঁটকির ভাগ দাবি করলে, নানা আছিলায় জালালের অস্বীকার করা।

ঙ. ভাগ থেকে বঞ্চিত করে উল্টে রামহরির কাছ থেকে টাকা বাকি থাকার দাবি।

চ. বাকি টাকা আদায় পর্যন্ত রামহরির জমি দখল জালালের।

ছ. রামহরির নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে কাগজে টিপ সই করানো, ৩৫ হাজার টাকা ঋণ, লাভের মালিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা এবং টাকা শোধ দিতে না পারলে নৌকার মালিকানা ভোগের মতো ষড়যন্ত্র করে রামহরির সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া।

জালাল মেম্বার রামহরির প্রতি একই সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও শোষণ-বঞ্চনা করেছে। এসব অন্যায়ের পরেও যখন জালাল মেম্বার রামহরিকে তারই নৌকার বড়োমাঝি হিসেবে নিযুক্ত করেছে, তখন রামহরির অস্তিত্বে আঘাত লেগেছে। সে গ্রামের গণ্যমান্য লোকের কাছে সাহায্য চেয়েও পায়নি।

অন্যদিকে ‘অর্ক’ উপন্যাসে ছোবান মেম্বার জেলেপাড়ার একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি। সবরকম সরকারি সাহায্য তার মারফত জেলেদের কাছে পৌঁছয়। এই কর্মক্ষমতাকেই তিনি শোষণযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। উপন্যাসে জানা যায়, ছোবান মেম্বার কোনো জেলেকে মাছ নিয়ে মাছের দাম দেন না। দাম চাইলে বলে-

> ‘...সরকারি রিলিফ যখন আসে ওগুলো মক্ত-আলা দিই না তোদের? ওই রিলিফর দাম নিই আমি তোদের কাছ থেকে বেটারা? এর পর মা-বোন তুলে দুইচারটা গালি দেন।’ (জলদাস ২০১৭, পৃ. ১৪-১৫)

অশিক্ষিত সরল জেলেরা বোঝে না, সরকারি রিলিফ সকলকে সমানভাবে বন্টন করে দেওয়া ছোবানের কর্তব্য ও দায়িত্ব। জেলেদের এই অবুঝ মানসিকতার সুযোগ নেয় ছোবান। তাইতো বলরাম যখন ভারতে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল, তখন তার বসত ভিটা ছোবানের কাছে বিক্রি করার কথা বলেছিল সে। কিন্তু সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে ছোবান মেম্বার অসন্তুষ্ট হয়েছে। বলরামের বাড়ি কেনার ইচ্ছে পূরণ না হলেও সুযোগ বুঝে বলরামকে তার পুকুরটি পাঁচ বছরের জন্য লিজ দিতে বাধ্য করে ছোবান মেম্বার। শর্ত থাকে প্রতিবছর হাজার টাকা এবং মাঝেমধ্যে খাওয়ার জন্য মাছ দেবে সে।

> ‘কিন্তু এমন কণ্ঠ আর এমন চোখে বললেন, না দিলে সমূহ ক্ষতি করবেন বলরামের। ইচ্ছের বিরুদ্ধে সেদিন ছোবান মেম্বারকে পুকুরটা লিজ দিতে রাজি হয়েছিল বলরাম।’ (জলদাস ২০১৭, পৃ. ৭৯-৮০)

কিন্তু দেখা গেল, বছর বছর মাছ চাষ করলেও লিজ নেওয়ার শর্ত পূরণ করে না মেম্বার। নানা অজুহাতে মাছ দেয় না সে। প্রতি বছর হাজার টাকা চুক্তিরও একই অবস্থা। মাঝেমধ্যে দশ বিশ পঞ্চাশ একশ টাকা করে দেয়। বলরামের আস্থা অর্জনের জন্য মেম্বার হিসেবের খাতা বের করে দেখান। কিন্তু সেই হিসেবের খাতা গরমিলে পূর্ণ। দশের জায়গায় বিশ, বিশের স্থানে পঞ্চাশ, পঞ্চাশের স্থানে একশ টাকা লিখে রাখেন ছোবান।

৪.১.২.৪ অন্যান্য প্ররোচনামূলক আর্থিক শোষণ

এ পর্যন্ত আমরা দেখলাম, ক্ষমতার শৃঙ্খলায় আধিপত্য যেভাবে গঠিত হয়েছে, সেখানে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কখনো বাধ্য করে, কখনো অর্থের ক্ষমতার জোরে নিম্নবর্গকে বঞ্চনা ও শোষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে

সমালোচক অশোক সেন পুঁজিবাদী ও শ্রমিক সম্পর্কের রেশ টেনে বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ হিসেবে আত্মীয়তা, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক বিষয়গুলি অর্থনৈতিক দিকটিকে প্রভাবিত করে। ফলে উচ্চবর্গ আর্থিক দিক থেকে সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গকে চাপে ফেলতে সক্ষম হয়। অশোক সেনের বক্তব্য অনুযায়ী,

> 'The commodity economy enfulgs all relation in a manner that rules out the need for other unifying parameters like kinship, religion, or polities. The capital Labour relation in an independent constitutive element, and commodities in circulation provide the social linkages : One might say that the market replaces the pre- capitalist community.' (Guha (ed.) 1987, p. 211-212)

সমালোচক অশোক সেনের মন্তব্য অনুযায়ী, পুঁজিবাদী ও শ্রমের সম্পর্ক একটি স্বাধীন গঠনমূলক উপাদান এবং প্রচলিত পণ্য সেই সম্পর্কের সামাজিক যোগসূত্র প্রদান করে। অর্থাৎ আধিপত্যকামীরা যে অর্থে শোষণ ও বঞ্চনা করে সেটিও একটি সামাজিক সম্পর্কের অন্তর্গত।

আমরা লক্ষ করি নিম্নবর্গীয় সমাজের মধ্যেও এই মূলধন ও শ্রমের সম্পর্কটি স্বাধীন গঠনমূলক উপাদান হিসেবে উঠে এসেছে। 'কসবি' উপন্যাসে দেখি জেলেপাড়ার কৃষ্ণা অর্থনৈতিক দুরবস্থার চাপে তপন নামক এক ফল বিক্রেতার জালে জড়িয়ে পড়ে। সে কৃষ্ণাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করার বদলে তার দৈহিক ভোগের সুযোগ নেয়। একটা সময় সুযোগ বুঝে তপন কৃষ্ণাকে সাহেবপাড়া পতিতাপল্লিতে বিক্রি করে। পতিতাপল্লিতে কোনো পতিতার প্রথম দৈহিক ভোগের মূল্য অনেক। আমরা লক্ষ করেছি, কালু সর্দার কৃষ্ণাকে কিনে নেওয়ার পর তার সঙ্গে প্রথম মিলনের জন্য ধনী কাস্টমার খোঁজে। কাস্টমার ধরে আনার দায়িত্ব সে জালাল নামক দালালকে দেয়। সে একজন কাস্টমারের খোঁজ আনে। কিন্তু কাস্টমারটি কুশ্রী। মোটা, কালো, বা চোখ নষ্ট ও মুখে বসন্তের দাগ। তাই জালাল ইতস্তত বোধ করে এই বলে যে, নতুন মেয়ে এরকম ধরনের ব্যক্তির সঙ্গে প্রথম সম্ভোগে ভয় বা আতঙ্কিত হতে পারে। কিন্তু কালু সর্দার কোনো কথার তোয়াক্কা করে না। তার মতে, নতুন মেয়ে ঘরে তিন দিন ধরে বসে আছে এবং তার প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে। তার বক্তব্য-

> 'এ-ন গরি কত্তদ্দে যেএন তোর মাইয়ার ঘরত্ পইল্যা বেডা গল্লাওর। আঁত্তোন টিঁয়ার দরকার। বউত্ টিঁয়া। টিয়া সুন্দর অইলে হইল, বেডা সুন্দরর দরকার নাই'। (জলদাস ২০১১, পৃ. ৬৪)

আসলে কালু সর্দার এখানে পুঁজির পূজারী। সে শুধুই টাকা চেনে। টাকা কীভাবে, কোন পথে তার হাতে আসবে—এটাই তার মূল লক্ষ্য। প্রয়োজনে সে খুন পর্যন্ত করতে প্রস্তুত। কৃষ্ণা তো সামান্য পতিতা। ফলে দেখা যায়, যাদের ঘিরে কালুর ব্যবসা তাদের প্রতি সে সবচেয়ে কঠোর ও নির্দয়। টাকার জন্য পতিতাদের

প্রতিনিয়তই এভাবেই শোষিত হতে হয় সমাজের সর্দার-মাসি-মস্তানদের হাতে। তাইতো মোহিনী মাসির সন্তান কৈলাসের মনে প্রশ্ন জেগেছে,

> 'মা, তুমি বল—এই অসহায় মেয়েদের জন্য কে আছে? তোমরা তাদের শুধু শোষণ করে যাচ্ছ, তাদের ভালোর জন্য কী করছ তোমরা?' (জলদাস ২০১১, পৃ. ১৫৩)

মায়ের কাছে এর কোনো সদুত্তর খুঁজে পায় না কৈলাস। তাই সে পতিতাদের জন্য হিতকর কিছু কাজ করতে চায়। সে পতিতাদের একত্র করে তাদের অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতন করে বলে, সর্দার-মাসিরা কীভাবে প্রতিনিয়ত টাকার জন্য তাদের শোষণ করে চলছে। তাই কৈলাস তাদের পরামর্শ দেয় সপ্তাহে একদিন দেহ ব্যবসা বন্ধ করে উপার্জনের ৮০ শতাংশ নিজের কাছে রেখে মাসি সর্দারের হাতে ২০ শতাংশ দিতে। কারণ এ ব্যবসা পতিতা নির্ভর। তাই তাদের অধিকার আছে শরীরকে বিশ্রাম দেওয়ার ও উপার্জনের অধিকাংশ নিজের কাছে রাখার। পতিতারাও কৈলাসের কথার সত্যতা অনুধাবন করতে পারে। তাই ইলোরা ও বনানী সিদ্ধান্ত নেয় সপ্তাহে একদিন তারা ঘরে কাস্টমার তুলবে না। পতিতাদের এই সিদ্ধান্তে কালু সর্দার বেজায় চটে যায়। দলবল নিয়ে কালু পশ্চিমগলিতে পৌঁছায় এবং বনানীকে সামনে পেয়ে তার গালে চড় মারে।

> 'চোদমারানি বেহেনচোদ, দশ টেইক্যা সস্তা খানকি, তুই চাইতাছস ছুটি—সাপ্তাহিক ছুটি? মাগি, বড়ো অফিসের অফিসার হইছস, ভদার বিশ্রামর লাইগ্যা ছুটি চাস'? (জলদাস ২০১১, পৃ. ১৫২)

আমরা জানি, ক্ষমতা যেখানে সৃষ্টি হয়, সেখানে তাকে ঘিরেই সুবিধাবাদী, লোভী, স্বার্থপর, লোকেদের ভীড় জমে ওঠে। কালু পতিতাপল্লির সর্দার। তার হাতে সমাজ পরিচালনার ক্ষমতা রয়েছে। দেহব্যবসাকে শক্ত হাতে সামাল দেওয়ার জন্য তাই সে শক্তিবাহিনী গঠন করেছে। সেই গুন্ডা মস্তানদের দলে রয়েছে সেই পতিতাপল্লির জারজ সন্তানরা। ক্ষমতা, শক্তি ও অর্থবলের দ্বারা কালু সর্দার পতিতাপল্লির একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে উঠেছে। ক্ষমতা ও অর্থের ভিত্তিতে পতিতাপল্লিতে সর্দার-মাসি-মস্তান-পতিতাদের মধ্যে যে শ্রেণিবিভাজন সৃষ্টি হয়েছে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই অর্থ ও ক্ষমতার সঙ্গে শ্রমের একধরনের শোষক-শোষিতের সম্পর্ক প্রদর্শিত হয়েছে।

'রামগোলাম' উপন্যাসটি মেথর সম্প্রদায়কে নিয়ে রচিত হলেও আংশিকভাবে জেলে সমাজের কথা উঠে এসেছে, যেখানে অর্থনৈতিক শোষণের বর্ণনা আমরা পেয়েছি। সমাজের তথাকথিত অন্ত্যজ তথা নিম্নবর্গের অন্যতর শ্রেণি হল মেথর সম্প্রদায়। উপন্যাসে জানা যায়, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের তৎকালীন পূর্ববঙ্গে মেথর সম্প্রদায়কে আনা হয়েছিল কানপুর, এলাহাবাদ, চরগাও প্রভৃতি এলাকা থেকে। ব্রিটিশ যুগে তাদের চাকরির নিশ্চয়তা ছিল। পরিশ্রম অনুযায়ী সম্মানজনক পারিশ্রমিক ছিল। কিন্তু দেশভাগ

পরবর্তীকালে মেথর সম্প্রদায়ের নিশ্চয়তার ভাঙন দেখা দেয়। স্বাধীনতার পর তাদের অর্থনৈতিক জীবনের ভাঙ্গন প্রায় নিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়, কারণ তাদের বলা হয়—চাকরির মেয়াদ শেষ হলে সরকার প্রদত্ত ঘরবাড়ি, কলোনি ও সমস্ত সুযোগ সুবিধা ছাড়তে হবে। তাছাড়া মেথরদের জন্য বরাদ্দ রেশন প্রথাও একটা সময় বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, কর্পোরেশন থেকে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষদের জন্য ঝাড়ুদারের চাকরি উন্মুক্ত করার উদ্যোগ নিলে ধীরে ধীরে উন্মূল হতে থাকে চট্টগ্রামের মেথর সম্প্রদায়। আসলে যে চাকরি কেবলমাত্র মেথরদের জন্য নিশ্চিত ছিল, সেখানে সমাজের অন্যান্য মানুষদের মধ্যে সেই চাকরি উন্মুক্ত করে দেওয়ার অর্থ মেথর সম্প্রদায়কে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার দিকে ঠেলে দেওয়া। তাইতো কর্পোরেশনের এই উদ্যোগের কথা শুনে চারটি মেথরপট্টির মেথররা ফিরিঙ্গিবাজার মেথরপট্টির মন্দিরে একত্রিত হয়। বান্ডেলের মুখ্য চেদিলাল সর্দার গুরুচরণের কাছে হাহাকার করে ওঠে এই বলে যে,

> 'বল সর্দার, এবার আমাদের কী হবে? করপোরেশন বলেছে—এ চাকরি শুধু আমাদের হয়ে থাকবে না। হিন্দু-মুসলমান সবাই এই চাকরির সুযোগ পাবে। ওরা যদি দলে দলে আমাদের চাকরিতে ঢোকে, তাহলে আমরা যাব কোথায়?'
>
> (জলদাস ২০১২, পৃ. ৩২)

মেথেররা সমাজের তথাকথিত মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন এক অন্ত্যজ সম্প্রদায়। কর্পোরেশনের এই সিদ্ধান্ত তাদের অসহায়তার চরমসীমায় পৌঁছে দিয়েছে। অসহায়তা মেথরদের মধ্যে শ্রেণিচেতনা জাগিয়ে তুলেছে এবং তারা প্রতিবাদের রাস্তা বেছে নিয়েছে। রামগোলাম এই প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু করপোরেশনের বড়োবাবু আব্দুস ছালামের ক্ষমতার কাছে প্রতিবাদ টিকতে পারেনি। যোগেশকে হত্যা করার মিথ্যে অপরাধী সাজিয়ে রামগোলাম ও কার্তিককে আইনসম্মতভাবে দমন করেছে আব্দুস ছালাম। রামগোলাম ও কার্তিক পুলিশের কাছে গ্রেপ্তার হলে আবদুস ছালামের কাছে তার সিদ্ধান্তে অটল থাকার পথ মসৃণ হয়েছে। ফলে দেখা যায়, তিনি অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে সুইপার নিয়োগ করলেন। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কিছু মেথরদেরকে বেছে বেছে চাকরিচ্যুত করার পাশাপাশি আইন করলেন—হরিজনদের মধ্যে থেকে কেউ কোনোদিন জমাদার হতে পারবে না। এখন থেকে বাংলাদেশের সব সম্প্রদায়ের মানুষেরা সুইপারের চাকরি পাওয়ার অধিকার পাবে। এই নিয়ম বলবৎ করার ফলস্বরূপ দেখা গেল –

> '..ভিন্ন সম্প্রদায়ের সুইপাররা চাকরি এবং ঘর ভাড়া দিল।... চাকরির খাতায় তাদের নাম থাকল। চাকরি করতে লাগল বেকার হরিজনরা। বিনিময়ে অর্ধেক বেতন। অন্য অর্ধেক বেতন চাকরি না করা ভিন্ন সম্প্রদায়ের সুইপারদের। তাদের নামে অনুমোদিত কলোনির ঘর তারা ভাড়া দিল হরিজনদের'। (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৯১-১৯২)

অর্থাৎ হরিজনরা যে অন্ধকারে ছিল, সেই অন্ধকারেই থেকে গেল। সমাজের মানুষের নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার করে মেথর সম্প্রদায় নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাইলেও উচ্চবর্গের আধিপত্যকামীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দুর্বলকে আরো দুর্বল, দরিদ্রকে আরো দরিদ্র এবং অসহায়কে আরো বেশি অসহায়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

'রামগোলাম' উপন্যাস সর্দার গুরুচরণের মৃত্যুর পর তার দেহ দাহ করার জন্য শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পর জানা যায় মেথরদের মতো অস্পৃশ্য শ্রেণির মরা পোড়ানোর জায়গা অন্যত্র করা হয়েছে। তার উপর দাহকার্যের জন্য শ্মশান কমিটি মেথর সম্প্রদায়ের থেকে মরা পিছু আড়াই'শ টাকা ধার্য করার নির্দেশ দিয়েছে। রামদাস ডোম তাদের আদেশ শিরোধার্য করে বলে-

> 'তোরা মেথর আছিস। তোদের জায়গা এতা নয়। এইটা বাবুদের জন্য। তোরা পোড়াবি ওইখানে। আর হ্যাঁ, মরা পড়ানোর জন্য ট্যাক্স দিতে হোবে, আড়াই শো টাকা'। (জলদাস ২০১২, পৃ. ১১০)

বোঝাই যাচ্ছে সমাজ কাঠামোর তথাকথিত নিচুতলার মানুষগুলিকে সমাজের ক্ষমতাধররা নানা কারণ দেখিয়ে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করেছে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে মেথর সম্প্রদায়কে বাধা দিয়েছে উচ্চবর্গ পোষিত একজন তথাকথিত অন্ত্যজ নিম্নবর্গই। কারণ সেই নিম্নবর্গের মানুষটি উচ্চবর্গ দ্বারা লালিত। আনুগত্যের বশে সে চাইলেও তাদের বিরোধিতা করতে পারে না। যেমনটি ঘটেছে রামদাস ডোমের ক্ষেত্রে। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে, ক্ষমতা সূচক সব সম্পর্কই আসলে উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের বৈপরীত্যমূলক কেন্দ্রীয় ধারণা যা শ্রেণি বা জাতি সম্পর্ক, শাসক-শোষিতের সম্পর্ক ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সম্পর্ক থেকে পৃথক হয়েও সেই বৈপরীত্যমূলক ধারণার অন্তর্গত। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রায় সকল অভিব্যক্তিই, এই বাইনারি সম্পর্কের মধ্য দিয়ে স্পষ্টতা লাভ করে। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.৩৪)

হরিশংকর জলদাসের উপন্যাসে বর্ণিত নিম্নবর্গীয় সমাজে যেভাবে অর্থনৈতিক শোষণের চিত্রটি ফুটে উঠেছে সেভাবে তার গল্পগুলিতে অর্থনৈতিক শোষণের দিকটি ফুটে ওঠেনি। আসলে আমরা জানি উপন্যাসে জীবন ও সমাজকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে যা গল্পের ক্ষেত্রে নেই। 'ঢেন্ডেরি' গল্পে দেখি রাইগোপালের বাবা যদুনাথ জলদাস নৌকা মেরামতের জন্য ছালাম দাদনদারের কাছ থেকে বাধ্য হয়ে দাদন নিয়েছিল। যদুনাথ সেই টাকা সুদে-আসলে শোধ করার পরেও ছালাম তা অস্বীকার করে। তার মতে সে আরো টাকা পায়। যদুনাথ এর প্রতিবাদ করলে ছালাম তার গুন্ডাদের দিয়ে যদুনাথকে ও রাইগোপালকে আঘাত করে। ছালাম যদুনাথকে হুমকি দেয়-

'দুই দিনের মইধ্যে আঁর টিঁয়া নো পোঁছাইলে যেই পথ দি তোর মার পেডাত্তোন বাইর হইয়স হেই পথদি তোরে গল্লাই দিয়ম চোদানির পোয়া'। (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৪৭)

বাহুবলের ক্ষমতা হোক বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা হোক—তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে সমান ক্ষমতা প্রদর্শন না করলে দুর্বল অসহায়কে শোষিত হতেই হয়। যেমনটি হয়েছে যদুনাথের সঙ্গে। কারণ ছালামের অর্থবল, বাহুবল দুই-ই আছে। যদুনাথের তার কোনোটিই নেই। তাই যদুনাথের মতো নিম্নবর্গের মানুষদের মার খেয়ে মার সহ্য করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তাই সে বাধ্য হয়ে নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে উত্তর পতেঙ্গা গ্রামে চলে আসে সপরিবারে।

অন্যদিকে 'দুলারী এবং কয়েকজন' গল্পে দেখি মহেশখালীর এক অসহায় জেলে কন্যা উপার্জনের আশায় চট্টগ্রাম শহরে কোনো একটি গার্মেন্টসে চাকরি নিয়েছিল। সেখানে ঘটনাক্রমে শ্যামল দত্ত নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। একটা সময় দুলারীকে বিয়ে করে শ্যামল, তাদের সন্তান হয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে দুলারী একদিন জানতে পারে, শ্যামল আগে থেকেই বিবাহিত। দুলারীর উপার্জনের টাকায় বিনা শ্রমে খাওয়া-পরা চালানোর জন্য সে তাকে বিয়ে করে, এটা তার চালবাজি। সত্য প্রকাশ্যে এলে তাদের দুজনের মধ্যে বচসা সৃষ্টি হয়। দুলারীর মুখে শোনা যায় তার প্রতি শ্যামলের অর্থনৈতিক শোষণের কথা।–

'শুয়োরের বাইচ্চা শ্যামইল্যা! আমার খাইয়া, আমার লগে ফুইত্যা, গায়ে বাতাইস লাগাইয়া কাটাইছস এতদিন। এখন আমার ঘর থেইক্যা বাইর অইয়া যা খানকির পোলা'। (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৯৪)

আমরা নিম্নবর্গের ইতিহাসে জেনেছি উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ দ্ব্যণুক সম্পর্কের মধ্যে দুটি চেতনার স্বাতন্ত্র্য যেমন সত্য, তেমনি উচ্চবর্গের প্রভুত্ব ও নিম্নবর্গের অধীনতাও সমান সত্য। অর্থাৎ নিম্নবর্গীয় চেতনা স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও পরাধীন। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে এই দ্ব্যণুক সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক রূপটি সবসময় সচল, কারণ উচ্চবর্গের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে তারা ক্ষমতাকে বিভিন্ন রূপে (যেমন- আধিপত্য, বলপ্রয়োগ, ষড়যন্ত্র) ব্যবহার করে। ফলে অধিকাংশ সময়ই ক্ষমতার কাছে নিম্নবর্গকে ঝুঁকতে হয়। এক্ষেত্রে নিম্নবর্গকে দেখা যায়, নিষ্ক্রিয়, ভীরু ও অনুগত হিসেবে। সুতরাং নিম্নবর্গের প্রতি উচ্চবর্গের শোষণ-শাসন প্রক্রিয়া চলতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা উচ্চবর্গের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা না করে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর 'A small History of Subaltern Studies'-প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের নিরিখে ব্রিটিশদের আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতার আয়োজন করার প্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছেন-

'The arrangement of power in which the present and other Subaltern classes found themselves in colonial India contained two very different logics of hierarchy and opression. One was the logic of the quasi-liberal legal and institutional teamwork which the British introduced into the country.

> Imprecated with this was based on direct and explicit domination and Subordination of the less powerful through both ideological-symbolic means and physical force. The semiotics of domination and subordination were what the subaltern classes sought to destroy every time they rose up in rebellion. (Schwarz (eds.) 2005, p. 474)

অর্থাৎ ঔপনেবেশিক ভারতবর্ষে ক্ষমতার ব্যবস্থা কৃষক ও অন্যান্য নিম্নবর্গের মধ্যে শ্রেণিবিভাজন ও নিপীড়ন এই দুটি ভিন্ন যুক্তিতে দাঁড়িয়েছিল। এর মধ্যে একটি ছিল আধা- উদারবাদী আইনি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যুক্তি যা ব্রিটিশরা এদেশে এনেছিল। এর সঙ্গে জড়িত ছিল আরেকটি সম্পর্ক যেখানে শ্রেণিবিন্যাস প্রত্যক্ষ ও স্পষ্টভাবে আধিপত্যের উপর ভিত্তি করে ছিল। মতাদর্শগত প্রতীকীর মাধ্যমেই কম শক্তিশালীদের অধীনতা এবং আধিপত্যকামীদের শারীরিক শক্তি প্রদর্শিত হয়েছে। এর ফলে নিম্নবর্গ যতবার বিদ্রোহে জেগে উঠেছে ততবার তাদের ধ্বংস করা হয়েছে। সুতরাং স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা নিম্নবর্গের মধ্যে যে শ্রেণিবিভাজন ও নিপীড়নের মানদণ্ডে শাসনকার্য চালিয়েছিল তার মৌলিকতা নানারূপ ভেদে বর্তমানেও রয়ে গিয়েছে। হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় সমাজে অর্থনৈতিক শোষণের নানা রূপকল্প সে কথাই প্রমাণ করেছে।

৪.১.৩ রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক শোষণ-বঞ্চনা

পুঁজিতন্ত্রের প্রাক্পর্বের অন্য যে কোনো সমাজের মতো নিম্নবর্গীয় সমাজেও অর্থনীতি কেন্দ্রিক প্রায় সব সম্পর্কই ক্ষমতার সম্পর্ক বা বলা ভালো রাজনৈতিক সম্পর্ক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। নিম্নবর্গ-চর্চা আসলে উচ্চবর্গের রাজনীতি ও নিম্নবর্গের রাজনীতি-এই স্বতন্ত্র দুটি ধারার আলোচ্য বিষয়। সেই কারণেই ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহ প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্কটিকে রাজনীতির মর্মস্থলে রেখেছেন। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ৩৪) যে কোনো ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় সীমানার বাসিন্দা। সেই রাষ্ট্র আরোপিত বিবিধ আইন-নিয়ম-বিধি ব্যক্তি-সমাজকে মেনে চলতে হয়। সেক্ষেত্রে এক শ্রেণি নিয়মের স্রষ্টা এবং অপর শ্রেণি সেই নিয়মের পালক। গ্রামশির মন্তব্যেও আমরা লক্ষ করেছি যে, সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্র দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন বিধি-আইন আরোপিত হলেও তাদের মূল উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি করা। রাজনীতির আড়ালে ও বুদ্ধিজীবী সিভিল সোসাইটিকে কাজে লাগিয়ে তারা রাষ্ট্রের জনগণের কাছে শাসনের মাধ্যমে সর্বসম্মতি আদায় করে নেয়। (Hoare (eds.) 1971, p. xiii-xiv) এই শাসন প্রক্রিয়া যে সবসময় সমান শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলে এমনটা নয়, আসলে রাষ্ট্র যে আইন-বিধি আরোপ করে তা সমাজ কাঠামোর মধ্যমবর্গ অর্থাৎ শাসক সহায়ক গোষ্ঠী দ্বারা চালিত হয়। সুতরাং জনগণের আপাত মঙ্গলার্থে যে বিধি

আইন তা সবসময় মান্য করে না তারা। ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয় এবং প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্কটি প্রকট হয়ে ওঠে।

সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের সময় থেকেই প্রভুত্ব ও অধীনতার বৈপরীত্য এক শ্রেণিকে শোষক ও অন্য শ্রেণিকে শোষিতে পরিণত করেছে। হরিশংকর জলদাস তাঁর কথাসাহিত্যে যে সমাজকে তুলে এনেছেন সেখানে কিছুটা অংশ জুড়ে ১৯৭১ কালপর্বের বাংলাদেশ তথা পূর্ব-পাকিস্তানের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে তাঁর কয়েকটি গল্প-উপন্যাস যথা 'দহনকাল', 'অর্ক', 'দইজ্যা বুইজ্যা', 'থুতু', 'সীমানা ছাড়ায়ে', 'আহব ইদানীং'-এ মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব ও প্রসঙ্গ এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে তৎকালীন বাংলাদেশের জনজীবন বিশেষ করে জেলেসমাজ যেভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে তা আসলে রাজনৈতিক অস্থিরতার এক অন্ধকার পরিস্থিতি। সাম্প্রদায়িকতার জেরে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় কেউ দেশ ত্যাগ করেছে, কেউ সেখানে থেকেই নির্বিচারে পাকসৈন্যের হাতে মৃত্যু বরণ করেছে। আলোচ্য পরিচ্ছেদে রাজনৈতিক কারণে নিম্নবর্গীয় সমাজের শোষণ ও বঞ্চনার প্রকৃতিকে আমরা অনুধাবন করার চেষ্টা করব।

৪.১.৩.১ মুক্তিযুদ্ধ ও নিম্নবর্গের জীবন-যন্ত্রণা

'দহনকাল' উপন্যাসটি জেলেসমাজের কাহিনি হলেও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব উত্তর পতেঙ্গা জেলেপাড়াকে কীভাবে বিধ্বস্ত করেছে তার বর্ণনা পাই। মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক অস্থিরতা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে দিয়ে। উপন্যাসে জানা যায়-

> '...১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাত। বাংলাদেশে গণহত্যা জ্বালাবার জন্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চের নিকষকালো রাত্রিটিকে বেছে নিয়েছিল। কমসে কম ত্রিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করবার জন্যে আদেশ দিয়েছিল সে। সে-রাতে একটি জাতিকে ধ্বংস করার প্রথম প্রক্রিয়া শুরু করেছিল পাকিস্তানি হায়নার দল।'
>
> (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৪১)

দেখা গেল অতিদ্রুত পাক সৈন্যরা বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জ-শহরে ছড়িয়ে পড়ল। পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিল বিহারী জনগোষ্ঠী ও কিছু স্বার্থপর বাঙালি। লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশত্যাগে বাধ্য হল এবং যারা যেতে পারল না, তারা অবরুদ্ধ হয়ে রইল। উত্তর পতেঙ্গা জেলেপল্লিটিও পাকিস্তানি সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ হয়। জোর-জুলুম করে তারা বেড়িবাঁধের সামনে রসিক মিয়ার বাগান বাড়ি দখল করে সেখানে ঘাঁটি গাড়ে। যুদ্ধের প্রাক্-প্রস্তুতি ও আশ্রয় নেওয়ার জন্য মেজর গিলানীর আদেশে গর্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হলে সৈন্যরা বলপূর্বক গ্রামের সাধারণ বাঙালি পুরুষদের ধরে আনে।

> 'চারো তরফসে চুতিয়া বাঙ্গালিয়োঁ কো পাকড়কে লাও। কামমে লাগাও। কাম নেহি ক্যরনে পর টরচার ক্যরো।'

(জলদাস ২০১০, পৃ. ১৪৩)

শুধু তাই নয়, পাক সৈন্যরা মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে জেলেদের ওপর অকথ্য অত্যাচার ও নিপীড়ন করেছে। রাধানাথকে ইন্ডিয়ার গুপ্তচর সন্দেহে বেধড়ক পেটানো হয়েছে। রাধানাথের

> 'শরীরের এখানে ওখানে হিংস্র নির্যাতনের চিহ্ন। চিবুক ফেটে রক্ত ঝরছে,...স্থানে স্থানে ফোলা, চামড়াও উঠে গেছে কোথাও কোথাও।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৫২)

পাকসেনাদের এই বর্বর অত্যাচারে দরিদ্র-লাঞ্ছিত জেলেরা ভয়ে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। সমুদ্রে কোনো জেলেকে মাছ ধরতে না দেওয়ার ফলে সমগ্র জেলেপাড়ায় হাহাকার দেখা দেয়। বহদ্দাররা তাদের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে কোনোরকমে দিনাতিপাত করলেও সাধারণ জেলেদের পেট শূন্য। এরই মধ্যে পাক সৈন্যরা একরাতে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আব্দুল খালেকের ঘনিষ্ঠ সলিমুল্লাহকে গুলি করে হত্যা করেছে। ভীত জেলেরা শূন্য পেটে বাড়ি থেকে বেরোন বন্ধ করে। কারণ, মাঝেমধ্যেই পাকসেনারা যখন তখন যাকে পেরেছে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়েছে গর্ত খোঁড়ার জন্য। এরকমই একদিন দুপুরে মৃদুল, তপন, মিলন, সন্তোষ এবং আরো কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গিয়েছে তারা। এদের মধ্যে মৃদুলকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, জেলেপাড়া ও মুসলিমপাড়া থেকে তারা বিনা বাধায় কখনো কারও ছাগল, মুরগি, গোরু, ভেড়া ইত্যাদি নিয়ে যায়। উপন্যাসে দেখি-

> 'তারা পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে, সঙ্গে থাকে রাজাকারের দল। ছাগলটা গোরুটা নজরে পড়লে বলে, 'ইসে উঠা লো।' রাজাকাররা ছাগলটার সঙ্গে মুরগিটা, গোরুর সঙ্গে ভেড়াটা নিয়ে নেয়। বাধা দেওয়ার কেউ নেই।'
>
> (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৯০)

পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচার ও নিপীড়নের প্রতিউত্তরে জেলেরা একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ করলে তার শাস্তি স্বরূপ পাক সৈন্যরা জেলেপাড়ার সব ঘর পুড়িয়ে দেয়। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় রাধানাথের বাড়ির উঠানে চন্দ্রকলার লাশ পড়ে আছে এবং তিনটি নারকেল গাছের সঙ্গে নিকুঞ্জ, ইমাম খবির উদ্দিন ও রাধানাথের মৃতদেহ বাঁধা। জেলেপাড়া ঘিরে ফেলার আগে মেজর গিলানি সৈন্যদের উদ্দেশ্যে আদেশ দেয়-

> 'প্রথমে আনসারির দলটিকে খুঁজে বের কর; তারপর আগুন লাগাও, হত্যা কর। আমি পোড়ামাটি চাই, একজন লোকও যাতে জীবিত না থাকে। কুকুর-বেড়ালকেও ছাড়বে না। ও ওগুলোকেও গুলি করবে।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৯৫)

'অর্ক' উপন্যাসটিও মুক্তিযুদ্ধ প্রভাবান্বিত। জানা যায়, পাকসেনাদের অত্যাচারে এমদাদ মিয়ার মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আত্মগোপন করেছে। সমুদ্রে জেলেদের যাওয়া আসার পথে পাক সৈন্যরা তাদের নানা রকম হেনস্থা করে।

‘কখনো নেংটা করে হিন্দু না মুসলমান পরীক্ষা করে, কখনো আপাদমস্তক বুটজুতা দিয়ে মাড়িয়ে উল্লাস প্রকাশ করে।...এই তো সেদিন চৌরাশির বাপকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারল পাঞ্জাবিটা।’

(জলদাস ২০১৭, পৃ. ১০৫-১০৬)

আবার ‘দইজ্যা বুইজ্যা গল্পে দেখি মধ্য একাত্তরে উত্তর পতেঙ্গা জেলেপাড়াটি পাকসৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। পাকসৈন্য দ্বারা জেলেদের ওপর শোষণ পীড়নের চিত্রটি এখানেও স্পষ্ট। সৈন্যরা জেলেপাড়ায় এসে সকলকে একত্র করে।

‘তাদের দিয়ে বড়ো বড়ো গাছ কাটায়, বাঁশ কাটায়। রাজাকাররা মোটা বেতের বাড়ি মারে, রাইফেলের গুতোঁ দেয় ছেলেদের পিঠে-পাছায়। তাদের দিয়ে কাটা গাছ-বাঁশ বয়ে নিয়ে যায় নিজেদের আস্তানায়। ...

যাওয়ার সময় পাকিস্তানিসৈন্য ও রাজাকাররা খালি হাতে যায় না। মধুসূদনের ছাগলটা, মালতির হাঁস চারটি, বুড়া হারানের বাপের প্রসবোন্মুখ গোরুটি নিয়ে যায়। জেলেদের মুখে প্রতিবাদের ভাষা নেই।'

(জলদাস ২০১৬(ক), পৃ.২৬)

‘থুতু’ গল্পেও দেখা যায় মুক্তিযোদ্ধা শামসুর বাড়িতে আগুন লাগায় পাক সৈন্যরা। যাওয়ার সময় তারা গোরু ছাগলগুলো নিয়ে যায়।

‘যুদ্ধের সময় চরখানপুরে বশিরউদ্দিন ভীষণ অত্যাচার চালিয়েছে। গোরু-ছাগল নিয়ে গেছে যখন ইচ্ছে, যার গোয়ালঘর থেকে ইচ্ছে।’ (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ.২১৩)

অন্যদিকে ‘আহব ইদানীং’ গল্পে কালামুদ্দিন একজন মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধে আহত হয়ে সে বাড়ি ফিরে পঙ্গু জীবন কাটায়। দেশমাতৃকাকে মুক্ত করতে যে বীর পঙ্গুত্বকে বরণ করেছে সেই বীর যোদ্ধাদের স্বাধীন দেশে ভিক্ষাবৃত্তিকে অবলম্বন করতে হয়েছে। ‘সীমানা ছাড়ায়ে’ গল্পে ছৈদুলকেও মুক্তিযুদ্ধে পঙ্গু হয়ে ভিক্ষা করতে দেখা গিয়েছে।

৪.১.৩.২ সাম্প্রদায়িকতা ও শোষিত নিম্নবর্গ

সৈন্যদের আশ্রয়স্থানে খন্দক খোঁড়ার জন্য একসঙ্গে পঁচিশ-ত্রিশজন জেলেদের জোরপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়েছে সৈন্যরা। তাদের মধ্যে রয়েছে নিকুঞ্জ বহদ্দার। সারাদিন মাটি কাটার পর জেলে ও মুসলমানদের ভাত খেতে দেওয়া হলে জেলেরা মুসলমানদের সঙ্গে খেতে চায় না। এই দেখে বিশ্বাসঘাতক রাজাকার হামিদ বলে ওঠে-

‘গোরুর গোস্তর ঝোল খাবাই বিয়াগ মালাউনেরে মুসলমান গইয্যম।’ (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৬৬)

ক্যাপ্টেন তাদের জোর করে খাওয়ানোর নির্দেশ দিলেন হামিদ ও কয়েকজন মিলে জোর করে মুখে মাখা ভাত পুড়ে দেয়।

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যরা পূর্বপাকিস্তানে আস্তানা তৈরি করে সমস্ত মুক্তিযুদ্ধাদের ধ্বংস করতে। ফলে তারা হিন্দু কাউকে দেখলেই ইন্ডিয়ার দালাল বলে সন্দেহ করে এবং তাদের নিপীড়ন করে। কিছু বিশ্বাসঘাতক বাঙালি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পাক সেনাদের সঙ্গে হাত মেলায়। যারা রাজাকার নামে অভিহিত। এরা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। যেমনটা আমরা দেখলাম 'অর্ক' উপন্যাসে। সমগ্র পাড়ার পরিবেশ দেখে দিবাকরের অনুভূতি এরকম-

> 'এখন কী রকম যেন রেষারেষি। পরস্পরের প্রতি সন্দেহ। পতেঙ্গার মুসলমানরা ভাবছে—হিন্দুরা ইন্ডিয়ার গুপ্তচর।...
>
> এই যে সন্দেহ, এই যে ঘৃণা, এই যে বিদ্বেষ, পাক-ভারতের যুদ্ধের সময় হিন্দু আর মুসলমানের মনের মধ্যে হঠাৎ করে চাগিয়ে উঠল।' (জলদাস ২০১৭, পৃ. ৪১)

এই বিদ্বেষের বলি হতে দেখা গেল নিরপরাধী নিরীহ কানাইলাল সরকারকে। সাম্প্রদায়িকতার বর্বরতার রূপ নিয়েছে 'থুতু' গল্পেও। গল্পে দেখা যায়, চরখানপুর ইউনিয়ন এর চেয়ারম্যান বশিরউদ্দিন রাজাকার হয়ে পাক সেনাদের সঙ্গে হাত মেলায়। যুদ্ধের সময় এই বশিরউদ্দিন চরখানপুরে ভীষণ অত্যাচার চালায়। নাপিত পাড়ার বিমল শীল একদিন বশিরের পাশ কাটিয়ে আসলে সে হুঙ্কার দিয়ে বলে

> 'কিথারে মালাউনের পুত, চোখে দেখছ না? আদাব-সালাম না দিয়া পাশ কাটাইয়া যাইতাছছ? তুই জানছ না আমি ক্যাটা?' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২১৩)

ভয়ে বিমল তাকে আদাব জানালেও বশির সন্তুষ্ট হয়নি। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে কোনো এক দুপুরে রাজাকারের দল নিয়ে বিমলের বাড়িতে উপস্থিত হল। তারপর-

> 'বিমল, তার বউ, দুই সন্তান, বিমলের বুড়া বাপ—সবাইকে নিয়ে মসজিদ গেল। সেদিন জুমার নামাজের পর গোটা পরিবারকে মুসলমান করা হল।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২১৩)

নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিক ও সমালোচক জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে, গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে কমিউন্যাল ঝগড়া ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে তাদের মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। সমালোচক অশোক সেন সাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে জানিয়েছেন-

> 'The Use of the term 'community' entails no denial of the existence of classes. An india of Community in immanent in Marx's concepts of classes and class struggle, particularly when he assigns a vital role to the conciousness of the exploited and their political action in negating an exploiting order. This is the crix of a 'class- for- itself' (Guha (ed.) 1987, p.227)

অর্থাৎ সম্প্রদায় হল এমন একটি শব্দ যা শ্রেণিকে সংঘবদ্ধ করে। মার্কসীয় দৃষ্টিতে সম্প্রদায় হল শ্রেণি, শ্রেণি-সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা শোষিত হওয়ার চেতনা থেকে উদ্ভূত। সাম্প্রদায়িকতা নির্দিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীর একক চেতনা যা অপর ধর্মীয় গোষ্ঠীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। ফলে অধীনস্ত শ্রেণির শোষণ ও বঞ্চনার জন্য দায়ী।

৪.১.৩.৩ অন্যান্য রাজনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা

মুক্তিযুদ্ধের বাইরেও সমাজের সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসক দ্বারা বঞ্চিত হতে দেখা গিয়েছে 'দহনকাল' উপন্যাসে। জানা যায় আইয়ুব খানের আমলে পাকিস্তান সরকার ঠিক করে পূর্ব-পাকিস্তানকে কলকারখানায় ভরিয়ে তোলা হবে। নিঃসন্দেহে প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত জনকল্যাণমুখী। তারা সিদ্ধান্ত নেয় এই অঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য দূর করতে হবে। সেই মত উত্তর পতেঙ্গা গ্রামে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার নির্মাণের একটি বড়ো কারখানা করার সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান প্রশাসন। স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয় হিন্দুপাড়াটিকে। সেই স্থানটি কয়েকটি পরিবারের বাসস্থানের অন্তর্গত হওয়ায় তারা ধরনায় বসে। কিন্তু তাদের জানিয়ে দেওয়া হয় সরকার উচিত মূল্যে তাদের বাস্তুভিটা কিনে নেবে এবং আগামি ছয় মাসের মধ্যে জমি ছেড়ে দিতে হবে।

> 'কালক্রমে সরকার নির্ধারিত দামের দুই-তৃতীয়াংশ টাকা দিয়ে তাদের বাস্তুচ্যুত করা হলো। বলা হলো—বাকিটা পরে দেওয়া হবে। কিন্তু সরকারি প্যাঁচে ওই টাকা আটকে গেল।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৮২)

বাধ্য হয়ে তারা কেউ রাস্তার পাশে ঝুপরির মত জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে, কেউ দেশ ত্যাগ করেছে, কেউ অন্য গ্রামে বাড়ি করেছে। আদাব স্যারও ভিটেমাটি চ্যুত হয়ে বস্তি সদৃশ জায়গায় ছনের ছাউনি দিয়ে একটি ঘর তুললেন। এখানে সরকার প্রতিশ্রুত নির্ধারিত মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে সাধারণ মানুষ। 'অর্ক' উপন্যাসে দেখা যায়, প্রলয়ঙ্করী ঝড়ে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের জনজীবন বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারালেও-

> 'পাকিস্তান সরকার বিপর্যস্ত অঞ্চলে কোনোরূপ মানবিক সাহায্য পাঠাল না।' (জলদাস ২০১৭, পৃ. ১০২)

'দহনকাল' উপন্যাসের এরকম এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জেলেজীবন বিপর্যস্ত হলে বহির্বিশ্বের নানা দাতাসংস্থা এগিয়ে এসেছে সাহায্যের জন্য। তারা জেলেদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-জাল, সুতো ত্রাণ হিসেবে দান করেছে।

> 'এই সাহায্য আবার সকল জেলেপরিবার নির্বিশেষে পেল না। মধ্যস্বত্বভোগীরা নানা ছলচাতুরির মাধ্যমে লুটে নিল অনেক সাহায্য।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১১৮)

দেখা গেল, মধ্যস্বত্বভোগীদের একজন হয়ে দাঁড়ালো নিকুঞ্জ। কারণ সে জেলেপাড়ায় স্বল্প শিক্ষিত। সাহায্যকারী দল শিক্ষিত লোক সন্ধান করলে নিকুঞ্জ এগিয়ে আসে। ফলে এক অর্থে নিকুঞ্জ হয়ে উঠল জেলে পাড়ার ত্রাণকর্তা। তার ওপর নির্ভর করতে লাগল সাধারণ জেলেদের ত্রাণ প্রাপ্তি। পূর্বের প্রতিশোধস্পৃহায় মত্ত হয়ে নিকুঞ্জ রাধানাথের ক্ষতি করার চেষ্টা করল।

> 'তাই সাহায্যপ্রার্থী জেলেদের তালিকা থেকে রাধানাথের নাম বাদ যেতে লাগল মাঝেমধ্যে; স্বজনহারাদের নাম যখন চাইল একটি দাতাসংস্থা; নিকুঞ্জ রাধানাথের নামের জায়গায় নাম লিখল রাধাচন্দ্র। দাতারা রাধাচন্দ্রকে খুঁজে পেল না। ফলে বড়ো ধরনের একটা সাহায্য প্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো রাধানাথ।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১১৮)

এখানেই শেষ নয়, ক্ষতিগ্রস্ত জেলেদের অর্থনৈতিক স্থিতি ফিরিয়ে আনার জন্য কানাডার একটি দাতা সংস্থা জেলেপাড়ায় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করল। সমিতি গঠন করার সময় ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার আব্দুল খালেক নবগঠিত সমিতির সভাপতি পদে বসলো এবং নিকুঞ্জ হল সাধারণ সম্পাদক। এই সমিতির সাহায্য থেকেও রাধানাথ বঞ্চিত হল নিকুঞ্জ ও আব্দুল খালেকের জন্য। দেখা গেল-

> 'রাধানাথ সামান্য পরিমাণে সুতা পেল। নৌকা প্রাপকদের নামের তালিকা থেকে রাধানাথের নাম বাদ দেওয়া হলো।'
> (জলদাস ২০১০, পৃ. ১১৯)

বঞ্চনার এই সামগ্রিক ঘটনা থেকে আমরা তিনটি স্তর দেখতে পেলাম। দাতাসংস্থা > মধ্যস্বত্ত্বভোগী > ক্ষতিগ্রস্ত জেলে। যদি দাতা সংস্থা সরাসরি জেলেদের সাহায্য করত, তবে সেখানে ছলচাতুরী বা বঞ্চনার প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু মধ্যস্বত্ত্বভোগী নিকুঞ্জ ও আব্দুল খালেকের মতো স্বার্থসন্ধানী মানুষদের প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করার কুফল ভোগ করেছে রাধানাথের মতো সাধারণ জেলে।

৪.১.৪ শোষিত নিম্নবর্গের নারী

ইতিহাসে নারীকে অধস্তন হিসেবে কবে থেকে দেখা হয়েছে- এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। নারী শোষণের ইতিহাস সমাজের সর্বত্র লক্ষণীয়। ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক, পারিবারিক প্রায় সবদিক থেকে নারীকে Other বা 'অপর' করে রাখা হয়েছে। নারী সবযুগে, সবদেশেই শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক হুমায়ুন আজাদ তার 'নারী' প্রবন্ধে জানিয়েছেন-

> 'পুরুষ নারীকে সাজিয়েছে অসংখ্য কুৎসিত অভিধায়; তাকে বন্দী করার জন্যে তৈরি করেছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র; উদ্ভাবন করেছে ঈশ্বর, নিয়ে এসেছে প্রেরিত পুরুষ; লিখেছে ধর্মগ্রন্থ, অজস্র দর্শন, কাব্য, মহাকাব্য; সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ও আরো অসংখ্য শাস্ত্র। এতো অস্ত্র নিয়ে প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয় নি কোনো সেনাবাহিনী। এর কারণ পুরুষের যৌথচেতনায় মহাজাগতিক ভীতির মতো বিরাজ করে নারী। তাই নারীর কোনো স্বাধীনতা স্বীকার

করে নি পুরুষ। পুরুষ এমন এক সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছে যা নারীকে সম্পূর্ণ বন্দী করতে না পারলে ধ্বংস হয়ে যাবে ব'লে পুরুষের ভয় রয়েছে। এর নাম পিতৃতান্ত্রিক, বা পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতা। পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতার প্রথম শোষকশ্রেণি পুরুষ, প্রথম শোষিতশ্রেণি নারী।' (আজাদ ১৯৯২, পৃ ১৩-১৪)

অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবদমিত অবস্থা একটি গুরুতর ঐতিহাসিক সমস্যা। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' প্রকাশিত হওয়ার পর সাম্প্রতিককালে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়েছে। সে দিক থেকে নারীর সামাজিক অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে,

'পুরুষ শাষিত সমাজে সব নারীই এক অর্থে নিম্নবর্গ। তাই বলে নারীর কোনো শ্রেণিগত, জাতিগত, সম্প্রদায়গত পরিচয় নেই, এও সত্য নয়। সুতরাং নিম্নবর্গের নির্মাণ দেখতে হলে পুরুষশাষিত সমাজে নারীর অধীনতাও যেমন বিশ্লেষণের বিষয়, তেমনি অন্যান্য ক্ষমতার সম্পর্ক, যেমন শ্রেণি, জাতি, সম্প্রদায়, ইত্যাদি কীভাবে সেই নিম্নবর্গীয় নারীর নির্মাণটিকে আরো জটিল করে তোলে, তাও বিশেষ গবেষণার বিষয়।' (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.২০)

সমালোচক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের উক্ত মন্তব্য স্মরণে রেখে হরিশংকরের কথাসাহিত্যে বর্ণিত তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সমাজে নারীর অবস্থানকে আমরা এক্ষেত্রে স্পষ্ট করতে পারি। ডোনা ল্যান্ড্রির নেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে সমালোচক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক 'নারী' বলতে বুঝিয়েছেন,

'My own definition of a woman is very simple: it's rest on the word "Man" as used in the texts that provide the foundation for the corner of the literary criticism establishment that I inhabit …defining the Word "women" As resting on the word 'Man' is a reactionary Position … one, no rigorous definition of anything is ultimately Possible, so that if one wants to, one could go on deconstructing the Oposition between men and women, and finally show that it is a binary oposition that displaces itself.' (Landry (eds.) 1996, P-54)

স্পিভাকের মতে, তিনি কখনোই নারীর সংজ্ঞা নির্ধারক নন। একজন নারী হিসেবে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাতে তার মনে হয়েছে, 'মানুষ' একটি প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থানিক শব্দ। সেখানে কেউ চাইলে একজন পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিরোধিতার বিনির্মাণ দেখতে পারেন। এমনও মনে করা যেতে পারে যে, এটি একটি বাইনারি বিরোধিতা যা নিজেকে স্থানচ্যুত করে। অর্থাৎ 'মানুষ' শব্দ ব্যবহারের জায়গায় শারীরিক কাঠামো ও বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যে নারী-পুরুষ ভেদ হতেই পারে, কিন্তু সমাজ নারীকে দ্ব্যণুক সম্পর্কের আড়ালে আদিকাল থেকে অধীনস্ত করে রেখেছে। আর স্বাভাবিকভাবেই নিম্নবর্গের ইতিহাস ও সমালোচনা থেকে আমরা জেনেছি অধীনস্থের বিপরীতে অবস্থান করে অধিপতি। ফলে কী সমাজ, কী রাষ্ট্র, কী সাহিত্য—সব ক্ষেত্রে নারীর শোষণ-বঞ্চনার ঘটনা বিশেষভাবে প্রকটিত। তাই গায়ত্রী

চক্রবর্তী স্পিভাক একজন নারী হিসেবে নারীর সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনা করেন নিম্নলিখিতভাবে -

> 'I Construct my definition as a woman not in terms of a woman's putative essence but in terms of words Currently in use. 'Man' Is such a word in common usage. Not a word but the word.I therefore fix my glance upon This word even as I question the enterprise of redefining the Premises of any theory.' (Landry (eds.) 1996 p 54)

হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে বর্ণিত নিম্নবর্গীয় সমাজেও পুরুষের বিপরীতে নারীর দ্বণুক অবস্থানে নারীর অধীনতা লক্ষণীয়। কিছু ক্ষেত্রে নারীকে সন্তান জন্ম দেওয়ার যন্ত্র হিসেবে দেখা গিয়েছে। নারীর প্রতি শারীরিক ও মানসিক পীড়নের ঘটনাও লক্ষণীয়। এছাড়াও নারী-ধর্ষণ, নারী অপহরণের মতো ঘটনাও দেখা গিয়েছে কথাবিশ্বে। বর্তমান আলোচনার পরিসরে নারী শোষণ-বঞ্চনার বিভিন্ন প্রকৃতি ও ধরনগুলি আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

আমরা জানি নারী কোনো ভিনগ্রহের প্রাণী নয়। তার মধ্যেও রয়েছে চেতনা-অবচেতনার অবস্থান। নারীও সমাজ-পরিবার-অর্থনীতি দ্বারা প্রভাবিত। নারী একদিকে যেমন স্নেহ-প্রেম-ধৈর্য-মমতার প্রতিমূর্তি তেমনই অন্যদিকে হিংসা-লোভ-ক্রোধ-ক্ষোভ তাকে মাঝেমধ্যেই হিংস্র করে তুলেছে। স্থান ও পরিবেশগত কারণেই এই নারী চরিত্রায়নের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও প্রকৃতি। হরিশংকর জলদাস তাঁর কথাবিশ্বের সমাজের তথাকথিত যে নিম্নবর্গের কথা বর্ণনা করেছেন সেখানে জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুর স্রোতে বহমান বিভিন্ন বিচিত্র নারী চরিত্র যেমন মূর্ত হয়ে উঠেছে, তেমনই নারীদের প্রতি শোষণ-বঞ্চনার ছবিও উঠে এসেছে।

৪.১.৪.১ শারীরিক নির্যাতন ও লাঞ্ছনা

'জলপুত্র' উপন্যাসে দেখি জোনাব আলীর বাবা পুরনোপন্থী বৃদ্ধ মানুষ। সরকার একসময় তার জমির উপর দিয়ে রাস্তা তৈরি করেছিল এবং সেই জমির মূল্যও শোধ করেছিল। তার ধারণা রাস্তাটির মালিক সে। ফলে জেলেদের এই রাস্তা দিয়ে সমুদ্রে যাওয়ার মূল্য হিসেবে বিনা পয়সায় মাছ নেয় সে। এরকমই একদিন বংশীর মা ও ভুবনেশ্বরী মাছ ভর্তি খাড়াং নিয়ে এই পথ দিয়ে গেলে পেছন থেকে জোনাব আলির বাবা তাদের দাঁড়াতে বলে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে। কারণ বংশীর মা আগের দিন তাকে মাছ না দিয়ে চলে গিয়েছে। বংশীর মা 'জনইপ্যার বাপ'কে মুখ খারাপ করতে মানা করলে, ক্ষেপে গিয়ে সে বলে,

> 'ধুত্তোর মুখ খরাপর মারে চুদি, মুখ খরাপ মারাঅদ্যে না, খানকি।' বলে এক ঝটকায় বংশীর মায়ের মাথা থেকে মাছের খাড়াংটা মাটিতে ফেলে দিল জোনাব আলীর বাপ।...

বংশীর মা অসহায় দৃষ্টিতে জনইপ্যার বাপের দিকে তাকিয়ে থাকল।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৬৮)

জোনাব আলির বাবা এ ধরনের অন্যায় ও বংশীর মা'র অসহায়তা সমাজে পুরুষ ও নারীর বিপরীত অবস্থানকে স্পষ্ট করেছে। যেখানে একদিকে প্রতাপের প্রদর্শন অন্যদিকে অধীনতার অসহায়তা উঠে এসেছে। শুধু তাই নয়, এরকমই লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের সাক্ষী আমরা হয়েছি, যখন কর্ণফুলী নদীর পাড়ে কমলমুন্সির হাটে মাছ বিক্রি করাকালীন এক মধ্যবয়সী লোকের হাতে ভুবন লাঞ্ছিত হয়েছে। দেখা যায়, হাটে ভুবন ইচা মাছ নিয়ে বসেছে। মাছগুলো তাজা বলে তার সামনে অনেক ক্রেতার ভিড়। এরই মধ্যে একজন মধ্যবয়সী লোক হঠাৎ চিৎকার করে বলে-

'অই ডুমিনি, কঁত্তেত্তোন দাম পুচ গরির দে, দাম কা নো কঅর? বলেই সে ছাতার বাঁট দিয়ে ভুবনের মাথায় ঠেলা দিল।

বাঁটের ঠেলায় ভুবন চিৎ হয়ে পড়ে গেল। তার হাতে-মুখে-গায়ে কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল।'

(জলদাস ২০০৮, পৃ. ১০১)

ঘটনাটি ব্যাখ্যা করলে বোঝা যায়, প্রথমত ক্রেতাদের ভিড় ও শোরগোলে ভুবনের সকলের কথা না শোনাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই মধ্যবয়সী লোকটি মাছের দাম বারবার জিজ্ঞেস করার দাবি জানিয়ে ভুবনকে 'ডুমিনি' বলে ছাতার বাঁট দিয়ে তাকে আঘাত করেছে। আঘাতের আসল আভ্যন্তরীণ কারণ হল, সেই ভদ্রলোকের বিরক্তি ও দম্ভ। তার কথার মধ্যেই ধরা পড়েছে সেই দম্ভের আস্ফালন। সে মনে করেছে যে, তার মতো ক্ষমতাবান মানুষের কথার উত্তর না দেওয়ার সাহস কীভাবে হয় একজন সামান্য জেলেনারীর। মূলত এই কারণেই সেই লোকটির এ ধরনের অন্যায় আঘাত করা।

শুধু সামাজিক ক্ষেত্রে নয়, পারিবারিক ক্ষেত্রেও নারীরা লাঞ্ছিত-নিপীড়িত। যেমন 'সুখলতার ঘর নেই' উপন্যাসে মৎস্যসমাজের পাশাপাশি যতটুকু জেলেসমাজ অর্থাৎ মানব সমাজের কথা উঠে এসেছে সেখানে দেখা যায়, উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের চিন্তামণি বহদ্দারের দুই ছেলে—ঝলক ও পুলক। ঝলক গাঁজাখোর। চিন্তামণি ঝলককে বিয়ে করানোর পর থেকেই সে তার স্ত্রীয়ের প্রতি শারীরিক নির্যাতন করেছে। উপন্যাসের বর্ণনানুযায়ী-

'গেজেল ঝলক শুধু বউ পেটায়। মারের চোটে বড়ো বউ হাঁইচনি বালা বিলাপ করে, 'ও মারে, আরে কিয়ল্লাই এই পোড়া কোয়াইল্লার লগে বিয়া দিয়চ রে মা? দেওতাছাড়ার মাইর আঁই ত আর সইয্য গরিত্ নো পারির রে মা!'

(জলদস ২০১৯(খ), পৃ. ৯২-৯৩)

ঝলকের এভাবে স্ত্রীকে শারীরিক নির্যাতন করার পেছনে কোনো যে কারণ নেই তা চিন্তামণির কথাতেই স্পষ্ট। শ্বশুর হিসেবে পুত্রবধূর লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারে না সে। তাই ক্ষোভে গালাগাল করতে থাকে সে। স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলে ওঠে-

'কুত্তার বাইচ্চা হুদা হুদা বউয়েরে মারের কা? বউ পিডাইতে ভালা লাগে না খানকির পোয়াত্তোন?'

(জলদস ২০১৯(খ), পৃ. ৯৩)

চোখের সামনে পুত্রবধূকে নির্যাতিত হতে দেখে চিন্তামণি ও মোরেশ্বরী নিজেদের মধ্যে সমালোচনা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না, তারা জানে যে ঘরে নারী জাতি লাঞ্ছিত হয় সে ঘরে শ্রী থাকে না। ছেলের এই অন্যায়ে মায়ের মুখ থেকে স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে আসে-

'হিতে নিষ্ঠুর। বেইমান হিতে। দিন-রাইত যে বউঅর সেবা ল, হেই বউয়েরে পিডায়। ধ্বংস হই যাইবো ঝলইক্যা।'

(জলদস ২০১৯(খ), পৃ. ৯৪)

স্বামীর হাতে স্ত্রী নির্যাতনের ঘটনা একইভাবে চোখে পড়ে 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে। লক্ষণীয় সুধাংশু তার বড়ো মেয়ে ফাল্গুনীর বিয়ে দেয় শিকলভাঙা গ্রামের এক শিক্ষিত ছেলে অরবিন্দের সঙ্গে। বিয়ে দেওয়ার সময় পাত্র সম্পর্কে ভালোমতো খোঁজ খবর না নিয়ে একপ্রকার তাড়াহুড়ো করে মেয়ের বিয়ে দেয় সুধাংশু। কিন্তু বিয়ের প্রায় এক বছর পর সুধাংশু তার দূর সম্পর্কের সুশীলা পিসির কাছে অরবিন্দের আসল চেহারার সন্ধান পায়। সুশীলা পিসি জানায়-

'চাকরি থেকে ফিরেই অরবিন্দ জুয়ার আড্ডায় বসে যায়। ছুটিছাটার দিনে রাতে-দিনে বিরামহীন জুয়া খেলে যায় অরবিন্দ। বাপ-মায়ের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই অরবিন্দের ওপর। মাঝে মাঝে মদ গিলে বাড়ি ফিরে সে। ফাল্গুনীর সঙ্গে ঝগড়া করে। তার গায়ে হাত তোলে। ফাল্গুনীর কান্নার আওয়াজ এই পাড়ার আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়ায়।'

(জলদাস ২০১৯, পৃ. ১৭৯)

ফলে কন্যা অন্তপ্রাণ মাতা-পিতার মানসিক অবস্থা ভাঙতে থাকে। অবসর সময়ে উঠোনের এক কোণে বসে বিলাপ করে মা অহল্যা।

'তোর গায়ে কোনোদিন হাত তুলিনি রে মা, ফুলের একটা বাড়ি পর্যন্ত দিই নি তোর গায়ে। আমার পরম আদরের কন্যা ফাল্গুনী আজ শ্বশুরবাড়িতে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছিস! হা ঈশ্বর! এই অন্যায়ের প্রতিবাদ আমি কী করে করব! কার কাছে বিচার চাইব প্রভু! (জলদস ২০১৯, পৃ.১৮৩)

লক্ষণীয়, স্ত্রীকে নির্যাতন করার পর অরবিন্দের মধ্যে কোনো ভাবান্তর নেই। ফাল্গুনীর অসহায়তা ও প্রতিবাদহীনতাকে নারীর দুর্বলতা মনে করে তার ওপর আরো নির্যাতন করা হয়েছে। অন্যদিকে নিজের কন্যা সন্তানের এরকম শারীরিক নির্যাতনের কথা জেনেও একজন মায়ের অসহায়তা ও নিরুপায় অবস্থা দেখে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে নিম্নবর্গ করে রেখেছে। এর কারণ ব্যাখ্যা

করলে দেখা যায়, জেলেসমাজে একজন নারী পরিবারের আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম ও সন্তান সামলানোর পাশাপাশি জেলেপুরুষের উপার্জনেরও সহায়ক হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো অর্থনৈতিক নিরাপত্তা তাদের থাকে না। ফাল্গুনীর ক্ষেত্রে এই অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা অনেকাংশেই তাকে প্রতিবাদহীন করে তুলেছে। দ্বিতীয়ত, পুরুষের সামর্থ্য ও বাহুবলের কাছে নারীর বাহুবল অপেক্ষাকৃত কম হওয়ার সুযোগ নেওয়া হয়েছে। ফাল্গুনীর এইভাবে পড়ে পড়ে মার খাওয়া তাই নিরুপায় হয়ে সহ্য করতে হয় আর একজন নারীকে, যে তার জন্মদাত্রী মা অহল্যা। তাই বিলাপ করা ছাড়া অন্য কোনো পথ থাকে না তার। সর্বোপরি একজন নারীর ক্ষমতায় যতটা মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতা থাকে, তার অধিকাংশই একজন পুরুষের মধ্যে থাকে না। অন্তর্জগৎ হোক বা বহির্জগৎ- পুরুষ ধ্বংস করে, নারী সেখানে সৃষ্টি করার মানসিকতা পোষণ করে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'The nation and Its Women' প্রবন্ধে জানান একজন নারী কীভাবে তার পরিবার, জীবনের বহমানতাকে বহির্জগৎ থেকে সুরক্ষা প্রদান করে।

> 'Further, within the human species,Women cultivate and cheris these god like qulities for more than do men. Protected to a certain extent from the purely material pursuits of securing a livelihood in the external world, women express in their apearance and behavior the spiritual qualities that are characteristic of civilized and refind human society.' (Guha (ed.) 1997, p- 250-51)

যে নারী সমাজের জন্য, পরিবারের জন্য, সভ্যতার জন্য নিজেকে উজাড় করেছে প্রতিটি ক্ষেত্রে সেখানে সেই নারীই চার দেওয়ালের মধ্যে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হয়েছে। এ কেবল সাম্প্রতিককালের প্রতিফলন নয়, যুগ যুগ ধরে নারীরা এভাবেই অবহেলিত ও নির্যাতিত। কাল, সমাজ নির্বিশেষে নারী অবমাননা সাহিত্যেও উঠে এসেছে বারংবার। হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বেও এর অন্যথা হয়নি। 'দুখিনি' গল্পে দেখি, কিষ্টপদ ও রসবালার দাম্পত্য জীবন বছর সাতেক সুখকর কাটলেও অভাব ও দারিদ্র্য সংসারের আনন্দগুলো মুছে দিয়েছে ধীরে ধীরে। কিষ্টপদর নিজস্ব জাল-নৌকা ছিল না বলে সে দিনমজুরের কাজ নেয়। কিন্তু তাতেও সংসারের অভাব দূর হয় না। ফলস্বরূপ মাঝে মাঝেই স্বামী-স্ত্রীতে বচসা শুরু হয়। বচসার একপর্যায়ে ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কিষ্ট রসবালাকে পেটায়। স্ত্রীকে পেটাতে পেটাতে একসময় ক্লান্ত হয়ে কিষ্টপদ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। অন্যদিকে অসহায় রসবালা বিলাপ করে-

> 'এই ভাদাইম্যার হাতত্ পড়ি আঁর জীবননান্ ছারখার অই গেল্গই। অলইক্ষা, ভাত দিত্ নো পারের, কিলাই কিলাই আঁর হাড্ডিগুড্ডি জর জর গরি ফেলাইলো রে মা।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ.৪১)

অন্যদিকে 'দুলারি এবং কয়েকজন' গল্পে মহেশখালি জেলেপল্লির এক দরিদ্র ঘরের দুলারি চট্টগ্রাম শহরে আসে উপার্জনের আশায়। সেখানে শ্যামল দত্ত নামের এক জোচ্চরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয় দুলারির। তারা বিয়ে করে। বিয়ের প্রায় এক বছর পর তাদের সন্তান হয় এবং দুলারি একদিন জানতে পারে

শ্যামল আগে থেকেই বিবাহিতা। সে তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এই নিয়ে তাদের মধ্যে বচসার সূত্রপাত হলে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে শ্যামলের। ক্ষোভে, ক্রোধে সে দুলারিকে চড় মারে-

> ‘প্রচন্ড একটা চড় বসাল শ্যামল দুলারির বাম গালে। ঘুরে মেঝেতে পড়ে গেল দুলারি।’ (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ.৯৪)

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা মান-অভিমান পরিবার ও সংসারের ক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক হলেও নারী প্রহার আসলে এক প্রকার দমননীতিরই প্রতিফলন। কিছু ক্ষেত্রে তা এমন রূপ নিয়েছে যাতে একজন নারীর মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। এরকমই ঘটনা আমরা লক্ষ করি ‘ভাঙন’ গল্পে। গল্পে জানা যায়, বগলা নদীর তীর ঘেঁষে অবস্থিত ডোমপাড়ার নামকরা ডোম দয়ালহরি স্ত্রীর সঙ্গে কোনো কারণে বচসা বাঁধে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে

> ‘...বউয়ের বাম কান বরাবর একটা থাপ্পড় বসিয়ে ছিল দয়ালহরি। ওই এক থাপ্পড়েই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গিয়েছিল যশোদার।’ (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ১৪৬)

ইতিপূর্বে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক একজন নারীর চোখ ও অভিজ্ঞতা দিয়ে নারীকে সংজ্ঞায়িত করার সময় পুরুষ ও নারী অবস্থান প্রসঙ্গে বলেছিলেন- ‘It is a binary oposition that displaces itself.’—এর সত্যতা আমরা বংশীর মা, হাইচনিবালা, ফাল্গুনী, দুলারি, রসবালা ও যশোদার ক্ষেত্রে লক্ষ করলাম কারণ স্পিভাকের মতে-‘... ‘Woman’ as resting on the word ‘man’ is a reactionary position.’ উল্লেখিত এই ‘Reactionary position’ এর কারণে নারী ও পুরুষের মধ্যে দ্বিমুখী বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে।

‘রামগোলাম’ উপন্যাসের সমাজ বর্ণনা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে নারী নিপীড়নের ঘটনা। আমরা জানি মেথররা সমাজের দুর্গন্ধময় নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার করে বলে মানসিকভাবে তৈরি থাকার জন্য তারা মদের নেশা করে। মদের নেশা মেথর সমাজে প্রচলিত ও স্বাভাবিক। কিন্তু এই মদের নেশার জন্যই অনেক পরিবারের শান্তি বিনষ্ট হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। উপন্যাসে দেখি, মেথর সমাজে নারীরা কর্মঠ। পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারাও করপোরেশনে ঝাড়ুদারের কাজ করে। কিন্তু জীবনযাপনের হিসেব দেখলে বোঝা যায়-

> ‘মেথরসমাজে সন্তান ধারণ করা থেকে লালনপালন, অসুখে রাতজাগা থেকে মন্দিরে পুজো, বাজার করা থেকে ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া—সবই নারীদের কাজ। পুরুষরা শুধু বউয়ের পেটে সন্তান আনবে, টাকার জন্য বউ পেটাবে ...’
>
> (জলদাস ২০১২, পৃ. ৪৯)

যদিও মেথরপট্টির কিছু পরিবারের পুরুষরা মদের নেশা থেকে মুক্ত। কিন্তু অধিকাংশ মেথর পরিবার মদ গাঁজার নেশার কারণে সাংসারিক ও পরিবার জীবন বিপন্ন ও বিধ্বস্ত। তাইতো মেথরানীরা নিরুপায় হয়ে মন্দিরে কালীমাতার কাছে প্রার্থনা করে-

> 'হে মা কালী, তুমি আমার মরদের মধ্যে সুবুদ্ধি সৃষ্টি করো। সে যেন মদ খাওয়া ছেড়ে দেয়—এই আশীর্বাদ করো মা। নিজের আয়ের টাকা সে মদের পেছনে উড়ায়; সন্ধেয় আমার ইনকামটাও কেড়ে নেয় সে। ..টাকা না দিলে পেটায় আমাকে, চুলের মুঠি ধরে বেদম পেটায়।' (জলদাস, ২০১২, পৃ. ৪২)

এ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা লক্ষ করলাম নারী মূলত নির্যাতিত হয়েছে একজন পুরুষের দ্বারা। সে ঘরেই হোক বা বাইরে। সমালোচক পার্থ চট্টোপাধ্যায় যে অর্থে একজন নারীকে নিম্নবর্গ রূপে গণ্য করেছেন, সেখানে মূলত গ্রামশি কথিত নিম্নবর্গের অধীনতার চেতনা, তাদের সীমিত শক্তির কথাই প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচক ডেভিড আর্নল্ড নিম্নবর্গ সম্পর্কে গ্রামশির বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে উপলব্ধি করেন-

> 'Gramsci's use of the term 'subaltern' further invites us to apreciate the common properties of subordinate groups as a whole - the shared fact of their subordination, their intrinsic weaknesses, their limited strengths.' (Chaturvedi (ed.) 2000, p.33)

অর্থাৎ 'Subaltern' শব্দ ব্যবহারের মধ্যে সেখানে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে তাদের অধীনতা, দুর্বলতা ও সীমিত শক্তি। এই বক্তব্যকেই যখন আমরা কোনো স্ত্রীয়ের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে যাই তখন দেখা যাবে, একজন স্ত্রী তার স্বামীর অধীনতা স্বীকার করে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণে চাহিদা পূরণের ভিত্তিতে। দ্বিতীয়ত, পারিবারিক পরিমণ্ডলে সন্তানের জননী হিসেবে ও পারিবারিক সম্পর্কের আড়ালে সে দুর্বল এবং তৃতীয়ত, তার সীমিত দৈহিক শক্তি। নারীর এই সীমিত গণ্ডির মধ্যে একজন পুরুষ তার সর্বস্ব শক্তি আরোপ করলে নারীর কোনোঠাঁসা অবস্থা অনিবার্য। ফলে স্বামীর হাতে তারা প্রায়শই প্রত্যাখ্যাত হয়, প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হয়। কিন্তু তবুও পরিবারের সম্পর্কে দূর্বলতার জালে জড়িয়ে একজন নারী অসহায় ও প্রতিবাদহীনভাবে ঘরের এক কোণে মুখ বুজে পড়ে থাকে। ঐতিহাসিক সমালোচক পার্থ চট্টোপাধ্যায় নারীর অসহায়তা ও মানিয়ে নেওয়ার আদর্শকেই নারী সুলভ আচরণ বলেছেন। জীবনের বাহ্যিক অবস্থা ও নারীসুলভ আধ্যাত্মিক গুণাবলী একজন নারী কোনো অবস্থাতেই হারাতে নারাজ। কারণ নারীর এই গুণাবলীর কারণেই বাড়ি সংসারে পরিণত হয়, সংসার পরিবারে পরিণত হয়। নারীর এই আচরণ আসলে তাদের এক প্রকার শক্তি, কিন্তু একজন পুরুষের সঙ্গে তার দ্ব্যণুক বৈপরীত্য ক্ষমতার প্রতিফলনে তাদের শোষিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত হতে হয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য অনুযায়ী-

> 'The home was the principal site for expressing The Spiritual quality of the national culture, and Women must take the main responsibility for protecting and nurturing this quality. No matter about the changes in the external condition of life for women, they must lose their essentially Spiritual (that is, faminine) vertues; they must not,..'. (Guha (ed.), 1997(b) p. 251-52)

সমালোচক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর বিতর্কিত প্রবন্ধ 'Can the Subaltern Speak?' প্রবন্ধে নিম্নবর্গের প্রতিবাদের ধরন ও চেতনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে নারী সংক্রান্ত আলোচনাকে বিশেষভাবে নিম্নবর্গের ইতিহাস ব্যাখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। নারীকে পৃথকভাবে নিম্নবর্গের আত্ততাভুক্ত করার বিভিন্ন কারণ উদাহরণসহ দেখিয়েছেন। বিশেষ করে নারী ধর্ষণের প্রসঙ্গে তিনি জানান-

> 'In the former case, a figure of 'women' is at issue one where minimal prediction and indeterminate is already available to the phallocentric tradition... For The figure of women the relationship between women and silence can be plotted by women themselves race and class differences are subsumed under that change. Subaltern Historiography must confront the Impossibility of such gestures.' (Ashcroft (ed.) 1997, p. 82)

অর্থাৎ নারীর শারীরিক গঠন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যা কিনা সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বিরাজমান। নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনায় নারীর এই অবস্থাকে অবশ্যই একটি বিশেষ অঙ্গভঙ্গির মুখোমুখি হতে হয়েছে।

বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক সিগমুন্ড ফ্রয়েড তাঁর 'The Differentiation between men and women'-প্রবন্ধে নারী ও পুরুষের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বলেন,

> 'As we all know, it is not unfill pubcrty that the sharp distinction is established between the masculine and feminine characters.... It is true that the masculine and feminine disporitions are already easily recognizable in childhood. The development of the inhabitation of sexuality (shame, disgust, pity, etc.) takes place in little girls earlier and in the face of less resistance than in boys; The tendency to sexual repression seems in general to be greater; and where the component instimets of sensuality apear, they prefer the passive form.' (Freud 1962, p 85)

আমরা জানি যৌনমনস্তত্ত্ব অনুযায়ী একজন পুরুষ অধিকার করে এবং একজন নারী অধিকৃত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে। ফ্রয়েড তাঁর যৌন মানসিক বিকাশ তত্ত্বে জানিয়েছেন মানুষের মন প্রচণ্ডভাবে গতিশীল। ফলে আমাদের চিন্তা ও চেতনার গতি আলোর গতির চেয়েও বহুগুণ বেশি। কিন্তু যে সমাজে আমরা বাস করি সেই সমাজের রয়েছে কিছু বিধি নিষেধ। সমাজ ব্যবস্থার সমস্ত বাধা ও বিরোধকে মেনে নিয়ে আমাদের জীবন ধারণ করতে হয়। ফলে আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন নই। মানব মনের যে কামনা-বাসনা ও যৌন তাড়না উদ্দীপিত হয় তা এই বাধা নিষেধের ফলে অতৃপ্ত থেকে যায়। বাধ্য হয়ে সেই ইচ্ছেগুলোকে অবদমিত করতে হয়। এই অতৃপ্ত ইচ্ছেগুলোই স্থান করে নেয় আমাদের অচেতন স্তরে। ফলে এই অবদমনের চেষ্টা থেকে আমাদের মনে সৃষ্টি হয় এক বিপরীতমুখী বিরোধের যা কিনা লজ্জা,

ঘৃণা, ভয়, দুঃখ ইত্যাদি নেতিবাচক অনুভূতি সহ এক মানসিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। আসলে কামপ্রবৃত্তির উপস্থিতি হল একজন মানুষের জৈবিক সংগঠনের মৌলিক উপাদান। যার ফলে একজন শিশুর জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে আত্মকামী সত্তা হিসাবে যৌন অনুভূতি কেন্দ্রিক কামপ্রবৃত্তির দিকে এগিয়ে যায়। এই কামসত্তার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে রয়েছে প্রেম, ভালোবাসা, বন্ধুপ্রীতি, আদর, সোহাগ ইত্যাদি এবং এর বৈশিষ্ট্য হিসাবে ফ্রয়েড কিছু তাত্ত্বিক ধারণার উল্লেখ করেছেন। যেমন ইদিপাস এষণা, ইলেক্ট্রা এষণা, মর্ষকাম, ধর্ষকাম, জীবনবৃত্তি এবং মরণবৃত্তি। একজন পুরুষ শিশু আত্মকাম প্রবৃত্তির ফলে বিপরীত লিঙ্গ মায়ের প্রতি যে যৌন আকর্ষণ অনুভব করে এবং একই লিঙ্গ হওয়ার কারণে পিতার প্রতি যে ঈর্ষা পোষণ করে একেই ফ্রয়েড ইদিপাস এষণা বলেছেন। আবার এর বিপরীত ক্রিয়ায় একজন স্ত্রী শিশুর পিতার প্রতি আকর্ষণ ও মায়ের প্রতি ঈর্ষা অনুভব করাকে বলা হয়েছে ইলেক্ট্রা এষণা। মর্ষকামের প্রবৃত্তি হল ভালোবাসার মানুষের হাতে নিগৃহীত হয়ে যৌন সুখ নেওয়া এবং ধর্ষকাম হল ভালোবাসার মানুষকে নিপীড়ন করে যৌন তৃপ্তি পাওয়া। মূল কথা হল, একজন নারী বা পুরুষ তাদের জৈবিকসত্তা নিয়েই নিজেকে সম্পূর্ণ অনুভব করে। কিন্তু সমাজ-সংস্কার নারী পুরুষকে সমান মর্যাদা দেয়নি। এর কারণ হিসাবে রয়েছে একাধিক যুক্তি গ্রাহ্য ব্যাখ্যা। (Freud 1962, p 85-87)

প্রথমত, নারীদের অবমূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে আছে পুরুষের পেশি শক্তি।

দ্বিতীয়ত, একজন পুরুষের সত্তায় রয়েছে অধিকার করার ইচ্ছা এবং নারীর মধ্যে রয়েছে অধিকৃত হওয়ার অপেক্ষা।

তৃতীয়ত, যৌন সঙ্গমকালে একজন পুরুষ নারীকে বশ করে, লিঙ্গ দ্বারা বিদ্ধ করে।

তবে আমাদের মনে হয়েছে যৌনতা ও ধর্ষণের মধ্যে রয়েছে সম্মতির পার্থক্য। নারী পুরুষ কিংবা সমকামীর সম্মতিতে যখন কোনো যৌন মিলন সংগঠিত হয় তখন সেটা যৌনতা এবং কোনো একজনের অসম্মতিতে সেই ক্রিয়া সম্পন্ন হলে তা হবে ধর্ষণ।

নারীদের অবমূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে পুরুষের পেশীশক্তি প্রদর্শন এক অর্থে নারী-পুরুষের অবস্থানের প্রেক্ষিতে হেজেমনির প্রয়োগ। নারী শোষণ বা ধর্ষণ সমাজ সৃষ্টির আদিকাল থেকেই একটি গুরুতর সমস্যা। দেশকাল নির্বিশেষে নারী ধর্ষণের মতো ঘটনায় সমাজ আক্রান্ত। তবে একথা অনস্বীকার্য যে হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে বর্ণিত নিম্নবর্গের সমাজে অবৈধ সম্পর্কের ভিত্তিতে যৌনতার কথা রয়েছে। বিশেষ করে জেলেসমাজের বর্ণনায় আমরা বারবার এই শারীরিক সম্পর্কের কথা পেয়েছি। নিম্নবর্গীয় সমাজে এই অবৈধ সম্পর্ক বা যৌন বর্ণনা আমাদের কোনোভাবেই অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম মনে

হয়নি। বরং তা তথাকথিত সমাজ বাস্তবতাকে বজায় রেখেছে। কিন্তু নারী ধর্ষণ প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। হরিশংকর জলদাস তাঁর কথাসাহিত্যে ধর্ষণের মধ্য দিয়ে একজন পুরুষ তার বিপরীতে নারীকে কীভাবে নিম্নবর্গ রূপে নির্মাণ করেছে তাঁর রূপকল্পটি স্পষ্ট করেছেন। আলোচনার এই পরিসরে আমরা সেই দিকটা দেখে নেব।

'দহনকাল' উপন্যাসে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে জনজীবন বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে যখন মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে পাকিস্তানী সৈন্যরা জেলেপাড়াকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে তাদের আস্তানা তৈরি করে। এই ঘটনার প্রায় সাত দিনের মধ্যে পাক সৈন্যরা উত্তর পতেঙ্গা জনজীবনকে অস্থির করে তুলেছে। তাদের সঙ্গে গিয়ে যুক্ত হল জেলেপাড়ার আব্দুল খালেক ও তার রাজাকার বাহিনী। তাদের কাজ হল জেলেপাড়াকে ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখা যাতে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে না পারে। এই ভয় দেখানর নামে তারা দিনে-রাতে যেকোনো সময়ে জেলেপাড়ায় ঢুকে নারী ধর্ষণ শুরু করে। এরকমই একদিন পাক সৈন্য দলের প্রধান আসরাত আনসারি ও তার দলবল সন্ধের সময় রাধেশ্যামের বউকে একা পেয়ে ধর্ষণ করেছে। দেখ গেল-

> 'আনসার বেরিয়ে এলে একে একে অন্য চারজন বর্বর সেই ঘরে ঢুকল আর বেরোল, বেরোল আর ঢুকল।
>
> ধর্ষণ প্রক্রিয়াটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাজাকার সেলিম ও খলিল বুক টান করে ঘরটির সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। তাদের চোখে-মুখে রতিক্রিয়ারত হায়নার উল্লাস।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৭১)

দিনের পর দিন জেলেপাড়ায় পাক সৈন্যের এই ধরনের বর্বর অত্যাচারে জেলেপল্লি বিধ্বস্ত। সকলের মনেই নারী লাঞ্ছনার আতঙ্ক। আমরা লক্ষ করলাম- পাড়ার অন্যান্য জেলেনারী ও জেলেকন্যার মতো পরিমলের বউও ভীত ও আতঙ্কিত। সেই আতঙ্কের ফলে ঘরের মেয়েদের ঠাকুরমারা

> 'কারও নজরে না-পড়ার জন্য ছেঁড়াফোঁড়া শাড়ি পরিয়ে রাখে, ঘরের বাইরে যেতে দেয় না। এই জেলেপল্লির প্রতিটি অবিবাহিত মেয়ের মুখে-গলায় মায়েরা ঠাকুমারা দিনের শুরুতেই পাতিলের তলা থেকে কালি নিয়ে লেপ্টে দেয়, যাতে কোনো হায়নার চোখ না পড়ে সেই মুখে।' (জলদাস ২০১০, পৃ.১৭৬)

অন্যান্য দিনের মতো পরিমলের বউকেও দেখা যায় তার মেয়ের মুখে কালি মাখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। হামিদ, এমদাদ, সেলিমদের মতো নৃশংস রাজাকাররা মিলে বিশাখাবালাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে। পরের দিন সকালে-

> 'পরিমলের মেয়ে বিশাখাবালাকে পাওয়া গেল চানমিয়ার কলাবাগানে। ..সেই কলাবাগানের মাঝে বিশাখাকে পাওয়া গেল অচৈতন্য অবস্থায়। রক্তাক্ত, মুখে-গলায় আঁচরের দাগ, ব্লাউজ ছেঁড়া।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৭৭)

উপন্যাসে জানা যায়, আসরাত আনসারি নারীলোভী। জেলেপাড়ায় যত ধর্ষণ হয়েছে তার পেছনে রয়েছে আসরাত আনসারির লোলুপ কামনা। যে কারণে পাকিস্তান প্রশাসক তাকে পূর্ব-পাকিস্তানে

পাঠিয়েছেন তা আনসারির কাছে মুখ্য নয়। নারী শরীর ভোগ করাটাই তার কাছে কাম্য। তাই একদিন জেলেপাড়া পরিদর্শনে বেরিয়ে সে জেলেপাড়ার মসজিদের ইমাম খবিরউদ্দিনের বাড়িতে তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু রাজাকার হামিদ আনসারির এই ইচ্ছার বিরোধিতা করে বলে ইমামের স্ত্রীকে ধর্ষণ করা অপরাধ। কিন্তু আনসারির চোখ তখন কাম লোলুপ। সে হামিদকে আঘাত করে বলে-

> 'রেহেনে দে গুনাহ্। হামে পূর্ব পাকিস্তান মে ভেজা দুশমনকো খাতাম ক্যরকে ছোয়াব কামানে কে লিয়ে। হাম ইয়াহাঁ যো ভি ক্যরেঙ্গে ছোয়াব কামানে কে লিয়ে ক্যরেঙ্গে।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৯১)

এখানে আসরাত আনসারির কথাতে স্পষ্ট যে তার হাতে আছে সেই ক্ষমতা যার অপপ্রয়োগে সে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি সাধারণ জনজীবনকেও বিপর্যস্ত করতে পারে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় প্রভুশক্তি মুক্তিযোদ্ধাদের বিনাশের উদ্দেশ্যে সৈন্যদের ক্ষমতা প্রদান করলেও তাদের হাতে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ঘটেছে। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদমন করতে এসে পাক-সৈন্যরা নারী ধর্ষণ করে অমানবিকতা ও নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে।

'অর্ক' উপন্যাসেও লক্ষণীয়, সর্বানন্দের কুমারী মেয়েকে ধর্ষণ করে যায় চারজন পাক-সেনা। এরকমই ঘটনা ঘটতে দেখা যায় 'দইজ্যা বুইজ্যা' গল্পে। উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের জেলেপাড়ার জগমোহনের কন্যা পারুলবালাকে ক্যাপ্টেন মার্শেদ ধর্ষণ করেছে। পাক-সৈন্যের নৃশংস অত্যাচারে জেলেপাড়া আতঙ্কিত। কিন্তু পাকসেনাদের হাত থেকে মুক্তি নেই তাদের। পারুলকে প্রথমবার ধর্ষণ করার বেশ কিছুদিন পর ক্যাপ্টেন মোর্শেদের স্ত্রী প্রেরিত চিঠিতে জানতে পারে, স্ত্রী তার জন্য অপেক্ষারত। ফিরে যাওয়ার প্রার্থনায় মোর্শেদ বড়ো তৃপ্তি বোধ করে। বউয়ের চিঠি তার শরীরে কাম জাগায়। রাজাকার মজিদের বুঝতে অসুবিধে হয় না মোর্শেদের এখন একজন নারীর সঙ্গ প্রয়োজন। তাই সে তাকে জেলেপাড়ায় জগমোহনের বাড়ির সামনে নিয়ে আসে। পারুলকে ঘরে না পেয়ে তার মা তোতারানিকেই ভোগ করে মোর্শেদ।

ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী নারীরা যেখানে মা ও দেবীর সঙ্গে তুলনীয় সেখানে নারীজাতি সমস্ত রকম আধিপত্যের শিকার। তাদের প্রতি সহজে জোর-জুলুম করা যায়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাই ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে নারী অবস্থান সম্পর্কে তাঁর 'The Nation and its women'-প্রবন্ধে জানিয়েছেন,

> 'As with all hegemonic forms of exerciring Dominance, this patoriaehy eombined coercive authority with the subtle force of persuasion. This was expressed most generally in the intervate ideological form of the relation of power between the sexes: the adulation of woman as goddess or as mother.'
> (Guha (ed.) 1997(b), p 256-57)

অর্থাৎ নারীর প্রতি অবমাননা আসলে দুই বিপরীত লিঙ্গের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ক যা সাধারণত আদর্শগতভাবে প্রদর্শিত হয়। তা সে রাজনৈতিকভাবেই হোক, অর্থনৈতিকভাবেই হোক বা যৌনতার দিক থেকেই হোক, নারী শোষণ একপ্রকার 'Hegemonic forms of exercising dominance'। তবে শুধু রাজনৈতিক কারণেই যে হরিশংকরের কথাসাহিত্যে নারী ধর্ষণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এমন নয়। সমাজের সব ক্ষেত্রেই নারী ধর্ষিত। আসলে নারী যেখানেই একা, যেখানে সে অসহায়, যেখানে সে নিরুপায় সেখানেই পুরুষ তার সুযোগ নিয়েছে, নারীকে ধর্ষণ করেছে। সাহায্যের বিনিময়ে নারীদেহ ভোগ করেছে। 'দুলারি এবং কয়েকজন' গল্পে দেখি দুলারি শ্যামল দত্তের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসে। অসহায়-নিরুপায় দুলারির কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। বাধ্য হয়ে সে একরাতে অসহায় অবস্থায় বহদ্দারহাটে আশ্রয় নেয়।

> 'সেখানে প্রথম রাতেই দুলারি ধর্ষিতা হল। দু'জন ষন্ডা তাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে রক্তাক্ত করল। বস্তি ছাড়ল সে। তারপর ভেসে চলা—এ-জায়গা থেকে ও-জায়গায়, এ-ফুটপাত থেকে সেই ফুটপাতে।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৯৪-৯৫)

ফুটপাতে এসেও দুলারিরা নিস্তার পায় না। অসহায় একজন নারীকে পাড়ার জগলু মস্তান ও তার দল মিলে কিছু খাবারের বিনিময়ে শারীরিকভাবে শোষণ করেছে। কিছু ক্ষেত্রে দুলারির শারীরিক শোষণ করেও বিনিময়ে কিছুই না দিয়ে চলে যায় তারা। ক্ষুধার যন্ত্রণা ও মানসিক বিপর্যস্ত দুলারি তাই ভদ্রলোক দেখলেই ক্ষেপে গিয়ে নিরন্তর গালাগাল দিতে থাকে।

'থুতু' গল্পেও নারীর অসহায়তা একাকিত্বের সুযোগ নিতে দেখা গিয়েছে। গল্পে মুক্তিযোদ্ধা শামসুর যুদ্ধে আহত হয়ে ফিরে আসলে তাদের নিজস্ব গ্রাম খড়গপুর থেকে উৎখাত হতে হয়। তারা নিরুপায় হয়ে আশ্রয় নেয় এক বস্তিতে। শামসুর ও তার স্ত্রী নিলু বেগম উপার্জনের আশায় কাজে বের হলে তাদের একমাত্র সন্তান ফারহানা ঘরে একা থাকে। এই একা থাকার সুযোগ নেয় পাশের ঝুপড়ির সিরাজের বাবা।

> 'ওই সময় পাশের ঝুপড়ির সিরাজের বাপ ঘরে ঢোকে। ঝাপটে ধরে ফারহানাকে।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২১৯-২০)

আবার 'চিঠি' গল্পে দেখা যায় এক নামহীন কিশোরীর আত্মহত্যার কারণ। পড়াশোনায় মেধাবী ছাত্রী জন্মের সময় থেকেই তার বাবা তাকে আপন করে নিতে পারেনি। কারণ তার পিতা ছেলে সন্তান চেয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে মেয়ের মধ্যে দিয়েই পিতার গভীর স্নেহ-ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে। মেধাবী পরিচয় পাওয়ার পর কন্যাকে ঘিরে পিতার নানা স্বপ্ন। সেই মতো নামহীন কন্যা স্কুলে পড়তে

যায়। কিন্তু স্কুলের হান্নান স্যারের কামুক দৃষ্টি পড়ে তার ওপর। তাকে আলাদা করে যত্ন নিয়ে পড়ানোর নামে স্কুলে ডেকে তাকে ধর্ষণ করে হান্নান স্যার। গল্পে এর ইঙ্গিত রয়েছে এইভাবে-

> 'মিনিট পনেরো পরে আমি মুক্তি পেলাম হান্নান স্যারের হাত থেকে।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ১৩৫)

'কসবি' উপন্যাসে বর্ণিত সাহেবপাড়া পতিতাপল্লিটি তিনশো বছরের পুরনো। পূর্বে পাড়াটি সদরঘাট জেলেপল্লি নামে পরিচিত ছিল। উপনিবেশিক ভারতে কাজকর্মে এই অঞ্চলের বন্দরে ব্রিটিশ সাহেবসুবোদের যাতায়াত ছিল। জানা যায়, জাহাজের নাবিক, ক্যাপ্টেন জলে ভাসতে ভাসতে দীর্ঘদিন নারীসঙ্গ বিবর্জিত। তাই ভূমিতে পা রাখার জন্য তারা লোভী হয়ে ওঠে। এরকমই একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন ম্যাগরিজ মার্টিনেজ। কর্ণফুলীর পোর্ট এরিয়ায় নেমেই সে জেলেপাড়ায় হাঁটতে বেরিয়ে ছিল। হাঁটতে হাঁটতে একটা সময় রাইচরণের বউয়ের প্রতি নজর পড়লে রাইচরণের অনুপস্থিতিতে তার বউকে ধর্ষণ করেছে। গোটা পাড়ায় ধর্ষণের কথা ছড়িয়ে গেলে রাইচরণ সকলের কাছে প্রতিকার চাইল। অসহায় দরিদ্র অশিক্ষিত জেলেদের কাছে কোনো প্রতিকার নেই। কিন্তু সমাজের সর্দার মুখ্যরা বিচারসভা বসিয়ে রাইচরণের বউ জটিলাকে 'অসতী' ঘোষণা করে তাদের একঘরে করে দিল। প্রতিশোধ নেওয়ার বদলে যে সমাজ উল্টে তাদের শাস্তি দিল, সে সমাজকে অমান্য করাই শ্রেয়। তাই জটিলা জেদ, দুঃখ, ঘৃণা ও অভাবের বসে বেশ্যাবৃত্তিকে বেছে নিল। অর্থাৎ ঔপনেবেশিক ভারতবর্ষে একজন ধর্ষিতা নারীকে সাহায্য করার বদলে তাকে অসতী প্রমাণ করে জেলেরা তাকে শাস্তি দিয়েছে। তৎকালীন সমাজবোধে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, নারীকে তার স্বামী বাদে অন্য কোনো পুরুষ যৌন স্পর্শ করলে সে তার সতীত্ব হারাবে। প্রাবন্ধিক সমালোচক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক ঔপনিবেশিক ভারতের প্রেক্ষিতে তাই 'সতী' শব্দটি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে-

> '... Constructed Counter Narrative of women's Consciousness, thus women's being good, thus the good women's desire, thus women's desire. This slipage can be seen in the fracture inscribed in the very word sati, the feminine form of sat. Sat trans cends any gender- specific notion of masculinity and moves up not only into human but spiritual universality. It is the present participle of the verb 'to be' and as such means not only being but the true, the good, the right.'
>
> (Ashcroft (ed.) 1995, P.100)

অর্থাৎ সৎ এর স্ত্রীলিঙ্গ হল সতী। সৎ শব্দটি যে কোনো লিঙ্গ ভেদে ব্যবহৃত হয় যা মানুষের ভালো, সঠিক, ন্যায়সম্মত, সত্য ও উচিত সত্তাকে নির্দেশ করে। কিন্তু এই 'সৎ' শব্দটির লিঙ্গ পরিবর্তনে একেবারেই ভিন্ন ধরনের অর্থ সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ একজন নারীর সতীত্বকে প্রমাণ করার জন্য তার দায়দায়িত্ব, স্বামী-ভক্তি, সন্তান-সংসার প্রীতির মধ্য দিয়ে নারীর চেতনাকে শুদ্ধ, উন্নত ও একনিষ্ঠ করে তোলা অর্থে ব্যবহৃত

হয়েছে। একই শব্দের লিঙ্গ পরিবর্তনে অর্থের এরূপ পার্থক্য নারীকে নিম্নবর্গে পরিণত করার কৌশল মাত্র। একজন পুরুষের বিপরীতে নারীকে এভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যুগ-যুগান্তর থেকে।

অন্যদিকে 'মোহনা' উপন্যাসে একাদশ শতাব্দীর কালখণ্ডে ঘটে যাওয়া কৈবর্ত বিদ্রোহের ঘটনার প্রেক্ষিতে কৈবর্ত সমাজকে প্রতিফলিত করা হয়েছে। যেখানে ডমরনগরের বারাঙ্গনাপল্লির বর্ণনায় জানা যায়-

> '... বারাঙ্গনাপল্লিতে নারীর সম্মতির প্রয়োজন নেই, নারীদের শারীরিক সুস্থতাও উপেক্ষিত হয় পুরুষদের কাছে। মিলনের আগে পুরুষেরা নারীশরীর বিমর্দনে মগ্ন থাকে। সেই বিমর্দন নারীটিকে সুখ দিচ্ছে, না ব্যথা দিচ্ছে—সেদিকে লক্ষ করার প্রয়োজন অনুভব করে না অধিকাংশ অতিথি।' (জলদাস ২০১৩, পৃ. ২০)

যেখানে অর্থের বিনিময়ে দেহভোগই উদ্দেশ্য সেখানে নারীর শারীরিক অসুস্থতাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাইতো অর্থসর্বস্ব ক্রিয়ায় সুখসর্বস্ব ফলভোগে কোনো মানবিকতার প্রশ্ন ওঠে না।

'রামগোলাম' উপন্যাসে বর্ণিত মেথরসমাজে নারী ধর্ষণের ঘটনার উল্লেখ না থাকলেও নারী ধর্ষণের চেষ্টার উল্লেখ রয়েছে। দেখা যায় ঝাউতলা মেথরপল্লিতে রূপলালের মেয়ে রূপালীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেছে মনুলালের শ্যালক জনি। জানা যায়, ব্যান্ডেলে বার্ষিক মহোৎসবের প্রস্তুতিমূলক সভা আয়োজনের কারণে ঝাউতলা মেথর পট্টি প্রায় পুরুষশূন্য। রূপলালও সেই সভায় উপস্থিত। ফলে পিতা ও পাড়ার পুরুষদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে জনি রূপালিকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। কিন্তু রূপালি বটি দিয়ে জনিকে আঘাত করলে তার সেই উদ্দেশ্য পূরণ হয় না।

তাহলে দেখা গেল যে ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী নারীকে দেবী ও মায়ের সমতুল্য বলে ভাবা হয়, সেখানে একজন পুরুষের বিপরীতে নারী কেবল অধিকৃত বস্তু। শুধুমাত্র সেই পুরুষের মা, বোন, স্ত্রী কন্যা সম্পর্কের বাইরে নারীজাতি কেবলই 'Sex object'। তাইতো ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষীয় সমাজের প্রেক্ষাপটে পশ্চিমা নারীদের সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের নারীদের তুলনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক সমালোচক পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান-

> 'Here is one more Instance of the displacement in Nationalist Ideology of the construct of women as a sex object In western Patriarchy: The the nationalist Male thinks of his own wife/sister/daughter as 'normal' precisely because she is not a "sex object", while those who could be "sex object" are not "normal". (Guha (ed.) 1997(b), p. 258)

৪.১.৪.২ নারীর অপহরণ ও পণ্যায়ন

সমাজ গঠনের কাল থেকে নারীরা পুরুষের কাছে কামবাসনার বস্তু। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র-পুঁথি-পুরাণ অনুযায়ী নারীর অবস্থানের কোনো পরিবর্তন নেই। যৌনবাসনা চরিতার্থ করার জন্য নারীরা বহুকাল থেকেই পুরুষদের দ্বারা অপহৃত হয়ে আসছে। ধর্ষিত হচ্ছে যেখানে সেখানে। যৌনবস্তু রূপে নারীকে রীতিমতো পণ্য স্বরূপ অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করা হচ্ছে। দেশ-বিদেশে নারী পাচার একুশ শতকেও এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কলঙ্ক ও ব্যাধিরূপে বিরাজিত। যার কোনো নিরাময় নেই। আমরা জানি সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে ক্ষমতার এককে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের দ্বিমুখী বৈপরীত্য প্রক্রিয়ায় আধিপত্য ও অধীনতার সম্পর্ককে নানা দিক থেকে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' চর্চা ও বিশ্লেষণ করেছে। দেশকাল সমাজ নির্বিশেষে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবমূল্যায়ন নারীকে বিশেষভাবে পুরুষের বিপরীতে নিম্নবর্গ রূপে নির্মাণ করেছে। হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে বর্ণিত নিম্নবর্গীয় সমাজেও নারীর অবমূল্যায়নের এই দিকটি উপেক্ষিত হয়নি।

প্রবহমানকাল ধরে নারীকে 'Sex object' হিসেবে প্রতিপন্ন করার ফলে পৃথিবীর যে কোনো স্থানে ও প্রান্তে পতিতাপল্লি গড়ে উঠেছে। সাম্প্রতিককালের সমাজ ও সামাজিক আইন নারীদের দেহব্যবসাকে আইনসম্মত বলে মত প্রদানও করেছেন। তবে এও সত্য যে, কোনো নারী স্বেচ্ছায় তার দেহকে বারংবার বহু পুরুষ দ্বারা অবগাহিত করতে চায় না, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অসহায় অবস্থায় সে বাধ্য হয়ে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে। হরিশংকর জলদাস সমাজের এই দিকটির প্রতি সচেতন দৃষ্টি দিয়ে 'কসবি' উপন্যাসটি সৃজন করেছেন। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের প্রাচীন বেশ্যাপল্লি সাহেবপাড়া আলোচ্য উপন্যাসের পটভূমি। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় পতিতা চরিত্র দেবযানীর অতীত জীবনে লক্ষ করা যায় যে, সে একজন জেলে পরিবারের কন্যা। বীরপুরের দাসপাড়ায় তার বাড়ি, আসল নাম কৃষ্ণা। পিতার নাম শৈলেশ দাস। মা যশোদা মারা যাবার পর থেকে পিতা শৈলেশ মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সংসারে অভাব ও দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে কৃষ্ণা বাধ্য হয়ে পূর্ব পরিচিত ফল বিক্রেতা তপনের সাহায্য কামনা করে। কিন্তু তপন সাহায্য করার বদলে কৃষ্ণার দেহভোগ করেছে। ঘটনাক্রমে,

> 'অর্থনৈতিক দুরবস্থা, পারিবারিক নিরাপত্তাহীনতা, যৌন মিলনের প্রবল আসক্তি, বিয়ের প্রলোভনের ঘূর্ণিতে পড়ে একরাতে কৃষ্ণা তপনের সঙ্গে পালাল।' (জলদাস ২০১১, পৃ. ৫৩)

চট্টগ্রামের সোনালি বোর্ডিং হোটেলে মুসলমান দম্পতি পরিচয়ে তপন কৃষ্ণাকে নিয়ে গিয়ে দিন-রাত তাকে ভোগ করতে থাকে। এভাবে কিছু দিন চলার পর-

'..এক রাতে 'একটু নিচ থেকে আসি' বলে তপন বেরিয়ে গেল, আর ফিরল না।' (জলদাস ২০১১, পৃ. ৫৪)

পরদিন সকালে কৃষ্ণাকে একা দেখে হোটেলের মালিক বদর মিঞার বুঝতে অসুবিধা হল না পুরুষ সঙ্গীটির প্রতারণা। ফলে সে দেরি না করে সাহেবপাড়া পতিতাপল্লির দালাল শামছুকে খবর দেয়। বদর মিঞাকে উচিত মূল্য দিয়ে শামছু কৃষ্ণাকে উদ্ধার করার নামে কিনে নেয় এবং দু-দিন পর কৃষ্ণাকে বাড়ি পাঠানোর আশ্বাস দিয়ে-

'শামছু কৃষ্ণাকে নিয়ে গিয়ে কালু সর্দারের কাছে চড়া দামে বেচে দিল।' (জলদাস ২০১১, পৃ. ৫৫)

পরদিন সকালে কৃষ্ণা জানতে পারে শামছু তাকে বেশ্যাপল্লিতে বিক্রি করে দিয়ে গিয়েছে। শৈলবালার পা জড়িয়ে কৃষ্ণা নিজ চরিত্র নষ্ট না করার অনুরোধ করলে, শৈলবালা বলে-

'চরিত্র? কীসের চরিত্র? বেশ্যাপাড়ার মাগির আবার চরিত্র কী? তুমি তো মাইয়া ফুলের মতো পবিত্র না। হোটেলে পরপুরুষের সঙ্গে রাত কাটাইছ। ...এই মাগিপাড়ায় এসে চরিত্র বাঁচাইতে চাও? (জলদাস ২০১১, পৃ. ৫৭)

নিরুপায়, অসহায়, ভীত কৃষ্ণা পরিস্থিতির জালে এইভাবে দেবযানী পতিতায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। তবে শুধু কৃষ্ণা নয়, কৃষ্ণাকে বশে আনার জন্য শৈলমাসি যে পতিতার শরণাপন্ন হয়েছিল—চম্পা, সেও এক সাধারণ পরিবারের আদরের মেয়ে ছিল। উপন্যাসে জানা যায়, বছর দশেক আগে চম্পা শৈলবালার হাতে এসেছিল। সৈয়দপুরে বাড়ি তার। যুবতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নুর আলি নামে এক ব্যক্তির নজরে পড়েছিল চম্পা। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জেরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সে। তারপর শরীর ভোগ করা হয়ে গেলে নুর আলি চম্পাকে শৈলমাসির কাছে বিক্রি করে দেয়। এরকম আরো একজন পতিতা হল ইলোরা। তার আসল নাম উমা প্রু চাকমা। রাঙামাটির প্রত্যন্ত এলাকায় এক বাঙালিবাবুর প্রেমে পড়ে ঘর থেকে পালিয়েছিল সে।

'মধু সংগ্রহের পর সেই প্রেমিক তাকে এই পাড়ায় বিকিয়ে দিয়ে গেছে। প্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকতা, মা-বাবা ত্যাগের অপরাধবোধ, মাসি আর কাস্টমারের দৈহিক নির্যাতন তাকে প্রায় বোবা করে তুলেছিল।' (জলদাস ২০১১, পৃ. ৭৫)

অন্যদিকে 'মোহনা' উপন্যাসে নারী অপহরণ করে পতিতাপল্লিতে বিক্রি করার ঘটনার উল্লেখ পাই। উপন্যাস অনুযায়ী মোহনা গাঙ্গী নামক জেলেপল্লিতে জন্মেছে। ছোটোবেলায় অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে খেলারত অবস্থায় নারী চোরাচালানকারী সনকা তাকে চুরি করে ডমরনগর বারাঙ্গনাপল্লিতে নিয়ে আসে। তারপর জানকি মাসি মোহনাকে সনকার কাছ থেকে কিনে নেয়। উপন্যাসে জানা যায়-

'সনকার কাছ থেকে জানকি মোহনাকে কিনে নিয়েছিল। সে সময় সনকাদের মতো যৌবনহারা বারাঙ্গনারা গাঁয়ে গাঁয়ে ভিক্ষুক সেজে বা বেদের মেয়ে সেজে ঘুরে বেড়াত। সুযোগ পেলে মোহনাদের মতো বালিকাদের চুরি করে নিয়ে

আসত। তারপর বিক্রি করে দিত বারাঙ্গনাপল্লিগুলোতে। শুধু ডমরনগর নয়, বৈশালি, মগধ, চম্পকনগর, গৌড় প্রভৃতি নগরের অধিকাংশ বারাঙ্গনা এভাবেই সংগৃহীত হত।' (জলদাস ২০১৩, পৃ. ২৭)

আবার 'সুখলতার ঘর নেই' উপন্যাসে মৎস্যসমাজের রূপকে মানবসমাজকে পরিস্ফুট করার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে মৎস্য সমাজের নানা সামাজিক শোষণ অত্যাচার ও পীড়নের কথা। উপন্যাসে জানা যায়,

'এই জলের তলায় কতো কিছু ঘটে যায়! বিশ্বাসঘাতকতা, অপমান, লাঞ্ছনা, তিরস্কার, প্রবঞ্চনা, সম্পত্তি লুণ্ঠন, নারী অপহরণ—কত কিছুই না সংগঠিত হয়!' (জলদাস ২০১৯(খ), পৃ. ৪২)

তাইতো মানবসমাজের মতোই মৎস্যসমাজেও দেখা গিয়েছে নারী লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণের মতো ঘটনা। যেমন, জলধি গ্রামের সর্দার পঞ্চুর ছেলে জগাই বিবাহিত হওয়া সত্বেও রূপসী নামক এক মৎস্যনারীকে অপহরণ করে বিয়ে করার হুমকি দেয়।

'…যদি রাজি না হও, তাইলে তোরে তুইলে লইয়া যাইব রূপসী।' (জলদাস ২০১৯(খ), পৃ. ৫৬)

শুধু তাই নয়, পঞ্চু নিজেও ঘরে স্ত্রী থাকতে বিজাতীয় সুন্দরী মৎস্যকন্যা রুমকিকে জোর-জবরদস্তি বিয়ে করে ঘরে আনে। উপন্যাস দেখা যায়-

'দ্বিতীয় বউ রুমকি স্বেচ্ছায় বউ হয়ে আসেনি পঞ্চুর ঘরে। পঞ্চু সর্দার জোর-জবরদস্তি করে রুমকিকে ঘরে তুলেছিল। যমুনা ভীষণ নারাজ ছিল এই বিয়েতে। কিন্তু পঞ্চুর অত্যাচার আর নিজের অসহায় ভবিষ্যৎ জীবনের কথা চিন্তা করে চুপ করে থেকেছে যমুনা।' (জলদাস ২০১৯(খ), পৃ. ৫৯)

নারীর প্রতি শোষণ ও অন্যায় হওয়া সত্ত্বেও বিপরীত লিঙ্গের ক্ষমতা, অত্যাচার ও নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে নীরব থাকা প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের মন্তব্য। 'Can the subaltern speak?' প্রবন্ধে নিম্নবর্গীয় নারী চেতনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন-

'The cautions I have just expressed are valid only if we are spiking of the subaltern women's consciousness- or, more acceptably, subject. Reporting on, or better still, participating in, antisexist work among women of color or women in class opression in the First World or the Third World is undeniably on the agenda. … Yet the assumption and construction of a consciousness or subject sustains such work and will, in the long run, cohere with the work of imperialist subject-constitution, minyling epistemic violence with the advancement of learning and civilization. And the subaltern women will be as mute as ever.' (Ashcroft (ed.) 1995, p. 90)

অর্থাৎ একথা পরিষ্কার যে, কেউ যদি দরিদ্র, অসহায় ও বিশেষ করে নারী হয় তাহলে বিষয়টি নারীচেতনার দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রথম বিশ্ব বা তৃতীয় বিশ্বের নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে এক বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। আমাদের উচিত এই সব নীরব এলাকায় তথ্য পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করা। যা পরবর্তীকালে দীর্ঘমেয়াদে সাম্রাজ্যবাদী সাংবিধানিক কাজের

সঙ্গে সমন্বয় করবে। কিন্তু তবুও শিক্ষা ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে নারী চেতনার কোনো পরিবর্তন হবে না। কারণ নিম্নবর্গীয় নারী আগের মতোই নিঃশব্দে থাকবে। আমরা জানি সমাজ-ইতিহাসের সঙ্গে সমান্তরালভাবে সাহিত্যও তথ্য সংগ্রহের কাজটি করে থাকে। তাইতো ইতিহাসের মতো সাহিত্যেও নিম্নবর্গীয় নারীর নিরাপত্তাহীনতা আমরা আলোচ্য গল্প-উপন্যাসগুলিতে লক্ষ করলাম।

যেমন 'সুখলতার ঘর নেই' উপন্যাসে পঞ্চুর বাড়িতে কর্মরতা অসহায় দাসী। জগাই-পঞ্চুর মতো চরিত্রহীনদের সঙ্গে একই ছাদের তলায় থাকতে থাকতেই সে বহুবার বহুভাবে লাঞ্ছিত হতে হতে নারীত্বের সকল সম্ভ্রমবোধের কথা ভুলে গিয়েছে। অবলীলায় তাই সে উচ্চারণ করে-

> 'দেহের ক্ষুধা মিটাইতে হয় আমারে। রাইতের বেলা জগাই আসে ঘরে। দলাই-মলাই করে। শইলে শইলে ডলে।'
>
> (জলদাস ২০১৯(খ), পৃ. ১২০)

অর্থাৎ অসহায় নিরুপায় দাসীটি জগাইয়ের কাছে 'sex object' ছাড়া কিছুই নয়। ঘরে স্ত্রী থাকতে সে তার যৌন পিপাসা চরিতার্থ করার জন্য দাসীটিকে শুধুমাত্র পণ্য হিসেবে ব্যবহার করেছে। যৌন শোষণ করেছে। কিন্তু দাসী তার প্রতিবাদ করতে পারেনি। সে নীরব থেকেছে।আবার অন্যদিকে সুখলতার রতিকান্তের সঙ্গে বিয়ের পর তারা একসঙ্গে শ্বশুরবাড়ি থেকে বের হলে পথে জগাই ও জিগলু তাদের পথ অবরোধ করে এবং জোরপূর্বক সুখলতাকে অপহরণ করে।

> 'সেই পূর্ণিমার রাতে সুখলতাকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছিল জগাই।' (জলদাস ২০১৯(খ), পৃ. ১৩৬)

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক মন্তব্য করেছিলেন,

> 'If in the context of colonial production, the subaltern has no history and cannot speak, the subaltern as female in even more deeply in shadow.' (Ashcroft (ed.) 1995, p. 82-83)

নারীরা যে আরো গভীর অন্ধকারের ছায়ায় নিমজ্জিত এই দিকটির প্রতি আলোকপাত করার লক্ষ্যেই প্রাবন্ধিক নারীকে আলাদা করে নিম্নবর্গের ইতিহাস-চর্চায় গুরুত্ব দিয়েছেন, যা কিনা উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিক আলোচনায় একটি আলাদা মাত্রা যোগ করেছে।

৪.২ সারাংশ

নারী শোষণের কেন্দ্রে রয়েছে পুরুষ শাসিত সমাজ। পুরুষের বিপরীতে নারীকে অধস্তনরূপে নির্মাণ করা হয়েছে পুরুষজাতির স্বার্থ অনুসারে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী সর্বদাই অন্ধকারের ছায়াতলে। তাইতো পুরুষ মুখ্য, নারী গৌণ; পুরুষ শরীর, নারী ছায়া; পুরুষ প্রভু, নারী দাসী; পুরুষ বংশের আলো, নারী গলগ্রহ; পুরুষ বিশেষভাবে বাহন করার কারক, নারী দান করার পাত্রী। যদিও পৃথিবীতে শুধু নারীরাই

শোষিত ও বঞ্চিত নয়, অধিকাংশ শ্রেণির পুরুষেরাও শৃঙ্খলিত ও শোষিত। কিন্তু সর্বকালের, সর্বদেশের, সর্বশ্রেণির নারীরাই শোষিত। তাই স্বাভাবিকভাবেই নারীদের সামাজিক এই দুরবস্থাকে উপলব্ধি করে প্রাবন্ধিক হুমায়ূন আজাদ মন্তব্য করেন-

> 'নারীশোষণে বুর্জোয়া ও সর্বহারায় কোনো পার্থক্য নেই; বুর্জোয়া পুরুষ শুধু সর্বহারা শ্রেণিটিকে শোষণ করে না, শোষণ করে তার নিজের শ্রেণির নারীকেও; আর সর্বহারা পুরুষ নিজে শোষিত হয়েও অন্যকে শোষণ করতে দ্বিধা করে না, সে শোষণ করে নিজের শ্রেণির নারীকে। বিত্তবান শ্রেণির নারী পরগাছার পরগাছা, বিত্তহীন শ্রেণির নারী দাসের দাসী। শোষণে সব শ্রেণির পুরুষ অভিন্ন;... নারীর প্রভু ও শোষক সব পুরুষ; অন্ধও নারীর শোষক; উন্মাদও নারীর প্রভু।... কোনো বিশেষ সামাজিক শ্রেণি নারীর শোষক নয় ব'লে, পুরুষতন্ত্রই যেহেতু নারীর শোষক, তাই সামাজিক বিপ্লবের ফলে পুরুষ মুক্তি পেলেও নারী মুক্তি পায় না, নারীকে মুক্তি দেয়া হয় না।... তাই নারীই এখন বিশুদ্ধ শোষিত ও সর্বহারা।' (আজাদ ১৯৯২, পৃ. ১৪-১৫)

নিম্নবর্গীয় চেতনায় শোষণ ও বঞ্চনার বিভিন্ন প্রকৃতিগুলি আসলে সামাজিক কাঠামোয় ক্ষমতার অসম বণ্টনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে সেখানে নিম্নবর্গ প্রায় ক্ষেত্রেই প্রতিবাদহীন। যদিও কিছু ক্ষেত্রে তারা তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, কিন্তু সেই প্রতিক্রিয়া পরবর্তীকালে উচ্চবর্গের রোষের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। যার ফলে উচ্চবর্গের শোষণ আরো তীব্রতর রূপে প্রকাশ পেয়েছে নিম্নবর্গের প্রতি। অর্থাৎ একদিকে নিম্নবর্গের প্রতিবাদহীনতা, অন্যদিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া—এই দুইয়ের মাঝে পড়ে তারা বারবার কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। তবে হরিশংকর জলদাসের আখ্যানবিশ্বে বর্ণিত নিম্নবর্গ সাময়িকভাবে মার খেয়ে মার সহ্য করলেও একটা সময় তাদের মধ্যে শ্রেণিচেতনার উদ্ভব হয়েছে, যা পরবর্তীকালে তাদের সম্যক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম করেছে। নিম্নবর্গের শ্রেণিচেতনা, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চেতনার এই দিকটিকে আমরা পরবর্তী পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

পঞ্চম অধ্যায়

হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্ব : নিম্নবর্গীয় চেতনায় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বয়ান

৫. সূচনা

৫.১ কথাবিশ্বে নিম্নবর্গের শ্রেণিচেতনা

৫.২ কথাবিশ্বে নিম্নবর্গীয় প্রতিবাদের ধরন ও স্বরূপ সন্ধান

৫.৩ কথাবিশ্বে নিম্নবর্গীয় নারীর প্রতিবাদ

৫.৪ নিম্নবর্গের নিষ্ক্রিয়তা ও প্রতিবাদহীনতা

৫.৫ নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ব্যর্থতার আখ্যান

৫.৬ সারাংশ

৫. সূচনা

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর আলোচনা অনুযায়ী উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ সম্পর্কটি ক্ষমতার এককে একটি বিপরীত অবস্থানে অবস্থিত। যেখানে মূলত আধিপত্য ও অধীনতার সম্পর্কটি প্রকট হয়ে ওঠে। এই বৈপরীত্যের কারণেই নিম্নবর্গকে প্রায়শই শোষিত-বঞ্চিত হতে দেখা গিয়েছে। এক্ষেত্রে উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের চেতনার বৈপরীত্যকে নির্ধারণ করতে গেলে দুই পক্ষেরই নিজ নিজ ক্ষেত্রের সক্রিয়তা ও দুর্বলতাকে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এমনটা নয় যে, নিম্নবর্গ পরাধীন বলে তারা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গীয় চেতনা কোনো না কোনোভাবে তাদের সক্রিয়তা প্রকাশ করতে সক্ষম। আর নিম্নবর্গের সক্রিয়তা ও স্বতন্ত্র চেতনার অস্তিত্ব তখনই ধরা পড়ে যখন তাদের মধ্যে শ্রেণিচেতনার মধ্য দিয়ে উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাই বলেন-

> 'অধিকাংশ সময়ই নিম্নবর্গকে দেখা যায় নিষ্ক্রিয়, ভীরু; একান্ত অনুগত জীব হিসেবে। অন্যে চালিত করলে তবেই যেন সে চলে। একমাত্র প্রকাশ্য রাজনৈতিক বিরোধ, বিশেষ করে বিদ্রোহের সময়ই শাসকগোষ্ঠী তাকে সক্রিয় প্রতিপক্ষ বিষয় হিসেবে গ্রাহ্য করে।' (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ৮)

অর্থাৎ অধিকার ও প্রাপ্য বিষয় যখন সরাসরি বঞ্চিতরা পাচ্ছে না, তখন তা ছিনিয়ে নেওয়ার প্রবণতা থেকে তৈরি হয় শ্রেণিচেতনা ও প্রতিবাদের মানসিকতা। দৈনন্দিন দাসত্ব, শোষণ-বঞ্চনা-নিপীড়ন-অন্যায় দিনের পর দিন সহ্য করেও নিম্নবর্গ নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সংগ্রামের পথ বেছে নেয় বাধ্য হয়ে। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' মূলত নিম্নবর্গের চেতনার স্বাতন্ত্র্যের দিকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে গিয়ে লক্ষ করে যে, যখনই নিম্নবর্গ নিজ অধিকার আদায়ের জন্য বিদ্রোহ বা প্রতিবাদের মুহূর্ত তৈরি করে কেবল তখনই উচ্চবর্গীয় চেতনায় ধরা পড়ে নিম্নবর্গের একটি নিজস্ব চেতনা রয়েছে, তাদেরও স্বার্থ রয়েছে, রয়েছে উদ্দেশ্য ও সংগঠন। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.৮)

ইতিপূর্বের যাবতীয় আলোচনায় আমরা জেনেছি, নিম্নবর্গের সামাজিক সত্তার উপাদানগুলি তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অধীনতার চেতনা দ্বারা তৈরি হলেও তা সব ক্ষেত্রে সমান নয়। অর্থাৎ উচ্চবর্গের ক্রিয়া-কলাপ ও চেতনায় প্রধানত আইনের মধ্যে থেকে, আইনের আশ্রয়েই নিম্নবর্গের প্রতি কার্যসিদ্ধি করার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু নিম্নবর্গের ক্রিয়া-কলাপ আইন সংগত হলেও প্রয়োজন ও অবস্থানুযায়ী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের রাস্তা বেছে নেওয়ার বিষয়টি উচ্চবর্গের কাছে অনেক সময়ই অপ্রত্যাশিত ও স্বতঃস্ফূর্ত। নিম্নবর্গের মধ্যে একইসঙ্গে উচ্চবর্গের প্রতি আনুগত্য ও বিরোধিতার সম্পর্কের সমন্বয়ে স্বতন্ত্র ও স্বকীয় চেতনার জন্ম হয়। রণজিৎ গুহ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে তৎকালীন

কৃষক বিদ্রোহের নিরিখে ক্ষমতাকে মূলত দুটি রূপে বিভাজিত করেছেন—আধিপত্য ও অধীনতা হিসেবে। গ্রামশি কথিত 'হেজেমনি'র ধারণার প্রসঙ্গে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে আধিপত্যের বিস্তারকে রণজিৎ গুহ বুঝিয়েছেন নিম্নলিখিতভাবে।

> '… hegemony stands for a condition of Dominance (D), such that, in the organic composition of D, Persuasion (P) outweighs Coercion (C). Defined in these terms, hegemony operates as a dynamic concept and keeps even the most persuasive structure of Dominance always and necessarily open to Resistance.' (Guha 1997, p. 231)

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রবক্তারা ঔপনিবেশিক কালখণ্ডে নিম্নবর্গীয় চেতনা বা তাদের স্বকীয়তার যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বলেছেন তা আসলে তৎকালীন ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র ভেদে নিম্নবর্গের চেতনার বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের সাধারণ চরিত্রকে অক্ষুন্ন রেখেই এক এক অবস্থায় এক এক রকমভাবে দেখা দেয়।

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর লেখকগোষ্ঠী নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চায় যেমন ঔপনিবেশিক কালখণ্ডের কৃষক বিদ্রোহ, দাঙ্গা ও অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনার দলিল-সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্য নিয়েছেন, তেমনই আমরাও আমাদের গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী নিম্নবর্গীয় চেতনায় প্রতিবাদ-প্রতিরোধের স্বরূপ সন্ধানে হরিশংকর জলদাসের আখ্যানবিশ্বকে সেই দলিল হিসেবে ব্যবহার করব। সাহিত্যিক হরিশংকর জলদাসও তাঁর কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গ ও নিম্নবর্গীয় সমাজকে তুলে ধরতে গিয়ে তাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চেতনাকে সাহিত্যের আকল্পের মধ্য দিয়ে একদিক থেকে নিম্নবর্গের ইতিহাসই রচনা করেছেন।

৫.১ কথাবিশ্বে নিম্নবর্গের শ্রেণিচেতনা

অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের মধ্যে শ্রেণিচেতনার বিষয়টিও স্পষ্টরূপ লাভ করেছে। সমাজ কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত যে কোনো শ্রেণির মানুষের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ ও নিজ গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার্থে যে অভিন্নতা বোধ গড়ে ওঠে, তাকেই প্রাথমিকভাবে শ্রেণিচেতনা বলা হয়। এককথায় সমশ্রেণির বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষের মধ্যে অভিন্নতা বোধ ও অন্যান্য শ্রেণি থেকে সেই নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা শ্রেণির একাত্মবোধই হল শ্রেণিচেতনার বৈশিষ্ট্য। তবে মার্কসবাদের শ্রেণিচেতনা হল, বিশ্বাসের একটি সমষ্টি যা কোনো ব্যক্তি তার শ্রেণি বা সমাজে তাদের শ্রেণির কাঠামো এবং শ্রেণির স্বার্থ সম্পর্কে ধারণ করে। কাল মার্কসের মতে, এটি একটি সচেতনতা যা একটি বিপ্লবকে উজ্জীবিত করার চাবিকাঠি। পোস্ট কলোনিয়াল কালখণ্ডের পুঁজিবাদী সমাজে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণিচেতনা। এই শ্রেণিচেতনা আসলে সেই শ্রেণির মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত। অর্থাৎ সংহতি ও ঐক্যবদ্ধ শ্রেণিচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে যখন এক

শ্রেণির মানুষেরা বুঝতে পারে যে তাদের সমস্যাগুলো একই। ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’ চর্চায় আমরা জেনেছি নিম্নবর্গীয় চেতনা আসলে বহুবিভক্ত শ্রেণিচেতনার সংমিশ্রণ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চেতনা হলো নিম্নবর্গের বিরোধী অথবা প্রতিবাদী চেতনা। যে মুহূর্তে আধিপত্যের প্রভাবে তথাকথিত উচ্চবর্গ তাদের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য নিম্নবর্গের ওপর শোষণ-বঞ্চনা প্রকাশ করে, সেই মুহূর্তে দৈনন্দিন অধীনতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নিম্নবর্গ বুঝতে পারে তাদের শ্রেণিস্বার্থে আঘাত করা হচ্ছে। তখন নিম্নবর্গের চেতনায় নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে ঐক্য ও সংহতি স্থাপিত হয় এবং তাদের প্রতিবাদী-প্রতিরোধী চেতনা জাগ্রত হয়। কিন্তু এই শ্রেণিবদ্ধ হয়ে আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মুহূর্তটিও স্বল্পস্থায়ী। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তারা শ্রেণিগত প্রতিরোধের ক্রিয়া-কলাপকে বাস্তবায়িত না করে ততক্ষণ পর্যন্তই নিম্নবর্গের মধ্যে শ্রেণিচেতনার প্রভাব থাকে। (Chaturvedi (ed.) 2000, p.27-28) শ্রেণিচেতনা সম্পর্কে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল,

প্রথমত, কোনো শ্রেণির মধ্যে শ্রেণিচেতনার উন্মেষ হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে একই অন্যায় শোষণের ঘটনার পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয়ত, কোনো একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণিচেতনা বলে মানুষরা এলোমেলোভাবে সমবেত হতে থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সমস্যা ভুক্তভোগীর অনুযায়ী তাদের নির্বাচন করা হয়। ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা মিলিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, শ্রেণিচেতনা উন্মেষের কোনো পূর্ব-পরিকল্পিত সংগঠন থাকে না। ঘটনার প্রভাবে শ্রেণির মধ্যে এক ধরনের সংহতি ও ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে যা একে অপরের সাহায্যের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ দাবি করে। (কর ১৯৬৫, পৃ.২৩৮)

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়, গ্রামশি তাঁর ‘প্রিজন নোটবুক’-এ সারদিনিয়ার কৃষকদের শ্রেণিচেতনা সম্পর্কে বলেছিলেন যে, একটি নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষের মধ্যে থেকে শ্রেণিচেতনা সংগঠিত হয়, তা নির্বিচারে বাইরে থেকে আরোপ করার বিষয় নয়। গ্রামশির মন্তব্য স্মরণ রেখে নিম্নবর্গের ইতিহাস সমালোচক ও গবেষক ডেভিড আর্নল্ড কৃষকদের শ্রেণিচেতনার প্রভাব সম্পর্কে তাই জানিয়েছেন-

> ‘Class consciousness, he believed, could only come from within a social Group: it could not be arbitrarily imposed from outside. Thus the ‘spontaneous’ and ‘elementary’ passions of the subalterns had to be studies, not ‘spurned’, developed.’ (Chaturvedi (ed.) 2000, p. 28)

অর্থাৎ নিম্নবর্গের শ্রেণিচেতনার স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাথমিক আবেগের বিষয়টি আসলে তাদের বিকাশ ও প্রগতিশীল সমাজ সৃষ্টির একটি ধারণা থেকে উদ্ভূত হয়। সুতরাং শ্রেণিচেতনার উন্মেষ একটি আবেগ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া হলেও নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে নিম্নবর্গ তাদের ঐক্যবোধকে তাদের প্রতিবাদী চেতনার

অংশ হিসেবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে। তাইতো নিম্নবর্গ নিজেরাই একটি শ্রেণিচেতনার খণ্ডিত উপাদানকে উপস্থাপন করে। লক্ষণীয়, সাবঅলটার্ন স্টাডিজে যে কৃষক বিদ্রোহগুলির সংগঠন, প্রতিস্থাপন প্রতিরোধ ও ব্যর্থতার বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেখানে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কৃষকদের শ্রেণিচেতনার গুরুত্বকে সামনে রাখা হয়েছে। কারণ নিম্নবর্গের ইতিহাসে কৃষক তথা নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধী চেতনাকে বুঝতে হলে শ্রেণিচেতনার প্রসঙ্গটিও অঙ্গাঙ্গিভাবে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। হরিশংকরের কথাসাহিত্যে মূলত উপন্যাসে বর্ণিত নিম্নবর্গীয় সমাজে সম্মিলিত প্রতিরোধের প্রাক্‌পর্ব হিসেবে তাদের শ্রেণিচেতনার উন্মেষ লক্ষ করা যায়। আমরা একটি সারণির মধ্য দিয়ে কথাবিশ্বে নিম্নবর্গের শ্রেণিচেতনা জাগরণের বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করছি।

আখ্যানের নাম	**শ্রেণিস্বার্থে আঘাত**	**শ্রেণিচেতনা জাগরণের প্রতিনিধি**	**সম্মিলিত প্রতিরোধের স্বরূপ**
জলপুত্র	শুক্কুর-শশিভূষণ দ্বারা জেলেদের ওপর আর্থিক শোষণ, গঙ্গাকে হত্যা	গঙ্গাপদর নেতৃত্বে জেলেদের মধ্যে শ্রেণিচেতনার জাগরণ	শুক্কুর-শশিভূষণকে মারার পরিকল্পনা ও খামারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া
দহনকাল	পাক সৈন্য দ্বারা জেলেদের প্রতি অত্যাচার, ধর্ষণ লুটপাট, শোষণ-পীড়ন	রাধানাথ, হরিদাস, রাধেশ্যামের উদ্যোগে শ্রেণিচেতনার জাগরণ	পাক সেনারা অত্যাচার করতে এলে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম।
কসবি	কালু সর্দার-মস্তান দ্বারা পতিতাদের নিপীড়ন, শোষণ-বঞ্চনা	কৈলাস দ্বারা পতিতাদের মধ্যে শ্রেণিচেতনা জাগরণের প্রয়াস	বনানী, জুলিয়েটদের সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা, দেবাযানীর কালুকে হত্যা
রামগোলাম	কর্পোরেশন দ্বারা মেথরদের সংরক্ষিত চাকরি উন্মুক্ত করে দেওয়া	রামগোলাম ও কার্তিক মেথরদের ঐক্যবদ্ধ করে	কর্পোরেশন ঘিরে চারদিন ব্যাপী অবস্থান বিক্ষোভ ও ধর্মঘট।
মোহনা	পাল রাজাদের বারংবার কৈবর্ত রাজ্য দখল করার চেষ্টা, লুণ্ঠপাট-ধর্ষণ	ভীমসেনের ডাকে নিম্নবর্গের মধ্যে শ্রেণিচেতনার জাগরণ	রাজ্যকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে ভীমের সৈন্য দলে যোগদান ও যুদ্ধ

কুন্তীর বস্ত্রহরণ	চেয়ারম্যান আবুলের কুমোরদের প্রাচীন শ্মশান আত্মসাৎ করার ইচ্ছে	কুন্তীর নেতৃত্বে কুমোর, মালো, নমঃশূদ্রদের মধ্যে শ্রেণিচেতনা	পাড়ায় পাড়ায় প্রতিবাদ মিছিল ও স্লোগান দেওয়ার পরিকল্পনা
সুখলতার ঘর নেই	ষড়যন্ত্র করে পিতাকে খুন করে পঞ্চুর সর্দার হওয়া ও মাৎস্যান্যায় রূপ শোষণ	পঞ্চু সর্দারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মৎস্যসমাজের ঐক্যবদ্ধ হওয়া	আঠারো দিন ব্যাপী দুই পক্ষের মহাসংগ্রাম ও পঞ্চুর বিনাশ

তবে কথাবিশ্বে নিম্নবর্গ যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিবাদী, এমনটা নয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের নিষ্ক্রিয়তা ও প্রতিবাদহীনতাও উঠে এসেছে। আবার উচ্চবর্গের ক্ষমতার কাছে নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ব্যর্থও হয়েছে। আলোচনার এই পরিসরে আমরা হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে বর্ণিত নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধকে দেখে নেওয়ার মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র-স্বকীয় চেতনাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

৫.২ কথাবিশ্বে নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের স্বরূপ সন্ধান

বাদ ও প্রতিবাদ বিষয়টি একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমাজের যেখানেই অন্যায় শোষণ-বঞ্চনা দেখা যায়, সেখানেই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ উঠে এসেছে। হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে নিম্নবর্গের প্রতি ঘটে যাওয়া নানাবিধ শোষণ-বঞ্চনার রূপ আমরা ইতিপূর্বের অধ্যায়ে অনুধাবন করেছি। সেই শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের মধ্যে কখনো একক প্রতিবাদ বা কখনো সম্মিলিত প্রতিরোধকে লক্ষ করা গিয়েছে। কথাবিশ্বে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের এই বিবিধ রূপ উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নিম্নে আলোচনা করা হল।

৫.২.১ একক প্রতিবাদের নানাদিক

‘দহনকাল’ উপন্যাসে হরিদাসের সহপাঠী সুধীর লম্পট ধরনের বলে হরিদাসকে সে নানা কারণে বিরক্ত করে। এরকমই পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর দিন দাদুর দেওয়া নতুন জামার কলার সুধীর হাতের মুঠিতে খামচে ধরে ঝাঁকাতে থাকে। হরিদাস দাদুর আশীর্বাদস্বরূপ জামাটির এরকম লাঞ্ছনা দেখে সুধীরকে তার জামাটি ছাড়তে বলে। কিন্তু নাছোড়বান্দা সুধীর উল্টে হরিদাসকে মেরেছে-

'সুধীর এর কথায় হরিদাসের ভেতর হঠাৎ এক ধরনের শক্তি জেগে উঠল। তার স্নায়ুতন্ত্র চঞ্চল হয়ে উঠল। দুই হাতের থাবা দিয়ে সুধীরের বুকে একটা জোরে ধাক্কা দিল হরিদাস। সুধীর প্রস্তুত ছিল না। সে জানতো, ম্যাদামারা হরিদাস হাজার অত্যাচারেও রা কাড়বে না।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৮৫)

উল্লেখ্য, 'হরিদাস হাজার অত্যাচারেও রা কাড়বে না'- নিম্নবর্গের প্রতি উচ্চবর্গের এ ধরনের মনোভাবই উচ্চবর্গীয় চিন্তা-চেতনা থেকে নিম্নবর্গীয় চেতনাকে আলাদা করে। উচ্চবর্গীয় চেতনা আধিপত্য ভিত্তিক, অন্যদিকে অধীনতার চেতনা নিম্নবর্গের বৈশিষ্ট্য। ফলে সুধীরের মনে হয়েছে হরিদাস প্রতিবাদে অক্ষম। কিন্তু যে মুহূর্তে হরিদাস সুধীরের বুকে ধাক্কা মারে সেই মুহূর্ত থেকে সুধীরের প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়েছে হরিদাস। সুধীরের কাছে হরিদাসের প্রতিবাদ করা যতটা না অপমানের ততটাই বিস্ময়ের।

'তার চোখে যতটা না অপমান, তার চেয়ে অধিক বিস্ময়। কী অবাক কান্ড! হরিদাস তাকে ঠেলা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছে! আর সে এখনো মাটিতে পড়ে আছে।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৮৫)

আমরা লক্ষ করলাম, নিম্নবর্গীয় চেতনায় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বৈশিষ্ট্য উচ্চবর্গের কাছে তাদের স্বতন্ত্রতাকে চিহ্নিত করে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'More on Modes of power and the peasantry' প্রবন্ধে জানিয়েছেন-

'The revolt is only a moment in the historical process of domination/ resistance.'
(Guha (ed.) 1983, p.339)

আসলে উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গের চেতনাকে সাহিত্যের নিরিখে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দেখতে গেলে কথাবিশ্বে অভিব্যক্ত প্রভুত্ব-অধীনতার দ্বান্দ্বিক সম্পর্কগুলি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন, আলোচ্য উপন্যাসে হরিদাস ও সুধীরের দ্বন্দ্বের ঘটনাটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও হরিদাসের প্রতি সুধীরের মনোভাব প্রভুত্ব-অধীনতার দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটিকে স্পষ্ট করেছে। শুধু তাই নয়, আলোচ্য উপন্যাসে নিকুঞ্জ বহদ্দার যখন তার পাউন্যা নাইয়া পরিমলকে গোঁজ পুঁতে দেওয়ার নাম করে দিনের পর দিন খাঁটিয়ে নেয়, তখন সংসারের অভাব ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সে নিকুঞ্জের বিরুদ্ধে নিজের বাড়িতে সালিশি সভা ডাকে। আমরা জানি নিকুঞ্জ একজন সর্দার হওয়ার পাশাপাশি সে গ্রামের মান্যগণ্য সর্দারও। তার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস জেলেপাড়ার কারো নেই। কিন্তু পরিমল সাধারণ পাউন্যা নাইয়া হয়ে তার বিরুদ্ধে সালিশি ডাকার দুঃসাহস দেখিয়েছে। তাই সভায় উপস্থিত সকলের সামনে এসে সে অভিযোগ জানাতে পারে-

'আঁর বহদ্দার নিকুঞ্জ কাকা জাল বোয়াইতো নো দের।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৯৪)

পরিমলের এই সালিশি প্রতিবাদের জন্য তৈরি ছিল না নিকুঞ্জ। কারণ তার মতে পাউন্যা নাইয়া হল তার হুকুমের গোলাম। সে যেমন ভাবে তাকে চালাবে সে সেই মতো চলবে। নিকুঞ্জের মতে,

'পাউন্যা নাইয়া মানে আঁর পইরর মাছ।...আঁল্লাই সালিশ!' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৯৪)

পাউন্যা নাইয়াকে 'পইরর মাছ' বলে অভিহিত করার মধ্যে উচ্চবর্গের আধিপত্যের চেতনা ফুটে উঠেছে। কিন্তু পাউন্যা নাইয়ার এ ধরনের অপমান মেনে নিতে পারেনি আরেকজন পাউন্যা নাইয়া রাধানাথ। নিজেকে অধীনস্ত হিসেবে মানতে নারাজ রাধানাথ প্রতিবাদী সত্তায় বলে ওঠে-

'তুঁই ঠিগ নো-কত্ত সর্দার। পাউন্যা নাইয়া নো অইলে বহদ্দার অলেও জাল বয়াইত নো পাইত্তো।'

(জলদাস ২০১০, পৃ. ৯৪)

আসলে অন্যায় অযৌক্তিকতার বিপরীতে যৌক্তিক বিচারে সত্য উদঘাটন প্রক্রিয়াই প্রতিবাদের প্রাথমিক শর্ত। 'দহনকাল' উপন্যাসে একাধিকবার রাধানাথের মুখ থেকে এ ধরনের যৌক্তিক সত্য উদঘাটিত হয়েছে, যার ফলে তাকে তথাকথিত উচ্চবর্গের রোষের মুখেও পড়তে হয়েছে বারবার। নিকুঞ্জের অন্যায় যুক্তিকে খণ্ডন করে রাধানাথ নিকুঞ্জর রোষের কারণ হয়েছে। নিকুঞ্জ হুমকি দিয়েছে-

'রাধানাইথ্যা, তইলে তুই বউত্ কাবিল অই উঠ্যস। লিডার হইয়স। ভালা ভালা। চোখ-কান খোলা রাইস।'

(জলদাস ২০১০,পৃ. ৯৫)

কিন্তু রাধানাথও দমে যাওয়ার পাত্র নয়। সে প্রতিবাদী। সাহস সঞ্চয় করে তাই সে বলে-

'পাউন্যা নাইয়াও মানুষ। অত্যাচার নো গইয্যো। হিতারার মিক্কেও ঈশ্বর আছে।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৯৫)

তবে শুধু নিকুঞ্জ সর্দারের বিরুদ্ধেই নয়, জেলেপাড়ার আব্দুল খালেক মেম্বারের অন্যায়ের দাবির বিরুদ্ধেও রাধানাথকে প্রতিবাদ করতে দেখা গিয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসে দেখা যায়, উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়ায় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করার সময় সেখানে উপস্থিত হয় ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার আব্দুল খালেক। হঠাৎ সে দাবি করে জেলেদের জন্য তৈরি সমবায় সমিতিতে সভাপতি হিসেবে তার নাম যেন থাকে। মেম্বারের আচরণ ও স্বার্থ সম্পর্কে অবগত উপস্থিত সকল জেলেরা বিস্ময়ে অবাক হলেও রাধানাথ মেম্বারের এই অন্যায় দাবিকে মানতে পারেনি।

'জাইল্যা সমিতির সভাপতি অইবেন, সাহায্য লইতেন নো। হিয়ান আঁরা বিশ্বাস গরি কেত্রন গরি?'

(জলদাস ২০১০, পৃ. ১১৯)

রাধানাথকে এজন্য খালেকের রোষের মুখে পড়তে হয়েছে। খালেকের দাবিকে অযৌক্তিক প্রমাণ করার চেষ্টায় সে রাধানাথকে হুমকি দেয়-

'হুন্ রাধানাইথ্যা, বেশি সিয়ানা নো অইস। বিপদ নো ডাকিস।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১১৯)

অন্যদিকে উপন্যাসে ঘটনাক্রমে রামহরির সঙ্গে অংশীদারি ব্যবসায় নেমে জালাল মেম্বার রামহরির সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে পথের ভিখারী করে ছেড়েছে। শুধু তাই নয়, রামহরিকে তার নিজেরই

নৌকার বড়োমাঝি হিসেবে নিযুক্ত করে জালাল বঞ্চনার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। সর্বস্ব হারিয়ে রামহরি প্রতিশোধস্পৃহায় চিৎকার করে বলে উঠেছে-

> 'জালাইল্যা আঁই তোর বাপের নাম ভুলাই দিয়ম' (জলদাস ২০১০, পৃ.১৩২)

রামহরি শুধু মুখেই বলেনি, কাজে করে দেখিয়েছে। জালাল যে নৌকায় রামহরিকে বড়োমাঝি নিযুক্ত করেছিল, সেই নৌকার পে-না অর্থাৎ ছিদ্রগুলি সে খুলে দিয়েছে।

> 'সবাই ঘুমিয়ে পড়লে একটা হাতুড়ি ও একটা বড়ো পেরেক খোলে রামহরি। একটা একটা করে পে-না হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে বের করে দেয় সে। গল গল করে সমুদ্রজল ঢুকতে থাকে সেই ছিদ্র দিয়ে'। (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৩৩)

ফলে পরদিন সকালে দেখা গেল, রামহরির চোখের সামনে গাউররা ভেসে যায়। নৌকার সঙ্গে রামহরিও ঢেউয়ে ঢেকে গিয়ে জলের তলায় হারিয়ে যায়। রামহরি প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। শোষণ-বঞ্চনার যোগ্য জবাব দিতে গিয়ে একজন নিম্নবর্গ যে মৃত্যুবরণ করতে পারে তার প্রমাণ রামহরি–যা একই সঙ্গে নিম্নবর্গীয় চেতনার সক্রিয়তা এবং প্রতিশোধজনিত প্রত্যাঘাতও। এক্ষেত্রে সমালোচক ডেভিড আর্নল্ডের মন্তব্য-

> 'Subaltern ideology, especially as represented by religion, one of its principal forms, was necessarily consistent with, or alppropriafe to, the subalterns' own material existence'.
> (Chaturvedi (ed.) 2000, p. 32)

আসলে নিম্নবর্গের আদর্শ মূলত ধর্ম দ্বারা প্রদর্শিত হলেও এটি তাদের একটি আদর্শগত ধরণ যা বারবার প্রয়োজন অনুরূপ কাজ করে বা নিম্নবর্গের নিজস্ব চেতনার উপাদানগত অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। রামহরির ক্ষেত্রেও নিজস্ব চেতনার অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে প্রাণের বিনিময়ে প্রতিশোধস্পৃহাকে সার্থক করার মধ্য দিয়ে।

বঞ্চনা-অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের এ ধরনের প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ আমরা 'অর্ক' উপন্যাসেও লক্ষ করি দিবাকরের মধ্য দিয়ে। জানা যায়, উত্তর পতেঙ্গা জেলেপাড়ার ছোবান মেম্বার সরকারি প্রতিনিধি। জেলেদের জন্য যাবতীয় সরকারি সাহায্য ও অনুদান মেম্বার দ্বারা জেলেদের কাছে পৌঁছায়। স্কুলে দিবাকরের রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে টাকার প্রয়োজন তা ছোবানের কাছে সরকারি অনুদান হিসেবে চাইতে গেলে ছোবান টাকা দিতে অস্বীকার করে। বলে, তার কাছে রাজকোষ বা গুপ্তধন নেই যে, চাইলেই পাওয়া যাবে। ছোবানের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দিবাকরের প্রতিক্রিয়া-

> 'আপনার কাছে টাকা চাইতে আসি নাই।..দরিদ্র মানুষদের সাহায্যের জন্য সরকারি টাকা আসছে আপনার কাছে। ওই টাকায় আমাদের হক আছে।' (জলদাস ২০১৭, পৃ. ৯১)

আবার 'রামগোলাম' উপন্যাসে মেথর সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে রামগোলাম ও কার্তিক চরিত্রটি প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। মেথর ও মেথর সমাজের প্রতি অন্যায় বঞ্চনার প্রতি একাধিক বার তাদের প্রতিবাদ লক্ষ করা যায়। উপন্যাসে দেখি কর্পোরেশনের তরফ থেকে জানানো হয় মেথরদের জন্য নির্ধারিত চাকরি এবার থেকে সকল জাতপাত নির্বিশেষে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। এই ঘোষণায় মেথরদের মধ্যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার প্রশ্ন ওঠে। কর্পোরেশনের এধরনের অন্যায় ঘোষণার বিরুদ্ধতা করতে মেথরপট্টির সর্দার গুরুচরণ, রামগোলাম ও কার্তিক বড়ো সাহেবের সঙ্গে কথা বলার জন্য কর্পোরেশনে পৌঁছায়। কিন্তু বড়ো সাহেবের সাকরেত ইউসুফ তাদের বড়ো সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে বাধা দেয়। গুরুচরণ বাধা না দিতে অনুরোধ করলে ইউসুফ গর্জে ওঠে। কার্তিক ইউসুফের কথায় প্রতিক্রিয়া জানায়- 'করবা কী মানে জোর করে ঢুকব।' (জলদাস ২০১২, পৃ.৮৮) কার্তিকের 'জোর করে ঢুকব' বলার মধ্যে অধিকার আদায় করার মানসিকতা রয়েছে। নিম্নবর্গীয় চেতনায় জোর করে বা বাধ্য করার বৈশিষ্ট্য না থাকলেও এক্ষেত্রে কার্তিকের চেতনায় বিনয় বা নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ করা যায় না। বরং আধিপত্যের অন্যতম শর্ত জোর করার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে কার্তিক। তাই

> '...কার্তিক হুংকার দিয়ে ওঠে। বলে, 'কী করে বাধা দাও দেখি?' বলে দরজার দিকে ছুটে আসে কার্তিক।'
>
> (জলদাস ২০১২, পৃ. ৮৮)

কার্তিকের হুংকারে বড়ো সাহেবের সম্বিত ফিরলে তিনি তাদের তিনজনকে ভেতরে ডাকেন। অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রমাণিত নিম্নবর্গের কণ্ঠস্বর তখনই কার্যকর হয় যখন তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তাই নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা প্রতিবাদকে নিম্নবর্গীয় চেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করেছেন।

অন্যদিকে মেথরদের প্রতিবাদের জবাব দিতে কর্পোরেশনের বড়োবাবু ছালাম সাহেব ইচ্ছে করে ফিরিঙ্গিবাজার মেথরপট্টির গা লাগিয়ে কসাইখানা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তের পেছনে অন্যতম কারণ হল, তাদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা এবং কসাইখানার দুর্গন্ধে তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলা। বড়োবাবু আবদুস ছালামের এই ঘৃণ্য উদ্দেশ্যের কথা মেথরদের কাছে পরিষ্কার হওয়ার পর তারা ঠিক করে, ঘরে বসে আফসোস না করে প্রতিবাদের পথ অবলম্বন করতে হবে। প্রতিবাদের ভাবনা নিয়ে তারা বড়ো সাহেবের কাছে কসাইখানা বন্ধের আর্জি জানালেও বড়ো সাহেব তার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। মেথররা ছালাম সাহেবকে আবারও অনুরোধ করলে পাশ থেকে যোগেশ বড়ো সাহেবের সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে সর্দার রামগোলামকে বোঝায়। যোগেশের এই চাটুকারিতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় বেজায় চটে যায় কার্তিক। তার তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা যায়,

‘চামচার বাচ্চা, বেহেনচোদ। চামচাগিরি করস খানকির পোলা? বলতে বলতে কার্তিক যোগেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অতর্কিত আক্রমণের ফলে ধপাস করে মেঝেতে পরে গেল যোগেশ। বুকের ওপর বসে অবিরাম চড়-ঘুষি চালিয়ে যেতে লাগল কার্তিক।’ (জলদাস ২০১২, পৃ.১৫৪)

রণজিৎ গুহ ঔপনিবেশিক ভারতে ১৭৮৩-১৯০০ সাল পর্যন্ত কালখণ্ডে ঘটে যাওয়া কৃষক বিদ্রোহগুলি পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন,

‘The fact that the subalterns and the subordinate classes have resisted oppression thought-out history has enough empirical evidence.’ (Mannathukkaren 2022, p. 32-33)

আসলে নিম্নবর্গের ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত অভিজাতদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অপরিবর্তনীয় ধারণা। সাবঅলটার্ন গোষ্ঠীর আলোচকেরা ঔপনিবেশিক কৃষক বিদ্রোহের উপর ভিত্তি করে কৃষক চৈতন্য বা তাদের প্রতিবাদ, সংগঠন, প্রতিরোধ, রাজনীতির কথা তুলে ধরতে গিয়ে উল্লেখিত আধিপত্যের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিরোধের যে অপরিবর্তনীয় ধারণার কথা ব্যক্ত করেছেন তা আসলে কৃষক তথা নিম্নবর্গেরই স্বতন্ত্র চেতনার সরব ঘোষণা। নিম্নবর্গীয় চেতনায় প্রতিবাদী সত্তার জাগরণ হঠাৎ করে ঘটে না। দিনের পর দিন আধিপত্যের পদতলে থেকে অধীনতার অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নেয় নিম্নবর্গের প্রতিক্রিয়া দেখানর সাহস, জেগে ওঠে প্রতিশোধস্পৃহা এবং সর্বোপরি শ্রেণিচেতনার উন্মেষের ফলে গড়ে ওঠে বৃহত্তর প্রতিরোধ বা বিদ্রোহ।

অন্যদিকে ‘অর্ক’ উপন্যাসে দেখি ছোবান মেম্বার ক্ষমতার অপব্যবহার করে জেলেদের প্রতি। ভারতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার প্রভাব বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়লে ছোবান মেম্বারের মতো সাম্প্রদায়িক মানুষেরা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে। জেলেদের থেকে মাছ কেড়ে নিয়েছে। গরীব জেলেদের জন্য বরাদ্দ সরকার অনুমোদিত সাহায্য থেকে বঞ্চিত করেছে। আবার কিছুক্ষেত্রে সেই অনুদানের কৃতিত্ব সে নিজে নিয়ে জেলেদের কাছ থেকে বিনামূল্যে মাছ ও সুযোগ সুবিধা নিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের আবহে পাক সেনা দ্বারা যখন উত্তর পতেঙ্গা গ্রাম অবরুদ্ধ তখন সাম্প্রদায়িক মানসিকতার ছোবান রাজাকার ও পাকসেনাদের জেলেপাড়ার প্রতি লেলিয়ে দেয়। দেখা যায় মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার পর একদিন রহমালি বাড়িতে এসে জানতে পারে ছোবান মেম্বার তার মায়ের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। রহমালিকে দেখে সুবল জ্যাঠা কাতর কণ্ঠে বলে ওঠে-

‘আমাদের বাঁচাও বাবা। আমাদের মেইয়েদের ইজ্জত শরমান রক্ষা কর।’ (জলদাস ২০১৭, পৃ. ১০৯)

রহমালি সকলের কাছ থেকে পাক সৈন্য ও ছোবান মেম্বারের অত্যাচার বঞ্চনা ও নিপীড়নের কথা শুনে জেলেদের সংযত ও মানসিকভাবে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেয়।

‘পরদিন সকালে পতেঙ্গা গ্রামের মানুষেরা জানল- রাতের আঁধারে কে বা কারা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছোবান মেম্বার কে খুন করেছে। পিস্তলের গুলিতে মেম্বারের মাথাটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়ে গেছে।’ (জলদাস ২০১৭, পৃ. ১১০)

এ পর্যন্ত আমরা দেখলাম নিম্নবর্গের প্রতিবাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে কখনো একত্রিত হয়ে আবার কখনো একক চেষ্টায় শোষণ বঞ্চনাকারীকে হত্যা করেছে। এই হত্যার পেছনে নিম্নবর্গীয় চেতনায় বৃহত্তর পরিসরে রূপান্তর ঘটানোর প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।

নিম্নবর্গের ‘insurgent consciousness’ যে শুধু কৃষক বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী কৃষকদের মধ্যে বা পরবর্তীকালে নিম্নবর্গের মধ্যে দেখা গিয়েছে তা নয়, প্রাচীন শাস্ত্র বা পুরাণেও অন্যায়-বঞ্চনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিক্রিয়া ধ্বনিত হয়েছে। এর উদাহরণস্বরূপ আমরা পেয়ে যাই হরিশংকরের ‘একলব্য’ উপন্যাসটিকে। মহাভারতের আদি খণ্ড অবলম্বনে রচিত একলব্য চরিত্রকে কেন্দ্র করে নিম্নবর্গীয় চেতনার প্রকাশ লক্ষণীয়। বিশেষ করে কর্ণ ও একলব্য চরিত্রদুটিকে আমরা স্বমহিমায় উপস্থিত হতে দেখেছি উপন্যাসে। জন্মের চেয়ে কর্মকে প্রাধান্য দেওয়া দুজন ব্যক্তিত্ব যেভাবে সমাজ ও ক্ষমতাকে উপেক্ষা করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য উপন্যাসে লক্ষ করি, কর্ণ দ্রোণাচার্যের কাছে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করার ইচ্ছে প্রকাশ করলে জাতপাতের কথা বলে তিনি কর্ণকে ব্রহ্মাস্ত্র বিদ্যাদানে অসম্মত হলেন। বর্ণের নিচতাই এর প্রধান কারণ। তাই দ্রোণ কর্ণকে জানায় যে, সুতপুত্রের এই অস্ত্র পাওয়ার অধিকার নেই। আমরা জানি কর্ণকে আজন্ম নিচুজাতের অপমান সহ্য করতে হয়েছে। তাই বারবার কর্ণকে অপমানের জবাব দিতে হয়েছে প্রতিবাদী হয়ে। দ্রোণের অপমানের জবাবে কর্ণের প্রতিক্রিয়া,

‘আমার মা রাধা। রাধা ব্রাহ্মণ কন্যা। সবাই আমাকে রাধেয় বলে। মায়ের দিক থেকে হলেও আমি ব্রহ্মাস্ত্র পেতে পারি।’ (জলদাস ২০১৬, পৃ. ৮২)

কর্ণের যুক্তি-তর্ক প্রতিবাদ কোনো কিছুতেই দ্রোণ তার সিদ্ধান্ত থেকে সরলেন না দেখে কর্ণ নিজের লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য অবিরাম সংগ্রাম করেছে। অভিমানে ক্ষুব্ধ কর্ণ নিজের আসল পরিচয় গোপন করে ব্রাহ্মণ পরিচয়ে গুরু পরশুরামের কাছে শিক্ষা লাভ করেছে। শুধু কর্ণ নয়, হীনবংশজাত নিষাদপুত্র বলে দ্রোণ একলব্যকেও একইভাবে অস্ত্রশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছেন। কর্ণের মতো একলব্যও হার মানেনি। গভীর জঙ্গলে দ্রোণের মাটির মূর্তি স্থাপন করে একাগ্র অধ্যাবসায়ে অস্ত্রশিক্ষা অর্জন করে পারদর্শী হয়ে উঠেছে সে। কিন্তু এই খবর দ্রোণের কাছে পৌঁছালে সে কৌশলে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ একলব্যের বুড়ো আঙুল কেটে নিয়েছেন যাতে ভবিষ্যতে অর্জুনের সমকক্ষ সে হতে না পারে। এধরনের অমানবিক নির্মম বঞ্চনায় একলব্য মর্মাহত ও হতবাক। এই করুণ পরিণতি স্বচক্ষে দেখে অন্য আরেকজন বীর কর্ণ নিজেকে ধরে

রাখতে পারেননি। গুরু দ্রোণের এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে সে। তার মৌখিক প্রতিক্রিয়ায় শোনা যায়-

> 'বাঃ! বাঃ! কী চমৎকার বিচার আপনার গুরুদেব! ..আপনি না নিজেকে সত্যপ্রিয় ন্যায়বিচারক বলে দাবি করেন?... যে তরুণটিকে আপনি হীন বংশ বলে একদিন দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন,একদিনের জন্য যাকে আপনি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেননি, সেই তরুণটির কাছ থেকে দক্ষিণার দোহাই দিয়ে তার দামি প্রত্যঙ্গটি কেড়ে নিলেন?
>
> (জলদাস ২০১৬, পৃ. ১৪৬)

গুরুদেবের সঙ্গে অর্জুনকেও হুমকি দিয়েছে কর্ণ। কারণ সে মনে করে অর্জুনের শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হয়ে ওঠার ইচ্ছেই সর্বনাশের মূল কারণ।

কর্ণ ও একলব্যের হীনবংশজাত সামাজিক অপমান কোনোদিনই তাদের পিছু ছাড়েনি। কিন্তু এইসব উপেক্ষা করে তারা জন্মের চেয়ে কর্মকে প্রাধান্য দিয়ে একসময় ধনুর্ধর ও বীর বলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। যদিও এক্ষেত্রেও তাদের প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উচ্চবর্গীয় চেতনার বিপরীতে। দিনের-পর-দিন জাতপাতজনিত অন্ত্যজ শ্রেণির অপমানে বঞ্চিত হয়ে অধীনতার অভিজ্ঞতায় কর্ণ ও একলব্য বেড়ে উঠেছে। এতদিনের অপমান বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো সামর্থ্য তাদের তৈরি হয়েছে যার ফলস্বরূপ কর্ণ ও একলব্যের প্রাথমিকভাবে মৌখিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করি।

প্রতিবাদের ভিন্ন ধরনও দেখা গিয়েছে 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে। দেখা যায়, জেলেসমাজের প্রথম শিক্ষিত এম.এ পাস শিবশঙ্কর সাজনমেঘ হাই স্কুলের হেডমাস্টার পদে আসীন হয়। তার দক্ষতা, যত্নে ও কর্মক্ষমতায় স্কুলটি খ্যাতি অর্জন করে। স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা চলাকালীন কমিটির সভাপতি হায়দার সাহেবের ভাগ্নে সেকেন্দার গণিত পরীক্ষায় নকল করতে গিয়ে ধরা পড়লে শিবশঙ্কর কর্তব্য অনুযায়ী সেকেন্দারের পরবর্তী পরীক্ষা বাতিল করে। কিন্তু হায়দার সাহেব রেজাল্ট বেরোনোর সময় ভাগ্নের প্রমোশন চাইলে শিবশঙ্কর আপত্তি জানায়। শিবশঙ্করের আপত্তিতে বেজায় চটে যান হায়দার সাহেব। এককথায় দুইকথায় শিবশঙ্করের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। জাতপাত তুলে নানাভাবে অপমানিত হয় শিবশঙ্কর। হায়দার সাহেবের বক্তব্য-

> 'জাইলার পোলা তুমি। কী করে কী করে এমএ পাস করেছ। পাশ করলে কি হবে, চাকরি পেতে নাকি! ছোটোজাতের লোকদের আজকাল চাকরি দেয় নাকি কেউ? আমরা উদার বলে দিয়েছি।' (জলদাস ২০১৯, পৃ.২২০)

এই বলে শিবশঙ্করকে হুমকি দিয়েছেন তার ভাগ্নের প্রমোশন দেওয়ার জন্য। শিবশঙ্করের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে সে চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছে।

> 'টেবিলে রেজিগনেশন লেটার চাপা দিয়ে সেই বিকেলে সাজনমেঘ হাইস্কুল থেকে বেরিয়ে এসেছিল শিবশঙ্কর।'

(জলদাস ২০১৯, পৃ.২২০)

হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে প্রতিবাদ শুধু ব্যক্তিবিশেষ বা অন্যায়-বঞ্চনা বিশেষে উঠে আসেনি। নিম্নবর্গ প্রতিবাদ করেছে সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধেও। কখনো কখনো তা কর্মের মধ্যে দিয়ে কখনো যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে। তাইতো 'কোটনা' গল্পে দেখি মুচি রামদুলাল হাটে বাজারে লাথি-ঝাঁটা খেয়ে উপলব্ধি করে নিম্নবর্গীয় জীবন কতটা অপমানের। ফলে একজন পিতা হিসেবে সে তার ছেলের জীবন সুরক্ষিত করতে চেয়েছে। সমাজের কাছে মুচি বলে প্রতি পদক্ষেপে যে অপমান ও যন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হয়েছে তার প্রতিবাদ স্বরূপ সে তার ছেলে অশোককে হালিমুন্নেছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছে। সন্তানকে শিক্ষিত করার মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি প্রতিবাদ ঘোষণাই শুধু নয়, ছেলের পদবী 'দাস' থেকে 'চৌধুরী'-তে পরিবর্তন করার মধ্যেও রয়েছে তথাকথিত ভদ্রসমাজের প্রতি প্রতিবাদ। তাইতো হঠাৎই একদিন পিতা রামদুলাল স্কুলের হেডমাস্টারকে অনুরোধ করে,

> 'আমার ছেলের পদবী বদলাতে চাই।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ১৮)

নিম্নবর্গীয় প্রতিবাদের এই ভিন্নতা সম্পর্কে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন,

> 'লোকমানসের কিছু কিছু উপাদান যেমন আশ্চর্য রকমের শক্তিশালী বিশেষ করে এক ধরনের স্বাভাবিক নীতিবোধ কাজ করে তার মধ্যে যা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, ন্যায়শাস্ত্র বা আইনের তুলনায় অনেক সহজ অথচ গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী। দৈনিক জীবনযাত্রা নানা পরিবর্তন ঘটলেও স্বাভাবিক ন্যায়অন্যায় বোধ অক্ষুন্ন থাকে। এমনকি নতুন নতুন পরিস্থিতিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নানা অভিনব পন্থা জন্ম দিতে সক্ষম।' (ভদ্র (সম্পা.), ১৯৯৮, পৃ.৪)

নিম্নবর্গ তাদের নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সামাজিক উপাদান এর কিছু কিছু অংশই গ্রহণ করে, ফলে সামাজিক মানুষ হিসেবে সমাজ বিন্যাসের সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের মধ্যে এ ধরনের উচ্চ-নীচ স্তরভেদ দেখা যায়। আমরা জানি, যে কোনো শ্রেণিবিভক্ত সমাজে প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্কটি মোটের উপর বিরোধিতারই সম্পর্ক। সুতরাং প্রায়শই উচ্চবর্গীয় চেতনার সঙ্গে নিম্নবর্গীয় চেতনার এক ধরনের বৈরিতা বা বিরুদ্ধতা সৃষ্টি হয়। এই বিরুদ্ধতা থেকে জন্ম নেয় নিম্নবর্গীয় প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চেতনা যা অনেকক্ষেত্রেই ক্ষমতাশীল বা প্রভাবশালী শ্রেণির কাছে বিপদ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়।

কথাবিশ্বের নিরিখে তাই দেখা গেল, নিম্নবর্গীয় সমাজের অন্তশ্রেণি ও আন্তঃশ্রেণির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ফলে বারবার শোষিত হয়েছে মানুষ। দিনের পর দিন বঞ্চনা সহ্য করার পর নিজ অস্তিত্বকে বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্গের মানুষরা উচ্চবর্গীয় আদর্শের মুখোশ খুলে তা প্রত্যাখ্যানও করেছে। সমালোচক ডেভিড আর্নল্ড তাই বলেছেন-

'The mental tenacity of the subalterns which made them slow to take up revolutionary ideas, also made them resistant to attempts to introduce or impose new hegemonic ideas.'

(Chaturvedi (ed.) 2000, p. 32)

অর্থাৎ নিম্নবর্গের মানসিক গড়ন এমন যা তাদের বৈপ্লবিক আদর্শগত সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করায় এবং পাশাপাশি তাদের মধ্যে নতুন প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বিভিন্ন পন্থার সৃষ্টি করে। আলোচ্য গল্প-উপন্যাসে আমরা লক্ষ করলাম, নিম্নবর্গের অন্যায়ের তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া করলেও সেই প্রতিক্রিয়া কার্যকর হতে সময় লেগেছে অনেকটা। দিনের পর দিন শোষিত-বঞ্চিত হতে হতে ও অধীন থাকার ফলে একজন নিম্নবর্গ তার প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখানোর সাহস সঞ্চয় করেছে।

আলোচনার এই পরিসরে বলতে হয়, হরিশংকরের উপন্যাসে তথাকথিত নিম্নবর্গের প্রতিবাদের যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে সে তুলনায় তার গল্পবিশ্বে নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রসঙ্গ তেমনভাবে উঠে আসেনি। তবুও যে কয়েকটি গল্পে নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনাকে আমরা অনুধাবন করেছি সেখানে 'থুতু' গল্পে দেখা যায়, শামসু মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে বন্দুকের গুলির আঘাতে পঙ্গু হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। স্বাধীনতার প্রায় পাঁচ বছর পর রাজাকার অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতক যুদ্ধপরাধীরা সমাজে সম্মান পেতে ও ক্ষমতাবান হয়ে উঠতে শুরু করে। এর মধ্যে রাজাকার বশিরউদ্দিন একজন। কালক্রমে সে দলবল জোগাড় করে শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান থেকে চরখানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হয়ে ওঠে। সেই থেকে শামসুল গ্রামে থাকা মুশকিল হয়ে পড়ল। কারণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা বশির শত্রু হিসেবে মনে করে। তাই সে শামসু জীবনকে নানাভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। বাধ্য হয়ে সর্বস্বান্ত শামসু স্ত্রীকে নিয়ে চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে আশ্রয় নেয়। ওভারব্রিজের নিচের ছোট্ট ঝুপড়িতে রাত কাটায় তারা। কিন্তু সকাল বেলা নজমুল নামক দারোয়ান এসে শামসুকে লাঠির খোঁচা দিয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে।

'আরে লেইঙ্গাইয়া, হারা রাইত মাইয়াপোয়া বুগত্ লই কাডাইয়ছ। ক'টিয়া দিয়ছ মাগিরে?'

(জলদাস ২০১৬(ক) পৃ. ২১৫)

শামসু নজমুলের সব কথা না বুঝলেও তার রাগী চোখ মুখ ও 'মাগি' শব্দটির মানে বুঝতে অসুবিধা হয় না। নজমুলের অপমানের জবাবে শামসু মুখে কিছু না বলে-

"শুধু ক্র্যাচটা দিয়ে নজমুলের পেটে একটা জরসে একটা গুঁতা দিল। 'ওরে মারে' বলে ধপাস করে মেঝেতে বসে পড়ল দারোয়ান নজমুল।" (জলদাস ২০১৬ (ক) পৃ.২১৫)

নাজমুলের চিৎকার শুনে আশেপাশের লোক জড়ো হলে নাজমুলের অন্যায়ের কথা সকলকে খুলে বলে শামসু। তারপর নাজমুলের দিকে তাকিয়ে সরোষে সজোরে শামসু বলে ওঠে-

"মুক্তিযোদ্ধা আমি। একাত্তরের যুদ্ধেত গেছলাম,' 'এই ক্র্যাচ দিয়া যেমন আমি পথ চলি, পথ পরিষ্কার করি এই ক্র্যাচ দিয়া।" (জলদাস ২০১৬(ক) পৃ.২১৬)

ক্র্যাচ দিয়ে পথ পরিষ্কার করার কথা প্রসঙ্গে একজন নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনাকেই প্রকাশিত হতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, রেলস্টেশনের বস্তিতে শামসু স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে বসবাস শুরু করলে ঘটনাচক্রে একদিন ফারহানা তারেকের দোকানে চা আনতে গেলে সেই দোকানের কর্মচারী কালাম ফারহানাকে দোকানের ভেতর ডেকে তার গালে কামড় দেয়। কাঁদতে কাঁদতে ফারহানা বাড়িতে এসে সব জানালে শামসু তৎক্ষণাৎ তারেকের দোকানে গিয়ে-

'শামসু কালামের মাথা বরাবর একটা জোর বাড়ি দিল ক্র্যাচ দিয়ে। 'আল্লারে' বলে মাটিতে পড়ে গেল কালাম।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২১৭)

আমরা জানি শামসু একজন পঙ্গু ব্যক্তি। ক্ষমতার দিক থেকে তো বটেই, শারীরিক দিক থেকেও সে বিশেষভাবে সক্ষম। তবুও সে প্রতিটি অন্যায়-নিপীড়নের প্রতিবাদ শুধু নয়, প্রত্যাঘাতও করেছে।

মুক্তিযুদ্ধেরই প্রেক্ষাপটে রচিত 'দইজ্যা বুইজ্যা' গল্পে দেখি, ষাটোর্ধ্ব হরগোবিন্দ জলদাস সমুদ্রে দুই পুত্রকে হারিয়ে অর্ধউন্মাদে পরিণত হয়েছে। এখন তার কন্যা ছাড়া কেউ নেই। এরমধ্যে পাক সৈন্যের ক্যাপ্টেন মোর্শেদ হরগোবিন্দের প্রতিবেশী জগমোহনের কন্যা পারুলবালাকে ধর্ষণ করে যায়। এই ঘটনা অর্ধউন্মাদ হরগোবিন্দের মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। সে পারুলের সম্মানহানিকে তার নিজ কন্যার সম্মানহানি বলে ভাবে। প্রতিশোধস্পৃহায় জর্জরিত হরগোবিন্দ ক্যাপ্টেন মোর্শেদকে উচিত শিক্ষা দিতে চায়-

"ঠিক তখনই উঠানে এক তীব্র হুংকার শোনা গেল, 'তোরার মারে চুদি,চোদানির পোয়াক্কল, আঁই তোরারে চাই লইয়ম।' (জলদাস ২০১৬ (ক) পৃ.২৪)

শুধু তাই নয় 'দহনকাল' উপন্যাসের মতো আলোচ্য গল্পেও পাক সৈন্যদের অত্যাচার-পীড়ন-লুণ্ঠন চোখে পড়ে। জেলে সমাজ তথা নিম্নবর্গের প্রতি পাকিস্তান শাসনযন্ত্রের এই অমানবিক আচরণকে চিরতরে বন্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে হরগোবিন্দ জলদাস প্রতিরোধে রাস্তায় বেছে নেয়। আলোচ্য গল্পে দেখি ক্যাপ্টেন মোর্শেদ দ্বিতীয় বার তাকে ধর্ষণ করতে এলে আগে থেকেই তৈরি হরগোবিন্দ ধারালো দা দিয়ে মোর্শেদকে কুপিয়ে হত্যা করে। গল্প অনুযায়ী,

'ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে চেরাগের ক্ষীণ আলোয় মোর্শেদের গলা বরাবর কোপ মারে দইজ্যা বুইজ্যা। মাথা বাঁচাতে মোর্শেদ ডানহাত ওপরে তুললে কোপটা সেই হাতেই পড়ে। বিচ্ছিন্ন হাতটা মাটিতে পড়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

দইজ্যা বুইজ্যা থামে না। কোপাতে থাকে। একটা কোপ পাকিস্তানি হায়নাটার মাথা বরাবর পড়ে। মাথা দু'ফাঁক হবার আগে মোর্শেদ মরণ চিৎকার দেয়।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ.২৮)

আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, হরগোবিন্দ এই প্রতিরোধ ইচ্ছাকৃত, স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রতিশোধস্পৃহা জনিত। পাক সৈন্যদের বর্বর অত্যাচার থেকে মুক্তিকামী জেলে হরগোবিন্দ উপলব্ধি করে যে মোর্শেদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বৃহত্তর রূপান্তর ঘটানো সম্ভব। তাই সে তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মোর্শেদকে কুপিয়ে হত্যা করে প্রতিবাদী চেতনার পরিচয় দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, অন্যায় অত্যাচার বঞ্চনা বা নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের সচেতন প্রতিবাদ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় ফল হলেও সাবঅলটার্ন স্টাডিজে বর্ণিত নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনার যে ইতিহাস লেখা হয়েছে সেখানে সাবঅলটার্ন শ্রেণি বিশেষ করে কৃষকরা ঔপনিবেশিকতা ও প্রতিরোধের কথা বাস্তবে ত্যাগ করেছিল।

'The 'Subaltern classes, specifically peasants' gave away in practice to the textuality of colonialism and resistance.' (Ludden (ed.) 2002, p.19)

অর্থাৎ নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনা সবসময় ইতিহাস মেনে জেগে ওঠেনি। হরিশংকরের কথাসাহিত্যে তাই নিম্নবর্গের প্রতিবাদী সত্তা অন্যায়-বঞ্চনার বিরুদ্ধেও যেমন দেখা গিয়েছে, তেমন আবার অধিকার আদায় করে নেওয়ার ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে। নিম্নবর্গ গোটা সমাজের হয়ে কথা বলতে পারে না—গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক কথিত আলোচ্য মন্তব্যটি গল্প-উপন্যাস অনুযায়ী সঠিক হলেও নিজ সম্প্রদায় বা সমাজের জন্য নিম্নবর্গ প্রতিবাদ করেছে।

৫.২.২ সম্মিলিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধের স্বরূপ

অন্যায়-বঞ্চনা-নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের প্রতিবাদের আরেকটি স্বরূপ হল, তাদের সম্মিলিত প্রতিরোধ। আসলে যে কোনো প্রতিবাদ তার চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে ধাপে ধাপে। নিম্নবর্গীয় প্রতিবাদী চেতনা উচ্চবর্গের বিপরীতে শ্রেণিচেতনার মধ্য দিয়ে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। লক্ষণীয় যেখানেই তথাকথিত উচ্চবর্গ তাদের আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছে—তা সে সর্বজনসম্মতিক্রমেই হোক বা বলপ্রয়োগ করেই হোক, তার বিপরীতে তথাকথিত নিপীড়িত নিম্নবর্গ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এ সমালোচক পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন-

'If domination is one aspect of this relation of power, its opposed aspect must be resistance. The dialectical opposition of the two gives this relation its unity. This opposition also creates the possibility for a movement within that relation, and thus makes it possible for there to be a history of the relation of dominance and subordination,' (Chaturvedi (ed.) 2000, p.11)

অর্থাৎ আধিপত্য যদি ক্ষমতার সম্পর্কের একটি দিক হয়, তাহলে তার বিপরীতে অবশ্যই প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। উভয়ের এই দ্বান্দ্বিক বিরোধিতা ক্ষমতার সম্পর্ককে ঐক্যবদ্ধ করে এবং সেই সম্পর্কের মধ্যে একটি আন্দোলনের সম্ভাবনা তৈরি করে। এইভাবে আধিপত্য ও অধীনতার সম্পর্কের ইতিহাস তৈরি করা সম্ভব হয়।

হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সমাজের মানুষের প্রতিরোধ গড়ে তোলার বিষয়টিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সামাজিক কাঠামোর তথাকথিত ক্ষমতাবানদের সঙ্গে তথাকথিত নিম্নবর্গের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ফলে নিম্নবর্গের প্রতিরোধে সত্তা বা চেতনা জাগরিত হয়েছে। অন্যায়, বঞ্চনা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে তারা তাদের সর্বস্ব বুদ্ধিমত্তা ও সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

'জলপুত্র' উপন্যাসে ঘটনাচক্রে জেলেরা এ সত্য অনুধাবন করে যে দাদনদার শুক্কুর ও শশিভূষণ মহাজন তাদের বহুদিন ধরে সুদ দেওয়ার নামে বঞ্চনা করে এসেছে। দেখা যায় দাদনদার শুক্কুর ঋণের অন্যায় শর্ত অনুযায়ী নিজ নির্ধারিত মূল্যে কামিনী বহদ্দারের কাছে মাছ কিনতে চাইলে সে বাধা দেয়। বাধাপ্রাপ্ত শুক্কুর কামিনীকে চড় মারে। সমুদ্রের পাড়ে কামিনীকে লাঞ্ছিত হতে দেখে অন্যান্য জেলেরা শুক্কুরের এই অন্যায়ের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়। রামনারায়ণ বহদ্দার শুক্কুরকে হুমকি দিয়ে বলে ওঠে,

> 'খবদ্দার আর কোনোদিন যদি কামিনী বহদ্দার অথবা অন্যকোনো জাইল্যার গাআত্ হাত তোল, তইলে হেই হাত আঁরা বেয়াগ্গুনে ছেঁচি দিয়ম।' (জলদাস ২০০৮, পৃ.৫৩)

জেলের গায়ে হাত তোলার প্রতিবাদ স্বরূপ জেলেরা শুক্কুর ও শশিভূষণ এর কাছে বাজার নির্ধারিত মূল্যে মাছ বিক্রির পরিকল্পনা মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

> 'আরো অনেক সলাপরামর্শের পর ঠিক হল—যারা শুক্কুর ও শশিভূষণের কাছ থেকে দাদন নিয়েছে, তারা আগামীকাল থেকে তাদের কাছে মাছ বেচবে বাজার দরে। মহাজনদের মনগড়া দরে মাছ বেচবে না। এজন্য কোনো অঘটন ঘটলে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে তার প্রতিরোধ করবে। কামিনী এবং অন্যান্য ঋণগ্রহীতার দাদনের টাকা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিশোধ করে দিতে পরামর্শ দেওয়া হল।' (জলদাস ২০০৮, পৃ.৫৪)

উপন্যাসের অন্তিম পর্বে জেলেদের যে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে শুক্কুর-শশিভূষণদের বিরুদ্ধে তা একদিনে গড়ে ওঠেনি। আসলে শুক্কুর ও শশিভূষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার পেছনে রয়েছে জেলেদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, অপমান, নিপীড়ন ও গর্হিত অন্যায়-অপকর্ম। আর এর প্রাথমিক সূচনা হয়েছে শুক্কুর দ্বারা কামিনী বহদ্দারের গালে চড় মারার ঘটনা থেকে।

দ্বিতীয়ত, জেলেদের সরলতা ও নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়েছে শুক্কুর ও শশিভূষণ। জেলেদের দেওয়া ঋণের সুদের হিসেবে তারা খাতায় ভুল লিখে রাখে। নিরক্ষর জেলেরা দাদনদার হিসেব বিশ্বাস করে নেয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে একদিন কামিনী বহদ্দারের হিসেব করতে গিয়ে শুক্কুরের ছলচাতুরি ধরা পড়ে। গঙ্গাপদ ও দয়ালহরি মাস্টারের সহায় তাঁর শুক্কুরের যোগফল ভুল লিখে রাখার ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। জেলেরা বুঝে যায় তাদের এতদিন ধরে শুক্কুর শশিভূষণরা ঠকিয়ে এসেছে। এর জবাবে তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। গঙ্গাপদর নেতৃত্বে পাড়ার তরুণ জেলেরা ঠিক করে শুক্কুর ও শশিভূষণের কাছ থেকে পরের বছর থেকে দাদন নেওয়া হবে না। বহদ্দাররা সাধারণ জেলেদের টাকা দিয়ে সাহায্য করবে। শুধু তাই নয়, জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে জলদস্যু নৌ-ডাকাতদের হাতেও লুণ্ঠিত ও নিপীড়িত হয় মাঝেমধ্যে, জীবন বাজি রাখে ধরা মাছগুলি তারা জেলেদের কাছ থেকে নিমিষেই লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। বাধা দিতে গেলে প্রাণ হারানোর ঝুঁকি থাকে। অর্থাৎ জেলেরা জলেও বঞ্চিত-নিপীড়িত, স্থলেও বঞ্চিত-নিপীড়িত। তাই

> 'অনেক সলাপরামর্শের পর সভায় ঠিক হল শুক্কুর ও শশিভূষণ থেকে আগামী বছর দাদন নেওয়া হবে না। জলডাকাতের আঘাতের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত করা হবে।' (জলদাস ২০০৮, পৃ.৯৮)

জেলেদের পরিকল্পিত সিদ্ধান্তকে পরিণতি দেওয়ার জন্য এক গভীর রাতে গঙ্গা, জয়ন্ত, জগদীশ, অনিল প্রভৃতি তরুণেরা বিজন বহদ্দারের বাড়িতে জমায়েত হয়। সেখানে উপস্থিত থাকে রামনারায়ণ, পূর্ণচন্দ্র, গোলকবিহারী, কামিনী বহদ্দার ও কয়েকজন পাউন্যা নাইয়া। গঙ্গাপদ বহদ্দারদের উদ্দেশ্যে বলে, গত মরসুমে যাদের উপার্জন বেশি হয়েছে তারা প্রত্যেকে দুজন করে জেলেদের দাদন দেবে। বহদ্দারদের সহযোগিতায় গঙ্গাপদরা শুক্কুর-শশিভূষণের শোষণের হাত ভেঙে দিতে চায়। তাই গঙ্গা সভায় উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলে -

> '..চাও, আঁরা অর্থাৎ জয়ন্তদা, অনিল, আঁই, এড়ে যে যে যোয়ান পোয়াঅল উপস্থিত অই, হিতারার বেশির ভাগর কোনো না-জাল নাই। আঁরা শুধু তোঁয়ারার মঙ্গলল্লাই আজিয়া অঁওর অই। আঁরারে সাহায্য গর। আঁরা দাদনদারর শোষনর হাত ভাঙি দিয়ম।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১০৮)

তরুণ জেলেদের প্রতিবাদ স্পৃহা দেখে বহদ্দার ও অন্যান্য জেলের সাহস সঞ্চারিত হলেও তাদের মনে দ্বিধা তৈরি হয়েছে। তাদের মতে, দাদনদারদের স্বার্থে আঘাত লাগলে তারা জেলেদের সমূহ ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। বহদ্দার ও অন্যান্য জেলেদের মনের দ্বন্দ্ব কাটাতে গঙ্গা তাই বলে-

> '...একখান কথা মনত্ রাইখ্যো তোঁয়ারা, মাইর খাইতে খাইতে মাইনষর পিড দেয়ালত্ ঠেগি গেলে গই মাইনষে ঘুরি থিঁআ। তোঁয়ারারও ঘুরি থিআঁনর সময় হইয়ে। আঁরা আছি তোঁয়ারার লগে।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১০৯)

একথা তো সত্যিই যে, দিনের পর দিন মার-বঞ্চনা-অন্যায় সহ্য করতে করতে জেলেদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে। তাই তাদের ঘুরে দাঁড়ানো অর্থাৎ প্রতিরোধ করার সময় এসেছে।

তৃতীয়ত, গঙ্গাপদদের একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সংবাদ অবিলম্বে শুক্কুর-শশিভূষণের কাছে পৌঁছে গেলে তারা চুপ করে বসে থাকে না। বিনা পরিশ্রমে সুদের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে শুক্কুর প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে।

'ঠান্ডা মাথার শশিভূষণ শুক্কুরকে নিয়ে বসে শেষ পর্যন্ত ঠিক করল—ডোমদের শাস্তি দিতে হবে। উচিত শাস্তি। জীবনের শাস্তি।' (জলদাস ২০০৮, পৃ.১১৭)

জেলেদের জীবন এর উচিত শাস্তি দিতে গিয়ে তারা জেলেদের ভাতে মারার পরিকল্পনা করেছে। এক অন্যায়ের পর আরো এক অন্যায়কর্মে তারা লিপ্ত হয়েছে। কয়েকদিন পর দেখা যায়, উত্তর পতেঙ্গা সমুদ্র উপকূলে চারটা তক্তার নৌকা। সেই নৌকার আরোহীরা মাছ মারার কাজে দক্ষ, যাদের শুক্কুর ও শশিভূষণ সন্দীপ থেকে ভাড়া করে এনেছে। জানা যায়, মাছ মারার মরসুমে এরা দাদনদারদের হয়ে সমুদ্রে মাছ ধরবে। দাদনদারদের এই ষড়যন্ত্র জেলেদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। শুক্কুরদের অন্যায়ের বিচার চাইতে জেলেরা ঠিক করল পরদিন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আফজালুর রহমান চৌধুরীর কাছে যাবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে জেলেরা হতাশ হয়। কারণ তিনি তার কথাবার্তায় বুঝিয়ে দেয় শুক্কুর-শশিভূষণের অন্যায়ের প্রতিকার করতে তিনি পারবেন না। জেলেরা হতাশ হয়ে গঙ্গাপদর উঠানে জড়ো হয়। সেখানে গঙ্গা সকলের উদ্দেশ্যে বলে-

'যার কাছত্তোন সাহায্য পাওনর কথা, হেই চেয়ারম্যান যখন সাহায্য নো গইল্যো, তখন আঁরার অধিকার আঁরাত্তোন আদায় গরি লওন পড়িব। অন্যায়ের মূলরে হাঁড়ি দেওন পড়িবো। এই জ্যাইলাপাড়াত্ যত নৌকা আছে, কালিয়া বিয়াগ্নিন পাতাত্ যাইবো। কোনোভাবেই শুক্কুইজ্যা শইশ্যারে আঁরার সামনে জাল বোয়াইতো দিতাম নো। আঁরা পতিরোধ গইয্যম।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১২৪)

চতুর্থত, জেলেদের সম্মিলিত প্রতিরোধ পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে শুক্কুর ও শশিভূষণ গোপনে ঠিক করে-

'খানকির পোয়া গঙ্গাইয়ার লিডারগিরি থামাই দেওন পড়িবো।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৯১)

কারণ তারা জানে গঙ্গাপদ জেলেদের প্রতিনিধি। তার নেতৃত্বে জেলেরা ক্ষেপে উঠেছে প্রতিবাদের জন্য। সে ক্ষেত্রে দলের মাথাকে সরিয়ে দিলে প্রতিবাদ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যাবে। ফলে একরাতে গঙ্গা টাউঙ্গাজাল নিয়ে মাছ ধরতে গেলে সে আর ফিরে আসে না। পরদিন বংশীর মুখে শোনা যায়-

'গঙ্গা মরি গেইয়ে গই। গঙ্গারে মারি ফেলাইয়ে। আঁই শুক্কুরজ্যার খামারর ঢাগর খালত্ দেখি আস্যি।'

(জলদাস ২০০৮, পৃ.১২৭)

যে গঙ্গাপদ ছেলেবেলা থেকেই জেলেসমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটি উপলব্ধি করেছে, সেই একসময় তরুণ মন নিয়ে জেলেদের মধ্যে প্রতিরোধী ভাবনাকে জাগ্রত করতে সচেষ্ট হয়েছে। গঙ্গা নেতৃত্বে জেলেদের ঘুরে দাঁড়ানোর বিষয়টি দাদনদারেরা স্পর্ধা হিসেবে দেখেছে। তাই প্রতিরোধের মাথা গঙ্গাকে চিরতরে সরিয়ে দিয়েছে তারা। এই মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য যে শুক্কুর ও শশিভূষণই দায়ী তা জেলেদের বুঝতে দেরি হয় না। গঙ্গার মৃত্যু জেলেদের মধ্যে প্রতিরোধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে ত্বরান্বিত করে। ফলে

'অল্পক্ষণের মধ্যে দেখা গেল শুক্কুরের খামারটি দাউদাউ করে জ্বলছে। জেলেরা দলবেঁধে সেই খামারে আগুন দিয়েছে।'

(জলদাস ২০০৮, পৃ.১২৮)

আসলে জনস্বার্থের স্বতঃস্ফূর্ততা থেকে উদ্ভূত একরকম অনেক প্রতিরোধের জন্য উচ্চবর্গ তৈরি থাকে না। শশি-শুক্কুরের খামারে জেলেদের আগুন লাগানোর ঘটনা আসলে গঙ্গার মৃত্যুর প্রতিশোধস্পৃহা থেকে উদ্ভূত সম্মিলিত স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া। সাবঅলটার্ন স্টাডিজ আলোচনায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাই বলেন-

'Subaltern studies is right that many resistances that arise out of populer spontaneity do not rely on clite initiatives, but this does not mean that they always lead to desirable consequences (popular mobilization in communal riots is an example. (Mannathukkaren, 2022, p. 142)

তাহলে 'জলপুত্র' উপন্যাসে জেলেদের প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও প্রতিরোধ করা প্রসঙ্গে আমরা অনুধাবন করলাম যে আধিপত্য ও অধীনতার দুটি বিপরীত শাসন ক্ষেত্রে ক্ষমতার শৃঙ্খলাকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে। অর্থাৎ একদিকে শুক্কুর-শশিভূষণের ছেলেদের প্রতি আধিপত্য বিস্তার করার মধ্য দিয়ে নানা অন্যায়-বঞ্চনা করা এবং অন্যদিকে সেই বঞ্চনা-অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেলেদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও শুক্কুরের খামারে আগুন লাগিয়ে অন্যায়ের প্রতিশোধ স্বরূপ প্রতিরোধ করা। আলোচ্য এই দ্বিমুখী সম্পর্কে নিম্নবর্গের প্রতিবাদ স্বরূপ প্রতিরোধ গড়ে তোলা নিম্নবর্গীয় চেতনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরা পড়েছে।

একইভাবে 'দহনকাল' উপন্যাসেও ধরা পড়েছে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে পাকিস্তানি সৈন্য তথা পাকিস্তানি শাসকের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেলে সমাজের প্রতিরোধ। 'জলপুত্র' উপন্যাসের মতোই আলোচ্য উপন্যাসে জেলেদের প্রতিরোধ একদিনে গড়ে ওঠেনি। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে জেলেদের নিপীড়িত বঞ্চিত হয়ে আসার ঘটনা। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে রাজাকার বাহিনীর বিশ্বাসঘাতকতা ভারতের কাশ্মীর ও পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রভাবে তৎকালীন বাংলাদেশের চট্টগ্রামের জেলেজীবনকে বিপর্যস্ত করে। এর ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি সাম্প্রদায়িকতায় পর্যবসিত হয়। উপন্যাসে জানা যায়, ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের আটকাতে পাকিস্তানী সৈন্যরা বাংলাদেশের গ্রাম গঞ্জের

ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালি তরুণরা তাদের শিকারের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। তাদের হিংস্র বর্বরতায় বাংলাদেশের জনজীবন বিপর্যস্ত হতে থাকে। পাকিস্তানি সৈন্যদের একের পর এক অন্যায় অত্যাচার নিপীড়নের ঘটনা জেলেদের সহ্যের বাধ ভেঙে দেয় এক সময়। ফলে প্রতিরোধের রাস্তা বেছে নেয় জেলেরা। উপন্যাসে যে ঘটনাগুলির সম্মিলিত ফল হিসেবে জেলেদের প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে তা সংক্ষেপে দেখা যাক।

প্রথমত, পাকিস্তানি সৈন্যরা উত্তর পতেঙ্গা গ্রামকে অবরুদ্ধ করে জেলেদের জোর করে পরিখা খননের কাজে বাধ্য করে। বাঙালিদের ওপর তাদের নৃশংস, অত্যাচার, নিপীড়ন-ধর্ষণ, লুটপাঠ, নির্বিচার নারকীয় হত্যালীলা চলতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলে সৈন্য দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় জেলেরা। রাধানাথকে ইন্ডিয়ার গুপ্তচর সন্দেহে আটকে রেখে অমানবিক অত্যাচার ও নিপীড়ন করা হয়। প্রহারের চোটে সে পঙ্গু হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, পাক সৈন্য ও রাজাকাররা খন্দক খোঁড়ার জন্য মানুষ সংগ্রহ করার নামে পাড়ায় পাড়ায় নারী ধর্ষণের মতো গর্হিত অন্যায় অত্যাচার চালায়। রাধেশ্যামের বউ ও পরিমলের মেয়ে বিশাখাবালাকে ধর্ষণ করে পাক সৈন্যরা।

চতুর্থত, পাক সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ধ্বংস করতে। ফলে মাঝে মাঝেই তারা জেলেপাড়ায় বা মুসলমান পাড়া থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও গুপ্তচর সন্দেহে মৃদুল, তপন, সন্তোষ ও আরো কয়েকজন তরুণদের ধরে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে মৃদুল নামক তরুণ জেলেকে অকথ্য অত্যাচারের পর গুলি করে হত্যা করা হয়।

পঞ্চমত, মেজর গিলানির নির্দেশে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনের একটি সৈন্যদল হরিদাস, নিরঞ্জন সহ আরো অনেক জেলেকে জোরপূর্বক ট্রেন্স খোঁড়ার জন্য ধরে নিয়ে যায়। কখনো সামান্য খাওয়ার দিয়ে বা কখনো অভুক্ত রেখে তাদের প্রতি অত্যাচার-নিপীড়ন করা হয়েছে। শেষে নিকুঞ্জকে জোর করে মুখে গোরুর মাংস ঢুকিয়ে দিয়ে হিন্দু ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করেছে পাক সৈন্যরা।

ষষ্ঠত, মুসলিম পাড়া ও জেলেপাড়ায় রাজাকার ও পাকসৈন্যরা জোর করে তাদের গোরু ছাগল মুরগি লুণ্ঠন করে। বাধা দিতে গেলে বন্দুকের বেয়নট দিয়ে আঘাত করে সৈন্যরা।

মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে পাকসৈন্য দ্বারা অন্যায় নিপীড়ন দীর্ঘদিন ধরে সহ্য করে আসা জেলেরা যখন দেখল তাদের মা-বোনদের সম্মানে আঘাত করেছে তখন তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আমরা জানলাম জেলেদের উত্তেজিত মানসিকতার ভাষ্য -

‘আমাদের মধ্যে একটা প্রস্তুতি চলছে—প্রতিশোধ নেওয়ার প্রস্তুতি, প্রত্যাঘাত করার প্রস্তুতি। আবার যদি আমাদের কোনো মাকে, বোনকে, অবুঝ কন্যাকে অপমান করতে আসে, তাহলে তাদের আর আস্ত ফিরে যেতে হবে না। আমাদের জান যাবে, কিন্তু আর মান যেতে দেব না। আমাদের ভেতরে অপমানের যে আগুন জ্বলছে, সে আগুন বড়ো বড়ো গলার আগুনের চেয়ে দাহ্যগুণ সম্পন্ন। অপমানের সেই আগুনে পুড়িয়ে মারব আমরা শত্রুদের, প্রাণ দিয়ে তাদেরকে আমরা এই পাড়া থেকে আর ফিরে যেতে দেব না।’ (জলদাস ২০১০, পৃ.১৮০)

জেলেদের এই প্রতিরোধের সংকল্প অনুযায়ী উপন্যাসে দেখা যায়, রাধেশ্যামের বাড়ির পেছনে নানাজনের বাড়ির বাঁশঝাড় থেকে নলিবাঁশ, বোরাও বাঁশ কেটে এনে জড়ো করা হয়। শুধু তাই নয়, পাক সৈন্যদের আক্রমণ করার অস্ত্রশস্ত্র তৈরির পাশাপাশি তারা গভীর রাতে জেলেপাড়া ঢোকার রাস্তার নিচে সুরঙ্গ খোঁড়ে। হরিদাসের অনুমান অনুযায়ী পাকসৈন্যরা হামিদের দেখানো পথে পরিমলের উঠানে উপস্থিত হয় সেই রাতে। সৈন্য প্রধান আনসারি পরিমলের ঘরের ভেতরে ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যেই খু-উ বুইজ্যা আনসারিকে ছুঁচালো বাঁশ দিয়ে আঘাত করলে আনসারি তাকে গুলি করে ধরাশায়ী করে।

‘এইসময় পরিমলের রান্নাঘরের পাশ থেকে দ্রুতবেগে বেরিয়ে এলো রাধেশ্যাম, হাতে দিনের পর দিন ঘষে ঘষে ধারালো করে তোলা লম্বা দা-টি। উঠানে পাহারারত সৈন্যরা বুঝে ওঠার আগেই আনসারির গলা লক্ষ করে সে দা-টি চালিয়ে দিল। গোঁৎ একটা শব্দ করে আনসারির বিপুল দেহটি উঠানে লুটিয়ে পড়ল। একজন পাকসেনার রাইফেলের গুলি রাধাশ্যামের মাথার খুলি উড়িয়ে দিল। ঠিক এই সময়ে পরিমলের বাড়ির চারদিক থেকে অজস্র ইটের টুকরা ও সুঁচালো বাঁশ তীরের গতি নিয়ে পাকসেনা ও রাজাকারদের গায়ে মাথায় এসে আঘাত করতে লাগল।’

(জলদাস ২০১০, পৃ. ১৯৩)

দেখা গেল, জেলেদের প্রতিরোধের সীমানা বা সংহতির কোনো একক নির্দিষ্ট চরিত্র নেই যা সরাসরি তার তাৎক্ষণিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বা সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে অনুমান করা যায়। বিস্তৃত অর্থে, পরাধীনতা ও প্রতিরোধ উভয় ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গীয় চেতনা উপলব্ধি করে যে প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে তারা একটি বৃহত্তর পরিসরে কাজ করতে এবং রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম। এই ক্ষমতা বা প্রতিরোধ বিদ্রোহ বা আন্দোলনকে একটি ইচ্ছাকৃত এবং সক্রিয় বিদ্রোহী চেতনা উদ্দেশ্য পূরণে সচেষ্ট হয়। ঔপনিবেশিক ভারতে ঘটে যাওয়া কৃষক বিদ্রোহের বিশ্লেষণে সমালোচক পার্থ চট্টোপাধ্যায় কৃষক চৈতন্যের প্রতিরোধ সংগঠন ও রূপদান সম্পর্কে একথাই বলেছেন যা শুধু কৃষকদের ক্ষেত্রেই নয়, তথাকথিত নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাঁর মতে,

‘The boundaries or forms of solidarity in peasant rebellions have no single detreminate character that can be directly deduced either from its immediate socio-economic context or from its cultural world. … in the broadest sense available to a peasant conciousness, for from being narrow and inflexible, is

capable of a vast range of transformations to enable it to understand, and to act within, varying context, both of subordination and of resistance.' (Chaturvedi (ed.) 2000, p. 14)

'দহনকাল' উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে জেলেদের সংহতি ও প্রতিরোধেরও কোনো নির্দিষ্ট চরিত্র নেই। পরাধীনতা অর্থাৎ অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে জেলেরা পাক সৈন্যদের অত্যাচারের প্রতিশোধ এবং একই সঙ্গে তাদের বিতাড়িত করতে চেয়েছিল যার ফলে সম্মিলিত প্রতিবাদ গড়ে উঠেছে।

'রামগোলাম' উপন্যাসে দেখি, ফিরিঙ্গিবাজার সেবক কলোনিতে মেথর সন্তানদের পড়াশোনার জন্য পাকিস্তান সরকার একটি স্কুল তৈরি করলে সেখানে পরবর্তীকালে মেথর সন্তানদেরই প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। সমাজের তথাকথিত ভদ্রলোকের দায়িত্ব নিয়ে তাদের ছেলে মেয়েকে স্কুলে পড়ানোর সুযোগ করে দেয়। বঞ্চিত করে মেথর সন্তানদের। এই ঘটনায় মেথররা ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বোধ করলে মেথর সর্দার গুরুচরণ এর প্রতিবাদ স্বরূপ মেথরদের একত্রিত করে,

> 'সবাই মিলে করপোরেশনে নালিশ জানাল, শিক্ষা অফিস নালিশ জানাল। বাবা সর্দার বলে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করলো বেশি। এক রাতে বাপকে মেরে রাস্তায় শুইয়ে দিয়ে গেল ওরা।' (জলদাস ২০১২, পৃ.২৮)

শুধু তাই নয়, গুরুচরণ মেথরদের নিয়ে শিক্ষা অফিসে প্রতিবাদ করতে গেলে অফিসার তাদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে তাড়িয়ে দেয়। তাতেও গুরুচরণ না দমলে তাকে পিয়ন-আরদালি দিয়ে প্রহার ও অপমান করা হয়। সুতরাং অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার ফল ফলপ্রসূ হয়নি কোনোবার। উচ্চবর্গের প্রতিরোধের সামনে তাদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার কাজ হয়নি। আসলে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর 'Can the Subaltern Speak?' প্রবন্ধে জানিয়েছেন- নিম্নবর্গ তার কথা অন্যকে বোঝাতে অক্ষম। কারণ উচ্চবর্গীয় চেতনায় নিম্নবর্গ বরাবর অলীক। তাকে গুরুত্ব দিয়ে শোনা বা বোঝার মতো কোনো রিসিভার উচ্চবর্গের মধ্যে নেই। (Landry (eds.) 1996, p.272)

যদিও 'রামগোলাম' উপন্যাসে মেথরসমাজের মূল সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তাদের জন্য নির্ধারিত চাকরি সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। আসলে জীবিকা যেখানে মূল প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে জীবন অনিশ্চয়। সেই কারণে কর্পোরেশনের বড়োবাবু আবদুস ছালামের সঙ্গে মেথরদের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। আর যেখানে দ্বন্দ্ব হয়, সেখানে দুই তরফেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক প্রতিবাদের সূচনা হয়। তাইতো আবদুস ছালামের অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কার্তিক বলে ওঠে,

> 'নোংরা কাজ করতে করতে আমাদের জীবন ক্ষয়ে ফেলেছি। পুরুষানুক্রমে আপনারা মানে ভদ্রলোকেরা আমাদের ব্যবহার করেছেন। আজ সরকারের দোহাই দিয়ে আমাদের পেটে লাথি মারতে চাইছেন।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৭৯)

এরপর মেথরদের তরফ থেকে মনুলাল, চেদিলাল, মদোশ্যামল ও রামগোলামের মৌখিক প্রতিক্রিয়া একে একে লক্ষ করা গিয়েছে। দেখা যায় মনুলাল প্রথমে বড়ো সাহেবের হয়ে কথা বললেও স্বজাতির স্বার্থে আঘাতের ফলে সেও মেথরদের হয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে। এক্ষেত্রে মনুলালের প্রতিক্রিয়া -

'আর বেইমানি নয়। জাতের সঙ্গে আর বেইমানি করব না। আপনি আপনার নোটিশ ফিরিয়ে নিন, নইলে ভালো হবে না।' (জলদাস ২০১২, পৃ.১৮০)

চেদিলালের প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা যায়-

'আমরা স্ট্রাইক করব। আবর্জনা পরিস্কার করব না। দিনের পর দিন।' (জলদাস ২০১২, পৃ.১৮০)

মদোশ্যামল চেদিলালের কথার রেশ ধরে বলে ওঠে

'তখন বুঝবেন মজা। ভদ্রলোকদের বারোটা বাজবে তখন।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৮০)

সর্দার রামগোলামেরও একই প্রতিক্রিয়া প্রতিধ্বনিত হয়েছে-

'আমরা অচল করে দেব সব। আবর্জনায় সয়লাব হয়ে যাবে গোটা শহর। ময়লার ডিপো হবে।'
(জলদাস ২০১২, পৃ. ১৮০)

মেথরদের প্রতিক্রিয়া ও আন্দোলন করার হুমকি শুনে বড়ো সাহেব আবদুস ছালাম উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তার বক্তব্য—তাকে ভয় দেখিয়ে লাভ হবে না তাদের। তিনি মেথরদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন। কিন্তু রামগোলাম প্রতিবাদী ও অধিকারবোধে সচেতন। তাই সে বলে -

'ভয় না স্যার, হকের কথা বলছি। সুইপারের চাকরিতে আমাদের পুরুষানুক্রমে হক আছে।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৮১)

অধিকারবোধে সচেতন হওয়া মেথরদের মধ্যে ধর্মঘট করার পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া নিম্নবর্গীয় চেতনার প্রতিবাদী সত্তাকে পরিস্ফুট করেছে। শুধু তাই নয়, যে হারাধনবাবু সর্বদা বড়োবাবুর অনুগত হয়ে কাজ করে আসছিল সেও একসময় মেথরদের অধিকারের পক্ষে প্রশ্ন করেছে। কারণ হারাধনবাবু দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছেন যে তিনি মেথরদেরই একজন। তাইতো সে আবদুস ছালামকে তার অন্যায় কর্মকাণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন একে একে।

'ভয় না স্যার, সাবধান করছি। আপনি মেথরপট্টির সঙ্গে লাগিয়ে কসাইখানা তৈরি করলেন। মিথ্যাকে সত্যের আবরণে বোঝালেন তাদের। ধর্মের আফিম খাওয়ালেন। শেষ পর্যন্ত কী করলেন আপনি? ধর্মনাশ করলেন তাদের। এতে শুধু মেথররা রেগে গেল না, গোটা চট্টগ্রামের হিন্দুরা, এমনকি আপনার করপোরেশনের লোকেরা পর্যন্ত আপনাকে ঘৃণা করতে শুরু করল।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৮৭)

সকলের প্রতিবাদের মুখে পড়ে আবদুস ছালাম আরো প্রখর হয়ে উঠেছেন। ক্ষমতার দম্ভ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তিনি নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকেছেন। কারণ তিনি জানেন কর্পোরেশনের সিদ্ধান্তকে স্তিমিত বা পরিবর্তন করার সাধ্য মেথরসমাজের নেই। নিম্নবর্গকে তুচ্ছ ভাবার মানসিকতা আসলে উচ্চবর্গীয়

চেতনারই বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এ চর্চিত কৃষকদের প্রতিবাদী চেতনা স্বরূপ বলা হয়েছিল-

> “The insurgent consciousness was, first of all, a ‘negative consciousness’, in the sense that its identify was expressed solely thought an opposition, namely, its difference from and antagonism to its dominators.” (Chaturvedi (ed.) 2000, p.12)

অর্থাৎ নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনা আসলে তাদের একটি নেতিবাচক চেতনা। কারণ প্রভাবশালীর বিপরীতে নিম্নবর্গ তাদের সর্বোচ্চ শক্তি প্রকাশের কথা বলে প্রভাবশালীর ক্ষমতা না জেনেই। ফলে প্রথম থেকেই উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের মধ্যে ক্ষমতা প্রদর্শনের বিরাট পার্থক্য তৈরি হয়ে থাকে। সেই কারণেই আকর্ষণের ক্ষমতা না জেনেই নিম্নবর্গীয় মেথররা তাদের ধর্মঘট পরিকল্পনা ও তারা কি কি করতে পারে তা আগে থেকে জানিয়ে দেয় বড়োবাবুকে। আর বড়োবাবু তাদের পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করার জন্য কীভাবে নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করবেন, তা পরিকল্পনা করার সময় ও সুযোগ পেয়ে যান। উপন্যাসে,

> ‘করপোরেশনের বিল্ডিংয়ের সামনের মাঠে হরিজনরা অবস্থান নিয়েছে। মাঠ ছাড়িয়ে রাজপথ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে তারা। চার পট্টির হাজার পাঁচেক হরিজন আজ নিত্যদিনের সব কাজকাম ফেলে ঘেরাও-এ অংশ নিয়েছে। সবার সামনে রামগোলাম। তারপাশে কার্তিক, চেদিলাল, রামপ্রসাদ, চমনলাল, ইন্দল, বাল্লু, শক্তিলাল, মনুলাল—এরা। এদের পাশে পাশে হরিজনপল্লির আবালবৃদ্ধবনিতা।’ (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৮৯)

দেখা গেল, চতুর্থদিনে হরিজনদের ধর্মঘট করতে উস্কে দেওয়ার অভিযোগে বড়োবাবু আবদুস ছালাম রামগোলামকে বরখাস্ত করলেন। ফলে উত্তেজনা আরো ছড়িয়ে পড়ে মেথরপল্লিতে। অন্যদিকে গত তিনদিনে মেথরদের ধর্মঘটের জন্য গোটা চট্টগ্রাম শহর ময়লা-আবর্জনায় সয়লাব। নালা-নর্দমা নোংরা জলে উপচে পড়ে রাজপথ ভরিয়ে ফেলেছে। আবর্জনার দুর্গন্ধে শহরবাসীর দূরবস্থা। শত শত টেলিফোন আসতে থাকে কর্পোরেশন অফিসে। সেখান থেকে শহরবাসীকে সঠিক তথ্য দেওয়ার বদলে দুদিন পর সব পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। এরকম অবস্থায় রামগোলাম ঘোষণা করে,

> ‘... আগামীকাল সকাল থেকে করপোরেশনের বাইরে ভেতরে অবস্থান নেব আমরা। হাতে বেলচা-কাঁটা, নারী পুরুষ সবাই আসবে। কালকে আমাদের জীবন মরণের দিন। কালকে চৌদ্দ তারিখ। (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৮৮)

উপন্যাস অনুযায়ী পরদিন কর্পোরেশনের সামনে অবস্থান কালে মেথরদের সঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের বিরোধিতা তৈরি হয়েছে। হঠাৎই চাকরিপ্রার্থীদের ভিড়ে বেইমান-বিশ্বাসঘাতক যোগেশকে দেখতে পায় মেথররা। হরিজনদের মধ্যে থেকে যোগেশকে মারার জন্য আওয়াজ উঠলে অপর প্রান্তে থাকা চাকরিপ্রার্থীরা কিছু না বুঝে তারাও মেথর দিকে ধেয়ে আসে।

'চিৎকার-চেঁচামেচি বিরাট হট্টগোলে পরিণত হল। তুমুল গালাগালি। প্রচন্ড আস্ফালন। মুষ্টিবদ্ধ হাতের ওপরে- নিচে ওঠা নামা। রক্তচক্ষু। টান টান পেশি। বিপরীত পক্ষের দিকে ধেয়ে আসা।'

... বেলচা, কাঁটা, ঝাড়ু হাতে চাকরিপ্রার্থীদের দিকে হরিজনদের ধেয়ে যাওয়া। গালাগালি থেকে মারপিট। চারিদিকে হইচই, ধুমধাম আওয়াজ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৮৯-৯০)

সমাজ কাঠামোর বিন্যাসে ক্ষমতা যেখানে মূল কথা সেখানেই উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের বিপরীত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সমালোচক দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর 'A small history of subaltern studies' প্রবন্ধে বলেছেন নিম্নবর্গের রাজনীতির বৈপরীত্য ও শ্রেণিচেতনা আসলে উচ্চবর্গের আধিপত্যের প্রতি একটি প্রতিরোধের ধারণা। তাঁর বক্তব্য

'In the domain of "Subaltern politics," on the other hand, mobilization such as "the traditional organization of kinship and territoriality or a class consciousness depending on the level of the consciousness of the people involved." They tended to be more violent than clite polities. Central to subaltern mobilizations was "a notion of resistance to elite domination."

(Schwarz (eds.) 2005, p. 472)

অর্থাৎ নিম্নবর্গের রাজনীতি ও তাদের প্রতিরোধের চেতনা সংহতির অনুভূমিক সংযুক্তি ও শ্রেণিচেতনার উপর নির্ভর করে। এর মধ্যে দিয়ে অভিজাত রাজনীতির চেয়ে নিম্নবর্গের আরো বেশি হিংস্র হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। কারণ নিম্নবর্গের সম্মিলিত হওয়ার কেন্দ্রবিন্দু ছিল অভিজাত আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ধারণা।

সুতরাং হরিশংকরের গল্প-উপন্যাসে বর্ণিত তথাকথিত নিম্নবর্গের প্রতিরোধ গড়ে তোলার বিষয়টিও যে 'a notion of resistance to elite domination' তা আমরা দেখলাম, বিশেষ করে 'জলপুত্র' উপন্যাসে শুক্কুর ও শশিভূষণের খামারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া বা 'দহনকাল' উপন্যাসে পাক সৈন্যদের বিরুদ্ধে একত্রিত প্রতিরোধ ও রাধেশ্যাম দ্বারা ক্যাপ্টেন আনসারির হত্যা অথবা 'দইজ্যা বুইজ্যা' গল্পে হরগোবিন্দ দ্বারা ক্যাপ্টেন মোর্শেদের হত্যা ও 'অর্ক' উপন্যাসে রহমালি কর্তৃক ছোবান মেম্বারের হত্যার ঘটনার মধ্য দিয়ে, যা আসলে দীর্ঘদিন ধরে নিম্নবর্গকে পিষ্ট করার এক আকস্মিক পরিণাম।

৫.৩ কথাবিশ্বে নিম্নবর্গীয় নারীর প্রতিবাদ

হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে বর্ণিত নিম্নবর্গীয় সমাজে অন্যায়-শোষণ-নিপীড়ন ও বঞ্চনা যেমন নারী-পুরুষ নির্বিশেষের প্রতি ঘটেছে, তেমনই উভয়ের তরফ থেকেই প্রতিবাদ-প্রতিরোধও উঠে এসেছে। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের নিম্নবর্গীয় নারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চার দেওয়ালের ভেতর নিজেকে অবরুদ্ধ করে রাখার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সর্বদা। তাই সেই দেওয়াল ভাঙার কথা তাদের কল্পনাতেও আসেনি

কখনো। যদিও কথাসাহিত্যে নারীর অবস্থান গুরুত্বপূর্ণভাবে উঠে আসতে না দেখলেও কাহিনির ঘটনাচক্রে নিম্নবর্গীয় সমাজের নারীরা প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যায়-বঞ্চনা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে মুখর হয়ে উঠেছে। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ঔপনিবেশিক কালখণ্ডে নারীদের অবগুণ্ঠন খুলতে শুরু করেছে।এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, তথাকথিত নিম্নবর্গীয় নারীর প্রতিবাদগুলির বিভিন্ন ধরন। কথাবিশ্বে নারী কখনো প্রতিক্রিয়াশীল, কখনো প্রত্যাঘাতী, কখনো আত্মঘাতী ও কখনো নীরব। আলোচনার এই পরিসরে নারী প্রতিবাদের আলোচ্য ধরনগুলি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কথাবিশ্বে নিম্নবর্গীয় নারীর প্রতিবাদী চরিত্রটি অনুধাবন করার চেষ্টা করব।

৫.৩.১ নারীর সরব ও ঘাতক প্রতিবাদ :

হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে তথাকথিত নিম্নবর্গীয় নারীচরিত্রের বহুল সমাবেশ ঘটলেও তাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধী চেতনা স্বল্প স্থান জুড়েই উঠে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা স্মরণ করে নিতে পারি সেই সব নারী চরিত্রদের যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। লক্ষণীয়, ‘দহনকাল’ উপন্যাসে বিধবা চন্দ্রকলা দাসী হরিদাসের সহপাঠী সুধীরের হাতে নাতিকে লাঞ্ছিত-প্রহৃত হতে দেখে নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। সুধীরের বাড়িতে গিয়ে তার পিতা মনোরঞ্জনের কাছে পুত্রের সকল অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে সোচ্চারে। উপন্যাস অনুযায়ী-

> ‘সেই ভরদুপুরে অক্ষত জেলেপল্লির চন্দ্রকলা নামের বিধবাটি মনোরঞ্জন বহদ্দারের উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠেছিল; ‘বহদ্দার, অ মনোরঞ্জন বহদ্দার, বাইর হ। চা তোর পোয়ার কীর্তি।’
>
> এপাড়ার কেউ কোনোদিন চন্দ্রকলাকে এরকম উগ্রমূর্তিতে দেখেনি, এরকম চিৎকার করে কথা বলতেও শোনেনি কেউ। আজ তার কী হলো!’ (জলদাস ২০১০, পৃ.৮৭)

আজ চন্দ্রকলার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে। দিনের পর দিন অপমানিত-নিপীড়িত-বঞ্চিত চন্দ্রকলা জীবন সংগ্রাম করতে করতে এ সত্য অনুধাবন করেছে, যে ভীতি ও হারানোর শঙ্কা নিয়ে সে বা তারা চুপ করে সব সহ্য করে আসছিল আজ তার বা তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর সময় এসেছে। নাতিকে লাঞ্ছনা বা প্রহার করা তো কেবল আজীবন সঞ্চিত ক্ষোভ উগরে দেওয়ার সামান্য উপকরণ মাত্র। আজ তাই মনোরঞ্জন বহদ্দারের কাছে যৌক্তিক প্রশ্ন করে চন্দ্রকলা,

> ‘চাও, চাও তোঁয়ার পোয়া আঁর নাতিরে কী-য্যে। আঁর নাতি পাস গইয্যে হিয়ান হিতার অপরাধ।’
>
> (জলদাস ২০১০, পৃ. ৮৭)

একজন জেলেসন্তানের শিক্ষিত হয়ে ওঠার পেছনে যে সমাজের অন্যান্য তথাকথিত ক্ষমতাবান মানুষের ঈর্ষা বা অশুভাকাঙ্ক্ষা রয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না চন্দ্রকলার সঙ্গে আমাদেরও। তাই নাতির লাঞ্ছনায় নিজের লাঞ্ছনা অনুভব করে চন্দ্রকলা। আজীবন মার খেয়ে মার সহ্য করা চন্দ্রকলার মতো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নারী নিজের স্বাভিমান রক্ষার্থে গর্জে উঠেছে।

লক্ষণীয় চন্দ্রকলা নিজের অপমান বা বঞ্চনার জন্য প্রতিবাদ করেনি। নাতির অপমান-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে সে। এর প্রেক্ষিতে আমরা বলতেই পারি নিম্নবর্গের নিজস্ব স্বতন্ত্র চেতনা রয়েছে বলেই অবস্থাভেদে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে তারা। এই কারণেই 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর ঐতিহাসিক-সমালোচকরা উচ্চবর্গের রাজনৈতিক চেতনার বিপরীতে নিম্নবর্গীয় চেতনার স্বতন্ত্র বিবেচনায় জোর দিয়েছেন।

একইভাবে 'কসবি' উপন্যাসে বর্ণিত পতিতাসমাজেও পতিতাপল্লির নারীদের প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠতে দেখা গিয়েছে। উপন্যাসে সাহেবপাড়া পতিতাপল্লিতে কালু সর্দারের আধিপত্যে পতিতারা বঞ্চিত নিপীড়িত হয়ে আসছে দিনের পর দিন। কিন্তু সময় বদলায়। মোহিনী মাসির ছেলে কৈলাস এসে পতিতাদের অধিকার বোধে জাগরিত করে। ইলোরা ও বনানী নামক পতিতারা সেইমতো সপ্তাহে একদিন ব্যবসা বন্ধ রাখার পরিকল্পনা করলে কালু সর্দার বনানীকে গালমন্দ করে তার গালে চড় মারে। ইলোরা এই ঘটনার প্রতিবাদে বলে ওঠে,

> 'গালি দিয়েন না সর্দার। আমাগো শরীরও শরীর। আপনাগো শরীর যদি বিশ্রাম চায়; আমাগোর শরীর চায় না?'
>
> (জলদাস ২০১১, পৃ.১৫২)

ইলোরার প্রতিক্রিয়ায় বনানীও চুপ থাকেনা। সেও তার সিদ্ধান্তে অটল থাকার কথা সর্দারকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়,

> 'তুমি সর্দার, মারতে পার। তোমার গুন্ডা-মাস্তান আছে। কিন্তু আমাগোর এককথা- শুক্রবার আমরা কাস্টমার ঢুকামু না ঘরে।' (জলদাস ২০১১, পৃ. ১৫৩)

বনানীর বক্তব্যে স্পষ্ট যে, ক্ষমতার দম্ভে ও আস্ফালনে কালু পতিতাপল্লিতে তার আধিপত্য বিস্তার করেছে। কিন্তু একজন তথাকথিত নিম্নবর্গের হয়ে বনানী যে সাহস ও স্বাভিমানের উপর নির্ভর করে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকার কথা ক্ষমতাবান সর্দারকে জানিয়েছে তা আসলে দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচারিত শোষিত মানসিকতার সোচ্চার প্রতিবাদ।

অন্যদিকে 'রামগোলাম' উপন্যাসে রূপালী নামক চরিত্রটি প্রতিবাদী চেতনায় অনন্য। আলোচ্য উপন্যাসের বর্ণনা অনুযায়ী-

'কিন্তু রূপালীর স্বভাব অন্যরকম। সে প্রতিবাদী। তার বাবা হাজার চেষ্টা করেও তাকে বোঝাতে পারিনি যে মেথরদের প্রতিবাদ করতে নেই। ...বাবা রূপলাল যতই বোঝাক, কাজ কিছুই হয়নি। কোথাও অবহেলা অসঙ্গতি দেখলেই ফুঁসে ওঠে রূপালী।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ৭৭-৭৮)

রূপালীর ফুঁসে ওঠার ঘটনা লক্ষ করা যায় রশিদের খাবারের দোকানে। উপন্যাসের ঘটনাক্রমে একদিন রূপালী হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে রশিদের দোকানে খাবার কিনতে যায়। সেখানে তার আলুথালু সাজপোশাক দেখে রশিদের চোখ কামজর্জরিত হয়ে ওঠে। ফলে সে অকারণ রূপালীকে 'সোনা' সম্মোধন করে। দোকানের কর্মচারী জামাল অশ্লীলভাবে তার চোখ টেপে, সোহেল দালাল জিহ্বা বের করে বিকৃত ভঙ্গি করে। রূপালী তাদের মতলব বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ গর্জে ওঠে-

'হারামির পুত, সোনা ডাকস কারে? গর্জে ওঠে রূপালী। তার ডান হাতের তর্জনী চ্যাংড়াদের দিকে প্রসারিত।'

(জলদাস ২০১২, পৃ. ১২১)

কিন্তু রশিদ আরো তাকে উত্যক্ত করে। রূপালী নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে হুংকার দিয়ে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।

'শুয়রকা লেড়কা, মা-চোদ। হামে গালি দে রাহা হে তু?' বলতে বলতে পাশের চেয়ারটি উল্টে মেঝেতে ফেলে দিল রূপালী।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ১২২)

ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনা তখনই জাগরিত হয় যখন আধিপত্যবাদী শ্রেণি তাদের অস্তিত্বে আঘাত করে বা বলা ভালো তাদের মানুষ রূপে গণ্য করে না। রূপালীর ক্ষেত্রেও তার আত্মসম্মানের প্রশ্ন এসেছে। কিন্তু নিম্নবর্গের 'limited strenth'-এর কারণে রূপালীর প্রতিবাদের তীব্রতাও সীমিত। তাই সে রশিদ ও জামালদের গালাগাল করে এবং সজোরে চেয়ার উল্টে ফেলার মধ্য দিয়ে তার সমস্ত ক্ষোভ উগরে দেয়।

আবার 'কুন্তীর বস্ত্রহরণ' উপন্যাসে কুমোরপাড়ার শ্মশানকে দখল করে সেখানে একটি বাগান বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা করে চেঙ্গুটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কাশেম। তাই সে কুমোরপাড়ায় উপস্থিত হয়ে তার ইচ্ছের কথা প্রকাশ করে। এই শ্মশানের বদলে সে অন্য এক জায়গায় প্রাচীর ঘেরা শ্মশান করে দেওয়ার প্রস্তাব দেয় কুমোরদের। চেয়ারম্যানের এই কথা শুনে,

'হঠাৎ ভিড় ঠেলে কুন্তীসামনে এগিয়ে আসে। সামান্য ঘোমটা টেনে বলে, 'এ কী কইতাছেন চেয়ারম্যান সাব! পূর্বপুরুষের শ্মশান আমাগোর! আমাগোর বাপ-দাদা, তাগোর মা-বাপ, কত শত আত্মীয়স্বজনের স্মৃতি জড়াইয়া আছে ওই শ্মশানের লগে! আপনি কী কইরে বলেন অই শ্মশান ছেইড়ে দিতে! (জলদাস ২০২১ পৃ. ৯৮)

আমরা আগেই জেনেছি প্রতিবাদই হলো এমন মুহূর্ত যখন উচ্চবর্গ নিম্নবর্গকে চেতনা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে মনে করে। তাইতো চেয়ারম্যানের প্রস্তাবে কুন্তীর আপত্তি ও প্রতিক্রিয়ায় আবুল কাশেম স্তম্ভিত হয়। কারণ,

'কেউ, বিশেষ করে কোনো নারী তার কথার প্রতিবাদ করবে, মোটেই আশা করেনি আবুল কাশেম। চোখের কোনা জ্বলে উঠে কাশেমের।' (জলদাস ২০২১ পৃ. ৯৮)

আবুল কাশেমের মতো সমাজে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা তথাকথিত ক্ষমতাবান উচ্চবর্গ নিম্নবর্গের এ ধরনের প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়ায় প্রাথমিক বিস্মিত হয়েছে। কেননা উচ্চবর্গীয় চেতনা ক্ষমতার এক প্রান্তে অবস্থিত আধিপত্যকে ধারণ করে। নিম্নবর্গের মানুষেরা তাদের কাছে অলীক কল্পিত বলে তাদের যে নিজস্ব মতবাদ ও চেতনা থাকতে পারে তা তথাকথিত উচ্চবর্গ ভাবতেই পারে না। আবুল কাশেমও কুন্তীর প্রতিবাদ আশা করেনি। উল্টোদিকে ক্ষমতার আরেক প্রান্তে অবস্থিত নিম্নবর্গীয়তা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ। তাই আবুল আরো একবার কুমোরদের অন্য শ্মশান করে দেওয়ার লোভ দেখালে কুন্তী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে,

'দরকার নাই আমাগোর বাঁধানো শ্মশানের। পূর্বপুরুষের এই শ্মশানডা আমাগোর মাথার ওপর থাউক। আমাগো শ্মশানের দিকে কুনজর দিবেন না চেয়ারম্যান সাব।' (জলদাস ২০২১ পৃ. ৯৯)

কুন্তীর হুমকিতে আবুল কাশেম বিস্ময়ে হতবাক। কুমোর পুরুষদের মাঝখানে কুন্তী মেয়ে মানুষ হয়ে কেন কথা বলছে—আবুলের এই প্রশ্নে ও ধমকে কুমোররা একত্রিত হয়ে আওয়াজ তোলে,

'ওকে ধমকাইয়েন না চেয়ারম্যান সাব।' (জলদাস ২০২১ পৃ. ১০৩)

কুন্তীর প্রতিনিধিত্বে কুমোর-মালোদের একত্রিত হতে দেখে নিরুপায় আবুল কাশেমের কাছে প্ররোচনা করা ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না। আমরা আগেই জেনেছি রণজিৎ গুহ কথিত ক্ষমতার শৃঙ্খলায় আধিপত্যের মূল বৈশিষ্ট্য হল, প্ররোচনার মধ্য দিয়ে আধিপত্য সৃষ্টি করা। তাই আবুলও বেআইনিভাবে মালোদের বসতভিটে দলিল-দস্তাবেজ না থাকার ভয় দেখিয়ে শ্মশানে মৃতদেহ পোড়ানো নিষেধের হুমকি দিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ভোটের আগে প্রচার স্বরূপ কুমোরপাড়ায় অজয় মণ্ডলের উঠানে মিটিংয়ে আয়োজন করে আবুল কাশেম। সেখানে আবুল কাশেম জাতীয় নির্বাচনে তার দলকে ভোট দেওয়ার কথা বলে কুমোর-মালোদের। আবুলের কথায় অনুরোধের চিহ্ন থাকে না বরং তা আদেশ হয়ে ওঠে। চেয়ারম্যানের কথায় অন্যান্য কুমোর-মালোরা চুপ থাকলেও কুন্তী প্রতিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।

''আপনার প্রস্তাবে আমরা রাজি না। কারে ভোট দিব, হেইডা আপনারে কমু না। কারে ভোট দিমু না-দিমু, তা ঠিক কইরে দেওনর আপনি কেডা?' (জলদাস ২০২১ পৃ. ১১৩)

কুন্তীর এই প্রতিক্রিয়ায় শহিদুল তাকে গালাগাল করে হুমকি দিলে তৎক্ষণাৎ আবুল মেকি ব্যবহারে মালোদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়, কারণ মালোদের ভোট তার দলের প্রয়োজন। তাই মালোদের না চটিয়ে তাদের ভোট দেওয়ার কথা বলে আবুল সেখান থেকে সরে পড়ে। গল্পে দেখা যায়, সেই রাতে অজয় মণ্ডল ভেদবমিতে মারা যায়। তার মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই আবুল কাশেম ও তার দলবল শ্মশানে আসে। কারণ আবুল কাশেম এই শ্মশানে মৃতদেহ পোড়াতে নিষেধ করেছিল। সেই নিষেধ অমান্য করলে মালুদের তিনি মরা অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে বলে। আবুলের এই অন্যায় বাধাদানে কুন্তী আবারও গর্জে ওঠে-

> 'বন্ধ কইরব না।... এইডা আমাগোর জাগা, এই শ্মশান আমাগোর। এই ভূমি আমাগো কাছে মায়ের সমান পবিত্র। এই জাগা ছাড়ুম না আমরা। দেখি আপনি কী কইরতে পারেন।' (জলদাস ২০২১, পৃ. ১১৭)

কুন্তীর আবুলের বিরুদ্ধে এই প্রতিস্পর্ধা ও প্রতিক্রিয়ায় আবুল বলপ্রয়োগ করে জোর জবরদস্তির পথ অবলম্বন করেছে। যা আধিপত্যবাদী শ্রেণির আরো একটি বৈশিষ্ট্য। ফলে ক্ষমতার শৃঙ্খলা আমরা কী ইতিহাসের ঘটনাবলিতে, কী আখ্যানের ঘটনায়—উচ্চবর্গের আধিপত্যের বিপরীতে নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনাকে জাগরিত হতে দেখেছি।

অন্যদিকে 'দুলারী এবং কয়েকজন' গল্পে একজন জেলে নারীর করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে দুলারী জলদাসের প্রতিবাদী চেতনা। স্বামী শ্যামল দ্বারা এই অন্যায় ও বঞ্চনায় দুলারী প্রায় উন্মাদিনী হয়ে গর্জে ওঠে। একজন নারীর বল প্রয়োগের ক্ষমতা সীমিত বলে সে শ্যামলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেও শ্যামলকে শাস্তি দিতে পারে না। তাই দুলারীকে প্রচন্ড একটা চড় মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে শ্যামল। তার নির্জল চোখে ক্রোধের উন্মত্ততা। ফলে দৃঢ়তার সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে দুলারী হিংস্র কণ্ঠে শ্যামলকে জানায় -

> 'শুয়োরের বাইচ্চা শ্যামইলা! আমার খাইয়া, আমার লগে ফুইত্যা, গায়ে বাতাস লাগাইয়া কাটাইছস এতদিন। এখন আমার ঘর থেইক্যা বাইর অইয়া যা খানকির পোলা। ঝাঁটার বাড়ি দেওনর আগে বাইর হ।'
>
> (জলদাস ২০১৬ (ক) পৃ. ৯৪)

আমরা জানি দুলারির উপার্জনের উৎস আছে, সে তুলনায় শ্যামল বেকার। এতদিন দুলালীর উপার্জন নিজের ভরণপোষণ চালিয়েছে সে বিনা পরিশ্রমে। ফলে দুলারী আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা রয়েছে একা পথ চলার। সেই দৃঢ়তাই দুলারিকে প্রতিবাদে সাহস জুগিয়েছে। শ্যামলকে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে বলার মধ্য দিয়ে নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখার চেষ্টা, দুলারিকে একজন প্রতিবাদী নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তাহলে, ইতিহাস থেকে শুরু করে বর্তমান কালখন্ডের প্রেক্ষাপটে আমরা এ সত্য অনুধাবন করলাম যে, আধিপত্যকামীরা তাদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য বলপ্রয়োগ থেকে শুরু করে প্ররোচনার আশ্রয় পর্যন্ত নেয় এবং অধীনস্তরা সেই অন্যায়ভাবে স্বার্থসিদ্ধি করার পথে কখনো এককভাবে বা কখনো সম্মিলিতভাবে তার বিরুদ্ধতা করে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী। প্রশ্ন জাগে, কেন নিম্নবর্গকে বারবার বিরোধিতা প্রতিবাদের রাস্তা বেছে নিতে হয়? কারণ নিম্নবর্গের কণ্ঠস্বর বা দাবির কোনো অস্তিত্ব সৃষ্টি হয় না উচ্চবর্গের কাছে। তাই খুব স্বাভাবিক কারণেই গায়ত্রী চক্রবর্তীর মনে হয়েছে সাবঅলটার্ন শব্দটি তার ক্ষমতা হারাচ্ছে। কারণ সমাজের যে কোনো গোষ্ঠীর কাছে নিম্নবর্গ শুধু একটি গুঞ্জনে পরিণত হয়েছে- যারা আসলে কিছুই নয়। স্পিভাকের মন্তব্য-

> 'Thus an emotional response against this discrediting is misplaced, especialy when the kinds of groups that are claimed to be subaltern are simply groups that feel subordinal in any way. I think the word "subaltern" is losing its definitive power because it has become a kind of buzzword for any group that wants something that it does not have.' (Landry (eds.) 1996, p. 290)

অর্থাৎ এক গোষ্ঠীর মানুষের কাছে যদি আরেক গোষ্ঠীর মানুষ অস্তিত্ব সম্পন্ন না হয়, তাহলে তাদের ওপর বয়ে আসা বিভিন্ন অন্যায়-বঞ্চনা-শোষণ-যন্ত্রনা কীভাবে অন্য গোষ্ঠীর মানুষেরা অনুধাবন করবে। তাই বাধ্য হয়ে বঞ্চিত, নিপীড়িত শ্রেণি তাদের অস্তিত্বের জানান দিতেই অপরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে বারবার। আর সেই প্রতিবাদের প্রাথমিক পদক্ষেপ ধরা পড়েছে নিম্নবর্গের সোচ্চার মৌখিক প্রতিক্রিয়া মধ্য দিয়ে।

কথাবিশ্বে নিম্নবর্গীয় নারীর কেবল সোচ্চার প্রতিবাদই নয়, অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী আঘাতও করেছে। সে আঘাত কখনো প্রতিরোধজনিত, কখনো আত্মসম্মান রক্ষার্থে, আবার কখনো গর্হিত অন্যায়ের শাস্তি উদ্দেশ্যে। 'জলপুত্র' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র ভুবনেশ্বরীর প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই সমগ্র উপন্যাসের প্রথম প্রতিবাদের সূত্রপাত হয়েছে। কাহিনি অনুসারে চরপাড়ার জোনাব আলীর বাবা সমুদ্রে যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটির মালকানা দাবি করে জেলেদের কাছ থেকে বিনামূল্যে মাছ নেয়, অস্বীকার করলে কেড়ে নেয়। এরকমই একদিন বংশীর মা, গঙ্গার মা, মালতির মা ও গুড়াবি সমুদ্রতট থেকে খাড়াং ভর্তি মাছ কিনে বাজারের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে জোনাবের বাবার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। বংশীর মা মাছ দিতে অস্বীকার করলে জোনাবের বাবা এক ধাক্কায় বংশীর মা-র মাথা থেকে মাছ ভর্তি খাড়াং মাটিতে ফেলে দেয়। বংশীর মার প্রতি এই অন্যায় হতে দেখে ভুবনেশ্বরী নিজেকে আটকে রাখতে

পারে না। জোনাব আলীর বাবাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভুবন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। উপন্যাসের বর্ণনা অনুযায়ী-

> 'তোর বাপদাদারে লের দিতাম। মাইয়াপোয়ার গাআত্ হাত!' বলতে বলতে সারাজীবনের নিরীহ ভুবন পেছন থেকে জোনাব আলীর বাপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার দেখাদেখি অন্য তিন জেলেনিও নিষ্ক্রিয় থাকল না। খামচি, নখের আঁচড়, থাপ্পড় দিতে দিতে জোনাব আলীর বাপকে মাটিতে শুইয়ে দিল। গায়ের গেঞ্জি ছিঁড়ে একাকার। লুঙ্গিটা দুই হাতে ধরে আব্রু রক্ষা করছে জোনাব আলীর বাপ।' (জলদাস ২০০৮, পৃ.৬৮)

হরিশংকর-এর কথাসাহিত্যে বর্ণিত সমাজে যে নারীর সম্মানের গুরুত্ব সর্বাধিক তা আমরা পূর্বেই জেনেছি। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নারীদের সম্মান দিয়ে এসেছে, তাদের মান-সম্মান রক্ষার্থে সুরক্ষা প্রদান করেছে। কিন্তু জোনাব আলীর বাবার অন্যায় কর্ম ও বংশীর মাকে লাঞ্ছিত করার অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কোনো পুরুষের প্রয়োজন হয়নি ভুবনদের। জোনাব আলীর বাবার দ্বারা আঘাত ও অসম্মানের যোগ্য জবাব হিসেবে নারী শক্তির জাগরণ হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই। তাই স্বাভাবিকভাবেই জোনাবের বাবার প্রতি ভুবনদের প্রতিরোধের ঘটনাটি জেলেপাড়ায় চাপা উল্লাস অনুভব করে। উপন্যাস বর্ণনায়,

> 'সমস্তজীবন মারখাওয়া জেলেসমাজের চারজন নারী আজ জেলেদের দীর্ঘদিনের অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছে। শক্ত সমর্থ অর্থবান জেলেরা যা এতদিন করতে পারেনি, আজ চারজন নিঃস্ব হতদরিদ্র জেলেনারী তা করেছে। ..প্রায় গোটাটা জীবন যে শুধুই মার খেয়ে গেছে নিয়তির হাতে, সে নারীটিই আজ জেগে উঠেছে।' (জলদাস ২০০৮, পৃ.৬৯)

একটু গভীরে লক্ষ করলে বোঝা যাবে, আধিপত্যকামীদের স্বার্থসিদ্ধির শক্তি লুকিয়ে আছে তথাকথিত নিম্নবর্গের নিষ্ক্রিয়তায়। এই নিষ্ক্রিয়তাই ডমিন্যান্ট শ্রেণির মনে 'নিম্নবর্গ কিছুই না'—ধারণাটিকে বিশ্বাসে পরিণত করে। কিন্তু আমরা জানি নিম্নবর্গীয় চেতনায় প্রতিবাদী মুহূর্তটি তথাকথিত ক্ষমতাবান উচ্চবর্গের কাছে তাদের অস্তিত্বের সত্তাকে ঘোষণা করে। ফলে ভুবেনেশ্বরীর সারা জীবনের নিরীহ থাকার মানসিকতা এক মুহূর্তে উবে গিয়েছে জোনাব আলীর বাবার হাতে আর একজন নারীর লাঞ্ছনার ঘটনায়।

সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে ঘটনা পরম্পরায় এমন কিছু ঘটনা ঘটে থাকে যার ব্যাখ্যা সব সময় ইতিহাস বা তত্ত্ব মেনে চলে না। যেমন আমরা 'কসবি' উপন্যাসের দেবযানী চরিত্রের ক্ষেত্রে লক্ষ করেছি। আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনির একেবারে শেষে এসে আমরা দেখলাম পতিতাপল্লির হর্তাকর্তা স্বার্থান্বেষী অত্যাচারী কালুসর্দার জনসাধারণের সমক্ষে দেবযানীর হাতে খুন হচ্ছে। দেবযানীর কালু সর্দারকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার মতো পদক্ষেপ নেওয়ার পেছনে রয়েছে একজন সাধারণ জেলে

কন্যা কৃষ্ণার পরিস্থিতির শিকারে পতিতা হয়ে ওঠার যাত্রাপথে। সেই যাত্রাপথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব একজন নারীর প্রতিবাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর কারণ।

প্রথমত, দেবযানী ছিল একজন জেলেকন্যা। মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পিতা অর্ধউন্মাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে আর্থিক সংকটে পড়ে তার পরিবার। পাড়া প্রতিবেশীর কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে না।

দ্বিতীয়ত, অর্থসংকটে কৃষ্ণ বাধ্য হয়ে স্টেশন চত্বরে ফলবিক্রেতা তপনের কাছে সাহায্য চায়। কিন্তু সাহায্যের বদলে তপন কৃষ্ণার শরীর উপভোগ করে।

তৃতীয়ত, তপনকে বিয়ে করার জন্য জোরাজুরি করলে তার সঙ্গে কৃষ্ণা পালিয়ে যায় চট্টগ্রামে।

চতুর্থত, কৃষ্ণাকে নিয়ে চট্টগ্রামের এক হোটেলে ওঠে তপন। সেখানে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে কৃষ্ণের শরীর বারংবার উপভোগ করে। পরদিন সকালে কৃষ্ণাকে না জানিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায় তপন।

পঞ্চমত, হোটেলে সারা রাত কাটানো কৃষ্ণা তপনকে খুঁজতে থাকে। হোটেল কর্তার বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কৃষ্ণাকে ঠকিয়ে তার শরীর ভোগ করে কেউ চলে গেছে। সে তৎক্ষণাৎ সাহেব পাড়ার পতিতাপল্লির দালাল শামছুকে ডেকে কৃষ্ণাকে তার কাছে বিক্রি করে দেয়।

ষষ্ঠত, শামছু হোটেল থেকে কৃষ্ণকে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার নাম করে সাহেবপাড়ায় কালু সর্দারর কাছে চড়া দামে বিক্রি করে। তারপর জেলেপাড়ার এক সাধারণ কন্যা কৃষ্ণার পতিতা জীবনের আরম্ভ।

সপ্তমত, ধীরে ধীরে পতিতা জীবনে অভ্যস্ত কৃষ্ণা পতিতাপল্লির রূপসী পতিতা দেবযানীতে পরিণত হয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে তার কঠিন সিফিলিস রোগ ধরা পড়ে। সাহায্য ও চিকিৎসা করানোর বদলে গলাধাক্কা মেরে কালুসর্দার তাড়িয়ে দেয় দেবযানীকে।

অষ্টমত, মোহিনী মাসি রোগগ্রস্ত দেবযানীকে উন্নত চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে নবজীবন দান করে। কিন্তু বদলে মোহিনীর হয়ে পতিতাবৃত্তির নির্দেশ দিলে দেবযানী পুনরায় পতিতা জীবনচক্রে বাঁধা পড়ে যায়।

এই ঘটনার পর মোহিনী মাসির প্রতি তার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা বোধ জন্মেছিল। দেবযানী মোহিনী মাসির পুত্রশোক ও একাকীত্ব সহ্য করতে পারেনি। সারাজীবনের গ্লানি, বিশ্বাসঘাতকতা, অপমান-নিপীড়নের সমস্ত ক্ষোভ কালু সর্দারের প্রতি তীব্র এক প্রতিশোধস্পৃহার জাগরণ ঘটায় তার মনে। কিন্তু সে জানে কালুকে উচিত শিক্ষা দেওয়া ও কৈলাস হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া সহজ নয়। কারণ কালু ক্ষমতাবান। তার আছে অর্থ ও বাহুবল। কিন্তু পরদিন মন্দিরের পুরোহিতের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কালু সর্দার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলে দেবযানী বুঝে যায়, শুধু গ্রেপ্তারী বা জেলের বন্দিদশাই কালুর শাস্তি হতে

পারে না। তার অপরাধ আরো গুরুতর। তাই পতিতাপল্লির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক বৃহত্তর রূপান্তর কল্পনা করে দেবযানী সর্বসমক্ষে কালুকে খুন করে।

> ‘পুলিশ কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেবযানী কালুকে জড়িয়ে ধরল।
>
> কালুর মুখ দিয়ে ‘ঘোঁৎ’ করে একটা আওয়াজ বেরোলো। পুলিশ তড়িৎ বেগে কালুর কাছ থেকে দেবযানীকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল।
>
> সবাই দেখল- দেবযানীর হাতে একটা ছোরা। সেই ছোরা এবং দেবযানীর হাত- বুক- পেট রক্তে ভেসে যাচ্ছে। (জলদাস ২০১১, পৃ. ১৬৭-৬৮)

প্রায় এই রকমই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা লক্ষ করি ‘মোহনা’ উপন্যাসের মোহনা চরিত্রের ক্ষেত্রে। কৈবর্তরা কীভাবে ভীমসেনের নেতৃত্বে পালরাজাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করেছিল- তার বর্ণনার পাশপাশি উপকাহিনি হিসেবে সংযুক্ত হয়েছে ভীমসেনের পালিতপুত্র চণ্ডক ও বারাঙ্গনাপল্লির পতিতা মোহনার প্রেম কাহিনি। বস্তুত, আলোচ্য উপন্যাসে মোহনার ভূমিকা একজন সাধারণ বারবণিতার হলেও কাহিনির সমাপ্তি ঘটেছে মোহনার প্রতিশোধের মধ্য দিয়ে। কাহিনি অনুযায়ী ভীমের পালিত পুত্র চণ্ডক ভীমকে পিতা হিসেবে মান্য করলেও সংকটের চরম মুহূর্তে সে পাল রাজাদের সেনাপ্রধান হওয়ার লোভে তাদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র করে কৈবর্ত রাজ ভীমের মৃত্যুর কারণ হয়। যে প্রেম ও স্নেহ-মমতা দিয়ে ভীম চণ্ডককে বড়ো করে নতুন জীবন দান করেছিল তার মূল্য চণ্ডকের স্বার্থপরতার কাছে শূন্য। ফলে ঘটনাক্রমে পালরাজ রামপাল বরেন্দ্রভূমি দখল করলে কৈবর্ত রাজ্যের সকল বাসিন্দা রাজ্যত্যাগ ও পলায়নে তৎপর হয়ে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে বারাঙ্গনাপল্লিও জনশূন্য হয়ে পড়ে। কিন্তু মোহনা থেকে যায় চণ্ডকের অপেক্ষায়। চণ্ডকের প্রতি তার ঘৃণা ও প্রতিশোধ স্পৃহার মানসিকতা বুঝতে পারে না কেউ। এমন পরিস্থিতিতে চণ্ডক পালরাজ্য রামাবতীতে যাওয়ার জন্য মোহনার কাছে অনুমতি চেয়ে বলে,

> ‘কালকে আমার পুরস্কার পাবার দিন। সমস্ত জীবনটাই কেটে গেল কৈবর্তদের দাসত্ব করতে করতে। কৈবর্তরা নীচ জাত। পালরা রাজার জাত। এই রাজ বংশের বিশাল বাহিনীর সেনা প্রধান হব আমি।’ (জলদাস ২০১৩, পৃ. ১২৭)

চণ্ডকের অকপট বিশ্বাসঘাতকতার স্বীকারোক্তি মোহনার মনে তার প্রতি সমস্ত দুর্বলতাকে ধুলিস্যাৎ করে দেয়। কারণ মোহনা বুঝতে পারে, যে মহান দয়ালু রাজা একজন জারজ সন্তানকে নিজের পুত্রের সম্মান দিয়েছিল তার প্রতি যদি চণ্ডক এমন নির্দয় ও নির্মম বিশ্বাসহন্তায় পরিণত হতে পারে, তাহলে মোহনার মতো সামান্য বারাঙ্গনা তো তার পায়ের ধুলো। আসলে মোহনার প্রতি চন্ডকের ভালোবাসা দৈহিক আকর্ষণজনিত। যৌবনহারা মোহনা চণ্ডকের কাছে মূল্যহীন। তাই মোহনার আত্মসম্মান ও স্বাভিমান চণ্ডকের থেকেও বড়ো হয়ে উঠেছে। মোহনার মনে হয়েছে, এত বড়ো অন্যায় অপরাধ করার পর চণ্ডকের

মতো বিশ্বাসঘাতক এত সহজে মুক্তি পেতে পারে না। এ পৃথিবীতে বিশ্বাসঘাতকের কোনো স্থান নেই। তাই তো চণ্ডকের রামপালের কাছে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য পুরস্কার নিতে যাওয়ার প্রসঙ্গে মোহনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে গর্জে ওঠে-

> 'তোর আসল পুরস্কারটা নিয়ে যা রে, চণ্ডক। তোরে এই পুরস্কার দেওয়ার জন্য আমি পালিয়ে যাই নাই। অধীর আগ্রহে তোর জন্য প্রতীক্ষা করেছি।'
>
> '... মোহনা; কী করছ, কী করছ, মোহনা?' বলতে চাইলে চণ্ডক। তার আগেই চণ্ডকের মস্তক বরাবর মোহনার হাতের বঁটিটি নেমে এল। ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল মোহনার ভালোবাসার চণ্ডক, মোহনার ঘৃণার চণ্ডক।'
>
> (জলদাস ২০১৩, পৃ.১২৮)

মোহনার এই আঘাতের উদ্দেশ্য চণ্ডকের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া তো বটেই, পাশাপাশি নিজের আত্মশুদ্ধি ও আত্মসন্তুষ্টির জন্যও চণ্ডকের বিরুদ্ধে শাস্তি স্বরূপ প্রতিরোধ করেছে সে। আর এই প্রতিবাদী মুহূর্তই নিম্নবর্গীয় চেতনার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে।

'থুতু' গল্পে দেখা যায় শামসু মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে গুলির আঘাতে পঙ্গু হয়ে বাড়ি ফেরে। মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার কারণে তাদের বাড়ি থেকে উৎখাত করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বশির উদ্দিন। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বাধ্য হয়ে বস্তিতে আশ্রয় নেয় শামসু। সেই বস্তিতে থাকাকালীন এক দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। গল্প অনুযায়ী,

> 'ফারহানা তখন ক্লাস এইটে পড়ে। দুপুর ছুটিতে ভাত খেতে এসেছে ঘরে। দুপুরে বাপ ভিক্ষায়, মা ঝি গিরিতে। মাথা নিচু করে ডালের সঙ্গে ভাত মাখছে ফারহানা। ওই সময় পাশের ঝুপড়ির সিরাজের বাপ ঘরে ঢোকে। ঝাপটে ধরে ফারহানাকে। মাটিতে চেপে ধরার আগে পানি ভর্তি গ্লাস দিয়ে সিরাজের বাপের কপালে আঘাত করে ফারহানা। 'অ-মারে' বলে দ্রুত ঝুপড়ি থেকে বের হয়ে যায় সিরাজের বাপ। কপাল ফাটে না, কিন্তু আস্ত একটা সুপারি জেগে ওঠে তার কপালে।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২১৯-২০)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে নারীকে দুর্বল ও অবলা বলে ঘরের চার দেয়ালে বন্দি জীব হিসেবে দেখা হয়, তা আসলে পাঠ্য ভিত্তিক। আসলে অস্তিত্ব ও আত্মসম্মানে আঘাত করা হলে, নারী পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী যেমন প্রতিক্রিয়া করেছে, তেমনই প্রত্যাঘাতও করেছে। সব ক্ষেত্রে নারী স্পিভাকের মন্তব্য অনুযায়ী 'Mute forever' নয়। হরিশংকরের কথাসাহিত্যে যে তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সমাজ উঠে এসেছে সেখানে নারীর অবস্থান অনুসারে তাদের প্রতিশোধস্পৃহা প্রতিবাদেরই একটি স্বরূপ হিসেবে দেখা দিয়েছে। যদিও এই প্রতিশোধস্পৃহার প্রতিক্রিয়া সব ক্ষেত্রে সমান নয়। কখনো তা সুপরিকল্পিত, কখনো স্বতঃস্ফূর্ত, কখনো তাৎক্ষণিকভাবে দেখা গিয়েছে।

'কসবি' উপন্যাসে মোহিনী মাসি ও দেবযানীর সুপরিকল্পিত প্রতিবাদ লক্ষ করেছি। অত্যাচারী কালুসর্দার মোহিনীকে জব্দ করার লক্ষ্যে রহিজ পাগলকে দিয়ে জেলে-জেলেনী সম্পর্কিত একটি অপমানকর গান শিখিয়ে দিয়ে প্রত্যেকদিন মোহিনীর বাড়ির সামনে এই গান গাওয়ায়। দেখা যায়, কালু যে গান দিয়ে ও যাকে দিয়ে গান গাইয়ে তাকে অপমান অপদস্ত করতে চেয়েছে ঠিক একইভাবে মোহিনী মাসিও রহিজ পাগলকে দুবেলা ভরপেট খাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে কালু সর্দারের বাড়ির সামনে একটি গান গাইতে বলে। মোহিনী জানে কালু সর্দারের বাড়ির কোনো পতিতার সিফিলিস রোগ ধরা পড়েছে যা মারাত্মক ও সংক্রামক। সেই রোগ সংক্রান্ত গান শিখিয়ে মোহিনী রহিজকে তাই বলে-

> 'ভাত আমি তোমাকে দেবো দুই বেলা। তবে কামটা মন দিয়ে করে দিতে হবে তোমাকে। কাল সন্ধ্যে থেকে কাস্টমাররা যখন আসতে শুরু করবে, তখন সর্দারের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলবে—সর্দার বাড়ির মাইয়াগোর শরীলে সিফিলিস। নির্ভয়ে বলবে, চিৎকার করে বলবে। পারবে না?' তারপর প্রেমদাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'রহিজ পাগলারে ট্রেনিং দিয়ে তৈয়ার করে নাও প্রেমদাশ।' (জলদাস ২০১১, পৃ. ৯৯)

মোহিনীর এই সুপরিকল্পিত বুদ্ধিমত্তায় প্রেমদাশ বিস্মিত হয়। কোনো মারপিট নয়, শুধু বুদ্ধির খেলা। আর এই বুদ্ধির খেলা যখন ফলপ্রসূ হল, তখন দেখা গেল, রহিজের এই গানে প্রভাবিত হয়ে সর্দারের গেটের সামনে থেকে কাস্টমাররা একে একে সরে পড়ে। এই ঘটনার পর কালুসর্দারের সমূহ ক্ষতি হয়। কাস্টমাররা সযত্নে কালুর বাড়ি এড়িয়ে চলে। কারণ সিফিলিস রোগ এতটাই সংক্রামক ও মারাত্মক যা কাস্টমারদের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি করেছে। রাগে দুঃখে ক্ষোভে সর্দার যখন নিরুপায় তখন দোতলা থেকে মোহিনী মুচকি হেসে বলে-

> 'জাইল্যানির বুদ্ধি তো টের পাওনি শৈলবালা দত্তের পোলা? এখন বসে বসে নিজের বুড়ো আঙুল চোষ আর কুত্তার বিচা কচলাও।' (জলদাস ২০১১, পৃ. ১০১)

মোহিনীর বুদ্ধি ও সুপরিকল্পিত প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা কালু সর্দার না পেলেও আমরা তা অনুধাবন করেছি। একজন জেলেনারীর এধরনের বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতার পরিচয় প্রমাণ করে নিম্নবর্গীয় নারী সবক্ষেত্রে নীরব নয়। সুযোগ পেলে একজন নারী ও তার ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে।

আবার 'ঢেন্ডেরি' গল্পে দেখি জেলেনারী লক্ষ্মীবালা তার দুশ্চরিত্র স্বামী রাইগোপালের অন্যায় ও বঞ্চনার শাস্তি স্বরূপ পরিকল্পিত প্রতিশোধ নিয়েছে। গল্প অনুযায়ী লক্ষ্মীবালা স্ত্রী হিসেবে রাইগোপালের প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত। কিন্তু রাইগোপাল স্ত্রীর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছে। স্বামীর অবহেলা ও দুশ্চরিত্রতার কষ্ট চেপে রেখে লক্ষ্মীবালা সংসার সামলায়। রাইগোপালের অবৈধ সম্পর্কের ব্যাপারে কোনো লজ্জাবোধ নেই। দিনের পর দিন স্বামী দ্বারা বঞ্চিত-প্রত্যাখ্যাত হতে হতে লক্ষ্মীবালার মনে প্রতিশোধস্পৃহা

জেগে ওঠে। একদিন ঘটনাচক্রে হরিদাসীর মা তার কষ্টের কারণ জানতে পারলে সে লক্ষ্মীবালাকে পরামর্শ দেয়-

‘তোঁয়ারার সমাজ বঅর কড়া। এই রইম্যা কামত্ ধরা পইল্যা ঢেন্ডেরি। তুঁই গবিন্দ সর্দারের লগে দেখা গর। তাঁই ভালা মানুষ। একখান সৎ পরামর্শ দিব।’ (জলদাস ২০১৬ (ক) পৃ. ৫৬)

হরিদাসীর মার কথায় ভরসা পেয়ে লক্ষ্মীর প্রতিশোধের সংকল্প দৃঢ় হয়। সে স্বামীর অনুপস্থিতিতে গোবিন্দ সর্দারের কাছে সাহায্য চাইতে গেলে তিনি লক্ষীবালাকে স্বামীর কুকীর্তির প্রমাণ দিতে বলে। লক্ষ্মী তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে-

‘পাইয্যম। হাতেনাতে ধরাই দিত পাইয্যম।’ (জলদাস ২০১৬ (ক) পৃ. ৫৬)

দেখা গেল, গোবিন্দ সর্দার ও লক্ষ্মীর পরামর্শ অনুযায়ী সেইরাতে সর্দার তার দলবল নিয়ে আঙুরবালার বাড়িতে হানা দেয়। লক্ষীর কথা অনুযায়ী রাইগোপাল ও আঙুরবালা রান্নাঘর থেকে আপত্তিজনক অবস্থায় ধরা পড়ে। ফলে জেলেসমাজের অনুশাসন অনুযায়ী তাদের ঢেন্ডেরি শাস্তি দেওয়া হয়।

অন্যদিকে ‘শেফালি’ গল্পে শেফালির প্রতিশোধমূলক প্রতিক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্ত ও তাৎক্ষণিক। গল্পে দেখা যায়, শেফালী একজন নামকরা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সাধারণ ক্লার্ক। সেই কোম্পানির বড়ো সাহেবের ছোবহানের নজর পড়ে শেফালির ওপর। কারণে-অকারণে তাকে ডেকে পাঠান এবং ফাইলপত্র খুঁজে দেওয়ার নাম করে -

‘ছোবহান সাহেব শাফালির হাতে-বাহুতে-নিতম্বে-জানুতে হাত ছোঁয়ান।’ (জলদাস ২০১৯ (খ) পৃ. ১৫২)

ছোবহানের এই ধরনের কু-আচরণের কথা অফিসের কমবেশি সকলেই জানে। কিন্তু শেফালির প্রতি তার কুৎসিত ও লোলুপ দৃষ্টির গভীরতা দিন দিন বেড়েই চলছিল। ফলে শেফালির সহ্যের সীমা পার হতে থাকে। এরকমই একদিন ফাইল খোঁজার নামে সে শেফালির স্তনের দিকে তাকিয়ে থাকে। এরকম অবস্থায় তৎক্ষণাৎ শেফালি গর্জে ওঠে-

‘স্যার আমার বুক দেখতে চান? এই দেখুন।’ বলে সে ব্লাউজের একটা বোতাম খুলে ফেলল।’

(জলদাস ২০১৯ (খ) পৃ. ২৫৩)

শেফালির আচরণে ও চিৎকারে বড়ো সাহেবের অফিস ঘরের সামনে অফিস স্টাফ জড়ো হতে শুরু করে। লোকজন জড়ো হতেই সে আবারও ক্ষুব্ধ গলায় বলে ওঠে,

‘আপনার চোখ থেকে বাঁচার জন্য শাড়ি ব্লাউজ ধরেছি। তারপরও নিস্তার পাচ্ছি না। দেখুন স্যার এই দেখুন- আপনার বউয়ের চেয়ে কত পার্থক্য দেখে নিন।’ বলে ফটাফট করে ব্লাউজের বোতাম খোলা শুরু করল শেফালি।’

(জলদাস ২০১৯ (খ) পৃ. ২৫৪)

শেফালির এই আচরণে অপ্রস্তুত ছোবহান সাহেব অফিসের সামনে মান-সম্মানহানির ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে হাত জোড় করে শেফালির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। গল্পে দেখি-

> 'আবদুস ছোবহান মরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'দোহাই শেফালি। মাফ করো আমায়। থামো তুমি। মাথা নিচু করলেন বড়ো সাহেব। (জলদাস ২০১৯ (খ) পৃ.২৫৪)

তাহলে দেখা গেল, অন্যায় বঞ্চনা শোষণের বিরুদ্ধে কেবল বল প্রয়োগ বা মৌখিক প্রতিক্রিয়ায় নয় বুদ্ধিমত্তারও প্রয়োগ ঘটিয়েছে নারীরা। তাই এক্ষেত্রে বলতেই হয় গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক নিম্নবর্গীয় নারীকেই 'mute forever' বলুন না কেন ক্ষেত্রবিশেষে নারীকে আমরা প্রতিক্রিয়া, প্রতিরোধ ও প্রতিশোধে তৎপর হতে দেখেছি। বরং হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে নারীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় অনেকাংশেই পুরুষদের তুলনায় সক্রিয় ও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে।

৫.৩.২ নারীর আত্মহত্যা : প্রতিবাদের ভিন্ন স্বরূপ

'দহনকাল'-এর রাধেশ্যামের বউ, 'কুন্তীর বস্ত্রহরণ'-এর কুন্তী, 'চিঠি' গল্পের নামহীন কিশোরীরা কেউ ধর্ষিত, কেউ লাঞ্ছিত, কেউ আত্মরক্ষার জন্য সর্বোপরি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা আত্মহত্যার মতো চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে উল্লেখ্য আত্মহত্যার পরিণামকে কখনোই পলায়নবাদী পদক্ষেপ বলা যাবে না। বরং আখ্যানের প্রয়োজন ও সমাজ বাস্তবতা উভয় ক্ষেত্রেই এই আত্মহত্যার ঘটনাগুলি আসলে প্রতিবাদের বিবৃতি হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় ইলায়েন শোওয়াল্টার 'A literature of their own' শিরোনামের বক্তৃতায় বলেন,

> 'Suicide become a grotesquely fantasized female weapon, a way of cheating men out of dominance. Martyrdom and self immolation are viewed as aggressive, as a way of inflicting punishment on the guilty survivors.' (Showalter 1977, p. 250)

অর্থাৎ আত্মহত্যা একটি ভয়ঙ্কর কল্পনাপ্রসূত অস্ত্র হিসেবে মহিলা দ্বারা ব্যবহৃত হতে পারে যখন কোনো পুরুষ দ্বারা নারী প্রতারিত-ধর্ষিত বা অন্য কোনোভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়। আসলে আত্মহননকে আক্রমণাত্মক হিসেবে দেখা হয় যা আত্মহননকারী দোষী জীবিতদের শাস্তি প্রদানের উপায় হিসেবে ব্যবহার করে। সেরকমই রাধেশ্যামের বউয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম পাকসেনাদের দ্বারা স্বামীর অনুপস্থিতিতে যখন সে তার ঘরের মধ্যে বারংবার ধর্ষিত হয়েছে তখন ক্ষোভে-দুঃখে অভিমানে এবং অবশ্যই তার স্বামীর প্রতি ভালোবাসার মর্যাদা রাখতে আক্রমণাত্মক হয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এই আত্মহত্যা যে সেই নারীর সম্মানহানি ও লজ্জাবোধের কারণে তা কিন্তু নয়। রাধেশ্যামের বউ বিয়ের পর থেকে সংগ্রাম

করে গিয়েছে। বহুদিন অভুক্ত দিন কাটিয়েছে। কিন্তু কোনোদিন এক মুহূর্তের জন্য স্বামীর প্রতি অবহেলা দেখায়নি সে। কিন্তু ধর্ষণের মতো এত বড়ো অপমান কীভাবে সহ্য করবে সে। তাই নিজেকে চিরতরে সরিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে রাধেশ্যামকে সে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছে জীবিত দোষীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য। উপন্যাসের বর্ণনা অনুযায়ী,

> ‘কিন্তু রাধেশ্যামের ওপর একটা কঠিন দায়িত্ব দিয়ে গেছে সে। নিজের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার দায়িত্ব। রাধেশ্যাম সেই রাতে ঠিক করে ফেলল-প্রতিশোধ নেবে সে, জীবনের বিনিময়ে হলেও বউয়ের অপমানের প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে।’ (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৭৪)

রাধেশ্যামের বউয়ের আত্মহত্যার কারণে সারাজীবন প্রতিবাদহীন রাধেশ্যাম আজ প্রতিশোধস্পৃহায় জর্জরিত হয়েছে। তাই সামগ্রিক অর্থে একথা বলাই যায় যে, রাধেশ্যামের বউয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার সামর্থ্য ছিল না বলেই সে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে ‘জীবিত দোষী’-দের (guilty survivors) শাস্তি দেওয়ার উপায় অবলম্বন করে যা পরোক্ষভাবে নারী প্রতিবাদকেই চিহ্নিত করে।

‘কুন্তীর বস্ত্রহরণ’ উপন্যাসে লক্ষ করি চেঙ্গুটিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবুল কাশেম কুমোরদের শ্মশান দখল করতে চাইলে কুন্তী তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু আবুল কাশেম হুমকি দেয় সেই শ্মশানে কেউ যেন আর মৃতদেহ না পোড়ায়। সেই রাতেই অজয় মণ্ডল মারা গেলে তাকে শ্মশানে পোড়াতে নিয়ে এসে কুমোররা আবুল কাশেম ও তার দলবলের সম্মুখীন হয়। কুমোর, মালোদের সঙ্গে তাদের হাতাহাতি শুরু হলে একটা সময় সোলাইমান ও ফখরে আলম কুন্তীকে ঘিরে ফেলে। দুজনে মিলে কুন্তীর শাড়ি খুলে দেয়। সোলাইমান কুন্তীর অবশিষ্ট বস্ত্র পেটিকোট খুলতে উদ্যত হলে সম্মানহানির চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় বলে মনে করে কুন্তী। তাই,

> “কুন্তী চোখ বন্ধ করল। তার গলা চিড়ে বেরিয়ে এলো, ‘ভগবান রে...।’
> আবুল কাশেম তার কাছে পৌঁছানোর আগে কাঁকরির জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুন্তী।” (জলদাস ২০২১, পৃ.১১৯)

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, শোষণকারী আধিপত্যকামী আবুল কাশেমের দল চেয়েছিল কুন্তীর সম্মানহানির মধ্য দিয়ে তার প্রতিবাদী কণ্ঠকে রুদ্ধ করতে এবং অবশ্যই নিজস্ব ক্ষমতার আস্ফালনের মধ্য দিয়ে নিজের স্থানকে সুস্পষ্ট করতে। কিন্তু কুন্তী জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের প্রতিরোধ করেছে। নদীতে ঝাঁপ দিয়ে তাদের উদ্দেশ্যকে নস্যাৎ করে দিয়েছে সে। এখানেই কুন্তীর আত্মহত্যার পরোক্ষ প্রতিরোধ সফল হয়েছে।

অবশ্য ‘চিঠি’ গল্পে নামহীন কিশোরীর আত্মহত্যার ঘটনাটি সুপরিকল্পিত ও স্বতঃস্ফূর্ত। গল্পে দেখা যায়, কিশোরীটির জন্মমুহূর্ত থেকে সে পিতার কাছে অবহেলার পাত্রী। কারণ তার পিতা একজন

পুত্রসন্তান চেয়েছিলেন। কন্যার স্বাভাবিক জ্ঞান হওয়ার সময়ও সে এই বিষয়ে পিতা-মাতার মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হতে দেখেছে। স্বাভাবিকভাবেই কিশোরীর মনে পিতা দ্বারা অবহেলার যন্ত্রণা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পিতার কন্যা সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা ভাঙতে শুরু করে। যে কন্যাকে কালো বলে পিতা কোনোদিন স্নেহের চোখে দেখেনি সেই পিতাই ধীরে ধীরে তার সমস্ত স্বপ্ন কন্যা দ্বারা পূরণ হতে দেখে সে মেয়েকে কাছে টেনে নিয়েছে। তার প্রতি সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছে। মেয়ের মেধাশক্তি প্রমাণিত হওয়ার পর তাকে ভালো স্কুলে ভর্তি করিয়েছে। মেয়েকে নিয়ে এক স্বপ্নের জগৎ তৈরি করেছে পিতা। কিন্তু স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক হান্নান স্যারের কুদৃষ্টি পড়েছে কিশোরীটির ওপর। প্রাইভেট টিউশনি দেওয়ার নাম করে কিশোরীটিকে ধর্ষণ করেছে সে। এই ঘটনা মেয়েটির জীবনের সমস্ত আশা ভরসা ও আত্মবিশ্বাসকে নাড়িয়ে দেয়। সারাদিন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করার পর সে সিদ্ধান্ত নয় আত্মহত্যার। লক্ষণীয় আত্মহত্যার কারণ হিসেবে সে যা চিঠিতে লেখে তার প্রথম অংশটি প্রতিবাদী চেতনাকে বোঝার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সেই চিঠিতে জানলাম-

> 'আমি গেলাম। আমার জন্যে আফসোস করো না।..কিন্তু আমি না গেলে আমার কষ্টের সঙ্গে তোমাদের মানে তুমি, মা এবং ছোটো ভাইটির বেদনা এবং লজ্জা মিশে গিয়ে আরো বড়ো বেশি একটা অপমানের জায়গা তৈরি হবে। ..জানাজানি হবার পর তুমি হয়ত ক্রোধে জ্বলে উঠবে। সর্বোচ্চ পণ করে আমার চলে যাওয়ার ব্যাপারে যে দায়ী তার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করবে।' (জলদাস ২০১৬ (ক) পৃ. ১২৭)

লক্ষণীয়, কিশোরীটি জানে সমস্ত সত্য ঘটনা জানাজানির পর তার বাবা সর্বস্ব পণ করে হান্নান স্যারের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তাইতো নিজের সীমিত শক্তির দ্বারা প্রতিবাদ-প্রতিশোধ সম্ভব নয় বলে পরোক্ষভাবে 'জীবিত দোষী'-কে (Guilty survivors) শাস্তি দেওয়ার উপায় হিসেবে আত্মহত্যাকে বেছে নিয়েছে সে।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক নারী আত্মহত্যার বিষয়কে সামনে রেখে তাঁর 'can the subaltern speak?' প্রবন্ধে ভুবনেশ্বরী ভাদুড়ীর আত্মহত্যার ঘটনাকে ব্যাখ্যা করেছেন। যার মধ্য দিয়ে তিনি নারীর প্রতিবাদ স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। প্রবন্ধ অনুযায়ী জানা যায়, ষোল বা সতেরো বছর বয়সী এক যুবতী ভুবনেশ্বরী ভাদুড়ী ১৯২৬ সালে উত্তর কলকাতায় তার বাবার ফ্ল্যাটে আত্মহত্যা করেছিলেন। আত্মহত্যাটি একটি ধাঁধা ছিল কারণ মৃত্যুর মুহূর্তে তার ঋতুস্রাব হয়েছিল। এটা স্পষ্টতই অবৈধ গর্ভধারণের কোনো ঘটনা ছিল না। এই ঘটনার প্রায় এক দশক পর আবিষ্কৃত হয়েছিল যে, তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে জড়িত গোষ্ঠীর একজন সদস্য ছিলেন। সেই সময় তাকে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তির হত্যার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সেই দায়িত্ব

পালন করতে না পেরে তার আসল পরিচয় গোপন রাখার তাগিদে সচেতনভাবে সে নিজেকে হত্যা করেছিল। ভুবনেশ্বরী জানতেন যে, তার মৃত্যু অবৈধ আবেগের ফলাফল হিসেবে নির্ণয় করা হবে। তাই তিনি ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার নির্দিষ্ট দিনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে নারীদেহে ঋতুস্রাবের সময় যে কষ্ট ও যন্ত্রণা সৃষ্টি হয় তা সহ্য করেও ভুবনেশ্বরী আত্মহত্যার জন্য অনুমোদিত উদ্দেশ্যকে সাধারণীকরণ করেছিলেন। (Morris (ed.) 2010, p.281-82)

স্পিভাকের মতে ইতিহাসে নারীর এই প্রতিবাদের আধিপত্যবাদী বিবরণের উদীয়মান ভিন্নমতের সম্ভাবনাগুলি ভালোভাবে নথিভুক্ত করা হলেও অপ্রকাশিত। তা শুধুমাত্র বক্তৃতার মাধ্যমে পুরুষ নেতারা স্মরণ করে জনগণের চেতনাকে জাগ্রত ও আকৃষ্ট করার জন্য। এর বাইরে নারীদের আত্ম বলিদানের ঘটনা ও মাহাত্ম্য নিম্নবর্গ হিসেবে কোথাও শ্রুত বা পঠিত হয় না-

> 'The subaltern as female cannot be heard or read.' (Morris (ed.) 2010, p.282)

হরিশংকর-এর কথাবিশ্বেও একইভাবে নারীদের আত্মহত্যার ঘটনাকেই বড়ো করে দেখা হয়েছে। আত্মহত্যার আড়ালে ও অলক্ষে যে রয়ে গিয়েছে তাদের পরোক্ষ প্রতিবাদ তা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে কখনো ধরা পড়েনি।

৫.৩.৩ নারীর নীরবতা : এক নিস্তব্ধ প্রতিবাদ

অন্যায়, শোষণ, বঞ্চনা বা নিপীড়নের বিরুদ্ধে সব ক্ষেত্রেই যে নিম্নবর্গীয় নারী প্রতিবাদ করেছে তা নয়। আসলে কিছু ক্ষেত্রে নীরবতাও প্রতিবাদের উপাদান হয়ে উঠেছে। বক্তব্য ও নীরবতাকে প্রায়শই বিপরীত অবস্থানে দেখা হয়। কারণ, একটি পরিস্থিতি তৈরি হয় ভাষা ও বক্তব্যের অনুপস্থিতি বা উপস্থিতির উপর নির্ভর করে। এ প্রসঙ্গে নিম্নবর্গের ইতিহাস সমালোচক ও প্রাবন্ধিক শাইল মায়ারাম তাঁর 'Speech, Silence and the making of partition violence in Mewat' প্রবন্ধে বক্তব্য ও নীরবতার মধ্যে সম্পর্ক প্রসঙ্গে জানিয়েছেন,

> 'At one level, there is an obvious association between both speech and silience and the construction of truth. Speech is generally viewed as the other of silence, the absence of voice. Paradoxically, as we shall see, both language and speech do not preclude silence.' (Amin 1996, p. 127)

অর্থাৎ এক স্তরে বক্তব্য এবং নীরবতা উভয়ের মধ্যেই একটি সুস্পষ্ট সম্পর্ক আছে। বক্তব্য সাধারণত দেখা হয় নীরবতার অন্য দিক হিসেবে। নীরবতা হল কণ্ঠস্বরের অনুপস্থিতি। বিপরীতভাবে আমরা দেখতে পাব, ভাষা এবং বক্তব্য উভয়ই নীরবতাকে বাধা দেয় না। নীরবতা সম্পর্কে এই বক্তব্যকে স্মরণে রেখে

আমরা হরিশংকরের ‘প্রতিশোধ’ গল্পের মাধুরী ও ‘প্রস্থানের আগে’ উপন্যাসের ফাল্গুনী নারী চরিত্র দুটির নীরব প্রতিবাদকে লক্ষ করেছি। দুটি ক্ষেত্রেই ঘটনার সাজুয্য রয়েছে।

এক. দু'জনকেই বাড়ি থেকে সুযোগ্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দুই. দুজনেই পিতার আদরের সন্তান।

তিন. দুজনের ক্ষেত্রেই বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের অমতে কেবল পিতার পছন্দের ওপর নির্ভর করে বিয়ে দেওয়া হয়েছে।

চার. দুজনের ক্ষেত্রেই পরবর্তীকালে স্বামীর নেশাগ্রস্ততা ও জোচ্চোরগিরি ধরা পড়েছে।

প্রথমত 'প্রতিশোধ' গল্পে দেখি, যে সোমেশ্বর একদিন মেয়েকে শিক্ষিত করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে-ই একদিন মাধুরীকে হঠাৎ বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সোমেশ্বর ভেবেছিল বিয়ে দিলেই বোধ হয় মাধুরীর জীবন নিরাপত্তা ও সুখে শান্তিতে ভরে উঠবে। কিন্তু মিতভাষী মাধুরী এই সিদ্ধান্ত মন থেকে মানতে পারেনি বলে তার বাবাকে বলেছিল-

> ‘বাবা, আমার তো বিয়ার বয়স হয় নাই। তুমি আমাকে পড়াবে বলছিলা।এখন বিয়া দিতে চাও কেন? এখন বিয়া দিও না বাবা আমারে।’ (জলদাস ২০১৬ (ক) পৃ. ৮৩)

আদরের মেয়ের অনুরোধ-আবদার অগ্রাহ্য করেই কর্ণফুলীর পূর্বপাড়ে চৌকিদারের পুত্র বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে মাধুরীর বিয়ে ঠিক করেছিল সোমেশ্বর। কারণ পাত্র শিক্ষিত ও জার্মান কোম্পানিতে ক্লার্কের চাকরি করে। শিক্ষিত ছেলে পেয়ে সোমেশ্বর মনে মনে শান্তি পেয়েছিল। বিয়ের পর বেশ কয়েকবার মাধুরী বাপের বাড়ি এলে অন্যান্য সদস্যরা মাধুরী চোখেমুখে অশান্তির ছোঁয়া অনুভব করে। কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস করলে মাধুরী এড়িয়ে যায়।

> ‘মাধুরী ম্লান হাসে। মুখে কোনো জবাব দেয় না। (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৮৫)

কিন্তু ঘটনাক্রমে সোমেশ্বরের এক দুঃসম্পর্কের দিদি যার জলধিতে বিয়ে হয়েছিল তার বাড়িতে ঘুরতে এসে সোমেশ্বর জানতে পারে-

> ‘মেয়েটাকে যে বিয়া দিলা আমাদের একটু জিজ্ঞাসা করল না। সুলুক সন্ধান না করে ধুম করে মাইয়াটারে এক জুয়াড়ির সঙ্গে বিয়া দিলা!’ (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ.৮৭)

সোমেশ্বরের দিদির দেওয়া বর্ণনা অনুযায়ী বিচিত্রবীর্য ছেলেবেলা থেকে জুয়াড়ি। কম বয়স থেকে মদের নেশা ধরে ছিল সে। তাছাড়া দুশ্চরিত্র চিটিংবাজ বিচিত্রবীর্যের সংসারে কোনো মন নেই। চৌকিদার ভেবেছিল বিয়ে দিলে ছেলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু চাকরি থেকে ফিরেই সে জুয়ার আসরে বসে। দিদির মুখে একথা শুনে সোমেশ্বর হতবাক হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে তার অপরাধ।

‘আমি বুঝেছি, মাধুরীর অভিমান আমার উপর। আমি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়া দিছি। সে আমার উপর প্রতিশোধ নিছে।’ (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৮৮)

যে কন্যা পিতা অন্তপ্রাণ তার ইচ্ছের সম্মান রাখতেই মাধুরী এই অনিচ্ছাকৃত বিয়েতে রাজি হয়েছে। বাড়ির সদস্যরা চেয়েছিল মাধুরী সুখে থাক। তাইতো স্বামীর চরিত্রের কথা হাসি মুখে চেপে গিয়েছে সে। শারীরিক ও মানসিক অসুখ চেপে রেখে সুখের অভিনয় করার মধ্য দিয়েই পিতার হঠকারী সিদ্ধান্তের নীরব প্রতিবাদ করে গিয়েছে মাধুরী। তাইতো হঠাৎ একদিন সোমেশ্বরের কাছে খবর আসে মাধুরীর মারাত্মক রোগ হয়েছে। পিতা মাধুরীকে নিয়ে আসার জন্য জোরাজুরি করলেও সে সংসারের দোহাই দিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে গিয়েছে। কিন্তু দুদিন পর খবর এসেছে মাধুরী গত রাতে মারা গিয়েছে।

তাহলে দেখা গেল, মাধুরীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার সুখের ব্যবস্থা করা পিতার হঠকারী সিদ্ধান্ত তার জীবনে কী বিপুল দুঃখ-কষ্ট বয়ে এনেছে। শিক্ষিত হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে হঠাৎই তাকে অন্য জগতে পাঠিয়ে দেওয়ার ঘটনাটি মাধুরী মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু পিতার উপর অভিমান করা ছাড়া তার করণীয় তো কিছুই নেই। ফলে নীরব থাকার মধ্যে দিয়েই অভিমান ও দুঃখ-কষ্টকে লাঘব করতে চেয়েছে সে। যা একইসঙ্গে হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের নামান্তর।

আবার ‘প্রস্থানের আগে’ উপন্যাসেও ‘প্রতিশোধ’ গল্পের পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা গিয়েছে। মাধুরীর মতো ফাল্গুনীর নীরবতার কারণ সুশীলা বুঝতে পারে।

‘সুশীলা পিসি বলে, ‘হয়তো তোমার ওপর বা তোমার সমস্ত পরিবারের ওপর হের বড়ো অভিমান আছে। হয়তো তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে হেরে তোমরা এই ঘরে বিয়া দিছ। হয়তো সে প্রতিশোধ লইতাছে তোমার উপর। নিজে তিল তিল কইরে মইরে যাবে, তবুও নিজের বেদনার কথা কইবে না তোমারে—ইটাই বোধহয় পণ কইরেছে ফাল্গুনী।’

(জলদাস ২০১৯, পৃ. ১৭৯)

সুশীলা পিসির কাছে যেটা ‘হয়তো’ বা ‘বোধহয়’ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে, পিতা সুধাংশুর কাছে সেটাই নিশ্চিত রূপে সত্য বলে প্রমাণিত। কারণ সুধাংশু জানে সে বাড়ির সদস্যদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ফাল্গুনীর বিয়েটা দিয়েছিল। তাই ফাল্গুনীর নীরবতা একটা সময় সুধাংশু কাছে তার কৃতকর্মের অনুশোচনা ও অপরাধবোধে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। তাইতো কন্যার কাছে পিতার আকুল প্রার্থনা-

‘আমারে মাফ কইরে দে রে ফাল্গুনী, আমারে ক্ষমা কইরে দে।’ (জলদাস ২০১৯, পৃ. ১৮০)

অন্যদিকে ‘কসবি’ উপন্যাসের ইলোরা নামক পতিতা চরিত্রের নীরব প্রতিবাদের কথা বলতে হয়। আলোচ্য উপন্যাসে জানা যায়, ইলোরা চাকমার আসল নাম উমা প্রু চাকমা। রাঙামাটির প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক গ্রামের মেয়ে সে। এক বাঙালিবাবুর প্রেমে পড়ে তার হাত ধরে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল

সে। শারীরিক শোষণ করে সে বাবুটি তাকে এই সাহেবপাড়ায় বিক্রি করে দিয়ে গিয়েছে। প্রেমিকের বিশ্বাসঘতকতা, মা-বাবাকে ত্যাগ করার অপরাধবোধ ও মাসি-কাস্টমারের দৈহিক নির্যাতন তাকে নির্বাক করে তুলেছে। তার মনে এখন শুধুই পুরুষজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ। তাইতো তার সিফিলিস রোগ হলেও সে ইচ্ছে করেই নীরব থেকে এই রোগের চিকিৎসা করাতে চায়নি। কারণ ইলোরা জানে এই রোগ সহবাসের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পুরুষ যৌনাঙ্গে জ্বালা-যন্ত্রণার সৃষ্টি করবে। পুরুষটি চাইলেও এই যন্ত্রণা বা পতিতাগমনের কথা সকলকে বলতে পারবে না। এই দৃশ্য কল্পনা করেই ইলোরা সুখ অনুভব করে। উপন্যাসে তার মনের নীরব প্রতিশোধের কথা শোনা গিয়েছে,

> 'সহবাসকালে সে ক্ষতস্থানে, একটু একটু ব্যথা পাচ্ছে বটে, কিন্তু প্রতিশোধস্পৃহার কাছে তার এই ব্যথা কিছুই নয়। সে এই রোগ সারাবে না, যাবে না জীবন ডাক্তারের কাছে। সে অপেক্ষা করে আছে একজনের জন্যে।...
>
> যেদিন বাঙ্গালিবাবুর শরীরে সিফিলিসের জীবাণু ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হবে, শুধু সেইদিনেই যাবে জীবন ডাক্তারের কাছে। তার আগে নয়। কিছুতেই নয়, কিছুতেই নয়।' (জলদাস ২০১১, পৃ. ৭৬-৭)

তাহলে দেখা গেল, একজন নারী তার প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও শুধুমাত্র প্রতিশোধকে সফল করার উদ্দেশ্যে তার মারাত্মক রোগ সম্পর্কে নীরব থেকেছে। ইলোরার এই নীরব প্রতিবাদ আসলে সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গীয় নারীর স্বতন্ত্র চেতনাকেই প্রমাণ করে।

সুতরাং এ পর্যন্ত আলোচনায় নিম্নবর্গীয় নারীর প্রতিবাদ-প্রতিরোধের যে ধরন উঠে এল তা আসলে নিম্নবর্গের সমগ্র সমাজের হয়ে কথা না বলতে পারার ফল। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক আসলে 'Can the subaltern speak?' প্রশ্নের মধ্য দিয়ে একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে নিম্নবর্গের কেউ কথা বলার জন্য মৃত্যু বা আত্মহত্যার চেষ্টা পর্যন্ত করে, নীরব থেকে প্রতিবাদ করে, আবার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিরোধও করে। কিন্তু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবর্গীয় নারী শোনা ও বলার মাধ্যমে তাদের বক্তব্যকে সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করতে পারে না। আর পারে না বলেই উচ্চবর্গের কাছে নিম্নবর্গের বক্তব্য পৌঁছায় না। তারা ধীরে ধীরে তথাকথিত ক্ষমতাবান তথা এলিট শ্রেণির কাছে 'কিছুই নয়' অর্থাৎ অস্তিত্বহীন হিসেবে বিবেচিত হয়। ডোনা ল্যান্ডরি ও গেরাল্ড ম্যাকলেন-এর দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে গায়ত্রী চক্রবর্তীর স্পিভাক তা স্পষ্ট জানান-

> '... "the subaltern can not speak", means that even when the subaltern marks an effort to the death to speak, she is not able to be heard, and speaking and hearing complete the speach act. That's what it had meant, and anguish Marked the spot.' (Morris (ed.) 2010, p.292)

স্পিভাক আরো বলেন যে যদি কেউ 'speak' শব্দটিকে সাহিত্যিক অর্থে 'Talk' হিসেবে গ্রহণ করেন তাহলে তার ভুল ব্যাখ্যা করা হবে কারণ 'speak' ও 'Talk' শব্দটির অর্থ এক হলেও এর ব্যবহারে

ভিন্নতা রয়েছে। 'Speak'-এর ব্যবহার হয় বক্তার কণ্ঠে শব্দ উৎপাদনের ওপর আলোকপাত করে, কিন্তু 'Talk' শব্দটি একে অপরের সঙ্গে কথাবার্তা বলার অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। (Landry (eds.) 2012, p. 291) সুতরাং নিম্নবর্গের কথা বলতে না পারার অর্থ তারা নিজস্ব চেতনার ভাববস্তুকে নিজ কণ্ঠস্বরে শব্দ উৎপাদনের মধ্যে প্রকাশ করতে পারে না। তাই বাধ্য হয়ে তারা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের নানা বিকল্প পথ খুঁজে নেয়। নিম্নবর্গীয় নারীদের ক্ষেত্রে আমরা তাই প্রতিবাদের বিভিন্ন ধরনকে উপলব্ধি করলেও তাদের নিজস্বতাকে তেমনভাবে প্রকটিত হতে দেখিনি। নারীর যতটুকু প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় তা কেবল সাময়িক ক্ষেত্রে অন্যায়কারীকে অস্বস্তিতে ফেলেছে ঠিকই কিন্তু তথাকথিত আধিপত্যকামী নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্য আরেকটি পথ অবলম্বন করেছে। তাই নিম্নবর্গ যতবারই প্রতিবাদ করেছে, সেই প্রতিবাদের উদ্দেশ্য প্রতিবারই বিফলতায় পর্যবসিত হয়েছে। নিম্নবর্গীয় চেতনার বৈশিষ্ট্য হিসেবে কথা বলতে না পারার বিষয়টি তাই প্রতিবাদের বিফলতার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিশদে আলোচনা করব।

৫.৪ নিম্নবর্গের নিষ্ক্রিয়তা ও প্রতিবাদহীনতা

কথাবিশ্বে প্রতিবাদ-প্রতিরোধী সত্তাটি যেমন নিম্নবর্গীয় চেতনার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে আমরা পেয়েছি তেমনই পরিস্থিতি অনুযায়ী কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিবাদহীনতাও নিম্নবর্গীয় চেতনারই একটি বৈশিষ্ট্য রূপে উঠে এসেছে।

'জলপুত্র' উপন্যাসে কামিনী বহদ্দার চরিত্রটিকে আমরা অন্যায় বঞ্চনা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়, প্রতিবাদহীনতার ভূমিকায় লক্ষ করেছি। উপন্যাসে কামিনী মাছ মারার মরশুমে শুক্কুরের কাছ থেকে ধার নেয় এই শর্তে যে, যত মাছ ধরা পড়বে তার সবই তার কাছে বিক্রি করতে হবে। কিন্তু কামিনী বহদ্দারের জালে লম্বু ধরা পড়লে সেই মাছ শুক্কুর জলের দামে কিনতে চায়। কামিনী তাতে রাজি না হলে শুক্কুর তাকে চড় মারে। লক্ষণীয় চড় মারার পরও শুক্কুর তাকে গালমন্দ করতে থাকে ও মাছ তার দামেই বিক্রি করার হুমকি দেয়। কিন্তু কামিনী বহদ্দার এর তরফ থেকে কোনো জোরদার প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবাদ লক্ষ করা যায় না। মার ও গালাগাল খাওয়ার পর তার বক্তব্য শুধু এতটুকুই-

> "মাছ তো তোঁয়ার কাছে বাজার দামে বেচনর কথা, তুঁই তো তোঁয়ার ইচ্ছা মতন দাম দিতা চাইতা লাইগ্য।' শরীর থেকে বালি ঝাড়তে ঝাড়তে কাঁদো কাঁদো স্বরে কথাগুলো বলল কামিনী।" (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৫২)

'কাঁদো কাঁদো স্বরে' কথা বলার মধ্যে ভীরুতা ও নিষ্ক্রিয়তা প্রদর্শিত হয়। কামিনীর যেখানে অন্তত মৌখিক প্রতিক্রিয়া করার কথা সেখানে ঘটনাস্থলে উপস্থিত বিজন বহদ্দার ও রামনারায়ণ বহদ্দার কামিনীর হয়ে শুক্কুরের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। শুধু তাই নয়, গঙ্গার নেতৃত্বে জেলেজীবনের ধারায় যে দিক-পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে তাতে সকলের সমান উত্তেজনা ও সচেতনতা থাকলেও কামিনী বহদ্দারের নিষ্ক্রিয়তা লক্ষণীয়। অনিল যখন উত্তেজিত কণ্ঠে কামিনীর উদ্দেশ্যে বলে-

'আর কত মাইর খাইবা? জীবন বাজি রাখি যে-মাছ ধরি আন, হেই মাছ আর কতদিন বিনা পয়সায় বিলাই দিবা?'
(জলদাস ২০০৮, পৃ. ১০৮)

এর উত্তরে কামিনী বহদ্দার এর প্রতিক্রিয়া প্রণিধানযোগ্য। উত্তেজনাহীন প্রতিবাদহীন ভাবে সে অদৃষ্টের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে বলে-

'কী গইয্যম? আঁরার কোয়ালত্ লেখা আছিল। কেএন গরি খন্ডায়ম?' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১০৮)

ধর্মের দোহাই দিয়ে কর্ম থেকে পিছিয়ে যাওয়ার অর্থ হল অক্ষমতা ও ভীরুতা। নিম্নবর্গের ইতিহাসে আলোচিত নিম্নবর্গীয় চেতনার এটি একটি লক্ষণ। রণজিৎ গুহ যাকে নিম্নবর্গীয় চেতনার ধর্মভাব বলেছেন। যদিও এই ধর্মাভাব বলতে শুধু ধর্ম বা ধর্মসংস্থার প্রতি আনুগত্য বোঝায় না, তা আসলে চেতনার সেই অবস্থা-

'যার প্রভাবে জীব জগতের কোনো সত্তাকে বাস্তবের ভাবনার অন্তর্গত কোনো বিষয়কে তা যথার্থভাবে ধারণার মধ্যে আসতে পারে না, এবং এক বিষয়ের উপর আরেক বিষয়ের গুণ আরোপ করে। ফলে যা ঐহিক তাকে অলৌকিক বলে মনে হয় যা একান্তই মানবিক তাকে দৈব বলে ভুল হয়।' (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ৪৩)

অর্থাৎ এই ধর্মভাবের ফলে কর্তা কখনো কখনো নিজের কৃতকর্মকে সঠিকভাবে চিনতে পারে না। যা তার নিজের কৃতিত্ব তাকে সে অন্যের প্রতিবাদ বা কৃতিত্ব বলে বর্ণনা করে। তাইতো আলোচ্য উপন্যাসে গঙ্গাপদ জেলেদের অধিকারবোধে সচেতন করে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিলে কামিনী বহদ্দারের সঙ্গে অন্যায় বঞ্চনাকে শুক্কুর শশিভূষণের বদলে কপাল বা ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছে। সুতরাং কামিনীর সমমর্যাদায় বসবাসকারী জেলেদের মধ্যে প্রতিবাদী চেতনা জাগরিত হলেও কামিনী বরাবর নিষ্ক্রিয়তা ও ভীরুতার পরিচয় দিয়েছে।

যদিও 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' বর্ণিত কৃষক বিদ্রোহের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে তৎকালীন ঔপনিবেশিক যুগের বাস্তব অভিজ্ঞতা যে একেবারে অবিকল মিলে যাবে এমন নয়। আমরা যে কৃষক চৈতন্যের উপর নির্ভর করে তথাকথিত নিম্নবর্গের চেতনার বৈশিষ্ট্যকে অনুধাবন করেছি তা শুধুমাত্র তাত্ত্বিক প্রস্তাবের মূলসূত্র। স্থান, কাল, পাত্র ও পরিস্থিতিভেদে চেতনার বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের সাধারণ চরিত্র

অক্ষুন্ন রেখেই এক এক পরিস্থিতিতে এক একভাবে উঠে আসে। তাইতো 'দহনকাল' উপন্যাসে রাধানাথকে একজন প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে দেখা গেলেও বাস্তবতার সঙ্গে সেও আপোষ করে নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, রাধানাথের যখন নিজস্ব নৌকা ছিল না তখন সে অনেক অনুরোধ করে রমণীমোহন বহদ্দারের নৌকায় পাউন্যা হিসেবে কাজ করার সুযোগ পায়। কিন্তু রমণীমোহন রাধানাথের অসহায়তার সুযোগ নেয়। দেখা যায়, জেলে সমাজের অলঙ্ঘনীয় শর্ত হিসেবে বহদ্দারের তিনটি ও পাউন্যার একটি জালের মধ্যে বহদ্দার একটি দেয়াল থেকে মাছ তোলার পর পাউন্যা নাইয়ার জাল থেকে মাছ তুলতে হবে। কিন্তু রাধানাথের ক্ষেত্রে এই শর্ত লঙ্ঘন করেছে রমণীমোহন। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবাদ করেনি রাধানাথ।কারণ তার মনে বহদ্দার হওয়ার স্বপ্ন-

> 'আর রাধানাথ জানে—বহদ্দার হতে চাইলে এইসব ছোটোখাটো অনৈতিক অসম ব্যাপারকে উপেক্ষা করতে হবে। রাধানাথ করেছেও তা-ই। (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৮)

আমরা জানি কিছু পেতে হলে কিছু হারাতে হয়। রাধানাথও বহদ্দারের মর্যাদা পেতে রামনীমোহনের অনৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থেকেছে। যদিও একটা সময় পর রাধানাথ রমণীমোহনকে ছেড়ে অন্নচরণ বহদ্দাররের নৌকায় পাউন্যা হিসেবে কাজ নেয়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও অন্নচরণ অলঙ্ঘনীয় শর্ত লংঘন করেছে। তাই দেখা যায়, অন্নচরণ নৌকা ভর্তি মাছ নিয়ে ঘরে ফেরে আর রাধানাথ ফেরে শূন্য হাতে। তারপরও কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না রাধানাথ। শুধু রাধানাথ নয়, তার মতো অন্য অনেক পাউন্যাই বহদ্দারের এই অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে। তাই বলে এই নয় যে, প্রতিবাদের ভাষা বা ধরন তাদের জানা নেই। আসলে তারা জানে প্রতিবাদ করলেই শাস্তি স্বরূপ বহদ্দারের অসহযোগিতা নেমে আসবে তাদের ওপর। গোঁজ পোতার সময় বহদ্দাররা যদি তাদের নৌকা দিয়ে সাহায্য না করে—এই ভয়ে তারা প্রতিবাদহীন নিষ্ক্রিয় দিন কাটায়। উপন্যাসে জানতে পারি-

> 'একজন বহদ্দারের অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে সব বহদ্দারের অসহযোগিতা তাদের মাৎস্যজীবনকে জেরবার করে ছাড়ে।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৩৪)

অর্থাৎ বহদ্দার তার নিজস্ব নৌকা থাকার ক্ষমতার অপব্যবহার করে পাউন্যা ও অন্যান্য জেলেদের প্রতি আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু অধীন জেলেরা অন্য কোনো সাধারণ জেলের সহযোগিতা পর্যন্ত পায় না। প্রতিরোধ গড়ে তোলার সম্ভাবনা থাকে না সেখানে। ফলে নিরুপায় পাউন্যা নাইয়ারা নিষ্ক্রিয় ও অসহায় বোধে 'দৈনন্দিন অধীনতার অভিজ্ঞতা' নিয়ে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়।

অন্যদিকে রাধানাথের মা চন্দ্রকলা হাটে মাছ বিক্রি করাকালীন কোনো এক জনৈক ভদ্রলোক দ্বারা প্রতারিত হন। কারণ টাকা খুচরো নেই বলে ক্রেতা মাছের দাম না দিয়ে চলে গিয়েছে। চন্দ্রকলা

সেই ভদ্রলোকের জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করলেও সে ফেরেনি। নিরুপায়, অসহায় চন্দ্রকলা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন,

‘চল যাই, ভগমান তুঁই তার বিচার গর। আঁর পোয়ার দইজ্যা-হেঁচো মাছ।’ (জলদাস ২০১০, পৃ.৪৩)

বাড়িতে ফিরে সেই ক্রেতার বঞ্চনার কথা ভুলতে পারে না চন্দ্রকলা। আবার রাধানাথকেও এই বঞ্চনার কথা বলতে পারে না। কারণ রাধানাথের উত্তরও তার জানা,

‘দাম নো দি মাছ লই গেইয়ে গই বুলি তুঁই মন খরাপ নো গইয্যো মা। হিতার কোয়ালত্ লেখা আছিল মাছ হিউন।’

(জলদাস ২০১০, পৃ. ৪৪)

এক্ষেত্রে ‘জলপুত্র’ উপন্যাসের কামিনীর মত চন্দ্রকলা ও রাধানাথ নিজের কৃতকর্মের বিষয়ের ওপর ঈশ্বর ও অদৃষ্টের গুণ আরোপ করেছে।

আবার রাধানাথ যখন তিন টাকার বেশি দামের একটি ইলিশ মাছ বেচার জন্য হাটে নিয়ে যাচ্ছে তখন আব্দুল খালেক মেম্বার ইলিশ মাছটি একপ্রকার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়,

‘তারপরও তিন টিয়া হাতত্ গুঁজি দি মেম্বরে কইলো—ল ল। আঁরা তো চাইলে উগ্গা-দুউয়া মাছ মক্তো পাই। তিন টিয়া দিদ্দে বউত্। লেজত্ ধরি লটকাই লই হাঁডা দিল। কী কইতে পারি? মেম্বর রাইতরে দিন গরে।’

(জলদাস ২০১০, পৃ. ৪৪)

‘কী কইতে পারি?’- এই অসহায়তা প্রকাশের মধ্যে যে রাধানাথের মনে এক ধরনের ভীরুতা ও অক্ষমতা কাজ করেছে তা আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কারণ আব্দুল খালেক মেম্বার সমাজের তথাকথিত ক্ষমতাবানদের একজন। তার অনুগত না হয়ে থাকলে রাধানাথের সমূহ ক্ষতি হওয়ার ভীতি রাধানাথকে প্রতিবাদহীন ও নিষ্ক্রিয় করে তুলেছে।

একই প্রসঙ্গে উঠে এসেছে ‘অর্ক’ উপন্যাসে। বলরামের মত সাধারণ জেলেদের কাছ থেকে ছোবান মেম্বারের মতো মানুষেরা মাছ নিয়ে দাম দেয় না। কারণ জেলেদের জন্য সরকারি রিলিফ আসে তার কাছে। সব জেলেদের জন্য বরাদ্দ টাকাকে নিজের কৃতিত্ব বলে আদায় করে সে। সেই সুযোগে জেলেদের কাছ থেকে বিনামূল্যে মাছ নেয়। কেউ দাম চাইলে রিলিফ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। ফলে সকলে প্রতিবাদহীন হয়ে মেম্বারের হাতে শোষিত হয়। কিন্তু দিবাকরকে হাইস্কুলে ভর্তি করার প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক সত্যব্রত চক্রবর্তী বলরাম ওদের মত অসহায় মানুষদের উজ্জীবিত করার জন্য সমাজ বাস্তবতাকে তার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেন।

‘দেখ বলরাম, যুগ যুগ ধরে তোমরা তুই-তোকারি, গালিগালাজ শুনে আসছ। তোমাদের কাছ থেকে ভালো আর বড়ো মাছগুলো ছলেবলে হাতিয়ে নিচ্ছে ওরা। তোমরা এসব অন্যায়কে ঈশ্বরের বিধান বলে সহ্য করে আসছ। এসব ঈশ্বরের বিধানটিধান কিচ্ছু না। এর জন্য দায়ী তোমাদের প্রতিবাদহীনতা।’ (জলদাস ২০১৭, পৃ. ২২)

আমরা লক্ষ করলাম সত্যব্রত বাবুর বক্তব্যে তথাকথিত নিম্নবর্গীয় চেতনার বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। এখানে একই সঙ্গে নিম্নবর্গের অধীনতার চেতনা, ধর্মভাবের লক্ষণ ও প্রতিবাদহীন উপাদানের কথা উঠে এসেছে। যা এ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি। নিম্নবর্গীয় চেতনা সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু সত্যব্রত চক্রবর্তী নয়, এই দৃষ্টিভঙ্গি বলরামের মত সাধারণ জেলে তথা নিম্নবর্গের ভাবনাতেও ধরা পড়েছে। তাই তো সে মনে মনে উপলব্ধি করে-

‘সত্যি তো, বংশানুক্রমে এতটি বছর তারা মুখ বুজে হিন্দু-মুসলমানের অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করে এসেছে। কথায় কথায় জাইল্যা-ডোম বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে। ঘরে আসন পেতে বসতে দেয়নি কোনোদিন। নৌকা থেকে পাঙাশ মাছটি, ইলিশ মাছটি, কোরাল মাছটি হাতে ধরে নিয়ে গেছে, দাম চাইবার সাহস করেনি। কখনো বা দাম চাইলে ছাতার বাট দিয়ে মাথায়-গায়ে বাড়ি মেরেছে। এসব অত্যাচারের কোনোই তো প্রতিবাদ করেনি তারা। প্রতিবাদ করার কথা মনেই আসেনি কোনোদিন।’ (জলদাস ২০১৭, পৃ. ২৩)

সমস্ত অন্যায়-বঞ্চনাকে মুখ বুঝে সহ্য করে আসার মধ্যে যেমন প্রতিবাদহীনতা ধরা পড়েছে তেমনই প্রতিবাদ করার কথা মনে না আসার মধ্যে ভীরুতা, নিস্ক্রিয়তা ও আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে নিম্নবর্গীয় চেতনায়। শুধু তাই নয়, ছোবান মেম্বারের অন্যায়-অত্যাচারের উদাহরণ হিসেবে আমরা যখন দেখলাম রহমালির রিক্সায় তিন মাইল পথ এসে তাকে পাঁচ টাকার দিলে সে সাত টাকা দাবি করলে ছোবান মেম্বার তাকে মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে বেধড়ক মারলেন।

‘হয়রান না হওয়া পর্যন্ত রহমালিকে পিটিয়ে গেলেন ছোবান মেম্বার। আশেপাশের লোকেরা নির্বাক দর্শক হয়ে থাকল। কেউ প্রতিবাদ করার সাহস করল না।’ (জলদাস ২০১৭, পৃ. ১০৯)

ইতিপূর্বে জেনেছি ‘প্রতিবাদ করার সাহস’ সঞ্চিত হয় তখনই যখন নিম্নবর্গের আগ্রহ ও সমস্যাগুলি একি বলে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু রহমালি সাধারণ রিক্সাচালক, তার প্রহৃত হওয়ার ও বেদনা তার নিজেরই। সুতরাং রহমালি মতো শোষিত ও নিপীড়িত হতে নির্বাক দর্শকের মধ্যে কেউ চায়নি। ফলে তাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চারিত হয়ে তারা প্রতিবাদী নিষ্ক্রিয় থেকেছে।

আবার ‘কসবি’ উপন্যাসে সাহেবপাড়া পতিতাপল্লীর কালিমাতার মন্দিরে পুরোহিত চরিত্রটি কালু সর্দারর দাপটে একটা সময় পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদহীন হয়ে থেকেছে। উপন্যাস অনুযায়ী মন্দিরের পেছনে একচালা ঘরটি কালু সর্দারের অন্যায় অপকর্মের আঁতুড়ঘর। কারণ সেই ঘরটি অপরাধী, খুনি, গুন্ডাদের

আশ্রয় কেন্দ্র। খুনের আসামি, জেলপলাতকদের কালু ঘরটিতে টাকার বিনিময়ে আশ্রয় দেয়। কালুর দুষ্কর্মের কথা অন্য কেউ না জানলেও মন্দিরের পুরোহিত জানেন। কিন্তু কালুর বিরুদ্ধে গিয়ে এই সত্য উন্মোচনের সাহস নেই পুরোহিতের। কারণ তিনি জানেন এর ফলস্বরূপ কালুর ক্ষোভের মুখে পড়তে হবে তাকে। উপন্যাসের বর্ণনায়,

> ‘সর্দারের এই দুষ্কর্মের কথা অন্য কেউ না জানলেও মন্দিরের পুরোহিত জানেন। কিন্তু বলার সাহস পুরোহিতের নেই। তাঁর ঘাড়ে কটি মাথা আছে যে, তিনি সর্দারের দুষ্কর্মের প্রতিবাদ করবেন?’ (জলদাস ২০১১, পৃ. ৯৫)

অন্যদিকে ‘একলব্য’ উপন্যাসের ঘটনা অনুযায়ী দেখা যায় যে গুরু দ্রোণ দ্বারা একলব্যকে নিষাদ পুত্র বলে যখন অস্ত্র শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয় তখন হতবাক একলব্য মনে গভীর অপমান বোধ নিয়ে অরণ্যে প্রবেশ করে। সেখানে সে দৃঢ় সংকল্প বসে দ্রোণের মাটির মূর্তি নির্মাণ করে তার সামনে কঠোর অধ্যবসায়ে অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ হয়ে ওঠে। একজন নিম্নবর্গের উত্থানকে স্তিমিত করে দেওয়ার জন্য দ্রোণাচার্য কূটকৌশলে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ অস্ত্র চালনার জন্য অত্যাবশ্যকীয় প্রত্যঙ্গ বুড়ো আঙ্গুল একলব্যর কাছ থেকে কেড়ে নেন। দ্রোণাচার্যের এই গর্হিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে একলব্য কোনো প্রতিবাদ করেনি, করতে পারেনি। কারণ গুরুর কাছে তার আত্মা সমর্পিত। এই সমর্পণের সুযোগ নিয়ে গুরু তার শিষ্যের সর্বনাশ করতে চেয়েছেন। মহাবীর কর্ণ এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে নিজের কাছে প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়েছেন।

> ‘এ কেমন মানুষ রে বাবা! এত বড়ো অন্যায় কাজের পর, নিজের মূল্যবান অঙ্গ হারানোর পর, নিদারুণ লাঞ্ছনার পরও কোনো ভাবান্তর নেই! রোষে জ্বলে ওঠা নেই, কান্নায় ভেঙে পড়া নেই, উন্মাদের মতো আচরণ নেই, শুধু ধীরস্থির হয়ে থাকা। এ কেমন নিষাদ! নিষাদদের কি জ্বালাযন্ত্রণা নেই? তারা কি বেদনায় কাঁদে না? তারা কি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শিখে নি?’ (জলদাস ২০১৬, পৃ. ১৫০)

যদিও এক্ষেত্রে একলব্যের প্রতিবাদহীনতার কারণ ভীরুতা নয়। শাস্তির ভয়ে নয়, তার নিষ্ক্রিয়তার কারণ গুরুর প্রতি অচলভক্তি ও সমর্পণ। একলব্যের আচরণে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে কেবল ধর্মভাব বা ভীরুতার কারণে প্রতিবাদহীন থাকে না নিম্নবর্গ। কখনো কখনো নিজ আত্মমর্যাদা ও মহত্ত্ব প্রদর্শনেও নিম্নবর্গ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

‘সুখলতা ঘর নেই’ উপন্যাস লক্ষ করা যায় যে, মৎস্যসমাজে ছোটো জাত বলে পরিচিত চেরবডি জাতের এক দরিদ্র মৎস্যপরিবারের মেয়ে একদিন পঞ্চানন সর্দারের ছেলে জগয়াইয়ের চোখে পড়ে। সে তাকে বাড়িতে দাসী হিসেবে আশ্রয় দেয়। কিন্তু আশ্রয় ও খাদ্যের বিনিময় সে মেয়েটিকে জগাইয়ের শারীরিক ক্ষুধা মেটাতে হয়।

'যেন বহুবার বহু ভাবে লাঞ্ছিত হতে হতে নারীত্বের সকল সম্ভ্রমবোধের কথা সে ভুলে গেছে।'

(জলদাস ২০১৯(খ), পৃ. ১২০)

দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে একজন নারীর শরীর উপভোগ করার মধ্যে ক্ষমতার আস্ফালন প্রকাশ পেয়েছে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সেই নারীর তরফ থেকে কোনো প্রতিবাদী চেতনা জাগরিত হয়নি বরং একজন নারী হয়ে আরেকজন নারীর সুখলতার কাছে তার মনোবেদনা প্রকাশ করেছে মাত্র। জগাই দ্বারা শারীরিকভাবে শোষিত হয়েও সে নিষ্ক্রিয় থেকেছে কারণ সে জলতলের সমাজে ছোটো জাত বলে বিবেচিত। দৈহিক আকারেও তারা ছোটো,বলও সীমিত। তাই তারা সাগরের সব ধরনের মাছের অবহেলার শিকার। সুতরাং যে শ্রেণি সমাজের অন্যান্য সকল শ্রেণির কাছে অবহেলিত তারা কার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। তারা নিম্নশ্রেণির বলে নিজের আত্মসম্ভ্রমকে ভেসে যেতে দিয়ে নিষ্ক্রিয় থেকেছে।

উপন্যাসের মতোই হরিশংকরের ছোটোগল্পে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুযায়ী সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের নিষ্ক্রিয়তা ও প্রতিবাদহীনতা লক্ষ করা গিয়েছে। যেমন 'দইজ্যা বুইজ্যা' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে পাকসেনা দ্বারা জেলেপাড়া অবরুদ্ধ হয়। সেখানে পাঞ্জাবি সৈন্য বেলুচি সৈন্য ও রাজাকার দ্বারা জেলেরা অত্যাচারিত নিপীড়িত হয়। সৈন্যরা বেতের বাড়ি, বন্ধুকের গুঁতো দিয়ে জেলেদের জোর করে গাছ কাটায়। সেগুলি আবার তাদের দিয়েই বহন করায়৷ মাঝে মাঝে কারো বাড়ির হাঁস-মুরগি-ছাগল-গোরু লুট করে নিয়ে যায়। এত অত্যাচার সহ্য করেও জেলেরা চুপ থেকেছে। গল্পের বর্ণনা অনুযায়ী

'জেলেদের মুখে প্রতিবাদের ভাষা নেই। শুধু মনে আগুন জ্বলে, রাগে ক্ষোভে শরীর কাঁপে। সেই কাপুনি অতি কষ্টে জীর্ণ কাপড়ের তলায় ঢেকে রাখে তারা।' (জলদাস ২০১৬ (ক) পৃ. ২৬)

অর্থাৎ রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে জেলেদের শরীর কাঁপলেও তারা ক্ষোভ প্রকাশ করতে পর্যন্ত সাহস করেনি, কারণ সৈন্যরা সশস্ত্র। আসলে বন্দুকের নলের সামনে দাঁড়িয়ে আর যাই করা যাক প্রতিবাদ করা যায় না। প্রতিবাদের ফল নির্ঘাত মৃত্যু জেনেই মরণের চেয়ে শোষণ শ্রেয় মনে করে তারা প্রতিবাদহীন ও নিষ্ক্রিয় থেকেছে।

'থুতু' গল্পেও দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধের সময় চরখানপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বশিরউদ্দিন সেই অঞ্চলে রাজাকারদের সাহায্যে ভীষণ অত্যাচার চালায়। তাদের অত্যাচারে অধিকাংশ নরসুন্দর পরিবার গ্রাম ত্যাগ করে। কিন্তু বিমল শীলের পরিবার সেখানেই থেকে যায়। ঘটনাচক্রে কোনো একদিন রাস্তায় বশিরের সঙ্গে বিমলের দেখা হলে সে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলে বশিরউদ্দিন হুংকার দিয়ে ওঠে,

‘কিথারে মালাউনের পুত, চোখে দেখছ না? আদাব সালাম না দিয়া পাশ কাটাইয়া যাইতাছছ? তুই জানছ না আমি ক্যাটা?’ (জলদাস ২০১৬ (ক) পৃ. ২১৩)

বিমল বশিরের কথায় আঁতকে ওঠে। তার ব্যবহারের জন্য সে ক্ষমা চেয়ে আদাব জানায়। কিন্তু বশির আরো রেগে গিয়ে তাকে গালমন্দ করে এবং এর শাস্তি পেতে হবে বলে বিমলকে হুমকি দেয়। ফলে কোনো এক শুক্রবার দুপুরে রাজাকারের দলেরর সাহায্যে বশির বিমলের পরিবারকে জোরপূর্বক মসজিদে নিয়ে যায়। সেখানে তার পরিবারকে মুসলমান করা হল।

‘বিমলের মুসলমানি নাম রাখা হল ইজ্জত আলী। ইজ্জত আলী মাথায় টুপি পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরল।’

(জলদাস ২০১৬ (ক) পৃ. ২০৩)

গল্পে বশির ক্ষমতাধারী ও অত্যাচারী। তাকে আদাব না জানানোকে সে অপরাধের দৃষ্টিতে দেখেছে। আধিপত্যের এই ধরনটি একটি চমকপ্রদ উদাহরণ। কিন্তু বিমল এখানে সাধারণ সহায়-সম্বলহীন একজন নাপিত। সে অত্যাচারের ভয়ে অন্যান্যদের মত গ্রাম ত্যাগ করতে পারে না নিরুপায় হয়ে। ফলে বশিরউদ্দিনের অধীনে একান্ত অনুগত হয়ে দৈনন্দিন জীবনযাপন করে বিমল। তাই তাকে ধর্মান্তরিতকরণে বাধ্য করা হলেও সে তার প্রতিরোধ করতে পারেনি।

শুধু বিমলই নয়, বশিরউদ্দিনের অত্যাচারের শিকার হয় মুক্তিযোদ্ধা শামসুর। কিন্তু পঙ্গু শামসু তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নিতান্তই দুর্বল। ফলে স্ত্রী-কন্যা নিয়ে সে এক বস্তিতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেখানে শামসুর অনুপস্থিতিতে পাশের ঝোপের সিরাজের বাবা তার কন্যা ফারহানকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এই ঘটনা ফারহানা তার বাবা মার কাছে প্রকাশ করে না। কারণ সে জানে,

‘জানালে দুঃখ বাড়বে মা বাবার। হয়তো সিরাজের বাপের সঙ্গে ঝগড়া জড়িয়ে পড়বে তারা। চার-পাঁচটা পোলা সিরাজের বাপের। যদি মারামারি লাগে তাহলে তার পঙ্গু বাপ পড়ে পড়ে মার খাবে। তারচেয়ে কিল খেয়ে কিল হজম করে যাওয়া ভালো।’ (জলদাস ২০১৬ (ক) পৃ. ২২০)

ফারহানার চেতনায় পিতার অক্ষমতা ও পঙ্গুত্ব বড়ো হয়ে উঠেছে বলে সে প্রতিবাদের রাস্তা বেছে নেয়নি। কারণ সে জানে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের যে বল ও ক্ষমতার প্রয়োজন তা তার পিতার নেই। বরং অন্যায়কারীর চার-পাঁচটি ছেলে। তারা চাইলে তার পিতাকে উল্টে হেনস্থা করতে পারে। এই ভেবেই ফারহানা নিষ্ক্রিয় থেকে সব কিছু সহ্য করে নিয়েছে।

আবার ‘রতন’ গল্পটি রতন নামক এক কিশোরীর শ্যাওলার মতো ভাসমান জীবন কাহিনির বিবরণ। গল্পে দেখা যায় অলিপুর গ্রামের পোস্ট মাস্টারের কাছে রতন পরিচারিকার কাজ করতো একটা সময়। কিন্তু পোস্টমাস্টারের চাকরি কলকাতায় বদলি হয়ে গেলে রতন তার এক দূরসম্পর্কের কাকার

কাছে আশ্রয় পেল। অভাবের তাড়নায় তার কাকা এক বৃদ্ধের সঙ্গে রতনের বিয়ে দিয়েছে। বিয়ের সাত আট বছর পর বৃদ্ধ মারা গেলে তার পূর্বের স্ত্রীর ছেলেরা রতনকে তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে।

'শ্রাদ্ধ সাঙ্গ হওয়ার পরপরই কিছু টাকা করি রতনের আঁচলে বেঁধে দিয়ে থাকে ঘর থেকে বের করে দিল ছেলেরা।'

(জলদাস ২০১৬ (ক) পৃ. ২০৩)

নিজের নিম্নবর্গীয়তা একপ্রকার মেনে নিয়েই রতন মুখ বুজে সেখান থেকে চলে এসেছে। বৃদ্ধ খগেন্দ্রনাথের স্ত্রী হওয়ার অধিকারটুকু সে দাবি করার সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি। এই নিষ্ক্রিয়তা ও ভীরুতা একজন নারীর নিম্নবর্গীয়তাকেই প্রমাণ করেছে।

ক্ষমতার সম্পর্কের একদিকে আধিপত্য থাকলে তার অপর প্রান্তে অবশ্যই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। কিন্তু সামগ্রিক আলোচনায় দেখা গেল পরিস্থিতি ও ক্ষমতার প্রাবল্যের কাছে প্রতিরোধ কেন, কোনো প্রতিবাদ স্বরূপ প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত লক্ষ করা যায়নি। নিম্নবর্গের এই একান্ত অনুগত জীব হয়ে দৈনন্দিন অধীন জীবনযাপন নিম্নবর্গের নিম্নবর্গীয়তাকে যেমন স্পষ্ট করে তেমনই এই নিষ্ক্রিয়, ভীরুতা ও প্রতিবাদহীনতাই একটা সময় পরোক্ষভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতেও সাহায্য করেছে।

৫.৫ নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ব্যর্থতার আখ্যান

প্রভুত্বের বিরুদ্ধে অধীনস্তরা বহুকাল থেকেই প্রতিবাদ করে এসেছে। সেই প্রতিবাদের চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে যে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে তার সর্বাঙ্গীণ রূপ দেখতে পাওয়া যায় ইতিহাসে ঘটে যাওয়া কৃষক বিদ্রোহে। কিন্তু সেই বিদ্রোহগুলি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কারণ উচ্চবর্গের ক্ষমতার দৃষ্টিতে তথাকথিত নিম্নবর্গের ঐক্যবোধ ও সম্মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্য ধরা পড়ে না। উচ্চবর্গ ধরে নেয় যে, নিম্নবর্গের একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মধ্যে কোনো নিজস্বতা নেই। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.৪১) সুতরাং প্রতিরোধকে আটকাতে তারা পরিস্থিতিভেদে নানা কৌশলে দমননীতির প্রয়োগ করে। সেই দমননীতিতে উচ্চবর্গ কখনো আইনের, কখনো প্ররোচনা বা ষড়যন্ত্রের, আবার কখনো বাহুবলের সাহায্য নেয়, যা নিম্নবর্গ কখনোই পায় না। ফলে নিম্নবর্গের প্রতিরোধ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। সমালোচক ডেভিড আর্নল্ড তাঁর 'Gramsci and Peasant Subalternity in India' প্রবন্ধে কৃষক বিদ্রোহের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে আন্তনিও গ্রামশির বক্তব্যকে সামনে রেখে মন্তব্য করেন যে,

'He saw little evidence of autonomy in peasant movements, both in the specipic sense of their failure to generate their own leadership and organization and to formulate their own demands effectively, and in the broader sense of being unable to mount an ideological and political assault capable of overthrowing the domination and hegemony of the ruling classes. 'Subaltern groups', we are

reminded, 'are always' subject to the authority of ruling groups, even when they rebel up and rise up.' (Chaturvedi (ed.)2000, p. 34)

অর্থাৎ গ্রামশি কৃষক আন্দোলনের মধ্যে স্বায়ত্ত্ব শাসনের প্রমাণ হিসেবে দেখেছেন, যে কৃষকরা নিজস্ব নেতৃত্ব ও সংগঠন তৈরি উভয় ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার অনুভূতির সঙ্গে তাদের দাবি কার্যকর করে। ফলে এই অক্ষমতার সঙ্গেই তারা একটি আদর্শিক ও রাজনৈতিক শাসকশ্রেণির প্রতি আক্রমণ করে যাকে শাসকশ্রেণি ক্ষমতা ও আধিপত্য দ্বারা উৎখাত করতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে গ্রামশি মনে করিয়ে দেন যে, নিম্নবর্গ যতই প্রতিরোধ বা বিদ্রোহ করুক, সেই মুহূর্তেও নিম্নবর্গ সর্বদা শাসকগোষ্ঠীর কর্তৃত্বের অধীনেই থাকে। ফলে কৃষক তথা নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রথম খণ্ডে রণজিৎ গুহ তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর 'On Some Aspects Of the Historiography of Colonial India'-প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক কালখণ্ডে ঘটে যাওয়া কৃষক বিদ্রোহের প্রসঙ্গ এনেছেন বারবার। ইতিহাস ও কৃষক বিদ্রোহের নানা দলিল দস্তাবেজের সাহায্যে তিনি প্রতিটি বিদ্রোহের চরিত্র অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছেন বিদ্রোহের ঐতিহ্যই নিম্নবর্গের রাজনীতির একটি ধ্রুব উপাদান। (Guha (ed.) 1982, p. 12) রণজিৎ গুহের এই বক্তব্যের প্রসঙ্গে সমালোচক পার্থ চট্টোপাধ্যায় কৃষক বিদ্রোহের ব্যর্থতার সম্পর্কে জানান,

> 'Imbricated with this was another sets of relationships in which hierarchy was based on direct and explicit domination and subordination of less powerful through both ideological-symbolic means and physical force. The semiotics of domination and subordination were what the subaltern classes sought to destroy everytime they rose up in rebellion.' (Schwarz (eds.) 2005, p. 474)

অর্থাৎ আধিপত্য ও অধীনতা ক্ষমতার এমন দুটি বর্গ যা প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্বাণুক অবস্থানে অবস্থিত। সুতরাং নিম্নবর্গীয় চেতনায় যদি প্রতিরোধী সত্তা একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে তাহলে এর বাইনারি অবস্থানে উচ্চবর্গীয় রাজনৈতিক চেতনায় সেই প্রতিরোধকে যে কোনো উপায়ে ধ্বংস করার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তাই রণজিৎ গুহ কৃষক বিদ্রোহের চরিত্র বিশ্লেষণে দেখেছেন,

> '... উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মধ্যে প্রভুত্ব ও অধীনতার অতি প্রাচীন সম্পর্ক এবং প্রভুর বিরুদ্ধে অধীনের বহুকালব্যাপী, যদিও ব্যর্থ, প্রতিবাদ।' (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ৪১)

হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে বিশেষ করে জলপুত্র, দহনকাল, মোহনা ও রামগোলাম উপন্যাসে আমরা নিম্নবর্গের শ্রেণিচেতনা ও প্রতিবাদ স্বরূপ প্রতিরোধ গড়ে ওঠার পাশাপাশি তা প্রতিবার ব্যর্থ হতে দেখেছি।

'জলপুত্র' উপন্যাসে যখন গঙ্গাপদর ঐকান্তিক চেষ্টায় জেলে জীবনে অধিকার চেতনা জাগরণের মধ্য দিয়ে পরিবর্তনের বাঁক এসেছে, যখন জেলেদের পরস্পর সহযোগিতায় শুক্কুর ও শশিভূষণের দেওয়া

ঋণের ওপর নির্ভরতা থেকে মুক্তির পথ খোঁজার চেষ্টা চলছিল, ঠিক তখনই জেলেদের এই পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করার জন্য দাদনদারদের চেতনায় জেলেদের ‘উচিত শাস্তি’ দেওয়ার কথা মনে হয়েছে। তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সমুদ্রে জেলেদের মাছ ধরার স্থানে নিজেদের ভাড়া করা মুসলমান জেলেদের দ্বারা জাল পাতিয়েছে। জেলেদের ভাতে মারার উদ্দেশ্যে যে তাদের এই পরিকল্পনা তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু জেলেরা সমবেত হয়ে এই অন্যায়ের প্রতিরোধ স্বরূপ যখন শুক্কুর ও শশিভূষণকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন জেলেদেরই একজন অর্থাৎ বিজন বহদ্দারের ঘনিষ্ঠ পাউন্যা গোপাল জলদাস জেলেদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। সে জেলেদের গোপন পরিকল্পনার কথা দাদনদারদের জানিয়ে দেয়। শশিভূষণের কথায়,

> ‘জাইল্যা অইলে কি অইবো। আস্ত মীরজাফর। জাইল্যা অলর বিয়াগ গোপন কথা, পরিকল্পনা এই গোয়াইল্যাই আঁরারে সাপ্লাই দিএ। ইতে আঁরার মানুষ। আঁরার কিনা গোলাম।’ (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১১৩)

অর্থাৎ অর্থের লোভে গোপাল দাদনদারদের কাছে বিকিয়ে গিয়েছে। তার কাছে শ্রেণিস্বার্থের থেকে নিজের স্বার্থ বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। সকল গোপন কথা রাতের আধারে সে তাদের জানিয়ে আসে আর বিনিময়ে অর্থ পায় সে। যে রাতে জেলেরা মিলে শুক্কুর-শশিভূষণকে মারার পরিকল্পনা করেছে, তার খবর সেই রাতেই গোপাল তাদের কাছে পৌঁছে দেয়।

> ‘খবর সাংঘাতিক। কালিয়া তোঁয়ারার সর্বনাশ অইবো। জাইল্যা অলে ক্ষেপি গেইয়ে গই। গঙ্গা বিয়াগ্‌গুনেরে জাগাই তুইল্যে। একজোট গইয্যে। কালিয়া গঙ্গা বিয়াগ জাইল্যারে লই দইজ্যার মাঝে তোঁয়ারার উঅর ঝাঁপাই পড়িবো।’
> (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১২৪)

জেলেদের এই ধরনের পদক্ষেপের কথা শুনে শুক্কুর প্রাণের ভয়ে সংকুচিত হয়ে গেলেও শশিভূষণ ঠাণ্ডা মাথায় এর থেকে মুক্তির উপায় খোঁজে। একটা সময় সে সিদ্ধান্ত নেয়, প্রতিরোধের মাথাকেই সরিয়ে দেওয়ার। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই রাতেই তারা গঙ্গাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। পরদিন সকালে গঙ্গার মৃত্যুর খবর জেলেপাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

এই পুরো ঘটনায় লক্ষণীয়, উচ্চবর্গের প্রতিভূ শুক্কুর ও শশিভূষণ তাদের ক্ষমতার দৃষ্টিতে জেলেদের ঐক্যবোধ ও শ্রেণিচেতনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞাত হলেও বিশ্বাসঘাতক গোপাল মারফৎ জেলেদের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে যায়। তাই সেই প্রতিরোধকে আটকাতে তারা উচ্চবর্গের আধিপত্যের রাজনৈতিক কৌশলে গঙ্গাকে হত্যা করে জেলেদের প্রতিরোধের গতিমুখকে গঙ্গার মৃত্যুর দিকে ঘুরিয়ে দেয়।পলাতক শুক্কুর-শশিভূষণকে শাস্তি দিতে ব্যর্থ হলেও ক্ষোভে-দুঃখে তারা তাদের খামারে আগুন লাগায়। কিন্তু জেলেদের প্রতিশোধস্পৃহা স্তিমিত হয় না। কারণ তাদের বিশ্বাস, যে গঙ্গাপদ

জেলেদের অধিকার নিয়ে লড়াই শুরু করেছিল তাকে সম্পূর্ণ করবে গঙ্গার অনাগত সন্তান বনমালী। এই ভরসায় তারা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আবার 'দহনকাল' উপন্যাসে পাক সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের জেলেরা দৈনন্দিন অত্যাচার-নিপীড়নে বিপর্যস্ত হওয়ার ফলে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। রাধেশ্যাম দা দিয়ে আনসারির মাথা বরাবর আঘাত করলে তার মৃত্যু হয়। এরপর চারিদিক থেকে জেলেদের হঠাৎ আক্রমণে পাক সৈন্যের দলটি পথ না পেয়ে পালিয়ে যায়।

এ পর্যন্ত ঘটনায় আপাতভাবে মনে হতে পারে, জেলেদের প্রতিরোধ সফল হয়েছে। তবে তা সাময়িক। কয়েকজন পাক সৈন্যকে আক্রমণ করে জেলেরা অজান্তেই পাকসৈন্য বাহিনীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িয়ে পড়েছে। আনসারির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রতিশোধ সম্পূর্ণ হলেও তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল পাক সৈন্যের কবল থেকে মুক্তি। কিন্তু পরদিন সকালে এর ফল স্বরূপ দেখা গেল, মেজর গিলানী তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে জেলেপাড়ায় ধ্বংসলীলা চালিয়েছে।

'জেলেপাড়া ঘিরে ফেলার আগে মেজর গিলানী সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলেছিল—প্রথমে আনসারির দলটিকে খুঁজে বার কর; তারপর আগুন লাগাও, হত্যা কর। আমি পোড়া মাটি চাই, একজন লোকও যাতে জীবিত না থাকে। কুকুর-বেড়ালকেও ছাড়বে না। ও গুলোকেও গুলি করবে।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৯৫)

আসলে বন্দুক ও মানুষের দ্বন্দ্বে যে বন্দুকেরই জয় হয়—এ কথা বলাই বাহুল্য। তাই রাধানাথরা সম্মিলিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুললেও সশস্ত্র পাক সৈন্যের কাছে তারা নির্বিচারে প্রাণ হারায়। উপন্যাসের শেষে তাই দেখা যায়,

'রোদে-আগুনে জেলেপাড়া ছারখার। জেলেপাড়ার অধিকাংশ ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দু'একটি ঘর এখনো জ্বলছে।..চারিদিকে ভয়ংকর ভুতুড়ে পরিবেশ, শ্মশানের নিস্তব্ধতা।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৯৫)

দেখা গেল, রাধানাথের বাড়িতে তিনটি নারকেল গাছের সঙ্গে বাঁধা রাধানাথ, নিকুঞ্জ ও ইমাম খবিরুদ্দিনের লাশ। উঠোনে চন্দ্রকলার মৃতদেহ। কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে বসুমতী, হরিদাস ও ইন্দ্রবালা। আমরা উপন্যাসে জেনেছি, পাক সরকার সৈন্যদের পূর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ধ্বংস করতে। আর এই কাজটি সহজ নয় বুঝতে পেরে মেজর গিলানী কিছু বাঙালি বিশ্বাসঘাতককে পাশে চেয়েছিলেন যারা মানুষের মধ্যে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের গোপনীয়তা প্রকাশ করবে। তাই সে ক্যাপ্টেন ইকবালকে আদেশ দিয়েছিল,

'... হামে কুছ মীরজাফর বাঙ্গালিয়োঁ কি জরুরত হ্যায়। ঢুন্ডো—ইস গাঁওমে মীরজাফর কিতনে হ্যায়। মীরজাফরকে লিডার কো পকড় লে আও।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৪৩)

মীরজাফরকে খুঁজে বার করার আগেই আশ্চর্যজনকভাবে মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক আব্দুল খালেক তার দলবল নিয়ে মেজরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। গিলানী খালেকের সাহায্যে রাজাকার বাহিনী গঠন করে এলাকায় ভীতি সৃষ্টি করিয়েছে। 'জলপুত্র' উপন্যাসের গোপালের মতোই আলোচ্য উপন্যাসের রাজাকাররা নিজ জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। পাক সৈন্যের ক্ষমতার জোরে নিজেদের মানুষকেই বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে বারবার। বিশ্বাসঘাতকতার কারণে প্রভুশক্তি আরো বেশি শক্তিশালী ও অধীনস্তরা আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সবল-দুর্বলের লড়াইয়ে জেলেদের পরাজয় ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে।

একইভাবে 'মোহনা' উপন্যাসে পালরাজা রামপালের আক্রমণের বিরুদ্ধে কৈবর্ত রাজ্যের তথাকথিত নিম্নবর্গীয় প্রজারা রাজা দিব্যোকের আমল থেকে রাজা ভীমসেনের আমল পর্যন্ত তাদের নেতৃত্বে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছে। প্রতিবারই পাল রাজারা কৈবর্তদের তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু ভীমের পালিত পুত্র চণ্ডকের সেনানায়কত্বে ভীম রামপালের কাছে পরাজিত হয়েছে। কৈবর্তদের সম্মিলিত প্রয়াস ও প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার পেছনে রয়েছে চণ্ডকের বিশ্বাসঘাতকতা। আর এই বিশ্বাসঘাতকতার কারণ তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতার লোভ। আমরা জানি, ভীম একদিন চণ্ডককে রাস্তা থেকে তুলে এনে রাজপরিবারের সদস্য ও পুত্র রূপে লালন করেছিলেন। কিন্তু চণ্ডকের মনে হয়েছে তার বীরত্বকে ভীম কেবল তার রাজ্য সুরক্ষিত করার জন্য কাজে লাগিয়েছে, পরিবর্তে তাকে প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা দেননি। চণ্ডকের মনের এই ক্ষোভের কথা টের পান রামপাল। ফলে উচ্চবর্গের রাজনৈতিক কৌশলে তিনি চণ্ডকের এই ক্ষোভকে নিজ স্বার্থে কাজে লাগাতে চেয়েছেন। তাই তো রামপাল তার দূত অনোমদর্শীকে চণ্ডকের কাছে পাঠান এই বার্তা দিয়ে,

> '..রাজা রামপাল আপনার বীরত্বে মুগ্ধ। শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হিসেবে আপনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে তাঁর। আপনি যদি তাঁকে সহযোগিতা করেন, আপনাকে তিনি তাঁর বাহিনীর প্রধান সমরনায়ক করবেন। প্রধান সেনাপতির মানমর্যাদা আর ক্ষমতার কথা আপনার অজানা নয়।' (জলদাস ২০১৩, পৃ. ১০৭)

প্রাথমিকভাবে চণ্ডক এই প্রস্তাবে সমর্থন না জানালেও তার মনের সুপ্ত লোভ ও আকাঙ্ক্ষা তাকে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করেছে। রামপালের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে তাই সে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমের হাতির চোখে খড়্গ দিয়ে আঘাত করে। যন্ত্রণায় কাতর হাতিটি উন্মত্ত হয়ে পালরাজাদের চক্রব্যূহে ঢুকে পড়লে রাজা ভীমসেন পালদের কাছে বন্দি হয়ে পড়ে। রাজার করুণ পরিণতিতে কৈবর্ত বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয় এবং চণ্ডকের বিশ্বাসঘাতকতায় কৈবর্তদের প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়ে যায়।

'রামগোলাম' উপন্যাসেও মেথরসমাজকে একইভাবে কর্পোরেশনের বড়োবাবু আবদুস ছালামের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দেখা গিয়েছে। কারণ মেথরদের জন্য সংরক্ষিত চাকরি তিনি সমাজের অন্যান্যদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে চেয়েছেন। অস্তিত্বের সংকটে মেথররা ঐক্যবদ্ধ হলে আবদুস ছালাম তাদের ঐক্যে ভাঙন ধরিয়েছেন। এর জন্য তিনি টাকার লোভ দেখিয়ে মেথরসমাজের যোগেশকে নিজের দলে টানতে সক্ষম হয়েছেন। আলোচ্য উপন্যাসে তাই যোগেশকে বড়োবাবুর তোষামোদ করতে দেখা গিয়েছে। গঙ্গাপদ, চণ্ডকের মতো সেও তার শ্রেণিস্বার্থ থেকে নিজ স্বার্থকে বড়ো করে দেখেছে। তাইতো কার্তিকের মুখে তার প্রতি ক্ষোভ উগরে দিতে দেখেছি,

'তুমি ছালাম সাহেবের দালালি করছ। আমাদের পেটে লাথি দেয়ার দলে ভিড়েছ। তুমি হরিজন-সমাজের বিভীষণ।'

(জলদাস ২০১২, পৃ. ৩৪)

আমরা লক্ষ করলাম উচ্চবর্গের প্রতিভূ আবদুস ছালাম মেথরদের প্রতিরোধকে ঠেকাতে মেথরদেরই একজনকে (যোগেশ) অর্থ দিয়ে কেনা গোলামে পরিণত করেছেন। যোগেশকে যেমন তিনি মেথরদের পরিকল্পনা জানতে ব্যবহার করেছেন, তেমনই ধর্মঘটকে উৎখাত করতে যোগেশকেই খুন করিয়েছেন যাতে সেই খুনের অভিযোগ তিনি প্রতিরোধের প্রতিনিধি রামগোলাম ও কার্তিকের ওপর চাপাতে পারেন। এক্ষেত্রে আবদুস ছালাম আইনের সাহায্য নিয়ে রামগোলাম ও কার্তিককে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন মিথ্যে সাক্ষীর মাধ্যমে। অনুগত হেডক্লার্ক ও পিয়নকে আবদুস ছালাম মিথ্যে সাক্ষীর জন্য কাজে লাগিয়েছেন। পিওন ইকবাল তাই পুলিশের কাছে মিথ্যে বলে,

'হুজুর, আমার নিজের চোখে দেখা—রামগোলাম যোগেশের গলা চিপে ধরেছে আর কার্তিক পেছন থেকে বেলচা দিয়ে এক বাড়ি। ও মারে বলে যোগেশ মাটিতে পড়ে গেল।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৯০)

দুবছর সেই খুনের মামলা চলার পর কার্তিকের মৃত্যুদণ্ড ও রামগোলামের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। দেখা গেল, যে দুজন প্রতি মুহূর্তে শ্রেণিস্বার্থে ও অধিকারবোধে মেথরসমাজকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছে, প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে—তাদের খুব সহজেই আবদুস ছালাম কৌশলে সরিয়ে দিয়েছে। সুতরাং নেতৃত্বের অভাবে মেথরদের ধর্মঘট করার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাই আবদুস ছালাম অন্যান্য জাতের মানুষদের মেথরের কাজে নিযুক্ত করেছে। ফলে মেথরদের জীবন পুনরায় অর্থনৈতিক সংকট ও বঞ্চনায় দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য চারটি উপন্যাসে বর্ণিত তথাকথিত নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ব্যর্থতার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই সাযুজ্য রয়েছে। যেমন,

এক. প্রতিটি প্রতিরোধের স্থান, কাল, পাত্র, ঘটনা, উদ্দেশ্য ও সামাজিক পরিচয় ভিন্ন হলেও তা ব্যর্থ হয়েছে মূলত কোনো একজন বিশেষ ব্যক্তির স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কারণে। উদাহরণ স্বরূপ বিশ্বাসঘাতক হিসেবে দেখলাম 'জলপুত্র'-এর গোপাল জলদাস, 'দহনকাল'-এর রাজাকার, 'মোহনা'-র চণ্ডক ও 'রামগোলাম'-এর যোগেশকে।

দুই. প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রতিরোধের উদ্দেশ্য আধিপত্য থেকে মুক্তি পাওয়া হলেও প্রতিশোধস্পৃহাই শেষ পর্যন্ত তথাকথিত নিম্নবর্গের প্রতিরোধের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও এই প্রতিশোধস্পৃহার দৃশ্যটি কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট।

তিন. প্রতি ক্ষেত্রেই তথাকথিত নিম্নবর্গের ঐক্যবোধ ও শ্রেণিচেতনার প্রতি উচ্চবর্গের উদাসীনতাই তাদের প্রতিরোধের পরিকল্পনার কারণ। এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, নিম্নবর্গের চেতনায় প্রতিবাদ যদি একটি লক্ষণ হয়, তাহলে এর বিপরীতে উচ্চবর্গীয় চেতনার বৈশিষ্ট্য হল, যেকোনো উপায়ে প্রতিরোধ দমন করা। তাইতো আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে উচ্চবর্গের প্রতিভূরা কখনো বলপ্রয়োগ করে, কখনো আইনের সাহায্য নিয়ে প্রতিরোধকে দমন করেছে।

চার. সর্বোপরি, প্রতিটি প্রতিরোধের ব্যর্থতার পেছনে রয়েছে নিম্নবর্গের সংহতির অভাব, সীমিত শক্তি ও বুদ্ধি। কারণ সংহতির অভাবেই নিম্নবর্গের মধ্য থেকেই বিশ্বাসঘাতকের জন্ম হয়েছে। আর উচ্চবর্গ নিম্নবর্গের নিত্য অভাব ও দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়েছে খুব সহজেই।

আলোচ্য উপন্যাসগুলির নিরিখে নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের উপরিউক্ত চরিত্র ও ব্যর্থতার কারণগুলি দেখানোর পাশাপাশি মনে পড়ে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এ সমালোচিত বিদ্রোহী কৃষকচেতনার কথা। কারণ কৃষক বিদ্রোহগুলির ব্যর্থতার পেছনে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক-সমালোচকরা যে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছেন, তা কথাবিশ্বে বর্ণিত নিম্নবর্গীয় প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ব্যাখ্যায় খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। সমালোচক পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের কৃষক বিদ্রোহের সমালোচনার অনুষঙ্গে কৃষকদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ব্যর্থতাকেও অনুধাবন করেছেন। তাঁর মতে সংহতির অভাবই কৃষকদের বিদ্রোহের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। তবে এই কারণটি শুধু কৃষকই নয়, তথা সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের প্রতিরোধের ব্যর্থতার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। তিনি উচ্চবর্গীয় রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক চেতনার পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বলেন,

> 'The process is quite the opposite in the consciousness of a rebellious peasantry. There solidarities do not grow because individual feel they can come together with others on the basis of their common individual interests : on the contrary, individuals are enjoined to act with in a collectivity because, it

is believed, bonds of solidarity that tie them together already exist. Collective action does not flow from a contract among individuals; rather, individual identities themselves are derived from membership in a community.' (Chaturvedi (ed.) 2000, p.14)

৫.৬ সারাংশ

উচ্চবর্গের রাজনীতিতে সংহতি গড়ে ওঠে একটি সমষ্টিগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যার দ্বারা ব্যক্তিরা সর্বজনীন স্বার্থের ভিত্তিতে একজোট বা একত্রিত হয়। কিন্তু বিদ্রোহী কৃষকের চেতনায় প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে সংহতি বৃদ্ধি পায় না কারণ ব্যক্তি মনে করে যে, তারা তাদের সর্বজনীন ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তিতে অন্যান্যদের সঙ্গে একত্রিত হয় এবং বিপরীতে ব্যক্তিকে একটি দলের মধ্যে থেকে কাজ করার নির্দেশ দেয়। কারণ এটা বিশ্বাস করা হয় যে, সংহতির বন্ধন তাদের বেঁধে রেখেছে। আসলে সম্মিলিত পদক্ষেপ ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো পরিকল্পনা বা চুক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয় না, বরং সংহতি একটি সম্প্রদায়ের সদস্যপদ থেকে উদ্ভূত হয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করে।

আমরা তাই দেখলাম, এই সংহতির অভাবেই 'জলপুত্র' উপন্যাসে গঙ্গাপদ দ্বারা গড়ে তোলা প্রতিরোধে ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তিতে জেলেরা অন্যান্যদের সঙ্গে একত্রিত হলেও গঙ্গার নির্দেশ থাকে একটি দলের মধ্যে থেকে শুক্কুর-শশিভূষণদের বিরুদ্ধে আঘাত হানার। কারণ গঙ্গা বিশ্বাস করেছিল সংহতির বন্ধন জেলেদের একত্রিত করেছে। কিন্তু ব্যক্তি গোপাল জলদাস গঙ্গার এই নির্দেশকে মনে থেকে মেনে নেয়নি বলেই একই শ্রেণিভুক্ত হওয়ার ফলে তাকে চুপ থেকে সংহতির বন্ধনের বিশ্বাসকে অটুট রাখতে হয়েছে। তাইতো সে জেলেদের দলের মধ্যে থেকে শুক্কুর-শশিভূষণের কাছে জেলেদের গোপন পরিকল্পনা ফাঁস করেছে। ফলে খুব সহজেই শুক্কুর-শশিভূষণ গঙ্গাকে হত্যা করার মাধ্যমে জেলেদের প্রতিরোধকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। একইভাবে 'মোহনা' উপন্যাসে চণ্ডকের মধ্যেও শ্রেণিস্বার্থের থেকে ব্যক্তিস্বার্থ বড়ো হয়ে উঠেছে বলেই সে রামপালের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ভীমকে পরাজিত করে। যার ফলে কৈবর্তরা পালদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়। 'দহনকাল' উপন্যাসেও বাঙালি হয়ে আব্দুল খালেক পাক-সৈন্যদের রাজাকার বাহিনী গঠনে সাহায্য করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আবার 'রামগোলাম'-এ যোগেশ বড়োবাবুর কেনা গোলাম হয়ে মেথরদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যা আসলে সংহতির অভাবকেই প্রমাণ করে। অর্থাৎ 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এ আলোচিত কৃষক বিদ্রোহের নিরিখে উঠে আসা কৃষকের বিদ্রোহী চেতনার নেতিবাচকতা আসলে যে শুধু কৃষকই নয়, সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তা আমরা হরিশংকর জলদাসের আলোচ্য কথাবিশ্বের নিরিখেও অনুধাবন করলাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হরিশংকর জলদাসের আখ্যানবিশ্ব ও নিম্নবর্গীয় চেতনা : সম্পর্কের সন্ধানে

৬. সূচনা

৬.১ হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে নিম্নবর্গ : ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

৬.২ উচ্চবর্গের 'অপর' হিসেবে নিম্নবর্গের নির্মাণ

৬.৩ উচ্চবর্গের রাজনীতি ও নিম্নবর্গের রাজনীতি : দুটি স্বতন্ত্র ধারা

৬.৪ হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্ব : নিম্নবর্গীয় চেতনার নিরিখে

৬.৪.১ নিম্নবর্গের প্রগতিশীল চেতনা

৬.৪.২ নিম্নবর্গের কুসংস্কার ও অদৃষ্টে বিশ্বাস

৬.৪.৩ নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনা

৬.৫ সারাংশ ও সিদ্ধান্ত

৬. সূচনা

একজন ঐতিহাসিক যেভাবে নিম্নবর্গকে আবিষ্কার করবেন, একজন সাহিত্যিক হিসাবে নিম্নবর্গের আবিষ্কার কিন্তু সেরূপ হবে না। এর মূল কারণ দৃষ্টিভঙ্গিগত তফাৎ। এই ভাবনা আমাদের বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভ তৈরির ওপর ক্রিয়াশীল। আমরা আলোচ্য অধ্যায়ে অন্বেষণ করেছি নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাকারীরা নিম্নবর্গকে যেভাবে দেখেছেন, একজন সাহিত্যিক হিসাবে হরিশংকর জলদাস তাঁর আখ্যানে নিম্নবর্গকে সেভাবে দেখছেন কি না, বা নিম্নবর্গ নিয়ে তাঁর আখ্যানে নতুন কোনো দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা গিয়েছে কি না। মূলত সমালোচকদের আবিষ্কৃত নিম্নবর্গীয় চেতনার সঙ্গে হরিশংকর জলদাস-এর কথাসাহিত্যের সম্পর্ক সন্ধান করাই আলোচ্য অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

লক্ষণীয় 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রথম চারটি খণ্ডে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের পটভূমিতে কৃষক বিদ্রোহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনার যাবতীয় দলিল, দস্তাবেজের নিরিখে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকেরা নিম্নবর্গের স্বকীয়-স্বতন্ত্র স্বরকে অন্বেষণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নিম্নবর্গের ইতিহাসের আলোচনার একটি উল্লেখযোগ্য বাঁক সৃষ্টি হয়েছে পঞ্চম-খণ্ড ও তার পরবর্তী সমালোচনাগুলি প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এই পর্যায়ে এসে ঐতিহাসিক-গবেষকেরা অনুধাবন করতে পারলেন যে, শুধুমাত্র ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজের গবেষণা থেকে নিম্নবর্গীয় চেতনার বিশুদ্ধ রূপের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ নিম্নবর্গের ইতিহাস আংশিক ও অসম্পূর্ণ। নিম্নবর্গের ইতিহাস যে ক্ষমতাশীল ও ক্ষমতাহীন নানা শ্রেণিচেতনার বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণ—এই বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকার করা হল। ফলে নিম্নবর্গের আসল বৈশিষ্ট্য কী—এই প্রশ্নটি পূর্ববর্তী আলোচনায় যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, পরবর্তীকালের আলোচনায় সেই প্রশ্নটি হয়ে দাঁড়াল এই যে, ইতিহাসে উচ্চবর্গের বিপরীতে অপর হিসেবে নিম্নবর্গকে কীভাবে প্রদর্শিত ও প্রতিনিধিত্ব করানো হয়। সুতরাং প্রশ্ন পরিবর্তনের ফলে নিম্নবর্গের ইতিহাসকে পুনর্মূল্যায়ন করার নব দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন দেখা দিল। এই প্রসঙ্গে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক প্রশ্ন তুললেন,

> '...ইতিহাস রচনার প্রতিটি উপাদানই যখন দেখিয়ে দিচ্ছে যে নিম্নবর্গ মানেই 'কোনো এক আদর্শ থেকে বিচ্যুতি', তখন নিম্নবর্গের ঐতিহাসিককে অত ঘটা করে বিশুদ্ধ কৃষকচৈতন্য অথবা একান্তভাবে স্বতন্ত্র নিম্নবর্গের রাজনীতির স্লোগান আওড়াতে হচ্ছে কেন?... ঐতিহাসিকের লেখার ভেতর দিয়ে নিম্নবর্গ তার নিজের কথা বলবে, এটা তো নিতান্তই গল্পকথা। ...আসলে তো ঐতিহাসিক নিম্নবর্গের প্রতিনিধিত্ব করছেন মাত্র। নিম্নবর্গকে ইতিহাসের পাতায় উপস্থিত করছেন। নিম্নবর্গ তার নিজের কথা কখনোই বলতে পারে না।' (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ১৬-১৭)

তাঁর মতে, নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের উচিত উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গের নির্মাণ করার কৌশলগুলির অনুসন্ধান করা। কারণ ইতিহাসের শত-সহস্র কণ্ঠস্বরের মাঝে শুধুমাত্র নিম্নবর্গের স্বকীয় কণ্ঠস্বরকে চিহ্নিত করা বৃথা। আসলে ঐতিহাসিক আমাদের সামনে নিম্নবর্গকে যেভাবেই তুলে আনুন না কেন, তা আসলে নিম্নবর্গের নিজের কথা তো নয়, অন্যের দ্বারা নির্মিত বা আরোপিত কথা। তাই নিম্নবর্গকে কীভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে, তার সামাজিক পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে সেই প্রক্রিয়াগুলো আবিষ্কার করাই একজন ঐতিহাসিকের প্রধান কর্তব্য।

এক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক জহর সেনমজুমদার অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মন্তব্য করেন, স্পিভাক যে উপরিউক্ত ঐতিহাসিককে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনা করার জন্য চাইছেন, বাস্তবে সেই নিরপেক্ষ, দিকনির্ণয়ী ঐতিহাসিকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তিনি সেক্ষেত্রে প্রশ্ন তোলেন, 'অপর' হিসেবে নিম্নবর্গের নির্মাণের প্রক্রিয়াটির অনুসন্ধানের বাস্তব প্রত্যাশা কেবল একজন ঐতিহাসিকের কাছ থেকেই কেন করলেন স্পিভাক? সেই বাস্তব প্রত্যাশা তো তিনি একজন সাহিত্য স্রষ্টার কাছ থেকেও করতে পারতেন। কারণ একজন সাহিত্যিকও ঐতিহাসিকের মতোই গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজ-বাস্তবতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নিরপেক্ষভাবে সাহিত্য রচনা করেন। যদিও এক্ষেত্রে বলতে হয়, একজন ইতিহাস রচয়িতা এবং একজন সাহিত্য স্রষ্টা উভয়ই সামাজিক মানুষ। কিন্তু একজন ঐতিহাসিক যখন ইতিহাস লিখতে বসেন তখন তাঁর নিজস্ব কিছু দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করলেও, তিনি আশ্রয় নেন বহু প্রামাণ্য তথ্য, সত্য ও তত্ত্বের। কিন্তু একজন সাহিত্য স্রষ্টার সে দায় থাকে না। কারণ একজন সাহিত্যিক তাঁর ব্যক্তিভাব ও অভিজ্ঞতা থেকে লেখা শুরু করলেও ঐতিহাসিকের মতো তথ্য, সত্য ও তত্ত্বকে সর্বদা গুরুত্ব দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকে না। (সেনমজুমদার ২০০৭, পৃ. ৩৫) স্পিভাক বলেছেন নিম্নবর্গ তার নিজের কথা নিজে কখনো বলতে পারে না। কারণ ইতিহাসে নিম্নবর্গের নির্মাণ হয়েছে একজন ঐতিহাসিক দ্বারা, যা অন্যের নির্মাণ। এক্ষেত্রে একজন ঐতিহাসিক নিম্নবর্গের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন মাত্র। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে একজন সাহিত্যিকের সাহিত্যে নিম্নবর্গের নির্মাণও সেই হিসেবে অন্যের নির্মাণই বটে। তাইতো জহর সেনমজুমদার প্রশ্ন তোলেন,

> 'নিম্নবর্গের নিজস্ব কণ্ঠস্বর শুনবার জন্য কিংবা নিম্নবর্গের সঠিক সামাজিক অবস্থানজাত ইতিহাস জানবার জন্য বিশেষ ব্যক্তিসংগঠিত ইতিহাসবিদ্যা নয়, নির্বিশেষে সাহিত্যই কি ভীষণভাবে ভরসা হয়ে উঠতে পারত না? তাহলে স্পিভাক বা রণজিৎ গুহ ইতিহাসবিদ্যা অপেক্ষা সাহিত্যকে কেন ইতিহাসের প্রতিরূপে সামনে রাখলেন না?'
>
> (সেনমজুমদার ২০০৭, পৃ. ৩৬)

তবে এ কথা ঠিক যে, ইতিহাসের মধ্যে যে বাস্তব সত্য উঠে আসে, তা অনেক ক্ষেত্রেই সাহিত্যে উঠে আসে না। কিন্তু স্পিভাক নিজেও নারীর সামাজিক অবস্থানকে পরিস্ফুট করে তাকে নিম্নবর্গের আওতায় প্রদর্শিত করার জন্য মহাশ্বেতা দেবীর 'স্তনদায়িনী', 'দ্রৌপদী', 'অরণ্যের অধিকার' প্রভৃতি গল্প-উপন্যাসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। প্রশ্ন আসে, কেন তিনি সাহিত্য সংরূপকে তাঁর আলোচনার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করলেন। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের সঙ্গে সাহিত্যিকের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে কিছুটা ইঙ্গিত গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর 'A Literary Representation of the Subaltern : Mahasweta Devi's 'Stanadayini''-প্রবন্ধে দিয়েছেন,

> That history deals with real events and literature with imagined one may now be seen as a difference between cases of historical and literary events will always be there as a differential moment in terms of what is called 'the effect of the real'. what is called history will always seem more real to us than what is called literature. ... and that historiography and literary pedagogy are disciplines.'
>
> (Guha (ed.) 1987, p.94-95)

অর্থাৎ ঐতিহাসিক ঘটনা ও সাহিত্যিক ঘটনার বিভাজন আসলে উভয়ক্ষেত্রেই গবেষণার দাবি করে। স্পিভাক তাই বলেন, মহাশ্বেতা দেবী তাঁর কল্পকাহিনিতে যা কিছু বলেন তা তিনি প্রথমে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গবেষণা করেন। 'স্তনদায়িনী'-র যশোদা, 'দ্রৌপদী' গল্পের দ্রৌপদী, 'অরণ্যের অধিকার'-এর বিরসা মুন্ডার সার্থকতা হল, চরিত্রগুলি সর্বজনগৃহীত একটি অনুমান দ্বারা কল্পিত ও পরীক্ষিত। একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক মুহূর্তেও চরিত্রগুলি নিম্নবর্গ রূপে বিদ্যমান থাকতে পারে।

কিন্তু একজন নিম্নবর্গের ইতিহাসকার একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত কল্পনা করেন যাতে রচিত ইতিহাসটি একটি সুসঙ্গত রূপ নিতে পারে। সেক্ষেত্রে একজন ঐতিহাসিকের কল্পনা বা অনুমানগুলি বাস্তব ঘটনার সঙ্গে খুব বেশি আলাদা হয় না। কিন্তু যারা সাহিত্য পড়েন বা লেখেন তারা নিম্নবর্গকে ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের চেয়ে বেশি মর্যাদা দেন। প্রকৃতপক্ষে মূল পার্থক্যটি হল এই যে, ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক যখন নিম্নবর্গকে তাদের রচনায় প্রদর্শিত করছেন তখন একজন সাহিত্যিক নিম্নবর্গকে 'অবজেক্ট' হিসেবে কল্পনা করেন এবং ঐতিহাসিক তাকে 'বাস্তব' বলে মনে করেন। স্পিভাকের ভাষায়,

> 'The difference is that the subaltern as object is supposed to be imagined in one case and real in another. I am suggesting that it is a bit of both in both cases. The writer acknowledges this by claiming to do reasearch… I hope it will be admitted that my brief is very different from saying that history is only literature. (Guha (ed.) 1987, p. 95-96)

স্পিভাক সাহিত্যের আকল্পের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের স্বরকে খোঁজার ইঙ্গিত দিলেও তাঁর উদ্দেশ্য গবেষণাধর্মী সাহিত্য। কারণ নিম্নবর্গের চেতনার প্রদর্শনের দিক থেকে ভাবলে সাহিত্যের মধ্যে থেকেও নতুন তাত্ত্বিক

দৃষ্টি উন্মোচনের সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্যই সেই সাহিত্যে ইতিহাসকে বহু দিক দিয়ে নয়, বরং নিম্নবর্গের সঙ্গে সামাজিক ইতিহাসের যুগস্থাপনের মধ্য দিয়ে পরস্পরের পরিপূরক ভাবে গড়ে তুলতে হবে। তবে একথাও ঠিক যে ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ থেকে নিম্নবর্গের ইতিহাস নির্মাতা নিম্নবর্গকে যতটা দেখতে পান, তার থেকে অনেক বেশি নিম্নবর্গকে ধরা যায় সাহিত্যের আকল্পের মধ্যে। তা যদি না হতো, তাহলে স্পিভাক মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য গবেষণার প্রসঙ্গ আনতেন না। শুধু স্পিভাক কেন, গৌতম ভদ্র তাঁর 'কথকতার নানা কথা' প্রবন্ধে প্রত্যক্ষভাবে লোককথা, প্রচলিত লোকসাহিত্য, পুরাণ, লোকগানের মাধ্যমে নিম্নবর্গের স্বর ও চেতনার সন্ধান করেছেন। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ১৯১-১৫১) আবার রণজিৎ গুহ-ও তাঁর 'একটি অসুরের কাহিনি' নামক প্রবন্ধের সূচনাই করেছেন ধর্মের বিশেষ রূপ মৌখিক লোককথার মধ্য দিয়ে ইতিহাস রচনার কথা বলে। যে সব তথ্য বা দলিল দস্তাবেজের ওপর নির্ভর করে ইতিহাস লেখা সম্ভব তার প্রাচীনতম সংকলন রয়েছে ধর্মে। আধিপত্য ও অধীনতা সম্পর্কের স্বরূপগুলি কর্তৃত্ব, সহযোগিতা আর প্রতিরোধের নিয়মে সেখানেই রয়েছে। এর মূলে রয়েছে কিছু ক্ষমতার বিধান; ইতিহাসে তার উচ্চারণ স্পষ্ট।

> 'ফলে ক্ষমতার প্রতি উচ্চবর্গ এবং নিম্নবর্গের যে মনোভাব তার এক পুঞ্জিভূত তথ্য সমগ্র গড়ে ওঠে। আর প্রকাশ আমরা দেখি কখনো পৌরাণিক কাহিনিতে, কখনো বা আচার অনুষ্ঠানে, আবার কখনো রীতিনীতিতে, অথবা বিশ্বাসের জগতে পূর্বোক্ত উপকরণসমূহের বিচিত্র যোগাযোগের বিভিন্ন উপন্যাসে।' (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ৬৭)

অর্থাৎ এক্ষেত্রে তিনি পৌরাণিক কাহিনির মধ্যে ইতিহাসের তথ্য সমগ্রের পূঞ্জিভূত হওয়াকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এবং 'রাহু' নামক পৌরাণিক অসুরের ছয়টি উপাখ্যানের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন কীভাবে পুরাণ কথার মধ্যে ক্ষমতার শৃঙ্খলায় প্রভুত্ব ও অধীনতার রূপকল্পটি লুকিয়ে আছে। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.৬৭-৮৫) দেখা যাচ্ছে, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক বা রণজিৎ গুহ নিম্নবর্গের নির্মাণ কৌশল বা পদ্ধতি অনুসন্ধানের জন্য একজন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের ওপর নির্ভর করলেও তারা নিজেরাই কিন্তু সাহিত্যের রূপকল্পের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের যোগসূত্রের কথা বলেছেন। সে ক্ষেত্রে স্পিভাক যদিও বিশেষভাবে গবেষণাধর্মী ও সাহিত্যের প্রসঙ্গ এনে একজন সাহিত্যিক দ্বারা নিম্নবর্গকে বেশি মর্যাদা দানের কথা বলেছেন। এই সূত্র ধরেই আমরা বলতে চাই যে একজন সাহিত্যিকের রচনার মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনার আকল্প যদি গবেষণাধর্মী হতে হয় তাহলে হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যের মধ্যেও আমরা স্পিভাক কথিত গবেষণাধর্মিতা লক্ষ করেছি। যে প্রসঙ্গ ও কারণে তিনি মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যকে নিম্নবর্গের

ইতিহাস সন্ধানের আকল্প হিসেবে বেছে নিয়েছেন সেই একই প্রসঙ্গ ও কারণে আমরাও আমাদের গবেষণায় হরিশংকরের কথাসাহিত্যকে নিম্নবর্গের ইতিহাসের আকল্প বা প্রতিকল্প হিসেবে গ্রহণ করেছি।

ইতিপূর্বে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকের যে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে সে হিসেবে হরিশংকর সর্বপ্রথম একজন জেলেসন্তান, তারপর তিনি একজন লেখক। একজন জেলেসমাজের ব্যক্তি যখন তাঁরই সমাজের কথা রচনা করেন, তখন তার থেকে প্রত্যক্ষ গবেষণা আর কী হতে পারে। যার সফল উদাহরণ 'জলপুত্র', 'দহনকাল', 'প্রস্থানের আগে' ও 'অর্ক' উপন্যাস। তাছাড়া জেলেসমাজ সম্পর্কিত ছোটোগল্পগুলিও রয়েছে। শুধু তাই নয়, নিষিদ্ধপল্লির পতিতাদের নিয়ে লেখা 'কসবি', মেথরসম্প্রদায় নিয়ে 'রামগোলাম', কৈবর্ত বিদ্রোহ নিয়ে রচিত 'মোহনা' উপন্যাসের পেছনেও যে লেখকের গভীর গবেষণা রয়েছে তা আমরা লেখকের জবানিতেই শুনে নিতে পারি। 'দহনকাল' উপন্যাস সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন,

> 'দহনকালের কাল হলো ১৯৫৩ থেকে ১৯৭১। ১৯৭১ আমার নিজের চোখে দেখা। ১৮ বছরের তরুণ তখন আমি। স্বাভাবিকভাবে '৭১-এর যুদ্ধকাল এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়ার মানুষও একাত্তরের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। তারাও ঠেকিয়েছিল পাঞ্জাবি সেনা আর রাজাকার-আলশামসদের। ওই ঘটনা আমি তুলে ধরেছি দহনকালে। দেখাতে চেয়েছি, জেলেদের মতো প্রান্তজনেরা মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।'(জলদাস ২০১৮, পৃ. ১৬০)

জেলেদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের বিষয়টির ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে তাঁর 'অর্ক' উপন্যাসটিও। শুধু জেলেরাই নয়, সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষেরাও যে এই যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল এবং পঙ্গু অবস্থায় ফিরে এসে এক রাজনৈতিক চক্রান্তে পথের ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছিল—সেই বাস্তব ঘটনাগুলির জলজ্যান্ত উদাহরণ হল-'সীমানা ছাড়িয়ে', 'থুতু', 'আহব ইদানিং', 'দইজ্যা বুইজ্যা', 'একজন জলদাসীর গল্প' প্রভৃতি গল্পগুলি। অন্যদিকে 'রামগোলাম' উপন্যাস সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য-

> 'কসবি লেখার আগেই রামগোলাম লেখার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু রামগোলাম লেখার তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি ছিল তখন। তাছাড়া আমার মনে হয়েছিল হরিজনদের সঙ্গে যে তিন বছর মিশলাম, তা উপন্যাস লেখার জন্য যথেষ্ট নয়। আরো বেশি তথ্যের জন্য, তাদের সঙ্গে আরো বেশি সময় নিয়ে মিশবার জন্য আমি অপেক্ষা করলাম। ... দীর্ঘ ৫-৬ বছর হরিজনদের সঙ্গে মেলামেশার পর একসময় আমার মনে হল—এখন লেখা যায়। তাই রামগোলাম লিখতে বসলাম।' (মুহাম্মদ ২০১৭, পৃ. ৫৫)

আবার 'মোহনা' উপন্যাস লেখার পেছনে লেখকের ভাবনা এরকম-

> '...ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার হাজারো সমস্যা। ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে অক্ষুন্ন রাখা, ঘটনাপরম্পরা ঠিক রাখা, সময়-সংলাপ-পটভূমি এসব দিকে কড়া নজর রাখা। মনে হলো, ঠিকঠাক মত প্রস্তুতি না নিয়েই উপন্যাস লিখতে বসেছি আমি।...শুরু করে দিলাম বঙ্গদেশের ইতিহাস বিষয়ে পাঠ নেওয়া।...

কিন্তু গবেষণা আর ফিকশন এক কথা নয়। উপন্যাসের জন্য ওই সম্প্রদায়ের বিষয়ে আরো গভীরতর জানা-শোনা দরকার। এই সময় আমার হাতে এল শঙ্কর দে (দেঁড়ে)-র সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জেলে কৈবর্ত আদি কলকাতার জেলেপাড়া, জেলেপাড়ার সঙ বইটি। বইটি আমার পড়াশোনাকে অনেক দূর এগিয়ে দিল। আমি পুনরায় মোহনা উপন্যাসটি লিখতে বসলাম।' (জলদাস ২০১৮, পৃ. ২১৩-১৪)

অন্যদিকে 'কসবি' উপন্যাস সম্পর্কে লেখককে এক সাক্ষাৎকারে যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে তিনি উপন্যাসের প্রয়োজনে পতিতাদের সম্পর্কে জানতে পতিতাপল্লিতে গিয়েছেন কি না? সেই প্রশ্নের উত্তরে লেখক বলেন,

'বিদেশের এবং ভিন্ন জেলার পতিতাপল্লীতে যাওয়া হয়নি আমার। তবে যে-পাড়াকে পটভূমি করে 'কসবি' লিখিত হয়েছে, ওই পাড়াটি আমার দেখা, ভালো করে দেখা। বারবার ঘুরেছি আমি ওই পাড়ায়—বাল্যবয়সে। তরুণ বয়সে এমনকি প্রৌঢ় বয়সেও লেখা এবং দেখার প্রয়োজনে বারবার গেছি আমি সাহেবপাড়ায়। বাল্য ও তারুণ্যের ঔৎসুক্যে এবং প্রৌঢ় বয়সে শেখার প্রয়োজনে ওই পল্লীতে গেছি আমি।' (জলদাস ২০১২(ক), পৃ. ৯৮)

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা স্পষ্ট, হরিশংকর জলদাস শুধুমাত্র একজন তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষ বলেই যে তিনি নিম্নবর্গ প্রধান সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করেছেন, তা নয়। এর পেছনে রয়েছে তার গভীর অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণা। কারণ তিনি তাঁর রচনার মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে নিম্নবর্গ কেবল সাহিত্য বিনোদনের বাহক মাত্র নয়, বরং তাঁর গল্প-উপন্যাসে ইতিহাসের বিভ্রমে সৃষ্টি হাওয়া ঘটনাবলিকে ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেখানে শাসক ও শোষিতের দ্বান্দ্বিক স্বরূপের পাশাপাশি তাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকাও স্পষ্টরূপে উঠে এসেছে। ফলে ইতিহাসের মতো হরিশংকরের সাহিত্যে সামাজিক পদ্ধতিগত বিন্যাসে নিম্নবর্গ কেবল অন্যের নির্মাণ হয়ে থাকেনি বরং নিজ অভিজ্ঞতা ও গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে একজন ঐতিহাসিকের মননদৃষ্টি নিয়েই উপস্থিত হয়েছে।

৬.১ কথাবিশ্বে নিম্নবর্গ : ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

বর্তমান অভিসন্দর্ভে এ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি যে, নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চায় মূল আলোচ্য বিষয়টি হল সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিরোধিতা করে দক্ষিণ এশিয় ইতিহাসচর্চার অভ্যন্তরে উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গের নিজস্ব চেতনার স্বতন্ত্র ক্ষেত্রটিকে অনুসন্ধান করা। এক্ষেত্রে গবেষকদের প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস রচনার বিরোধিতা করতে হয়েছে। ফলে নিম্নবর্গের ইতিহাস প্রায়শই বিরোধী ইতিহাস হয়ে উঠেছে। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ১৩) সুতরাং নিম্নবর্গের ইতিহাসকে প্রদর্শিত করতে গিয়ে সমালোচকেরা ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন গণ ও কৃষক বিদ্রোহকে দমন

করতে গিয়ে যেমন তাদের রাজনীতি, প্রতিবাদী চেতনা ও শ্রেণিচেতনার কথা উল্লেখ করেছেন, তেমনই পরবর্তীকালে সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ ও নারীর অবস্থানের বিষয়টিকেও গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় **১৯৮২** থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত সাবঅলটার্ন স্টাডিজের বারোটি খণ্ডে মোট পঁচানব্বইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে মূলত ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্গের চেতনা ও নির্মাণের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

সাবঅলটার্ন স্টাডিজ আলোচিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা, দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতা, দেশভাগ, কৃষক আন্দোলন ও তাদের ব্যর্থ প্রতিবাদ, উপজাতির আন্দোলন, নারীর সামাজিক অবস্থান, জাতিভেদ জনিত সমস্যা প্রভৃতি আলোচনার ভরকেন্দ্র মূলত সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গই। ঐতিহাসিক নথি-দলিল-দস্তাবেজে নিম্নবর্গীয় চেতনার সরাসরি সাক্ষ্য প্রায় কোথাও পাওয়া যায় না। ইতিহাসের নথিপত্র নির্মিত হয়েছে উচ্চবর্গ দ্বারা। সেক্ষেত্রে সেখানে নিম্নবর্গকে কেবল উচ্চবর্গের অধীনস্তের ভূমিকাতে লক্ষ করা গিয়েছে। একমাত্র বিদ্রোহের মুহূর্তেই শাসকগোষ্ঠীর চেতনায় নিম্নবর্গীয় চেতনার অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। সুতরাং নিম্নবর্গের ইতিহাস সমালোচকরা বিদ্রোহ দমনের মুহূর্তগুলিকে গুরুত্ব সহকারে সাবঅলটার্ন স্টাডিজের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে দেখা গেল, শাসকবর্গের প্রতিনিধিরা নানা আন্দোলনগুলির মধ্যে রাষ্ট্রশক্তির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে তথ্য ও ঐতিহাসিক ঘটনার নথি পেশ করেছেন, সেই তথ্য ও ঐতিহাসিক ঘটনার নথিগুলি নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকেরা বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার ফলে কৃষকদের বিদ্রোহী ও প্রতিবাদী চেতনা পরিচয় উঠে এসেছে। শুধু তাই নয়, নিম্নবর্গের ইতিহাস সমালোচকেরা নতুন করে দেখালেন যে, কৃষকচেতনায় কেবল বিদ্রোহী মানসিকতাই নয় এর সঙ্গে উপস্থিত রয়েছে তাদের ধর্মভাব, অলৌকিকতা, দৈবশক্তি, বিশ্বাস, অলীক কল্পনা, অদৃষ্টের প্রতি আস্থা-র মত বিষয়গুলি যা কোনোভাবেই উপেক্ষার বিষয় নয়। কারণ এই বিশ্বাস ও আস্থা নিম্নবর্গের চেতনাকে স্বতন্ত্র ও স্বকীয় করে তোলে। ফলে কৃষক চেতনার স্বকীয়তা অনুসন্ধানের জন্য বিদ্রোহী প্রতিবাদী চেতনাকে যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তেমনই পাশাপাশি তাদের দৈনন্দিন অধীনতার জীবনযাপনের ভেতরেও কৃষক চেতনার বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধানের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

সাবঅলটার্ন স্টাডিজের সাম্প্রতিক প্রবন্ধগুলিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে মূলত তিনটি বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। **i)** সাম্প্রদায়িকতা **ii)** জাতিভেদ প্রথা ও **iii)** নারী সংক্রান্ত আলোচনা। এই তিনটি ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে উচ্চবর্গের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের পার্থক্য ধরা পড়েছে। হরিশংকর একজন গবেষকের দৃষ্টি দিয়ে নিম্নবর্গের বয়ান রচনা করেছেন। সুতরাং

সেখানে অনিবার্যভাবে ধরা পড়েছে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘটনার অভিঘাত। পাশাপাশি উঠে এসেছে প্রতিনিয়ত অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষমতাশীল গোষ্ঠী দ্বারা তথাকথিত জেলে, মেথর, পতিতা, মুচি, তথা নিম্নবর্গের শোষণ-বঞ্চনার নির্লজ্জ ইতিহাস। আর এই সবই ক্রোধ অপমান যন্ত্রণা ও প্রতিবাদে হরিশংকর জলদাসের জীবনে ও সাহিত্যকর্মের নানা আকল্পে ধরা পড়েছে।

৬.১.১ সাম্প্রদায়িকতা : ইতিহাসে ও কথাবিশ্বে

সম্প্রদায়গত বা সাম্প্রদায়িক চেতনা সম্পর্কে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা প্রথম থেকে কার্যকর ছিল। কৃষকের সাম্প্রদায়িক চেতনা কীভাবে একটি কৃষক বিদ্রোহকে ত্বরান্বিত করেছিল তা ধরা পড়ে তাঁর 'Agrarian relations and communalism in Bengal, 1926-35' ও 'More on modes of power and peasantry' দুটি প্রবন্ধে। আলোচ্য দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন। যথা সাম্প্রদায়িক, সামন্ততান্ত্রিক এবং বুর্জোয়া ঔপনিবেশিক ভারতে প্রাক্‌শিল্প সমাজে অবস্থান করেছিল। এখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা সমগ্র সমর্থকদের ওপর ন্যস্ত। পার্থ চট্টোপাধ্যায় এর ব্যাখ্যায় বলেন-

> 'Here the collective is prison; individual or sectional identities are derived only by virtual of membership of the community… Communal authority may be exercised through a council or elders or of leading families, or even by a chief or patriarch. The point is that authority resides not in the person or even in the office; it resides only in the community as a whole. The officials and councils are no more than mere functionaries.'
> (Guha (ed.) 1983, p. 317)

আসলে সম্প্রদায়ের ধারণা একটি জীবন্ত শক্তি হিসেবে অব্যাহত ছিল কৃষক চেতনায় এবং সামন্ত ও রাষ্ট্রের দালালরা তাদের কাছে বহিরাগত হিসেবে থেকে যায়। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে পূর্ব-বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা হিন্দু মুসলিম সম্পর্ককে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে।

যদিও হরিশংকরের কথাসাহিত্যে পার্থ চট্টোপাধ্যায় কথিত দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে দেখতে গেলে বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় না। কারণ পূর্বে উল্লেখিত রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সহাবস্থানের মধ্যে সামন্ততন্ত্রের স্থান এখন বহু বিভাজিত হয়ে সামাজিক ক্ষমতার শৃঙ্খলায় বিভিন্ন রূপে অবস্থান করেছে। রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা তথাকথিত নিম্নবর্গের কাছে বহিরাগত হলেও বিশ্বে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি হয়েছে মূলত বহির্বিশ্বে গঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে। উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা 'দহনকাল' উপন্যাসটি দেখি তাহলে দেখা যাবে,

'ষাটের দশকের মাঝামাঝি ভারতশাসিত কাশ্মীরে হঠাৎ করেই হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাঁধে। সেই দাঙ্গার ঢেউ প্রচণ্ড শক্তিতে আছড়ে পড়ে ঢাকায়, নারায়ণগঞ্জে। চট্টগ্রামও সেই বীভৎস দাঙ্গার গ্রাস থেকে রেহাই পায় না। উত্তর পতেংগার মতো নিভৃত অচঞ্চল গাঁয়েও দাঙ্গার জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১০৯)

উপন্যাসে আরো জানা যায় যে, সাতচল্লিশের দেশভাগের সময় বিহারি-মুসলমানরা পূর্ব-পাকিস্তানে প্রবেশ করে পাকিস্তানি শাসকদের আশ্রয়ে একটি শক্তিশালী আস্তানা গড়ে তোলে। তারা স্থানীয় মানুষদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। হিন্দু প্রধান গ্রামে আক্রমণ, লুঠ-পাট, ধর্ষণের মতো গর্হীত অপরাধের মধ্য দিয়ে হিন্দু- মুসলিম সম্পর্কে ফাটল ধরাতে সক্ষম হয় তারা। হামিদকে দেখি হিন্দু জেলেদের প্রতি হঠাৎই সম্প্রীতির ব্যবহার ত্যাগ করে তাদের ওপর অন্যায়ভাবে প্রভাব খাটাতে। জেলেদের ধরা মাছ তারা কেড়ে নেয় এক অলিখিত অধিকার বশে। এমদাদ তাই বিনা দ্বিধায় নিকুঞ্জর ছেলেকে বলতে পারে-

'অই ডোমর পোয়া অল, ইয়ান পাকিস্তান, মুছলমানর দেশ। তোরা মালাউন অল এন্ডে থাইত্ পাত্তি নো। যদি থাকস ইচা মাছ অই থাগিবি। আঁরা যিয়ান কই হিয়ান গরিবি।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১১০)

হামিদ-এমদাদ-সিরাজ-সাইদুল এদের সঙ্গে জেলেদের দীর্ঘদিনের সম্প্রীতি। কিন্তু বহির্বিশ্বের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জেরে এদের এরূপ মানসিকতা হিন্দু জেলেদের মনে প্রশ্ন জাগায় যে,

'...আজ তাদের ভাষা এত খারাপ হয়ে উঠল কেন? কোনো দুষ্টবুদ্ধি তাদের মাথা বিগড়ে দিল?'(জলদাস ২০১০,পৃ.১১০)

এর উত্তর পাওয়া যায় ইতিহাস থেকে। যেখানে সম্প্রদায়ের ধারণা একটি জীবন্ত শক্তি হিসেবে বারবার অব্যাহত ছিল কৃষক চেতনায়। তাইতো বাইরের সাম্প্রদায়িকতার ঘটনা সেই জীবন্ত শক্তিকে ত্বরান্বিত করে খুব সহজেই। হঠাৎ করেই জেলেরা মুসলমানদের কাছে 'ইচা মাছ' হয়ে যায়। 'মুছলমানর দেশ' বলে তারা নিজেদের আধিপত্য শ্রেণি হিসেবে জেলেদের বিপরীতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। একথা তো স্বাভাবিক যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কাছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় স্বভাবতই নিম্নবর্গ। তাইতো একই সমাজকাঠামোয় একই শ্রেণির মানুষ হয়েও জেলেরা মুসলমানদের কাছে নিম্নবর্গে পরিণত হয়েছে।

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর সপ্তম খণ্ডের বিবিধ প্রবন্ধে ধর্মসম্প্রদায় ক্ষমতা ও নিম্নবর্গ নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্র পান্ডের 'The colonial constraction of Communal : British Writings on Banaras in the Nineteenth Century' প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন, ব্রিটিশরা তাদের অনুশাসন নীতিকে সুশৃঙ্খল করার জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে গল্পের আকারে ইতিহাসে স্থান দিয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় দ্বারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর প্রতি প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে দমিয়ে রাখার কৌশলগুলি রাষ্ট্রের ইতিহাসে 'সাম্প্রদায়িক কলহের' নামে সংক্ষিপ্ত রূপ

নিয়েছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুর প্রতিবাদ-প্রতিরোধকে আইন-শৃঙ্খলা লঙ্ঘনকারী পদক্ষেপ বলে ঘোষণার মাধ্যমে ব্রিটিশরা নিজেদের দমননীতিকে বড়ো করে দেখিয়েছে (Guha (ed.) 1989, p. 152) অর্থাৎ বেনারসের সাম্প্রদায়িকতার জেরে গঠিত নানা সময়ের দাঙ্গার ঘটনাকে কেবলমাত্র 'কলহের' নামে এর আসল কারণগুলি চাপা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হরিশংকর 'অর্ক' উপন্যাসে দেখাচ্ছেন কীভাবে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রভাবে হিন্দু-মুসলিম বৈরিতা ও প্রতিশোধস্পৃহা। ভারতীর সৈন্যের মৃত্যুর খবরে পাকিস্তানবাসীদের আনন্দ, পোস্টার লাগিয়ে উল্লাস আসলে যে পাকিস্তানে বসবাসকারী সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের প্রভাব বিস্তারের উল্লাস তা বোঝা যায়, যখন দিবাকর স্কুলে গিয়ে মুসলিম ছাত্রদের কটাক্ষের শিকার হয়। একটা সময় যখন পতেঙ্গার মুসলমানরা হিন্দুদের 'ইন্ডিয়ার গুপ্তচর' ভাবা শুরু করে তখন দিবাকর দেখে-

> 'এই যে সন্দেহ, এই যে ঘৃণা, এই যে বিদ্বেষ, পাক-ভারতের যুদ্ধের সময় হিন্দু আর মুসলমানের মনের মধ্যে হঠাৎ করে চাগিয়ে উঠল।' (জলদাস ২০১৭, পৃ. ৪১)

এই সময় এক রাতে কানাই দর্জিকে খুন করা হয়। একজন মুসলমান কানাইকে ইন্ডিয়ার গুপ্তচর ভেবে তাকে হত্যা করে। এই ঘটনায় পতেঙ্গার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শোরগোল হলে হিন্দুরা প্রাণ হারানোর ভয়ে একেবারে নিষ্ক্রিয়-নিশ্চুপ হয়ে পড়ে। সংখ্যালঘু হিন্দুদের এই নিষ্ক্রিয়তায় মুসলমানরা নিজেদের আরো শক্তিশালী মনে করলে হিন্দুদের স্বাভাবিক জীবন-যাপন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। দেখা গেল রাজনৈতিক অধিকার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিভাজিত হয়ে একে অপরের প্রতিপক্ষে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে হিন্দুদের দেশ ত্যাগ করানোর জন্য মুসলমানদের অকথ্য অত্যাচার শোষণ বঞ্চনা ও নিপীড়ন অভিশাপের মতো তাদের ওপর নেমে এসেছে। তাইতো বলরাম যখন ভারতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে তখন ছোবান মেম্বার রুক্ষ স্বরে বলে উঠেছিল,

> 'ক্যান, যাবি না ক্যান? চইলে যা, চইলে যা। কত স্বপ্ন দেখলাম তোর বাড়িটারে লইয়া। একটা মসজিদ...'
>
> (জলদাস ২০১৭, পৃ. ৭৯)

'থুতু' গল্পে বিমল শীলের উপর বশিরউদ্দিনের যে অন্যায় প্রদর্শিত হয়েছে তার মতো সাম্প্রদায়িকতার প্রতিচ্ছবি আর কোথাও উঠে আসেনি। আমরা দেখলাম, বিমল বশিরউদ্দিনকে আদাব না করে পাশ কাটিয়ে চলে আসার অপরাধে তার পরিবারকে বশির মসজিদে জোর করে ইসলাম ধর্মে রূপান্তরিত করে।

তাহলে দেখা গেল, উপনিবেশিক ভারতবর্ষে ঘটে যাওয়া নানা রাজনৈতিক অভিঘাতে সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গ যেমন শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত ও অবহেলিত ছিল তেমনই উত্তর-ঔপনিবেশিক স্বতন্ত্র বাংলাদেশেও নিম্নবর্গরা একইভাবে শোষিত ও অবহেলিত। রাজনৈতিক পালাবদল ক্ষমতার হস্তান্তর হলেও

নিম্নবর্গের অবস্থা একই রকম থেকে যায়। উচ্চবর্গ দ্বারা রচিত প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের বিপরীতে হরিশংকর জলদাস তাঁর 'দহনকাল', 'অর্ক', থুতু, 'সীমানা ছাড়ায়ে', 'আহব ইদানীং', 'দইজ্যা বুইজ্যা' প্রভৃতি উপন্যাস-গল্পে তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসকে স্থান দিয়েছেন। আর এই বিকল্প কথাবিশ্বের আকল্পে ও বয়ানে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচিত হয়েছে।

৬.১.২ জাতিভেদ প্রথা : আখ্যানের আকল্পে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

প্রাবন্ধিক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে জাতিপ্রথাকে মানুষের মধ্যে পরিচয় ও পার্থক্য সৃষ্টির পেছনে সন্দেহ করার জোরালো কারণ আছে। জাতিপ্রথা শুধুমাত্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়, এটি দৃষ্টান্তমূলক ফর্ম হিসেবে কাজ করে। 'জাতি' শব্দটি ভারতবর্ষে বর্ণ হিসেবে নয় বরং নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তা সমগ্র জাতি-উপজাতি, ভাষাগোষ্ঠী, ধর্মীয়গোষ্ঠী ও জাতীয়তা হিসেবে ধরা পড়েছে। এ ক্ষেত্রে একটি সাধারণ তাৎপর্য হল,

> 'The extent to which a caste-like system provids the cultural from for conceptualizing relations of domination, as well as of resistance, between social groups needs to be examined in its concreteness.' (Chaturvedi (ed.) 2000, p. 17)

নিম্নবর্গের ইতিহাস-এর প্রেক্ষিতে জাতিভেদ প্রথাকে আধিপত্য ও অধীনতার কারণ হিসেবে দেখা হয়েছে। হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে লক্ষ করলে দেখা যাবে 'জাতি' শব্দটি ধর্মীয়গোষ্ঠী, পেশাগোষ্ঠী ও জাতীয়তা হিসেবে ধরা পড়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে উক্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে তথাকথিত উচ্চবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে জলপুত্র, দহনকাল, একলব্য, প্রস্থানের আগে, সুখলতার ঘর নেই, মোহনা, রামগোলাম উপন্যাস ও 'তুমি কে হে বাপু', 'সুবিমলবাবু', 'কোটনা', 'দুলারি এবং কয়েকজন' গল্পে জাতিভেদ প্রথার কারণে সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের প্রতি যে শোষণ বঞ্চনা ও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে তার বিস্তৃত আলোচনা আমরা আলোচ্য অভিসন্দর্ভের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে করেছি। বর্তমান পরিসরে আমরা খুব সংক্ষেপে দেখে নেব হরিশংকরের উপন্যাস-গল্পগুলির আকল্পে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতাজনিত কারণগুলির মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের বিনির্মাণকে।

প্রথমত, 'জলপুত্র' উপন্যাসে গঙ্গাকে স্কুলে ভর্তি করানো হলে সে স্কুলে যেতে চায় না। কারণ স্কুলের অধিকাংশ হিন্দু ছাত্ররা তার সঙ্গে জাতিভেদ জনিত ঘৃণায় দূরত্ব বজায় রেখে চলে। জেলে বলে গঙ্গাকে 'জাইল্যা', 'ডোম' বলে ঘৃণা প্রদর্শন করে। আবার অনুষ্ঠান বাড়িতে প্রদীপ ঢুইল্যাদের নিজেদের এঁটো তাদেরই নদীতে ফেলে দিয়ে আসতে বলা হয়। সমাজে মান্য তথাকথিত বর্ণ হিন্দুদের এই আচরণ আসলে বর্ণ প্রথারই এক কুৎসিত রূপ। কারণ জেলেদের 'ডোম'-দের সঙ্গে এক সারিতে রাখার

মানসিকতা জাতিভেদ প্রথার মধ্য দিয়ে সমাজের একাংশকে অধীন করে রাখার প্রবণতাকেই স্পষ্ট করে। জন্মসূত্রে জাতি নির্ণয় ও জাত অনুযায়ী পেশা-বৃত্তি গ্রহণ করার মানসিকতা থেকে আধিপত্য-অধীনতা সম্পর্কটি জাতিভেদ প্রথার মধ্যে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। 'দহনকাল' ও 'মোহনা' উপন্যাসে দেখা যায় জেলেদের মধ্যে পেশা অনুযায়ী জাত বিভাজন। হালিক কৈবর্তরা জালিক কৈবর্তদের থেকে নিজেদের উঁচু জাত বলে মনে করেছে। 'একলব্য' উপন্যাসে একলব্য এক ব্যাধ সন্তান বলে ব্রাহ্মণ গুরু দ্রোণ তাকে অন্ত্যজ শ্রেণি বলে অস্ত্র শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছে। 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে দেখা যায়, জেলে সন্তান সত্যব্রত তার ভাগ্নিকে শিকলভাঙা গ্রামে নাপিতের কাছে চুল কাটাতে নিয়ে গেলে নাপিত বিক্রম শীল সত্যব্রতকে জাত তুলে অপমান করে ও জনতা দ্বারা সে প্রহৃত হয়। কারণ নাপিত জাত জেলেদের নিচু জাত মনে করে। তাই অপেক্ষাকৃত নিচুজাতের সেবা করতে তারা নারাজ। সুতরাং দেখা গেলো জাতিভেদ প্রথার নামে নাপিতরা জেলেদের ওপর আধিপত্য প্রকাশ করেছে। 'তুমি কে হে বাপু' গল্পে কর্ম ও গুণের চেয়ে জন্মের পরিচয়কে গুরুত্ব দেওয়ার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। 'সুবিমলবাবু' গল্পে ব্রাহ্মণ্যবাদের মুখোশ খুলে ফেলার প্রবণতা রয়েছে। অর্থাৎ আলোচ্য গল্প-উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সামাজিক কাঠামোয় জাতিভেদ প্রথা আধিপত্য অধীনতার দ্ব্যণুক সম্পর্ককে ত্বরান্বিত করেছে।

প্রাবন্ধিক পার্থ চট্টোপাধ্যায় 'Cast and Subaltern Consciousness' প্রবন্ধে জানিয়েছেন, ডোমের পাশাপাশি হাড়িও বাংলার প্রত্নতাত্ত্বিক মতে অন্ত্যজ জাতি। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বাগদী, মুচি, নমশুদ্র বা মালোর তুলনায় এরা যথেষ্ট কম ছিল যা ত্রিশ শতাংশ বা তার বেশি অংশ। সেই জেলার হিন্দু জনসংখ্যা যাদের অস্পৃশ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। উদাহরণস্বরূপ আলোচ্য প্রাবন্ধিক চট্টগ্রামের সমীক্ষার রাঙ্কিং অনুযায়ী জানাচ্ছেন, পারস্পারিক শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য নিম্নবর্ণের মধ্যে উপহাসের প্রবণতা দেখা যায়। যেখানে হাড়ি ও ডোম সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়,

> 'The Dom thinks he is purer than the Hadi, the Hadi thinks he is purer than the Dom. Risley classifies the Hadi as a menial and scavenger class of Bengal proper with whom no one will eat and from whom no one will accept water'. (Guha (ed.) 1989, p. 95)

সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় যে, সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে অল্পসংখ্যক বিশেষ গোষ্ঠীর ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠদের আধিপত্য বজায় রাখার কৌশল হল জাতিভেদ প্রথার মধ্য দিয়ে তাকে অদৃশ্য ঘোষণা করা। যেমনটা দেখা গেল, 'রামগোলাম' উপন্যাসে মেথরদের অস্পৃশ্যের দৃষ্টিতে দেখার মধ্য দিয়ে। আবার 'জলপুত্র', 'দহনকাল', 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে জেলেদের ডোম, জাইল্যা বলে বঞ্চনা ও নিপীড়ন করা। পার্থ চট্টোপাধ্যায় জাতপাতের সারমর্মটি উপলব্ধি করতে গিয়ে দেখেছেন,

> …the opposition between purity and pollution. While the need to maintain purity implies that the castes must be kept separate… it also necessarily brings the castes together…The unity of identity and difference—in this case … the unity of purity and pollution—gives us the ground of caste as a totality or system. (Guha (ed.) 1989, p. 180)

তাই, উচ্চবর্ণ বা বংশের কাছে নীচবর্ণের শ্রমজীবী মানুষগুলিকে পুনরুৎপাদন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে যাতে তারা তাদের শুদ্ধ অবস্থাকে বজায় রাখার প্রয়োজনে অশুদ্ধ শ্রমজীবীকে অধীনস্ত অবস্থায় পেতে পারে। ধর্মের সমস্ত আদেশ ও নির্দেশ এই লক্ষ্যেই রচিত হয়েছে। (Guha (ed.) 1989, p. 180)

'রামগোলাম' উপন্যাসের কথা বলতে গিয়ে হরিশংকর জলদাস তাই স্বাভাবিকভাবেই মেথরদের উৎপত্তির পৌরাণিক কাহিনিকে সংযুক্ত করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ব্রহ্মা মর্তে এসে পথের মাঝে বর্জ্য পদার্থ দেখে বিরক্ত হন। তৎক্ষণাৎ তিনি তার শরীরের ময়লা থেকে মহীথরের জন্ম দেন এবং তাকে পথ থেকে বর্জ্য পরিষ্কার করার আদেশ দেন। মহীথর আদেশমাত্র তা সম্পাদন করার পর ব্রহ্মা তাকে মর্ত্যের মানুষদের বর্জ্য পরিষ্কারের মধ্য দিয়ে তার জীবনের সার্থকতার আশিস প্রদান করেন। আলোচ্য উপন্যাসে জানতে পারি উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা।

> 'এই সম্প্রদায়টি মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিতে পারঙ্গম, মানবতার অন্তহীন অপমানে এরা উল্লাস বোধ করে। অনুশাসন নির্মাণের প্রবল ক্ষমতা তাদের হাতে। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে তারা মানুষের যুক্তিকে গলা টিপে মারে।..নোংরা কাজে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে নিযুক্ত করার জন্য পুরোহিত গোষ্ঠী শাস্ত্রবাণীকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং সার্থক হয়েছে। ধর্মীয় অনুশাসনের কুযুক্তি মেথর সম্প্রদায়কে হিন্দু জাতিস্তম্ভের নিম্নতম স্তরে ঠেলে দিয়েছে।'
>
> (জলদাস ২০১২, পৃ. ৩০)

এইভাবেই প্রতিনিয়ত জাতিভেদ প্রথার আড়ালে উচ্চবর্গের দ্বারা সমাজ কাঠামোর একদল মানুষকে কোণঠাসা করে রাখার মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের নির্মাণ হয়ে চলেছে।

৬.১.৩ নিম্নবর্গ হিসেবে নারীর অবস্থান

নারীর শ্রেণিগত, জাতিগত ও সম্প্রদায়গত পরিচয় থাকলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সব নারীই এক অর্থে নিম্নবর্গ। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.২০) কথাবিশ্বে দেখলাম, নারীর প্রতি অবহেলা, দৈহিক শোষণ অর্থাৎ ধর্ষণ, নারীর পণ্যায়ন, অপহরণের মত বিষয়গুলি উঠে এসেছে যা সামাজিক রাজনৈতিক ও কিছু ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকেও দায়ী করে। যদিও সামগ্রিক অর্থে নারীর অধীনতা আর বিশেষ অর্থে নিম্নবর্গীয় নারীর অধীনতা পরস্পর সম্পর্কিত হলেও বিভিন্ন হিসেবে ধরা পড়েছে। কারণ নিম্নবর্গীয় নারী চরিত্রে প্রতিবাদী চেতনা লাভ করেছে যা সামগ্রিক অর্থে নারীর চরিত্রে লক্ষণীয় নয়।

আলোচ্য বিষয়টির সাপেক্ষে ‘কসবি’ উপন্যাস থেকে বলা যায়, পতিতা সমাজে ক্ষমতা, অর্থ ও পেশার ভিত্তিতে যে স্তরায়ণ হয়েছে সেখানে পতিতারা নিম্নবর্গীয় নারী হিসেবে প্রতিপন্ন হলেও মাসিরা অর্থাৎ শৈলবালা মোহিনী বিশেষ অর্থে নিম্নবর্গীয় নারী নয়। আবার ‘রামগোলাম’ উপন্যাসে মেথরসমাজের প্রেক্ষিতে রূপালি যে অর্থে নিম্নবর্গ, অঞ্জলি ও চাঁপারানী সে অর্থে নিম্নবর্গ নয়। নারীর নিম্নবর্গ রূপে প্রতিভাত হওয়ার একটি সার্থক উদাহরণ রয়েছে ‘দুলারি এবং কয়েকজন’ গল্পে। গল্পে দুলারি একজন জেলেকন্যা যে শ্যামল দত্তের ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে প্রত্যাখ্যান ও বঞ্চিত হয়ে সন্তান নিয়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। পথে-ঘাটে তাকে ধর্ষণ করা হয়। সভ্য সমাজের প্রতি তার অশ্লীল অশ্রাব্য কুযুক্তি তার এই অভিমানকে প্রকাশ করে। কিন্তু যে তথাকথিত সভ্য সমাজের প্রতি তার অভিমান সেই অধ্যাপকের স্ত্রী কিন্তু দুলারীর প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও সমানুভূতিশীল নয়। একথা ঠিক যে অধ্যাপকের স্ত্রী একজন গৃহবধূরূপে তার সীমাবদ্ধতায় বাধা বলে সেও এক প্রকার নিম্নবর্গ। কিন্তু দুলারির মত নারীরা যেভাবে সমাজে প্রত্যাখ্যাত ও ধর্ষিত হয় তা অধ্যাপকের স্ত্রীকে হতে হয়নি। তাই সামগ্রিক অর্থে নিম্নবর্গ ও বিশেষ অর্থে নিম্নবর্গ নারীর মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে যা হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে স্পষ্টতা পেয়েছে।

এ প্রসঙ্গে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর অন্যতম বিতর্কিত ‘Can the subaltern speak?’ প্রবন্ধে নারীর সামাজিক অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনায় সতীদাহ প্রথার প্রসঙ্গ এনে বোঝাতে চেয়েছেন যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একজন নারী তার মৃত স্বামীর চিতায় ভস্ম হয়ে যাওয়াকে সমাজ যে অর্থে ‘সতী’ হিসেবে দেখেছে, তা আসলে নারীর পতিব্রতা ও পবিত্রতাকে পরিষ্ফুট করে। কিন্তু এক্ষেত্রে সতীদাহ প্রথা এক অর্থে নারীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে হত্যা করার উচ্চবর্গীয় কৌশল মাত্র। এখানে তৎকালীন ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজে প্রচলিত এই ব্রাহ্মণ্য সংস্কার প্রতিটি নারীর ক্ষেত্রেই সমান নয়। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্যবাদী বিচার ধারায় একজন নারীর সতীত্ব প্রমানের পথ হিসেবে স্বামীর সঙ্গে সহমরণকে দেখা হয়েছে। (Morris (ed.) 2010, p.269) এক্ষেত্রে নারীর প্রতিবাদের কোনো ভূমিকাই লক্ষ করা যায়নি। কিন্তু পাশাপাশি স্পিভাক এও দেখিয়েছেন যে আত্মহত্যা যখন কোনো নারী স্বেচ্ছায় করে তখন তার পেছনে থাকে এক পরোক্ষ প্রতিবাদ। নারীর এই নীরব প্রতিবাদে হয়তো কোনো স্বর খুঁজে পাওয়া যায় না, সে হয়তো তার কণ্ঠস্বরের ভাষায় তার প্রতিবাদের কারণকে সর্বসমক্ষে আনতে পারে না বা বোঝাতে অক্ষম হয় কিন্তু প্রতিবাদী হিসেবে নারীকেও নিম্নবর্গীয় চেতনায় ধরা যায়। এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য তিনি ভুবনেশ্বরী নামক একজন ষোড়শী নারীর আত্মহত্যার ঘটনাকে ব্যাখ্যা করেন। সেরকমই হরিশংকরের কথা সাহিত্যেও নারীর আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে পরোক্ষ প্রতিবাদ লক্ষ করা গিয়েছে।

শুধু গায়ত্রী স্পিভাক নয়, রণজিৎ গুহ তাঁর ‘Chandra’s Death’ প্রবন্ধে চন্দ্র নামক একজন নিম্নবর্গীয় বাগদী নারীর মৃত্যুকে ঘিরে নানা বিবৃতির মধ্য দিয়ে নারীর অবস্থানের বিষয়টিকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেন। চন্দ্র একজন বাগদী বিধবা যিনি মগারামের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের জেরে গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল। ঔপনিবেশিক সমাজের বাগদির আজাদ ও শ্রেণির দিক থেকে সমাজের নিচু স্তরে বিরাজ করে। ফলে চন্দ্র গর্ভবতী হয়ে পড়লে মগারাম তাকে ত্যাগ করে। এই সংকটের মুখে পড়ে চন্দ্রের পরিবার আত্মীয়দের ডেকে একত্রিত করে চন্দ্রের গর্ভপাতের ব্যবস্থা করে। এক্ষেত্রে রণজিৎ গুহ দুই ধরনের সংহতির কথা বলেন,

এক. পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ভয় দ্বারা সৃষ্ট সংহতি।

দুই. পরস্পর বিরোধী নীতি দ্বারা সক্রিয় সহানুভূতিমূলক সংহতি। (Guha (ed.) 1887, p. 166)

মগারাম দ্বারা গর্ভপাত করানোর পরামর্শের মধ্যে ছিল সমাজের ভয় ও মুখ থেকে বাঁচার পথ খোঁজা। কিন্তু চন্দ্রার পরিবারে একত্রিত হাওয়া মহিলাদের কাছে বড়ো হয়ে উঠেছিল চন্দ্রাকে সামাজিক নিন্দা থেকে বাঁচানো। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই গর্ভপাতের ঘটনাটি দেখা হয়েছে অন্য নারীর সামাজিক নিন্দা ও প্রত্যাখ্যান করার জন্য সচেতনভাবে গৃহীত একটি কৌশল হিসেবে। বাগদি সমাজে নারীদের সম্মানের সঙ্গে ঘটে যাওয়া সংকটে ভগবতী, রঙ্গু, বৃন্দাদের একত্রিত হওয়া পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের একটি কৌশল। সাবঅলটার্ন স্টাডিজে লিঙ্গভেদে নিম্নবর্গের অনুপস্থিতির দিকটি ইঙ্গিত করে গায়ত্রী স্পিভাকের সমালোচনার পর চন্দ্রার মৃত্যুর ঘটনাটি হল প্রথম ঘটনা যেখানে রণজিৎ গুহ পিতৃতন্ত্রের প্রশ্ন ও মহিলাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেখানে তিনি দেখান পুরুষতান্ত্রিকতা কীভাবে নারীকে দমন করে এবং নারীরা তা কীভাবে প্রতিরোধ করে। (Guha (ed.) 1887, p. 166)

নিম্নবর্গের ইতিহাসের পর্যালোচনায় স্পিভাক, রণজিৎ গুহ-রা সতীদাহ প্রথা, ভুবনেশ্বরীর আত্মহত্যা, চন্দ্রার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নারীর সামাজিক সমস্যা জনিত অবস্থান তুলে ধরে যেভাবে নারীর দমন ও প্রতিবাদের দিকটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন তেমনি ইতিহাসের পথ বেয়েই হরিশংকরের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় নারীর সামাজিক অবস্থানের দিকটিও চিহ্নিত করা যায়। যদিও এক্ষেত্রে ‘চরণদাসী’ গল্পে চরণদাসীর সঙ্গে হারাধন জলদাসের অবৈধ সম্পর্কের ফলে চরণদাসী গর্ভবতী হয়ে পড়লে হারাধন তাকে প্রত্যাখ্যান করেনি। চরণদাসীকে সম্মানপূর্বক বিয়ে করেছে। তবে নারীকে অবদমিত ও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে অন্য পন্থায়। ‘দুখিনি’ গল্পে, ‘জলপুত্র’ উপন্যাসে নারীর রূপ-লাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে পুরুষ তাকে বিবাহ করলেও পরবর্তীকালে মোহভঙ্গে পুরুষেরা অন্য নারীকে সাঙ্গা অর্থাৎ বিবাহ করে প্রথম স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান

করেছে। 'দুখিনি' গল্পের কিষ্টপদ ও জলপুত্রের মধুরাম পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ হিসেবে নারীকে অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে।

৬.২ উচ্চবর্গের 'অপর' হিসেবে নিম্নবর্গের নির্মাণ

নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা যে কেবল নিম্নবর্গকে নিয়ে তা নয়, এর সঙ্গে জুড়ে আছে উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গের সম্পর্ক, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ইতিহাসে নিম্নবর্গের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ও সর্বোপরি উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গের অপরায়ণ কীভাবে হচ্ছে এসবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আলোচিত হয়েছে। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' আলোচনায় একপর্যায়ে দেখা গেল যে, শুধুমাত্র নিম্নবর্গীয় চেতনার ওপর নির্ভর করে ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় ইতিহাসের দলিল দস্তাবেজে নিম্নবর্গীয় চেতনার কণ্ঠস্বর পাওয়া যাবে বলে দাবি করলেও সেখানে নিম্নবর্গের নিজস্ব কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে তা আসলে উচ্চবর্গ দ্বারা সৃষ্ট অর্থাৎ অন্যের নির্মাণ। সুতরাং উচ্চবর্গের বিপরীতে 'অপর' হিসেবে নিম্নবর্গকে কীভাবে প্রদর্শন অথবা নির্মাণ করা হচ্ছে এই বিষয়টি গভীর গবেষণার দাবিদার হয়ে উঠল। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এ দেখা যাবে, নিম্নবর্গের অপরায়ণ বিষয়টি তৎকালীন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন- অফিস, আদালত, কারখানা, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, পুলিশি ব্যবস্থা, আইন, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর প্রভৃতির নিরিখে বিশ্লেষিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দীপেশ চক্রবর্তীর একটি ব্যতিক্রমী প্রবন্ধ 'শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক ভারতে মহামারী ও জনসংস্কৃতি'-এ দেখান যে, কী করে ভারতে ঔপনিবেশিক কালখণ্ডে রাষ্ট্র সমাজ ব্যবস্থা মহামারীর কবলে জনস্বাস্থ্যের নামে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রদর্শিত করতে চেয়েছিল এই অর্থে যে মহামারী থেকে বাঁচাতে তারা জনস্বার্থে কাজ করছে, কিন্তু খাদ্যশস্য মজুত, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও পুঁজিবাদীদের পরোক্ষ সাহায্যের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের মুনাফা অর্জনের 'হেজেমনি' প্রক্রিয়া চালিয়েছে তারা। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.১৬১-৭৮) এ ধরনের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা বিশ্লেষণে দেখা যায়, নিম্নবর্গের ইতিহাস কেবল সমাজতাত্ত্বিকভাবে নিম্নবর্গ কেন্দ্রিক ইতিহাসের সীমাবদ্ধ থাকল না, বরং তা হয়ে দাঁড়াল রাষ্ট্র ও বৃহত্তর অর্থে আধিপত্যকামী ক্ষমতাচর্চার ইতিহাস। রণজিৎ গুহর নিম্নবর্গীয় চেতনা স্বাতন্ত্র হলে উচ্চবর্গীয় চিন্তাভাবনা আদর্শ ও মানসিকতার সঙ্গে তাদের পারস্পারিক বোঝার ক্ষেত্রে যে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্য নেওয়া হয়েছে তা হল সামাজিক কাঠামোর ক্ষমতার স্তরায়ণ। ক্ষমতার এককেই উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ ধারণাটিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। (Guha (ed.) 1982, p. 6-10)

এক্ষেত্রে হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে যে তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সমাজকে আমরা দেখলাম সেখানে বিশেষ করে 'একলব্য' উপন্যাসে পৌরাণিক মহাভারতের আখ্যানের ভিত্তিতে ব্যাধ সম্প্রদায়ের এক ব্যাধসন্তান একলব্য শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হয়ে ওঠার সংকল্প গ্রহণ করে। আর্য প্রবর্তিত চতুর্বর্ণপ্রথা অনুযায়ী ব্যাধ অর্থাৎ পশুশিকারীরা সমাজ কাঠামোর চতুর্বর্ণ তথা শূদ্র ও অন্ত্যজগোষ্ঠী বলে গুরু দ্রোণ একলব্যকে অস্ত্রশিক্ষা দিতে আপত্তি জানিয়েছেন। গুরু দ্রোণের মতে নীচ জাতিকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করা গুরুর অখ্যাতির কারণ আর তাছাড়া সামাজিক ব্যবস্থা অনুযায়ী একমাত্র ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের অস্ত্রবিদ্যার উপর অধিকার রয়েছে। অন্ত্যজর সে অধিকার নেই। লক্ষণীয়, এখানে সামাজিক শ্রেণিবিভাজন কিন্তু কখনোই কর্ম ও গুণের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, গড়ে উঠেছে জন্ম ও জাতির উপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ মানবরূপে জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই বা তার পূর্বেই সেই মানুষের ভবিতব্য বিচার্য হত কেবল এই বর্ণাশ্রম প্রথার দ্বারা। সমাজের উচ্চবর্গ দ্বারা সৃষ্ট এই প্রথা নিম্নবর্গের অপরের পেছনে প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের দ্রোণের মুখে এর অভ্যন্তরীণ কারণ অপর হিসেবে নিম্নবর্গের নির্মাণকে আরো স্পষ্ট করেছে।

> 'দ্রোণাচার্য ভাবলেন—আর্য সমাজ যে চতুর্বর্ণীয় বিভাজনের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে, তা অবশ্যই মানবজাতির জন্য কল্যাণকর। এই বিভাজন সমাজকাঠামোকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। এই শৃঙ্খল রাজ্যশাসন, প্রজাশোষণ ও ধর্মমার্গের পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল।
>
> ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র শ্রেণিপ্রথা সমাজে বিরাজমান না থাকলে আর্য সমাজব্যবস্থা কবেই ভেঙে পড়ত। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়রা স্বাধীন। ব্রাহ্মণ্য মস্তিষ্ক আর ক্ষত্রিয়-বাহুবলের সম্মেলনে এমন একটা কেন্দ্রশক্তি তৈরি হয়েছে, যা অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অপ্রতিরোধ্য। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের সমন্বয়কে অব্যাহত রাখতে হলে এসব ছোটোজাতের শূদ্রদের মাথা তুলতে দেওয়া যাবে না। (জলদাস ২০১৬, পৃ. ১০০)

দ্রোণ যিনি উচ্চবর্গের প্রতিভূ তাঁর চিন্তা-চেতনায় মূলত দুটি কথা এখানে গুরুত্বপূর্ণভাবে লক্ষণীয়। এক. চতুবর্ণীয় বিভাজনে সমাজ কাঠামোর শৃঙ্খলা রাজ্য ও প্রজা শাসন-শোষণে বিশেষভাবে অনুকূল। এবং দুই. ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মিলিত শক্তিকে অব্যাহত রাখতে হলে নিম্নবর্গের মানুষদের মাথা তুলতে না দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করা। গুরু দ্রোণের এই মানসিকতা দুটি দিককে সামনে আনে। প্রথমত, উচ্চবর্গীয় চিন্তা-চেতনায় সর্বদা আধিপত্যকামী মানসিকতার প্রতিফলন দ্বিতীয়ত, উক্ত মানসিকতাকে অব্যাহত রাখতে বিভিন্ন কৌশলে নিম্নবর্গের অপরায়ণ। দেখা গেল, 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' চর্চার যে পর্যায়ে নিম্নবর্গের নির্মাণ কৌশলের প্রতি দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, সে নির্মাণ পৌরাণিক যুগ থেকে ইতিহাসের বহমানতার খাতে সমানভাবে বয়ে আসছে। শুধু 'একলব্য' নয়, 'যমুনাজলে বিবর সন্ধান' গল্পে

লক্ষ করা গেল চেদিরাজ উপরিচর বসুর বীর্য অদ্রিকা নামক মৎস্যের গর্ভে দুটি পুত্র ও কন্যার জন্ম হয়। রাজা পুত্রসন্তানকে গ্রহণ করে কিন্তু কন্যাটিকে একজন ধীবরের কাছে পালন করার জন্য রেখে আসেন। কারণ পুত্রসন্তান রাজার উত্তরাধিকারী হবার যোগ্য বলে বিবেচিত সমাজে। নারী নয়। তাই নারীকে ত্যাগ করলেন রাজা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর এই অপরায়ণ করার কৌশল একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। শুধু তাই নয়, কন্যা সন্তানটি সমাজে বেড়ে উঠতে লাগলে তার রূপলাবণ্যে একদা ঋষি পরাশর তার সঙ্গে মিলন প্রার্থনা করলেন। স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণে মৎস্যগন্ধার প্রতি এই প্রস্তাব অন্যায়সম। কিন্তু উচ্চবর্গের প্রতিভূ পরাশরমুনির প্রকোপের ভয় মৎস্যগন্ধাকে প্রতিবাদহীন করে তুলেছে। পরাশর মৎস্যগন্ধার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে তাকে আশীর্বাদস্বরূপ জানান, তার সঙ্গে মিলনে মৎস্যগন্ধার কুমারীত্বের কোনো হানি হবে না। ঋষির আশীর্বাদে তার শরীর থেকে ফুলের গন্ধ তৈরি হবে যা যোজন দূরত্ব পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। শুধু তাই নয়, তার ভবিষ্যৎ হবে রাজকীয়। মিলনের বদলে হঠাৎ এত সুখকর প্রাপ্তির আশা আসলে নিজ কার্যসিদ্ধি করা আর উচ্চবর্গীয় কৌশল। তাইতো পরাশরমুনি একটা সময় মৎস্যগন্ধাকে জড়িয়ে ধরলে সে নিষ্ক্রিয় থাকে। দেখা গেল নৌকার মধ্যে মৎস্যগন্ধার শরীর উপভোগ করে মুনি নদীর পাড়ে নেমে নৌকাটিকে নদীর দিকে ঠেলে দেয়। নৌকার পাটাতনে চিত হয়ে শুয়ে থাকে নিস্পলক মৎস্যগন্ধা। (জলদাস ২০১৯(খ), পৃ. ৪৯-৫৭) অর্থাৎ কার্যসিদ্ধির পর নারীকে ত্যাগ করার প্রবণতা ফুটে উঠেছে এখানে যা নিম্নবর্গীয় নারী অপর হিসেবে বিনির্মিত হয়েছে উপন্যাসে।

লক্ষণীয় প্রাচীনকালে সমাজপতিরা বিভাজিত হওয়া থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এর রেশ সমাজে রয়েছে জাতিভেদ রূপে যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে বিভাজনও যে নিম্নবর্গের অপরাধের জন্য দায়ী তা আমরা ‘জলপুত্র’, ‘দহনকাল’, ‘অর্ক’, ‘জামাইখেকো’ প্রভৃতি উপন্যাস-গল্পে লক্ষ করেছি। যেখানে জাল ও নৌকার ভিত্তিতে জেলে সমাজের বহদ্দার, পাউন্যা নাইয়া, বিয়ারী ও সাধারণ জেলে হিসেবে শ্রেণিবিন্যাস দেখা যায়। এই অন্তশ্রেণির মধ্যে যেমন অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের জেলে দ্বারা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের জেলেরা বঞ্চিত-শোষিত হয়েছে তেমনই সমগ্র জেলে সমাজও বহিরাগত শক্তির দ্বারা শোষিত হয়েছে। বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলা যায়, ‘জলপুত্র’ উপন্যাসে জেলেদের নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে শুক্কুর ও শশিভূষণ ঋণ দেওয়ার নামে তাদের সঙ্গে প্রতারণা করে খাতায় হিসেবে গড়মিল করে রাখে। নরম সুরে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে শশিভূষণ তাদের ভরসা আদায় করে দিনের পর দিন তারা জেলেদের ‘অপর’ করে রেখেছে। ‘দহনকাল’ উপন্যাসে রাধানাথের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে রমণীমোহন আগে-ভাগে তার জাল দিয়ে মাছ তুলে নিয়েছে শর্ত উপেক্ষা করে। অন্নচরণ বহদ্দারও রাধানাথের

অসহায়তার সুযোগ নেয় একইভাবে। শুধু তাই নয়, জালাল মেম্বার রামহরির সঙ্গে অংশীদারি ব্যবসায় নেমে রামহরিকে প্রচুর মুনাফার লোভ দেখিয়ে তার সর্বস্ব কেড়ে নেয়। তবুও জেলেরা চুপ থাকে। কারণ জেলে সমাজের নানা নিয়ম ও অনুশাসনের উর্ধ্বে কেউ নয়। উচ্চবর্গ দ্বারা নিম্নবর্গীয় জেলেরা সর্বদা অনুশাসনের আড়ালে নজরবন্দি। মিশেল ফুকোর মত অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই অনুশাসনের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ জেলেরা শাস্তির ভয়ে বহদ্দার ও ক্ষমতাসম্পন্ন আধিপত্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে না। (Gordon (ed.) 1980, p. 139-40) 'অর্ক' উপন্যাসে কীভাবে বলরাম ছোবান মেম্বারকে মাছ দেওয়ার কথা শুনে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকে। কারণ মাছ নিয়ে সে দাম দেয় না। জানা যায় ছোবান মেম্বার দ্বারা জেলেরা যাবতীয় সরকারি ত্রাণ ও সাহায্য পায় বলে তার বিনিময়ে জেলেদের কাছ থেকে বিনামূল্যে মাছ নেয় সে। অর্থাৎ নিরক্ষর অশিক্ষিত ও অধিকার অজ্ঞাত জেলেরা ছোবান মেম্বারকে গুরুত্ব দেয় বাধ্য হয়ে। লক্ষণীয় ছোবানের উচ্চবর্গীয় কৌশল জেলেদেরকে 'হেজেমনি' দ্বারা অধীন করে রেখেছে যা নিম্নবর্গকে অপর করে রাখার কৌশলমাত্র।

আবার 'কুন্তীর বস্ত্রহরণ' উপন্যাসে লক্ষ করা যায়, চেঙ্গুটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কাশেমের নজর পড়ে কুমোরদের শ্মশানের ওপর। কারণ সেখানে সে একটি বাগান বাড়ি নির্মাণ করতে চায়। উচ্চবর্গের প্রতিনিধি আবুল কাশেম কুমোর-মালোদের কাছে শ্মশানটি দাবি করার বদলে অন্য স্থানে এরকম আরেকটি প্রাচীর ঘেরা শ্মশান গড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। আমরা জানি আবুল কাশেমের এই প্রস্তাব আসলে হেজেমনির মাধ্যমে বলপ্রয়োগ না করে সকলের সম্মতিতে কার্যসিদ্ধি করা। কিন্তু কুন্তী প্রতিবাদ করলে আবুল তার দলবল নিয়ে ফিরে আসে কারণ সে জানে কুমোরদের এখনই চটানো যাবে না, কারণ সামনে জাতীয় নির্বাচনে কুমোরদের ভোট গুরুত্বপূর্ণ। তাই এক সন্ধ্যায় কুমোরদের জড়ো করে আবুল তার দলকে ভোট দেওয়ার কথা বলে। এক্ষেত্রেও কুন্তীর প্রতিবাদ তথাকথিত উচ্চবর্গের মানসিকতায় বাধা সৃষ্টি করেছে। ফলে আবুল কাশেম কুমোরদের ওপর শক্তি প্রদর্শন করে তার প্রার্থিত শ্মশানটি জবর দখল করেছে। আবুল কাশেমদের বিপরীতে কুমোর-মালোদের অপরায়ণ হয়েছে।

হরিশংকর জলদাস ইতিহাস ও ভূগোলকে অনেকটা বিস্তৃত করে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দেখতে চেয়েছেন। ফলে তাঁর লেখায় নিম্নবর্গরা নিরন্তর সংঘর্ষে লিপ্ত, ছোটো-বড়ো প্রতিষ্ঠান ও ক্ষেত্র, তার অনুশাসন এবং যাবতীয় আধিপত্যবাদ ও ক্ষমতার প্রতিস্পর্ধী। তাইতো তাঁর কথাবিশ্বে ক্ষমতার কথা যেমন কঠোর ও নির্মম তেমনই প্রতিবাদের ভাষাও রুক্ষ ও সোচ্চার। এখানে নিম্নবর্গের অপরায়ণ যেমন প্রতিনিয়ত ঘটেছে তেমনই এর বিপরীতে নিম্নবর্গ তাদের প্রতিবাদের ক্ষেত্রটিকে সম্মিলিত প্রতিরোধ পর্যন্ত

প্রসারিত করতে পেরেছে। নিম্নবর্গীয় চেতনায় এই প্রতিবাদী সত্তাটি যখনই জাগরিত হয়েছে তখনই আমরা গঙ্গাপদ, হরিদাস, জয়ন্ত, রামগোলাম, কার্তিক, দিবাকর, একলব্য, কর্ণ, মোহনা, দেবযানী, কৈলাস, শিবশঙ্কর, কুন্তীকে পেয়েছি।

হরিশংকরের কথাসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস স্থান পায়নি বরং উঠে এসেছে আজীবন নিম্নবর্গকে দেখে আসা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সত্যিকারের বাংলাদেশের ইতিহাস। যেখানে অন্যের দ্বারা সৃষ্ট ইতিহাসের বদলে সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের দৈনন্দিনতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জীবনযাপনের ইতিহাস উঠে এসেছে। কখনো সামাজিক-অর্থনৈতিক অনুশাসনে, কখনো পৌরাণিক ইতিহাসের ভিত্তিতে, কখনো রাজনৈতিক অনুশাসনের আড়ালে প্রতিনিয়ত নিম্নবর্গের অপরায়ণের মধ্য দিয়ে দেখা গিয়েছে এক বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশকে। উচ্চবর্গের চাপিয়ে দেওয়া ইতিহাসের তলায় যে অচেনা-অজানা বাংলাদেশের নিম্নবর্গের ইতিহাস চাপা পড়েছিল—তাকেই হরিশংকর জলদাস তাঁর আখ্যানের বয়ানে তুলে ধরেছেন।

৬.৩ উচ্চবর্গের রাজনীতি ও নিম্নবর্গের রাজনীতি : দুটি স্বতন্ত্র ধারা

সাবঅলটার্ন স্টাডিজ আলোচনায় রণজিৎ গুহ উল্লেখ করেন যে প্রচলিত ঔপনিবেশিক এবং জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে জনগণের রাজনীতির কোনো স্থান নেই। কিন্তু তাঁর মতে রাজনীতির অভিজাত পরিধির সমান্তরালে আরেকটি স্বায়ত্তশাসিত পরিধি ছিল যা নিম্নবর্গের রাজনীতি। সাবঅলটার্ন স্টাডিজের প্রথম খণ্ডে তিনি স্পষ্ট সে কথা জানিয়েছেন-

> 'For parallel to the domain of elite politics there excited throughout the colonial period another domain of Indian politics in which the principal actors were not the dominant groups of the indigerous society or the colonial authorities but the subaltern classes and groups constituting the mass of labouring population and the country that is the people. This was an autonomous domain, for it is neither originating from elite politics nor did its existence depend on the latter.
>
> (Guha (ed.) 1982, p. 4)

অর্থাৎ ঔপনেবেশিক ভারতবর্ষে উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের রাজনীতির ধারা দুটি স্বতন্ত্র হলেও নিরপেক্ষ নয়। ধারা দুটি বৈপরীত্যে বাঁধা এবং বেণীবন্ধের মতো প্রায়শই পরিস্থিতি অনুযায়ী ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে যুক্ত হয় আবার নিজস্ব খাতেও বয়ে চলে। এ ক্ষেত্রে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করে বলেন যে অভিজাত রাজনীতি তুলনামূলকভাবে আইন ও সংবিধানবাদী, কিন্তু নিম্নবর্গের রাজনীতি আপেক্ষিকভাবে হিংস্র। অভিজাত রাজনীতি সতর্ক ও নিয়ন্ত্রিত অন্যদিকে নিম্নবর্গের রাজনীতি অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত। নিম্নবর্গের রাজনীতি আসলে কী—সে বিষয়ে প্রাবন্ধিক আল্ফ গানভাল্ড নীলসেন জানান যে,

‘The political activity of social groups who are adversely incorporated intu determinate power relations.’ (Nilsen (ed.) 2015, p. 1)

অর্থাৎ নিম্নবর্গের রাজনীতি সামাজিক গোষ্ঠীগুলির রাজনৈতিক কার্যকলাপকে বোঝায় যারা ক্ষমতার সম্পর্কে প্রতিকূলভাবে অন্তর্ভুক্ত। দুটি রাজনীতির ধারা ঔপনিবেশিক ভারতে বিশেষ প্রকট না হলেও সাবঅলটার্ন স্টাডিজের সমালোচকরা নিম্নবর্গের রাজনীতির ধারা থেকে নতুন করে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন।

ইতিহাসের এই বহমানতা হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে উঠে এসেছে স্পষ্টরূপে। এখানে লেখক কোনো ইতিহাস দ্বারা প্রভাবিত হননি বরং ইতিহাসের নানা উপাদানকে উপেক্ষা করে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাকে উচ্চবর্গের বিপরীতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। উচ্চবর্গের রাজনৈতিক কৌশল ও নিম্নবর্গের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে পঞ্চম অধ্যায় আলোচনা করেছি। সুতরাং বর্তমান পরিচ্ছেদ এর উদ্দেশ্য অনুযায়ী আমরা শুধুমাত্র সেই ধারা দুটি সংক্ষিপ্ত রূপকে সামনে রাখছি।

‘জলপুত্র’ উপন্যাসে গঙ্গাপদ দ্বারা শুক্কুর-শশিভূষণের হিসেব জাল করার ঘটনার পর্দা ফাঁস করা এবং একত্রিত হয়ে দাদনদারদের কাছ থেকে ঋণ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত। জেলেদের অসহযোগী চিন্তাভাবনায় শুক্কুর-শশিভূষণ জেলেদের উচিত শাস্তি দিতে তৎপর হয়ে ওঠে। আমরা জানি উচ্চবর্গের কাছে নিম্নবর্গীয় রাজনীতি তখনই স্বতন্ত্র চেতনা হিসেবে ধরা পড়ে যখন তাদের কর্মকাণ্ডে উচ্চবর্গের স্বার্থসিদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করে। শুক্কুর-শশিভূষণ জেলেদের মাছ ধরার স্থানে নিজেদের ভাড়া করা মুসলমান জেলেদের দ্বারা জাল পেতে তাদের ভাতে মারার চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, তাদের এই অন্যায় কর্মের বিরুদ্ধে গঙ্গাপদ জেলেদের নেতৃত্বে দিলে তাকে কৌশলে হত্যা করে বিদ্রোহের মাথাকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়া হয়।

‘দহনকাল’ উপন্যাসে পাক সৈন্য দ্বারা উত্তরপতেঙ্গা গ্রামটি অবরুদ্ধ হয়, মুক্তিযুদ্ধাদের বিনাশ উপলক্ষ্যে সৈন্যরা জেলেদের ওপর নিরন্তর অত্যাচার-পীড়ন করলে তারা সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ করে সাময়িকভাবে। কিন্তু বন্দুক ও মানুষের লড়াইয়ে জয় সবসময় বন্দুকেরই হয়। তাই জেলেদের প্রতিরোধের জবাব দিতে পাকসেনারা উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করে।

‘মোহনা’ উপন্যাসে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের রাজনীতির দুটি স্পষ্টভেদ লক্ষণীয়। দেখা যায় বরেন্দ্রভূমিতে রাজা দিব্যোক যে কৈবর্ত রাজ্যের পত্তন করেছিলেন তাকে পাল রাজাদের আক্রমণ থেকে প্রতিবার সুরক্ষিত করেছে তার পরবর্তী উত্তরসূরী রাজা ভীমসেন। কিন্তু রামপালের আমলে রামপাল

বুঝতে পারেন ভীমসেনকে সহজে পরাজিত করা সম্ভব নয়। এমন সময় সে ভীমসেনের পালিতপুত্র চণ্ডকের অসন্তুষ্টির কথা জানতে পারেন। ফলে সে চণ্ডককে তার সেনাপ্রধান করার প্রস্তাব দিয়ে চণ্ডকের সমর্থন প্রার্থনা করেন। এখানে স্পষ্ট রামপালের রাজনৈতিক চাল। পালরা কৈবর্ত রাজ্য আক্রমণ করলে চণ্ডকের বিশ্বাসঘাতকতায় রাজা ভীমসেন রামপালের কাছে বন্দি হয়ে পড়ে। কৈবর্ত রাজ্যের পতন হয়। রামপাল রাজনৈতিক কৌশলে ভীমসেনকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়।

অন্যদিকে 'রামগোলাম' উপন্যাসে দেখা যায় কর্পোরেশনের বড়োবাবুর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রামগোলামের নেতৃত্বে মেথররা একত্রিত হয়ে অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। উচ্চবর্গের প্রতিনিধি বড়োবাবু আব্দুস ছালাম চাইলে মেথরদের সমূলে উৎখাত করতে পারতেন। কিন্তু প্রথমেই তিনি বলপ্রয়োগ করলেন না। কারণ আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি অভিজাত রাজনীতি তুলনামূলকভাবে আইন ও সংবিধানবাদী। দেখা গেল বড়োবাবু জমাদার হারাধনের বুদ্ধি ও পরামর্শ অনুযায়ী রামগোলামকে সরাসরি জুনিয়র জমাদারের পদে নিয়োগ করেন। কারণ হারাধনের মতে রামগোলাম এই পদে নিযুক্ত হলে রামগোলাম মেথরদের সঙ্গে সবসময় মেলামেশা করতে পারবে না এবং হারাধন তাকে কথার জালে ফাঁসিয়ে ও পয়সার লোভ দেখিয়ে মেথরদের নেতৃত্ব দেওয়া থেকে বিরত করতে পারবে। কিন্তু উচ্চবর্গের এই রাজনৈতিক কৌশল ব্যর্থ হয় কারণ রামগোলামকে কিনে নেওয়া যায়নি। সে মেথরদের হয়ে নিরন্তর প্রতিবাদ করেছে। শেষে আব্দুস ছালাম তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসবে না জেনে রামগোলাম ধর্মঘট করার হুমকি দেয়। উপন্যাসে তাই দেখা যায় অভিজাত রাজনীতি অনুযায়ী আব্দুস ছালাম মেথরদের চতুর্থ দিনের ধর্মঘটের দিন যোগেশকে খুন করিয়ে সেই দায় রামগোলাম ও যোগেশের ওপর চাপিয়ে পুলিশের হাতে তাদের ধরিয়ে দেয়। মিথ্যে প্রমাণ ও সাক্ষ্য হিসেবে পিওনের বয়ান অনুযায়ী তাদের ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়।

আলোচনা শেষে বলা যায়, প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে প্রাক-ঔপনিবেশিক, ঔপনিবেশিক ও উত্তর উপনিবেশিক কালপর্বে সমাজ কাঠামোয় একদল মানুষকে সমাজ ও সময় অনুযায়ী বর্ণ, বিত্ত, বিত্তি-র ওপর ভিত্তি করে যেভাবে নিচের দিকে প্রতিনিয়ত ঠেলে দেওয়া হয়েছে, বর্তমান সময়পর্বেও এই নির্মাণের পরিবর্তন হয়নি। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নবর্গের অভিধাগুলো বদলে কখনো শূদ্র, অন্ত্যজ, প্রান্তিক, দলিত, অপর, ব্রাত্যে পরিণত হয়েছে মাত্র। একজন জেলেসন্তান হওয়ার দরুন জেলেদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার জীবনযাপন, তাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চেতনাকে লেখক যেভাবে বাস্তবতার সঙ্গে স্পষ্ট করেছেন, সে দিক থেকে তিনি ব্যতিক্রমী। রণজিৎ গুহ 'Subaltern studies'-এ উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ ধারণাটি সুস্পষ্ট করার পাশাপাশি প্রশ্ন তুলেছেন-

'...একথা যদি সত্যি হয় যে ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনার উৎপত্তি হয়েছিল ইংরেজের শাসনব্যবস্থা থেকেই এবং তার বিকাশ ঘটে ওইগুলিকে আশ্রয় করেই, তাহলে দেশীয় রাজ্যে প্রজা-আন্দোলন হয়েছিল কোনো প্রেরণায়?... কিংবা যদি উচ্চবর্গের প্রতিভাই জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় আন্দোলনের একমাত্র কারণ হয়ে থাকে তাহলে তাদের প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠন বা ব্যক্তির সর্দারি ছাড়াও, এবং তাদের নেতৃত্ব ও পরামর্শ উপেক্ষা করেই যে সব ঐতিহাসিক গণসমাবেশ ঘটেছিল তার ব্যাখ্যা কেমন করে হয়?' (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ৩১)

এই প্রশ্ন থেকেই নিম্নবর্গের যে একটি রাজনৈতিক আদর্শ ও সত্তা রয়েছে তা বোঝা যায় যা কিনা দীর্ঘদিন উচ্চবর্গ দ্বারা সৃষ্ট ইতিহাসের তলে চাপা পড়েছিল।

হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যও এই ইতিহাসের ঊর্ধ্বে নয়। তাইতো তাঁর কথাবিশ্বে দেখা গেল অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে বিশেষ দিনে জেলেদের গোপন পরামর্শ নিমিত্তে সমাবেশ, আবার কখনো জেলেরা একত্রিত হয়ে তথাকথিত আধিপত্যকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সংগঠন নির্মাণ করে। কখনো সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। শুধু জেলেরাই নয়, মেথর সম্প্রদায়ের রয়েছে নিজস্ব গোষ্ঠী সংগঠন ও সর্দার। যার পরামর্শে মেথররা সংগঠিত হয়ে নিজস্ব অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়। আবার বেশ্যাপাড়ায় কৈলাসের আগমনে পতিতাদের মধ্যে অধিকারবোধ জাগরিত হয় যা কালু সর্দারের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ নিম্নবর্গের ইতিহাসের সমালোচকরা নিম্নবর্গের রাজনীতির ধারাটিকে খুঁজে পেতে ঔপনিবেশিক ভারতের নানা ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্রয় নিয়েছেন কারণ সেই ইতিহাস লুকোনো ইতিহাস। কিন্তু একজন সাহিত্যিকের সে বাধা নেই বলেই তিনি নির্দ্বিধায় নিম্নবর্গের রাজনৈতিক চেতনাকে সমাজ বাস্তবতা ও আখ্যানের প্রয়োজনে স্পষ্ট রূপদান করতে পারেন। এক্ষেত্রে হরিশংকর তথাকথিত নিম্নবর্গের অধিকারবোধ ও প্রতিরোধের চেতনাকে জাগিয়ে তুলে লুকোনো ইতিহাসকে সামনে এনেছেন। যেখানে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রকাশিত হয়েছে অপ্রকাশিত নিম্নবর্গের ইতিহাস।

৬.৪ হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্ব : নিম্নবর্গীয় চেতনার নিরিখে

আমরা জেনেছি, সাধারণ অর্থে নিম্নবর্গ হল ক্ষমতার সম্পর্কে আধিপত্যের বিপরীতে অধীনতাগ্রস্ত অধস্তন গোষ্ঠী। নিম্নবর্গ হল পরিচয়ের অভিজ্ঞতামূলক উপাধির মধ্যে অবস্থান, ক্ষমতা, অধীনতা ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে কীভাবে তাদের চিহ্নিত করা হয় তার একটি সমালোচনামূলক বোঝাপড়া, আর নিম্নবর্গ থেকে নিম্নবর্গত্বে অগ্রসর হওয়ার অর্থ একটি পরিচয় থেকে ক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। তাই সমালোচক নীলসেন মনে করেন, গুহ যে অর্থে সমগ্র জনসংখ্যা থেকে এলিটকে বাদ দিয়ে বাকি অংশকে নিম্নবর্গ বলে নির্ধারণ করেছেন, নিম্নবর্গীয়তা বিষয়টি কিন্তু তার থেকে আরো বেশি পরাধীনতার

সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাঁর মতে, 'নিম্নবর্গ' শব্দটি ব্যবহার হত দক্ষিণ এশিয়ার সমাজে পরাধীনতার বৈশিষ্ট্যের নাম হিসেবে যা শ্রেণি, বর্ণ, বয়স, লিঙ্গ ও সামাজিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বা যে কোনো অন্য উপায়ে প্রকাশ করা হয়। (Nilsen (ed.) 2015, p. 6-7)

নিম্নবর্গীয় চেতনা আলোচনা প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রামশি কথিত নিম্নবর্গের 'Common Sense' কথাটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, সাধারণ কর্মী-জনতার মধ্যে সক্রিয় মানুষ ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত, এই কর্মকাণ্ডের জগৎকে বোঝার কিছু রূপ জড়িত যা সে তার ব্যবহারিক কর্মের মাধ্যমে রূপান্তরিত করে। কারও মতে সাধারণ জনতার 'common sense'- এর দুটি তাত্ত্বিক চেতনার একটি হল তার কার্যকলাপে নিহিত বিরোধী চেতনা এবং অপরটি হল যা তাকে তার সমস্ত সহকর্মীর সঙ্গে একত্রিত করে। এই পরস্পর বিরোধী চেতনাকে আরো অন্বেষণ করে গ্রামশি উল্লেখ করেছেন,

> '... a conception which manifests itself in action, but occasionally and in flashes- when that is, the group is acting as an organic totality. But this same group has, for reasons of submission and itellectual subordination, adopted a conception which is not its won but is borrowed from another group; and it affirms this conception verbally and believes itself to be following it, because this is the conception which it follows in 'normal times'- that is when its conduct is not independent and autonomous, but submissive and subordinate.' (Hoare (eds.) 1971, p. 327)

পার্থ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন গ্রামশির এই মন্তব্যের মধ্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা বিশ্লেষণের একটি সম্ভাব্য সূত্র রয়েছে। তাঁর মতে আমরা নিম্নবর্গীয় চেতনাকে পরস্পরবিরোধী, খণ্ডিত বা কম-বেশি এলোমেলোভাবে একত্রে রাখা সাধারণ জ্ঞান হিসেবে দেখি। এটি একটি অস্পষ্ট ও বহুমুখী ধারণা। নিম্নবর্গীয় চেতনাটি আসলে একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে গঠিত এবং রূপান্তরিত হয় প্রভাবশালী এবং অধীনস্ত শ্রেণিকে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে নিয়ে আসে। তাই নিম্নবর্গের সাধারণ জ্ঞান হল দুটি উপাদানের পরস্পর বিরোধী ঐক্য। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'Common sense' কোনো অনমনীয় এবং অচল কিছু বিষয় নয় বরং এটি ক্রমাগত নিজেকে পরিবর্তন করছে যা দার্শনিক মতামত দিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে সাধারণ জীবনে প্রবেশ করে। অন্যদিকে নতুন ধর্ম ও দর্শন এর নতুন ব্যবস্থার আধিপত্যের উদ্ভব ও আধিপত্যবাদী অধস্তন গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াইয়ের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। সাধারণ অর্থে নিম্নবর্গের স্বয়ংক্রিয় স্বায়ত্তশাসিত উপাদানটি শ্রেণিগুলির মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্বের মুহূর্তে অবিকল বিস্ফোরিত হয় এবং এই মুহূর্তে সমাজের দুটি বিরোধী বিশ্বাস, দুটি বিরোধী ধর্ম, দুটি বিরোধী মতবাদ সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্ন হওয়ার ক্ষেত্রকে প্রকাশ করে। (Guha (ed.) 1989, p. 170-71) অর্থাৎ নিম্নবর্গীয় চেতনা আসলে খণ্ড, পরস্পরবিরোধী ও বহুমুখী একটি ধারণা। এর বৈশিষ্ট্য হিসেবে সমালোচকেরা দেখিয়েছেন যে, নিম্নবর্গীয়

চেতনায় প্রগতিশীল মানসিকতা রয়েছে যা তাকে একক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে পরিচয় পরিবর্তনে উৎসাহ যোগায় অর্থাৎ প্রান্ত থেকে মধ্য পর্বে উত্থানের চেষ্টা থাকে। দ্বিতীয়ত নিম্নবর্গীয় চেতনার ধর্মভাব ও নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনা যা তার সহকর্মী ও শ্রেণির সঙ্গে একত্রিত বা সংঘবদ্ধ করে গড়ে তোলে শ্রেণিচেতনা।

১৯৯৮ সালে পার্থ চট্টোপাধ্যায় 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে জানিয়েছিলেন যে সাবঅলটার্ন স্টাডিজের প্রথম দিকের সমালোচনাতে নিম্নবর্গীয় চেতনা নিয়ে একটি আপত্তি তৈরি হয়েছিল। আপত্তির পেছনে মূল প্রশ্ন উঠেছিল এই যে, নিম্নবর্গের চেতনা যে একটি স্বতন্ত্র চেতনা একথার মধ্য দিয়ে কি ঐতিহাসিকরা চেতনার পৃথকীকরণ, ও সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে উন্নত চেতনার অধিকারী অগ্রগামী শ্রেণির ভূমিকাকে অস্বীকার করছেন? তাঁরা কি উচবর্গ-নিম্নবর্গের চেতনাকে স্বতন্ত্র ঘোষণা করে এদের মধ্যে তুলনাকে অস্বীকার করছেন? এক্ষেত্রে নিম্নবর্গের ঐতিহাসকের উত্তর হল, নিম্নবর্গের অবস্থান থেকে দেখলে ঔপনিবেশিক জাতীয়তাবাদ ও প্রগতিবাদের ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে যে নিম্নবর্গের কোনো স্বতন্ত্র ভূমিকা নেই- এই কথাটি প্রমাণ করাই 'সাব-লটার্ন স্টাডিজের' মূল উদ্দেশ্য। তাই নিম্নবর্গের ইতিহাসের প্রধান কাজ হল- প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের সমালোচনা না করে বিরোধী ইতিহাস রচনার মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র চেতনাকে অনুসন্ধান করা। কারণ,

> 'বিকল্প ইতিহাসরচনা-পদ্ধতির কোনো পরিপূর্ণ কর্মসূচী নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক দিতে পারেন না।'
>
> (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.১৩)

একজন ঐতিহাসিক বিকল্প ইতিহাস রচনা করতে না পারলেও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে হরিশংকর জলদাস সেই বিকল্প ইতিহাস রচনা করেছেন অনেকাংশেই। এখানে নিম্নবর্গীয় চেতনার স্বতন্ত্র প্রকাশ আমরা লক্ষ করেছি। আলোচনার এই পরিসরে নিম্নবর্গের সেই স্বতন্ত্র চেতনাকে হরিশংকরের পাঠকৃতির নিরিখে নিচে তুলে ধরা হল।

৬.৪.১ নিম্নবর্গের প্রগতিশীল চেতনা:

প্রগতিশীল ইতিহাসের প্রথম ব্যাখ্যাই হল মানুষের চেতনার বিকাশ ও অনুন্নত বা পূর্বের অবস্থান থেকে উন্নত চেতনার দিকে ক্রমশ বিকশিত হওয়া। এই বিকাশতত্ত্ব যেমন সমগ্র সমাজ তথা সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনি ইতিহাসের অভ্যন্তরে সৃষ্ট হওয়া বিভিন্ন শ্রেণি বিভাজনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ

শ্রেণিবিভাগ দিতে সমাজে আর্থিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ক্ষমতাশীলের চেতনা ক্রমশ উন্নত হয়ে ওঠে। হরিশংকরের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের প্রগতিশীল মানসিকতা লক্ষ করা গিয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রে।

৬.৪.১.১ শিক্ষায় প্রগতিশীল মানসিকতা

সামাজিক ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের প্রগতিশীল মনোভাব হরিশংকরের বেশিরভাগ উপন্যাস-গল্পে আমরা উঠে আসতে দেখেছি। লক্ষণীয় যে জেলে-মুচি-মেথর-পতিতা-দিনমজুর-গোয়ালা ইত্যাদি সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গীয় পরিবার নিজেদের সামাজিক অবস্থান থেকে তাদের উত্তরসূরিকে মুক্তি দিয়ে এক নবজীবনের দিকে তাদের প্রসারিত করে দিতে চেয়েছে। দেখা যাচ্ছে এই অবস্থান থেকে মুক্তির পথ হিসেবে তারা বেছে নিয়েছে শিক্ষা তথা শিক্ষিত হয়ে চাকরি পাওয়ার মাধ্যমে সভ্য সমাজের স্থান করে নেওয়া। তাইতো 'জলপুত্র' উপন্যাসে স্বামীহীন ভুবনেশ্বরী তার একমাত্র সন্তান গঙ্গাপদকে স্কুলে ভর্তি করায়। উপন্যাসে জানা যায়-

> 'এরই মাঝে ভুবনেশ্বরী প্রতিজ্ঞা করে—তার ছেলে গঙ্গাপদ পড়াশোনা করবে। হিন্দু-মুসলমানের সন্তানদের মতো সেও শিক্ষিত হয়ে বাপের অপমৃত্যুর দাগ ভুবনেশ্বরীর হৃদয় থেকে মুছে দেবে।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১৩)

'দহনকাল' উপন্যাসে দেখি রাধানাথ শত কষ্ট করে হরিদাসকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করে। কারণ সে চায় ছেলে জেলেজীবন থেকে মুক্তি দিয়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে দিতে। তাইতো রাধানাথের সংকল্প করে-

> '..হরিদাসেরে আঁই পড়াইয়ম। মাছ মারইন্যা জাইল্যা হইতাম দিতাম নো।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৩)

আমরা 'কসবি' উপন্যাসে সাহেবপাড়া পতিতাপল্লির মোহিনী মাসিকে দেখা যায়, সে তার সন্তান কৈলাসকে পতিতাসমাজের কলুষিত জীবন থেকে দূরে জলধি গ্রামের মরিয়ম একাডেমিতে শিক্ষা অর্জন করতে পাঠিয়ে দেয় যাতে শিক্ষিত হয়ে তথাকথিত ভদ্রসমাজে নিজের স্থান করে নিতে পারে। অন্যদিকে 'রামগোলাম' উপন্যাসে লক্ষ করা যায় শিবচরণ স্ত্রীর চাঁপারানী তার ছেলে রামগোলামকে পড়াশোনা শিখিয়ে ভদ্রলোকের মত জীবন দিতে চেয়েছে। তার মতে,

> 'টাট্টি আর আবর্জনা টানার কাজ সে করবে না। অফিসার হবে সে, বউ ছাওয়াল নিয়ে ভদ্রপাড়ায় থাকবে।'
> (জলদাস ২০১২, পৃ. ২৬)

'অর্ক' উপন্যাসে বলরাম জলদাসও তার ছেলে দিবাকরকে শত কষ্ট সহ্য করেও লেখাপড়া শেখায়। বলরামের মা বলরামকেও শিক্ষিত করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু অর্থাভাবে তার স্বপ্ন পূরণ হয় না। কিন্তু নাতি দিবাকরের ক্ষেত্রে সে বলরামকে বলে-

'তুইতো পারলি না বলরাম লেখাপড়া করতে, তোর ছেলেমেয়েকে পড়াশোনা করাস। তাহলে তাদেরকে তোর মত রাক্ষসী সমুদ্রে যেতে হবে না, আমার মতো মাথায় খাড়াং নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় মাছ বেচতে হবে না। হিন্দুপাড়ার বাবুদের মতো তারা অফিস আদালতে চাকরি করবে। (জলদাস ২০১৭, পৃ. ১২-১৩)

'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে শিবশঙ্করকেও দেখা যায় জেলেজীবন থেকে মুক্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করে শিক্ষক ও পরে অধ্যাপক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। শুধু তাই নয়, তার সন্তানদের সুস্থ-সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে সে জেলেপাড়া ত্যাগ করে চট্টগ্রাম শহরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে তথাকথিত ভদ্র সমাজে বাস করার শুরু করে।

উপন্যাসের মতো গল্পেও শিক্ষার মধ্য দিয়ে বিকশিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন 'কোটনা' গল্পে রামদুলাল মুচি তার ছেলে অশোকের 'দাস' পদবী বদলে 'চৌধুরী' করার অনুরোধ করে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে। কারণ সে জানে নিচুজাতের সমাজে সুযোগ সম্মান মর্যাদা নেই। তাই দাস থেকে চৌধুরী অর্থাৎ পদবী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের চেষ্টা দেখা গিয়েছে রামদুলালের মধ্যে। আবার 'সুবল জেঠা' গল্পে সুবল জেঠা তার দুই ছেলেকে দারিদ্র্যের মধ্যে লেখাপড়া শিখিয়েছেন যাতে তারা উচ্চ শিক্ষিত হয়ে বড়ো চাকরি করতে পারে।

তাহলে সমাজের নিম্নবর্গ তাদের সামাজিক অবস্থানকে পরিবর্তন করতে চেয়েছে উত্তরসূরি অর্থাৎ তাদের সন্তানদের মধ্য দিয়ে। কারণ যে সামাজিক অবস্থানে এতদিন তারা বাস করেছে সেই অবস্থানে জীবন কি পরিমাণ দুর্বিষহ তার পূর্বসূরী জানে বলেই তারা তাদের উত্তরসূরির জীবনকে শিক্ষা অর্জনের মধ্য দিয়ে সুরক্ষিত ও উন্নত করতে চেয়েছে।

৬.৪.২ নিম্নবর্গের কুসংস্কার ও অদৃষ্টে বিশ্বাস :

গবেষক রণজিৎ গুহ জানিয়েছেন, নিম্নবর্গীয় চেতনার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হল ধর্মভাব। যদিও ধর্ম বলতে তিনি ধর্মীয় সংস্থার প্রতি আনুগত্যকে নির্দেশ করেননি, বরং তিনি বোঝাতে চাইছেন, ধর্ম চেতনার এমন এক বিচ্ছিন্ন অবস্থা যার প্রভাবে জড় বা জীবের কোনো সত্তা বা বাস্তব ভাবনার বিষয়কে যথার্থভাবে ধারণার মধ্যে আনতে না পেরে এক বিষয়ের ওপর আরেক বিষয়ের গুণ বা দোষ আরোপ করে। অর্থাৎ যা বাস্তব তাকে অলৌকিক এবং যা অলৌকিক তাকে অদৃষ্ট বা দৈবশক্তি বলে দ্বিধান্বিত হয়। নিম্নবর্গীয় চেতনার এই ধর্মভাবের ফলে ব্যক্তি তার নিজের কার্যকারিতা ও প্রতিভাকে অন্যের কৃতিত্ব বলে মনে করে। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.৪৩) নিম্নবর্গীয় চেতনারই বৈশিষ্ট্যকে উদাহরণসহ বোঝানোর জন্য

তিনি জানান, মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যের রচয়িতা কাব্যের শুরুতেই তাই জানিয়ে দেন যে তাঁর রচনা তাঁর নিজের সৃষ্টি নয়, বরং যে দেবীর মঙ্গলগাঁথা রচিত হয়েছে তা আসলে দেবীই তাকে দিয়ে লেখাচ্ছেন। অর্থাৎ কবি যন্ত্র এবং দেবী বা অন্য অদৃশ্য কোনো শক্তি হল যন্ত্রী। এই ধরনের ধর্মভাব তখনই জেগে ওঠে যখন নিম্নবর্গের মনে একদিকে আকাঙ্ক্ষা অন্যদিকে সেই ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও উপাদানের অভাবজনিত দুর্বলতা তৈরি হয়। অর্থাৎ একদিকে নিম্নবর্গের অধিকারদাবী ও বিদ্রোহের প্রতিরোধ অন্যদিকে ব্যর্থতা ও হতাশা। এদিক থেকে নিম্নবর্গীয় চেতনায় ধর্মভাবটি আসলে তাদের রাজনীতির একটি উপাদান। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ৪৩) হরিশংকরের কথাবিশ্বে কিছু ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের চেতনায় এই ধর্মভাবের পরিচয় পেয়েছি।

'জলপুত্র' উপন্যাসের কামিনী বহদ্দার চরিত্রটির মধ্যে এই ধর্মভাবের দ্বান্দ্বিকতা লক্ষণীয়। কামিনীর প্রতিবাদহীনতার কথা প্রত্যক্ষভাবে উপন্যাসে উঠে এলেও জেলেসমাজ যে যুগ-যুগান্তর থেকে অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে প্রতিবাদহীনভাবে জীবনযাপন করে এসেছে তার প্রমাণ উপন্যাসে পাওয়া যায়, যখন গঙ্গা তার মায়ের অপমানের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত করে। উপন্যাসের ভাষায়,

> 'যে-কাজটা পুরুষ পরম্পরায় জেলেসমাজ করতে পারেনি, সেটা করে দেখিয়েছে আজ গঙ্গা। নানা ছল-চাতুরির আশ্রয়ে উচ্চকোটির মানুষরা তাদের সঙ্গে যুগ-যুগান্তর ধরে হীন আচরণ করে আসছে। কেউ কোনোদিন এর প্রতিবাদ করেনি। বরং কপালের লিখন হিসেবে ধরে নিয়ে এসব অত্যাচার-অবিচারকে নীরবে সহ্য করে গেছে।'
>
> (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১০২)

'অর্ক' উপন্যাসে বলরাম যখন দিবাকরকে হাইস্কুলে ভর্তি করাতে যায় তখন প্রধান শিক্ষক সত্যব্রত চক্রবর্তীর বয়ানে জানা যায় যে জেলেরা দীর্ঘকাল ধরে অধীনতার অভিজ্ঞতা নিয়ে জীবন যাপন করে আসছে। অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে তার প্রতিবাদহীনভাবে ভীতসন্ত্রস্ত দিন কাটায়। কিন্তু নিম্নবর্গের সঙ্গে তথাকথিত উচ্চবর্গের যা আচরণ, তা কপালের দোষ বা অলৌকিকতা নয়। তা আসলে নিম্নবর্গের ভীতি ও অক্ষমতা। প্রধান শিক্ষকের কথায় জেলেদের এই অদৃষ্টে বিশ্বাসের কথা ধরা পড়েছে।

> 'দেখ বলরাম, যুগ যুগ ভরে তোমরা তুই তোকারি, গালিগালাজ শুনে আসছ। তোমরা এসব অন্যায়কে ঈশ্বরের বিধান বলে সহ্য করে আসছ। এসব ঈশ্বরের বিধানটিধান কিছু না। এ জন্য দায়ী তোমাদের প্রতিবাদহীনতা।'
>
> (জলদাস ২০১৭, পৃ. ২২)

আবার 'দইজ্যা বুইজ্যা' গল্পে পারুলবালা যখন পাক সৈন্যদের দ্বারা ধর্ষিত হয় তখন তার মায়ের বিলাপে ধরা পড়ে অদৃষ্টে বিশ্বাসী মনোভাব।

> 'আঁই শেষ, আঁরা শেষ! অ ভগবান, তুঁই আঁরার কোয়ালত্ এই কলঙ্ক লেখি রাখ্যিনা দে না?'

(জলদাস ২০১৬(ক) পৃ. ২৩)

লক্ষণীয় পাকসৈন্যের অন্যায় কৃতকর্মের দোষ ঈশ্বরের বিবেচনার ওপর আরোপ করা হয়েছে। একই রকম ভাবে 'জামাইখেকো' গল্পে ক্ষুদিরাম মাছ ধরতে গিয়ে সমুদ্রে তলিয়ে গেলে তার স্ত্রী আরতী বিলাপ করে,

> 'ও ভগবান রে! ও ঈশ্বর! আঁর কোয়াল পুইল্যরে ঠাকুর। মা গঙ্গারে, তোঁয়ার কী দোষ গর্বিলাম রে জননী! তুঁই আঁর সোয়ামিরে কড়ি লইলা রে ম!' (জলদাস ২০১৬(ক) পৃ. ৩৭৮)

একথা সত্য যে জেলেদের জীবন বাজি রেখে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে হয়।. কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদের প্রাণনাশ হতে পারে। তাই বলে জীবন সুরক্ষিত নয়। কিন্তু নিম্নবর্গীয় চেতনায় এই বাস্তব সত্যের বদলে সমুদ্রকে মা গঙ্গার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যা আসলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তার বাস্তব ভাবনার বিষয়ে যথাযথ ধারণার মধ্যে আনতে না পেরে এক বিষয়ে দোষ বা গুণ অপর বিষয়ে আরোপ করেছে নিম্নবর্গ। তাইতো মা গঙ্গাকে পরোক্ষভাবে দোষারোপ করেছেন আরতী ক্ষুদিরামের মৃত্যুর জন্য।

রণজিৎ গুহ জানান, নিম্নবর্গীয় চেতনায় এই কুসংস্কার নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাঁর মতে নিম্নবর্গীয় চেতনায় রাষ্ট্রশক্তি আসলে স্থানীয় প্রতিনিধিদের ক্ষমতার মধ্যে দৃশ্যমান। তাদের চেতনায় রাষ্ট্রের সামগ্রিক ও স্থানীয় রূপের মধ্যে দিয়ে শূন্যস্থান তৈরি হয়, সেই স্থান নিম্নবর্গ পূরণ করে ক্ষমতার প্রকৃতি ও প্রয়োগ সম্পর্কে নানারকম অলৌকিক শক্তি দিয়ে। সেই কারণেই ক্ষমতা কাঠামোর একেবারে তলদেশে মানুষেরা একেবারে ওপরতলার মানুষদের ক্ষমতা ও শক্তিকে অলৌকিক বা দৈবশক্তি মনে করে। (Guha (ed.) 1982, p. 13)

৬.৪.৩ নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনা

রণজিৎ গুহ তাঁর 'Elementary aspects of peasant insurgency in colonial India' গ্রন্থে উচ্চবর্গীয় রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে নিম্নবর্গীয় রাজনৈতিক চেতনার পার্থক্য ও কৃষক বিদ্রোহের প্রাথমিক দিক আলোচনা করতে গিয়ে প্রতিবাদী কৃষক চৈতন্যের ছয়টি দিক চিহ্নিত করেছেন। যথা- (১) Negation বা অস্বীকার (২) Ambiguity বা অস্পষ্টতা (৩) Modality বা পদ্ধতি ব্যাখ্যা (৪) Solidarity বা সংহতি (৫) Transmission বা সংক্রমণ ও (৬) Territoriality বা আঞ্চলিকতা। গবেষক পার্থ চট্টোপাধ্যায় এর ব্যাখ্যায় বলেছেন,

> "He identified six 'elementary aspects', as he called them, of the insurgent peasant conciousness: negation, ambiguity, modality, solidarity, transmission and territoriality. The insurgent consciousness useas, first of all, a 'negative consciousness." (Chaturvedi (ed.) 2000, p. 12)

এ প্রসঙ্গে কৃষকের প্রতিবাদী চেতনাকে রণজিৎ গুহ 'নেতিবাচক চেতনা' বলেছেন এই অর্থে যে, এটির পরিচয় শুধুমাত্র বিরোধিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। তিনি আরো বলেন,

> 'The limits of this geographical space were determined, on one hand, negatively by the rebel's perception of the geographical spread of the enemy's authority, that is to say, by a principle of exclusion, and on the other, positively by a notion of the ethnic space occupied by the insurjent community, that is by the principle of solidarity. The intersection of these two spaces defined the territoriality of the insurgency.' (Chaturvedi (ed.) 2000, p. 13)

গুহ কথিত উপরোক্ত কৃষকের প্রতিবাদী চেতনার ছয়টি উপাদানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে 'the nation of community'। প্রতিটি উপাদান সম্প্রদায়ের নীতির মাধ্যমে নির্দিষ্টভাবে তার রাজনৈতিক রূপ প্রকাশ করে। হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনাটি ধরা পড়েছে তা কখনো সমষ্টিগত বা কখনো একক হলেও গুহ কথিত প্রতিবাদী চেতনার অধিকাংশ উপাদানগুলি সেখানে ধরা পড়েছে।

ইতিপূর্বে আলোচিত পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি হরিশংকরের কথাবিশ্বে নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনার ধরন ও ব্যর্থতার কারণ। 'জলপুত্র' উপন্যাসে শুক্কুর ও শশিভূষণের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে ওঠার পেছনে জেলেদের 'সংহতি' ও 'সংক্রমণ' অর্থাৎ প্রতিবাদের বার্তার দ্রুত সংক্রমণ ও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া উপাদানটি ধরা পড়েছে যখন তারা বিজন বহদ্দারের বাড়িতে সঙ্গবদ্ধ হয়ে শুক্কুর- শশিভূষণ শাস্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করে। আবার জেলেদের এই পরিকল্পনার কথা শুনে যখন শুক্কুর- শশিভূষণ ষড়যন্ত্র করে জেলেদের নেতৃত্ব গঙ্গাপদকে হত্যা করেছে। তখন জেলেদের মধ্যে 'পদ্ধতি' নামক উপাদানটি নজরে আসে। যার ফলে জেলেরা শশিভূষণকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে গেলেও তাদের সামনে না পেয়ে তাদের খামারটিতে আগুন লাগিয়েছে। আবার 'দহনকাল' উপন্যাসে পাক-সৈন্যদের প্রতিনিয়ত অত্যাচার সহ্য করতে করতে জেলেরা যখন দেখল সৈন্যরা তাদের মা-বোনদের ধর্ষণের উদ্যত হয়েছে তখন তাদের মধ্যে 'সংহতি' ও 'সংক্রমণ'-এর উপাদান অনুধাবন করা যায় যা প্রতিরোধের প্রাক্-মুহূর্ত হিসেবে আমরা লক্ষ করেছি। লক্ষণীয় যে সৈন্যদের বিরুদ্ধে তারা সরাসরি প্রত্যাঘাত করেছে। আসলে সৈন্যরা রাষ্ট্রপ্রেরিত মাধ্যম মাত্র। জেলেদের আসল শত্রু পাকিস্তান সরকার। কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে 'অস্বীকার' বা প্রত্যাখ্যানের মনোভাব দেখা গিয়েছে তাদের আসল শত্রুদের প্রতি। দেখা গেল, আসল শত্রুদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলাকে অস্বীকার করে জেলেরা রাতের অন্ধকারে তাদের নিপীড়কদের প্রতি আঘাত করেছে। এরকমই 'কসবি' উপন্যাসে দেবযানী যখন কালুকে সর্বসমক্ষে ছুরি দিয়ে হত্যা করে তখন তার মধ্যেও 'অস্বীকার' উপাদানটি কাজ করেছে। কারণ সে পতিতাপল্লির দুরবস্থার জন্য যারা দায়ী

তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাকে অস্বীকার করে প্রত্যক্ষ শত্রু কালুকে হত্যা করেছে। 'রামগোলাম' উপন্যাসে তাই মেথর সম্প্রদায় তাদের প্রতি সমস্ত অন্যায়ের জন্য কর্পোরেশনের বড়োবাবুকে দায়ী করে তার বিরুদ্ধে ধর্মঘট ও অসহযোগের পথে নামে। কিন্তু তাদের শত্রু আসলে রাষ্ট্র প্রশাসক। কারণ প্রশাসনের নেওয়া সিদ্ধান্তের জন্য বড়োবাবু মেথরদের চাকরিকে সুরক্ষিত রাখতে দেয়নি। ফলে মেথরদের মনে 'সংহতি' বা 'সংক্রমণ'-এর পাশাপাশি 'অস্বীকার'-ও লক্ষ করা যায়। 'একলব্য' উপন্যাসেও লক্ষ করা গেল একলব্য ও কর্ণ তাদের লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে এসে দ্রোণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলেও তাদের দুজনের ক্ষোভ গিয়ে পড়েছে অর্জুনের প্রতি। কারণ তাদের ধারণা অর্জুনকে শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর রূপে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই দ্রোণ কর্ণ ও একলব্যকে যোগ্য মর্যাদা দেয়নি। তাই তারা নিজের চেষ্টায় বীর ধনুর্ধরে পরিণত হওয়ার পর অর্জুনকে নানাভাবে পরাস্ত করার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে 'অর্ক' উপন্যাসের শেষে দেখা যাচ্ছে জেলে সমাজকে দীর্ঘদিন ধরে শোষণ করে আসা ছোবান মেম্বারকে এক রাতের অন্ধকারে মুক্তিযোদ্ধা রহমালি তার বাড়ির সামনে খুন করে। এখানে রাষ্ট্র শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রত্যাখ্যান করে রাষ্ট্র প্রতিনিধিকে হত্যা করা হয়েছে। একইভাবে 'দইজ্যা বুইজ্যা' গল্পে হরগোবিন্দ ক্যাপ্টেন মোর্শেদকে থেকেই তার ও জেলেসমাজের শত্রু মনে করে তাকে হত্যা করেছে। রাষ্ট্রর ক্ষমতার অত্যাচার তার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে অনায়াসে।

৬.৫ সারাংশ ও সিদ্ধান্ত

ইতিহাসের কৃষক চেতনাকে বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে যে তাত্ত্বিক পরিসর সৃষ্টি হয়েছে তা স্থান-কাল-পাত্র ও পরিস্থিতি ভেদে হরিশংকরের কথাসাহিত্যে বর্ণিত নিম্নবর্গের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে হরিশংকর জলদাস অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিবিশেষ থেকে মুক্ত হয়ে নির্বিশেষের হয়ে তার কথাবিশ্বকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি একদিকে যেমন নিম্নবর্গের ইতিহাসের সূত্র ধরে নিম্নবর্গের বিনির্মাণ করেছেন তেমনই নিম্নবর্গের চেতনাকেও তার কথাসাহিত্যে তুলে ধরে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' বর্ণিত কৃষক চৈতন্যর কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বারবার। সুতরাং আলোচনার এই পরিসরে এসে বলতেই হয়, নিম্নবর্গের প্রকৃত স্বরূপটি তুলে ধরে 'উচ্চবর্গের নির্মাণের খোলস' খসিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব কেবল একজন ঐতিহাসিক পালন করেন না বরং একজন নিরপেক্ষ দায়বদ্ধ সাহিত্যস্রষ্টাও সেই দায়িত্ব পালন করতে পারেন। যেমন করেছেন হরিশংকর জলদাস। ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনার দলিল-দস্তাবেজ যা করতে পারে না তা কিন্তু একজন সাহিত্য নির্মাতা নিম্নবর্গ নির্মাণের কাজটিকে সহজ

করতে পারেন। রণজিৎ গুহ নিম্নবর্গের চেতনার স্বতন্ত্র সত্তা ও উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ ধারণাটির সম্পর্ক নির্ধারণ করতে গিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন,

> 'যদি নিম্নবর্গের চৈতন্যকে একটি স্বতন্ত্র সত্তা বলে স্বীকার করা হয় তাহলে তার বৈশিষ্ট্য কী এবং উচ্চবর্গের চিন্তাভাবনা আদর্শ ও মানসিকতার সঙ্গে তার সংঘাত ও সমঝোতা—এক কথায়, তাদের পারস্পারিক সম্পর্ক বুঝবো কোনো তত্ত্ব বা বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে?' (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.৩১)

এই সম্পর্ক আমরা বুঝব সমাজ কাঠামোর একটি স্তরে যেখানে ক্ষমতাই শেষ কথা। ক্ষমতার নিরিখেই আধিপত্য ও অধীনতা, শাসন-শোষণের দ্ব্যণুক বৈপরীত্যের অবস্থানকে বোঝা সম্ভব। কিন্তু আমাদের মতে উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ পারস্পারিক সম্পর্কটি শুধুমাত্র ঐতিহাসিকতার বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে না দেখে বরং সাহায্য নিতে পারি সেই সব সাহিত্যের যেখানে নিম্নবর্গীয় চেতনার সত্য ও বাস্তবসমস্ত প্রকাশ ঘটেছে। যেখানে উচ্চবর্গ দ্বারা নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরকে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। সুতরাং ইতিহাসের সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণকে উপেক্ষা করেও একজন নিম্নবর্গ দ্বারা নিম্নবর্গের সাহিত্য রচনাকে 'স্বতন্ত্র সৃজনী প্রতিভার ফল' হিসেবেই দেখতে হবে। কারণ স্পিভাকের মতো আমাদেরও মনে হয়েছে, এ ধরনের সাহিত্যই পরবর্তীকালে সৃষ্টি করতে পারে নতুন কোনো তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ। যদিও সে ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের সঙ্গে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান যুক্ত করতে হলে ইতিহাস ও সাহিত্যকে পরস্পরের পরিপূরক করে তোলা প্রয়োজন। তবে এও সত্য যে সাহিত্যকে আকর হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে গেলে সেখানে হয়তো বাস্তবের বিচ্যুতি ঘটবে, অনেকাংশে কল্পনা স্থান নেবে কিন্তু তাতে নিম্নবর্গের সামাজিক সত্তার মধ্যে কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না। সুতরাং এভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে, নিম্নবর্গীয় চেতনাকে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর দৃষ্টিতে যেভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, যেভাবে নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক, সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাবিন্যাসের শৃঙ্খলকে দেখা হয়েছে তা নিম্নবর্গের ইতিহাস ধারণ করুক এবং সাবঅলটার্ন তত্ত্ব অনুযায়ী তা একজন সাহিত্যিক দ্বারা বিশ্লেষিত হোক। ফলে এ ধরনের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই ভবিষ্যতে নিম্নবর্গের এক বিকল্প ইতিহাস লেখা সম্ভব হবে। যেমনটি লেখার চেষ্টা করেছেন হরিশংকর জলদাস। সুতরাং সামগ্রিক আলোচনার শেষে একজন ঐতিহাসিক এবং একজন সাহিত্যিকের মেলবন্ধনই বর্তমানে আমাদের কাছে প্রত্যাশিত।

উপসংহার

‘হরিশংকর জলদাসের আখ্যানবিশ্ব : নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে’ শিরোনামে পরিবেশিত গবেষণা সন্দর্ভের উপসংহারে পৌঁছে প্রাথমিকভাবে আমরা ছয়টি অধ্যায়ে বিভাজিত সমগ্র গবেষণা কর্মটির নির্যাসবিন্দুকে একে একে নিম্নে সাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি।

প্রথমত, প্রিজন নোটবুকে আন্তোনিও গ্রামশির 'সাবঅলটার্ন' শব্দ প্রয়োগ ও মিশেল ফুকোর প্রতাপ তত্ত্বের সূত্র ধরে ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’ চর্চার সূচনা। যার মধ্য দিয়ে রণজিৎ গুহর ‘নিম্নবর্গ’ বঙ্গীয়শব্দ প্রয়োগ ও কৃষক চেতনা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গীয় চেতনাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সর্বোপরি গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক দ্বারা ইতিহাসের বিনির্মাণের কথা তুলে ধরার মধ্য দিয়েই নিম্নবর্গ ও নিম্নবর্গীয় চেতনার বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে। যেখানে গ্রামশি ও মিশেল ফুকোর ক্ষমতার যূথবদ্ধ ধারণার পথ বেয়ে ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’ গোষ্ঠীর নানা সমালোচনা ও বিতর্ককে সামনে রাখা হয়েছে। দেখা হয়েছে কীভাবে জাতিভেদ প্রথা, সম্প্রদায়িকতা, নারীর নিম্নবর্গীয়তার মধ্য দিয়ে উচ্চবর্গ দ্বারা প্রতিনিয়ত নিম্নবর্গের নির্মাণ হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সাহিত্যে ‘সাবঅলটার্ন’ শব্দটিকে যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে বা নিম্নবর্গীয় চেতনা বা তত্ত্ব যেভাবে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের সীমা ছাড়িয়ে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ স্থান দখল করেছে, কিংবা যেভাবে বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের ক্রমশ রূপান্তর ও উত্থান ঘটেছে সেই বিষয়টিকে স্পষ্ট করার লক্ষ্যে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনার ক্রমবিকাশকে আলোচনার মাধ্যমে দেখতে চেয়েছি।

তৃতীয়ত, গবেষণায় নির্বাচিত হরিশংকর জলদাসের নিম্নবর্গ-প্রধান কথাসাহিত্যে বর্ণিত তথাকথিত নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে যথাসম্ভব বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। যেখানে উঠে এসেছে মূলত জেলে সমাজ, মেথর সমাজ ও পতিতা সমাজের কথা। তাদের বাসস্থানের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রান্তিক জীবনযাপন, আচার-ব্যবহার, রুচিশীলতা, সংস্কৃতি ও সর্বোপরি তাদের প্রগতিশীল চেতনায় জীবনযাপনের পরবর্তী অধ্যায়ে পৌঁছনোর প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রামকে লক্ষ করা গিয়েছে যা নিম্নবর্গের চালচিত্রকে প্রমাণ করে।

চতুর্থত, নিম্নবর্গের বিপরীতে উচ্চবর্গের অবস্থান ও তাদের দ্বারা নিম্নবর্গের প্রতিনিয়ত বঞ্চনা ও শোষণের চিত্রটি হরিশংকরের কথাসাহিত্যের একটি বিশেষ দিক হিসেবে ধরা পড়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। নিম্নবর্গীয় সমাজের প্রতি নানাবিধ শোষণ-বঞ্চনার চিত্রগুলি যেমন, সামাজিক শোষণ, অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক শোষণের পরিসীমা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। নিপীড়ন, অত্যাচার, ধর্ষণ, হত্যা, ষড়যন্ত্র ও

বিশ্বাসঘাতকতার চরমরূপের মধ্য দিয়ে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের দ্ব্যণুক অবস্থানকে বিশেষভাবে লক্ষ করা গিয়েছে।

পঞ্চমত, হরিশংকরের কথাসাহিত্যে বর্ণিত নিম্নবর্গ যে কেবল প্রতিবাদহীন ও নিষ্ক্রিয় তা নয়, প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী নিম্নবর্গকে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করতেও দেখা গিয়েছে। কখনো একক বা কখনো সম্মিলিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধে মুখর হয়েছে তারা। পুরুষসমাজের প্রতিবাদের ধরন ও নারী সমাজের প্রতিবাদের ধরনের ভিন্নতা রয়েছে সেখানে। তবে তাদের এই প্রতিবাদ সাময়িকভাবে ফলপ্রসূ হলেও বৃহত্তর ক্ষেত্রে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। নিম্নবর্গ যে কেবল উচ্চবর্গের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে চুপ করে থাকার পাত্র নয়, তা তারা জীবন দিয়ে পর্যন্ত বুঝিয়ে দিয়েছে, যা নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে গবেষণা সন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে।

ষষ্ঠত, সর্বশেষ ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, সাবঅলটার্ন গোষ্ঠীর সমালোচকেরা এমন একজন ঐতিহাসিকের কথা বলেন যিনি নিম্নবর্গের একজন হয়ে তাদের নির্মাণের কথা তুলে আনবেন। সে ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের মতো একজন সাহিত্যস্রষ্টাও যে নিম্নবর্গীয় চেতনা ও নিম্নবর্গ নির্মাণের কাজটি সহজ করে তুলতে পারেন—সেই বিষয়টিকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি সাবঅলটার্ন স্টাডিজ কথিত নিম্নবর্গের ইতিহাস ও নিম্নবর্গীয় চেতনাকে হরিশংকর জলদাস কীভাবে তাঁর কথাসাহিত্যের আকল্পে ব্যাখ্যা করেছেন তা তুলে ধরা হয়েছে- যার উদ্দেশ্য হল এটা প্রমাণ করা যে একজন সাহিত্যিকের নিম্নবর্গ প্রধান সাহিত্য সংরূপকেও ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজের বদলে নিম্নবর্গীয় চেতনার দলিল হিসেবে দেখা যেতে পারে।

সপ্তমত, পরিশিষ্ট অংশে আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে হরিশংকর জলদাসের বংশতালিকা, কালক্রমিক জীবন, তাঁর সৃজনবিশ্ব, অর্জিত পুরস্কারের পরিচয় ও সর্বোপরি লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরিচয় দিয়েছি।

সুতরাং উপরিউক্ত ক্রমে হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যকে নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা যা পেলাম তাতে দেখা গেল,

এক।

হরিশংকর জলদাস তাঁর কথাবিশ্বে নিম্নবর্গকে তুলে ধরেছেন একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ক্ষেত্রের মধ্যে। অর্থাৎ তথাকথিত জেলে, মেথর, পতিতা, কুমোর ইত্যাদি নিম্নবর্গীয় সমাজের মধ্যেই উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের বৈপরীত্যমূলক অবস্থান। ক্ষেত্র পরিবর্তনে ক্ষমতার পরিবর্তনের বিষয়টি সেভাবে কথাবিশ্বে উঠে আসেনি। নিম্নবর্গীয় সমাজের মধ্যেই তাঁর কথাসাহিত্যের সীমাবদ্ধতা।

দুই।

উচ্চবর্গের অপর হিসেবে নির্মিত নিম্নবর্গের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে গুরুত্ব সহকারে স্থান দেওয়ার পাশাপাশি কথাসাহিত্যে লক্ষ করা যায়, তাদের জীবিকার তাগিদে আমৃত্যু পরিশ্রম করার মানসিকতা, জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার জন্য অন্তিম প্রয়াস ও সর্বোপরি শোষিত-বঞ্চিত হওয়ার একই রকম অনুভূতি থেকে বারবার ঐক্যবদ্ধ হওয়া। উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের সম্মিলিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধ তাদের 'বাইনারি' অবস্থানে এনে দাঁড় করিয়েছে। কথাসাহিত্যে শুধুমাত্র নিম্নবর্গের উপস্থাপনের দিকটিই উঠে এল না, পাশাপাশি উচ্চবর্গের বিপরীতে প্রতিনিয়ত কীভাবে নিম্নবর্গের নির্মাণের দিকটিও উঠে এল। উচ্চবর্গ দ্বারা নিম্নবর্গ কীভাবে শাসিত ও শোষিত হয়ে সামাজিক অবনতির দিকে চলে যাচ্ছে-এই বিষয়টি লক্ষ করা গেল। নিম্নবর্গের নিজস্ব ভাবাদর্শের স্বতন্ত্র পরিচয় এবং অন্যায়-অত্যাচারের বিপক্ষে তাদের শ্রেণিচেতনার দিকটি গুরুত্ব পেল হরিশংকরের আখ্যানগুলিতে। নিম্নবর্গের আচার-ব্যবহার সংস্কৃতি, অর্থনীতি, পেশা, নেশা, সামাজিকতা, নিয়ম-নীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের মধ্য দিয়ে হরিশংকরের কথাসাহিত্য বহুমাত্রিক জীবনের শিল্প ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে—যা একই সঙ্গে নিম্নবর্গের ইতিহাস ও আখ্যান।

তিন।

নিম্নবর্গীয় চেতনায় শোষণ ও বঞ্চনার বিভিন্ন প্রকৃতিগুলি আসলে সামাজিক কাঠামোয় ক্ষমতার অসম বণ্টনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে নিম্নবর্গ প্রায় ক্ষেত্রেই প্রতিবাদহীন। যদিও কিছু ক্ষেত্রে তারা তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, কিন্তু সেই প্রতিক্রিয়া পরবর্তীকালে উচ্চবর্গের রোষের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। যার ফলে উচ্চবর্গের শোষণ আরো তীব্রতর রূপে প্রকাশ পেয়েছে নিম্নবর্গের প্রতি। অর্থাৎ একদিকে নিম্নবর্গের প্রতিবাদহীনতা, অন্যদিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া—এই দুইয়ের মাঝে পড়ে তারা বারবার কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। তবে হরিশংকর জলদাসের আখ্যানবিশ্বে বর্ণিত নিম্নবর্গ সাময়িকভাবে মার খেয়ে মার সহ্য করলেও একটা সময় তাদের মধ্যে শ্রেণিচেতনার উদ্ভব হয়েছে। সেই চেতনা তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করেছে যা পরবর্তীকালে তাদের সম্যক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম করেছে। নিম্নবর্গের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়, 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এ আলোচিত ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে যে কৃষক বিদ্রোহগুলি সংগঠিত হয়েছিল, তাদের মধ্যেও শ্রেণিচেতনা প্রবল ছিল, কিন্তু প্রতিবার ব্রিটিশ শাসকদের বিপরীতে তাদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে। আলোচ্য

কথাসাহিত্যেও নিম্নবর্গীয় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধগুলি তাদের প্রতিশোধস্পৃহাকে সাময়িক সন্তুষ্টি দিলেও উচ্চবর্গের ক্ষমতার কাছে তা ব্যর্থ হয়েছে।

চার।

ক্ষমতার সম্পর্কের একদিকে আধিপত্য থাকলে তার অপর প্রান্তে অবশ্যই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ও ক্ষমতার প্রাবল্যের কাছে কোনো প্রতিবাদ লক্ষ করা যায়নি। নিম্নবর্গের এই একান্ত অনুগত জীব হয়ে দৈনন্দিন অধীন জীবনযাপন নিম্নবর্গের নিম্নবর্গীয়তাকে যেমন স্পষ্ট করেছে তেমনই এই নিষ্ক্রিয়, ভীরুতা ও প্রতিবাদহীনতাই একটা সময় পরোক্ষভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতেও সাহায্য করেছে। সুতরাং 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এ আলোচিত কৃষক বিদ্রোহের নিরিখে উঠে আসা কৃষকের বিদ্রোহী চেতনার নেতিবাচকতা আসলে যে শুধু কৃষকই নয়, সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তা আমরা হরিশংকর জলদাসের আলোচ্য কথাবিশ্বের নিরিখেও অনুধাবন করলাম।

পাঁচ।

হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে শুদ্ধ- অশুদ্ধের মানদণ্ডের ওপর নির্ভর করে একদিকে যেমন সমাজ-মানুষের মধ্যে শ্রেণি বিভাজন হয়েছে তেমনই অন্যদিকে সমাজের কিছু বৃত্তিকে হেয় জ্ঞান করে তাদের নিম্নজাত বলে গণ্য করা হয়েছে। যেমন মেথরবৃত্তি, চর্মকার, পশুশিকার, মাছমারা ইত্যাদি পেশার সঙ্গে অশুদ্ধি বা অপবিত্রতা যুক্ত হয়ে আছে বলে সমাজে এগুলো নিম্নবৃত্তি। অপরপক্ষে যাগ-যজ্ঞ করা, শিক্ষকতা বা পরিশ্রম বর্জিত প্রায় সবরকম তথাকথিত বাবুশ্রেণির কাজ হল উচ্চবৃত্তির। ফলে আলোচ্য কথাসাহিত্যে বর্ণিত সামাজিক মানুষের মধ্যে নিম্নবৃত্তি ত্যাগ করে উচ্চবৃত্তি গ্রহণ করার মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। শুধু তাই নয়, হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থানের ফলে বহির্বিশ্বের নানা ঘটনার প্রভাব তাদের সাম্প্রদায়িক চেতনাকে সক্রিয় করেছে।

ছয়।

নিম্নবর্গীয় সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি তাদের পেশাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে। তবে জেলে, মুচি, চাষি, নাপিত ইত্যাদি পেশার মানুষেরা পুরুষানুক্রমিকভাবে একই পেশাকে অবলম্বন করে জীবন অতিবাহিত করলেও তাদের মধ্য থেকে কেউ শিক্ষা অর্জন করে তথাকথিত ভদ্রসমাজে নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। আবার কেউ পৈতৃক পেশা বদল করে কুলি, বাদনদলের বাদক, কেউ ভিক্ষে করে বা কেউ হাল চাষ করে জীবনধারণ করেছে। কিন্তু পতিতা ও মেথর সমাজের ক্ষেত্রে শিক্ষা অর্জন করে সমাজের মূলস্রোতে মেশার

কোনো সুযোগ তৈরি হয়নি। তাদের মধ্যে কেউ সে চেষ্টা করলেও তথাকথিত ভদ্রসমাজ তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমবিভাগের মধ্য দিয়ে এভাবেই সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা-বোধ সৃষ্টি হয়েছে।

সাত।

হরিশংকর জলদাস তাঁর কথাসাহিত্যে যে তথাকথিত নিম্নশ্রেণি তথা নিম্নবর্গীয় সমাজের কথা তুলে ধরেছেন সে সমাজে আলোচ্য পুঁথিগত শিক্ষার আলো প্রবেশ করতে পারে না। ফলে দিন আনা দিন খাওয়া নিম্নবর্গীয় সমাজ শিক্ষা নিয়ে খুব বেশি ভাবে না। এইসব তথাকথিত প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার উদ্যোগে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ হয় না। যদি তা বহু চেষ্টায় নির্মিত হয়ও, তথাপি তা গ্রাম থেকে সাত-আট মাইল দূরে অবস্থিত। দূরত্বের কারণে অনেকেই শিক্ষার্জনে আগ্রহ হারায় এবং স্থানীয় গৃহ শিক্ষকের কাছে নামমাত্র অক্ষর জ্ঞান লাভ করার পর তারা শিক্ষালাভ থেকে নিরস্ত হতে বাধ্য হয়।

আট।

হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে সংস্কৃতিগত আধিপত্যমূলক অপরত্ব ব্যাপারটি সে অর্থে উঠে আসেনি। কারণ তাঁর আখ্যানগুলি নিম্নবর্গ-প্রধান এবং সেখানে নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতিরই বর্ণনা আমরা পেয়েছি। হরিশংকর জলদাসের সাহিত্যে যে সমাজ ও সংস্কৃতিকে দেখি তা মূলত নিম্নবর্গকেন্দ্রিক যেখানে মূলত খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে ডাল, ভাত, মাছ, তরকারি, আলুর ভর্তা, রুটি, বিভিন্ন প্রকারের শাক-সবজি, মাংস, আচারের ব্যবহার এখনো বাঙালি সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও রয়েছে পুরোদস্তুর বাঙালিয়ানা। তাছাড়া গ্রামশি কথিত নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতিতে লোকসংস্কৃতির প্রভাব হরিশংকরের কথাসাহিত্যে বর্ণিত নিম্নবর্গের মধ্যে লক্ষণীয়।

নয়।

হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে যে অবস্থান থেকে সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গকে দেখা হয়েছে সেখানে সর্বোপরি প্রায় অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসে নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনাটি গুরুত্ব সহকারে প্রদর্শিত হয়েছে। যা নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে বিশ্লেষণ করার যোগ্য। তাছাড়া নিম্নবর্গের শ্রেণিচেতনা, প্রগতিশীল চেতনা, ধর্মভাব ও পরিস্থিতিভেদে নিম্নবর্গীয়তাকে স্বীকার করে নেওয়ার প্রবণতা উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গীয় চেতনা ও তাদের স্বতন্ত্র স্বরকে প্রকট করেছে।

দশ।

সর্বোপরি একথাই আমরা অনুধাবন করলাম যে, নিম্নবর্গের বিকল্প ইতিহাস রচনার জন্য সমালোচকেরা এমন ঐতিহাসিকের সন্ধান করেছিলেন যিনি নিম্নবর্গেরই একজন হয়ে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনা করতে পারবেন। যেখানে অন্তত তাদের স্বকীয় কণ্ঠস্বরকে চাপিয়ে দেওয়া হবে না। কিন্তু বাস্তবে এমন ঐতিহাসিকের সন্ধান না পেলেও আমরা নিম্নবর্গের সাহিত্যিক হরিশংকর জলদাসকে অন্বেষণ করতে পেরেছি, যিনি জেলে হয়ে জেলেদের তথা সমাজের নিম্নবর্গের কথা আখ্যানের আকল্পে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন।

পরিশেষে বলতে হয়, বর্তমান সময়কাল অর্থাৎ ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হরিশংকর জলদাসের সামগ্রিক কথাবিশ্বকে অনুধাবন করলেও আমরা আমাদের গবেষণার বিষয় হিসেবে তার একটিমাত্র দিককেই আলোকিত করার অবকাশ পেয়েছি। সুতরাং হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বকে আরো নানা দিক থেকে দেখার সুযোগ অবশিষ্ট রয়ে গেল। হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে পুরাণের বিনির্মাণ, প্রেম ও যৌনতার ব্যবহার, মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যাখ্যান, আত্মজৈবনিক উপাদানের নিরিখ কিংবা আখ্যানতত্ত্ব, শৈলীবিজ্ঞান কিংবা বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্বের আশ্রয়ে বিশ্লেষণের বিস্তৃত সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া হরিশংকরের কথাসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস ও রাজনীতি নিয়েও গবেষণার অবকাশ আছে। আমাদের এই গবেষণা সন্দর্ভটি হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যকে আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার দিক থেকে বিশ্লেষণের একটি সূচনামাত্র যা ভবিষ্যতে হরিশংকরপ্রেমী গবেষকদের হরিশংকরের সাহিত্য নিয়ে গবেষণায় উৎসাহিত করবে বলেই আশা করি।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

জলদাস, হরিশংকর। ২০০৮। জলপুত্র। মাওলা ব্রাদার্স : ঢাকা।

,, । ২০১০। দহনকাল। মাওলা ব্রাদার্স : ঢাকা।

,, । ২০১১। কসবি। অবসর প্রকাশনী : ঢাকা।

,, । ২০১২। রামগোলাম। প্রথমা প্রকাশনী : ঢাকা।

,, । ২০১৩। মোহনা। প্রথমা প্রকাশনী : ঢাকা।

,, । ২০১৬। একলব্য। অন্যপ্রকাশ : ঢাকা।

,, । ২০১৬(ক)। গল্পসমগ্র ১। মাওলা ব্রাদার্স : ঢাকা।

,, । ২০১৭। অর্ক। অবসর প্রকাশনী : ঢাকা।

,, । ২০১৯। প্রস্থানের আগে। অন্যপ্রকাশ : ঢাকা।

,, । ২০১৯(ক)। গল্পসমগ্র ২। মাওলা ব্রাদার্স : ঢাকা।

,, । ২০১৯(খ)। সুখলতার ঘর নেই। প্রথমা প্রকাশনী : ঢাকা।

,, । ২০২১। কুন্তীর বস্ত্রহরণ। কথাপ্রকাশ : ঢাকা।

সহায়ক গ্রন্থ :

বাংলা

আজিজ, মহিবুল। ২০০২। বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ। জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন : ঢাকা।

ইকবাল, শহীদ। ২০১৪। বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাস। আহমদ পাবলিশিং হাউস : ঢাকা।

ওয়াইজ এম.ডি., জেমস। ১৯৯৮। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ। ১ম ভাগ। ডানা পাবলিশার্স : ঢাকা।

,, । ২০০০। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ। ২য় ভাগ। ডানা পাবলিশার্স : ঢাকা।

,, । ২০০২। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ। ৩য় ভাগ। ডানা পাবলিশার্স : ঢাকা।

কর, পরিমলভূষণ। ১৯৬৫। সমাজতত্ত্ব। দে বুক স্টোর : কলকাতা।

কর, রণজিৎ। ২০০৯। প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিকজন। সুচয়নী পাবলিশার্স : ঢাকা।

খান, ইসরাইল (সম্পা.)। ২০১৪। অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাবলী। সূচীপত্র: ঢাকা।

গাঁতাইত, সুমনকুমার। ২০২২। হরিশংকর জলদাস : দর্পণে জলজীবন। একতারা প্রকাশনী : কলকাতা।

গুপ্ত, জগদীশ। ১৩৬৫। জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী। ১ম খণ্ড। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা।

ঘড়াই, অনিল। ১৯৯৩। মুকুলের গন্ধ। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

ঘোষ, অনিল (সম্পা.)। ২০১৫। অমর মিত্র অমনিবাস। সোপান : কলকাতা।

ঘোষ, প্রসূন। ২০০৫। উপন্যাসের নানা স্বর। এবং মুশায়েরা : কলকাতা।

ঘোষ, প্রদ্যোত। ২০০৭। বাংলার জনজাতি। (প্রথম খণ্ড)। পুস্তক বিপণি: কলকাতা।

,, ২০০৮, বাংলার জনজাতি। (দ্বিতীয় খণ্ড)। পুস্তক বিপণি : কলকাতা।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ। ২০১৪। বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি। সোনার বাংলা প্রকাশন : ঢাকা।

চক্রবর্তী, অর্ণব, প্রধান, শ্যামসুন্দর ও পাণ্ডা, বিশ্বজিৎ (সম্পা.)। ১৪২০। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাস। পরশপাথর প্রকাশন : কলকাতা।

চক্রবর্তী, বিমল। ২০১২। অদ্বৈত মল্লবর্মণ ব্রাত্য জীবনের ব্রাত্য কথাকার। অক্ষর পাবলিকেশনস্ : ত্রিপুরা।

চক্রবর্তী, সত্যব্রত (সম্পা.)। ২০০২। রাষ্ট্র সমাজ রাজনীতি। একুশে প্রকাশন : কলকাতা।

চক্রবর্তী, সুদেষ্ণা। ২০০২। ফরাসী বিপ্লবে নিম্নবর্গের মানুষ ও অন্যান্য প্রবন্ধ। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স : কলকাতা।

চন্দ, পুলক (সম্পা.)। ২০০০। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত কবিতা। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

চন্দ, বীরেন (সম্পা)। ২০০৪। বিষয় : বাংলা উপন্যাস। উত্তরধ্বনি : শিলিগুড়ি।

চট্টোপাধ্যায়, সাধন। ১৪১৮। উপন্যাস সমগ্র। ১ম খণ্ড। করুণা প্রকাশনী : কলকাতা।

চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সুনীতিকুমার। ১৩৬৭। সাংস্কৃতিকী। (প্রথম খণ্ড)। বাক্ সাহিত্য : কলকাতা।

চৌধুরী, ফকরুল (সম্পা.)। ২০১২। গ্রামশি পরিচয় ও তৎপরতা। সংবেদ : ঢাকা।

জলদাস, হরিশংকর। ২০০৮(ক)। নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজনজীবন। বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

,, । ২০০৯। কৈবর্তকথা। মাওলা ব্রাদার্স : ঢাকা।

,, । ২০১২(ক)। নিজের সঙ্গে দেখা। মাওলা ব্রাদার্স : ঢাকা।

,, । ২০১৬(খ)। আমার কর্ণফুলী। বাতিঘর : ঢাকা।

,, । ২০১৭(ক)। জলগদ্য। বাতিঘর : ঢাকা।

,, । ২০১৮। নোনাজলে ডুবসাঁতার। প্রথমা প্রকাশন : ঢাকা।

,, । ২০২২। বর্ণবৈষম্যের শিকড়বাকড়। কথাপ্রকাশ : কলকাতা

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ১৩৬৮। রবীন্দ্র রচনাবলী (দশম খণ্ড) জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

দত্তগুপ্ত, শোভনলাল (সম্পা.)। ২০০০। আনতোনিও গ্রামশি : বিচার বিশ্লেষণ। পার্ল পাবলিশার্স : কলকাতা।

দাশ, নির্মল। ১৯৯৭। চর্যাগীতি পরিক্রমা। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

দেবসেন, সুবোধ। ২০১২। বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ। পুস্তক বিপনি : কলকাতা।

দেবী, মহাশ্বেতা। ১৯৭৮। অগ্নিগর্ভ। করুণা প্রকাশনী : কলকাতা।

,, । ১৯৯৩। মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্প সঙ্কলন। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট: নয়াদিল্লি।

নাথ, প্রিয়কান্ত। ২০০৭। কাল বিভাজিত বাংলা উপন্যাস। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ : কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। ১৯৩৬। পদ্মানদীর মাঝি। বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লি. : কলকাতা

বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা। ২০০৫। মঙ্গলকাব্যে নিম্নবর্গের অবস্থান। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ : কলকাতা।

,, । ২০০৫। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ : কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। ১৩৫৭। তারাশংকর রচনাবলী। ২য় খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স : কলকাতা।

,, । ১৩৫৯। তারাশংকর রচনাবলী। ৬ষ্ঠ খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স : কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ (সম্পা.)। ২০১০। দলিতের আখ্যানবৃত্ত। মৃত্তিকা : কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। ১৯৬১। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

,, (সম্পা.)। ১৯৯৭। সমরেশ বসু রচনাবলী। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ : কলকাতা।

,, (সম্পা.)। ১৯৯৮। সমরেশ বসু রচনাবলী ২। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ : কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী। ১৯৯৬। বাংলা উপন্যাসে 'ওরা'। প্যাপিরাস : কলকাতা।

বসু, মনোজ। ১৯৬০। মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভার (রজত খণ্ড)। গ্রন্থপ্রকাশ : কলকাতা।

বসু, সমরেশ। ১৯৭৭। মহাকালের রথের ঘোড়া। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ : কলকাতা।

বেরা, নলিনী। ২০০৩। শ্রেষ্ঠ গল্প। করুণা প্রকাশনী : কলকাতা।

,, । ২০০৫। শবর চরিত। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

,, । ২০১৫। সেরা পঞ্চাশটি গল্প। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

,, । ২০১৮। সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য। ২০১৩। বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের আখ্যান ও ব্যাখ্যান। পূর্বালোক পাবলিকেশন : কলকাতা।

বিশ্বাস, মনোহরমৌলী। ২০০৭। দলিত সাহিত্যের রূপরেখা। বাণী শিল্প : কলকাতা।

বিশ্বাস, মিল্টন। ২০০৯। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ। বাংলা একাডেমী : ঢাকা

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন। ১৯৬৯। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। জিজ্ঞাসা : কলকাতা।

ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা.)। ১৩৫৬। সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প। প্রকাশ ভবন : কলকাতা।

,, । ১৩৬১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প। প্রকাশ ভবন : কলকাতা ।

ভট্টাচার্য, তপোধীর। ২০০৯, ২য় সংস্করণ। উপন্যাসের সময়। এবং মুশায়েরা : কলকাতা।

,, । ২০১০। উপন্যাসের বিনির্মাণ। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

,, । ২০১৬। ছোটোগল্প : সময়ের শিল্প। এবং মুশায়েরা : কলকাতা।

ভট্টাচার্য, দেবাশিস। ২০১০। বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা। অক্ষর পাবলিকেশনস্ : ত্রিপুরা।

ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পা.)। ১৯৯৮। নিম্নবর্গের ইতিহাস। আনন্দ পাবলিশার্স : কলকাতা।

ভাদুড়ী, সতীনাথ। ১৩৪৮। ঢোঁড়াইচরিতমানস। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ : কলকাতা।

মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (রহ)। ১৯৮৩। পরিবার ও পরিবার জীবন। খায়রুন প্রকাশনী : ঢাকা।

মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার (সম্পা.)। ১৯৯৮। পঞ্চাশের দশকের কথাকার। পুস্তক বিপণি : কলকাতা।

,, । ২০০৮। গল্পচর্চা। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ : কলকাতা।

মণ্ডল, প্রকাশচন্দ্র। ২০০৮। কথাসাহিত্যের নানা পাঠ। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ : কলকাতা।

মণ্ডল, বিপুল। ২০১৩। বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের মানুষ। সাহিত্য সঙ্গী : কলকাতা।

মান্না, গুণময়। ১৯৫৫ । লখীন্দর দিগার। বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা।

মিশ্র, ভগীরথ। ২০০২। শ্রেষ্ঠ গল্প। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ। ১৯৭১। উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি। বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। ১৯৭৪। কালের প্রতিমা। দেজ পাবলিশিং : কলকাতা।

,, । ১৯৮০। কালের পুত্তলিকা। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

,, । ১৯৯৪। মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, উর্বী ও চট্টোপাধ্যায়, অনুনয় (সম্পা.)। ২০১৫। বাংলা সাহিত্যে সমুদ্র। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, শুভঙ্কর। ২০১৯। শ্রেণি জাতি অস্পৃশ্যতা। গাঙচিল : কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, সুভাষ (সম্পা.)। ১৯৯৫। কেন লিখি। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স : কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, সুশোভন। ১৪১৩। প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ জীবন। করুণা প্রকাশনী : কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ। ১৩৬৩। চক্ষুসা কানঃ। বাক্ সাহিত্য : কলকাতা।

মুরশিদ, গোলাম। ২০০৬। হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি। অবসর প্রকাশনা সংস্থা : ঢাকা।

মুহাম্মদ, মহি। ২০১৭। হরিশংকর জলদাসের অন্তরঙ্গকথা। অবসর প্রকাশনা সংস্থা : ঢাকা।

রহমান, আনিসুর। ২০১৫। নিম্নবর্গের ইতিহাস এবং প্রাক মহাশ্বেতা পর্বের বাংলা উপন্যাস। অভিযান পাবলিশার্স : কলকাতা।

রহমান, রিজিয়া। ২০১২। রক্তের অক্ষর। বেঙ্গল পাবলিকেশন : ঢাকা।

রায়, অলোক (সম্পা.)। ১৯৬৭। সাহিত্য কোষ : কথা সাহিত্য। সাহিত্যলোক : কলকাতা।

,, । ২০০০। বাংলা উপন্যাস : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি। পুস্তক বিপণি : কলকাতা।

,, । ২০১০। বিশ শতক। প্রমা প্রকাশনী : কলকাতা।

রায়, গোপালচন্দ্র (সম্পা.)। ১৯৬৬। শরৎ রচনাবলী। ২য় খণ্ড। কলকাতা।

রায়, দেবেশ। ১৩৫৯। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

,, । ২০০৪। দলিত। সাহিত্য অকাদেমি : দিল্লি।

রায়, সত্যেন্দ্র। ২০০০। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

লিম্বালে, শরণকুমার। ২০১৭। দলিত নন্দনতত্ত্ব। তৃতীয় পরিসর প্রকাশনা : কলকাতা।

সাজ্জাদ, সুমন। ২০১৯। ধর্ম. নিম্নবর্গ. ঠাট্টা : সাহিত্য সংস্কৃতির অন্তরমহল। অক্ষর প্রকাশনী : ঢাকা।

সাঁফুই, অরুণকুমার (সম্পা)। ২০১৮। মিথ হয়ে যাওয়া বাংলা উপন্যাস ১৯৯০-২০১০। পত্রলেখা : কলকাতা।

সিংহ রায়, জীবেন্দ্র। ১৯৭৩। কল্লোলের কাল। দেজ পাবলিশিং : কলকাতা।

সেন, অভিজিৎ। ১৩৬২। রহু চণ্ডালের হাড়। সুবর্ণরেখা : কলকাতা।

সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য। ১৩৫৯। অচিন্ত্য কুমার রচনাবলী (২য় খণ্ড)। গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ : কলকাতা।

সেনমজুমদার, জহর। ২০০৭। নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন। পুস্তক বিপণি : কলকাতা।

সেন্দেল, ভেলাম ভান এবং বল, এলেন (সম্পা.)। ১৯৯৮। বাংলার বহুজাতি : বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ। আইসিবিএস : দিল্লি

হালদার, গোপাল। ১৩৪৮। সংস্কৃতির রূপান্তর। পুঁথিঘর : কলকাতা।

হাসান, মোঃ মেহেদী। ২০০৮। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের জীবন। মনন প্রকাশ : ঢাকা।

হোসেন, সোহরাব। ২০০৫। বাংলা ছোটোগল্পে ব্রাত্যজীবন। করুণা প্রকাশনী : কলকাতা।

ইংরেজি

Adamson, Walter L. 1980. *Hegemony and Revolution : A study of Antonio Gramsci's Political and Cultural Theory*. University of California press : London.

Amin, Shahid and Chakrabarty, Dipesh (eds.). 1996. *Subaltern Studies-IX Writings on South Asian History and Society*.Oxford University Press : Delhi

Anand, S (ed.). 2014. *Annihilation of Cast*. Navayana Publishing : New Delhi.

Arnold , David and David Hardiman (eds.).1994.*Subaltern Studies-VIII Writings on South Asian History and Society*.Oxford University Press : Delhi

Ashcroft (ed.), Bill, Gareth Griffith and Helen Tiffin(eds.).1995.*Gayatri chakraborty Spivak : Can the subaltern speak ?*.Routledge : London & New York

Ashcroft , Bill, Gareth Griffiths and Helen Tiffin(eds.).1998. *Key Concept In Post- Colonial Studies*. Routledge : London and New York.

Bandyopadhyay, Sekhar. 2004. *Cast, Culture and Hegemony : Social Dominance in Colonial Bengal*.Sage Publications India Pvt Ltd : New Delhi.

Chakravorty Spivak, Gayatri. 1988. *Subaltern Studies : Deconstructing Historiography,In the Other Worlds*. Routledge : New York.

Chatterjee (eds.), Partha, and Pradip Jeganathan (eds.). 2010. *Subaltern Studies XI; Community,Gender & Voice*. Permanent Black : Delhi.

Chatterjee (eds.), Partha and Gyanendra pandey (eds.).1993.*Subaltern Studies-VII Writings on South Asian History and Society*.Oxford University Press : Delhi

Chaturvedi, Vinayak (ed.). 2000. *Mapping Subaltern Studies and the Postcolonial*.Verso : London & New York.

Faubion , James. D(ed.). 1994.*Michel Foucault Power, essential works of foucault 1954- 1984*.vol – 3. Penguin Books : London

Feuer , Lewis S.(ed.). 1989. *Basic Writings on politics and philosophy* Karl Marx and Friedrich Engels. Anchor Books : USA

Forgacs, David. 2000. *The Gramsci Reader Selected writings 1916-1935*. New York University Press : New York.

Foster, George M. 1979. *Traditional Cultures : And the Impacts of Technological Change*. Harper & Brothers : New York.

Freud, Sigmund. 1962. Three Essays On the Theory Of Sexuality. Basic Books Publishers : New York

Gordon , Colin(ed.).1980. Power/Knowledge Seleted Interviews and Other Writtings 1972-1977 Michel

Foucault. Pantheon Books : New York.
Guha , Ranajit(ed.). 1982. *Subaltern studies I Writtings on South Asian History andSociety*. Oxford University Press : Delhi.
Guha , Ranajit (ed.).1983.*Subaltern Studies-II Writings on South Asian History and Society*. Oxford University Press : Delhi
Guha , Ranajit(ed.). 1984. *Subaltern studies III Writtings on South Asian History and Society*. Oxford University Press : Delhi.
Guha , Ranajit(ed.). 1985. *Subaltern studies IV Writtings on South Asian History and Society*. Oxford University Press : Delhi.
Guha , Ranajit(ed.).1987.*Subaltern Studies-V Writings on South Asian History and Society*.Oxford University Press : Delhi
Guha , Ranajit(ed.). 1989. *Subaltern studies VI Writtings on South Asian History and Society*. Oxford University Press : Delhi.
Guha , Ranajit, and Gayatri Chakravorty Spivak (eds.). 1988. *Selected Subaltern Studies*. Oxford University Press : New York.
Guha , Ranajit.1997. *Dominance without Hegemony : History and Power in colonial India*. Harvard University Press : Cambridge
Guha , Ranajit (ed.). 1997(b). *Subaltern Studies Reader : 1986-1995*. University of Minnesoth Press : Minneapolis.
Hoare , Quintin and Geoffrey nowell Smith (eds. , trans.). 1971. Selection From The Prison Notebook. International publishers : New York.
Jesph V, Femia. 1981. Gramsci's Political Thought : Hegemony, Consciousness, and the Revolutionary Proccess. Oxford University Press : New York.
Landry, Donna and Gerald Maclean (eds.).1996. The Spivak Reader : Selected Works of Gayatri Chakravorty Spivak. Routledge : New York and London.
Ludden, David(ed.).2003.*Reading Subaltern Studies, A brief history of subalternity*. Permanent Black : Delhi.
Mannathukkaren, Nissim.2022.*Communism, Subaltern Studies and Postcolonial Theory, The Left in South India*. Routledge : London and New York.
Mcnally, Mark(ed.). 2015. Antonio Gramsci Critical Explorations In Contemporary Political Thought. Palgrave Macmillan : United Kingdom.
Morris, Rosalind C.(ed.).2010. *Can the Subaltern Speak? : Reflections on the History of an Idea*. Columbia University Press : New York.
Pankaj, Ashok K. and Ajit K. Pandey (eds.). 2019. *Dalits, Subalternity and Social change in India*. Routledge : London and New York.
Park, Robert Ezra. 1928. *Human migration and the marginal man*. American Journal of Sociology.
Panikkar, KM. 2007. *Cast and Democracy*. Critical Quest : New Delhi.
Ramirez, Philippe. 2014. *People of the Margins Across Ethnic Boundaries in North- East India*. Spectrum Publication: Guwahati- Delhi.
Schwarz , Henry and Sangeeta Ray (eds.).2005. A Companion to Postcolonial Studies. Blackwell Publishing Ltd. : London.
Srinivas, M.N. 1969. *SOCIAL CHANGE IN MODERN INDIA*. University of California

Press : Berkeley and Los Angeles.
Showalter, Elaine. 1977. A literature of Their own. Vol.19. University press : Columbia.

প্রবন্ধ ও পত্র-পত্রিকা

ইসলাম চৌধুরী, সিরাজুল (সম্পা.)। ২০০৪। 'উপনিবেশিক ভারতে ইতিহাসের গতিবিধি'। নতুন দিগন্ত : ঢাকা।
ঘোষ, সুশান্ত। ২০১৭। 'হরিশংকর জলদাসের জলপুত্র : আঞ্চলিকতার বর্ণময় বিস্তার'। Ijhsss (vol-IV,issue-I) : আসাম।
ঠাকুর, কপিলকৃষ্ণ (সম্পা.)। ২০১৩। প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা। অদ্বৈত মল্লবর্মণ সংখ্যা। দলিত মনন : কলকাতা
দাস, শঙ্করী (সম্পা.)। ২০১৯। ত্রয়োদশ বর্ষ, একবিংশ সংখ্যা। বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গ ১। সময় তোমাকে : কলকাতা।
পাশা, হারুন (সম্পা.)। ২০২১। ৮ম বর্ষ, ২৬তম সংখ্যা। পাতাদের সংসার। অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস : ঢাকা।
প্রধান, অরবিন্দ (সম্পা.)। অপর : তত্ত্ব ও তথ্য । হাওয়া ৪৯ প্রকাশনী : কলকাতা।
বর্মণ, সাবলু (সম্পা.)। ২০১২। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। দলিত দর্পণ : শিবমন্দির।
ভৌমিক, তাপস (সম্পা.)। ১৪১২। আমি ও আমার সময়ের গল্পকার বন্ধুরা। কোরক সাহিত্য পত্রিকা : কলকাতা।
ভৌমিক, শান্তিরঞ্জন (সম্পা.)। ২০০৮। অরণিকা। দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা ১৪১৫ : ঢাকা।
মল্লিক, দীপঙ্কর (সম্পা)। ২০২০ (জানুয়ারি-মার্চ)। একলব্য। ২৫ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা : কলকাতা
,, । ২০২১ (জানুয়ারি-মার্চ)। একলব্য। ২৬ বর্ষ ৪২ সংখ্যা : কলকাতা
মহম্মদ, আনু (সম্পা.)। ২০০৪ এপ্রিল- মে। নতুন পাঠ। গৌতম ভদ্র : সাক্ষাৎকার। ঢাকা
মহি, মুহাম্মদ। ২০১৩ । 'জলদাসীর গল্প : সংবেদনশীল ও অনুভূতির গল্প'। বইয়ের জগৎ : ঢাকা।
রহমান, আনোয়ার। ২০১৪। 'জলপুত্র : পড়ে যা মনে হয়'। আবুল হাসনাত (সম্পা.)। কালি ও কলম। ১১ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।
সরকার, পুলক কুমার (সম্পা)। ২০০৭। বর্ষ ৪৫। 'নিম্নবর্গ চরিত্র : প্রতিবাদ, প্রত্যাখ্যান ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পর্ব', নিম্নবর্গের মানুষ, বাংলা কথাসাহিত্য সংখ্যা। শুভশ্রী পত্রিকা : বহরমপুর
সাহা, মানবেন্দ্র (সম্পা.)। ২০১৫। চন্দ, বীরেন। 'জলপুত্র : জল ও জেলে জীবনের নবতম মহাকাব্য'। সংবর্তিকা।
সেনগুপ্ত, মৃন্ময় ও পীযূষ আশ (সম্পা.)। ২০১৯। আইডেন্টিটি সংখ্যা। লোকায়ত, মাল্টি ডাইমেনশনাল রিসার্চ সোসাইটি।
হালদার, নারায়ণ (সম্পা.), ১৪১৮ প্রথম সংখ্যা, পৌনঃপুনিক, প্রজ্ঞা বিকাশ : কলকাতা।

আন্তর্জালিক তথ্য :

তামিম, হুমায়ুন। ২০১১। 'উপন্যাসে জেলেদের নদী থেকে সমুদ্রে বিস্তৃত করতে চাইছি'। প্রথম আলো : বাংলাদেশ।
দ্রঃ https://archive.prothom-alo.com/det DOR 21st june, 2019

হরিশংকার জলদাস এর বিশেষ সাক্ষাৎকার। সিভয়েস সংলাপ।
দ্রঃ https://www.youtube.com/watch?v=6_cbyh4alks DOR 3rd aug,2019

মিত্র, অমর। ২০১৭। ঘটনাপুঞ্জের লেখক নন সতীনাথ ভাদুড়ী। এন টিভি (অনলাইন)। গল্প পড়ার গল্প। ঢাকা।
দ্রঃ https:/www.ntvbd.com/arts_and_literature/124247 DOR -5th june, 2021

খান, ইন্দ্রজিৎ। ২০২০। আফসার আমেদ : এক অনন্য কথাকার। ম্যানগ্রোভ সাহিত্য (অনলাইন)। বিশেষ নিবেদন সংখ্যা : আফসার আমেদ কিসসা। কলকাতা।
দ্রঃ https://mangrovesahitya.com/?p=1688 DOR -17th july, 2021

সিংহ, পুরুষোত্তম। ২০১৯। সৈকত রক্ষিতের গল্প : ভিন্ন ভুবনের আখ্যান। কুলিক রোববার। কলকাতা।
https://kulikinfoline.com/2019/08/25/kulik_robbar_book_review_uttorkotha_purushottam_singha/

DOR 8th july, 2021

সিংহ, পুরুষোত্তম। ২০১৭। কথাকার অনিল ঘড়াই। গল্পপাঠ পত্রিকা। কলকাতা।
https://galpopath.com/sahitya_op3x DOR 8th july, 2021

ইউটিউব চ্যানেল : Educational and Cultural Station 'জীবন ও সাহিত্যের কথা : সাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়'
দ্রঃ https://youtu.be/O8gXI-oxU-A DOR -30th june, 2021

আরা, হোসনে। ২০১৬। মহাশ্বেতা দেবী : অগ্নিগর্ভ জীবন ও সৃষ্টি । কালি ও কলম পত্রিকা (অনলাইন) : ঢাকা
দ্রঃ www.kaliokalam.com/মহাশ্বেতা-দেবী-অগ্নিগর/
DOR 28th july, 2021

পরিশিষ্ট

হরিশংকর জলদাসের জীবন ও রচনাপঞ্জি

কথাকারের বংশলতিকা

[পিতৃকুল]

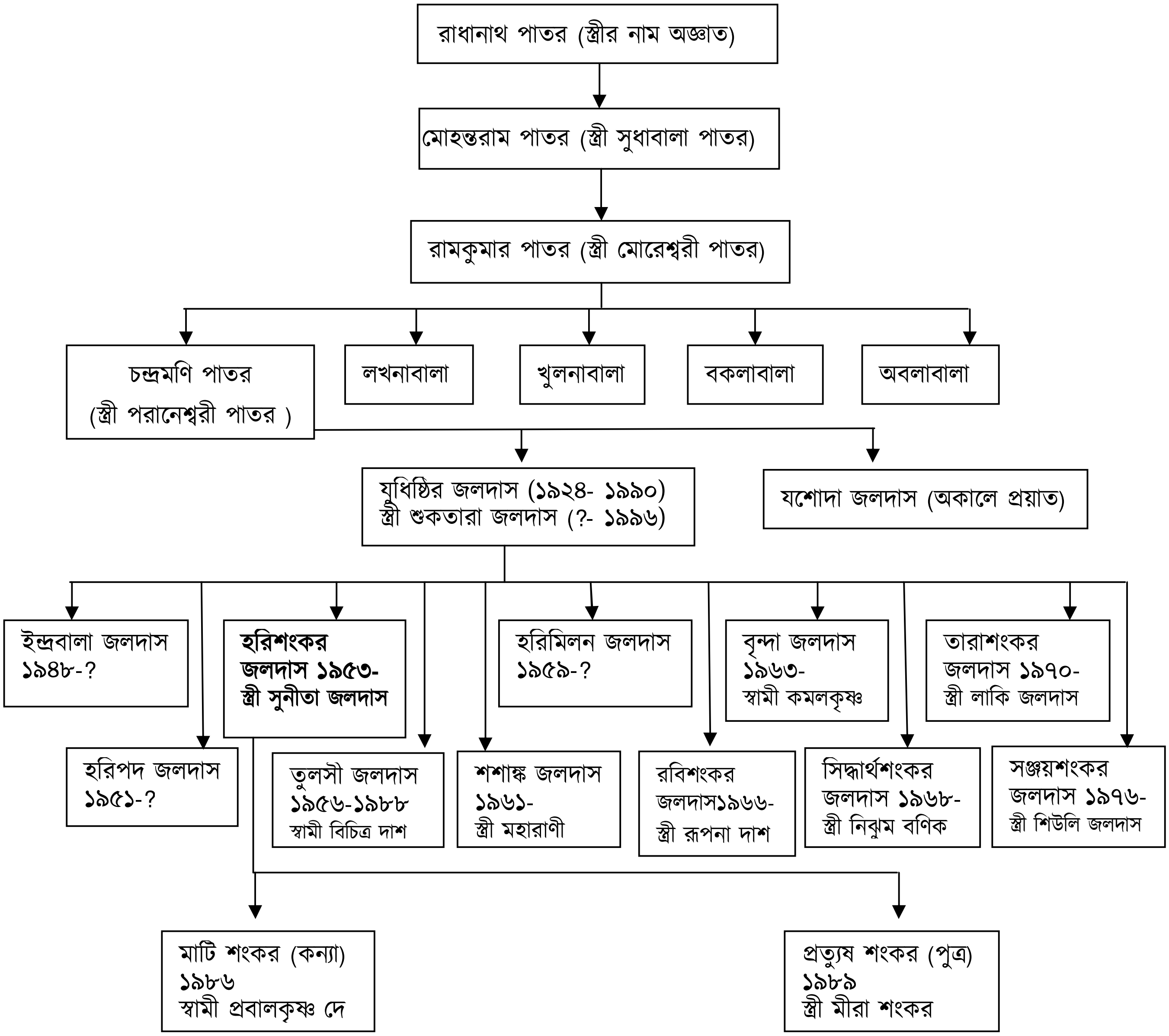

কথাকারের জীবনপঞ্জি

জন্ম :	৩ মে, ১৯৫৩। ২০ বৈশাখ, ১৩৬০। রবিবার।
জন্মস্থান :	উত্তর পতেঙ্গা, কাটগড়, জেলেপাড়া। ডাকঘর- পতেঙ্গা, থানা- পতেঙ্গা, জেলা- চট্টগ্রাম।
মাতা :	শ্রীমতী শুকতারা জলদাস
পিতা :	শ্রীযুক্ত যুধিষ্ঠির জলদাস
ভাইবোনের সংখ্যা :	এগারো জন। আট ভাই, তিন বোন। চার ভাইবোনের অকাল প্রয়াণ
শিক্ষা :	প্রাইমারি : পতেঙ্গা বোর্ড প্রাইমারি স্কুল
	এসএসসি : পতেঙ্গা হাইস্কুল, ১৯৭১ চট্টগ্রাম
	এইচএসসি : চট্টগ্রাম কলেজ, ১৯৭৩
	বি.এ (বাংলা অনার্স) : চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৬
	এম.এ (বাংলা) : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭
	পিএইচ.ডি. : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭,
	বিষয় : নদীভিত্তিক উপন্যাস ও কৈবর্ত জনজীবন।
বিবাহ :	২৮ জানুয়ারি, ১৯৮১। সুনীতা জলদাসের সঙ্গে।
চাকরি :	১৯৮২ সালে বিসিএস দিয়ে ১৯৮৪ সালে কলেজে যোগদান। প্রথম পোস্টিং নীলফামারী সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক পদে।
সন্তানলাভ :	১৯৮৬ সালে কন্যাসন্তান মাটি শংকর এবং ১৯৮৯ সালে পুত্রসন্তান প্রত্যুষ শংকরের জন্ম।
সাহিত্য রচনা :	২০০৮ সালে 'জলপুত্র' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সাহিত্য রচনার সূত্রপাত
অবসর :	২০১৪ সালের ১১ অক্টোবর সরকারি সিটি কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে।
বর্তমান ঠিকানা :	মনরিভ, ফ্ল্যাট : এ৭, ১৬/১৭ লাভ লেইন, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। (অস্থায়ী)

পুরস্কার ও সম্মাননা

- ২০১০ : প্রথম আলো বর্ষসেরা বই পুরস্কার। (দহনকাল)
- ২০১১ : ড. রশীদ আল ফারুকী সাহিত্য পুরস্কার।
- ২০১১ : অবসর সাহিত্য পুরস্কার।
- ২০১২ : সিটি-আনন্দ আলো পুরস্কার। (রামগোলাম)
- ২০১২ : বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন সম্মাননা পদক। (রামগোলাম)
- ২০১২ : বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার।
- ২০১২ : আলাওল সাহিত্য পুরস্কার। (জলপুত্র)
- ২০১৪ : ব্র্যাক ব্যাংক-সমকাল সাহিত্য পুরস্কার। (প্রতিদ্বন্দ্বী)
- ২০১৫ : জীবনানন্দ মেলা সম্মাননা স্মারক।
- ২০১৬ : বিশাল বাংলা প্রকাশনা সাহিত্য পুরস্কার। (একলব্য)
- ২০১৭ : অদ্বৈত সম্মাননা। (অদ্বৈত মল্লবর্মণ সম্পর্কিত গবেষণা)
- ২০১৮ : বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ সাহিত্য পদক।
- ২০১৯ : 'একুশে পদক' রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। (ভাষা ও সাহিত্যে)

কথাকারের রচনাপঞ্জি (২০০১-২০২২)

উপন্যাস :

- জলপুত্র (২০০৮) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।
- দহনকাল (২০১০) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।
- কসবি (২০১১) শুদ্ধস্বর। ঢাকা।
- রামগোলাম (২০১২) প্রথমা প্রকাশন। ঢাকা।
- হৃদয়নদী (২০১৩) শুদ্ধস্বর। ঢাকা।
- মোহনা (২০১৩) প্রথমা প্রকাশন। ঢাকা।
- আমি মৃণালিনী নই (২০১৪) প্রথমা প্রকাশন। ঢাকা।
- প্রতিদ্বন্দ্বী (২০১৪) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।

- এখন তুমি কেমন আছো (২০১৫) প্রথমা প্রকাশন। ঢাকা।
- সেই আমি নই আমি (২০১৬) প্রথমা প্রকাশন। ঢাকা।
- একলব্য (২০১৬) অন্যপ্রকাশ। ঢাকা।
- রঙ্গশালা (২০১৭) প্রথমা প্রকাশন। ঢাকা।
- ইরাবতী (২০১৬) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।
- অর্ক (২০১৭) অবসর প্রকাশনা। ঢাকা।
- প্রস্থানের আগে (২০১৯) অন্যপ্রকাশ। ঢাকা।
- সুখলতার ঘর নেই (২০১৯) প্রথমা প্রকাশন। ঢাকা।
- মৎস্যগন্ধা (২০২০) কথাপ্রকাশ। ঢাকা।
- বাতাসে বইঠার শব্দ (২০২০) প্রথমা প্রকাশন। ঢাকা।
- কুন্তীর বস্ত্রহরণ (২০২১) কথাপ্রকাশ। ঢাকা।
- বিনোদপুরের বিনোদিনী (২০২২) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।
- দুর্যোধন (২০২২) কথাপ্রকাশ। ঢাকা।

কিশোর উপন্যাসে :

- ভাস্কো দা গামার বেহালা (২০২২) প্রথমা প্রকাশন। ঢাকা।

গল্পগ্রন্থ :

- জলদাসীর গল্প (২০১১) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।
- লুচ্চা (২০১২) শুদ্ধস্বর। ঢাকা।
- হরকিশোরবাবু (২০১৪) অন্যপ্রকাশ। ঢাকা।
- কোনো এক চন্দ্রাবতী (২০১৫) চন্দ্রদীপ প্রকাশনা। ঢাকা।
- মাকাল লতা (২০১৫) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।
- চিত্তরঞ্জন অথবা যযাতির গল্প (২০১৬) অবসর প্রকাশনা। ঢাকা।
- কাঙাল (২০১৬) গদ্যপদ্য। ঢাকা।
- গল্পসমগ্র-১ (২০১৬) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।
- ক্ষরণ (২০১৭) বেঙ্গল পাবলিকেশন্স। ঢাকা।
- সপ্তর্ষি (২০১৭) অনীক প্রকাশনী। ঢাকা

- ছোটো ছোটো গল্প (২০১৮) বাতিঘর। ঢাকা।
- শ্রেষ্ঠ গল্প (২০১৮) আলোঘর প্রকাশনা। ঢাকা।
- তিতাসপাড়ের উপাখ্যান (২০১৮) গ্রন্থকুটির। ঢাকা।
- সেরা দশ (২০১৮) অন্যপ্রকাশ। ঢাকা।
- কুন্তীর বস্ত্রহরণ (২০১৮) তুলসী পাবলিশিং হাউস। আগরতলা।
- গল্পসমগ্র-২ (২০১৯) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।
- অনার্য অর্জুন (২০১৯) পুঁথিনিলয়। ঢাকা।
- আছে তো দেহখানি (২০২০) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।
- গল্পের গল্প (২০২০) অবসর প্রকাশনা। ঢাকা।
- আহব ইদানীং (২০২০) চন্দ্রবিন্দু। চট্টগ্রাম।
- মনোজবাবুদের বাড়ি (২০২০) প্রথমা প্রকাশন। ঢাকা।
- প্রেমের গল্প (২০২০) পুঁথিনিলয়। ঢাকা।
- হরিশংকর ২৫ (২০২০) জ্ঞানকোষ প্রকাশনী। ঢাকা।
- বাছাই বারো (২০২০) চন্দ্রদীপ প্রকাশনা। ঢাকা।
- জলধরের কীর্তি (২০২০) অন্যপ্রকাশ। ঢাকা।
- পৌরাণিক গল্প (২০২১) অনন্যা প্রকাশনী। ঢাকা।
- গগন সাপুই (২০২১) অন্যপ্রকাশ। ঢাকা।
- যুগলদাসী (২০২১) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।
- প্রান্তজনের গল্প (২০২১) সমাবেশ। ঢাকা।
- অষ্টাদশী (২০২২) প্রসিদ্ধ প্রকাশনী। ঢাকা।
- গল্পসমগ্র-৩ (২০২৩) প্রকাশিতব্য

আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ :

- কৈবর্তকথা (২০১১) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।
- নিজের সঙ্গে দেখা (২০১২) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।
- আমার কর্ণফুলী (২০১৬) বাতিঘর। ঢাকা।
- জলগদ্য (২০১৭) বাতিঘর। ঢাকা।

- নোনাজলে ডুবসাঁতার (২০১৮) প্রথমা প্রকাশন। ঢাকা।

গবেষণামূলক গ্রন্থ

- ধীবরজীবনকথা (২০০১) শৈলী প্রকাশনা *
- ছোটোগল্পে নিম্নবর্গ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (২০০২) শৈলী প্রকাশনা *
- কবি অদ্বৈত মল্লবর্মণ এবং (২০০২) শৈলী প্রকাশনা *
- লোকবাদক বিনয়বাঁশি (২০০৪) গতিধারা। ঢাকা।
- নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজনজীবন (২০০৭) (পিএইচ.ডি সন্দর্ভ) বাংলা একাডেমি। ঢাকা।
- জীবনানন্দ ও তাঁর কাল (২০১০) শুদ্ধস্বর। ঢাকা।
- বাংলা সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ (২০১২) রোদেলা প্রকাশনী। ঢাকা।
- বর্ণ-বৈষম্যের শিকড় বাকড় (২০২২) কথাপ্রকাশ। ঢাকা।

ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক গ্রন্থ :

- নতুন জুতোয় পুরনো পা (২০১৯) বাতিঘর। ঢাকা।

স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ :

- বিভোর থাকার দিনগুলিতে (২০২১) বাতিঘর। ঢাকা।
- খেয়ালখুশির লেখা (২০২২) বাতিঘর। ঢাকা।

সাক্ষাৎকার সংগ্রহ :

- হরিশংকর জলদাসের অন্তরঙ্গকথা (২০১৭) অবসর প্রকাশনা। ঢাকা। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা মহি মুহাম্মদ

ইংরেজিতে অনূদিত উপন্যাস :

- Sons of the Sea (2014) Translator : Quazi Mostain Billah. Abasar Prakasan. Dhaka.
- Ramgulam (2019) Translator : Quazi Mostain Billah. Batighar. Dhaka.

*চট্টগ্রামের শৈলী প্রকাশনা থেকে বই তিনটি প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাগুলো দুর্বল ছিল বলে পরে ওই লেখার কিছু পরিবর্তন-পরিমার্জন করে পরবর্তীকালে 'বাংলা সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ' নামে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

সাক্ষাৎকারে হরিশংকর জলদাস

তারিখ : ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২, সময় : সকাল ১১ টা
সাক্ষাৎকার গ্রহণ : বর্তমান গবেষক
মাধ্যম : আন্তর্জালিক, লিঙ্ক : https://meet.google.com/cir-sbyk-myw

প্রশ্ন : প্রথমেই আপনাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই 'একুশে পদক' পুরস্কারের জন্য। আমরা জানি আপনি 'জাইল্যার পোলা' বলে অপমানিত হয়ে কলম ধরেছেন। ২০২২ সালে দাঁড়িয়ে আপনার ৬৯টি বই। এর মধ্য দিয়ে সামাজিক অপমানের কতটা জবাব দিতে পেরেছেন বলে আপনার মনে হয়?

উত্তর : এ কথাগুলো যারা আমাকে অপমান করেছেন তারাই ভালো বলতে পারবেন। সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার হল, প্রথমে আমার ভেতরে একজন নারীর প্রদহ কাজ করেছে। আপনি জানেন, ৫৫ বছর বয়সে আমি আমার প্রথম উপন্যাস লিখেছি। এতটা বয়স পার করে লিখতে বসার পেছনের ইতিহাসটা ভালো ছিল না। আমি যদি চুরি করতাম বা অন্য কোনো নারীর প্রতি লগ্ন হতাম, তাহলে হয়তো সামাজিক অপমানটা আমি সহ্য করে নিতেও পারতাম, কিন্তু শুধুমাত্র জন্মগ্রহণ করবার অপরাধে অপমানিত হওয়াটা সহনীয় নয়। জন্মগ্রহণের পেছনে মানুষের কোনো হাত নেই। কর্ণ দুর্বাসা মুনির ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে এক সূত পরিবারে বেড়ে উঠেছিল। সারাজীবন কর্ণকে সামাজিক অপমান সহ্য করতে হয়েছে। আমার জেলে পরিবারে জন্ম গ্রহণ করার পেছনে আমার কোনো হাত ছিল না। যারা ঈশ্বর মানেন, তারা হয়তো ঈশ্বরের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বলবেন এর পেছনে ঐশ্বরিক হাত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জন্মস্থানের তথাকথিত কলঙ্ক থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই আমি সমুদ্রে মাছ ধরতে না গিয়ে আমার বাবা ও ঠাকুরঝির প্রণোদনায় পড়াশোনা করবার চেষ্টা করেছি। সেটাই আমার অপরাধ হয়েছে। আমি কেন মাছ ধরতে না গিয়ে পড়াশোনা করেছি। চাকরির জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পড়াশোনা করে যখন আমি বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে সরকারি কলেজে পড়াতে আসি তখন আমার মনে স্বস্তি বোধ হয়েছিল যে, এবার অন্তত আমি সামাজিক লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পাব। কারণ যারা আমার সহকর্মী তারা সকলেই এম.এ পাশ, শিক্ষিত। মনে করেছিলাম তাদের সকলের মনেই মানবিকতা আছে, তারা ঘৃণা করতে জানে না। তারা মানুষকে ভালোবাসতে জানে। কিন্তু সেখানে এসেই আমার স্বপ্নটা আবার ভাঙল, শুধুমাত্র জাতপাতের দোহাই দিয়ে। এই বিষয়টি আমার ক্রোধের কারণ। আসলে মানুষকে দুইভাবে ক্রোধের জবাব দেওয়া

যায়। আমি লিখে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমি নির্দ্বিধায় স্বীকার করছি, আমি প্রচণ্ড একটা ক্রোধ নিয়ে লেখালেখি করেছি। তবে এই ৭০ বছর বয়সে এসে মনে হয়, কলেজে সেই নারী যদি আমাকে অপমান না করত তাহলে হয়তো হরিশংকর কোনোদিন কলম ধরত না। এখন মনে হয়, ওই মহিলা আমার ধন্যবাদের পাত্রী। তাই ক্রোধ এখন আর নেই। কিন্তু এ কথা সত্য, সামাজিকভাবে অপদস্ত করার প্রবণতা এখনো কমেনি। আজও আমার প্রতি অবহেলার দৃষ্টি রয়েছে। একজন জেলের ছেলের লেখা এত প্রসারিত হল কেন বা তাঁকে সর্বোচ্চ পুরস্কারে সম্মানিত করা হল কেন—এই প্রশ্নের সম্মুখীন আমাকে আজও হতে হয়।

প্রশ্ন : আপনার লেখায় যে জেলে, মেথর, পতিতা, কুমোর, মুচিদের দেখি, বাস্তবে তাদের মধ্যে আপনার পাঠক আছে? থাকলে, তাদের প্রতিক্রিয়া কীরূপ?

উত্তর : সত্যি কথা বলতে জেলেসমাজকে নিয়ে লেখা আমার গল্প-উপন্যাসগুলি জেলে সমাজে খুব বেশি পড়া হয় না। কারণ এখনো তাদের দিন আনা, দিন খাওয়ার মতো অবস্থা। এখনো ওদের অর্থনৈতিক মুক্তি হয়নি। আমি যখন বাবার সঙ্গে জাল বসিয়েছি, ৩৫ বছর ধরে যে নৌকায় করে মাছ ধরেছি, এখন নৌকা, জাল এবং জাল বসানোর স্থান, সেগুলো বর্তমানে কেড়ে নেয়া হয়েছে। এখন উপকূলীয় মুসলমানরা মাছ শিকারে নেমে গেছে। ফলে ওদের জোর আছে, বাহুবল আছে, রাজনীতি, থানা ওদের হাতে। ফলে সেই জায়গাগুলো এখন দখল হয়ে গেছে। ১০০ টি পরিবারের মধ্যে এখন মাত্র তিনটি পরিবার মাছ ধরে। বাকিরা কেউ গার্মেন্টস, কেউ রিক্সা চালক, কেউ দোকান করে জীবিকা নির্বাহ করে। ফলে এখনো জেলেদের মধ্যে শিক্ষা অর্জনের প্রবণতা কম। ৫-১০ জন ছাড়া আমার তেমন কেউ জানা নেই যে তারা জেলেসমাজকেন্দ্রিক লেখাগুলো পড়েছে। তবে মেথরদের নিয়ে আমি যে ‘রামগোলাম’ লিখেছি তা মেথর সমাজে বাইবেলের মতো পঠিত হয়। বাইবেলের কথা বলে আমি সেই পবিত্র গ্রন্থকে ছোটো করছি না, বহু পঠিত অর্থে বাইবেলের প্রসঙ্গ এনেছি। তাদের মতে, বহুদিন পর আমরা একজন মানুষ পেলাম যিনি আমাদের কেউ নয়, কিন্তু আমাদের লাঞ্ছনা-বঞ্চনার কথা বলে তিনি আমাদের সামনে এনেছেন। আমার সমাজকে নিয়ে লেখা বই আমার সমাজের লোকেরা পড়ে না, কিন্তু মেথর সমাজের মানুষ না হয়েও তারা আমার লেখা সাদরে গ্রহণ করেছে এবং ওরা মনে করে আমি ওদেরই একজন। প্রতিবছর হরিজনদের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে ওরা আমাকে আমন্ত্রণ জানায় এবং প্রত্যেকের হাতে ‘রামগোলাম’

থাকে। সেই বই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। কসবিরা অর্থাৎ পতিতারা আমার বই পড়েছে কিনা, আমার তা জানা নেই।

প্রশ্ন : এবার আমরা গবেষণা কেন্দ্রিক আলোচনায় আসি। আমরা জানি আপনি নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্ত জীবন নিয়ে গবেষণা করেছেন, আপনার 'ছোটোগল্পে নিম্নবর্গ ও অন্যান্য' বইটিও রয়েছে। এই কাজটি করতে গিয়ে আপনাকে নিশ্চয়ই নিম্নবর্গের ইতিহাস ও নিম্নবর্গের তাত্ত্বিক দিকগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট পড়াশোনা করতে হয়েছে। সেই পড়াশোনার কোনো প্রভাব কি আপনার সাহিত্যে পড়েছে?

উত্তর : প্রথমেই বলে রাখি, আমি চাইলে অন্য বিষয় নিয়ে লিখতে পারতাম। কিন্তু নিম্নবর্গ নিয়ে লিখেছি কারণ আমার শরীরে সেই সব মানুষদেরই রক্ত বইছে। আমি তাদের খুব কাছ থেকে দেখেছি, আমি তাদের ভালো করে চিনি। যে বিষয় নিয়ে জানা নেই, সেই বিষয় নিয়ে লেখা যায় না। জেলেসমাজের অভিজ্ঞতার ওপরই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যে আমি আমার সমাজ তথা নিম্নবর্গকে নিয়েই নৃতাত্ত্বিক উপন্যাস লিখব। 'জলপুত্র' উপন্যাসে সাড়া পাওয়ার পর আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আমি তথাকথিত নিচুজাতের মানুষদের নিয়ে লিখব। এখন আপনার প্রশ্নের উত্তরে আসি। আমি সচেতনভাবে বা অঙ্ক কষে নিম্নবর্গের গল্প-উপন্যাস লিখিনি। মানে, লিখতে বসার সময় আমার মনে কখনো নিম্নবর্গের থিওরিকে ইমপ্লিমেন্ট করবার কোনো প্রবণতা ছিল না। আমি লিখতে বসেছি মানুষকে সাহিত্যিক বিনোদনের মাধ্যমে আনন্দ দেওয়ার জন্য। তার ভেতরে কি কি এসে ঢুকেছে, সেটা আমি মনে রেখে কখনো লিখিনি।

প্রশ্ন : ২০০৮ সালে 'জলপুত্র' উপন্যাসটির প্রকাশের পরের বছর 'কৈবর্তকথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত। গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধের কিছু কিছু অংশ 'জলপুত্র' উপন্যাসে বর্ণিত। এর কারণ কি জেলেসমাজকে সরাসরি অভিজ্ঞতার দিনলিপি বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন?

উত্তর : হতে পারে। আমি তো আসলে উপন্যাসে গল্পচ্ছলে বলে গেছি কথাগুলো। তবে এ কথা ঠিক যে, 'জলপুত্র' জেলেজীবনের দিনলিপি না হলেও ওদের জীবনের অনুপুঙ্খ অনুষঙ্গ তো বটেই। আমি এই উপন্যাস লেখার সময় কখনো কল্পনার আশ্রয় নিইনি। জলপুত্রের নব্বই শতাংশ চরিত্র বাস্তব। কাহিনিটা আমি নিজে তৈরি করেছি মাত্র। আর জলপুত্রের সঙ্গে কৈবর্তকথার যে তথ্য মিলের কথা বললেন, সে ক্ষেত্রে আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, কখনো কখনো কৈবর্তসমাজকে নিয়ে প্রবন্ধ লেখার জন্য যে তথ্য দিয়েছি তা জলপুত্রে চলে আসা অসম্ভব কিছু নয়। 'জলপুত্র' আসলে জেলেজীবনের বারোমাস্যা।

প্রশ্ন : আপনাকে সমালোচকেরা 'নিম্নবর্গের রূপকার' বলেন। আপনার পূর্বে বা সমকালে যাঁরা নিম্নবর্গ প্রধান কথাসাহিত্য রচনা করেছেন, তাঁদের থেকে আপনার লেখার স্বাতন্ত্র্য কোথায়?

উত্তর : প্রথমত, এ কথা বলতে আমার কোনো দ্বিধা বা লজ্জা নেই যে, বাংলাদেশে নিম্নবর্গীয় মানুষদের নিয়ে কোনো লেখালেখি বিশেষ হয় না। মাঝে মধ্যে কেউ বিচ্ছিন্নভাবে দু-একটি গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু সেখানে নিম্নবর্গের মানুষেরা তেমনভাবে উঠে আসেনি। তাঁরা আসলে নিম্নবর্গের মধ্য দিয়ে নিজের কথাই বলতে চেয়েছেন। তারা পারিপার্শ্বিক সমাজকে দেখেননি, পাশের পরিবারকে দেখেননি। নিজের কথাই বলেছেন। আমি যা দেখেছি, যেভাবে জীবনযাপন করেছি, তা-ই লিখেছি।

প্রশ্ন : একজন ঐতিহাসিক যেমন ইতিহাস লিখছেন, তেমনই একজন সাহিত্যিকও নিম্নবর্গের সাহিত্য রচনা করছেন। দুই ধরনের রচনার পেছনেই রয়েছে গবেষণা। একজন সাহিত্যিক হিসেবে আপনিও কি কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের ইতিহাস লিখতে চেয়েছেন? যদি তাই হয়, তাহলে সে ইতিহাস কতটা লিখতে পেরেছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, লিখতে তো চেয়েছি। কিন্তু কতটা লিখতে পেরেছি সেটা হয়তো আমি ভালো বলতে পারব না। আমি নিম্নবর্গের ইতিহাস অনেকটা লিখতে পেরেছি, সেখানে আমার ভেতরের অহং বোধটা প্রকটিত। আবার আমি লিখতে পারিনি, সেটা বললেও হয়তো মিথ্যে বলা হবে। সেটা নির্ধারণ করবেন আপনারা, আপনাদের মতো গবেষক, বিশেষজ্ঞরা। আমি আনন্দোচ্ছ্বলে অপমানের যন্ত্রণায় আমার মতো লিখে গেছি। কতটা নিম্নবর্গের হয়ে লিখতে পেরেছি জানি না, তবে আমার প্রচেষ্টার মধ্যে কোনো ত্রুটি বা কৃত্রিমতা ছিল না।

প্রশ্ন : সাবঅলটার্ন স্টাডিজে নিম্নবর্গের প্রতিবাদের ব্যর্থতার দিকটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আপনার রচনাতেও তথাকথিত নিম্নবর্গ প্রতিবাদ গড়ে তুলে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের ব্যর্থতার দিকটি কেন তুলে ধরলেন? তাদের ব্যর্থতা দেখানোর জন্যই কি গোপাল জলদাস, রাজাকার, চন্ডক বা যোগেশের মতো বিশ্বাসঘাতক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর : আসলে মূল বিষয়টি হল, ব্যর্থতাই কিন্তু বাস্তবতা। সিনেমায় দেখানো হয়, শেষে সবকিছুর মধ্যে মিলন ঘটে। দুষ্টের দমন হয়। কিন্তু বাস্তব কিন্তু তা-ই নয়। আপনি যে চরিত্রগুলোর নাম বললেন, তারা কিন্তু স্বজাতীয়। রামায়ণে দেখা যায়, রাম যদি হাজার বছর যুদ্ধ চালিয়ে যেত, তাহলে তিনি কিন্তু রাবণকে হারাতে পারতেন না, যদি না বিভীষণ সেখানে বিশ্বাসঘতকতা না করতেন। আমার গল্প-উপন্যাসে যে

দ্রোহগুলো গড়ে উঠছে, তাদের ব্যর্থতার পেছনে রয়েছে স্বজাতের মানুষেরা, আর সেটাই বাস্তব। আমি বাস্তবতাকে উপস্থাপন করতে চেয়েছি। আমি যদি গঙ্গার নেতৃত্বে জেলেদের জয় দেখাতাম, তাহলে হয়তো আমি অনেক হাততালি পেতাম, কিন্তু তা তো বাস্তবতা নয়। আমাদের পাড়ায় এখনো শুক্কুররা রাজত্ব করছে। গঙ্গারা এখনো পদদলিত হচ্ছে। আজও দাদনদারেরা জেলেদের শোষণ করে চলেছে। তাহলে আমি কল্পিত উপন্যাস লিখব কেন। আমরা এখনো তাদের শোষণের হাত থেকে ওভারকাম করতে পারিনি। তাই নিম্নবর্গের জয় দেখালে বাস্তবের সঙ্গে অন্যায় করা হয়। তবে জলপুত্র উপন্যাসে গঙ্গার অনাগত সন্তান বনমালীর মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে জেলে তথা নিম্নবর্গের মুক্তির ইঙ্গিত রয়েছে।

প্রশ্ন : আমরা জানি, নিম্নবর্গের সাহিত্য ও দলিত সাহিত্য দুটো ভিন্ন বিষয়। তবুও কেউ কেউ আপনার কথাসাহিত্যকে দলিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চান। এই বিষয়ে আপনি কী বলবেন?
উত্তর : প্রথমেই বলি, ‘দলিত’ শব্দটি প্রয়োগের পেছনে আমার আপত্তি ও ঘৃণা আছে। আসলে ‘দলিত’ শব্দের মধ্যে যে ‘দলন’ শব্দটি রয়েছে তার অর্থ পিষে ফেলা। আমরা যখন সিগারেট খেয়ে ফেলি, তখন তা অনেক সময় পা দিয়ে পিষে ফেলি। বিষয়টি প্রতীকী। অর্থাৎ শেষ যে আগুনটি জ্বলছে, আমরা পদদলিত করে তাকে নিভিয়ে ফেলছি। ফলে এই শব্দটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে হরিজনদের নিয়ে এই দলিত আন্দোলনটা হচ্ছে। এখানে মেথরদের অনুষ্ঠানে আমাকে যখন নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আমি তাদের বলি, এই যে তোমাদের ‘দলিত’ বলা হচ্ছে—এর প্রতিবাদ করো না কেন তোমরা? ওরা বলে ঠিকই তো বলেছে, আমরা তো দলিতই। তখন আমি তাদের ‘দলন’ শব্দটির মানে ব্যাখ্যা করে বলি, তোমরা তো তাহলে পায়ের তলায় পিষে যাওয়া জাতি। তোমাদের মাথায় তুলে, তোমাদের উন্নয়নের পেছনে কাজ করছি, অথচ বলার সময় দলিত বলছি—এই বিষয়টি আমি ঘৃণা করি। কেন আমার লেখাকে দলিত সাহিত্য বলা হচ্ছে জানি না। আমাকে দলিত-সাহিত্য রচয়িতা বললে আমি অবশ্যই এর প্রতিবাদ করব। সে তুলনায় নিম্নবর্গের সাহিত্যিক বললে সেটা আমার পক্ষে অনেক সম্মানজনক।

প্রশ্ন: আমার শেষ প্রশ্ন, আপনি জলপুত্র। নিজেকে জলপুত্র বলেই পরিচয় দেন। কিন্তু বর্তমানে আপনি একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। জেলেপাড়া ও জীবন থেকে দূরে শহরের ফ্ল্যাট বাড়িতে স্বচ্ছল অবসর জীবন কাটালেও আজও আপনি নিজেকে জলপুত্র তথা নিম্নবর্গ বলে মনে করেন?

উত্তর : নিশ্চিত রূপে। আমার পরিচয়ই হল আমি একজন জেলে ও জেলে সন্তান। আমার অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেও মানসিকভাবে আমি একজন জেলে। একথা ঠিক, একজন সাহিত্যিক হিসেবে যখন সম্মানিত হই, তখন মনে হয়, হ্যাঁ জেলে হরিশংকরের উত্তরণ হয়েছে। তবে আজও যখন সমাজ দুচোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, আপনি যতই প্যান্ট-শার্ট পরুন, গায়ে সুগন্ধি মাখুন আপনি আসলে জেলের ছেলে। তখন বর্তমান অবস্থান থেকে আচমকা মাটিতে পড়ে যাই। ফলে ওই একটানা স্বস্তিময় জীবন কিন্তু সামাজ আমাকে কাটাতে দেয় না। আজও পর্যন্ত। তবে আপনার কথা অনুযায়ী অবশ্যই আমার বর্তমান জীবন পরিশীলিত। তবে নিজের শিকড়টাকে ভুলিনি। মাসে একবার হলেও আমি আমাদের জেলেপাড়ায় যাই। ওরা আমাকে 'মাস্টর' বলে। ওরা জানে আমি শহরে থাকি, ছাত্র পড়াই। কিন্তু ওরা কখনো আমাকে দূরের মানুষ ভাবে না। নিজেদের লোকই মনে করে। আমি এদেরই একজন ছিলাম, এদেরই একজন হয়ে থাকতে চাই। তবে বর্তমান অবস্থানে থেকে মনে অবশ্যই একটি দ্বন্দ্ব কাজ করে অবিরাম। কখনো সম্মানিত হলে, আমি যে জেলে—এই কথাটি বিস্মৃত হই না এমন নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন আমি একা হয়ে যাই, নিজের কাছে নিজে যখন জবাবদিহি করি তখন কিন্তু আমার বারবারই মনে হয় যে আমার শিকড় জেলে পাড়াতেই প্রোথিত।

প্রশ্ন : আপনার সম্প্রতি প্রকাশিত উপন্যাস 'দুর্যোধন'। জানতে ইচ্ছে করছে, পরবর্তী গল্প-উপন্যাস হিসেবে আমরা পাঠকেরা আরো কি কি পেতে চলেছি?

উত্তর : দুর্যোধনের মতোই কর্ণকে নিয়ে একটি উপন্যাস লিখবার চেষ্টা করছি। লেখা প্রায় শেষের পথেই। আর আমাদের এখানে লাভ লেইন বলে একটি জায়গা আছে। জায়গাটি ব্রিটিশ আমলে তরুণ-তরুণীদের একটি মিটিং প্লেস ছিল। জায়গাটি টিলাময় এবং সেই সময় জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। এই বিষয়টিকে নিয়ে এবার একটি উপন্যাস লিখছি। আশা করছি পরের বছর (২০২৩) প্রকাশ পাবে। নাম দিয়েছি '১৬/১৭ লাভ লেইন'। এটা আমার বাসার ঠিকানা। তাছাড়া কৃত্তিবাসকে নিয়ে একটি উপন্যাস লিখবার ইচ্ছে আছে। এর জন্য যতটা সম্ভব পড়াশোনা চলছে। আশা করছি, সব ঠিক থাকলে এটিও খুব শীঘ্রই বেরোবে। আর 'গল্পসমগ্র ২' এর পর যত গল্প লিখেছি সেগুলো একত্র করে ২০২৩ সালে 'গল্পসমগ্র ৩' প্রকাশ পাবে।

গবেষক : অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

হরিশংকর জলদাস : আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। আপনার গবেষণা-সন্দর্ভটি খুব শীঘ্রই গ্রন্থাকারে হাতে পাব এই কামনা।

নির্ঘণ্ট

অ

অর্ক ১০৭, ১১২, ১৮৮, ২০১, ২০৮, ২৯০, ৪০২

অভিজাত ৩, ৩৯৭, ৩৯৮

অধস্তন ১৫, ২৬৬, ২৯৩, ৩১১, ৩৯৯, ৪০০

আ

আন্তনিও গ্রামশি ১৪, ১৬, ৫৩, ২৫১, ৩৬৭

আধিপত্য ২০, ২৮, ১১০, ২২২, ৩০৮, ৩৩০, ৪০৪

আম্বেদকর ১৮৪, ১৮৫

ই

ইলেক্ট্রা এষণা ৩০২

ইদিপাস এষণা ৩০২

উ

উত্তর-ঔপনিবেশিকতা ৩

উত্তর পতেঙ্গা ৪, ৯৯, ১২৮, ১৯৫, ২৮৮, ৩২৩

এ

একগাছি ১৪৬, ১৪৯

একলব্য ১০৭, ১৮০, ৩২৪, ৩৬৪, ৩৮৭, ৪০৬

এডওয়ার্ড সাইদ ২২১, ৩২৬

ঔ

ঔপনিবেশিকতা ৪১, ৪৪, ৩২৯

ক

কসবি ৯৯, ১১৫, ১৭৫, ৩০৮, ৩৪৬, ৪০১

ক্রিস্টোফার হিল ৩১

কুইন্টিন হোয়ার ১৬

কুন্তীর বস্ত্রহরণ ১০৮, ২২৫, ৩৪২, ৩৯৪

কোটনা ১০০, ১৮৯, ২৩৫, ৩৮৬, ৪০২

গ

গভর্নমেন্টালিটি ২৪

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক ১৮, ৩৯, ৭০, ৩৩৬

গৌতম ভদ্র ২৭, ৩৮, ২৯১, ৩৭৯

ঘ

ঘিলারজা ১৬

চ

চট্টগ্রাম ১০০, ১০১, ১৯৫, ২৪২, ৩৩৬

জ

জলপুত্র ৯৮, ১২৭, ২০৩, ৩৩৯, ৩৯২

জিম মেসেলস ৪১

ট

টংজাল ১৪২, ১৪৩, ২০৫

টাউঙ্গাজাল ১৪২, ১৪৩

ড

ডমিন্যান্ট ১৭, ১৯, ৫০, ২৬০

ডেভিড লাডেন ৩৫

ডেভিড হার্ডিম্যান ২৭, ৩৮, ৪৩

ঢ

ঢেন্ডেরি ১০০, ১২২, ১৬২, ২৪০, ৩৫০

ঢোঁড়াইচরিতমানস ৬৩, ৬৪

থ

থুতু ১০৪, ২৮৮, ৩২৭, ৩৬৫, ৩৯৬

দ

দহনকাল ১০২, ১৮০, ২০৪, ২৪০, ৩১৮, ৩৯৩

দ্ব্যণুক ৩১, ৩০০, ৩৮৭, ৪০৭, ৪২৩

দীপেশ চক্রবর্তী ২৭, ৪২, ২৮৬, ৩৩৯, ৩৯১

প

পলিউশন ১৮৭

প্রলেতারিয়েত ১৭, ১৮

প্রস্থানের আগে ৯৯, ১৫৩, ২০৩, ৩৫৭, ৩৮৬

প্রান্তিক ৪৮, ৫৩, ৮৮, ১০৫, ৩৯৭, ৪২২

পিওরিটি ১৮৭

প্রিজন নোটবুক ১৪, ১৬, ১৭, ৪৯, ৩১৬

ফ

ফিরিঙ্গিবাজার ১০৪, ১৯৭, ২৮৪, ৩৩৬

ব

বঙ্গোপসাগর ১০০, ১০১, ১০৫, ১০৯

বাইনারি ৩৬, ৯৫, ২৫১, ২৮৫, ৩৬৮

বিহিন্দিজাল ১১৩, ১৩৯, ১৩২, ১৪৪, ১৫৯

ভ

ভাঙন ১০৪, ১০৮, ১৩৫, ২৯৯

ভৈরব ৯০, ১৩১

ম

মৎস্য সমাজ ১৬৫, ২৬৭, ৩২০, ৩৬৪

মিশেল ফুকো ২১, ৪৩, ২৬৬, ৩৯৪, ৪২২

মোহনা ১০৭, ১৭৫, ২৪৩, ৩৪৮, ৪০২

র

রণজিৎ গুহ ৩৩, ২৭৬, ৩১৪, ৩৯০, ৪২২

রামগোলাম ১১,৯৯, ২৬৩, ৩২২, ৩৮০, ৪০১

ল

লুচ্চা ১৩৫, ১৩৬

শ

শাহিদ আমিন ৩৮

শেফালি ৩৫১, ৩৫২

স

সাবঅলটার্ন ১৭, ৪৮, ৮৮, ২৫১, ৩৬০, ৪২২

সাঙ্গা ১১৭, ৩৯২

সাহেবপাড়া ১০৬, ১২৪, ১৬৮, ২১১, ২৩২

হ

হরিজন ১১, ৭৫, ১৩০, ১৮৪, ২১৫, ২৮৪

হাড়ি ৫৬, ৬০, ৯০, ৩৮৭

হুরিজাল ১৪২, ১৪৪, ২০৮

হেজেমনি ১৪, ৩৯৪, ৩৯৫

ISSN : 0976-9463
Issue 26, Vol. 42

তবু একলব্য

৪২

UGC Approved Peer-Reviewed Research Journal on Arts and Humanities

বাংলা সাহিত্যে সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলন

বিশেষ সংখ্যা

দি গৌরী কালচারাল
এন্ড
এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন

৪২

TABU EKOLABYA
ISSN 0976-9463
তবু একলব্য

ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৬ বর্ষ • ৪২ সংখ্যা • ২০২১

Tabu Ekalabya

UGC Approved International Peer-Reviewed (Refereed)
Research Journal on Arts & Humanities

UGC-CARE LISTED JOURNAL

বাংলা সাহিত্যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলন

বিশেষ সংখ্যা

সম্পাদক • দীপঙ্কর মল্লিক
আমন্ত্রিত সম্পাদক • দেবাশিস পাল

দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন
সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য গবেষণাকেন্দ্র

সূ|চি|প|ত্র

◆ সামগ্রিক বিষয়কেন্দ্রিক প্রবন্ধ ______ ১-৬৩

বাংলা সাহিত্যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলন ১
হৃষিতা গুপ্তবক্সী

আন্দোলন ও সাহিত্য : প্রসঙ্গ নির্বাচিত বাংলা উপন্যাস ৭
শম্পা রায়

সাহিত্যে বিদ্রোহের ইতিহাস : ইতিহাসের দার্শনিক দলিল ১২
তমালী মুস্তাফী

বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক আন্দোলন : প্রসঙ্গ সিপাহি বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহ ১৭
জহিরুল রহমান মণ্ডল

সাহিত্যের আলোকে কৃষক বিদ্রোহের উৎসমুখ অন্বেষণ : প্রসঙ্গ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তী গ্রামীণ বাংলা ২৩
অভিজিৎ সাহা

ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলন ও বাংলা সাহিত্য : সম্পর্কের অন্বেষণ ২৮
বোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য

বাংলা সাহিত্য ও সমাজে মানবিক অধিকার রক্ষা আন্দোলন—একটি মূল্যায়ন ৩৮
নন্দিনী চক্রবর্তী

দ্বিভাজিত বাংলা, দ্বিখণ্ডিত বাঙালি-সত্তা : বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলন ৪২
দোয়েল দে

বাংলা সাহিত্য ও স্বাস্থ্য আন্দোলন ৪৯
নটরাজ মালাকার

বাংলা সাহিত্যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলন ৫৭
কার্তিককুমার মণ্ডল

◆ মধ্যযুগ বিষয়ক প্রবন্ধ ______ ৬৪-৮৪

শ্রীচৈতন্য : প্রথম বিদ্রোহী বাঙালি ৬৪
দীপঙ্কর মল্লিক

নকশাল আন্দোলন ও বাংলা ছোটগল্প ৪৭২
সঙ্ঘিতা দত্ত
অভিজিৎ সেনের 'দেবাংশী' : উত্তরণের আখ্যান ৪৭৮
শুভঙ্কর দাস
একাত্তরের নকশাল আন্দোলন ও বাংলা ছোটগল্পে তার প্রতিফলন ৪৮৪
স্মৃতিপর্ণা রায়
হরিশংকর জলদাসের গল্পবিশ্ব : প্রান্তিক জলদাসদের জীবনসংগ্রাম ৪৯০
মানিকলাল সাহা
নকশালবাদের প্রেক্ষাপটে রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি গল্প ৪৯৬
সাক্ষীগোপাল কুণ্ডু
দেশভাগ-দেশত্যাগ : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প ৫০১
সঙ্ঘিতা ঘোষ
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প : স্বদেশি আন্দোলনের নানা ছবি ৫০৭
কিশোর গোস্বামী
অভিজিৎ সেনের নির্বাচিত কয়েকটি গল্পে দাঙ্গা ও দেশভাগ ৫১৩
ব্রজ সৌরভ চট্টোপাধ্যায়
বাংলা ছোটোগল্পে অবতলজন-জাগরণ : হরিশংকর জলদাসের নির্বাচিত ছোটোগল্পের নিরিখে ৫১৮
সৌরভ বসাক
স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটোগল্পে প্রান্তীয়দের জীবনকথা ৫২৪
সালেহা খাতুন
তেভাগা রণধ্বনির প্রেক্ষিতে সুশীল জানার ছোটোগল্প ৫৩০
মহঃ মহব্বত আলী
সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ৫৩৯
আনন্দ ঘোষ
বৈপ্লবিক উত্থানের ভাষ্য 'হারানের নাতজামাই' ৫৪২
অঙ্কিতা মুখার্জী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' গল্পে অর্থহীন অন্ত্যজ মানুষের করুণ দুর্দশার চিত্র ৫৪৮
নন্দদুলাল দাস
বাংলা ছোটোগল্পে সিপাহি বিদ্রোহের নায়ক নানাসাহেব ৫৫২
বাসব দাস
জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই আন্দোলন: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটোগল্প ৫৫৮
বৈশাখী পাঠক

বাংলা ছোটোগল্পে অবতলজন-জাগরণ : হরিশংকর জলদাসের নির্বাচিত ছোটোগল্পের নিরিখে

সৌরভ বসাক

সাহিত্য জীবনকে প্রভাবিত করে না, জীবন সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। ফলে সেই জীবনকে ঘিরে থাকা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহ স্বাভাবিক ভাবেই যে সাহিত্যে উঠে আসবে তা বলাই বাহুল্য। লক্ষণীয়, যা মুখে বলা বা প্রকাশ করা যায় না তা বরাবর মানুষের লেখনীর সাহায্যে উঠে এসেছে। সময়ের প্রলেপেও এই নিয়ম আবছা হয়ে যায়নি। অবস্থা এবং ব্যবস্থার অনুকূল ও প্রতিকূল দিকগুলি তাই খুব সহজেই সাহিত্যে ধরা পড়ে। তাই কালচক্রে সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা গেছে পালাবদল। সেই পালাবদলের মধ্যে আমরা শুনতে পেরেছি বাংলা সাহিত্যে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সমাজের প্রান্তিক তথা অবতলজনদের উত্থান বা জাগরণের পদধ্বনি।

তবে একথা ঠিক যে নিম্নবর্গকে বিশেষ স্থান দিয়ে সাহিত্য রচনা করা মানেই সেখানে তাদের জাগরণ বা উত্থান দেখানো নয়। সাহিত্যে প্রান্তিক, দলিত তথা নিম্নবর্গ জাগরণের প্রকৃত অর্থ হলো লেখনীর মাধ্যমে স্বর, সংকট, সমস্যা, অপমান ও আঁতের কথাকে সহমর্মিতার সঙ্গে তুলে এনে সমাজের মূল স্রোতে তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা, নিম্নবর্গেরও যে নিজস্ব চেতনা ও স্বর রয়েছে—এ সত্য সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে পেশ করা। এতদিন সমাজের দর্পণ হিসাবে যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তা অর্ধাংশে। বাকি অর্ধাংশ রয়ে গেছে অন্ধকারে, অপ্রকাশিত। এই অন্ধকার অর্ধাংশের সিংহভাগ জুড়ে আছে সমাজের অবতলে থাকা প্রান্তিক, দলিত তথা নিম্নবর্গের মানুষেরা। এ অবকাশে এই জিজ্ঞাসার মীমাংসা করে নেওয়া ভালো যে, নিম্নবর্গ আমরা কাকে বলব এর সংজ্ঞায়নে যথেষ্ট দ্বিধা ও বিতর্ক আছে। নানা জন নানা দিক থেকে নিম্নবর্গকে দেখতে চেয়েছেন। ফলে সৃষ্টি হয়েছে মতভেদ। 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' গ্রন্থে নিম্নবর্গ কারা, এর একটি ধারণা রয়েছে। এখানে মার্কসীয় ধ্যান-ধারণাকে সরিয়ে রেখে আধিপত্য-অধীনতা ও ক্ষমতার সম্পর্ক সূত্রে নিম্নবর্গের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক মনে করেন, ঔপনিবেশিক শাসনে যে কোনও ধরনের অধীনতা ও ক্ষমতার সূত্রে নিপীড়িত অধীনস্ত যারা, তারাই নিম্নবর্গ। রণজিৎ গুহ মনে করেন, গরিব চাষি, প্রায় গরিব ও মাঝারি চাষি, নিরবিত্ত ভূস্বামী, হীনবল গ্রামভদ্র, সম্পন্ন মাঝারি কৃষক ও ধনী কৃষক, গরিব শ্রমিক, ক্ষেত মজুর, নিম্ন মধ্যবিত্ত গ্রাম ও শহরের গরিব জনতা, আদিবাসী ও নারীও নিম্নবর্গ। জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের মতে, অচ্ছুত, গৃহ ভৃত্য, নিরক্ষর অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, নারী, শিশু ও অসংখ্য প্রান্তিক অপর শ্রেণি হলো নিম্নবর্গ।

মহাকাল সাক্ষী, যবে থেকে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ ও সামাজিক ভাবে থাকতে শিখেছে তবে থেকে সেই সমাজে উচ্চ-নিম্ন, শাসক-শাসিত এই বৈপরীত্য লক্ষ করা গেছে। যে প্রক্রিয়ায় একজন শাসক শোষণ করে, যে প্রক্রিয়ায় একজন শাসিত শোষিত হয়, ঠিক তার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় শাসিতরা শাসকের বিরুদ্ধে গোষ্ঠীবদ্ধ হয় এবং গড়ে তোলে আন্দোলন ও প্রতিবাদ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই ধরনের আন্দোলন বা বিদ্রোহের উদাহরণ অজস্র রয়েছে। যদিও একথা ইতিহাস ও ঐতিহাসিকের। কিন্তু ইতিহাস ও সাহিত্য এক নয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গকে দেখা যাচ্ছে অধীনতার অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে, যার ওপর ভিত্তি করে সমাজ কাঠামোর তলদেশে রয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে একটি পরিভাষার মধ্যে নিয়ে এসে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহের 'সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ' প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। যেখানে এই সত্য উঠে আসে যে নিম্নবর্গরা আসলে কোনো 'সাবজেক্ট' নয়, তাদেরও রয়েছে নিজস্ব স্বকীয়তা, দাবি ও স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর যা নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের জন্ম দিয়েছে।

তবে শুধু ইতিহাসে নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঠিক কবে থেকে এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জাগরণ তার নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ উল্লেখ করা না গেলেও বলা যায়, বিশেষ করে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে উনিশ শতকের আধুনিকতা, নবজাগরণ, ঔপনিবেশিকতা ইত্যাদি বিষয়গুলি জড়িয়ে ছিল বলে উচ্চবর্গ বা এলিট শ্রেণির কাঠামোতে তা নির্মিত হয়েছিল। ফলে যারা আর্থ-সামাজিক দিক থেকে উচ্চস্থানে ছিলেন তাদের লেখায় এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ছিল বহু ক্রোশ দূরে। কিন্তু পরবর্তীকালে একের পর এক ঐতিহাসিক আন্দোলন বা বিদ্রোহের পিছনে যখন সমাজের এই তলদেশের মানুষদের গোষ্ঠীবদ্ধ হতে দেখা গেল তখন একদল সাহিত্যিক নিম্নবর্গকে সহমর্মিতার সঙ্গে সাহিত্যে স্থান দেওয়া শুরু করলেন, যথার্থ বিবেচনার সঙ্গে তাদের সংকট, সমস্যা ও নিজস্ব চেতনাকে ফুটিয়ে তুলতে তৎপর হলেন। আমরা লক্ষ করলাম রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে প্রাথমিক ভাবে শুরু করে ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত, সতীনাথ ভাদুড়ী, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, সমরেশ বসু, অনিল ঘড়াই, সাধন চট্টোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, মনোরঞ্জন ব্যাপারী ইত্যাদি লেখকের সাহিত্যে সমাজের নীচু তলার ব্রাত্য, দলিত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জাগরণ দেখা দিচ্ছে একেবারে নিজস্ব ঢঙে। নিম্নবর্গের এক নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি হয়েছে সে সব লেখায়। যেন সাহিত্যে অবতলজন-জাগরণ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন তাঁরা। আর সেই সূত্র ধরেই আমরা পেয়ে যাই একুশ শতকের উল্লেখযোগ্য লেখক অধুনা স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের নন্দিত কথাকার হরিশংকর জলদাসকে।

একুশ শতকে লেখালেখি শুরু করলেও তাঁর সাহিত্যের আঙিনায় তিনি এই সব অবতলজনদের এনে দাঁড় করিয়েছেন তাদের সংকট, সমস্যা, দলিত হওয়ার অভিজ্ঞতা ও সর্বোপরি তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানোর জন্য। এখনও পর্যন্ত তিনি যত গল্প-উপন্যাস লিখেছেন তার সিংহভাগ জুড়ে আছে এই অবতলজন-নিম্নবর্গের কথা। আমরা জানি হরিশংকর জলদাস নিজেও সেই অবতলজন, একজন অন্ত্যজ-প্রান্তিক নিম্নবর্গ, একজন জেলে পরিবারের সন্তান। তাঁর অভিজ্ঞতা একজন নিম্নবর্গের অভিজ্ঞতা। 'জ্যাইলার পোত' তকমা পেয়ে অপমানিত হরিশংকর জলদাসের সাহিত্য লিখতে বসা। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে সারা জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রথম উপন্যাস 'জলপুত্র'-র মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্য জগতে আলোকময় প্রবেশ। ২০১১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গল্পগ্রন্থ 'জলদাসীর গল্প'। বর্তমান কালের হিসেবে তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা ১৫ এবং ছোটোগল্পের সংখ্যা একশো ছাড়িয়ে গেছে। হরিশংকর জলদাসের সাহিত্যে মুচি, মেথর, ডোম, কৈবর্ত, জেলেদের যে জীবন চিত্র উঠে এসেছে সেখানে তাদের দাম্পত্য জীবন সমবায়ী। সেখানে নারী পুরুষের অবদান সমান।

সমাজের একটি দিকের মতো নারীরাও এখানে বঞ্চিত, পীড়িত, শোষিত ও অবহেলিত। তাদের হাহাকার, বেদনা ও বিপন্নতা চার দেওয়ালের মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কিন্তু সময় বিশেষে তারা প্রতিবাদ করে তাদের নিজেদের মতো। মার খেয়ে বা অন্যায় সহ্য করে পরে থাকে না। এখানে মূলত এবং বিশেষ ভাবে প্রান্তিক দলিত মানুষদের জীবনায়ন ঘটানো হয়েছে যেখানে উচ্চবর্গের স্থান সীমিত ও একান্ত প্রয়োজনানুসারী। গল্পগুলি তাই শুধু গল্প হয়ে থাকেনি, হয়ে উঠেছে নিম্নবর্গের সাহিত্য। 'জলদাসীর গল্প' (২০১০) গ্রন্থের 'কোটনা'—নামক গল্পটি উদাহরণ স্বরূপ আমরা দেখে নিতে পারি। এখানে গল্পের মূল ঘটনা হলো জেলে ও মুচি সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা অর্জনের অধিকারী নয়। কিন্তু জেলে শ্যামচাঁদ ও মুচি রামদুলাল তাদের ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করলেন অনেক বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে। হঠাৎ একদিন রামদুলালবাবু তাঁর ছেলের 'দাস' পদবি বদলে 'চৌধুরী' করতে হেডমাস্টারকে অনুরোধ করলেন। পদবি বদলে ছেলে হলো অশোক চৌধুরী। কিন্তু কেন?

আমরা জেনেছি, রাজনৈতিক সচেতনতা ও সামাজিক ক্ষমতার বিন্যাস প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে নিম্নবর্গকে বিশ্লেষণ করা নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে আমরা অবশ্যই দেখে নেব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষ্য। তাঁর মতে—

> নিম্নবর্গের রাজনীতির চরিত্র নির্ধারিত হচ্ছে নিম্নবর্গের নিজস্ব চেতনার রূপরেখা অনুসারে। সেই চেতনা গড়ে উঠেছে অধীনতার অভিজ্ঞতা থেকে। দৈনন্দিন দাসত্ব, শোষণ আর বঞ্চনার মধ্যেও নিজের অস্তিত্বটুকু বজায় রাখার সংগ্রামের ভেতর দিয়ে।[১]

'কোটনা' গল্পেও আমরা দেখেছি রামদুলাল তার ছেলেকে মুচিগিরি করতে দেবে না বলে হেডমাস্টারের অমতে স্কুলে ভর্তি করেছে। হেডমাস্টার স্বগত ভাবে বলেছেন, "মুচির ছেলে পড়বে! জুতো সেলাই করবে কে?"[২] বুঝতে অসুবিধে নেই এরকম বঞ্চনা ও চিরকাল অবতলে তলিয়ে যাওয়ার চেতনা উচ্চবর্গরা বরাবর নিম্নবর্গের মধ্যে সংক্রমিত করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, জেলে মুচি পাড়ার ছেলেরা যাও বা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে পড়তে লিখতে পারার অধিকারী ছিল, মেয়েরা ছিল এর থেকে শত হস্ত দূরে। নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদ্ রণজিৎ গুহ নিম্নবর্গ বলতে নারীদেরকেও বুঝিয়েছেন। এর প্রমাণ রয়েছে সাহিত্যে। অশোকের বোন দুলালীকে পড়ানোর তাগিদ অনুভব করে না পিতা। তার বক্তব্য, "দুলালীকে পড়ানোর দরকার কী? আই.এ, বি.এ পাস করেও তো মুচির ঘরে গিয়া চুলা ঠেলবো। মুচির ঘরে শিক্ষিত ছেলে কই?"[৩] কিন্তু এই প্রথাগত বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা যায় স্ত্রীর কণ্ঠে, "ছেলেকে তো পড়াচ্ছ, মেয়েকে পড়ালে দোষ কী ছেলে যদি বউ পায়, মেয়ে শিক্ষিত সোয়ামি পাবে না কেন?"[৪]

স্ত্রীর কেন-এর জবাব দিতে পারে না রামদুলাল। কারণ নিম্নবর্গের কাছে এ প্রশ্নের উত্তর নেই, উত্তর থাকে না। কিন্তু অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টাটুকু চালিয়ে যায় তারা। রামদুলালও একদিন হঠাৎ স্কুলে গিয়ে ছেলের 'দাস' পদবি বদলে 'চৌধুরী' করার আর্জি জানায়। কারণ সে উপলব্ধি করেছে তাদের যত বঞ্চনা, যত অপমান, যত সংগ্রাম এই নীচুজাতের জন্য। তাই ছেলের পদবি বদলে ছেলের নিম্নবর্গত্ব ঘোচাতে চেয়েছে পিতা। কারণ হিসেবে জানিয়েছে—

> মুচি বলে হাটে-মহল্লায় মানুষের লাথি-চড় খেতে হয়। আমি অশিক্ষিত মানুষ ছার, প্রতিবাদ করি না, করতে পারি না। ভাবি-অশিক্ষিত মুচির ভাইগ্য এর চাইতে আর ভাল কতটুকু হবে। কিল খেয়ে কিল হজম করি।[৫]

এ নিম্নবর্গের বৈশিষ্ট্য হলেও আলোচ্য গল্পে দেখা যাচ্ছে নিম্নবর্গের একজন পিতা তার পুত্রের পদবি বদলে সমাজে মাথা উঁচু করে তাকে বাঁচতে শেখাচ্ছেন যাতে পরবর্তী কালে অন্ত্যজ বলে

তাকে অপমানিত হতে না হয়। শুধু তাই নয়, নীচুতলার সমাজের নারীদের শিক্ষার দাবি নিয়েও সোচ্চার হতে দেখা গেছে তাদের। পরবর্তী গল্প 'দইজ্যা বুইজ্যা'তে নারী-লাঞ্ছনার চিত্র উঠে আসার পাশাপাশি দইজ্যা বুইজ্যার মতো একজন আধপাগল নিম্নবর্গের প্রতিবাদে নিম্নবর্গের সত্তা ও চেতনার যে জাগরণ লক্ষ করা গেছে তা নতুন করে গল্পটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। গল্পের শুরুতেই লেখক জানিয়ে দিচ্ছেন পারুলবালা নামক এক ষোলো বর্ষীয় জেলে নারীর ধর্ষিতা হওয়ার কথা। এর কারণ, একাত্তর খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি জেলেপাড়া অবরুদ্ধ হয় পাকিস্তানি সেনার আস্তানা গাড়ার ফলে। শুরু হয় জেলেদের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন। এরকম পরিস্থিতিতে ক্যাপ্টেন মোরশেদের কামাতুরতা জেগে ওঠে। সে তার সাগরেদ মজিদকে ডেকে তার অভীপ্সার কথা জানালে সে ক্যাপ্টেনকে নিয়ে যায় পারুলবালার কাছে। সে ধর্ষিতা হয়। এ ঘটনা দইজ্যা বুইজ্যা জানতে পারলে সে গরজে ওঠে এই বলে, "তোরার মারে চুদি, চোদানির পোয়াক্কল, আঁই তোরারে চাই লইয়ম।"* ক্ষমতার অপব্যবহারকারী উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে গল্পে এই প্রথম সোচ্চার প্রতিবাদ। ধর্ষণের ঘটনায় দইজ্যা বুইজ্যার চেতনায় ধরা পড়ে জেলেনারীর অপমান, যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা। তার কাছে পারুল ও তার কন্যা এক হয়ে যায়। তাই দেখা যায়—

> কাঁদতে কাঁদতে সে বলতে লাগল, 'পারুলও মাইয়াপোয়া, তুই অঝি মাইয়াপোয়া। তইলে পারুল মাইনে তুই। পারুলের অপমান মাইনে তোর অপমান। আঁর ঝির পোয়ার অপমান আঁই সইজ্য গইত্তাম নো। আঁই হউরর পোয়া অলরে চাই লইয়ম।'

আমরা নিম্নবর্গের ইতিহাসে বেশিরভাগ সময়ে নিম্নবর্গকে দেখেছি নিষ্ক্রিয়, ভীরু, একান্ত অনুগত একটি জীব হিসেবে। শুধু "একমাত্র একটি মুহূর্তে শাসককুলের মানসপটে নিম্নবর্গ আবির্ভূত হয় স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে। সেই মুহূর্তটি হলো বিদ্রোহের মুহূর্ত। নিম্নবর্গ যখন বিদ্রোহী, তখনই হঠাৎ শাসকবর্গের মনে হয়, দাসেরও একটা চেতনা আছে।"* আর এই চেতনার বশেই দ্বিতীয়বার যখন ক্যাপ্টেন পারুলকে ধর্ষণ করতে এসে তার মা তোতারানির ওপর ঝাপিয়ে পড়ে তখন এই দইজ্যা বুইজ্যা ধারালো দা দিয়ে ক্যাপ্টেনকে কুপিয়ে মারে। তার মরণ চিৎকারে বাইরে থেকে সৈন্যরা এসে দইজ্যা বুইজ্যার মাথা গুলিতে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। ক্ষমতার সামনে টিকে থাকতে পারে না দইজ্যা বুইজ্যার মতো নিম্নবর্গরা। কিন্তু ক্যাপ্টেনকে কুপিয়ে মারার মধ্যে যে নিম্নবর্গের প্রতিবাদী সত্তার জাগরণ ঘটেছে তা অবশ্যই আলোকপাত যোগ্য। কারণ আর মার খেয়ে মার সহ্য করা নয়, আত্মজাগরণের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী সত্তা জেগে ওঠাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এছাড়া আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'দুখিনি', 'দুলারী এবং কয়েকজন', 'ঢেন্ডেরি' প্রভৃতি গল্পগুলি নিম্নবর্গের উত্থানের গল্প হয়ে উঠেছে।

২০১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'চিত্তরঞ্জন অথবা যযাতির বৃত্তান্ত' গল্পগ্রন্থেও নিম্নবর্গের জাগরণের চিত্র ফুটে উঠেছে কিছু কিছু গল্পে। গল্পগুলি 'মহাভারত' এর প্রসঙ্গ ও আশ্রয়ে গড়ে উঠলেও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে 'মহাভারত'-এর যেখানে নিম্নবর্গেরা গুরুত্বহীন, উপেক্ষিত ও অপমানিত হয়েছেন ঠিক সেই স্থান থেকেই লেখক সেই সব মানুষগুলিকে মহান রূপে এনে দাঁড় করিয়েছেন বর্তমান সময়ের বাস্তব মাটিতে। ফলে গুরুত্বহীন নিম্নবর্গ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে উঠে এসেছে। আলোচ্য গ্রন্থের 'তুমি কে হে বাপু' গল্পটি এ প্রসঙ্গে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কারণ গল্পটির মধ্য দিয়ে একদিকে লেখক নিম্নবর্গের হয়ে যেমন একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন, তেমনি ব্যঙ্গচ্ছলে নিম্নবর্গের প্রতি সমাজের নগ্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের খোলসা করেছেন। গল্পের পাত্র নির্বাচনেও লেখকের চমৎকার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রয়েছে। একজন 'মহাভারত' সৃজনকর্তা কৃষ্ণ

দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এবং অপর জন হলেন ব্রাত্যজনের ব্রাত্য কথাকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ। গল্পে দেখা যাচ্ছে অদ্বৈত মর্তে সুকর্মের জন্য শত বৎসর স্বর্গলাভ করেছেন যমের আশীর্বাদে। সেই সুবাদে তাঁর ব্যাসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে। নামের শেষে 'মল্লবর্মণ' শব্দটি শুনে বিস্মিত হয়েছেন ব্যাসদেব। কারণ পদবির চল ছিল না ব্যাসদেবের যুগে। কিন্তু সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর পেরিয়ে আজ কলি যুগ। এখন "মানুষের আসল নামের সঙ্গে পদবি জুড়তে হয়। ঐ পদবিতেই যত মানমর্যাদা। এখন পৃথিবীতে মানুষের মর্যাদা তেমন নয়, যত না পদবিতে।"[৯] আমরা জানি ব্যাসদেবের যুগে কর্ম ও গুণের ভিত্তিতে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু কলিযুগে জন্ম সূত্রই আসল, কর্ম ও গুণের মূল্য শূন্য। তাই তো, "ব্রাহ্মণরা মাথায় তুলে রাখার আর শূদ্ররা পায়ে পিষে মারার।"[১০]

আমরা লক্ষ করেছি, ব্যাসদেব ও অদ্বৈতের কথোপকথনে বাস্তব সমাজের যে নগ্ন সত্য উঠে আসছে তাতে এ কথা স্পষ্ট, জাতের নামে বজ্জাতি ভারতবাসীর মজ্জায় মজ্জায়। এ প্রসঙ্গে অদ্বৈত তাঁকে জানালেন মর্তে ব্যাসদেবের উত্তরাধিকার জেলেদের প্রতি কি পরিমাণ ঘৃণা বর্ষিত হয়। নিকৃষ্ট জাতি রূপে তারা সবরকম অধিকার থেকে বঞ্চিত। অদ্বৈত তাঁর নিজের কথা উল্লেখ করে বললেন কোন রকমে সে ম্যাট্রিক পাশ করে কলম ধরেছিলেন। লিখেছিলেন 'তিতাস একটি নদীর নাম'। কিন্তু সেদিনের সমাজ তা মেনে নেয়নি। কেননা—তিনি জেলে সন্তান, একজন নিম্নবর্গ। তা বলে অদ্বৈতকে কিন্তু দমিয়ে রাখতে পারেননি কেউ। পরবর্তীকালে তাঁর রচনা মূল্যবান, কালজয়ী রূপে স্থান পেয়েছে। সেরকম করেই সর্ব অন্যায়ের সর্বনাশ অবশ্যই ঘটে একদিন। হরিশংকর জলদাসও বিশ্বাস করেন সমাজের তলানিতে থিতিয়ে পড়ে থাকা অবতলজনেরাও একদিন নিজেদের সামর্থ্যে সমাজের মূল স্রোতে ফিরবেন। উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের আর পার্থক্য থাকবে না, বরং পরস্পরের তুলনা হবে একদিন।

'কুন্তীর বস্ত্রহরণ' সেরকমই সমাজের থিতিয়ে থাকা মানুষগুলোর গর্জে ওঠার গল্প। গল্পটি চাঁপাতলা গ্রামের একটি মালোপাড়া ঘিরে। যেখানে কুন্তী নামক একজন প্রতিবাদী নারী চরিত্রের অবস্থান। তার উল্টোদিকে রয়েছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায় বলীয়ান উচ্চবর্গের প্রতিনিধি আবুল কাশেম যার ইচ্ছে মালোদের পূর্বপুরুষের শ্মশানটি দখল করার। সেজন্য মালোদের নানা প্রলোভন দেখান তিনি। কিন্তু মালোদের হয়ে গর্জে ওঠে কুন্তী—

> হঠাৎ ভির ঠেলে সামনে এগিয়ে এসে কুন্তী এই অন্যায় প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে। বলে এ কী কইতাছেন চেয়ারম্যান সাব। পুত্ত পুরুষের শ্মশান আমাদের।... আপনি কী কইরে বলেন ওই শ্মশান ছেড়ে দিতে?[১১]

বিত্তর পুরুষের মাঝখান থেকে নারীর এই প্রতিবাদ বাক্যে হতচকিত আবুল কাশেম কিছু বলতে না পেরে শুধু প্রলোভন দেখান একটি নতুন শ্মশান গড়ে দেওয়ার। সে কথার তোয়াক্কা না করে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কুন্তী বলে ওঠে, "দরকার নাই আমাদের বাঁধানো শ্মশানের। পূর্বপুরুষের শ্মশান আমাদের মাথায় থাক। ওই শ্মশানের দিকে নজর দেবেন না চেয়ারম্যান সাব।"[১২] ইতিহাস সাক্ষী এই বিষয়ে যে, নিম্নবর্গরা যত বার উচ্চবর্গের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ততবার তাদের নির্মূল করার জন্য তারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা লোকবলের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছে। মহাভারতে শকুনি মামা যেমন কৌরবদের কুবুদ্ধি জুগিয়েছে, ঠিক তেমনি বর্তমান সমাজেও আবুল কাশেমের মতো উচ্চবর্গদের কুবুদ্ধি জুগিয়ে থাকে ফখরে আলমের মতো শকুনিরা। সে আবুল কাশেমকে কুমন্ত্রণা দেয়। কুন্তীর দৈহিক গঠনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, "বাচ্চাকাচ্চা হলে কী হবে, দেখতে কচি ডাব হুজুর।"[১৩]

যদিও আমরা লক্ষ করেছি উচ্চবর্গীয় স্বভাববশত আবুল তাদের ধমকে বলে এরপর শ্মশানে কোনও দাহ করা যাবে না, করলে ফল খারাপ হবে। কিন্তু কিছুদিন পর অজয় মণ্ডল নামে এক বৃদ্ধ মারা গেলে তাঁকে সেই শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসে আবুল কাশেমের দলবল। শুরু হয় লাঠি, কিরিচ নিয়ে আক্রমণ। কুন্তী সেখানে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। একজন নিম্নবর্গের নারী হয়ে বিস্তর পুরুষের মাঝে সে যেভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে তাতে আমাদের এ কথাই মনে হয়েছে নিম্নবর্গ কেবল মার খেয়ে আর মার সহ্য করে না। তারা জেগে উঠে প্রতিবাদ করার ক্ষমতাও রাখে। আসলে আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে এই চেতনায় যে নিম্নবর্গকে বরাবর অধীনতার পদতলে পিষ্ট হতে হবে। কিন্তু সময় বদলেছে, বদলেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও জীবন। গল্পে উচ্চবর্গ দ্বারা কুন্তীর পরনে শাড়ি ও পেটিকোট খুলে নেওয়া হলেও সে কিন্তু তাদের পদতলে দলিত হয়নি, নিজের আত্মসম্মান রক্ষার্থে শ্মশানের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে। শুধু কুন্তীর মতো চরিত্ররা নয়, আলোচ্য গল্প গ্রন্থের সুরেন্দ্র গাওয়াল, 'ব্যর্থ কাম', 'ঢোলদাস' প্রভৃতি গল্পেও রয়েছে সমাজের নীচুতলার মানুষের সমস্যা অপমান ও চেতনার কথা।

এইভাবেই হরিশংকর জলদাস তার কলমকে হাতিয়ার করে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে অবতলজন জাগরণের আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। একজন নিম্নবর্গ হয়ে নিম্নবর্গের জন্য কলম তুলে নিয়েছেন তিনি। তাঁর প্রতিটি গল্পই আমাদের নিয়ে গেছে অবতলজন জীবনের অন্দরের গলিপথে। যেখানে দেখা মিলেছে শুধুই নিম্নবর্গের। কখনো স্বমহিমায়, কখনো আগুনের ফুলকির মতো, কখনো বা নিজেদের মতো প্রতিবাদের রাস্তা বেছে নিয়েছে তারা। হরিশংকর জলদাস সেই অন্ধকার অর্ধাংশ থেকে নিম্নবর্গকে তুলে এনে সাহিত্যে তাদের আলোকময় প্রকাশ ঘটিয়েছেন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই তত্ত্বে বিশ্বাসী লেখক তাঁর সাহিত্যে ঘটিয়েছেন অবতলজন জাগরণ।

উৎসের সন্ধানে

১. পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম ভদ্র সম্পাদিত : 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ১২
২. তদেব : পৃ. ১২
৩. তদেব : পৃ. ১৪
৪. তদেব : পৃ. ১৪
৫. তদেব : পৃ. ১৯
৬. তদেব : পৃ. ২৪
৭. তদেব : পৃ. ২৫
৮. তদেব : পৃ. ১২
৯. হরিশংকর জলদাস : 'চিত্তরঞ্জন অথবা যযাতির বৃত্তান্ত', অবসর, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৩৯
১০. তদেব : পৃ. ৪০
১১. তদেব : পৃ. ৫৫
১২. তদেব : পৃ. ৫৫
১৩. তদেব : পৃ. ৫৫

তথ্যের সন্ধানে

১. হরিশংকর জলদাস : গল্পসমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৬
২. হরিশংকর জলদাস : 'চিত্তরঞ্জন অথবা যযাতির বৃত্তান্ত, অবসর, ঢাকা

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে আয়োজিত
একদিনের আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র

সাহিত্যতত্ত্ব ও বাংলা সাহিত্য

শংসাপত্র

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে বাংলা বিভাগ (জলপাইগুড়ি শাখা) আয়োজিত ৫ মার্চ ২০২০ 'সাহিত্যতত্ত্ব ও বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক একদিনের আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত বক্তা/ অধিবেশন সভাপতি/ আলোচক/ প্রবন্ধ পাঠ/ অংশগ্রহণের জন্য ....মিঠুন নায়ক........ কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়ের ....গবেষক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়........ কে এই শংসাপত্র দেওয়া হল।

তাঁর আলোচনার বিষয় ....নিম্নবর্গতত্ত্বের নিরিখে হরিশংকর জলদাসের উপন্যাস : প্রসঙ্গ জলপুত্র........

উর্বী মুখার্জী	প্লাবন সিংহ	হাসনারা খাতুন
উর্বী মুখার্জী	প্লাবন সিংহ	হাসনারা খাতুন
সমন্বয়ক	আহ্বায়ক	আহ্বায়ক
(জলপাইগুড়ি শাখা)	আন্তর্জাতিক আলোচনাসভা কমিটি	আন্তর্জাতিক আলোচনাসভা কমিটি
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়	বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়	বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়